বর্ধমান জেলার ইতিহাস
ও
লোকসংস্কৃতি

দ্বিতীয় খণ্ড

বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি

দ্বিতীয় খণ্ড

একককড়ি চট্টোপাধ্যায়

র‍্যাডিক্যাল
কলকাতা
২০০০

যে জনগণ এই দ্বিতীয় খণ্ড
রচনার প্রেরণা দিয়েছে
জেলার সেই জনগণের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য।

সবিনয় নিবেদন

প্রথমে পরিকল্পনা ছিল 'বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থখানি দুই মলাটের মধ্যে একখণ্ডে বিধৃত হবে। কিন্তু জেলার প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের ভৌগোলিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণ, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ইতিহাস, সাহিত্য-সংস্কৃতি, মুক্তি সংগ্রামে ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে জেলার ভূমিকা প্রভৃতি বিষয় নাতিবিশদভাবে আলোচনা করতে গিয়েও গ্রন্থখানি এমন আকার ধারণ করলো যে, একখণ্ডে প্রকাশ করা খুবই অসুবিধাজনক হয়ে উঠলো। সে কারণে প্রকাশক মহাশয়ের নির্দেশমত বইখানি দু'টি খণ্ডেই প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত বলেই বিবেচনা করলাম। এ খণ্ডটির প্রধান বিষয়বস্তু লোকসংস্কৃতি।

লোকসংস্কৃতি এমন এক বিষয় যেটা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকা বিশেষ দরকার আর তার জন্যে গ্রামে গ্রামে পর্যটন করে গ্রামের লোকদের সঙ্গে মিশে তথ্য সংগ্রহ করা বিশেষ প্রয়োজন। তা না হলে লোকসংস্কৃতি কতকটা কিংবদন্তীর পর্যায়ে পড়ে যাবে। অবশ্য কিংবদন্তী ঐতিহাসিক বিচারে লোকমত ও ইতিহাস রচনায় উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথায় "আমরা যদি আপনার উচ্চতর অভিমানে পুলকিত হইয়া মনে করি যে, ঐ সব সাধারণ লোকদের জন্য আমরা লোকসাহিত্য সৃষ্টি করিব তবে এমন জিনিসের আমদানি করিব যাহাকে বিদায় করিবার জন্য দেশে ভাঙা কুলা দুর্মূল্য হইয়া উঠিবে। ইহা আমাদের ক্ষমতায় নাই। আমরা যেমন অন্য মানুষের হইয়া খাইতে পারি না, তেমনি আমরা অন্য মানুষের হইয়া বাঁচিতে পারি না। সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ। তাহা তো প্রয়োজনের প্রকাশ নহে। চিরদিনই লোকসাহিত্য লোক আপনি সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে।" লোকসাহিত্য সম্বন্ধে যে কথা, লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধেও একই কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। তাই প্রকৃত লোকসংস্কৃতির সন্ধান পেতে গ্রামে গ্রামে ব্যাপক পর্যটন করে লোকসাধারণের সঙ্গে মিশে তাদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করা দরকার। শুধু তথ্য সংগ্রহ করলেই হবে না। ঐতিহাসিক সুমিত সরকারের কথায়—History is never a set of given facts, it is always open to diverse reading and interpretation

which must always remain to the test of available evidence. কাজেই এই সমস্ত সংগৃহীত তথ্য সম্পর্কে ব্যাপক পড়াশোনা করে এগুলির ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করা ঐতিহাসিকের প্রধান কর্তব্য। ঐ বিষয়ে ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকারের উক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। আচার্য সরকার বর্ধমান সাহিত্য সম্মেলনের ইতিহাস শাখার সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন—"সত্য প্রিয়ই হউক, আর অপ্রিয়ই হউক, সাধারণের গৃহীত হউক আর প্রচলিত মতের বিরোধী হউক, তাহা ভাবিব না। .....সত্য প্রচার করিবার জন্য সমাজের বা বন্ধুবর্গের মধ্যে উপহাস ও গঞ্জনা সহিতে হয় সহিব। কিন্তু তবুও সত্যকে খুঁজিব, বুঝিব, গ্রহণ করিব। ইহাই ঐতিহাসিকের প্রতিজ্ঞা।" লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য খোঁজার জন্য গ্রামের লোকসাধারণের সঙ্গে একাত্ম হওয়া ইতিহাস রচনায় অপরিহার্য। আর এ তথ্যগুলিকে বুঝতে হবে, তবে গ্রহণ করা যাবে। অর্থাৎ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করে সত্যকে উদ্ঘাটন করতে হবে। এই সত্যকে অতীতের এই সংস্কৃতিকে উদ্ঘাটন করলেই হবে না, যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিকতা গ্রামীণ সমাজে যেভাবে ধীর গতিতে অনুপ্রবেশ ঘটছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আধুনিক যুগে এগুলির প্রাসঙ্গিকতা কতখানি, এগুলির ভবিষ্যৎ কি তারও বিচার করা দরকার। তবেই সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস হবে। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক গৌতম ভদ্রের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—"ইতিহাসের মূল লক্ষ্য হচ্ছে অতীতের আলোতে বর্তমানকে পথ দেখানো, সমাজ ও গোষ্ঠীর চলাফেরার পথ ও বিপথ দেখিয়ে মানুষকে সাবধান করা। ইতিহাস কাহিনীকার নয়, ইতিহাস উপদেষ্টা। মানুষের চরিত্রের নিগূঢ় তত্ত্বদর্শীদের নীতিসূত্রের ভাষ্য হচ্ছে ইতিহাস।" (ইতিহাসের মুক্তি—১৯৫৭)

পূর্বেই প্রথম খণ্ডের ভূমিকাতেই উল্লেখ করেছি জীবনের প্রথম ভাগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করার সুবাদে আমাকে প্রায় সমস্ত মহকুমার বহু গ্রামে ঘুরতে হয়েছিল এবং এমন সব কাজের দায়িত্বে ছিলাম যার জন্যে লোকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ অনিবার্য ছিল। সে সময়েই লোকসংস্কৃতির বহু তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম। এরপর সেই সব তথ্যের interpretationএর জন্য diverse readingএর প্রয়োজন হয়েছিল। গ্রন্থপঞ্জির মধ্যে সেই সমস্ত গ্রন্থ, পত্রপত্রিকার তালিকা দিয়েছি। সেই সমস্ত গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার লেখকদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নাই।

আমি মনে করি, জেলার প্রতিটি গ্রামের একটা ইতিহাস আছে। সে ইতিহাসের মধ্যে রাজনৈতিক ইতিহাস অপেক্ষা ভৌগোলিক, সামাজিক,

অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির ইতিহাসের গুরুত্ব অপরিসীম। জেলার জনঅধ্যুষিত গ্রামের সংখ্যা ২৪৮৮। এদের মধ্যে অনেকগুলির জনবসতি খুবই অল্প। এই সমস্ত গ্রামের ইতিহাসের সম্ভার নিয়ে গড়ে ওঠে জেলার প্রকৃত পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সমস্ত গ্রাম পর্যটন সম্ভব হয় নাই। তার কারণ দৈহিক ও আর্থিক সঙ্গতির অভাব। তখন বাস, ট্রেন সার্ভিস ছিল সীমিত, রাস্তাঘাট বর্ষায় চলাচলের অযোগ্য ও সংকীর্ণ, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মেঠো রাস্তা। বেতন কাঠামো সংসার চালানোর পক্ষেই অপ্রতুল—স্কুটার ছিল স্বপ্নের যান। একমাত্র সম্বল শীর্ণ চরণযুগল ও মান্ধাতা আমলের বাইসাইকেল। তবু কম করে ৩০০/৩৫০ গ্রাম ঘুরেছি। সেটাও কম নয়, শতকরা হিসেবে ১৩/১৪ শতাংশ হবে। ইংরাজিতে একটা কথা আছে Gallop Poll—কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনমত যাচাই করতে জেলার বা প্রদেশের ৯/১০ শতাংশের মত লোকের মতামত নিয়ে গোটা অঞ্চল সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে আসা যায়। সে হিসেবে এই ৩০০/৩৫০ গ্রামের তথ্য সংগ্রহ করে একটা প্রতিনিধিত্বমূলক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার চেষ্টা করেছি। সাথর্ক হয়েছি কতটা বা আদৌ হয়েছি কিনা—সে বিচারের ভার আমার সহৃদয় পাঠকদের উপর।

পরিশেষে নিবেদন করি, আমি এক অনামী, অখ্যাত, অজ্ঞাত লেখক। লেখা আমার পেশা নয়—কতকটা নেশা বলতে পারা যায়। কাজেই এই ইতিহাস রচনায় অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকাই স্বাভাবিক। তাছাড়া আমার বিশ্লেষণ, আমার দৃষ্টিভঙ্গি হয়ত অনেকের মনঃপূত হবে না. অনেক সমালোচনা হবে। অবশ্য এই সমালোচনার মূল্যও কম নয়। সমালোচনা না হলে লেখার গুরুত্বই কমে যায়। তবে সমালোচনা স্বার্থক হওয়া দরকার। সমালোচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে।

সাহিত্য সমালোচনায় লগুড় ও ব্যক্তিগত গালাগালিই যদি একমাত্র জিনিস হয়, তাহলে সেটা সাহিত্যের পক্ষে হিতকর কিনা—এই প্রশ্নের উত্তরে কবি বলেছেন—

> "যে সমালোচনার মধ্যে শান্তি নাই, যা কেবলমাত্র আঘাত দেয়, কেবলমাত্র অপরাধটুকুর প্রতিই সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট করে, আমি তাকে ঠিক মনে করি নে। এরূপ সমালোচনার ভিতর একটা জিনিস আছে যা বস্তুতঃ নিষ্ঠুরতা—এটা আমাকে পীড়ন করে। .....রচনাকে তার সমগ্রতার দিক থেকে দেখতে হবে। অনেক সময় টুকরো করে দেখতে গেলেই এক জিনিস আর এক হয়ে যায়। সমগ্র পটের মধ্যে যে-ছবি

আছে—পটটাকে ছিঁড়ে তার বিচার করা চলে না—অন্ততঃ সেটা আর্টের বিচার নয়। সুবিচার করতে হলে যে-শান্তি মানুষের থাকা উচিত সেটা রক্ষা করে আমরা যদি আমাদের মত প্রকাশ করি তা হলে সে মতের প্রভাব অনেক বেশি হয়। বিচার শক্তির প্রেস্টিজ, শাসন শক্তির প্রেস্টিজের চেয়ে অনেক বেশি।" (সাহিত্যের পথে)

বইটি নিয়ে সার্থক সমালোচনা হোক সেটাই তো কাম্য। তবে এটুকু জোর দিয়ে বলতে পারি এই গ্রন্থ রচনায় আমার ঐকান্তিক নিষ্ঠার কোন অভাব ছিল না। এই সত্তরোত্তর বয়সে রোগে শোকে জরাজীর্ণ দেহেও বৎসরের পর বৎসর দিনে ৮/১০ ঘন্টা অক্লান্ত পরিশ্রম করে ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ে বিদগ্ধ পণ্ডিতদের গ্রন্থাদি ও বহু পত্রপত্রিকা ঘেঁটে তথ্যাদি সংগ্রহ করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা সংগৃহীত তথ্যকে সত্যনিষ্ঠ করার চেষ্টা করেছি—সার্থক হয়েছি কিনা পণ্ডিত-সমাজ ও আমার পাঠকবর্গ বিচার করবেন। যশ আমার কাম্য নয়, Immediate successও আশা করি না। এ-বিষয়ে সামুয়েল বাটলারের নীতিই আমার নীতি। বাটলার বলেছেন, বই ছাপিয়ে প্রকাশকের সমালোচকের বাড়ী বাড়ী ঘুরে সার্থক লেখক হবার চেষ্টা Guinea-Pig success। সেরূপ করা তাঁর ধাতুতে ছিল না।

রবীন্দ্রনাথও বলেছেন "বাঁচিয়া থাকিতেই যদি আগাম-শোধের বন্দোবস্ত হয় তবে তাহাতে সন্দেহ জম্মায়। সংসারে অনেক জিনিস ফাঁকি দিয়া পাইয়াও রক্ষা করা চলে। অনেকে পরকে ফাঁকি দিয়া ধনী হইয়াছে—এমন দৃষ্টান্ত একেবারে বিরল নহে। কিন্তু যশ জিনিসটিতে সে সুবিধা নাই। উহার সম্বন্ধে তামাদির আইন খাটে না। যেদিন ফাঁকি ধরা পড়িবে সেদিন-ই ওটি বাজেয়াপ্ত হইবে—মহাকালের এমনই বিধি। জীবিতকালে যে সম্মান লাভ করিল সেটি সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার জো নাই।" সম্মান আমি আশা করি না—তবে যদি বইটি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়, যদি কোন গবেষকের গবেষণা কাজে সামান্যতম সাহায্যে আসে তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব—নিজের পরিশ্রমকে সার্থক বলে মনে করব। অন্তত পক্ষে একটা তৃপ্তি নিয়ে মরতে পারব, অবশ্য যদি বইটির প্রকাশকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকি।

এবার কৃতজ্ঞতা জানাবার পালা। বইটির সার্থক রূপায়ণের জন্য কবি ও সাহিত্যিক চিত্ত ভট্টাচার্য, শিক্ষাব্রতী ও সাংবাদিক সুধীর অধিকারী, অধ্যক্ষ গোপীকান্ত কোঙার আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। বইটির প্রকাশনার ক্ষেত্রে আমার সহকর্মী ও সহমর্মী নন্দদুলাল ঘোষ, বেথুন কলেজের অধ্যাপিকা স্বপ্না রায়, আমার স্নেহভাজন ছাত্র সুকুমার চৌধুরী, মৃণাল চৌধুরী ও অভিজিৎ

চৌধুরীর কাছ থেকে অকুণ্ঠ সহায়তা পেয়েছি। আমার প্রতিবেশী ও সহকর্মী পরিমল চৌধুরী, স্নেহভাজন ছাত্র বিশ্বপতি মজুমদার, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য অনেক তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। এঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নাই। বইটি যাতে দ্রুত প্রকাশিত হয় তার জন্য আমার সহকর্মী অনুজপ্রতিম শিবু চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র আমার ছাত্র ডাঃ অভিজিৎ এই পুস্তকের প্রকাশনার কাজে উদ্যোগী হয়ে যদি র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশনের মাননীয় অরুণকুমার দে মহাশয়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে না দিতেন এবং পাণ্ডুলিপির সমস্ত প্রুফ কলকাতা থেকে এনে ও কলকাতায় পৌঁছে না দিতেন তাহলে আমার জীবনকালে এই গ্রন্থ কোনদিনই দিনের আলো দেখতো না। এঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ঋণশোধ করা যায় না; তার চেয়ে বরং এঁদের কাছে চিরঋণী থেকে এঁদের অবদান আজীবন মনের মণিকোঠায় বহন করবো। পরিশেষে, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশনের সুদর্শন মণ্ডল, চন্দন ধর ও সরল মুখোপাধ্যায় যেভাবে আমার পাণ্ডুলিপির দেবাক্ষরের পাঠোদ্ধার করে পুস্তকখানির পূর্ণ রূপায়ণ করেছেন এবং শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ সাহু কঠোর পরিশ্রম করে প্রুফ দেখেছেন তার জন্য তাঁদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করবো না—ঈশ্বরের কাছে তাঁদের জীবনে উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। অলমতি বিস্তরেন... .

মায়ের আশিস
২নং ইছলাবাদ
পোঃ শ্রীপল্লী, বর্ধমান
পিন : ৭১৩১০৩
১৬.০৯.২০০০

এককড়ি চট্টোপাধ্যায়

চিত্র-তালিকা
[দ্বিতীয় খণ্ড]

চিত্র পরিচিতি

[দ্বিতীয় খণ্ড]

১. **দারুল বাহার : গোলাপবাগ**

গোলাপবাগের সুন্দর বাগানের পরিকল্পনা করে রাজা রামমোহন রায়ের বাগানের মালী রামদাস। এই গোলাপবাগে মহারাজার প্রমোদ ভবনের জন্য ছিল সুদৃশ্য প্রাসাদ 'দারুল বাহার', পশুশালা, হাওয়ামহল প্রভৃতি।

২. **হাওয়ামহল : গোলাপবাগ**

গোলাপবাগে মহারাজার প্রমোদ ভ্রমণের জন্য চারদিকে পরিখার মধ্যে দ্বীপে রাজসিংহাসন সমন্বিত রাজার বিশ্রামস্থান।

৩. **মেঘনাদ সাহা তারামণ্ডল**

১৯৯৪ সালের ৯ই জানুয়ারি এই তারামণ্ডলের উদ্বোধন হয়। তারামণ্ডলের মূলযন্ত্র জি. এস. ইন্সট্রুমেন্ট—জাপান সরকার সাংস্কৃতিক চুক্তি অনুযায়ী বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই প্রতিষ্ঠান সাংস্কৃতিক মনোরঞ্জনের সঙ্গে মানুষের বিজ্ঞানচেতনা বৃদ্ধির সহায়ক।

৪. **বর্ধমান বিজ্ঞান কেন্দ্র**

রমনার বাগানে গড়ে উঠেছে এই বিজ্ঞান কেন্দ্র। ১৯৯৪ সালেব ৯ই জানুয়ারি এর উদ্বোধন হয়। এখানে রঙবেরঙের ফুল ও প্রাণী ছাড়াও রয়েছে জীবন্ত কঙ্কালের সঙ্গে সাইকেল প্রতিযোগিতা প্রভৃতি।

৫. **বৈদ্যপুর শিবমন্দির**

কালনা থানার বৈদ্যপুরে অসংখ্য শিবমন্দির—বৃন্দাবন চন্দ্রের নবরত্ন মন্দির ও নবরত্ন শিবমন্দির আছে—১৭২৪ শকাব্দে নির্মিত এই মন্দির টেরাকোটা অলঙ্কবণ যুক্ত।

৬. **রাসমঞ্চ : অম্বিকা কালনা**

কালনার অসংখ্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে এটি বিখ্যাত। এখানে কৃষ্ণরাধিকার বিগ্রহ রাসমঞ্চে স্থাপন করে রাসলীলা উৎসব হতো।

৭. **প্রতাপেশ্বর শিবমন্দির : কালনা**

কালনার রাজবাড়ির মধ্যে প্রতাপেশ্বর শিবমন্দিয় উল্লেখযোগ্য। ১৭৭১ শকাব্দে প্রতাপচন্দ্রের স্ত্রী প্যারীকুমারী কর্তৃক নির্মিত। স্থাপত্য ও টেরাকোটা অলঙ্করণে শোভিত এটি একটি শিখরদেউল মন্দির।

৮. আটকোণা শিবমন্দির : কামারপাড়া

ভাতাড় থানার বনপাশ কামারপাড়া গ্রামের মিস্ত্রীপাড়ায় অষ্টকোণাকৃতি টেরাকোটা অলংকৃত শিবমন্দিরটি দেউলেশ্বর মন্দির নামে খ্যাত। এটি ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত।

৯. রাধাগোবিন্দ মন্দির : জগদানন্দপুর

দাঁইহাট স্টেশন থেকে ২ কিমি রিক্সায় কাটোয়ার সন্নিকটে জগদানন্দপুর। এখানে রাধাগোবিন্দজীর মন্দির সুবৃহৎ প্রস্তরনির্মিত মন্দিরের মধ্যে বিদ্যমান। ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে কৃষ্ণদুলাল রায়চৌধুরী নির্মাণ করান।

১০. কালনার গোপালজীর মন্দির

কালনার গোপালজীর মন্দিব ১১৫৯ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত—গোপালজীর মন্দির ও অনন্ত বাসুদেবের মন্দির কালনার অন্যতম দর্শনীয় স্থান।

১১ক. সর্বমঙ্গলা মন্দিরের দুর্গার প্যানেল

বাঁকানদীর উত্তরে শ্রীশ্রী সর্বমঙ্গলা মন্দির অন্যতম দর্শনীয় স্থান। এই নবরত্ন মন্দিরের সামনের দুর্গার প্যানেলের কারুকার্য বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে।

১১খ. বৈদ্যপুরের শিবমন্দিরের রামলক্ষ্মণের প্যানেল

বৈদ্যপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে মীরহাটের দিকে এগিয়ে গেলে একটি নবরত্ন শিবমন্দির চোখে পড়বে। এরই কাছে একটি পঞ্চরত্ন মন্দির আছে। এর টেরাকোটা অলঙ্করণের মধ্যে বিশেষভাবে রামলক্ষ্মণের প্যানেল চোখে পড়ে।

১২ক. কঙ্কালেশ্বরীর মন্দির : কাঞ্চননগর

বর্ধমান শহরের প্রান্তে অবস্থিত চামুণ্ডা কঙ্কালেশ্বরীর মন্দির। মন্দিরটির কোন টেরাকোটা অলঙ্করণ নাই। নবরত্ন মন্দিরের গঠনশৈলী ২০০।২৫০ বছরের প্রাচীন বলেই মনে হয়।

১২খ. কঙ্কালেশ্বরী মূর্তি

প্রবাদ মূর্তিটি বাঁকা গর্ভে নিমজ্জিত ছিল। এই মূর্তির উল্টো পিঠে ধোপারা কাপড় কাচতো। হঠাৎ উল্টাইয়া গেলে অষ্টভুজা চামুণ্ডার মূর্তি দেখা যায়। মূর্তিটি এক সাধক মন্দিরে স্থাপন করে। মূর্তিটির বৈশিষ্ট্য হল মূর্তিটির মধ্যে মানবদেহের শিরা, উপশিরা, ধমনী পাথরের ওপরে ক্ষোদিত। মূর্তিটির মস্তকের ওপরে একটি হস্তী ও পদতলে দেবাদিদেব শায়িত।

১৩ক. বলরামের পীড়াদেউল মন্দির

বোড়গ্রামের মধ্যস্থলে বলরামজীর মন্দির অবস্থিত। ভূমি থেকে প্রায় ১৪ ফুট উঁচু এক বিশাল ৮০ ফুট × ৬৫ ফুট প্রাঙ্গনের পশ্চিমভাগে মূল মন্দির অবস্থিত। এর গঠন প্রণালী পীড়াদেউল পদ্ধতির।

১৩খ. হোসেন শাহের মসজিদের ধ্বংসাবশেষ : মঙ্গলকোট

১৬২৪ সালে নির্মিত মসজিদে সম্রাট শাহজাহানের নাম ক্ষোদিত আছে। সম্রাটের গুরু দানেশমন্দ কর্তৃক হিজরী ১০৬৫ অব্দে নির্মিত। মসজিদটি এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত।

১৪ক. লালজীর পঁচিশচূড়া মন্দির

কালনার লালজী মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী অপূর্ব। পঁচিশ চূড়া বিশিষ্ট মন্দিরের অলঙ্করণ ও স্থাপত্যশৈলী পোড়ামাটি শিল্পের বিরল নিদর্শন।

১৪খ. পঞ্চরত্ন মন্দির : এরুয়ার

ভাতাড় থানার এরুয়ার গ্রামের মহারুদ্রদেবের পঞ্চরত্ন শিবমন্দিরের স্থাপত্য ও অলঙ্করণ বৈশিষ্টের দাবী রাখে।

১৪গ. জগদানন্দপুরের প্রস্তর মন্দির

কাটোয়ার সন্নিকটে জলদানন্দপুরের রাধাগোবিন্দজীর পঞ্চরত্ন প্রস্তর মন্দিরের স্থাপত্যরীতি অনুপম।

১৫ক. সর্বমঙ্গলার মূর্তি

প্রবাদ মূর্তিটি বাহিরসর্বমঙ্গলা মৌজায় চুনুরী পুকুরে নিমজ্জিত ছিল—চুনুরীরা এর পেছনে গুগ্‌লী ভাঙতো। কথিত আছে, মহারাজা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে চুনুরীর কাছ থেকে উদ্ধার করেন ও বাঁকানদীর উত্তরে তৈলমারুই ও বড়বাজারের সংযোগস্থলে নবরত্ন মন্দিরে স্থাপন করেন। এই মহারাজা সম্ভবত কৃষ্ণরাম। সর্বমঙ্গলা বর্ধমানেশ্বরী।

১৫খ ও ১৬. দরিয়ারপুরের ডোকরা শিল্প

বাঁকুড়া থেকে এসে কয়েকটি ডোকরা পরিবার আউসগ্রাম থানার গুসকরার কাছে দরিয়ারপুরে বসতি স্থাপন করে। এরা শিরেপারদু (মোম ছাঁচ গলানো) পদ্ধতিতে পিতলের কাজললতা, পেঁচা, অশ্বারোহী সমেত অশ্ব, দুর্গা মূর্তি তৈরী করে। এদের দুর্গা মূর্তি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছে। তবে অধিকাংশ শিল্পী পরিবার দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে।

কৃতজ্ঞতা

ডঃ কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশম্ভুনাথ ঘোষাল, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী.
পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা ১৪০৩, ডঃ বিনয় ঘোষ, শিবু চট্টোপাধ্যায়।
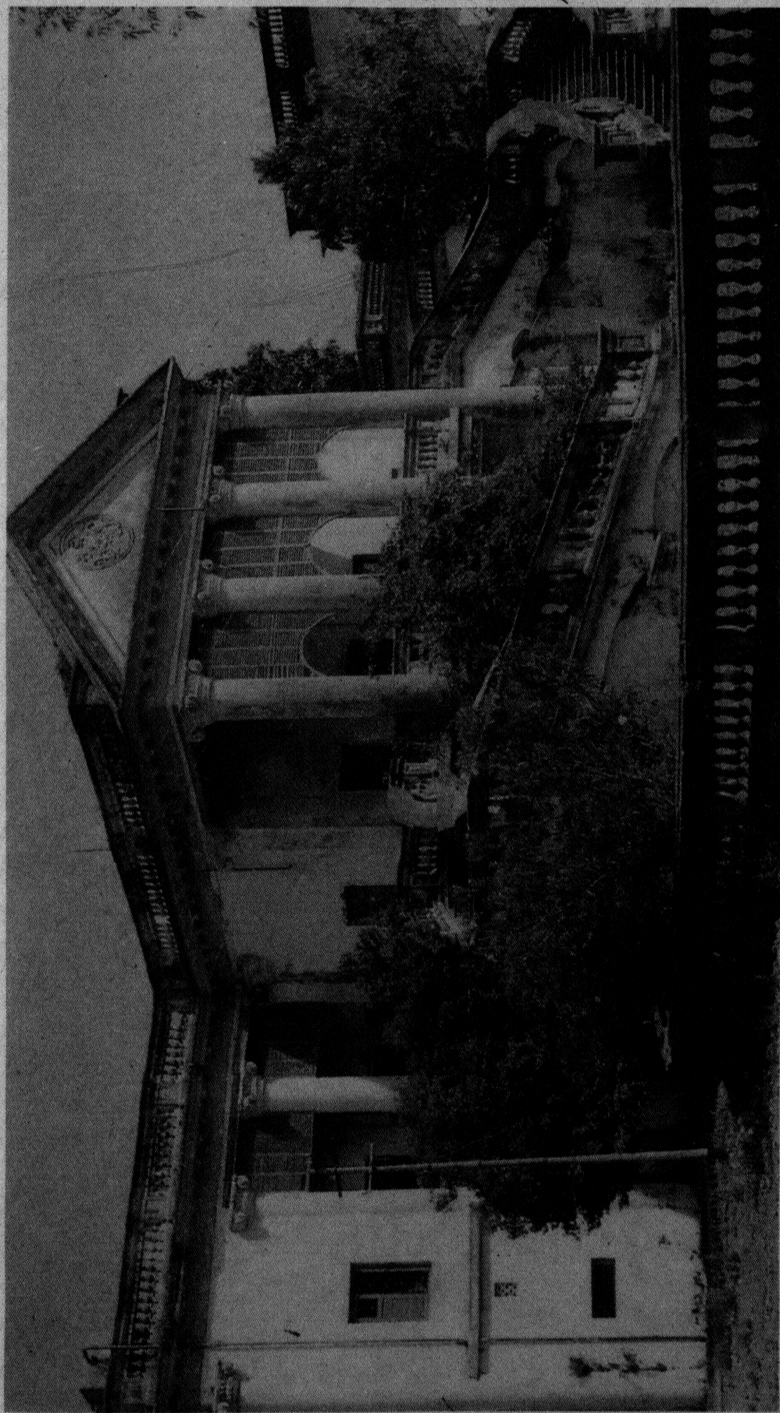
১. দারুল বাহার : গোলাপবাগ
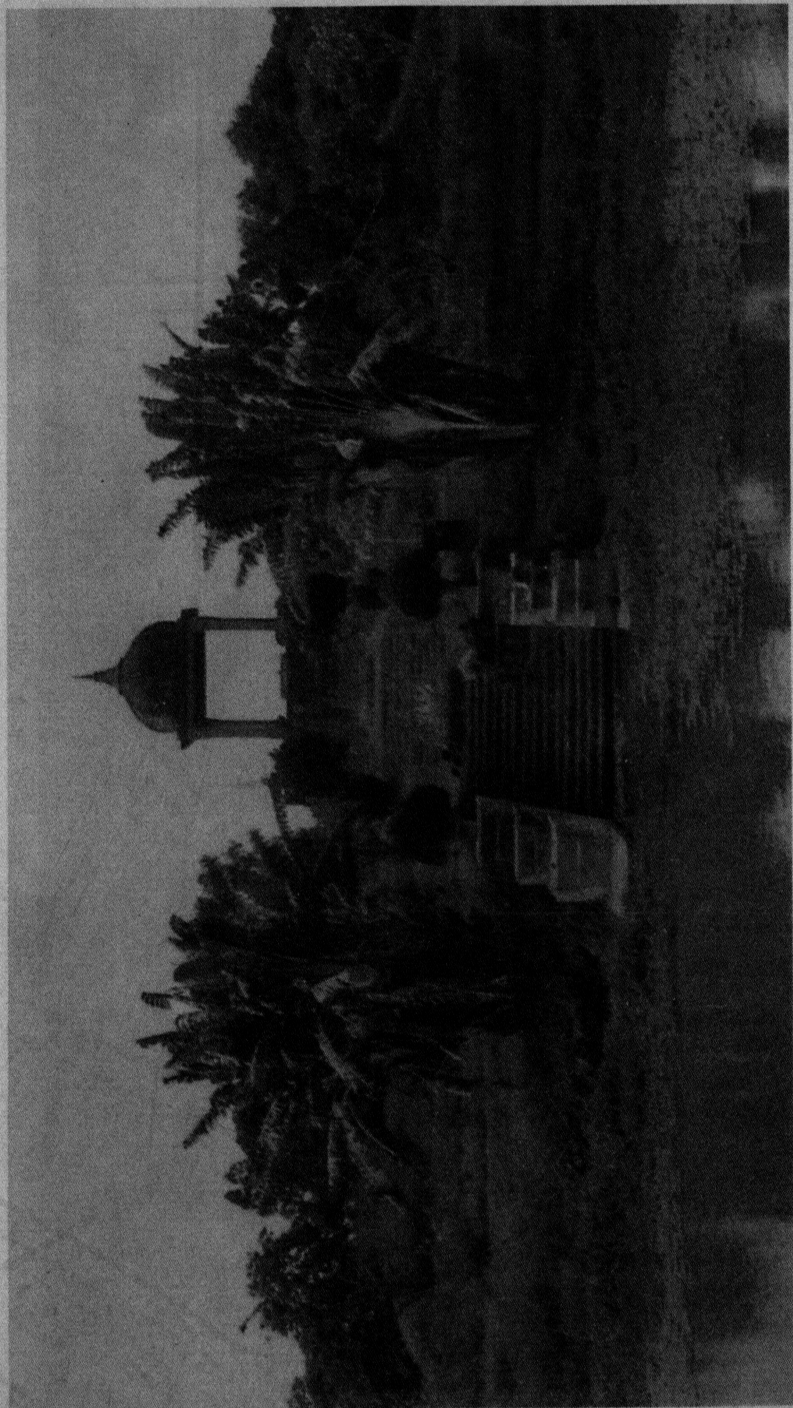
২. হাওয়া মহল : গোলাপবাগ
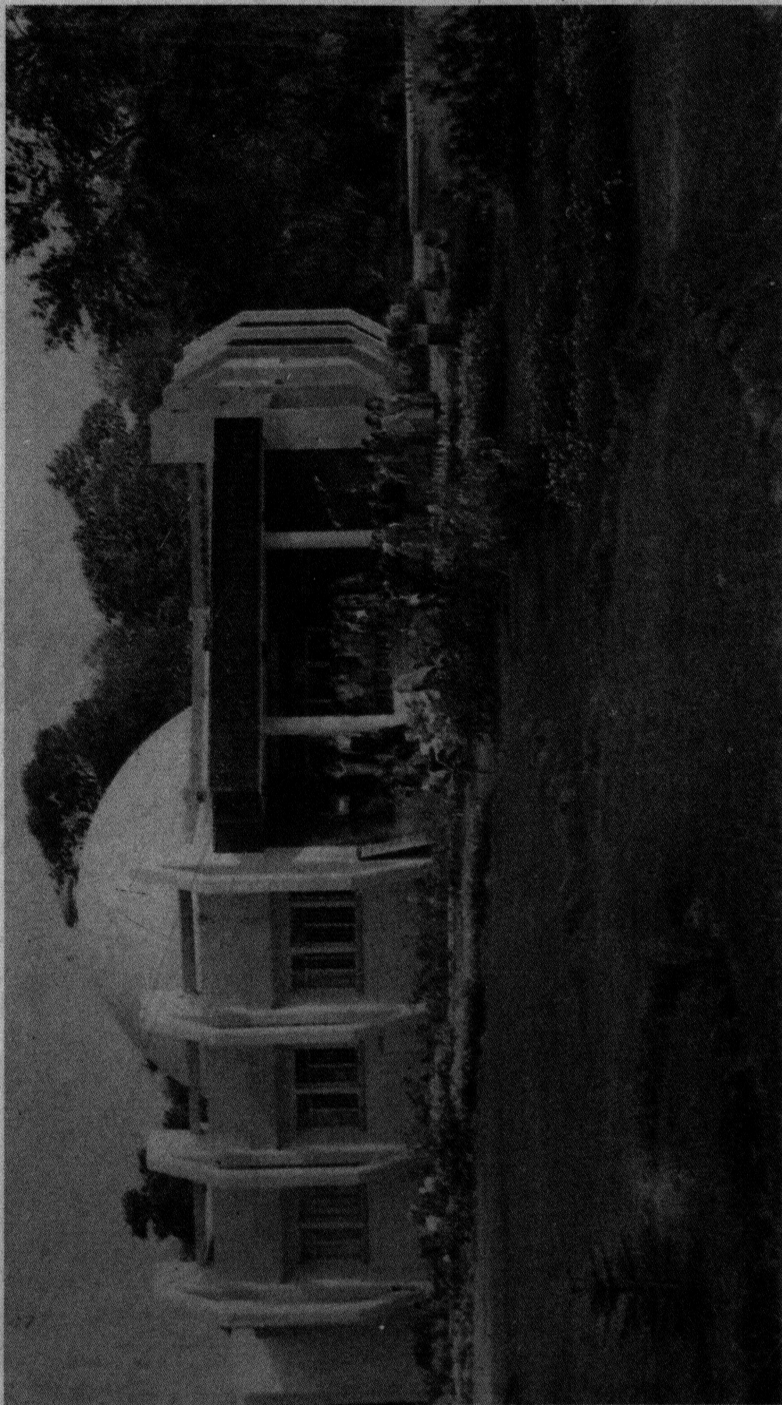
৩. মেঘনাদ সাহা তারামণ্ডল
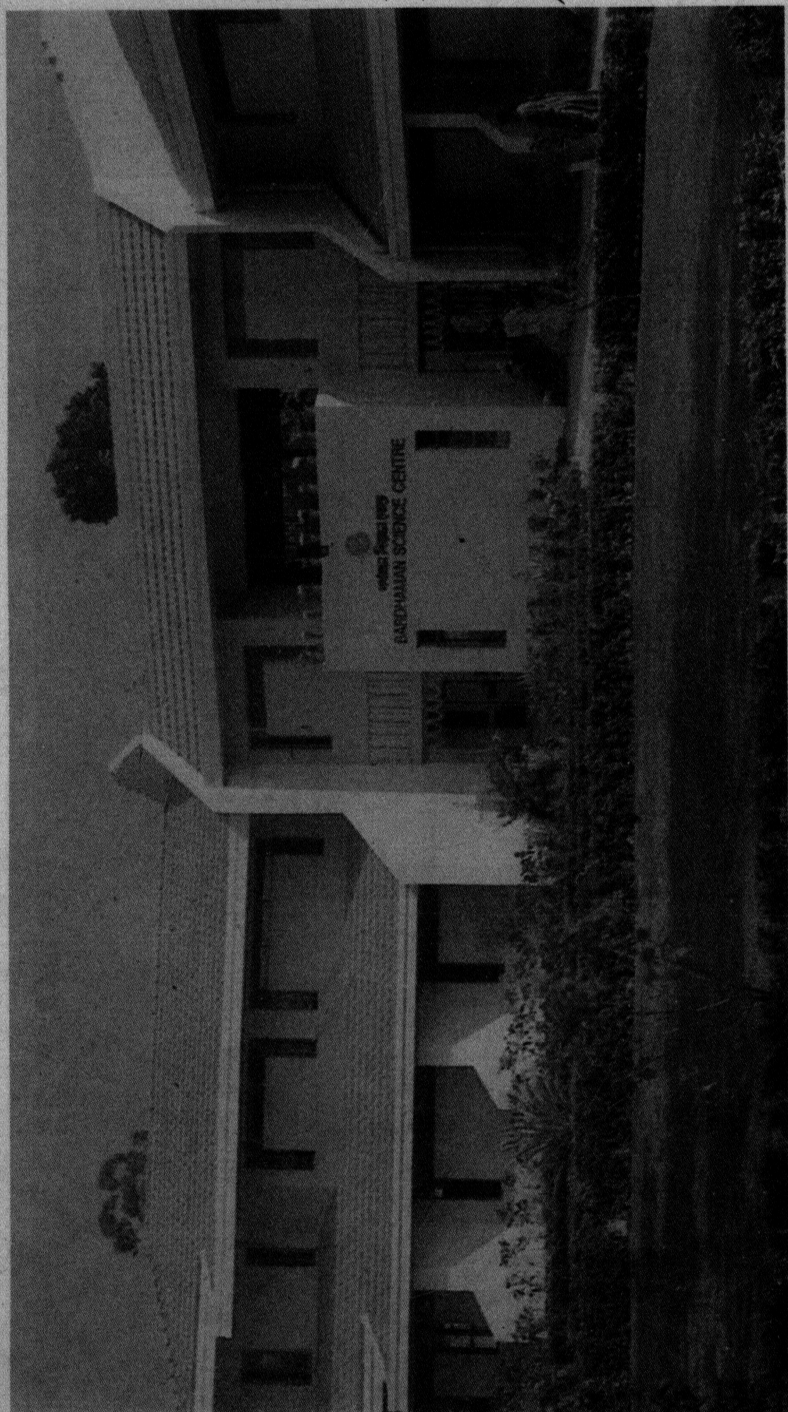
৪. বর্ধমান বিজ্ঞান কেন্দ্র
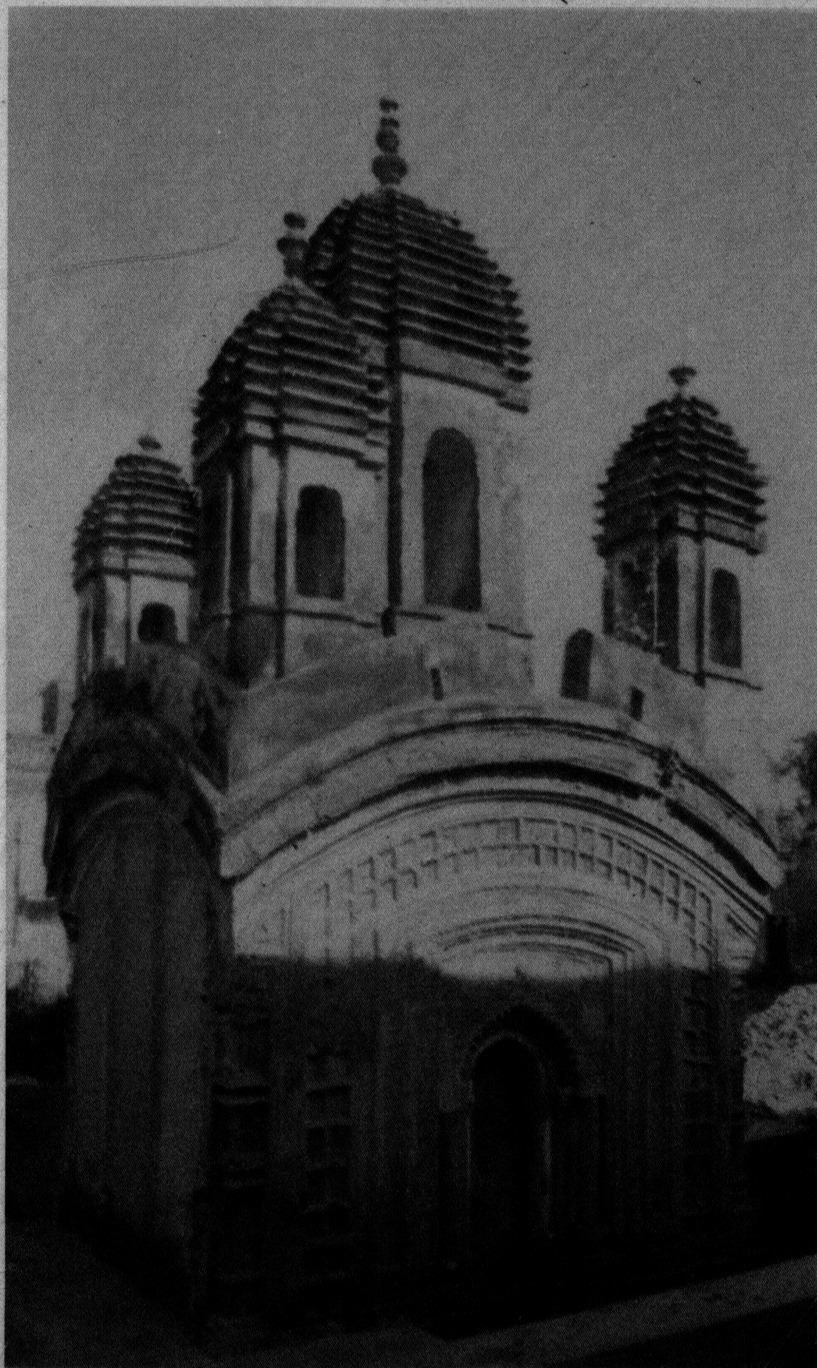
৫. বৈদ্যপুর শিবমন্দির

৬. রাসমঞ্চ : অম্বিকা-কালনা
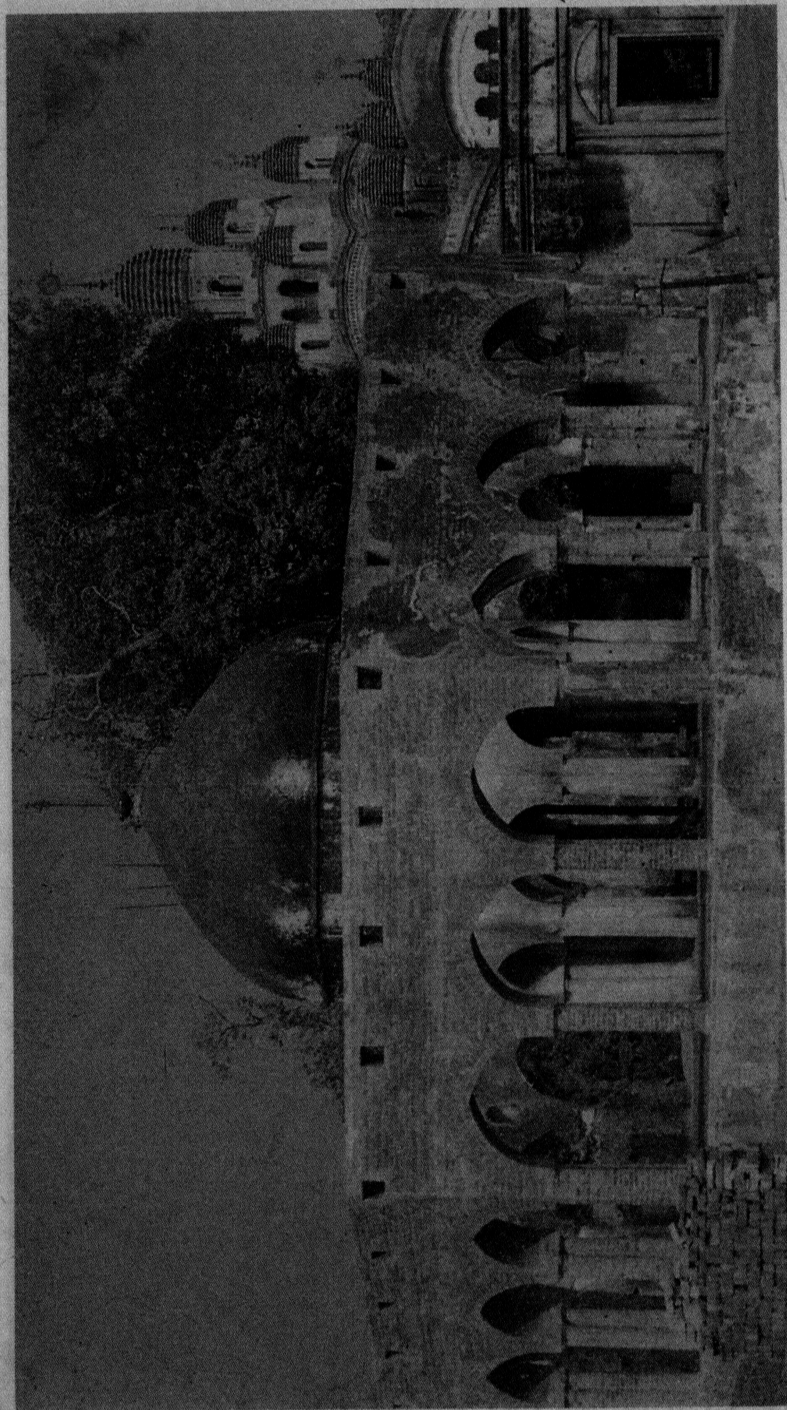
৭. প্রতাপেশ্বর শিবমন্দির : কালনা
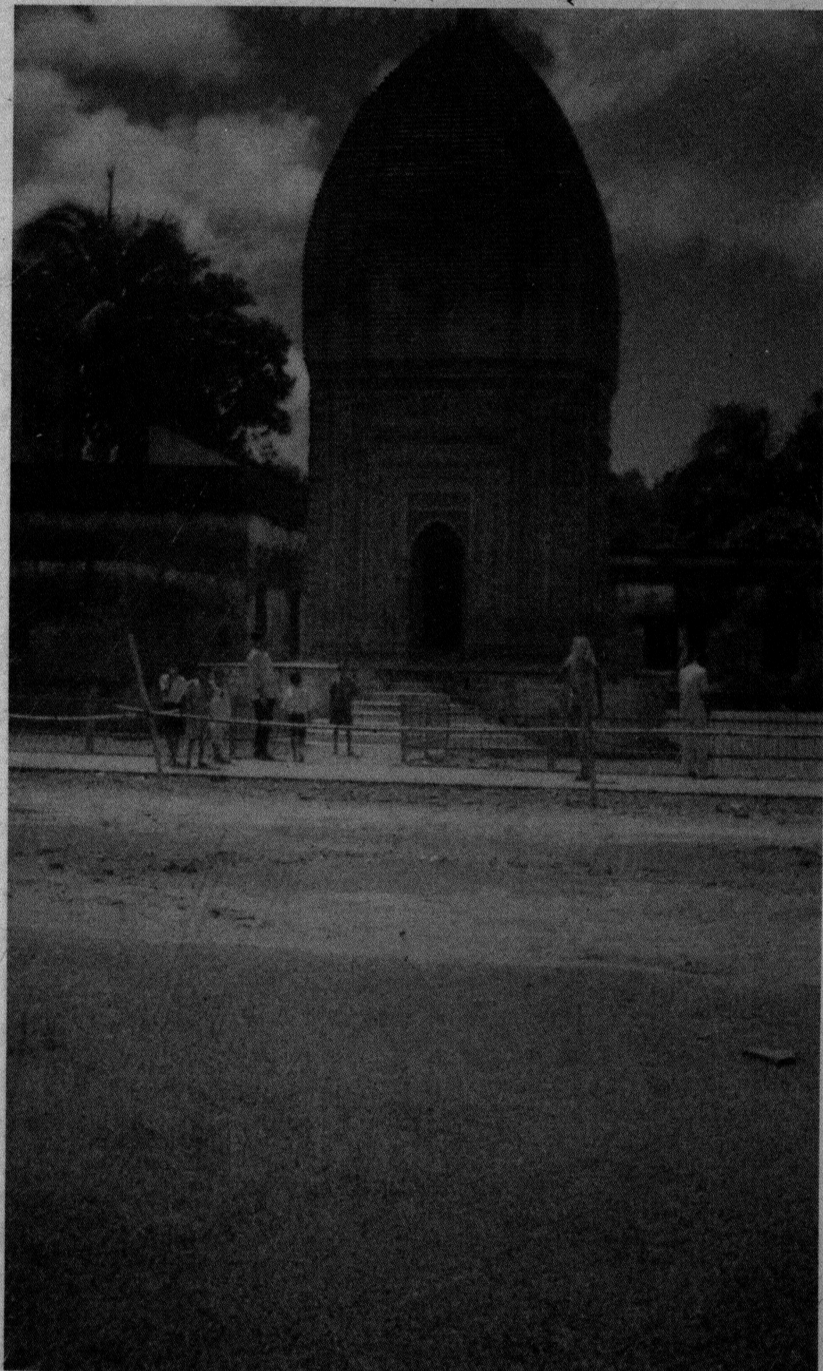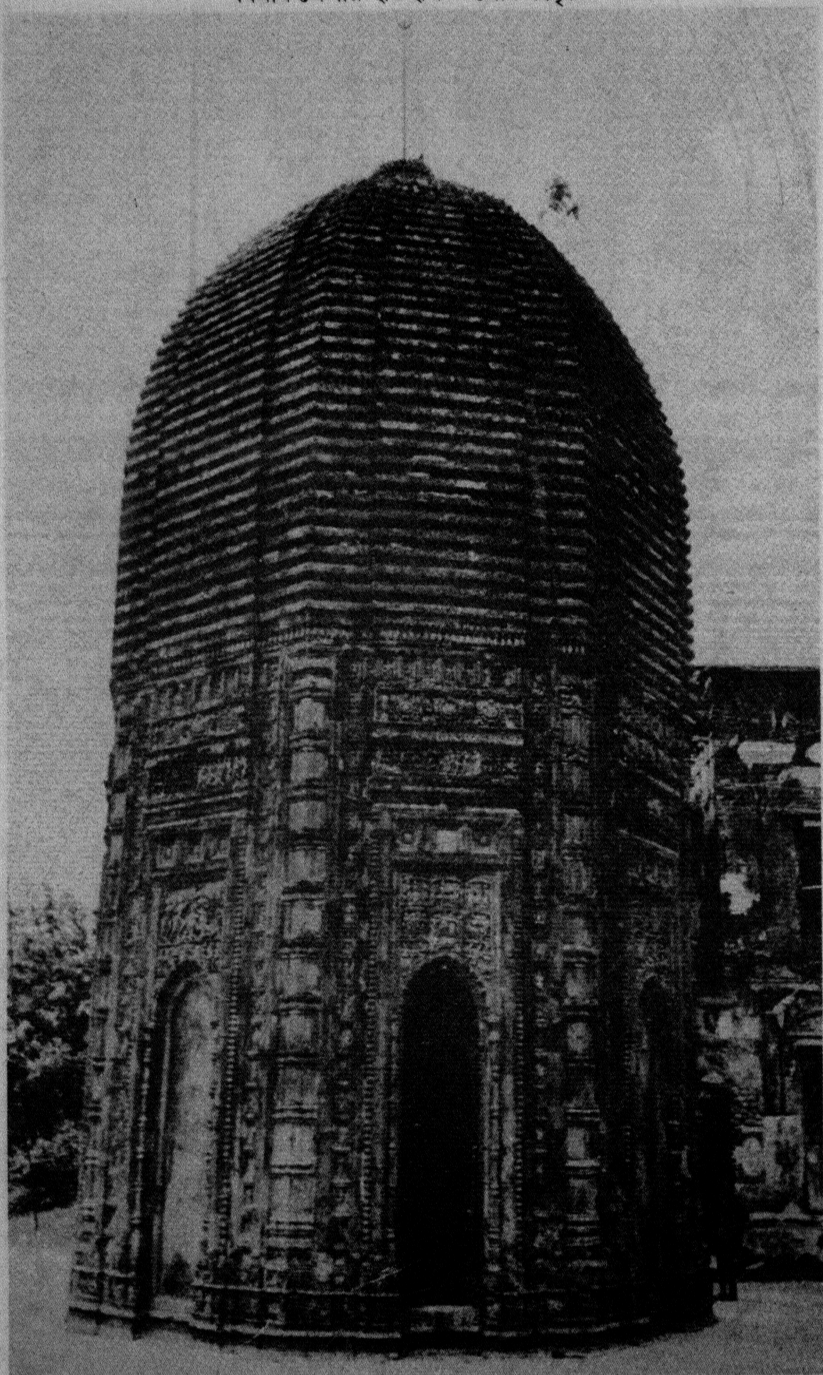
৮. আটকোণা শিবমন্দির : কামারপাড়া
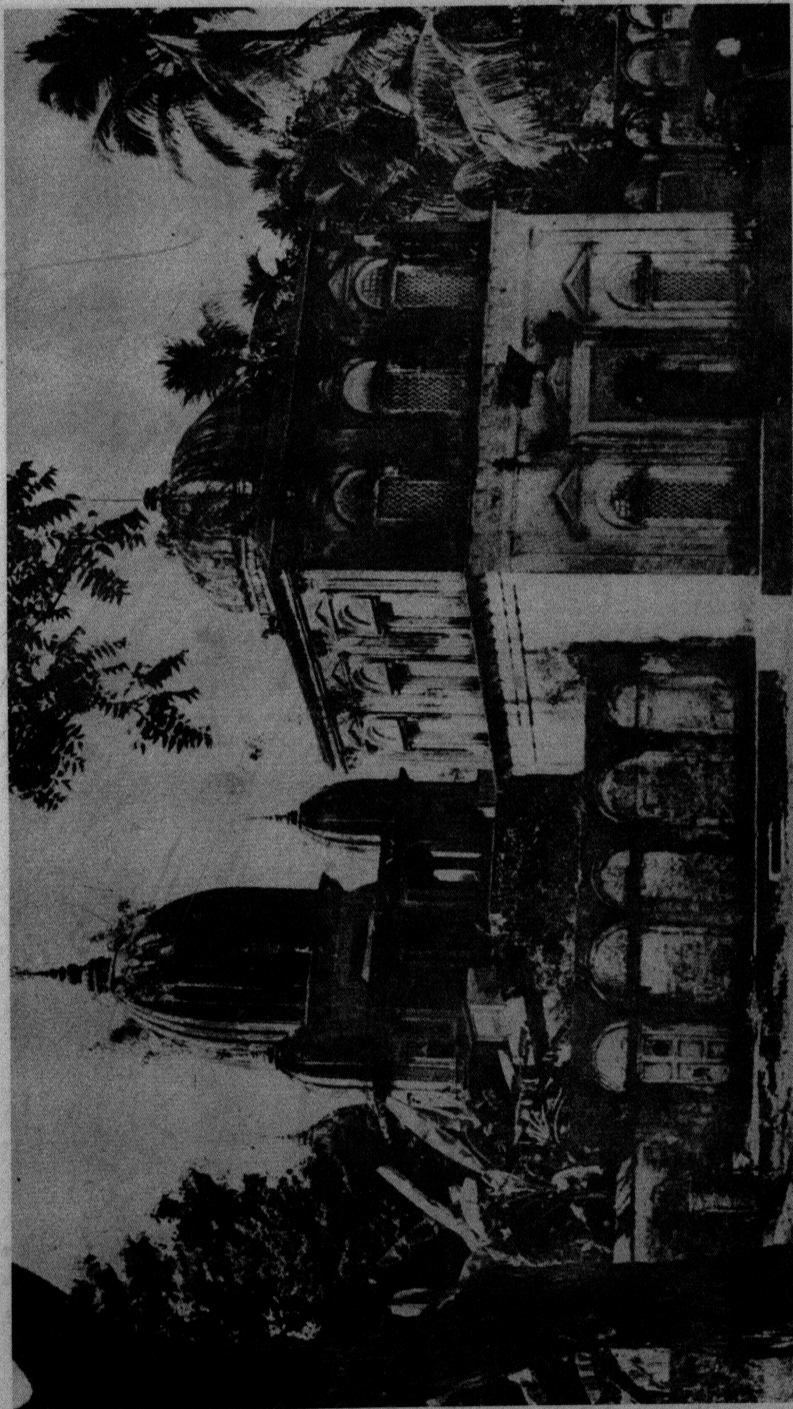
৯. রাধাগোবিন্দ মন্দির : জগদানন্দপুর

১০. কালনার গোপালজীর মন্দির
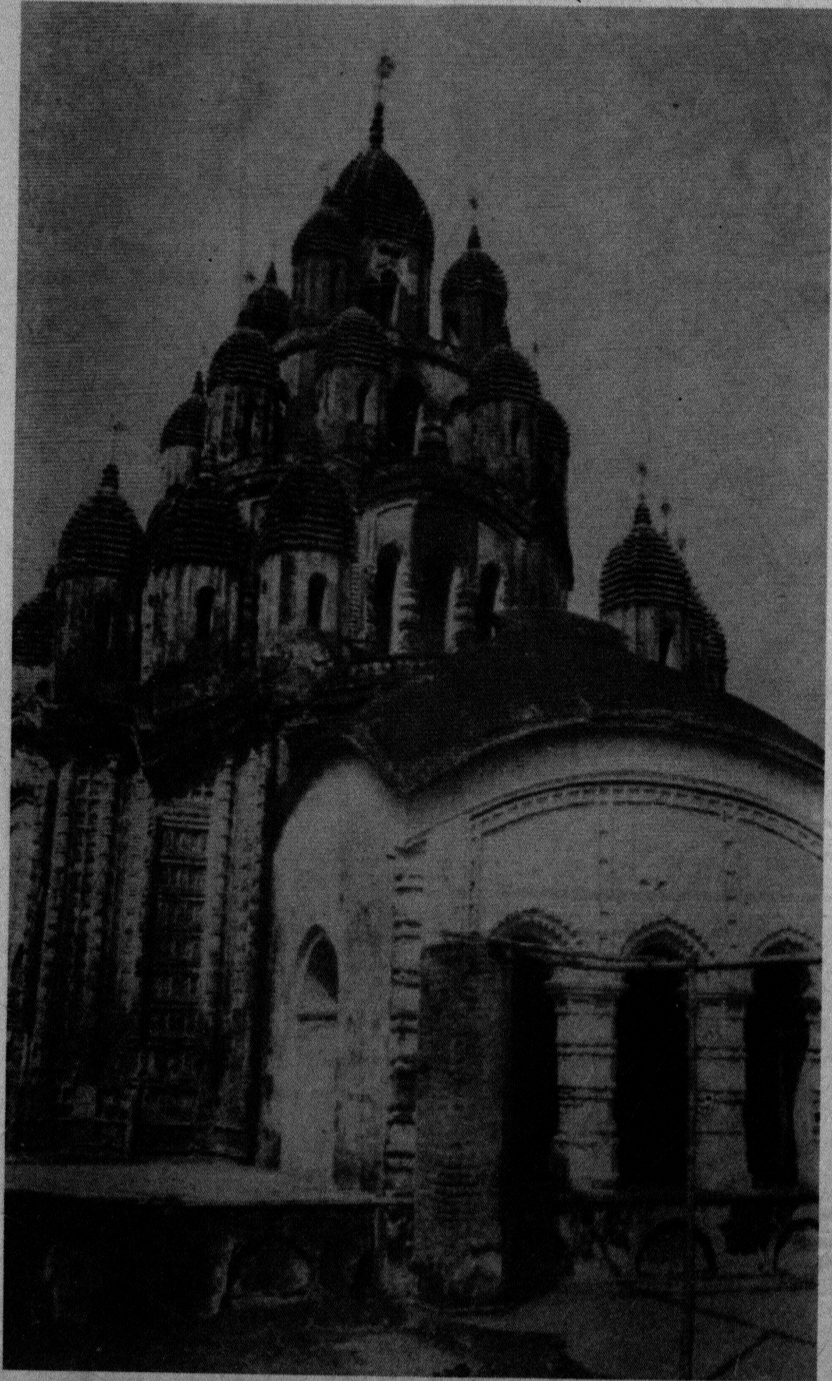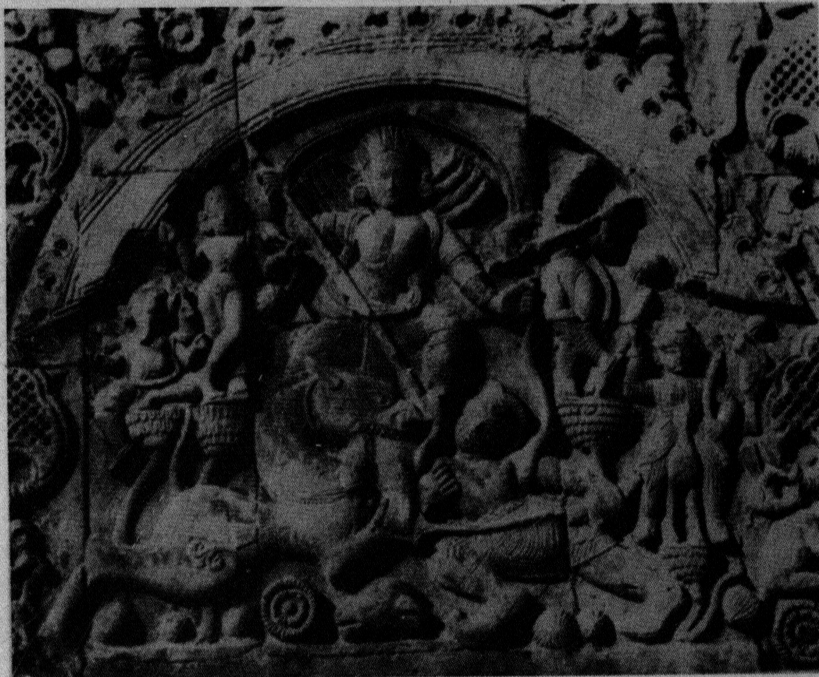
১১ক. সর্বমঙ্গলা মন্দিরের দুর্গার প্যানেল

১১খ. বৈদ্যপুরের শিবমন্দিরের রামলক্ষ্মণের প্যানেল
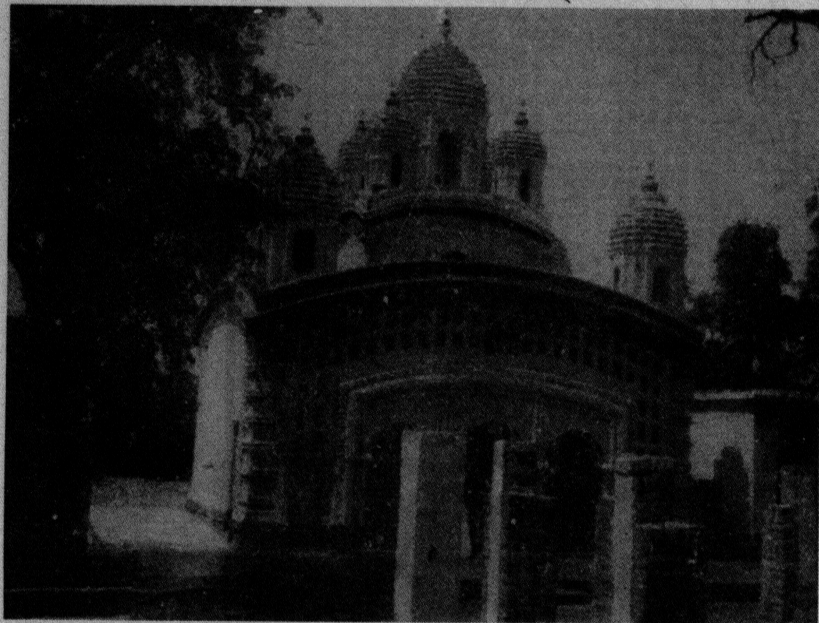
১২ক. কঙ্কালেশ্বরীর মন্দির:কাঞ্চননগর
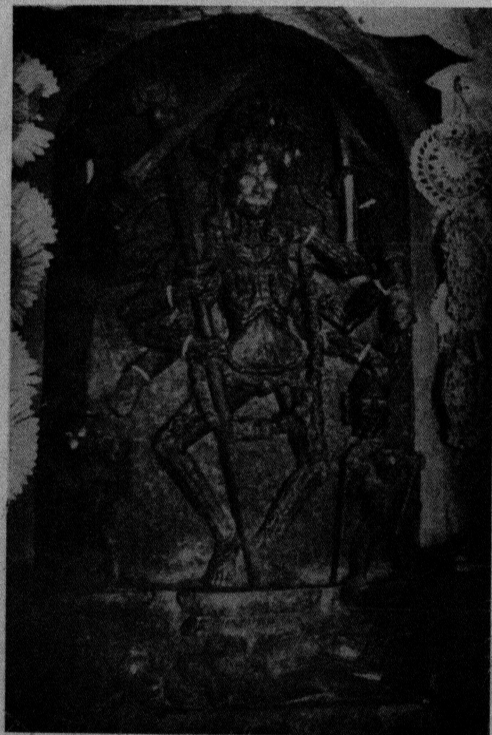
১২খ. কঙ্কালেশ্বরী মূর্তি

১৩ক. বলরামের পীড়াদেউল মন্দির
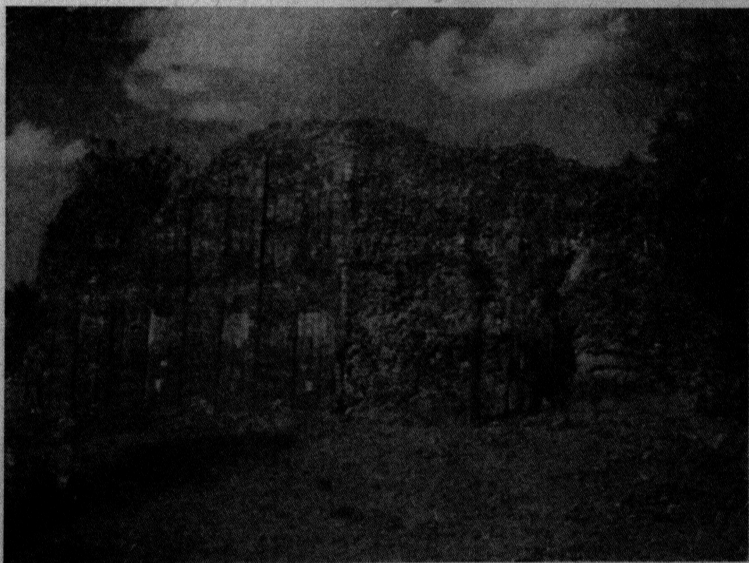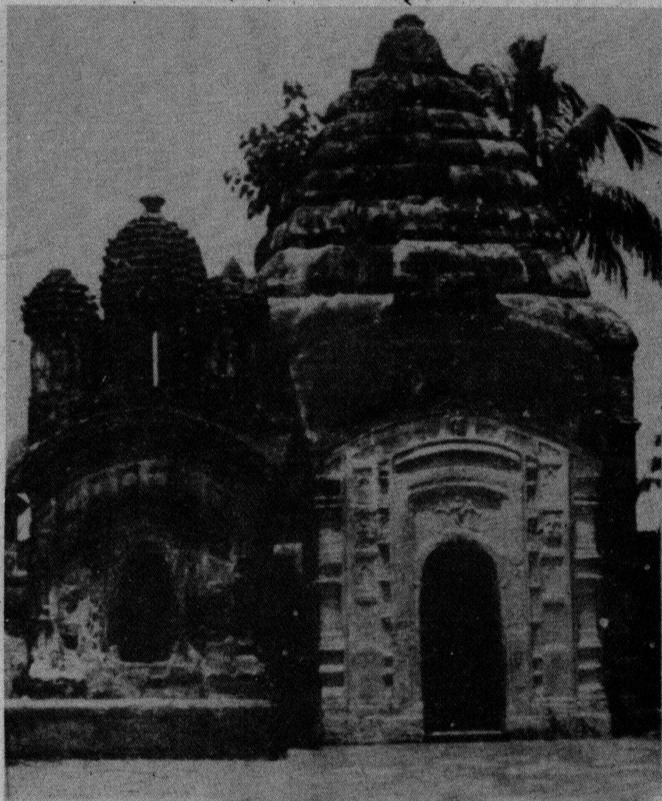
১৩খ. হোসেন শাহের মসজিদের ধ্বংসাবশেষ : মঙ্গলকোট

১৪ক. লালজীর পঁচিশচূড়া মন্দির
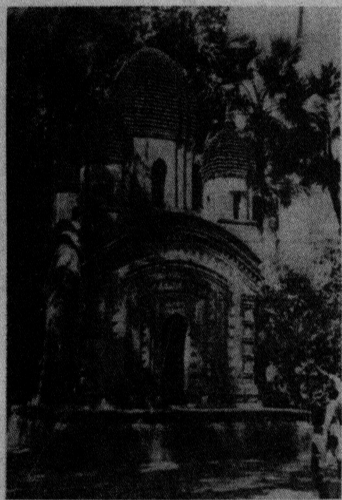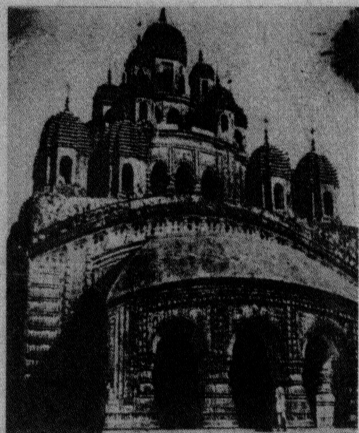
১৪খ. পঞ্চরত্ন মন্দির : এরুয়ার

১৪গ. জগদানন্দপুরের প্রস্তর মন্দির

১৫ক. সর্বমঙ্গলার মূর্তি

১৫খ. দরিয়ারপুরের ডোকরা শিল্প (১)

১৬. দরিয়ারপুরের ডোকরা শিল্প (২)

ডোকরা শিল্পী

সূচি

প্রথম পর্ব

দ্বিতীয় পর্ব

তৃতীয় পর্ব

পরিশিষ্ট :

প্রথম পর্ব

জেলার আধুনিক কালের সাহিত্য

নাটকের বিবর্তন, জেলার নাটক ও নাট্য-আন্দোলন

সাময়িক পত্রের ইতিহাসের ধারা

এক অধ্যায়

জেলার আধুনিক কালের সাহিত্য

সংস্কৃতই বাংলা ভাষার জননী। ভারতের সীমান্তের পথ বেয়ে ভারতে প্রবেশ করলো আর্য জাতি, তারা সঙ্গে নিয়ে এলো সমৃদ্ধ বৈদিক সাহিত্য ও উদার বৈদিক ছান্দস ভাষা—ভাষার উন্নত রাজপথ। সে পথে অন্ত্যজ জনগণের প্রবেশ নিষিদ্ধ কিন্তু রাজপথ তো রাজারই পথ নয়—জনগণেরও সঞ্চরণের পথ—ফলে ছান্দস হলো গণায়ত। ভারতে আর্য সংস্কৃতির ক্রমাগ্রগতির ফলে সংস্কৃতে ঘটলো প্রাকৃত, ও নানা অপভ্রংশের অনুপ্রবেশ। ৭ম শতাব্দীতে পাণিনি গণায়ত ছান্দস-এর সংস্কার করলেন। উদ্ভব হলো সংস্কৃত ভাষার। পরে সংস্কৃতেরও ঘটলো রূপান্তর; প্রাকৃত, মহারাষ্ট্রী, মাগধী, শৌরসেনী পৈশাচীর ধারা মূলধারার সঙ্গে মিশে গেল। মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলার হল উদ্ভব। কদলীপত্রে হবিসংযুক্তম্, কবোষ্ণান্নম্ বাঙ্গালীর কণ্ঠে উচ্চারিত হলো 'ওগ্গর ভত্তা রম্ভঅ পত্তা গাইক ঘিত্তা দুগ্ধ সযুত্তা'। এই বাংলা অপভ্রংশ থেকে "কলা পাতায় গব্যঘৃত সহযোগে গরম ভাত"-এ—রূপান্তরিত হতে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হলো। কাজেই বাংলা সাহিত্য আলোচনার আগে সংস্কৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বৃহদ্ধর্ম পুরাণ। গ্রন্থটি জেলার পূর্বাঞ্চলে রচিত হয়েছিল বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন। গোপরাজা ও সেন রাজাদের তাম্রশাসন সংস্কৃত ভাষাতেই রচিত হত। শ্রীখণ্ড-নিবাসী গোবিন্দদাসের কর্ণামৃত ও সঙ্গীতসাধক নাটক সংস্কৃতে রচিত। দেনুড় গ্রামের বৃন্দাবন দাসের কৃষ্ণকর্ণামৃত-টীকা, রসকল্পসারষ্টক, নিত্যানন্দ যুগলাষ্টক উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত রচনা।

মাড়োর নিত্যানন্দ প্রভুর বংশধর রঘুনন্দন দাস গোস্বামী (১৭৮৬?) গৌরাঙ্গ-চম্পূ, শ্রীগৌরাঙ্গ বিরুদাবলী, শ্রীমদ্ ভাগবতের সংশয়শাতন টীকা, স্মৃতি-শাস্ত্রের অনেকগুলি টীকা সংস্কৃতে রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যচর্চায় মানকর, কালনা, পূর্বস্থলী, সাতগেছিয়া, ধাত্রীগ্রাম, বর্ধমান

মহারাজের রাজসভা এবং দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের শাকনাড়া এবং ভাতার থানার মাহাতা ও বড়বেলুনের উল্লেখযোগ্য অবদান আছে।

কালনার তারানাথ তর্কবাচস্পতি (১৮০৬–২০.৬.১৮৮৫) সংস্কৃত অভিধান রচনায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বাচস্পত্য অভিধান' (১৮৭৩–'৭৪), 'শব্দস্তোমমহানিধি—অভিধান' (১৮৬৯–'৭০) শব্দার্থরত্ন (১৮৫২) ও সমাজ-সংস্কারমূলক শাস্ত্র বহুবিবাহ বাদ, বিধবা বিবাহ খণ্ডক ইত্যাদি। তিনি ছিলেন 'জীবন্ত সংস্কৃত বিশ্বকোষ'।

সিদ্ধান্ত কৌমুদী প্রকাশের দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণের সুপারিশ করে কাওয়েল সাহেব মন্তব্য করেছিলেন—I question if anyone in Bengal is equal to him.

রায়না থানার শাকনাড়া গ্রামের কুড়ুনীদেবীর পুত্র প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ (১৮০৬–২৫.৪.১৮৬৭) তারানাথের সমসাময়িক সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় কাব্যরসপূর্ণ শ্লোক রচনাতেই তাঁর সমধিক খ্যাতি ছিল। 'সমস্যাকল্পলতা' গ্রন্থে সংস্কৃত সমস্যাপূরণে তাঁর কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ১১টি সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। তাঁর অন্য গ্রন্থের তালিকায় আছে দণ্ডিরচিত কাব্যাদর্শের টীকা, পুরুষোত্তম রাজাবলী কাব্য ও নানার্থ সংগ্রহ অভিধান। তিনি টীকাকার হিসেবে 'দ্বিতীয় মল্লিনাথ'। ধাত্রীগ্রামে মহামহোপাধ্যায় কৈলাস চন্দ্র শিরোমণি (১৮৩০–১৯০৯) ন্যায়শাস্ত্রের ভাষ্যচ্ছায়ার টীকা রচনা করেন।

পূর্বস্থলীর মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন (১৮৩৩–১৯১১) প্রায় ১৫ খানি সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। এই গ্রন্থগুলি হলো—মূলগ্রন্থ কর্পূরাদি স্তোত্রের টীকা (১২৬৫ বঙ্গাব্দ), বাতদূত নামক দূতকাব্য টীকা, অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্-এর টীকা, মলমাসতত্ত্ব, দায়ভাগ, মীমাংসা পরিভাষা, শ্যামসন্তোষ, বৃহৎ মুগ্ধবোধ, অর্থসংগ্রহ নামক মীমাংসা গ্রন্থের টীকা, মীমাংসা ন্যায় প্রকাশ, মীমাংসা গ্রন্থের টীকা, তত্ত্বকৌমুদী নামক সাংখ্যশাস্ত্রের টীকা, স্মৃতিসিদ্ধান্ত ১ম, ২য় ও ৩য়।

বৈদ্যপুরের মহামহোপাধ্যায় বীরেশ্বর তর্কতীর্থ তর্কনিধি (১২৭৯–১৩৬১ বঙ্গাব্দ, কর্মক্ষেত্র বর্ধমান) লকাবার্থ নির্ণয় (১৯২১) নামক সংস্কৃত গ্রন্থরচনা করেন। এছাড়া বড়বেলুনের ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্নের গৌরচন্দ্রামৃত, মুক্তি দীপিকা, মাহাতার কৃষ্ণমোহন বিদ্যাভূষণ-এর অলংকার কৌস্তুভ, চানকের রাধাকান্ত বাচস্পতির নিকুঞ্জ-বিলাস, সূর্যশতক, দুর্গাশতক; কালনার উপলতি গ্রামের কাশীনাথ •তর্কালংকারের 'শব্দসন্দর্ভ সিন্ধু' অভিধান, মীরহাটের হরিনারায়ণ

তর্কপঞ্চানন-এর অমরকোষের মুগ্ধবোধিনী টীকা, শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চৈতন্য- চরিতামৃতের সংস্কৃত অনুবাদ (১২৯৫), কর্মসূত্রে কাটোয়ার অধিবাসী দুর্গাদাস লাহিড়ীর (১৮৫৩–১৯৩২) আদিনিবাস নবদ্বীপের কাছে চক ব্রাহ্মণগড়িয়া) বাংলা অক্ষরে চতুর্বেদের সম্পাদনা, ও মর্মানুসারিনী প্রভৃতি গ্রন্থ জেলার সংস্কৃত সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। আরও বহু পণ্ডিত জেলার এখানে ওখানে নিরলসভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের সাধনা করে যাচ্ছেন। তথ্যের অভাবে সকলের উল্লেখ করা সম্ভব হলো না। এর্জন্য পণ্ডিতপ্রবরদের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে আধুনিক যুগের সূচনা ধরা যেতে পারে। ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত এই সময় থেকেই, আর ইংরেজ শাসনের এই সূত্রপাত সূচনা করে বাংলার সমাজ ও শাসনে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে মানুষের জীবন ধারায় ঘটলো আমূল পরিবর্তন, সমাজের গঠন বদলে গেল। এর প্রতিফলন ঘটলো সাহিত্যে। সাহিত্যই তো জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ। সাহিত্য সমাজের মুকুর। তুর্কী-বিধ্বস্ত মধ্যযুগের বাংলায় শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয় যেমন বাংলার মোহনিদ্রাচ্ছন্ন হিন্দুসমাজে ভাঙন ধরিয়ে দেয়, বাংলা সাহিত্যে ভাবের ক্ষেত্রে, বিষয়ের ক্ষেত্রে এক নব জাগরণের জোয়ার আনে—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে পশ্চিমের সাহিত্য-সংস্কৃতির জোয়ার এসে লাগলো বাংলার সাহিত্য-ভাবনায়। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার, বাংলা লিপির সুনির্দিষ্ট আকার, সাহিত্যে নব জাগরণ গ্রন্থাকারে সাহিত্য রচনার সম্ভাবনাকে প্রসারিত করে দিল। পয়ারের ছন্দ-সাম্রাজ্যে প্রবেশ করল প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নানা ছন্দ, যার পরিচয় পাই এই বর্ধমানেরই কবি ছন্দের জাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, রামমোহন, বিদ্যাসাগরের সক্রিয় উদ্যোগে বাংলা গদ্য ভাষার উদ্ভব, একালের সাহিত্য ভাবনার এক স্মরণীয় ঘটনা। এতদিন বাংলা সাহিত্যের বাহন ছিল পদ্য। ফলে সাহিত্যের বহু দিক যেমন প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস, ছোট গল্প, ভ্রমণ কাহিনী ছিল উপেক্ষিত।

গদ্যসাহিত্য প্রবর্তনে বাংলা সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য হলো বহুমুখী, বহুধা সম্প্রসারিত। পূর্ববর্তী সাহিত্য-ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক যুগের সাহিত্যের আঙ্গিকগত, বিষয়বস্তুগত ও ভাষাগত পার্থক্য বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। উদ্ভব হলো নতুন নতুন সাহিত্যিক, প্রবন্ধকার, নতুন আঙ্গিকের কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিকের—সাহিত্যের জগৎ বৈচিত্র্যে ভরে উঠলো। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'সৃষ্টির কার্যে এই বৈচিত্র্যের প্রয়োজন আছে। নতুন নতুন কালের প্রেরণায়

নতুন নতুন রূপ আপনাকে ব্যক্ত করতে থাকে এবং এই উপায়েই কালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে। তবে সে আপনার শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। সেই পরিবর্তমান আদর্শের অনুবৃত্তির দ্বারা পুরাতন কালের ভিত্তির ওপর নতুন কালের সৃষ্টি সম্পূর্ণতা লাভ করে।''

সমাজ ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের এই জোয়ারের প্রভাব থেকে বর্ধমান জেলাও বাদ গেল না। নতুন কালের সঙ্গে তাল রেখে ধর্ম ও সঙ্গীতের ক্ষেত্র ছাড়িয়ে সাহিত্যের অঙ্গন প্রসারিত হলো নানা দিকে—উপন্যাস, ছোট গল্প, নাটক, নাটক সম্পর্কিত প্রবন্ধ, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, জীবনী-সাহিত্য, ভ্রমণ-সাহিত্য, নতুন আঙ্গিকে অনুবাদ-সাহিত্য ও কাব্য। বাংলা সাহিত্য হয়ে উঠলো ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী। ব্যাকরণ, বাক্যবিন্যাস, প্রবাদবচনে ও ছন্দে ঘটলো পাশ্চাত্যের ছায়াপাত। সাহিত্যে এই আধুনিক সত্তা কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগকে একেবারে উপেক্ষা করতে পারে না। অবিচ্ছিন্নতা ও কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতাই এর অন্তর্নিহিত স্বভাববৈশিষ্ট্য। ধীরে ধীরে আধুনিক সাহিত্য তার স্বকীয়তা অর্জন করলো। এই পরিপ্রেক্ষিতে এ জেলার এ যুগের সাহিত্যকে বিচার করতে হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে বঙ্গীয় গভর্নমেন্ট, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও পণ্ডিতপ্রবর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় জেলার পল্লী থেকে যে পুঁথি সংগ্রহের অভিযান শুরু করে ছিলেন—আধুনিক যুগেও সে ধারা অব্যাহত আছে। বিশ্বভারতী ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে এ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুঁথি সংগ্রহ ও তার সম্পাদনা অব্যাহত আছে। ঊনবিংশ / বিংশ শতাব্দীতে মধ্যযুগের সাহিত্যের মত আমরা এ যুগের জেলার সাহিত্যকৃতিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে বিচার করতে পারি। যেমন (১) পুঁথি সংগ্রহ ও তার সম্পাদনা (২) মঙ্গলকাব্যের ধারা (৩) পদাবলী সাহিত্যের অনুলিখন (৪) অনুবাদ-সাহিত্য (৫) বর্ধমান রাজসভাশ্রিত সাহিত্য (৫) কথাসাহিত্য, (৬) ভ্রমণকাহিনী (৯) উপন্যাস (৮) নাটক (৯) প্রবন্ধ-সাহিত্য (১০) লোকসাহিত্য (১১) গবেষণা-ভিত্তিক সাহিত্য (১২) পত্রপত্রিকা প্রকাশন।

পুঁথি : এই সমস্ত সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন একটা নতুন ভাব ও আঙ্গিকের উন্মোচন ঘটেছে, তেমনি এক শ্রেণীর সাহিত্যে বিদ্রোহের সুরও পরিলক্ষিত হয়। আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো—সাহিত্যের অঙ্গন শহরকে ছেড়ে পল্লীজীবনে প্রসারিত হলো।

পুঁথিসংগ্রহ দিয়েই শুরু করা যাক। পদাবলীর চণ্ডীদাসকে নিয়ে বির্তকের শেষ নাই। বড়ু, অনন্ত বড়ু, দ্বিজ, দীন চণ্ডীদাসের মধ্যে কোনটি বর্ধমানের বা

বর্ধমানের কেউ-ই বটে কিনা সেটা বলা শক্ত। তবে এতদিন কেতুগ্রাম এক দাবীদার ছিল। উত্তর বর্ধমানে দীন চণ্ডীদাসকে নিয়ে কেতুগ্রামের দাবীই খুব জোরালো। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের সিদ্ধান্ত তাই। অধুনা এই চণ্ডীদাস বিতর্কের মধ্যে আর এক দাবীদার এসে জুটেছে। ১৩৪৯ সালের ভারতবর্ষ পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় পণ্ডিত প্রবর হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন মহাশয় চণ্ডীদাসের একটি নব আবিষ্কৃত পুঁথির প্রাথমিক পরিচয় দিয়েছেন। সেই থেকেই এই দাবীর সূত্রপাত। এ সম্পর্কে এই পুস্তকের মধ্যযুগের সাহিত্য অধ্যায়ে কিছু আলোচনার সূত্রপাত করেছি। যেহেতু পুঁথিটির অনুলিপি-কাল আধুনিককালের সে কারণে আধুনিক কালের সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এই পুঁথি সম্পর্কে আর একটু বিস্তৃত আলোচনা করা যেতে পারে। ভারতবর্ষ পত্রিকার ১৩৪৯ সালের অগ্রহায়ণ থেকে পর পর ছয়টি সংখ্যায় ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুসরণে পুঁথির কিছু পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। পুঁথিটি আবিষ্কৃত হয় চতুর্দশ বঙ্গাব্দের চারের দশকে ভাতার থানার বনপাশ কামারপাড়ার ত্রিভঙ্গ রায়-এর বাড়ী থেকে। আবিষ্কার করেন বীরভূম জেলার রাতমা গ্রামের সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ত্রিভঙ্গবাবু আমাদের গাঁয়েরই বাসিন্দা, আমাদের বাড়ী থেকে এক ফার্লং দূরেই তাঁর বাড়ী। আবিষ্কারের সময় আমি সবে স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকেছি। গ্রামে যখন এ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল তখন আমিও আগ্রহী হয়ে ত্রিভঙ্গবাবুর কাছে এ বিষয়ে জানতে চাই। ত্রিভঙ্গবাবু স্বীকার করেন তাঁদের পরিবারের কে কখন এই অনুলিখন করেছেন বা অন্য কোথা থেকে কেউ এনেছেন কিনা তার কিছুই তিনি জানেন না—জন্মাবধিই তিনি পুঁথিটিকে তাঁদের ঘরে পূজা পেতে দেখছেন। পুঁথিটি আজ থেকে প্রায় ১৫০ বছর আগে কোন প্রাচীন পুঁথি থেকে সংকলিত। পুঁথিটিতে ১২০২টি পদ আছে। "পদাবলীর মধ্যের আখ্যায়িকা অক্রুরাগমন হইতে কৃষ্ণের মথুরা বাসের জন্য রাধার শোকাভিব্যক্তি পর্যন্ত প্রায় অবিচ্ছিন্ন ধারায় অগ্রসর হইয়াছে। পুঁথিটির ৭৩৩ পদ থেকে ৭৪৪ পদ পর্যন্ত রাধার বিরহাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি পদে কবির কবিত্ব প্রশংসনীয় ও চণ্ডীদাসের বিখ্যাত পদাবলীর সহিত উপমিত হইবার অযোগ্য নহে।" ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুঁথিতে যে চণ্ডীদাসের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে ও পদাবলীর বিখ্যাত কবি চণ্ডীদাস যাঁহার গানের সুর আজ বহু শতাব্দী ধরিয়া কর্ণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়া আমাদের প্রাণকে আকুল করিয়া আসিতেছে—এই দুই এর মধ্যে কি সম্পর্ক? ইঁহারা এক না বিভিন্ন? পুঁথির পদগুলির বহু উদ্ধার ও বিস্তৃত আলোচনা ছাড়া যথাযোগ্য

বিচার হওয়া অসম্ভব। এ সম্বন্ধে আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে এই পুঁথিতে প্রাপ্ত কয়েক কবিত্বগুণ সম্পন্ন পদের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রসঙ্গ শেষ করি—

ঘর হল্য কাল কানন সমান
গুরুজনা হল্য বিষে
ভাবনা গণনা কালা জপমালা
নিবারণ পাব কিসে?
ঘুমাইলে দেখি কালার বরণ
শুইলে সোয়াস্তি নাঞি।
গমনে কালিয়া দেখি এ ভালিয়া
সতত সকল ঠাঞি ॥
হৃদয়ে কালিয়া দেখিএ সঘনে
মুদিলে নয়ন দুটি।
দেখিতে দেখিতে নয়নের জল
সঘনে সঘনে ছুটি ॥
দেখিতে সেরূপ রাখিব কোথাহ
থুইতে নাহিক ঠাঁঞি।
নয়নে না ধরে উথলিয়া পড়ে
হেন কভু দেখি নাঞি।
রূপ মনোহর কি মোহিনী সই
দেখিলে নয়ন ঢলি।
কিসে নিবারিব এ হেন পিরিতি
তুমি ভুলাইলে ভালি ॥

এই পদের সঙ্গে পদাবলীর বিখ্যাত চণ্ডীদাসের পূর্বরাগ পদের ভাবগত কিছু সাদৃশ্য লক্ষণীয়—

এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখায় খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘ পানে
কি কহে দু হাত তুলি।
এক দিঠ করি ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নবপরিচয়
কালিয়া বঁধূর সনে ॥

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিসংগ্রহ বিভাগ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সংকলিত ও অনুলিখিত পদাবলীর কিছু পুঁথি উদ্ধার করেছেন—এই রকম এক পুঁথি দুর্জ্জয়মান পদাবলী—

পদকর্তা গোবিন্দদাস

পুঁথি সম্পূর্ণ, পত্র সংখ্যা ১–১১, প্রতি পৃষ্ঠা ১০ পঙক্তিতে লেখা।

লিপিকাল ১২৫৫ সাল ১ আষাঢ়।

লিপিকর ধনঞ্জয় মোদক।

সাং থাক দুয়ারিব, পঃ পডয়া

মোকাম বান্দারা বাদী

তুলট কাগজের মাপ ৩৩·৫ × ১২·৫ সে.মি.।

পুঁথির আরম্ভ—শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ ॥ অথ দুজ্জয়মান পদাবলী লিক্ষতে ॥

অলসে অরুণ এাখি অথ পুয়া কিলা দেখি
রজনি বঞ্চিলে কার সনে
বদন সরদ রুহু মলিন হএেছে মুখ
রজনি করিএে জাগরণে।

শেষ ভণিতা—

হাসি ২ মুখ মোড়ি পিঠ দেহ বৈঠল বুঝল
ভেকধারি নটরাজ।
গোবিন্দ দাস কহে চতুর সিরোমনী সাধল
সন্ন্যাস কাজ ॥
ব্রজে কী আনন্দ হৈল স্যাম মনে
প্যারির মিলন হল্য।

শ্রীদুর্জ্জঅমান পদাবলী সমাপ্ত।

ইতি

গোবিন্দদাস ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা। অসাধারণ পাণ্ডিত্যকে অসাধারণ কবি-প্রতিভায় জারিত করে নিয়ে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস শত শত বাঙালীর রসিক চিত্তকে জয় করেছেন। ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলা কাটোয়ার অন্তর্ভুক্ত শ্রীখণ্ডে গোবিন্দদাসেব জন্ম, ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু। গোবিন্দদাসের ৭০০-এর বেশী পদ পাওয়া গেছে, ব্রজবুলি পদেই গোবিন্দদাসের উৎকর্ষ। ষোড়শ শতকের এই গোবিন্দদাসের পদের নমুনা—

আধক আধ আধক দিঠি অঞ্চলে
যব ধরি পেখঁলু কান।
কত শত কোটি কুসুম সারে-জর জর
রহত কি ঘাত পরান ॥

ষোড়শ শতকের গোবিন্দদাসের পদাবলীর সঙ্গে ধনঞ্জয় মোদকের অনুলিখিত পদের পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে।

এ যুগে অনুলিখিত আর একটি পদাবলী 'একান্ন পদাবলীর' উল্লেখ করছি।

একান্ন পদাবলী

কবি : গোবিন্দদাস
লিপিকর : শ্রীবিনয় পদ
পুঁথির প্রথমাংশ :
শ্রীশ্রী কৃষ্ণ : পদাবলী
নিশি যবষেশে জাগী সব সখিগণ
বীন্দাদেবী মুখচাই।
রতি রসে য়বস সুতি রহু দুহু জন
তুয়ি তহি দেহ জাগাই।

পুঁথির শেষাংশ—
সুবাসিত নিরবারি ভার সহচরি
রাখত দুহু তনপাম।
মন্দির নিকটে পদতলে সুতল
সহসরি গোবিন্দদাস
ইতি একান্ন পদাবলী সমাপ্ত।

ষোড়শ শতকের গোবিন্দদাসের ব্রজবুলি মুখরিত পদের ধ্বনি ঝংকার কাব্যের চিত্রাবয়ব, ছন্দের কারুকার্যের সঙ্গে আধুনিক যুগে অনুলিখিত গোবিন্দদাস নামধেয় পদাবলীর ভাব, ভাষা ও ভণিতার দীনতা বিচার করলে মনে হয় না এযুগে অনুলিখিত পদাবলীর পদকর্তা প্রকৃত গোবিন্দদাস ছিলেন কিনা।

মঙ্গলকাব্য : এ যুগের মঙ্গলকাব্যের মধ্যে ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, প্রাণবল্লভের জাহ্নবীমঙ্গল ও পরাণচাঁদের হরিহরমঙ্গল উল্লেখযোগ্য।

জাহ্নবীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। প্রাণবল্লভ ঘোষের জাহ্নবীমঙ্গল—বৃহত্তম গঙ্গা মাহাত্ম্য নিবন্ধ মহারাজ কীর্তিচাঁদের মাতার

নির্দেশে রচিত। রচনাকাল ১৬৪৬ শকাব্দ (১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দ) লিপিকর ঘাটাল অঞ্চলের।

অম্বিকা (অম্বিকা-কালনা) নিবাসী প্রাণবল্লভ ছিলেন মহারাজ কীর্তিচাঁদেব কর্মচারী ও তাঁহার মাতার পোষ্য। গ্রন্থটি ১৯টি পালায় বিভক্ত। মূল পুঁথির প্রথম ৩৫ পাতা বিনষ্ট। পুঁথির পত্রসংখ্যা ১৭৪। পুঁথিটি তুলট কাগজের উভয় পৃষ্ঠে লেখা। পৃষ্ঠার আকার ১৪ x ৪½ ইঞ্চি।

প্রাণবল্লভ লিখেছেন—

গঙ্গাগান পদ্ম মধু পান অভিলাষ।
অম্বিকা নিবাসী তাহা সতত প্রয়াস ॥

কাব্যটি ১১ দিনে গাওয়ার জন্য রচিত। কাব্যমধ্যে গঙ্গা ও হরির অভেদত্ব ঘোষিত হয়েছে।

যেই বিষ্ণু সেই গঙ্গা বেদ পরমাণ।
ভেদ কৈলে মহাপাপ শুন জ্ঞানবান।

কিংবা

গঙ্গোদক হয় হরি পাদোদক।
জঠরে দ্বাদশ অঙ্গ থাকয়ে পৃথক ॥

যে গঙ্গার জল মাথায় ছিটিয়ে নিলে দেহ পাপমুক্ত হয়, যে গঙ্গাজলে মৃতের অস্থি বিসর্জন দিলে মৃতের আত্মার স্বর্গপ্রাপ্তি হয় বলে ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের বিশ্বাস সেই গঙ্গার মহিমা কাব্যমধ্যে বিধৃত।

জাহ্নবীমঙ্গল পোথা অমৃত লহরী।
পিবত ভকত লোক কর্ণপুট ভরি ॥

হরিহরমঙ্গল : মহারাজ তেজচন্দ্রের দেওয়ান এবং শ্যালক ও শ্বশুর পরাণচাঁদ কাপুর মহারাজের আদেশে হরিহরমঙ্গল কাব্যরচনা করেন।

আজ্ঞা দিলা রাজা বর্ধমান অধিকারী।
রানী যার রাজলক্ষ্মী কমলকুমারী।

বইটির রচনাকাল ১২৩৭ সাল—রচনাকালটি হেঁয়ালিতে দেওয়া আছে—

ব্রহ্ম বাহু গুণ পাখা কর অবলম্ব
এই সনে প্রথম বৈশাখে গ্রন্থারম্ভ।
বেদ গুরু চন্দ্র বাণ পণ গন্ডা ছয়।
কর কড়া ভুজ ক্রান্তি পাতন নিশ্চয়
বাম ভাগে পুরিলে যতেক অঙ্ক হয়
এই সনে মাঘে গ্রন্থ সাঙ্গ সমুচ্চয়।

ব্রহ্ম ১, বাহু ২, গুণ ৩, পাখা ২ (১২৩২ সন/১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ) গ্রন্থকালের সমাপ্তি ১২৩৭ (১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ)।

বইটিতে সেকালের চিত্রশিল্পী রামধন স্বর্ণকারের অঙ্কিত ৭১ খানি মূল্যবান ধাতুখোদাই চিত্র আছে। বইটি পুঁথির আকারে ছাপা। ছাপাকাল গ্রন্থসমাপ্তির পরেই ১৮৩০ সাল।

বইটির মধ্যে অনেকগুলি আখ্যায়িকা আছে, তাহাদের মধ্যে প্রধান রাজপুত্র জয়সেন রাজকন্যা জয়ন্তীব মিলন কাহিনী। এই কাহিনীর জন্য কাব্যটির নূতনত্ব দাবী করা হয়।

শিরে বন্ধি (ন্দি) হরিহর চরণ কমল
প্রাণ চাঁদ বিরচিত (ল) নূতন মঙ্গল।

কাব্যটির নূতনত্ব অন্যত্রও আছে। কাব্যটিতে—বর্ধমান মহাস্থান-এর নামকরণ কবির স্বকল্পিত নতুন তথ্যের সংযোজন।

রাজধানী বর্দ্ধমান যেই হেতু মান্যমান
শুন তার প্রধান কথন
শ্রীল তেজশ্চন্দ্র রাজ্ঞ যাথে মহা মানি বিজ্ঞ
যথা বদ্ধ হৈল মান্যগণ ॥
তেঁই নাম বর্দ্ধমান শুন পুণ হেতু আন
মানিগণে মানদ রাজন।
অন্য অন্য দেশী যারা বর্দ্ধমানে আসি তারা
রাজমান পাল্যে মান্য হন।

বর্ধমানে যে তখন ইংরাজী, পারসী, আরবী ভাযা শিক্ষাও হতো তারও উল্লেখ আছে।

যাবনিক ভাষা যাকে পারসী বলয়ে লোকে
পড়ায় মৌলবী কাজীগণ।
কেতাব কোরাণ আর আরবী তাহাতে সার
স্থানে স্থানে শিখে কতজন।

*** *** ***

ইঙ্গরাজী মেলছভাষা পড়ে তাতে যার আশা
বিজ্ঞ বিজ্ঞ ইংরাজের স্থানে।

কাব্যটিতে ভারতচন্দ্রের প্রভাব স্পষ্ট। মঙ্গলকাব্যের ধাঁচে কাব্যে-র সূচনা দেবদেবীর বন্দনা গীত দিয়ে। তবে জয়সেন-জয়ন্তীর আখ্যান স্থানে স্থানে অশ্লীলতা দোযে দুষ্ট।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংগৃহীত মঙ্গলকাব্য :—

জগন্নাথমঙ্গল : রচয়িতা গদাধর দাস
পত্র সংখ্যা ১—৮৬
লিপিকাল ১২৩৯ সাল ২রা ফাল্গুন (১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ)
লিপিকর শ্রী কালিপ্রসাদ মজুমদার
সাকিম লাকারি পরগণে খণ্ডঘোষ
পুঁথির মাপ ৪১ x ১৩.৫ সেমি

পুঁথির আরম্ভ : অথ জগন্নাথ মঙ্গল লিখ্যাতে।

সর্ব্বেস্বর সর্ব্বপ্রাণ প্রণমহ ভগবান
শ্রী নন্দযোগেশ্বরেশ্বর।
অতি আদি পুরাতন নিন্দি ইন্দু নবঘন
সদা নব জুবা মনোহর।

প্রথম ভণিতা :

অবতার সিরমণি ধ্যায় তব পদ্মযোনী
উদ্ধারিলা জঙ্গম স্থাবর।
অশেষ দুঃখের হর্ত্তা অক্ষয় নিদয় দাতা
না বুঝ অবোধ গদাধর।

পুঁথির শেষাংশ :

গদাধর কহে হরিপদ করি ধ্যান।
বলহরি বদন ভরি পূণ হৈল গান॥
জয় ২ জগন্নাথ সদা হয় মনে।
নিলগিরি মধ্যে গিয়া দেখি নারায়ণে।

পুঁথির শেষে লেখা আছে 'জগত মঙ্গল' পুস্তক সমাপ্ত।

ডঃ সুকুমার সেন এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেছেন—কাশীরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস। "গদাধর দাস 'জগৎ মঙ্গল' (নামান্তর জগন্নাথমঙ্গল) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। বিষয় জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য কাহিনী। উপাদান স্কন্দপুরাণ (উৎকল খণ্ড) ও ব্রহ্মপুরাণ হইতে গৃহীত।

১৫৬৪ শকাব্দে (১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দ) লিখিত এই পুস্তক থেকে ডাঃ সেন যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তার কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হলো।

চতুঃষষ্টি শকাব্দ সহস্র পঞ্চাশত সহস্র পঞ্চাশ সন
দেখা লিখা মত।

নরসিংহ দেব নামে উৎকলের পতি পরমবৈষ্ণব
জগন্নাথ ভজে নিতি।...
রাজচক্রবর্তী শাহজাদা দিল্লীপতি, ধর্মন্যায়ে তোষণ
করিল বসুমতী।

১২৩৯ সালে কালিপ্রসাদ মজুমদারের অনুলিখিত পুঁথির সঙ্গে গদাধর দাসের লিখিত পুঁথির পার্থক্য লক্ষণীয়। একেই বলে 'সাত নকলে আসল খাস্তা।'

অনুবাদ-সাহিত্য :

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে বর্ধমানেশ্বর মহতাবচাঁদ, আফতাবচাঁদ ও বিজয়চাঁদের অবদান বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহতাবচাঁদ (১৮২০–৭৯) বাহাদুর যাঁকে বিদ্যাসাগর মহাশয় the first man of Bengal আখ্যা দিয়েছিলেন—তাবই উদ্যোগে ১৮৫৪ সালের জুন মাসে বর্ধমান বাজসভা থেকে বাল্মীকি-রামায়ণের আদিকাণ্ডের পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করেছিলেন মহারাজার দুই সভাপণ্ডিত বিপ্রদাস তর্কবাগীশ ও উমাকান্ত ভট্টচার্য। বইটি মুদ্রিত হয় গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের ভাস্কর যন্ত্রে। ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদ প্রভাকরে বইটির সুদীর্ঘ Review করেছিলেন .

২ আষাঢ় ১২৬১ (১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ)—তার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত হলো।

"এক সময়ে বর্ধমান মহারাজেশ্বর চতুর্দশ নরেন্দ্র শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহাতাব চন্দ বাহাদুর বীরগণ বিরাজিত রাজসমাজে অধ্যাসীন হইয়া অধ্যাপক বর্গকে কহিলেন আমি কৃত্তিবাস মতে ভাষা বামায়ণ বিলোকন করিয়াছি তাহাতে বাল্মীকিকৃত মূল রামায়ণার্থ প্রকাশ হয় নাই এবং তাহা ইতর ভাষায় পরিপূর্ণ বিশেষত পয়ার আদি ছন্দেব মেলন উত্তম হয় নাই। অতএব গৌড় ভাষা পয়ার আদি ছন্দে ঐ মূলার্থ প্রবন্ধ করিতে অভিলাষ করি, ইহাতে প্রাজ্ঞবরেরা নরেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্বক প্রতিজ্ঞা করিলেন রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিবেন, তৎপরে শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের দুই সভাপণ্ডিত উপবিষ্ট হইয়া পূর্বোক্ত নিয়মে কবিতা নির্ম্মাণারম্ভ করিলেন এবং পণ্ডিতগণ মধ্যস্থ একজনকে লিপিকার্য্যে রাখিলেন।"

মহারাজ মহতাবচাঁদের সভাপণ্ডিত দ্বারা অনূদিত রামায়ণ থেকে উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি। এর থেকে অনুবাদের ভাষাছন্দের লালিত্য, গীত রসের মাধুর্য অনুধাবন করা যাবে।

স্থির মন জ্ঞানবান শুচি বীর্য্যধারী।
সর্বলোক সুপালক ধর্ম্ম রক্ষাকারী ॥
বিশারদ শাস্ত্রে বেদ বেদাঙ্গে নিপুণ
সর্ব্বলোক প্রিয় সাধু সুশীল সদগুণ ॥ (আদি কাণ্ড)

ত্রিপদী ছন্দের উদাহরণ :

বিন্ধ্যাচল বাসী যত হস্তি যূথ অনুগত
হিমালয় উদ্ভব মাতঙ্গ।
সত্ত্বাবীর্য্য গুণযুক্ত বলবান দোষমুক্ত
শূর গণে সর্ব্বদা সুসঙ্গ ॥ (ষষ্ঠ সর্গ)

সপ্তকাণ্ড রামায়ণের অনুবাদ আরম্ভ হয় ১৭৮৮ শকাব্দে এবং শেষ হয় ১৮০৪ শকাব্দে।

বর্ধমান রাজসভা থেকে বাল্মীকি-রামায়ণের সম্পূর্ণ গদ্য অনুবাদও প্রকাশিত হয়। গদ্যানুবাদ শুরু হয় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ও শেষ হয় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে।

অনুবাদের নমুনা : নারদের দেবলোকে গমনের মুহূর্তকাল পরে বাল্মীকি গঙ্গার সন্নিহিত তমসা নদীর তীরে গমন করিলেন। অনন্তর তিনি নদীতীরে উপস্থিত হইয়া কর্দ্দমশূন্য তীর্থ প্রদর্শন করিয়া পার্শ্বস্থিত শিষ্যকে কহিলেন—"হে ভরদ্বাজ! দেখ, এই স্বচ্ছ জলশালী রমণীয় তীর্থ সাধুব্যক্তির মনের ন্যায় অতি নির্মল।..." (আদিকান্ড ১৮৬৬)

মহাভারত : মহাতাবচাঁদের আমলে ১২৬৫ সালে বৈশাখ মাসে (১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে) রাজসভার মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়।

১২ই জানুয়ারী ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সমাচারচন্দ্রিকা থেকে জানা যায় যে 'মূল মহাভারতের বাঙ্গলা অনুবাদ প্রকাশ করিবার জন্য সর্বাগ্রে এই মহারাজাই বদ্ধপরিকর হয়েন। ...তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়াই মৃত মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় মহাভারত অনুবাদে কৃতকার্য হইয়াছেন।' বর্ধমান মহারাজের রাজসভা থেকে যে মহাভারত প্রকাশিত হয় তাহার সূচনা হয় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং শেষ হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। অনুবাদক গোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তারকনাথ তত্ত্বরত্ন, গোপালধন চূড়ামণি, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, আশুতোষ শিরোরত্ন, রামকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, সারদাপ্রসাদ জ্ঞাননিধি। মহাতাবের সময় আদিপর্ব থেকে শান্তিপর্ব পর্যন্ত অনূদিত হয় আর আফতাবচাদের সময় অনুশাসন থেকে খিল হরিবংশ পর্যন্ত সমাপ্ত হয়।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'বাংলা পুথি' থেকেও অনুবাদ সাহিত্যের নমুনা পাওয়া যায়, তার কিছু অংশ।

কুন্তীর বাণ ভিক্ষা :

রচয়িতা কবিচন্দ্র

পত্র সংখ্যা ১—১২

লিপিকাল ১২৪১ সাল ২৬ শে পৌষ

পাঠক শ্রীবিজয়রাম মাল সাং মাগুরা

পুঁথির আরম্ভ :

শ্রীশ্রী সিতারামজী।। কুন্তির বাণ ভিক্ষা ।।

রণে ভঙ্গ দিয়া কুরু গেলা নিজ স্থানে।
ক্রোধ করি দুর্য্যোধন ডাকী সৈন্য গনে ।।
ভিস্ম কর্ণ্য কৃপাচার্য্য বিদুর মহাশয়।
সৈন্যগণ রাজার সম্মুখে রহায় ।।

প্রথম ভণিতা :

দ্বিজ কবিচন্দ্র গান ব্যাসের বর্ণন
সুনিলে এসব কথা পাপ বিমোচন ।।

পুঁথির শেষাংশ :

কর্ণ্য বলে পদ্মবতি আর কিবা বল।
এত দিনে ধর্ম্মযুদ্ধে মোর প্রাণ গেল।
এত বলি কর্ণ্যবির বাণ হাথে লৈয়া।
কুন্তির হস্তেতে বাণ দিল সমর্পিয়া।
বান পেয়্যা কুন্তি দেবি করিলে গমন।
এত দূরে পালা সাঙ্গ কবিশ্চন্দ্র গান ।।

ইতি বাণ ভিক্ষা সমাপ্ত ।।

কবিচন্দ্র (১৬শ শতাব্দী) দামুন্যা-বর্ধমান; কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের অগ্রজ। তিনি কলঙ্ক ভঞ্জন, দাতাকর্ণ প্রভৃতি সরস কাব্যরচনা করেন।

স্বর্গারোহণ পর্ব :

কবি কাশীরাম দাস।

পুঁথি খণ্ডিত।

পত্র সংখ্যা ১—২৭

পুঁথিতে দুই রকমের হাতে লেখা দেখা যায়।
লিপিকাল ১২৬৬, ২২ ভাদ্র।

পুঁথির আরম্ভ :

শ্রীশ্রী কৃষ্ণ ।। শ্রীগণেশায় নমঃ
অথ সর্গ আরোহণ লিক্ষ্যতে।

জয় ২ শ্রীকৃষ্ট চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জঅ জয়াদৈত গোরভক্ত বিন্দ।

প্রথম ভণিতা :

মুক্তি হআ শুনে পূর্ব সর্গ আরোহণ।
কাশীরাম দাস কহে পাপ বিমোচন।

পুঁথির শেষে : কাশী দাস ধন্য ২ বলে সর্ব্বজনে।
অবহেলা না করিহ ভারত শ্রবণে ।।

ইতি মহাভারত সর্গ আরোহণ সংম্পুণ্য।

এর সঙ্গে কাশীরাম দাসের মহাভারত বলে বাজারে যা বহুল প্রচারিত সেই সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত মহাভারতে স্বর্গারোহণ পর্বের আরম্ভ এবং সমাপ্তির কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি :

পাণ্ডবগণের মেঘনাদ পর্ব্বতারোহণ

জন্মেজয় বলে মোরে কহ তপোধন।
কোন্ পথে স্বর্গে গেল পিতামহগণ ।।
কোন কোন পর্ব্বতে পড়িল কোন বীর।
কিরূপে সকায় স্বর্গে গেল যুধিষ্ঠির।

প্রথম ভণিতা :

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।

শেষাংশ :

শুচি হয়ে শুদ্ধ চিত্তে শুনে যেই জন।
অন্তকালে স্বর্গপুরে দেখে নারায়ণ।
শ্লোক ছন্দে বিরচিল মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে আমি করিনু প্রকাশ।

সাত নকলে আসল খাস্তা হয় জানি—কিন্তু আঙ্গিকে এমন কি বিষয়বস্তুরও পরিবর্তন হয়, সেটা ১২৬৬ সালের অনুলিখিত পুঁথি থেকেই বোঝা গেল।

প্রচলিত কাশীরাম ও পুঁথির কাশীরাম কোনটি আসল ও কোনটি নকল সে রহস্যের উদ্ঘাটন করতে হলে ব্যাপক গবেষণা দরকার।

উর্দু-ফারসী-অনুবাদ : মহাতাবচাঁদের আমলে সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারতের বঙ্গানুবাদ ছাড়াও উর্দু ও ফারসী থেকে যে সমস্ত বাংলায় অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

"*হাতেম-তায়ি কাহিনী*" : প্রথমে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে উর্দু থেকে ও ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ফার্সী থেকে অনূদিত হয়। অনুবাদ করেছিলেন—মুন্সী মহম্মদী ও গোলাম রব্বানি। বইটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬৮, এতে আছে ৭টি সমস্যা পূরণের গল্প। রাজবাড়ীর নিজস্ব প্রেসে ছাপা হয়। অনুবাদ সাবলীল ও প্রাঞ্জল, সামান্য তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশী শব্দের মিশ্রণের ফলে গুরুচণ্ডালী দোষ ছাড়া বিশেষ দোষ চোখে পড়ে না। গুরুচণ্ডালী দোষের নমুনা।

তাহার মন ছট্‌ফট্‌ করায় সে আপন বয়স্যদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিল। অথবা,

আমার দিগের রাজার দেশে একটি মানুষ আসিতেছে, তাহাকে দেখা কর্তব্য, তাহার কিরূপ রূপ এবং সকলে বলে যে মনুষ্যজাতির উত্তম রূপ ও সুন্দর মুখ, তাহার সহচরীরা বলিল অবশ্য তাহাকে দেখা আবশ্যক। (ছেদ চিহ্ন ঠিক মত ব্যবহৃত হয় নাই।)

কয়েক স্থানে পদ্যছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে—

হাতেম তার প্রেয়সীকে বলছেন—

আমার বাসনা হয়, দেখিতে তোমায়
কেবল বাসনা নহে, নয়ন তা চায়॥
বাহিরে দেখিতে চায় আমার নয়ন,
গোপনে দেখিতে মন, চায় প্রতিক্ষণ॥

হাতেম তাই এর আরব্য উপন্যাসের মতো গল্পের মধ্যে গল্প, সমস্যা ও সমস্যার সমাধান, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বর্ণিত আছে। বানভট্টের কাদম্বরীতে এরূপ আকর্ষণ আছে। এই আকর্ষণের ফলে বইটি হাতে নিয়ে গল্পের শেষ না দেখে ছাড়া যায় না।

"*মসনবি*" : উর্দুকবি মীর হসনের "মসনবি" পুস্তকের রাজসভা থেকে অনুবাদ হয়। পদ্যে অনূদিত বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে।

বইটিব পৃষ্ঠাসংখ্যা ভূমিকা সূচিপত্রসহ ২৪৮—মঙ্গলকাব্যের মত প্রথমে

মঙ্গলাচরণ, পয়গম্বরের স্তুতি ও গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী পদ্যে ও গদ্যে লেখা। কবিতাংশের নমুনা—

আলির স্তব

যে প্রকার লেখনীর দুই জিহ্বা রয়।
নবি আলি দুই জনে তেমনি নিশ্চয় ॥
আলি বলে শত্রু যে যাইবে বৌরবে।
আলির বান্ধব সুখে স্বর্গবাসী হবে॥

অনুবাদ করেন বর্ধমান রাজসভায় দুই মুসলমান কবি মুন্সী মহম্মদী ও গোলাম রব্বানি এবং পণ্ডিত দুর্গানন্দ কবিরত্ন।

এছাড়া রাজসভা থেকে ফার্সী কবি গজনবি নিজামীকৃত "ইসকান্দারনামা" অনূদিত হয়। অনুবাদ করেন মুন্সী মহম্মদী ও গোলাম রব্বানি। গ্রন্থটি ৪৬১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। বইটি ফার্সী ভাষায় গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের কীর্তিকাহিনী নিয়ে লিখিত।

মহারাজ মহতাবচাঁদের আমলে কবি আমীর খসবুর উর্দু ভাষায় লেখা 'কিস্সা-ই-চাহার দরবেশ' অনূদিত হয়। বইটি প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, বইটি ফরবীস সাহেবের ইংরাজী হবফে মুদ্রিত "চাহার দরবেশের বঙ্গানুবাদ"। অনুবাদ করেন মুন্সী মহম্মদী ও ব্রজেন্দ্র কুমার বিদ্যারত্ন। বইটির আখ্যানের ঘটনাস্থল পশ্চিম এশিয়া। চার দরবেশের কাহিনী নিয়ে বইটি লেখা।

বর্ধমান রাজসভার আওতার বাইরে বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ হয়। অনুবাদ করেন বড়বেলুনের ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। অমিত্রাক্ষর ছন্দে। বইটির নাম দেন "দন্তালিকা"। ইঁহার অন্য বই "আনন্তরী"। মাইকেল মধুসূদন দত্ত রামায়ণের একটি অংশমাত্রকে নিয়ে নয়টি সর্গে অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'মেঘনাদ বধ' কাব্য রচনা করে বাংলা কাব্যে যে নতুন সাহিত্য রীতি সৃষ্টি করে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার প্রবর্তন করেছিলেন, ক্ষেত্রনাথবাবু তাঁরই পথ অনুসরণ করে পাঁচটি খণ্ডে সমগ্র রামায়ণ অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচনা করে মধুসূদনের ধারাকে গতিশীল রাখেন। 'দন্তালিকা' বা পথের সন্ধানে শ্রীমহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণ অবলম্বনে ও অনুসরণে লিখিত, মূল্য অবস্থানুসারে।

পুস্তকটির বৈশিষ্ট্য হলো কিছু অংশ অমিত্রাক্ষর ছন্দে বর্ণনার পর মধ্যে বক্সের মধ্যে বাল্মীকি রামায়ণ থেকে সংশ্লিষ্ট অংশের ২/৪টি শ্লোকের সংযোজন : গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ও মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য থেকে উভয় কাব্যের ভাষার নমুনা প্রদত্ত হলো। এই নমুনা থেকে কাব্যটির মূল্যায়ন করা যাবে।

দন্তালিকা [চতুর্থ খণ্ড (ক)]

রাবণের মন্ত্রণাসভা

দূত মুখে শুনি বার্ত্তা রোষারক্ত আঁখি,
ঘোর ঘন-ঘটাছন্ন নৈশাকাশ সম
বদনে রাক্ষসনাথ বসিলা সভায়—
সামরিক মন্ত্রণায়। ডাকি মন্ত্রীগণে
যতেক. সেনানায়কে, মন্ত্রণা কুশল
বিভীষণ আদি যত আত্মীয় বান্ধবে,
কহিলা কর্ব্বুরনাথ--''করহ শ্রবণ
এক্ষণে পার্ষদ বর্গ, সৈন্য সেনাপতি,
এ কর্ব্বুর কুলগর্ব্ব, সর্ব্ববীর ভাগ
আত্মীয় স্বজন বন্ধু,
তস্মাৎ সুমন্ত্রিতং সাধু ভবন্তো মন্ত্রিসত্তমা;
কার্য্যং সম্প্রতি পদ্যন্তাং যত্তৎ কৃত্যং মতংমম। ১৫

* * * * * * * * *

মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম সর্গ থেকে ভাষার নমুনা :

এ হেন সভায় বসে রক্ষঃ কুলপতি,
বাক্যহীন পুত্রশোকে। ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে,
যথা তরু, তীক্ষ্ণ সরে সরস শরীরে
বাজিলে, কাঁদে নীরবে। করযোড় করি,
দাঁড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত, ধূসরিত
ধূলায়, শোণিতে আর্দ্র সর্ব্ব কলেবর।

* * * * * * * * *

বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়ি, কহিলা রাবণ,—
নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা
রে দূত ॥ অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরু বরে?

ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও মাইকেল মধুসূদনের উদ্ধৃতির ভাষা তুলনা করলে দন্তালিকা ভাষার মাধুর্য মাইকেলের ভাষার মাধুর্য থেকে কোন অংশে কম মনে হয় না। পার্থক্য শুধু উপস্থাপনা, দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শগত। মাইকেল যেখানে মিলটনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে রামচন্দ্রকে ভিখারী রাঘবে ও ইন্দ্রজিৎকে দেবোপম চরিত্রে চিত্রিত করেছেন ক্ষেত্রনাথবাবু সেখানে বাল্মীকিকে অনুসরণ করে চিরাচরিত ভাবে রাম ও ইন্দ্রজিতের রূপকল্পনা করেছেন।

প্রতাপচন্দ্র রায় সি.আই.ই (১৫.৩.১৮৪১—১৩.১.১৮৯৫) : জন্ম বর্ধমান থেকে মাইল ১২/১৩ পশ্চিমে সাঁকো গ্রামে। তিনি প্রথমে মহাভারতের অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ীতে চাকরী নেন। পরে নিজে দীর্ঘ সাত বছর পরিশ্রম করে মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেন। অনূদিত গ্রন্থের ২ হাজার খণ্ড বিক্রয়ের পর এক হাজার খণ্ড বিনামূল্যে বিতরণ করেন। রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত্ গীতা গ্রন্থেরও তিনি বাংলায় অনুবাদ করেন। মহাভারতের মূলানুযায়ী মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ তাঁর শ্রেষ্ঠকীর্তি। এর জন্য ভারত সরকার ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে সি.আই.ই উপাধি দান করেন।

উপন্যাস :

ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত জেলার সাহিত্যের অঙ্গনে উপন্যাসের আবির্ভাব হয় নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে দেশের সাহিত্য-প্রেমীরা উপন্যাস রচনার কার্যে হাত দেন। রামমোহনই সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ আমাদের সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বাংলা সাহিত্যের ধারাকে নতুন খাতে বইয়ে দেন।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা উপন্যাস রচনায় নতুন প্রেরণা যোগায়। কাগজের সম্পাদক পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য মানবজীবনের বৈচিত্র্যময় দিকগুলি সংবাদ হিসেবে প্রকাশ করতে থাকেন। বাস্তব জীবনের খণ্ড খণ্ড ছবিগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটা ধারাবাহিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে শেষে সমস্ত ঘটনা কাল্পনিক চিত্রে রূপায়িত হয়। এটিকে উপন্যাস রচনার অঙ্কুর বলা যেতে পারে। Ralph Fox এর ভাষায় The novel is not merely a fictional prose, it is the prose of man's life the first art to take the whole man and give him expression. এর পর বঙ্কিমের কলমে প্রথম যথার্থ উপন্যাস। কিন্তু এসময় উপন্যাস ছিল রোমান্স—ইতিহাস—ধনী দাম্পত্য জীবনের কাহিনী আশ্রয়ী। শরৎচন্দ্র প্রথম জমিদারের প্রাসাদের অন্দরমহল থেকে

উপন্যাসকে পল্লীর সাধারণ গৃহস্থের অঙ্গনে নিয়ে আসেন। তাঁর উপন্যাসের সমাজ-সাধারণ মধ্যবিত্তের সমাজ কিন্তু আমাদের দেশে আপামর জনসাধারণ, সমাজের অবহেলিত শোষিত নিপীড়িত অন্ত্যজ মানুষ উপন্যাসে প্রবেশাধিকার পায় নাই। শরৎ সাহিত্যে অবশ্য মহেশ গল্পের গফুর এক বিরল ব্যতিক্রম। কিন্তু বঙ্কিম-শরৎ বা রবীন্দ্রনাথ কেউ-ই এ জেলার মানুষ ছিলেন না। কাজেই এ জেলার সাহিত্যপ্রেমীদের উপন্যাস রচনার চেষ্টায় বঙ্কিম-শরৎ-রবীন্দ্রনাথ প্রভাব বিস্তার করলেও জেলার সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় তাঁদের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। উপন্যাসের অঙ্গনে আবির্ভাব হলো শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের (১৯০১–৭৬)। প্রথম আবির্ভাবেই বাজিমাত। শৈলজানন্দের হাতে উপন্যাস একেবারে জমিদারের কাছারী বাড়ী থেকে সাধারণ মধ্যবিত্তের মাটির বাড়ীকে পাশে রেখে কয়লাখনি অঞ্চলে সাঁওতালদের কুলী ধাওড়ায় এসে পড়ল। উপন্যাসে অনুপ্রবেশ ঘটলো বাস্তবতার বা Realism-এর। এই নতুন ধরনের পটভূমি খুঁজতে তাঁর পারিবারিক পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে।

পৈতৃক বাসভূমি বীরভূমের রূপসীপুর। কিন্তু তিনি মানুষ হন অন্ডালে, তাঁর মামার বাড়ীতে। মাতামহ ছিলেন রানীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লাখনির এক প্রতিপত্তিশালী মালিক। পিতা ধরণীধর ছিলেন হত দরিদ্র। সাপ ধরতেন, ম্যাজিক দেখাতেন। তিন বছর বয়সে শৈলজা মাকে হারান। বাবা নতুন সংসার করেন। এই সংসারে শৈলজানন্দ নিজেকে মানিয়ে নিতে পারলেন না। মাতুলালয়ে চলে এলেন। নতুন বন্ধু জুটলো নজরুল। শৈলজানন্দ কয়লাখনির কুলী-বস্তীতে কুলি মজুরদের জীবন-যন্ত্রণা অনুভব করার চেষ্টা করতে থাকেন। কল্লোল ধারার লেখকদের মত শৈলজানন্দ গল্পের বিষয়বস্তুর সন্ধানে পরিচিত পরিবেশ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। খুঁজতে লাগলেন ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত জীবনের কৃত্রিম সভ্যতার আওতার বাইরে যেখানে অশিক্ষার অজ্ঞানতার অন্ধকার। আদিম উদ্দাম কিন্তু সহজ সরল জীবন—সেইরূপ কোন পটভূমি। সেই পটভূমি আশৈশব পরিচিত সাঁওতালদের জীবন ও কয়লাখনি অঞ্চল।

১৩২৯ সালের কার্তিক মাসে প্রথম আত্মপ্রকাশ করল তাঁর 'কয়লা কুঠির দেশে' উপন্যাস। এরপর রানীগঞ্জ উখড়া কয়লা অঞ্চলের কুলী কামিনদের জীবন নিয়ে প্রবাসীর পৃষ্ঠায় বের হলো 'রেজিং রিপোর্ট'—কয়লা তোলার কাহিনী।

এতদিন আমরা অভ্যস্ত ছিলাম উপন্যাসে জমিদারী ঢঙের কথাবার্তার সঙ্গে; (গোবিন্দলাল) কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কৃষ্ণকান্তকে বলিলেন একটা নিবেদন আছে।

কৃষ্ণকান্ত —কি?

গোবিন্দলাল—ইহাকে ছাড়িয়া দিন। আমি জামিন হইতেছি। বেলা দশটার সময় আনিয়া দিব।

কিংবা পল্লীসমাজের ঘরোয়া কথাবার্তায়—গাঙ্গুলী বলিতে লাগিলেন—তুমি তো আমার পর নও বাবা—নিতান্ত আপনার—তোমার মা যে আমার একেবারে সাক্ষাৎ পিসতুতো বোনের খুড়তুতো ভগিনী।

এখন আমরা শুনলাম সাহিত্যে নতুন ভাষা যা ছিল এতদিন সাহিত্যে ব্রাত্য—"তুলি ধীরে ধীরে টুরনীর হাত ছাড়িয়া দিয়া—পীরুর নিকটে সরিয়া আসিয়া বেদনার্ত কণ্ঠে কহিল—লে কত মারতে পারিস মার; খালভরা। মেরে মরাই দে কেনে, খালাস পাই তা হলে।" সুকুমার সেনের ভাষায়—শৈলজানন্দের গল্প, বাস্তব (রিয়ালিস্টিক) বলিতে যাহা বোঝায় শুধু তাহাই নয়—'বাস্তবিক'ও। তীব্র অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণ অনুভব শৈলজানন্দের সাহিত্য সাধনাকে পরিচিত সরণি হইতে ভুলাইয়া উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত মানুষের অপরিচিত জীবনের অনাবিস্কৃত গহনের দিকে পরিচালিত করিয়াছিল।"

শৈলজানন্দের গল্পধারার প্রথম দিকের রচনা "নারী মন" (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০) ও শেষ দিকের রচনা "জোহানের বিহা" (বৈশাখ ১৩৩৩)।

শৈলজানন্দের এই রচনার পরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে ঠিক যেন শৈলজানন্দের 'তুলি' কথার প্রতিধ্বনি—বসিরের কণ্ঠে।

'ফের উয়ার সাথে বাতচিত করলি জানে মাইর‍্যা দিমু, আল্লার কিরে।'

কিংবা তারাশঙ্করের 'বেদেনী' গল্পে বেদেনী ও বাজিকর কেষ্টার সংলাপে একই ভাষা শুনতে পাই—

নাম শুনলি গালি দিবা আমাকে বেদেনী!
কেনে?
নাম বটে কিষ্টা বেদে।
তা গালি দিব কেনে?
তুমার নাম যে রাধিকা বেদেনী,
তাই বুলছি।

শৈলজানন্দের অন্যান্য গ্রন্থ—'ডাক্তার', 'বন্দী,' 'আজ শুভদিন,' 'আমি বড় হবো,' 'কনে চন্দন,' 'এক মন দুই দেহ,' 'ক্রৌঞ্চমিথুন', 'ঝড়ো হাওয়া,' রূপং দেহি,' 'সারারাত' 'অপরূপা', ও স্মৃতিচারণ—'যে কথা বলা হয় নি।' তাঁর কতকগুলি উপন্যাস ছায়াছবিতেও রূপায়িত হয়। যেমন 'মানে না মানা।' 'শহর থেকে দূরে,' 'বন্দী', 'অভিনয় নয়,' 'রং বেরঙ্' ইত্যাদি।

রেভারেন্ড লালবিহারী দে (১৮.১২.১৮২৪—২৮.১০.১৮৯৪) : ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্য এক শক্তিধর, ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার। বর্ধমান শহর থেকে মাত্র ১৩ কিমি উত্তরে পলাশী গ্রাম—সোনা পলাশী বলেই এর পরিচিতি। এই গ্রামের এক প্রায় দরিদ্র মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারে লালবিহারীর জন্ম। আলেকজান্ডার ডাফের ছাত্র। তাঁর কাছেই ১৯ বছর বয়সে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নেন। বিবাহ করেন গুজরাটের পার্সিয়ান হরমদজি পেসটনজির কন্যাকে। কিন্তু মনে প্রাণে লালবিহারী ছিলেন নির্ভেজাল বাঙালী। স্বাজাত্যবোধ ছিল প্রবল; বাঙালীর নিজস্ব উৎসব ব্রত-পার্বণ আমোদ-প্রমোদ সম্বন্ধে এক বিদেশী পণ্ডিতের বিরূপ মন্তব্যের জবাবে লালবিহারী বাংলার পল্লীর বারো মাসে তেরো পার্বণের খুঁটিনাটি দিয়ে এক অপূর্ব জোরালো প্রবন্ধ লেখেন। ওয়েব সাহেব তাঁর Hints of the Study of English গ্রন্থে বাঙালীদের অশুদ্ধ বাবু ইংরেজী সম্বন্ধে মন্তব্য করায় লালবিহারী সাহেবের প্রবন্ধের প্রথম পাতা থেকে শুরু করে একটির পর একটি ভুল বার করে ছাপিয়ে দিয়ে মন্তব্য করেছিলেন—যাঁরা নিজেরাই ইংরাজী লিখতে জানে না তাঁদের পক্ষে অন্যের ভুল ধরতে যাওয়া সাজে না। "বঙ্গে এ হেন বেশ কয়েক জন বাঙালী রয়েছেন, যাঁদের পায়ের কাছে বিনীত ভাবে বসে বহু সাহেব ইংরেজী ভাষা শিখে যেতে পারেন।" লিখতেন নির্ভুল গুরুগম্ভীর জনসোনিয়ান ইংলিশ। লালবিহারীর স্বাজাত্যাভিমানের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

তাঁর দুটি বিখ্যাত বই—গোবিন্দ সামন্ত ও ফোকটেলস্ অব্ বেঙ্গল।

তাঁর The History of a Bengal Rayot—Govinda Samanta উপন্যাসের নায়ক বর্ধমান জেলার কুড়মুন পলাশী অঞ্চলের এক দরিদ্র চাষী। গ্রামকেন্দ্রিক দরিদ্র বাঙালী কৃষকজীবন। তাদের সমাজ, তাদের নানা ধরনের পেশা, নানা রকমের কাজকর্ম, চালচলন, বইটির মধ্যে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সমবেদনার সঙ্গে চিত্রিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ / ষাট দশকের গ্রাম-বাংলার কৃষকজীবনের এক নির্ভরযোগ্য দলিল। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের অনাবৃষ্টির দুর্ভিক্ষে নায়ক গোবিন্দের মৃত্যুর বর্ণনার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি। এই উপন্যাসে কেবলমাত্র জমিদারদের শোষণের তীব্র প্রতিবাদই ছিল না, হিন্দু বিধবাদের অবমাননা ও সামাজিক অত্যাচারেরও বিশদ চিত্র আছে এই উপন্যাসে।

গ্রামের এই বাস্তব চিত্র বিদেশী পাঠকদের মুগ্ধ করেছিল। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক চার্লস ডারউইন পর্যন্ত পত্র লিখে লেখকের প্রতিভার স্বীকৃতি দেন।

লেখকের অন্য উপন্যাস 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান'—বইখানি বাংলায় লেখা বলে অনেকে লালবিহারীর লেখা বলে স্বীকৃতি দিতে দ্বিধাগ্রস্ত; উপন্যাসটি

লালবিহারীরই সম্পাদিত অরুণোদয় পত্রিকায় (১৮৭৭) প্রথমে ধারাবাহিকভাবে ও পরে লেখকের নাম ছাড়াই প্রকাশিত হয়। কোন কোন গবেষক এই উপন্যাসটিও যে লালবিহারীর লেখা তার সমর্থনে যে সব যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন সেগুলি পর্যালোচনা করলে কোন দ্বিধাই থাকে না যে বইটির লেখক লালবিহারী স্বয়ং। লালবিহারীর অন্য পুস্তক Folk Tales of Bengal বাংলার নিজস্ব উপকথাগুলি লালবিহারী গ্রামের বর্ষীয়সী মহিলা, পুরুষ এমনকি জনৈক নাপিতের কাছ থেকে সংগ্রহ করে ইংরাজীতে প্রকাশ করেন। ভাষা সরল ও সাবলীল। গ্রামের ঠাকুমা দিদিমার কাছ থেকে যে সব রূপকথা উপকথা আজও শোনা যায় তারই অবিকৃত রূপ ফুটে উঠেছে বইটিতে। গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর বক্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য—তাঁর এই উপকথা সংগ্রহের প্রচেষ্টা যতই অকিঞ্চিৎকর হোক, লোককথা ও অতীত কাহিনী অবলম্বন করে আধুনিক কালে যে সাহিত্য গড়ে উঠছে তাতে কিছুটা সাহায্য হবে এবং ইংলণ্ডে প্রচলিত রূপকথার সঙ্গে বাংলা উপকথা তুলনা করলে প্রমাণ হবে গঙ্গাতীরের কালো কালো প্রায় উলঙ্গ কৃষাণ হলো টেমস নদীর তীরে ধবধবে ফরসা ও ঝক্‌ঝকে পোশাক পরা—ইংরেজের দূর সম্পর্কের ভাই।" (দেশ, ১৬ আষাঢ় ১৩৮৫)

লালবিহারী মূলত বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যরসিক ও ধর্মপ্রচারক—ঔপন্যাসিক, নাট্যকার বা গল্পলেখক নন—তাই তাঁর গ্রন্থগুলির সাহিত্যিক উৎকর্ষ খুব উল্লেখযোগ্য নয়—সংলাপ নাই, যেটুকু আছে তাতে যেন প্রাণ নেই—বাস্তবতা নেই—দু-চারটি কথা বলতে বলতে বক্তার কথা যেন ফুরিয়ে যাচ্ছে, চরিত্রের সমারোহ আছে কিন্তু চরিত্রগুলি কেমন যেন নির্জীব—জীবন্ত হয়ে ওঠে নাই; বর্ণনার ক্ষেত্রে কল্পনাশক্তির অভাবও নজরে পড়ে। রঙ্গ-রসিকতা বর্জিত, কাজেই খানিকটা নীরস। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতে হবে গ্রন্থগুলি সমসাময়িক ঘটনার সত্যনিষ্ঠ দলিল।

এছাড়া লালবিহারী ইংরাজী মাসিকপত্র Bengal Magazine বের করেন ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে। যদিও লালবিহারী বলতেন, "বঙ্গভাষাকে বঙ্গদেশের মাতৃভাষা বলিতে হইবে, যে ব্যক্তি মাতৃভাষাতে বঞ্চিত সে বঙ্গদেশের তাবৎ সুখেই বঞ্চিত," তবুও তিনি ইংরেজীকে ভবিষ্যতে শিক্ষিত ব্যক্তির চিন্তার বাহন হবে বলে বিশ্বাস করতেন।

রমাপদ চৌধুরী : রেভারেন্ড লালবিহারী দে-র গোবিন্দ সামন্ত যদি ঊনবিংশ শতাব্দীর কৃষক জীবনের পদাবলী, একবিংশ শতাব্দীর স্বাধীনোত্তর গ্রাম-বাংলার সত্যনিষ্ঠ আর এক দলিল রমাপদ চৌধুরীর "বনপলাশীর পদাবলী।" মঙ্গলকোট

থানার ৬৯নং পলাসন গ্রাম রমাপদ চৌধুরীর জন্মভূমি, তবে অবশ্য তাঁর শিক্ষা ও সাহিত্যক্ষেত্র খড়্গপুর অঞ্চলে। তা সত্ত্বেও জন্মসূত্রে বর্ধমানের লেখক হিসাবে বর্ধমান তাকে দাবী করতেই পারে। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "বনপলাশীর পদাবলী" (জুন ১৯৬২) সাম্প্রতিক পল্লীজীবনের একটি নূতন রূপরেখা, যার অন্তর-স্পন্দন মনকে দোলা দেয়। এই উপন্যাসের মধ্যে বর্ণনা, ঘটনার বিবরণ ও আদর্শগত ভাষাচিত্রের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। দীর্ঘকাল ধরে নিপীড়িত অবহেলিত পল্লীসমাজে যখন স্বাধীনোত্তর যুগে গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তখন আশা করা গিয়েছিল গ্রামে গ্রামে জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা কর্মচাঞ্চল্য দেখা দেবে, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল চিত্রটা বিপরীত, গ্রামবাসীরা নিরুৎসাহ ও উদাসীন। নিজের নিজের সুখ-সুবিধার দিকেই নজর বেশী।

এই বৈচিত্র্যহীন জীবনাবর্তে মাঝে মাঝে একটু স্ফূলিঙ্গ দীপ্ত হয়, কোথাও একটু বিরল বর্ণ রোমান্সের লীলা, কোথাও বা একটু অখ্যাত অনাটকীয় ত্যাগ-মহিমা নীরবে এই ধূসর পরিবেশকে কল্পলোকের বর্ণবৈভবে রঙিন করিয়া তোলে। গ্রামে যুদ্ধফেরৎ অবিনাশ ডাক্তারের মধ্যে একটা আশাব্যঞ্জক সজীবতা আছে 'পদ্মর সঙ্গে তার সম্পর্ক গ্রাম্যসমাজের বিরুদ্ধে স্পর্ধিত প্রতিবাদ।' বনপলাশীর জীবনে বৃদ্ধা অট্টামা গ্রামের পূর্ব গৌরব ও অতীতের শেষ স্মৃতিচিহ্ন। মহত্ত্বের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত, মোহনপুরের বৌ অসাধারণ আত্মোৎসর্গের জীবন্ত প্রতীক।

পদাবলীর দু'একটি পদ শোনা যাক লেখকের নিজের কথায়—"সম্পন্ন কৃষিজীবী সেই ছেলেটি। একালের জোতদার, কালো কাপড় রোদে জ্বলে গিয়ে মেটে বঙ হয়ে যাওয়া ছাতাটি দেখিয়ে বলেছিল—মাঠে দাঁড়িয়ে কত রোদ খেতে হয় দেখুন। ছেলেবেলায় দেখা সেই গ্রাম্যবৃদ্ধা, কথায় কথায় ছড়া কাটতেন, সত্যি সত্যি নাম ছিল অট্টামা। সেই চাষী ছেলেটি, "আজ্ঞে ডাইভারি শিখলে জেতে কোটাল বলবে না।" কাটোয়াগামী বাসের মেঝেতে বসা শীর্ণ কৃষক "সরো, সরো করে তো পায়ের জুতো বানিয়েছেন, আর কত সরবো।" "দেখেছি গিরিজাপ্রসাদকেও, কিন্তু জানতাম না গ্রামজীবন নিয়ে একালের শহুরের লেখক আমি, উপন্যাস লিখবো।"

খড়্গাপুরের রেল কোয়ার্টারে মানুষ হলেও লেখক পলাসনকে ভুলতে পারেন নাই, যেমন ভুলতে পারেন নাই রেভারেন্ড লালবিহারী তাঁর সোনাপলাশী গ্রামের গোবিন্দ সামন্তকে। রমাপদ চৌধুরীর লেখনীতে পলাসন হয়ে উঠেছে বনপলাশী।

এরই মেঠো আল, পথের স্মৃতি চল্লিশ বছর ধরে লেখককে তাড়া করে বেরিয়েছে—তারই ফসল বনপলাশীর পদাবলী।

লেখক এই উপন্যাসে "চিরাচরিত পরম্পরাগত প্রবহমান বর্ণনারীতিকে পরিত্যাগ" করে "তার বদলে সহজ স্বাভাবিক জীবন থেকে তুলে আনা মিশ্র তরঙ্গের মধ্যে ঘটনা, চরিত্র, চিন্তাকে কাহিনীর, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের সঙ্গে একেবারে একাকার করে দিতে চেয়েছেন।" লেখকের বাসার কাছে সদাশিববাবুর কুয়োর জল তুলে স্নান করার সময় আবৃত্তি—"পহেলা পহরমে সবকোই জাগে, দুসরা পহরমে ভোগী, / তিসরা পহরমে তস্কর জাগে, চৌঠা পহরমে যোগী"—শুনতে শুনতে লেখক শেষ করলেন প্রথম উপন্যাস—'পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠায় নাম দিলেন—প্রথম প্রহর।'

লেখকের অন্যান্য উপন্যাস একাদেমী পুরস্কার প্রাপ্ত 'বাড়ী বদলে যায়', রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত 'এখনই', এ ছাড়াও পরপর 'লালবাঈ,' 'এই পৃথিবী এই পান্থনিবাস', 'অভিমন্যু', 'পিকনিক', 'পরাজিত সম্রাট' ইত্যাদি আরও শতাধিক গল্প। তবুও তৃপ্ত নন। লেখকের কথায়—লেখকের একমাত্র পুঁজি অতৃপ্তি। তাই লেখক আজও খুঁজে বেড়াচ্ছেন, "মানুষের মনের সেই ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড—অবাক দেশটাকে।" (দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮২)

যোগেন্দ্রনাথ বসু (৩০.১২.১৮৫৪–১৮.৮.১৯০৫) : বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা জামালপুর থানার বেড়ুগ্রামের গিরীশচন্দ্র বসুর জ্ঞাতিভ্রাতা ইলসবা গ্রামের যোগেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন একাধারে সাংবাদিক ও ঔপন্যাসিক। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'মডেল ভগিনী', 'কালাচাঁদ', 'চিনিবাস চরিতামৃত,' 'নেড়া হরিদাস' ও 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' প্রভৃতির বঙ্গসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান আছে। উপন্যাসগুলি ব্যঙ্গরসাত্মক। বীভৎস (Grotesque) রসের অনেকক্ষেত্রে প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। তবে গ্রন্থগুলি কতটা উপন্যাস ও কতটা ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা সেটা বিচার্য। কারণ, আঙ্গিকের দিক দিয়ে কিছু গ্রন্থকে ঠিক উপন্যাস পর্যায়ে ফেলতে অনেকে দ্বিধাগ্রস্ত। তবে ধর্মব্যাখ্যা, নীতিপ্রচার প্রভৃতি উপাদানের মধ্যে কিছুটা বাস্তব চিত্রণ ও চরিত্র বিশ্লেষণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

যোগেন্দ্রনাথ ছিলেন রক্ষণশীল হিন্দু। এর প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর 'মডেল ভগিনী' উপন্যাসে—উপন্যাসখানি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মধ্যে একটা আলোড়ন ওঠে—অনেকে একে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি কুরুচিপূর্ণ কটাক্ষপাত বলেন। উপন্যাসে ব্যঙ্গাত্মক অতিরঞ্জনের দ্বারা হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষিত হয়। প্রধান চরিত্র কমলিনীর ছলাকলা, বিলাসব্যসন স্থানে স্থানে সুরুচির সীমা ছাড়িয়ে

গেছে—তার ভাবভঙ্গী, রঙ্গরস তাকে উপহাসের পাত্র করে তুলেছে। উপন্যাসের শেষাংশে নগ্নপাপের বীভৎসতা উপন্যাসের রসভঙ্গ করেছে। সাহেবী পোশাকে 'ময়ূরপুচ্ছধারী' কৈলাসের হাওড়া স্টেশনে বীরত্বাভিনয়ের ফলে গ্রেপ্তার ও বিচার কৌতুকরসের অতিরঞ্জনের পর্যায়ে পড়ে।

শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী (১৯০৯) উপন্যাসে ব্যঙ্গ-কৌতুকের তীব্রতা অনেকটাই শিথিল। ইহার আখ্যানভাগ অতি বিস্তৃত। ইহার ঘটনা-বৈচিত্র্য ও নানাবিধ রসসঞ্চার কৌতুকের উদ্রেক করে। "উপন্যাসটির মধ্যে Victor Hugo এর Les Miserables-এর মত মহাকাব্যোচিত বিশালতা আছে।" চরিত্র-চিত্রণে আদর্শবাদের আতিশয্য লক্ষ্য করা যায়।

ইহার অন্যান্য রচনার মধ্যে, "কৌতুক কণা," "মহীরাবণের আত্মকথা", "বাঙালীচরিত" (তিন খন্ড) উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তিনি বঙ্গবাসী পত্রিকার কিছুদিন সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

শৈলবালা ঘোষজায়া (১৮৯৪–১৯৭৪) : এই বর্ধমান শহরেই আবির্ভাব হয়েছিল প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক শৈলবালা ঘোষজায়ার। কুমারী জীবনের উপাধি নন্দী। মেমারীর নরেন্দ্র ঘোষের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তখন মেয়েরা লেখিকা হবে এটা মেমারীর গ্রাম্য পরিবেশে কেউ ধারণা করতে পারতো না। কাজেই তিনি যখন লুকিয়ে লুকিয়ে রাত জেগে লিখতেন তখন পরিবার থেকেই বাধা আসে। কিন্তু সব বাধাকে অতিক্রম করে, তিনি প্রকাশ করলেন প্রথম উপন্যাস "সেখ আন্দু" (১৯১৭)। উপন্যাসটি প্রবাসীতে বের হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা আলোড়নের ঝড় তোলে। এই উপন্যাস লেখায় লেখিকার বিশেষ রকম স্বাধীনচিন্তা ও সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, কারণ নায়ক মুসলমান, নায়িকা হিন্দু। সে যুগে কেউ কল্পনাও করতে পারতো না। লেখিকার গল্প ও উপন্যাসের সংখ্যা ৫২।

'সেখ আন্দু' ছাড়া অন্য উপন্যাস 'নমিতা' (১৯১৮), 'জন্ম অপরাধী' (১৯২০), 'জন্ম অভিশপ্তা' (১৯২১), 'অভিনেত্রীর একরাত্রি,' 'ইমানদার' (১৯২২), 'মহিমাদেবী' (১৩২৭), 'মনীষা,' 'অকালকুষ্মান্ডের কীর্তি' ইত্যাদি।

চিত্ত ভট্টাচার্য : বর্তমান কালের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বর্ধমানের চিত্ত ভট্টাচার্যের (১৯৩০) নাম উল্লেখযোগ্য। পেশায় শিক্ষক, নেশায় সাহিত্যসেবা। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, শিশু-সাহিত্য, রম্যরচনা প্রভৃতি সাহিত্যের সমস্ত অঙ্গনে তাঁর বিচরণ—তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'কামমোহিতম্', 'অন্ধকারের রঙ',

রম্যরচনা—'প্রতিবেশিনীর কাছে' শিশু-সাহিত্য—'ফোয়ারা,' 'বিচিত্র'; গল্পগ্রন্থ—'ফুলদানি ও শেষ হাস্নুহানা', 'দৃশ্যান্তর', 'মধ্যদিনের গান' ও 'নাভিপদ্ম', কাব্যগ্রন্থ—'পত্ররাগ', 'ঝরণা তলার নির্জনে' ও 'পাঁকে পদ্মে'।

বর্তমানে সাহিত্য ক্ষেত্রে মোটামুটি পরিচিত নাম কালনার মানবেন্দ্র পাল (১৯২৬)। এঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'দূর থেকে কাছে', 'প্রতিলিপি', 'নিশিবিহঙ্গ' ও গল্প-সংকলন 'কাছের পৃথিবী'।

কালনার ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় গল্প ও উপন্যাসে নাম করেছেন। কাটোয়ার সৌরিন ঘটক তাঁর 'ধূলা মন্দির' উপন্যাসে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। আসানসোলের ঔপন্যাসিক ও কবি জয়া মিত্রের 'হন্যমানে' উপন্যাসে জীবনের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। এখনও বহু ঔপন্যাসিক আছেন কিন্তু সকলের তথ্য আমার কাছে নাই। তাছাড়া 'জেলার ইতিহাস,' 'সাহিত্যের ইতিহাস' নয়—এর পরিসরও অল্প।

একটা কথা আমার মনে হয়েছে—আমাদের জেলার পশ্চিমাঞ্চল প্রধানত শিল্পাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলে কৃষির প্রাধান্য। পশ্চিমাঞ্চলে বিরাট শিল্প কারখানা, খনির প্রাধান্য, ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্টের উর্বর ক্ষেত্র—ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনও কম হয় নাই। এখনও হচ্ছে বরং বেশী বেশীই হচ্ছে, কিন্তু শৈলজানন্দের পর তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' বা 'চৈতালী ঘূর্ণি'র মত কোন উপন্যাস বের হলো না যিনি চৈতালী ঘূর্ণির শ্রমিক সচেতনা ও শ্রমিক আন্দোলনকে উপন্যাসে রূপ দেন। তবে হয়েছে কিনা জানা নেই।

জেলাব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার এসেছিল—'দেবু মাষ্টারে'র অভাব ছিল না কিন্তু গণদেবতা বা ধাত্রীদেবতার মত উপন্যাসের পটভূমি রচিত হয়েই রইল—এই নিয়ে কোন উপন্যাস হলো না।

জেলায় ভূমি সংস্কার, অপারেশন বর্গা, তেভাগা আন্দোলন, পঞ্চায়েতী রাজের ফলে গ্রামের চিত্র দিন দিন বদলেছে। কিন্তু বঞ্চিতের জন্য সমবন্টন, সমানাধিকার, মন্বন্তরের কালোবাজারীর ক্ষুধা ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে আদর্শগত বিদ্রোহ তুলে নতুন ধরনের উপন্যাস হলো না। অন্ত্যজদের নিয়ে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র মত 'বেলকাশের চরের উপকথা' কিংবা 'পদ্মা নদীর মাঝি'র মত 'দামোদরের মাঝি'র কাহিনী আত্মপ্রকাশ করে নাই। জানিনা গতানুগতিকতার ধারা ত্যাগ করে নতুন কোন ঔপন্যাসিক জেলার ঔপন্যাসের নতুন প্রাণের সঞ্চার করবেন কিনা।

রাজশেখর বসু (১৮৮০–১৯৬১) : সাহিত্যের এক নতুন শাখা রসরচনা—এ বিষয়ে এ জেলা রাজশেখর বসুকে সঙ্গত কারণেই দাবী করতে পারে, কারণ

রাজশেখরের পৈতৃক বাসস্থান নদীয়ার উলা গ্রামে হলেও তাঁর জন্মস্থান বর্ধমান থেকে ৬/৭ মাইল পূর্বে আমড়া-বামুনপাড়া গ্রামে। রসরচনার ক্ষেত্রে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয় আগেই সামান্য উল্লেখ করেছি। রাজশেখর পেশায় রসায়নবিদ, নেশায় সাহিত্যে রসরাজ। তিনি রসরচনার জন্য পরশুরাম ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। সাহিত্যের অন্য অঙ্গনে তিনি রাজশেখর। বেঙ্গল কেমিক্যাল থেকে অবসর নিয়ে তিনি সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর গড্ডলিকা, হনুমানের স্বপ্ন, কজ্জলী বাংলার রসিকমহলকে আলোড়িত করেছিল। তাঁর কজ্জলী গল্পগ্রন্থের টাইপ চরিত্র 'বিরিঞ্চিবাবা'। "বিরিঞ্চিবাবা সভা অলংকৃত করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁর চেহারাটি বেশ লম্বা চওড়া, গৌরবর্ণ মুণ্ডিত মুখ। সুস্পষ্ট গালের আড়াল হইতে দুইটি উজ্জ্বল চোখ উঁকি মারিতেছে। দু'পয়সা দামের শিঙাড়ার মত সুবৃহৎ নাক, মৃদ হাস্যমণ্ডিত প্রশস্ত ঠোঁট, তার নীচে খাঁজে-খাঁজে-চিবুকের স্তর নামিয়াছে। স্বামী-গিরির উপযুক্ত মূর্তি। অঙ্গে গৈরিক রঞ্জিত আলখাল্লা; মস্তকে ঐরূপ কান-ঢাকা টুপি, বয়স ঠিক ঠিক পাঁচ হাজার বলিয়া বোধ হয় না, যেন পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন। বাবার বেদীর নীচে ডান-দিকে ছোট মহারাজ কেবলানন্দ বিরাজ করিতেছেন।" একেবারে নিখুঁত বর্ণনা—পড়তে পড়তে পাঠকের মানসপটে কখন যে বাবাজীর মূর্তি অঙ্কিত হয়ে গেছে পাঠক 'Zাস্তি'ও পারবেন না।

রসরচনা ছাড়া চলন্তিকা নামে বাংলা অভিধান, অনুবাদগ্রন্থ—বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারত, মেঘদূত, হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থের সংখ্যা ২১। তাঁর স্টাইল সহজ, সরল, স্পষ্ট, লক্ষ্যভেদী। তাঁর সরসতা চরিত্রকে কেন্দ্র করে। পৌরাণিক সাহিত্য ও প্রাচীন যুগের জীবনযাত্রার সঙ্গে আধুনিক জীবনের অসঙ্গতি তাঁর সাহিত্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছে হাস্যরসের এক নতুন উৎসমুখ। এই আধুনিকতার রসপুষ্ট, নবযৌবনপ্রাপ্ত হাস্যরসের স্রষ্টা ও ইহার বিজয় অভিযানের ঐতিহাসিক রাজশেখর।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯–১৯১১) : আদি নিবাস গঙ্গাটিকুরি। উকিল হিসাবে কর্মজীবনের শুরু। শ্লেষ ও ব্যঙ্গ রচনায় প্রথম সার্থক লেখক। পঞ্চানন্দ ছদ্মনামে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লিখতেন। বাংলা পত্রিকায় ব্যঙ্গচিত্রের তিনিই প্রথম প্রবর্তক। তাঁর প্রথম বই—"উৎকৃষ্ট কাব্যম্"। তাঁর সরস রচনার প্রশংসা করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, তিনি টেকচাঁদ ও হুতোমের সমকক্ষ। সংস্কৃতভিত্তিক সাধু বাংলা লেখার পরিবর্তে তিনি সহজ সরল সাবলীল বাংলায় লেখার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। পাঁচু ঠাকুর নামেও তাঁর কিছু কিছু লেখা সংকলিত হয়েছে। তাঁর

উল্লেখযোগ্য পুস্তক—কল্পতরু (উপন্যাস), ভারত উদ্ধার (খণ্ড কাব্য), হাতে হাতে ফল (প্রহসন), ক্ষুদিরাম (গল্প-সংকলন)। তিনি বর্ধমানের শ্যামবাজারে দীর্ঘদিন বাস করেছিলেন ও বর্ধমান কোর্টে কিছুদিন ওকালতিও করেছিলেন। তিনি তাঁর ব্যঙ্গাত্মক সওয়ালে আদালত কক্ষে হাসির রোল তুলতেন। বঙ্গবাসী পত্রিকার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। "বাহ্যবৃত্তিতে ইন্দ্রনাথ ছিলেন উকিল কিন্তু মনোবৃত্তিতে স্যাটায়ারিস্ট। হিন্দুত্ব, বাঙ্গালীত্ব ও ব্রাহ্মণত্বের দর্প-অভিমানই ছিল তাঁর স্যাটায়ার, ব্যঙ্গাত্মক রচনা ও হাস্যরস সৃষ্টির উৎস। এই হাস্যরস, ব্যঙ্গত্বই তাঁর সাহিত্য পরিচয়। এই হাস্যরসেই তিনি জীবনরসিক।" ইন্দ্রনাথের সময়ে লোকাচার, দেশাচার এমনকি পারিবারিক জীবনে নানা অনাচার ও আচার-অনুষ্ঠানের শিথিলতা দেখা দিয়েছিল, ঈশ্বর গুপ্তের ভাষায়—

"পিতা দেয় গলে সূত্র পুত্র ফেলে কেটে।
বাপ পূজে ভগবতী, বেটা দেয় পেটে।"

ইন্দ্রনাথ শক্ত হাল ধরে জাতীয় জীবনতরীকে নিমজ্জন দশা থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। তাঁর 'ভারত-উদ্ধার' পাঁচটি সর্গে রচিত। এটি একটি ব্যঙ্গকাব্য, আকারে ক্ষুদ্র, প্রকারে তীক্ষ্ণ শাণিত ছুরি। বাংলাদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনে অনেক নেতাই তখন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন—বিপিনচন্দ্র পাল, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ইন্দ্রনাথের কথায়—"বিলেতী পেট্রিয়টিজমের আঁটির চারার আমদানি হয়েছিল। সেই চারাকে অঙ্কুরিত ও পত্রপুষ্প পল্লবিত করে বনস্পতির রূপ দিতে সেদিনে 'ভারত উদ্ধার' কাব্যের বিপিনের মত কত না বাঙালী বীর কোমর বেঁধে লেগেছিল।" 'বাঙালী ভরসা' পরম স্বাদেশিক বিপিন যখন স্ত্রীর সহস্র কাকুতি মিনতি সত্ত্বেও দেশোদ্ধারে বদ্ধপরিকর, তখন অগত্যা পতিপ্রাণা সতী—হৃদয়বল্লভের উদ্দেশ্যে বললেন—'আলু ভাতে ভাত তবে দিই চড়াইয়া / খাইয়া যাইবে যুদ্ধে।'

ইন্দ্রনাথের এই ব্যঙ্গাত্মক উক্তি সেদিন সকলের মুখে মুখে ফিরত। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ যখন ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বিচারক নরীশ সাহেবকে গালাগালি দেবার অপরাধে জেলে গেলেন, তখন ইন্দ্রনাথ 'বঙ্গবাসী'তে লিখলেন—"আমি বেশ ছিলাম, সুরেন্দ্র জেলে গেল, আমাকে একবারে মাটি করিয়া গেল। সামান্য নরলোকে সুরেন্দ্র; জেলে গিয়ে বিশ কোটি মানুষের বুকের উপর সিংহাসন পাতিয়া আমাকে টিটকারি দিতেছে, আর আমি দেবতা—জেলখানার ফটকের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলাম।"

"এতে কে না মাটি হয়? আমি তো একেবারে ডাঁহা মাটি।" বঙ্কিমচন্দ্রের

কমলাকান্তের ন্যায় এই সেই পঞ্চানন্দ বা পাঁচু ঠাকুর; ইন্দ্রনাথের জীবনতত্ত্বের পূর্ণ প্রতীক।

ইন্দ্রনাথের বাংলা সহজ সরল সাবলীল—তাঁর 'বাংলা ভাষার সংস্কার' প্রবন্ধে ভাষার নমুনা—"ভাষার সংস্কার বিষয়ে চিন্তা করিতে হইলে ভাষার প্রকৃতি, ভাষার অবয়ব, সংস্থান প্রভৃতি নানা দিক দিয়া ভাষার পরিচয় গ্রহণ করা আবশ্যক।"...

ডাঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের উক্তি দিয়ে ইন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ শেষ করি। "পঞ্চানন্দী ব্যাকরণ প্রকৃত পক্ষে সমসাময়িক লোক-চরিত্র ও সমাজজীবনের ব্যাকরণ। ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাকরণকে এমন বৃহত্তর তাৎপর্যে প্রয়োগ ইন্দ্রনাথের জীবনদৃষ্টি ও রসসৃষ্টির এক উজ্জ্বলতম নিদর্শন।"

কাব্যগ্রন্থ :

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭–১৭.৫.১৮৮৭) : জন্ম এই জেলার বাকুলিয়া গ্রামে। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ থেকে অবসর নিয়ে তিনি কাব্যদেবীর সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

রঙ্গলালের কাব্যকৃতি সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্য : ইংরাজী বিদ্যার অভাবে অধিকতর শক্তিশালী হইয়াও গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যাহা করিতে পারেন নাই, ইংরাজী বিদ্যার বলে শিষ্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাহা সম্পন্ন করিলেন। ইংরেজী কাহিনী কাব্যের রোমানস্-রসের যোগান দিয়া রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নবযুগের দিকে বাঙ্গালা সাহিত্যের মুখ ফিরাইলেন, অবাস্তব কাল্পনিক পরিবেশে স্থূল প্রণয়লীলার স্থানে তিনি দেশপ্রেমকে কাব্যের বিষয় রূপে গ্রহণ করিলেন। ....রঙ্গলালের রচনার কবিত্ব মূল্য বেশি নয়। কিন্তু তাঁহার দ্বারা 'নিশীথিনীর মৌন যবনিকা' অপসারণের প্রথম সংকেত ধ্বনিত হইয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে তাহার বিশিষ্ট মূল্য আছে।" রঙ্গলালের ভারতের ইতিহাস প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর "পদ্মিনী উপাখ্যান" (১৮৫৮) কাব্যে—বাংলা কাব্যের ইতিহাসে আধুনিক বাংলা কাব্য—চিতোরের পতন, টডের রাজস্থান কাহিনী থেকে কাব্যের বিষয়বস্তু নির্বাচিত। নিসর্গ বর্ণনা দিয়া কাব্যের আরম্ভ।

সরসী সরিৎ সিন্ধু শেখর সুন্দর
গহন গহ্বর বন নির্ঝর শীকর।
দিনকর নিশাকর নক্ষত্র মণ্ডল।
মেঘ মাঝে তড়িতের চমক উজ্জ্বল॥

কাব্যের "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায় / দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়"—স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মূলমন্ত্র হয়েছিল। রঙ্গলালের দ্বিতীয় কাব্য 'কর্মদেবী' (১৮৬২)। কাব্যটি চারটি সর্গে বিভক্ত। কাহিনীসূত্র রাজপুত ইতিহাস থেকে নেওয়া।

কারু প্রতি ক্ষমা নাই হউক আপন ভাই
সমুচিত শিক্ষা দিব তারে।
অন্যায় না সহ্য হয় মিথ্যাবাদ নাহি সয়
সত্যের পরীক্ষা তরবারে ॥

রঙ্গলালের দেশপ্রেমের আদর্শ 'কর্মদেবী' কাব্যে আরও মুখর। তাঁর তৃতীয় কাব্য 'শূর সুন্দরী' (১৮৬৮)। এর কাহিনীও রাজপুত ইতিহাস থেকে সংগৃহীত। বিকানীরের মহিষীর বিরুদ্ধতায় ও সতীর তেজস্বিতায় কিভাবে সম্রাট আকবরকে অপদস্থ হতে হয়েছিল, তারই কাহিনী কাব্যটিতে বিধৃত। তাঁর 'রহস্য সন্দর্ভ' কাব্য-গ্রন্থে অনেকগুলি ইংরেজী কবিতার অনুবাদ আছে। ইংরেজী ও সংস্কৃত ছাড়াও রঙ্গলাল উড়িয়া ও ফারসী ভাষা থেকে অনেকগুলি কবিতা বাংলা কবিতায় অনুবাদ করেন।

রঙ্গলালই সম্ভবত প্রথম ওমর খৈয়ামের 'রুবাইৎ'-এর বাংলায় অনুবাদ করেন—

এই তো কুসুমকাল সুখের আকর।
প্রান্তর প্রবহা নদীতটে শ্রান্তি হয়।
এই এক বন্ধু সুরা পদ্মিনী ললনা।
কেহ না শুনিবে ভণ্ড গুরুর ছলনা।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৮—১৯৭৬) : পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যে সব কবি জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রঙ্গলালের পরেই নজরুলের নাম করতে হয়। হাবিলদার কবি কাজী নজরুল ইসলাম। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের জন্ম বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে। বালক বয়সে দুখু মিঞা নামে বেশী পরিচিত ছিলেন। ছোট বয়স থেকেই উদ্দাম নজরুলের মন ছিল বাঁধনছাড়া। ১৯ বছর বয়সে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন ও মেসোপটেমিয়া চলে যান। ১১ বছর থেকেই তিনি 'লেটো' গানের উপযোগী গান রচনা করতেন। মেসোপটেমিয়ায় ৪৯নং বাঙালী পল্টনের তদারকি করবার জন্য একজন পাঞ্জাবী মৌলভী নিযুক্ত

ছিলেন। তাঁর মুখে একদিন হাফিজের কবিতা শুনে তিনি ফারসী শিখতে থাকেন। এখান থেকেই প্রকৃত প্রস্তাবে নজরুলের কবিজীবনের সূচনা—হাফিজের অনুসরণে তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতা—

নাইবা পেল নাগাল শুধু সৌরভের আশে।
অবুঝ সবুজ দূর্বা যেমন যুঁই কুঁড়িটির পাশে।

দেশে ফেরার পর থেকে নজরুল কাব্যদেবীর আরাধনায় আত্মনিবেদন করেন। তাঁর দেশাত্মবোধক কবিতাগুলি আবেগে উচ্ছ্বাসে বাঙালী হৃদয়কে উদ্বেল করে দিল। কবি কেবল দমকা হাওয়ার মত 'অগ্নিবীণা' বাজাইয়া ক্ষান্ত রইলেন না। এর পর প্রকাশিত হলো ধূমকেতু। "অগ্নিবীণার লিরিক আবেগ বিদ্রোহের, নির্জীবতার নিশ্চেষ্টতার নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে প্রাণবান চিত্তের অসহিষ্ণুতা"।

'বিদ্রোহী' কবিতায় তাঁর বিদ্রোহের বাণী ইংরেজ শাসককেও সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল—

বল বীর
বল উন্নত মম শির
শির নেহারী আমারই শিখর হিমাদ্রীর

স্বাধীনতার প্রতি অগাধ বিশ্বাস তাঁকে ইংরেজ-বিদ্রোহী করে তুলেছিল। বিদ্রোহী কবিতায় সেই সুরই ধ্বনিত।

মহাবিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ
ভীম-রণ-ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।

সৈনিক কবি নজরুলের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মন হয়ে দাঁড়াল ক্ষুরধার তরবারি। 'বিদ্রোহী' যেন কবিতা নয়, আগুনের গোলা—প্রথম মহাযুদ্ধের পর 'মোসলেম ভারত' ও 'বিজলী'তে প্রায় একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়।

'কাব্যবিচারে 'বিদ্রোহী'র মূল্য সকলের কাছে সমান না হতে পারে কিন্তু তদানীন্তন যুগ-মানস যে এই কবিতার মধ্যেই প্রতিবিম্বিত একথা কেউ বোধকরি অস্বীকার করবেন না। এ কবিতার বিশৃঙ্খল ছন্দ ও উগ্র উৎকট উপমা উৎপ্রেক্ষাও

যে সে-যুগের অন্তরলোকের নিরুদ্ধ বাষ্পাবেগের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত।' একথা বলেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র (নজরুল স্মৃতি)। বইটি রাজরোষে পড়ে ও নিষিদ্ধ হয়।

'বিদ্রোহী'র পর তিনি 'ধূমকেতু' নামে পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করতেন। ধূমকেতু-র জন্য কবি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হন। এর পরে রাজরোষে পড়ে 'বিষের বাঁশি'।

১৯২৪ সালের ১৮ই অক্টোবর টেগার্ট চিফ সেক্রেটারীকে যে চিঠি লেখেন তার থেকেই এ তথ্য জানা যায়।

I have the honour to forward herewith a copy of a letter No 559/17/24 dated 24th September 1924 from the Bengal Librarian to the Director of public instruction, Bengal together with a copy of the enclosure on the subject of the book entitled 'Bisher Vanshi' by Kazi Nazrul Islam.

The writer was convicted last year under section 124A and 153A I.P.C and was sentenced to one year's R.I. in the Dhumketu Sedition case.' ...(নজরুলের নিষিদ্ধ নানা গ্রন্থ—শিশির কর) 'বিষের বাঁশি' সম্পর্কে কবির মন্তব্য—এই বিষের বাঁশির বিষ যুগিয়েছেন আমার নিপীড়িতা দেশমাতা আর আমার উপর বিধাতার সকল রকম আঘাতের অত্যাচার। বিষের বাঁশিতে প্রধান গান 'মরণ-বরণ' গান, প্রধান বাণী বিদ্রোহের বাণী, প্রথম বন্দনা বাণী বন্দনা।

(জ্যৈষ্ঠের ঝড়)

এরপর নিষিদ্ধ হয় 'ভাঙার গান' 'প্রলয় শিখা'। 'প্রখর শিখা'র পর বাজেয়াপ্ত হয় 'চন্দ্রবিন্দু', 'অগ্নিবীণা' (১৯২২), 'ফণিমনসা', 'সর্বহারা'। 'সর্বহারা'র কয়েকটি পঙ্‌ক্তি সেকালের যুবচিত্তে আলোড়ন তুলেছিল।

মোদেরি বেতন ভোগী চাকরেরে সালাম করি মোরা।
ওরে পাবলিক সারভেন্টদেরে আয় দেখে যাবি তোরা।
কালের চাকা ঘোর
দেড় শত কোটি মানুষের ঘাড়ে-চড়ে দেড় শত চোর।

নজরুলের ছোট নিবন্ধের পর 'রুদ্রমঙ্গল'ও বাজেয়াপ্ত হয়।

নজরুল করাচি সেনানিবাসে রচিত 'বাঁধন হারা'র ছয় নম্বর কিস্তিতে লিখেছিলেন—আগুন, ঝড়, ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্র, আঘাত, বেদনা, এই অষ্ট ধাতু নিয়ে আমার জীবন তৈরী হচ্ছে, যা হবে দুর্ভেদ্য, মৃত্যুঞ্জয় অবিনাশী। আমার

এ পথ শাশ্বত সত্যের পথ। বিশ্ব মানবের জনম ধরে যাওয়ার পথ; আমি আমার আমিত্বকে এ পথ থেকে মুখ ফেরাতে দেব না।" নজরুল যে শুধু আবেগমূলক উদ্দীপনামূলক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটালেন তাই নয়, প্রেম কবিতাকে হৃদয়ের আবেগ, অনুভূতি শরীরী আবেগের বাহন করে তুললেন।

কেঁদে ওঠে লতাপাতা
ফুল পাখি নদী জল
মেঘ বায়ু কাঁদে সবি অবিরল
কাঁদে বুকে উগ্র সুখে যৌবন-জ্বালায়-জাগা
অতৃপ্ত বিধাতা (পূজারিণী)

তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জিঞ্জির, সিন্ধু হিল্লোল, ঝিঙ্গে ফুল, বুলবুল, সঞ্চিতা, রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ, ব্যাথার দান। এছাড়া উপন্যাস—কুহেলিকা, মৃত্যুক্ষুধা, বাঁধন হারা, জীবনের জয়যাত্রা এবং নাটক—ঝিলিমিলি, আলেয়া। প্রবন্ধ-পুস্তিকা—দুর্দিনের যাত্রী, রুদ্রমঙ্গল। নজরুলের কাব্য হিন্দু-মুসলমানের মিলন-তীর্থ, সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আগ্নেয় বিদ্রূপবাণ—স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গণসঙ্গীত। তাঁর গানের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২–১৯২২) : আদি নিবাস বর্ধমান জেলায় চুপী গ্রামে। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যকৃতি রবীন্দ্র প্রভাবিত, কিন্তু ছন্দ বৈচিত্র্য ও বিষয়বস্তুর বিভিন্নতায় সত্যেন্দ্রনাথের রচনা একটি স্বতন্ত্র স্বীকৃতি লাভ করে। তাঁর কাব্যে স্বদেশপ্রেম, রাজনৈতিক আদর্শ, জ্ঞানবিজ্ঞানে গভীর আগ্রহ, নীতিবোধ ও প্রগাঢ় পল্লীপ্রেমের পরিচয় মেলে। সংক্ষিপ্ত আয়ুষ্কালের মধ্যে বিচিত্র ছন্দে বিচিত্র ভাষাশ্রিত বহু কবিতা তিনি রচনা করে গেছেন। তাঁর ছন্দ তাঁর 'ঝরণা' কবিতার মতই চঞ্চল। ছন্দে ও শব্দ-মূর্ছনায় যেন গিরি-দরী-বিহারিণী-হরিণীর-লাস্যে পাঠকের ধূসর-ঊষর চিত্তকে শ্যামার স্পর্শে শ্রীমন্ত করে তোলে। "সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর ছন্দ-সরস্বতীকে মনিবের বাস্তব ইতিহাসের সর্বাঙ্গীণ প্রগতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বন্দনা করিয়াছেন।" তিনি বিদেশী ভাষার কবিতা অনুবাদেও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সমসাময়িক মানুষ ও ঘটনা সম্পর্কেও তাঁর অনেক কবিতা আছে। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য রচনা : কাব্যগ্রন্থ—সবিতা, বেণু ও বীণা, তীর্থরেণু, কুহু ও কেকা, তুলির লিখন, হসন্তিকা। উপন্যাস—জন্মদুঃখী, বারোয়ারী, অনুবাদ নাট্যসংগ্রহ—রঙ্গময়ী। অনুবাদ নিবন্ধ—চীনের ধূপ। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত গ্রন্থ : বেলা শেষের গান, বিদায় আরতি, ধূপের ধোঁয়ায়, কাব্যসংগ্রহ, শিশু কবিতা, কাব্যসঞ্চয়ন ইত্যাদি।

সহমরণ কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ হিন্দু সমাজের কৌলীন্যপ্রথা ও সতীদাহের প্রতি বিদ্রূপবাণ হেনেছেন। 'দোরখা একাদশীতে' হিন্দু বিধবাদের জন্য বৈষম্য বিধানের জন্য বিধানদাতা সমাজপতিদের প্রতি কটাক্ষের বাণ নিক্ষেপ করেছেন।

দো-রোখা একাদশী

বিড়াল চাটে দুধের বাটি বাড়িয়ে দিয়ে গলা,
পিঁপড়ে মাছি আমের খোলায় উল্লাসে ভিড় করে,
শাস্ত্র যাদের ভয় দেখিয়ে করিয়েছে নির্জলা
তারাই শুধু হাতের চেটো মেলছে মেঝের পরে।
তৃষ্ণাতে জিভ টানছে পেটে এমনি রোদের তাত,
খসখসে দুই চোখের পাতা, হয় না অশ্রুপাত।

রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে তাঁর কবিতা—

কোন দেশেতে তরুলতা
সকল দেশের চাইতে শ্যামল
কোন দেশেতে চলতে গেলেই
দলতে হয়রে দূর্বাদল।

আজও শিশুদের মুখে মুখে আবৃত্ত হয়।

সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন—রবীন্দ্র অনুজাত ও নিষ্ঠাবান সমসাময়িক কবিদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথেরই বুদ্ধিবিদ্যার আয়োজন সবচেয়ে বেশী ছিল। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে গভীর আকর্ষণ ছিল এবং বর্তমান ইতিহাসের তিনি নিপুণ পর্যবেক্ষক ছিলেন। ছন্দ ও ভাষা দুইয়েতেই তাঁর কৌতূহলের অন্ত ছিল না। জীবনে সত্যেন্দ্রনাথের যে কৌতূহল ছিল তাহাও পুরাপুরি ভাবুকের ও ভোগীর নয়, অনেকটা কৌতূহলীর এবং খানিকটা তপস্বীর।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭—১৯৫৪) : জন্ম মাতুলালয়ে বর্ধমান জেলার পাতিলপাড়া গ্রামে। কর্মজীবনে ইঞ্জিনিয়ার ও সাহিত্যজীবনে প্রখ্যাত কবি। যতীন্দ্রনাথ দুঃখবাদী কবি; তিনি ঈশ্বরের করুণায় বিশ্বাস করতেন না। কবির মতাদর্শ ছিল—সকল কর্মের অধিকর্তা হিসেবে ঈশ্বরই কর্মকার। নির্যাতনের নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ইচ্ছাসুখে মানুষের জীবনে দুঃখ-যন্ত্রণা সৃষ্টি করে চলেছেন। নৈরাশ্যবাদী কবির কাছে দুঃখ ও ব্যর্থতাই জীবনের একমাত্র পরিণাম। তিনি তাঁর "লোহার ব্যথা" কবিতায় কামারের হাতে লোহার নির্যাতনের রূপকল্পনাকে আশ্রয় করে নিষ্ঠুর বিধাতার হাতে মানুষের জীবন-যন্ত্রণাকে চিত্রিত করেছেন।

ও ভাই কর্মকার—
আমারে পুড়িয়ে পিটানো ছাড়া কি নাইকো কর্ম আর?
কোন ভোরে সেই ধরেছো হাতুড়ি, রাত্রি গভীর হলো
ঝিল্লীমুখর স্তব্ধ পল্লী তোলো গো যন্ত্র তোলো।

'বানপ্রস্থ' কবিতায় বনকর্মচারীর জবানে কবির মনে এই ব্যথিত উপলব্ধি হয়েছে যে জীবিকার প্রয়োজনে অতিষ্ঠ মানুষের পক্ষে আর নির্জন বানপ্রস্থে সৌন্দর্য উপভোগ করার দিন শেষ হয়ে গেছে। 'হাট' কবিতাতে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কবি এই ভবের হাটে মানুষের লাভ লোকসানের হিসেব কষেছেন—

খোলা আছে হাট মুক্ত বাতাসে
বাধা নাই ওগো—যে যায় যে আসে
কেহ কাঁদে, কেহ গাঁটে কড়ি বাঁধে ঘরে ফিরিবার বেলা।
উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে চিরকাল একই খেলা।

কবির কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে আছে—মরীচিকা, মরুশিখা, মরুমায়া, কাব্য পরিমিতি, সায়ম্, অনুপূর্বা, গান্ধীবাণী, কণিকা, ত্রিযামা, নিনান্ডিকা। শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, ওথেলো এবং কালিদাসের কুমারসম্ভব প্রভৃতির অনুবাদ।

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত (১৮৯৩–১৯৮৬) : জন্ম উখড়া; পেশায় চিকিৎসক, নেশায় কবি। তাঁর কাব্যগ্রন্থ—সাঁঝের প্রদীপ, মন্দিরের চাবি, রবীন্দ্র-বৈজয়ন্তী এবং দীনেশ গুপ্তের শেষপত্র। তাঁর 'সাঁঝের প্রদীপ' ও 'মন্দিরের চাবি' ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২--১৯৭০) : জন্ম চণ্ডীমঙ্গল ও চৈতন্যমঙ্গল খ্যাত কোগ্রাম। পেশায় শিক্ষক। বাল্যকালেই তাঁর কাব্যপ্রতিভার বিকাশ ঘটে। তাঁর কবিতায় বৈষ্ণব ভাবাদর্শ এবং পল্লীপ্রকৃতির স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটেছে। লোচনদাসের স্মৃতিরেণুমাখা কোগ্রাম বৈষ্ণবকবির কাছে 'সোনার কোগা'—

চণ্ডী মায়ের সোনার কোগা তার বুকে যে থাকে,
ভোরে উঠেই 'লোচনদেব' এর চরণধূলা মাখে।

(হংসখেয়ারী)

'গ্রামের পথে' কবিতায় কবি এই কোগ্রামেরই বার বার জন্ম প্রার্থনা করেছেন :

ফিরে যদি জন্মাতে হয়, এই করুণা চাই
এই গ্রামেতেই দিয়ো দয়াল ফিরে আবার ঠাঁই।

কোগ্রামই কবির তীর্থভূমি :

তীর্থে ঘোরে নিত্য লোকে স্বর্গ লাগি হায়
স্বর্গ আসে দেখতে মর্‌ত মায়ের পদছায়। (গ্রামে)

বর্ষায় দুর্দম অজয়, গ্রীষ্মে যেন একেবারে নিরীহ, জলের রেখা খুবই সামান্য, প্রায় পুরো নদীগর্ভব্যাপী বিশাল চর। এই অজয়ের চর দেখে মুগ্ধ কবি লিখেছেন—

অজয়ের চর ভুলায় আমার মন
দর্শনীয়ের পাই সেথা দর্শন
তীর্থের ফল সেই দেয় মোরে আনি,
আমি তারেই কন্যাকুমারী জানি,
সেই মোর সেতুবন্ধ রামেশ্বর। (অজয়ের চর)

অজয় ও কুনুরের সঙ্গমে কোগ্রামে বসে যে কবিতা কবি রচনা করেছেন দিনের পর দিন তাতে বৈষ্ণব ভাবাদর্শ ও নির্জন গ্রামজীবনের সহজ সারল্য পরিস্ফুট। 'উজানী', 'একতারা' 'বনতুলসী' 'রজনীগন্ধা', 'শতদল', 'বনমল্লিকা', 'বীথি', 'বেণু', 'নুপুর', 'অজয়' প্রভৃতি ১৪টি কাব্যগ্রন্থ রচনা করে কবি কাব্যজগতে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"কুমুদরঞ্জনের কবিতা পড়লে বাঙলার গ্রামের তুলসীমঞ্চ, সন্ধ্যাপ্রদীপ, মঙ্গলশঙ্খের কথা মনে পড়ে।"

১৩২১ বঙ্গাব্দে বর্ধমানে অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন উপলক্ষে কবির রচিত 'আবাহন' কবিতা বর্ধমানের গৌরবগাথা।

কাশীরাম যেথা গাহিল প্রথম পীযূষ কাহিনী গাথা,
শ্রীকৃষ্ণদাস রচিল মধুর চরিতামৃত কথা,
প্লাবিত যে দেশ পতিত পাবন গোরার প্রেমের বানে।
যেখানে কোমল কমলাকান্ত মগ্ন আছিল ধ্যানে,
এই সেই দেশ, এস হে ভক্ত—পূজ্য অতিথি বেশে
'মুকুন্দ' 'জ্ঞান' লোচনানন্দ, বৃন্দাবনের দেশে।

ডঃ সুকুমার সেন কবির কাব্য সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, কুমুদরঞ্জনের কাব্য-শিল্প অত্যন্ত সরল ও নিরাড়ম্বর, কলা কৌশলের প্রচেষ্টাবিহীন। "আমার এ যে বাঁশের বাঁশি, মাঠের সুরে আমার সাধন—" রবীন্দ্রনাথের এই কথা আক্ষরিক অর্থে কুমুদরঞ্জনের কবিতার পক্ষে সত্য।

কবিশেখর কালিদাস রায় (জুলাই ১৮৮১—২৫.১০.১৯৭৫) : জন্মস্থান কাটোয়া থানার বুড়োশিব খ্যাত কড়ুই গ্রাম। তিনি ছিলেন একাধারে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, নিবন্ধকার ও প্রখ্যাত পল্লীকবি। শৈশব থেকেই তাঁর কাব্যপ্রীতি পরিলক্ষিত হয়। ১৮ বছর বয়সে তাঁর কাব্যগ্রন্থ "কুন্দ" প্রকাশিত হয়। তাছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কবিতা লিখতেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ—পর্ণপুট, খুদকুড়া, লাজাঞ্জলি, হৈমন্তী, বৈকালী, ব্রজরেণু, সন্ধ্যামণি, ঋতুমঙ্গল, চিত্তচিতা, রসকদম্ব, বল্লরী, পূর্ণাহুতি প্রভৃতি। কালিদাসও কুমুদরঞ্জনের মত বৈষ্ণব ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ কবি। তিনি ছিলেন চৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা লোচনদাসের বংশধর, তাঁর মাতৃকুলও বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত। তাঁর কাব্যে সহজ সরল আন্তরিকতার সুর পাওয়া যায়।

তিনি ছিলেন যতীন্দ্রমোহনের সমধর্মী। তাঁর 'পল্লীপ্রীতি রোমান্টিক রঙে রাঙানো।' তাঁর চাঁদ সদাগর—বজ্রজয়ী বনস্পতি, অভ্রভেদী তার ব্যক্তিত্ব—মানবাত্মার বিদ্রোহী রূপ—

দেবতা মন্দিরে ভরা সিন্দূর চন্দনে গড়া
বাণীতীর্থে উচ্চে তুলি শির,
তুমি দেবতারো বড়ো এ যুগের অর্ঘ্য ধরো
বন্দি সাধু চন্দ্রধর বীর।

তাঁর 'ছাত্রধারা' কবিতা শিক্ষকজীবনে ছাত্রদলের সঙ্গে সম্পর্কের স্মৃতিমন্ডিত।

বর্ষে বর্ষে দলে দলে আসে বিদ্যামঠতলে
চলে যায় তারা কলরবে,
কৈশোরের কিশলয় পর্ণে পরিণত হয়
যৌবনের শ্যামল গৌরবে।

... ...

আর সবি গেছি ভুলি ভুলি নি এ মুখগুলি,
একবার মুদিলে নয়ন
আঁখিপাতা ভারি ভারি ম্লান মুখ সাবি সারি
আকুল করিয়া তোলে মন।

সরল সহৃদয়তা কালিদাসের কাব্যকে এক বৈশিষ্ট্য দান করেছে। ১৩২১ সালে বর্ধমানে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে কবির কণ্ঠে বর্ধমানের যে গৌবব গাথা গীত হয়েছে তাহাও বৈষ্ণবোচিত ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ।

প্রেমের গোঁসাই ঠাকুর নিমাই লভিল এখানে বিরাগ দীক্ষা
লোচন এখানে লোচনের নীরে করে পথে পথে প্রেমের ভিক্ষা।
কবিরাজ আর দাস-গোবিন্দ রসের পাথারে ডুবালো বঙ্গে,
দাস নরহরি সব পরিহরি, হরি কীর্তনে নাচিল রঙ্গে।
এসো সুধীগণ মানস-মোহন
চাহ ভারতীর মিলনভবনে প্রেম ছলছল
উজ্জলা-নেত্রে।

তাঁর রচিত পুস্তক প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য, পদাবলী সাহিত্য, শরৎ সাহিত্য ও সাহিত্য প্রসঙ্গ বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তিনি বেতালভট্ট ছদ্মনামে অনেকগুলি রসরচনা করেছিলেন। এগুলি বহুজন সমাদৃত। শেষ জীবনে 'শরৎ সান্নিধ্যে' নামে একখানি বই রচনায় ব্রতী ছিলেন কিন্তু শেষ করতে পারেন নাই।

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩–১৯২২) : এর জন্ম বুড়ার গ্রামে। তাঁর 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' কাব্যগ্রন্থ তাঁকে কবিত্বের স্বীকৃতি দেয়।

মহারাজ বিজয়চন্দ্র : বিজয়গীতিকা রচনা করেন।

প্রবন্ধ সাহিত্য :

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ও কবিশেখর কালিদাস রায়ের প্রবন্ধ সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

অক্ষয়কুমার দত্ত : যে সকল মনীষীর আবির্ভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল পূর্বস্থলী থানার চুপী গ্রামের অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁদের অন্যতম। ১৬.৮.১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। রচনা-সম্ভারে ও পরিচালনার গুণে পত্রিকাটি অচিরাৎ শ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্রে পরিণত হয়। তিনি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' নামক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা-গ্রন্থের প্রথম ভাগ প্রকাশ করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানির সুদীর্ঘ উপক্রমণিকায় তিনি আর্যভাষা ও সাহিত্যের প্রধান শাখাত্রয় ইন্দো ইউরোপীয়, ইন্দো-ইরাণীয় এবং বৈদিক ও সংস্কৃত সম্বন্ধে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে জর্জ কুম্বের লেখা Constitution of Man অবলম্বনে রচিত বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ

বিচার ১ম ও ২য়, ধর্মনীতি এবং প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার প্রকাশ করেন। তাঁর লেখা চারুপাঠ ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ বিদ্যালয়ে পাঠ্য হতো। পদার্থবিদ্যা তাঁর অন্যতম প্রবন্ধ। তাঁর পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন প্রবন্ধ কৃষকদের দূরবস্থার প্রতি সজাগ ও সহানুভূতিশীল হৃদয়বৃত্তির পরিচায়ক। তাঁর গদ্যরীতি সহজ পরিমিত ও প্রকাশক্ষম। কিন্তু সাবলীলতার ও স্বচ্ছন্দগতির অভাব দেখা যায়। চারুপাঠ-এর কয়েকটি প্রবন্ধে বিশেষত 'স্বপ্নদর্শন' শীর্ষক রূপক প্রবন্ধে তাঁর সাহিত্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁর ভাষার নমুনা—ইহা সুপ্রসিদ্ধ যে বাঙ্গলাদেশের উর্বরা ভূমিই "অত্রত্য লোকের প্রধান উপজীবিকা। আমরা অরণ্যবাসি অসভ্য লোকদিগের ন্যায় মৃগয়া মাত্রোপজীবি নহি, ইংরাজদিগের ন্যায় শিল্পপ্রধানও নহি, দেশ দেশান্তর গমনপূর্বকবাহুল্যরূপে বাণিজ্য নির্বাহ করাও আমাদের বৃত্তি নহে।"

অজয়কুমার ঘোষ (২০.২.১৯০৯–১৩.১.১৯৩২) : বর্ধমান জেলার মিহিজামে জন্ম। পিতা চিকিৎসক শচীন্দ্রমোহন। পিতার কর্মস্থল কানপুরে লেখাপড়া শেখেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্ত প্রমুখের সঙ্গে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হন। যক্ষ্মায় রোগাক্রান্ত হলে দেউলী বন্দী নিবাস থেকে মুক্তি পান। World Marxist Review No. 2-তে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ Some features of Indian Situation ও Bhagat Singh and His comrades প্রকাশিত হয়। Marxist Miscellany Vol. 6. এ আদিবাসী সমস্যার উপর রচিত তাঁর প্রবন্ধ Notes on Chotonagpur and its people প্রকাশিত হয়। অন্যান্য বহু প্রবন্ধে তাঁর রাজনৈতিক মনীষার পরিচয় মেলে।

সাহিত্যাচার্য সুকুমার সেন : বিংশ-একবিংশ শতাব্দীর প্রবন্ধকারদের মধ্যে ডঃ সুকুমার সেন বোধ হয় শীর্ষস্থানীয়। প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক, মাসিক ও শারদীয়া পত্রিকার মধ্যে এমন পত্রিকা খুব কমই আছে যাতে ডঃ সেনের প্রবন্ধ নাই।

অন্যান্য প্রবন্ধকারদের সংখ্যা এত বেশী যে সকলের নাম উল্লেখ করা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নহে। শীর্ষস্থানীয় কয়েক জনের মধ্যে রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, বারিদবরণ ঘোষ, গোপীকান্ত কোঙার, অজিত হালদার, রামশঙ্কর চৌধুরী, ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা, ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, দেবিকা হাজরা, জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, রফিকুল ইসলাম, রমাকান্ত চক্রবর্তী প্রমুখ বহু বিশিষ্ট প্রবন্ধকার জেলার প্রবন্ধ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং অনেকে এখনও সারস্বত সাধনায় রত। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য 'হিন্দুদের দেবদেবী' গ্রন্থ তিনটি খণ্ডে প্রকাশ

করেছেন। 'সাহিত্যিক জীবনী অভিধান' রচনায় তিনি বর্তমানে আত্মনিয়োগ করেছেন।

অভিধান রচনায় আর এক সুপ্রতিষ্ঠিত নাম কাটোয়ার সুভাষ ভট্টাচার্য।

ইতিহাস ও গবেষণাগ্রন্থ :

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬০–১৯২৯) : কাটোয়া থানার দুর্গাপুর গ্রামের কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় বাংলাদেশের একটি প্রামাণ্য ইতিহাস রচনায় ব্রতী হন। তাঁর পরে রমেশচন্দ্র মজুমদারের বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩৫২ বঙ্গাব্দে এবং শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষের বাংলা ভাষায় মধ্যযুগে গৌড় প্রকাশিত হয় ভাদ্র ১৮৮১ শকাব্দে। কাজেই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় বাংলার ইতিহাস লেখার কৃতিত্ব কালীপ্রসন্নের। কালীপ্রসন্নের দুই সুযোগ্য ছাত্র রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়। মুসলমান আমলের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের গ্রন্থিমোচনে অগ্রসর হয়ে তিনি মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস—'নবাবী আমল' (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯০৯) রচনা করেন। এক বিশিষ্ট প্রবন্ধ-লেখক হিসেবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। সাহিত্য ও নারায়ণ পত্রিকায় তাঁর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

দুর্গামোহন লাহিড়ী (১৮৫৮?–১৯৩২) : নবদ্বীপের নিকটবর্তী চক ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় জন্ম হলেও কর্মসূত্রে কাটোয়ানিবাসী দুর্গামোহন লাহিড়ীর সর্বপ্রধান কীর্তি পৃথিবীর ইতিহাস রচনার প্রয়াস। কিন্তু 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' সাতখণ্ডে সমাপ্ত করেই তিনি মারা যান। তিনি সোমপ্রকাশ ও সুলভ সমাচার পত্রিকাতেও প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর অন্যান্য লেখা ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে আছে দ্বাদশ নারী, নির্বাণ জীবন, ভারতে দুর্গোৎসব, স্বাধীনতার ইতিহাস প্রভৃতি।

বলাই দেবশর্ম্মা মহাশয় কংগ্রেসের জেলা সম্মেলনে বর্ধমান ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (১৯৭৪)।

বর্ধমান জেলার ইতিহাস পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ করেন অনুকূলচন্দ্র সেন ও নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়। অনুকূলবাবু ছিলেন সেটেলমেন্ট অফিসার ও এর পূর্বে ছিলেন খাদ্যসংগ্রহ বিভাগের A.R.C.P (Asstt. Regional Controller of Procurement)। নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় স্বাধীনতা সংগ্রামী ও পণ্ডিত ব্যক্তি। উভয়ের অভিজ্ঞতা দিয়ে তাঁরা বইটিতে বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আরও বিস্তৃত বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করতে পারতেন। এরপর

সি.এম.এস স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ও কংগ্রেসকর্মী সুধীর দাঁ মহাশয় তার 'বর্ধমান পরিক্রমা' প্রকাশ করেন। এর পর ক্ষীরগ্রামের (অধুনা ভদ্রকালী হুগলী) যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী মহাশয় বিরাট তথ্যের সম্ভার দিয়ে তিন খণ্ডে তাঁর 'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি' গ্রন্থ (১৯৯০–১৯৯৪) প্রকাশ করেন। তাঁর পুস্তক থেকে অনেক গবেষক বর্ধমান সম্পর্কে অনেক তথ্যের সন্ধান পাবেন। কালনার দীপক দাস ১৯৯৫ সালে 'কালনার ইতিবৃত্ত' প্রকাশ করেন। বইটিতে কালনা সম্পর্কে কিছু নূতন তথ্য পাওয়া যাবে। বর্ধমানের সন্তান গোলাম আহম্মদ তাঁর 'ইসলামের ইতিহাস' গ্রন্থে মুসলমান সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছেন। সৈয়দ আবদুল হালিম সাহেব দুই খণ্ডে ইসলামের ইতিহাস (সংক্ষিপ্ত সংস্করণ) প্রকাশ করে ইসলাম ধর্ম, সংস্কৃতি ও আদর্শ এবং এর মূল্যায়নকে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। হালিম সাহেব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে যথাসম্ভব নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইসলামের আদর্শ বিশ্লেষণ করেছেন। বইটির প্রথম খণ্ডে বহির্ভারতীয় পটভূমিকায় ইসলামকে দেখানো হয়েছে; দ্বিতীয় খণ্ডে ভারতীয় ও বঙ্গদেশীয় পটভূমিকায় এই আদর্শকে দেখানো হয়েছে। হালিম সাহেব নিজ ব্যয়ে বইটি প্রকাশ করেন ও প্রচারের জন্য বিনামূল্যে গ্রন্থটি বিতরণ করেন।

ইতিহাস কিন্তু কেবলমাত্র তথ্যের সমাবেশ নয়। History is never a simple set of given facts, it is always open to diverse readings and interpretations which however must always ramain open to the list of available evidence. (Prof. Sumit Sarkar on Towards Freedom). আর 'Culture' is the arts and other manifestations of human intellectual achievements regarded collectively. এই নিরিখে বর্ধমানের ইতিহাস বা ইসলামের ইতিহাস কতখানি ইতিহাস ও কতখানি সংস্কৃতি হয়েছে সে বিচার করার ক্ষমতা আমার নাই। যদি আমার এই ইতিহাস কোন দিন গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে আমাকেই হয়ত একদিন পাঠক ও সমালোচকদের আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতে পারে।

গবেষণাগ্রন্থ :

সাহিত্যচার্য সুকুমার সেন (১৯০০–১৯৯২) : বিশিষ্ট সাহিত্যিক. সমালোচক, ও ভাষাতত্ত্ববিদ্ এবং বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক। চার খণ্ডে প্রকাশিত "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস", তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের সাক্ষ্য বহন করে। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর রচনা সর্বদা প্রামাণ্য বিবেচিত হয়। ভাষা

বিষয়ে নানা রচনা ছাড়াও ভূতের গল্প, রহস্য রোমাঞ্চ রচনাতেও তাঁর সমান কৃতিত্ব। তাঁর রচিত বিশাল গ্রন্থরাজির মধ্যে ভাষার ইতিবৃত্ত, বাংলার সাহিত্য-ইতিহাস, ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, চর্যাগীতি পদাবলী, প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী, ইসলামী সাহিত্য, বিচিত্র সাহিত্য, বঙ্গ ভূমিকা, ক্রাইম কাহিনীর কুলুজী, চৈতন্যাবদান, Women's dialect in Bengal, A history of Brajabuli Literature, old Persion Inscription of the Achamenian Emperors, Comparative Grammar of Middle Indo-Aryan, An Etymological Dictionary of Bengal, কালিদাস তাঁর কালে, 'যিনি সকল কাজের কাজি', 'সত্যমিথ্যা', 'কে করেছে ভাগ', 'বাংলা স্থাননাম,' 'ভারত কথা' গ্রন্থিমোচন, আত্মজীবনমূলক গ্রন্থ—"দিনের পরে দিন যে গেল" (দুই খণ্ডে) প্রভৃতি কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করা গেল। সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থ ছাড়াও তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়—বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, রূপরামের ধর্মমঙ্গল, সেখ শুভোদয় প্রভৃতি। তাঁর 'সাহিত্য-ইতিহাস' সম্পর্কে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু মন্তব্য করেছেন—

"অধ্যাপক সেনের বই পড়তে পড়তে আমি প্রাকৃত ও অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করে আগ্রহবোধ করেছি। যথারীতি আমরা প্রথমে পাই ধর্মঘটিত গান, গীতি ও আধ্যাত্ম কবিতা। তারপরে পদ্য কাহিনী, ক্রমশ সাহিত্যে ব্যবহার্য গদ্য বিকাশমান হলো, তারপরে এলো নাটক, এবং অবশেষে উপন্যাস গল্প। প্রাচীন লেখকদের সম্বন্ধে অধ্যাপক সেন অনেক খুঁটিনাটি তথ্য দিয়েছেন ...ভারতীয় সাহিত্যে যাঁদের আগ্রহ আছে তাঁদের সকলকে আমি এই বইটি পড়তে অনুরোধ করি।"

রামচন্দ্রপুর নিবাসী ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য কিছু গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন; তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে কৃষ্ণরাম দাসের রামমঙ্গল (১৯৫৮), মধুসূদন সাহিত্য পরিক্রমা (১৯৬৫), রামপ্রসাদের জীবনী ও রচনা (১৯৭০) উল্লেখযোগ্য।

আবদুস সামাদ তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ 'রাজসভাশ্রিত বাংলাসাহিত্য' রচনা করে কবি সাহিত্যিক পোষ্টা বর্ধমানের মহারাজাদের বিদ্যা, সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি এবং তাঁদের বিদ্যোৎসাহিতাকে তুলে ধরেছেন। ডঃ সুকুমার সেনের কথায় "কালিদাস যেমন বিক্রমাদিত্যের সংসারের পরিচয় দিয়েছিলেন, ইনিও তেমনি কবি সাহিত্যিকের পোষ্টা বর্ধমান রাজসভার বিদ্যা ও সুন্দর দুইয়েরই পৃষ্ঠপোষক। বর্ধমান রাজবাড়ীর সম্পূর্ণ দলিল প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহার (সামাদ সাহেবের) গ্রন্থ বাঙালীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক চিরস্থায়ী আকরগ্রন্থ হইয়া সমাদৃত থাকিবে।"

ড: আদিত্য মজুমদার, ড: রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও ড: বারিদবরণ ঘোষের অনেক প্রবন্ধ সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ড: আদিত্য মজুমদার ও সুধীর অধিকারীর যুগ্ম-সম্পাদনায় "শরৎ-জিজ্ঞাসা" শরৎ সাহিত্য সম্পর্কিত বিভিন্ন লেখকের তেরটি প্রবন্ধের সংকলন ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বইটি শরৎ সাহিত্যের গবেষকদের সাহায্য করবে।

গোপীকান্ত কোঙার "বর্ধমান জেলার মেলা"—সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা গ্রন্থে জেলার ৪৮২টি মেলা সম্বন্ধে বহু তথ্য ও তার সমাজতান্ত্রিক গুরুত্ব ও এর মধ্য দিয়ে সমাজের জীবন তুলে ধরেছেন। ডঃ কবিতা সিংহ বর্ধমানের সাময়িক পত্র-পত্রিকা নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন। ভিরিঙ্গি (দুর্গাপুর)-এর জাতীয় শিক্ষক ড: সুশীল ভট্টাচার্যের গবেষণামূলক গ্রন্থ 'নজরুলের জীবন ও সাহিত্য,' 'জীবনানন্দ পরিক্রমা', 'চিত্তরঞ্জন : জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থগুলি জীবনী ও সাহিত্য সম্পর্কিত সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার হবার পর থেকে জেলায় সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বহু বিদগ্ধ ব্যক্তি বহু বিষয়ে গবেষণা করেছেন, অনেকের গবেষণাপত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে, অনেকের হয় নাই। এঁদের সংখ্যা এত বিশাল যে সকলের তথ্য সংগ্রহ করাও কঠিন ও সকলের বিষয় আলোচনা করার স্থানও এটা নয়।

বর্তমানে পুরানো দিনের পত্রপত্রিকা থেকে বাছাই করা গল্প প্রবন্ধ নূতন আঙ্গিকে পুনঃপ্রকাশ করে সে কালের পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ে বিদগ্ধ সাহিত্যিকের সাহিত্যকৃতির সঙ্গে একালের পাঠকদের পরিচিত করে দেবার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। এ বিষয়ে এ জেলায় অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছেন বারিদবরণ ঘোষ, বিজিতকুমার দত্ত, গোপীকান্ত কোঙার প্রমুখ। তাঁদের প্রচেষ্টার ফলে বিজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত 'সবুজপত্র সংগ্রহ': বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত "ভারতবর্ষ" গল্প সংকলন ও প্রবন্ধ সংকলন ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। এর থেকে গবেষকগণ তাঁদের গবেষণা-কার্যে অনেক তথ্যের সন্ধান পাবেন, নতুন লেখকেরা লেখার আদর্শ ও দৃষ্টান্ত খুঁজে পাবেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও স্বাতী ঘোষের উদ্যোগে পুঁথি সংগ্রহের কাজ চলছে এবং বহু পুঁথি সংগৃহীত ও সম্পাদিত হয়েছে। সাহিত্যে গবেষণার ক্ষেত্রে এইসব পুঁথির অবদান অপরিসীম।

দুই অধ্যায়

নাটকের বিবর্তন, জেলার নাটক ও নাট্য-আন্দোলন

নাটক কথাটি এসেছে নৃৎ ধাতু থেকে। মানুষ অপরের কথা, কথার সুর, ভাবভঙ্গী, ছন্দ নকল করতে ভালবাসে। এই অনুচিকীর্ষা থেকেই নাটকের উৎপত্তি। আদিম কাল থেকে লোকে ধর্মানুষ্ঠান, ক্রিয়ানুষ্ঠানে নৃত্যের দ্বারা ধর্মভাব ও হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করত। গানের সঙ্গে তালে তালে নৃত্যই নাটকের বীজ।

যাত্রা, নাটক অভিনয়ের মাধ্যম—এই যাত্রার অর্থ গমন। পুরাকালে কোন পূজা বা উৎসব উপলক্ষে এক পূজার স্থান থেকে অন্যত্র গিয়ে নৃত্য-গীত পরিবেশন করার রীতি ছিল। এই যে এক উৎসবের স্থানে নৃত্যগীত সেরে অন্য উৎসবের স্থানে গিয়ে সেখানে নৃত্যগীত করার যে রীতি, তাকেই কেন্দ্র করে 'যাত্রা'র উদ্ভব। নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর বিশ্বকোষের ১৫শ খণ্ডে বলেছেন—"যে দেব চরিত্রাংশ অতি গভীর পূজা, আড়ম্বর ও ভক্তিসহ আনন্দতরঙ্গে নাচগান বিমিশ্রিত হইয়া লোক-সমাজে প্রকটিত হয় তাহাই যাত্রা।"

শিব শস্যের দেবতা—গ্রাম বাংলায় শিবের গান উপলক্ষে গম্ভীরা ও বোলান নৃত্যগীতের প্রচলন ছিল।

নাটকের সূচনার অনেক আগে থেকেই গম্ভীরা গানের মতই বোলান গানের অনুষ্ঠান হতো, শিবকেন্দ্রিক বোলান গানেও অনেক সময় রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা সম্পর্কিত নৃত্যগীত পরিবেশিত হত। ভক্ত্যারা যৌথভাবে এই গানে অংশগ্রহণ করতো। প্রধানত মুর্শিদাবাদ অঞ্চলেই বোলান গানের প্রাধান্য থাকলেও কাটোয়া অঞ্চলে এমনকি বর্ধমানে কুড়মুনের ঈশানেশ্বরের গাজনেও এক সময় বোলান গানের প্রচলন ছিল। এই বোলান গানের জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান দেখা যায় উদ্ধারণপুর ঘাটে—এখানকার বোলান গানে ৪টি ভাগ লক্ষ্য করা যায়। (১) ডাক (২) পোড়ো (৩) পালন্দ (৪) সাঁওতাল। বোলান গানের মত ময়ূরপঙ্খী গানের কোথাও কোথাও চল ছিল। এখনও রায়না থানার নাড়ুগ্রামে নাড়েশ্বর

শিবের গাজনে ময়ূরপঙ্খী গানের রেওয়াজ আছে। জামালপুর, রায়না প্রভৃতি ব্লকে গ্রামের দুটি পাড়ার মধ্যে ময়ূরপঙ্খীর গানের লড়াই হয়। গরুর গাড়ির ওপর বাখারি দিয়ে কাঠামো তৈরী করে রঙিন কাগজে সাজিয়ে ময়ূরপঙ্খী নৌকো তৈরী করা হয়। ময়ূরপঙ্খীর মাঝখানে ভক্ত্যারা ও বাদকের দল বসে। বাজনার মধ্যে ঢোল ও কাঁশি। যে কোন গান 'আরে ঐ' বলে একটানা সুর লাগানো হয়। অপর দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা হয়। শুরুতে বন্দনা গান। এক দল কৃষ্ণের ভূমিকা নেয়, অন্য দল বৃন্দা বা রাধার ভূমিকা নেয়। রাধাকৃষ্ণের এই উক্তি প্রত্যুত্তরই হলো নাটকের সংলাপের অঙ্কুর। অন্য ধরনের নাটকের শিকড়ের সন্ধানে লেটো গানের উল্লেখ করতে হয়। এ সম্পর্কে সাহিত্যাচার্য সুকুমার সেন লিখেছেন—খ্রীষ্টপূর্ব কাল থেকে আমাদের দেশে যে ধরনের নাট্যকর্ম পণ্ডিতদের অগোচরে একটানা চলে এসেছে বলা যায় তার জের পশ্চিমবঙ্গে হুগলী জেলায় দামোদর উপত্যকায় ও কাছাকাছি অঞ্চলে মুসলমান গুণীদের মধ্যে সেদিন পর্যন্ত চলে এসেছে। এ হলো নেটো বা নাটুয়া বৃত্তি, নাট্যকর্ম। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত নেটো সর্বসাধারণ্যে প্রচলিত ছিল। নাট্যো থেকে অপভ্রংশ লাট্য থেকে লেটোর উৎপত্তি বলে মনে করা হয়। নাটকে দুই কুশীলবের সংলাপের সূচনা ও লেটোর অনুষ্ঠানে দুই প্রতিযোগী দলের সংগীতযুদ্ধের মধ্যে নাটকের সংলাপের উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম জীবনে লেটো দলে যোগ দেন এবং লেটো দলের জন্য তিনি গানও লিখতেন। বস্তুত নাট্যবোধের উন্মেষ এই লোকায়ত নাট্য লেটো গানের মাধ্যমেই। এই লেটো গানের পরিণতি গীতিনাট্যের গীতিময়তা যা লোকনাট্যের স্বভাবধর্ম।

নাটকের উদ্ভবের ক্ষেত্রে চণ্ডীমঙ্গলের পালা গান, মনসামঙ্গলের ভাসান গান, কৃষ্ণলীলাবিষয়ক ঝুমুর, ধামালী গানের লৌকিক নৃত্য-গীতের প্রভাবও বর্তমান। এরপর রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনীর অভিনয়ের দ্বারা লোকজনের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থাও প্রচলন হয়। মহাপ্রভু স্বয়ং যাত্রাগানের মাধ্যমে কৃষ্ণলীলা অভিনয় করতেন।

মহাপ্রভুর পরে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক অভিনয়কে কেন্দ্র করে কালীয় দমন বা কৃষ্ণযাত্রার উদ্ভব হয়। "শ্রীকৃষ্ণেব রাসচক্রে গমনরূপ ব্যাপার রাসযাত্রা নামে প্রসিদ্ধ।"

শারদীয়া যুগান্তরে (১৩৭৬) নন্দলাল ভট্টাচার্য মহাশয় যাত্রার ক্রমবিবর্তন প্রবন্ধে বলেছেন—"যাত্রার শিকড় ১৪শ, ১২শ বা আরও গভীরে প্রবেশ করলেও, যাত্রার বীজ বাংলার মাটিতে বপন করা হয়েছিল ১৬শ শতাব্দীতে এবং তার অঙ্কুর হয় ১৯শ শতাব্দীতে।"

কৃষ্ণ-যাত্রার ক্ষেত্রে ১৯শ শতকের শেষে খ্যাতি অর্জন করেন বর্ধমান জেলার ধবনী গ্রামের নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (কণ্ঠমশাই)। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন অসাধারণ সঙ্গীতপ্রিয়। এই সঙ্গীত প্রিয়তার জন্যই তিনি গোবিন্দ অধিকারীর দলে যোগ দেন। হুগলীর অন্তর্গত জঙ্গীপাড়ার এই গোবিন্দ অধিকারী জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাত্রা-দলে 'ছোকরা' খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বর্ধমান রাজবাড়ীতে গোবিন্দ অধিকারীর একচেটিয়া গাওন ছিল। এছাড়া কাটোয়ার পীতাম্বর ও বিক্রমপুর নিবাসী কালাচাঁদ, পাতাইহাটের প্রেমচাঁদ অধিকারী কৃষ্ণযাত্রায় স্ব-স্ব পালা গেয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন। গোবিন্দ অধিকারীর মৃত্যুর (১২৭১ বাংলা/১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ) পর দাশরথি রায়ের ভাবশিষ্য কণ্ঠমশাই (১৮৪১—১৯১২) স্বতন্ত্র দল গঠন করে দলের অধিকারী হন এবং বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও বাঁকুড়ায় কৃষ্ণযাত্রায় 'দূতী'র ভূমিকায় অভিনয় করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁকে 'গীতরত্ন' উপাধি দেন। নীলকণ্ঠের দুই ভাই শ্রীকণ্ঠ ও সিতিকণ্ঠ—যাত্রাগান করতেন।

কৃষ্ণযাত্রা ছাড়াও তখন রামযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা, মনসার ভাসান যাত্রারও প্রচলন ছিল। তখনকার দিনে যাত্রার মধ্যে বেশভূষার কোন পারিপাট্য ছিল না; সাজের মধ্যে কৃষ্ণের জরি পাড় দেওয়া পুরনো হলদে রঙের সস্তা রেশমী কাপড়, আর যশোমতী, বৃন্দা ও অন্যান্য সখী এবং রাখাল বালকদের লাল, সবুজ কাপড়ের ঘেরাটোপ কতকটা পায়ের দিকে চোঙার মত করে কাপড় পরানো হতো। কাঁচা পাট দিয়ে মুনিঋষিদের দাড়ি ও পাকানো পাট দিয়ে মাথার জটা হতো। বাজনার মধ্যে খোল, করতাল ও বেহালা—কালীয় দমন, পুতনা বধ, কংসবধ এই সব পালা হতো। মাঝে মাঝে ২/৪টি কথা আর বাকী সব গান। যাত্রার আসর হতো চারদিকে চারটি বাঁশ ও মাঝখানে ২টি অপেক্ষাকৃত লম্বা বাঁশ পুঁতে দুই লম্বা বাঁশের মাথায় একটা বাঁশের 'পাড়' দিয়ে তার ওপর ছেঁড়া ত্রিপল বা চটের ত্রিপল খাটিয়ে দেওয়া হতো। আলোর মধ্যে একটা হ্যাজাক বা ডে-লাইট। ঘন্টা দুই গান হতো।

কৃষ্ণযাত্রা বা কালীয়দমন যাত্রার অনুসরণে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে 'সখের যাত্রা' নামে এক নতুন ধারা গড়ে ওঠে। সখের যাত্রার মধ্যে 'বিদ্যাসুন্দর যাত্রা' বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। ১৮২৬ সালের সমাচার চন্দ্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদে জানা যায় "সম্প্রতি আমাদের সমক্ষেও 'সখের যাত্রা' প্রদর্শিত হইয়াছে। এগুলি সর্বাঙ্গসুন্দর না হলেও লোকের আনন্দবর্ধন করিয়াছিল।"

২০/২/১২৬৫ বা ১.৬.১৮৫৮ তারিখের সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়—"...নাটক সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমরা প্রভাকরের যে

অভিপ্রায় প্রকাশ করি; তাহা স্পষ্টই এমত লিখিয়াছি যে অঙ্গভঙ্গী ও বাক্যচ্ছটা দ্বারা আপন মনোগত ভাব, শ্রোতৃবর্গের অন্তঃকরণে প্রতিভাত করাই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং যে নটবর এ বিষয়ে কৃতকার্য হন, তিনিই যথার্থ নট, নচেৎ অভ্যস্ত গদ্য-পদ্যগুলির মুখ হইতে নির্গত করিলেই নাটকের অভিনয় হইল না।

এই নিয়মে এই অভিনয়-ক্রিয়া পরীক্ষা করিয়া আমরা অতীব সন্তুষ্ট হইলাম। ...অতএব এই বলিয়া প্রস্তাব শেষ করি যে এই সাধু বালকদিগের সদ-দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া অপর গ্রামস্থ বিদ্যামোদী ছাত্রগণ এই বিশুদ্ধ আমোদ প্রথা প্রচলিত করুন।"

বিদ্যাসুন্দর যাত্রার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এক আসরে প্রাচীন রাসযাত্রার এক অঙ্কের অভিনয় করার পর, পরের অঙ্কের অভিনয় অন্য জায়গায় হতো। এর অনুসরণে নলদময়ন্তী যাত্রাও গড়ে ওঠে। বিদ্যাসুন্দর পালার জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হাল্কা বা হাস্যকর গান রচিত হতো। যেমন :

গা তোলরে নিশা অবসান প্রাণ
বাঁশ বনে ডাকে কাক মালী কাটে কপি শাক
গাধার পিঠে কাপড় দিয়ে রজক যায় বাগান।

ইতিমধ্যে কোন কোন স্থানে রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হতে থাকে। বিংশ শতকের তিরিশের দশকে বর্ধমানে দুটি মঞ্চ ছিল। শহরের এক প্রান্তে বোরহাটে মহারাজ বিজয়চাঁদ প্রতিষ্ঠিত "বিজয় থিয়েটার" আর অপর প্রান্তে জগৎবেড়ে 'ব্রজেন্দ্র থিয়েটার'। এই সব রঙ্গমঞ্চে গিরীশ-অমৃত-দ্বিজেন্দ্রলাল-এর নাটকের অভিনয় হত। এই সমস্ত নাটকের অভিনয়ের অনুকরণে আর এক নতুন ধরনের যাত্রার উদ্ভব হলো। এই নতুন প্রকৃতি বিশিষ্ট যাত্রা অপেরা বা গীতাভিনয় নামে পরিচিত ছিল। রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকের অনুকরণে এখন থেকে নাটকে অঙ্ক দৃশ্য বিভাগ শুরু হয়। বর্তমানে এই জাতীয় নাটকের ধারা অব্যাহত আছে।

বর্তমানে যাত্রা এক জনপ্রিয় লোকসংস্কৃতি। চারদিকে খোলা সাজসজ্জাহীন মঞ্চে নাচ গান ও জোরালো অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের মন জয় করাই যাত্রার উদ্দেশ্য। তবে যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে যাত্রার সাজসজ্জা, সংলাপ, উপস্থাপনা, বিষয়বস্তু সব কিছুরই পরিবর্তন ঘটেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার ভাতছালা নিবাসী মতিলাল রায় (১৮৪২—১৯০৮) যাত্রাশিল্পের যুগান্তর ঘটান। তিনি ছিলেন একাধারে পালাকার ও অভিনয়-শিল্পী। ধর্মীয় কাহিনী ছাড়াও ঐতিহাসিক এমন

কি রাজনৈতিক কাহিনী অবলম্বন করে এ সময় যাঁরা পালা রচনা করতেন মতিলাল ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি নিজে যাত্রার দল গঠন করেন এবং গীতাভিনয় বা অপেরা যাত্রা রচনা করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। তাঁর রচিত পালাগানের মধ্যে কথকতা ও পাঁচালীর মিশ্রণ ছিল।

মতিলালের প্রতিভা ছিল, এই প্রতিভার সাহায্যে তিনি যাত্রাগানে নতুন নতুন বিষয়ের অবতারণা করেন। যাত্রার মধ্যে ছেলেব দলের গানের অবতারণা করে গানের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য আনেন। জুড়ি গানের সঙ্গে একক গান, সখীদের নাচগান আমদানী করে তিনি যাত্রাকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তোলেন।

এ সময় মঞ্চ গড়ে ওঠায় যাত্রার আকর্ষণ খানিকটা কমতে থাকে। তখন যাত্রাগানকে মঞ্চের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখার জন্য একটা মধ্যপথ অবলম্বন করা হলো। জুড়ি উঠে গেল, গানের সংখ্যা কমানো হলো আর সংলাপের মধ্যে নাটকীয়তার ওপর জোর দেওয়া হলো।

বিংশ শতকের ত্রিশ-চল্লিশ দশকে দেখেছি গ্রামে-গঞ্জে কোন গ্রাম্যদেবদেবীর পূজা বা কোন উৎসব উপলক্ষে কলকাতা থেকে পেশাদারী যাত্রা কোম্পানীকে বায়না করে আনা হতো। এই সব যাত্রাদলের মধ্যে ছিল ত্রৈলোক্যতারিণী দল, একেবারে মহিলা অভিনেত্রী দিয়ে সম্পূর্ণরূপে মহিলা পরিচালিত দল। অন্যান্য দলের মধ্যে গণেশ অপেরা, সত্যেম্বর অপেরা, নট্ট কোম্পানী। তখনকার যাত্রায় এখনকার মত টিকিট কেটে যাত্রা শোনার রীতি ছিল না। গ্রামের সমস্ত লোকদের মিটিং করে সাধ্য অনুযায়ী ঘর পিছু চাঁদা তুলে যাত্রার খরচ তোলা হতো। সমাজে যারা অবহেলিত তারাও হয় শ্রমদান করতো কিংবা নিজেদের গরুর গাড়ী দিয়ে দলকে স্টেশন থেকে গ্রামে নিয়ে আসতো। এই সব যাত্রার নাটক পাঁচ এমন কি ছয় অঙ্কের হতো। প্রত্যেকটি অঙ্ক আবার দৃশ্য-গর্ভাঙ্কে বিভক্ত ছিল। যাত্রার আসর চারদিক খোলা—মঞ্চটির চারদিকে বাঁশের বাখারী দিয়ে ঘেরা, তার মধ্যে শতরঞ্জ বিছিয়ে রাজা রানীর দুটি চেয়ার জরির চাদর দিয়ে ঢাকা—রাজোচিত হওয়া চাই। আর আসরের চারদিকে ডে-লাইট। যাত্রা আরম্ভ হতো রাত্রি ৯ টায়, শেষ হতে মাঝে মাঝে সকাল হয়ে যেত। মঞ্চের একদিকে বাদ্য-বৃন্দের আসন। একজন প্রম্পটারও থাকতো। এখনকার মত মাইকের কোন ব্যাপারই ছিল না। ইন্দুবাবু (পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়), বড় ফণী (ফণিভূষণ বিদ্যাভূষণ), ছোট ফণী (ফণীন্দ্র মতিলাল) এরা যখন আসরে ঢুকতেন, আসর মাত করে দিতেন। এদের গলার আওয়াজ রাত্রে এক মাইল দূর থেকে শোনা যেত। যাত্রায় সখীদের নৃত্য ও দুই অঙ্কের মধ্যে একক নৃত্যের দ্বারা শ্রোতাদের মন জয় করার চেষ্টা হতো। দলে

অভিনেত্রী থাকতো না। ছেলেরাই মেয়ে সাজতো। এই সব আসরে কর্ণার্জুন, তরণীসেন বধ, সিরাজউদ্দৌলা, আওরঙ্গজেব, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি পালার অভিনয় হতো। বিবেকের গান অতি অবশ্যই থাকবে। বিবেক যাত্রার আসরের ১০০ ফুট দূর থেকে উদাত্ত স্বরে গান করতে করতে আসরে ঢুকতো। বিবেকের ভূমিকা ছিল মূল অভিনেতা-অভিনেত্রীর বিবেক সচেতকের। সঙ্গীতের মাধ্যমে অধর্মাচারী রাজাদের বিবেককে সচেতন করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। লোকে নাটক দেখে ও যাত্রা শোনে। সেজন্য গান যাত্রার অপরিহার্য অঙ্গ।

এদের দেখাদেখি গ্রামে ক্লাব গঠন করে পাড়ায় পাড়ায় সখের যাত্রার প্রচলন হয়। এই সমস্ত ক্লাবে গ্রামের কোন উৎসব উপলক্ষে বিশেষত দুর্গাপূজার আগে থেকে পাঠ লেখা, কুশীলব নির্বাচন করা, পাঠ বিতরণ করা হতো। এরপর রীতিমত মাসাবধি রিহার্সাল দিয়ে কালীপুজোয় অভিনয়ের ব্যবস্থা হতো। একজন মাইনে-করা গানের মাস্টার রাখা হতো—অভিনয়ের তালিম দেবার জন্য মোশান মাস্টার থাকতো। মান যে খুব উন্নত ছিল বলা যায় না, নিজেদের রান্না 'আলুনি' হলেও উপাদেয় মনে হয়। যাত্রাকে উপলক্ষ করে গ্রামে মাসাবধি কাল আনন্দ উৎসাহের জোয়ার বয়ে যেত। এ সব যাত্রায় দুই অঙ্কের মাঝখানে এক একটা বিশেষ নাচের ব্যবস্থা থাকতো। সে সব মজার নাচ। কোন যুবক মেয়ে সেজে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে থালা, পিলসুজ এই সব নিয়ে নাচের কেরামতি দেখাতো। দু হাতে থালা নিয়ে কিংবা মাথায় পিলসুজ রেখে খানিকটা ব্যালান্সের নাচ। শ্রোতারা খুব উপভোগ করতো।

যাই হোক জেলায় যাত্রায় বিবর্তনের কথায় ফিরে আসি।

একালেব যাত্রার বিষয়বস্তুর বিবর্তন পসঙ্গে অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। "যাত্রার বিষয়বস্তু আজ পুরাণ ও ধর্মগ্রন্থ থেকে বেশী নেওয়া হয় না। কিছুকাল আগে পর্যন্ত ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুরই প্রাধান্য দেখা যেত। ঐসব ঐতিহাসিক কাহিনীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ, বাঙালীর স্বাজাত্য চেতনা। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রভৃতি আদর্শ জোরালোভাবে প্রচার করা হতো। অর্থাৎ ঐতিহাসিক নাটকের যুগ শেষ হয়ে যাবার পর কয়েক বছরের মধ্যে ইতিহাসের বীর রসাত্মক উদ্দীপনা ও গৌরবজনক আদর্শ বজায় রাখা হয়েছিল। সামাজিক নাটকে পারিবারিক মূল্যবোধ, নীতি ও আদর্শ বেশীর ভাগ নাটকে বজায় রাখা হয় বটে, কিন্তু সাম্প্রতিক অনেক নাটকে মূল্যবোধ ও আদর্শ সম্পর্কে সংশয়, প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ ফুটে ওঠে। মার্ক্সবাদী চিন্তার প্রভাবে সমাজ বিপ্লবের অগ্নিময় চিত্রও অনেক নাটকে দেখা যায়। যাত্রার সীমানা এখন বিশ্বের আঙিনায় প্রসারিত হয়েছে।"

মতিলাল রায়ের কথা বলা হয়েছে। এই মতিলাল ছিলেন একাধারে পালাকার ও অভিনয়-শিল্পী। ধর্মকাহিনী নিয়ে তিনি অনেক পালা রচনা করেন। জেলায় তাঁর রচিত পালার মধ্যে সীতাহরণ, ভরতাগমন, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, নিমাই সন্ন্যাস, ভীষ্মের শরশয্যা, রামরাজা, কর্ণবধ, ব্রজলীলা প্রভৃতি উল্লেখ্যযোগ্য।

নাটক রচনা সম্ভব হলেও সর্বত্র রঙ্গালয় নির্মিত হয় নাই। কারণ অনেকটা অর্থাভাব। এর ফলে নাটকের মত লিখিত অথচ যাত্রার মত অভিনেতব্য এরূপ এক প্রকার দৃশ্যকাব্যের উদ্ভব হয়, একে বলে অপেরা বা গীতাভিনয়।

মনোমোহন বসু যে নাট্যধারার প্রবর্তন করেন তা পরিণতি লাভ করে ভাতার থানার মাহাতা রামচন্দ্রপুর গ্রামের রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটকে।

রাজকৃষ্ণ রায় ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যকার। তিনি কলকাতায় বীণা রঙ্গভূমি নামে এক নাট্যমঞ্চ গড়ে তোলেন ও সেখানে স্বরচিত 'চন্দ্রহাস' নাটক মঞ্চস্থ করেন। রাজকৃষ্ণ অনেক স্থলে হাস্যরস সৃষ্টির জন্য মাঝে মাঝে প্রাত্যহিক তুচ্ছতা মিশ্রিত ভাঁড়ামি দৃশ্যের অবতারণা করতেন।

যাত্রা ও গীতাভিনয়ের উদ্দেশ্য রাজকৃষ্ণের নাটকে সাফল্যলাভ করেছিল। পৌরাণিক নাটকগুলি অভিনয়ের সময় দর্শকদের হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে যেতো। গীতাভিনয়ের লক্ষ্যই যে গানের আতিশয্য সেটা রাজকৃষ্ণের নাটকে যথেষ্ট পরিমাণেই দেখা যায়।

রাজকৃষ্ণ তাঁর নাটকে গদ্য-পদ্য উভয় ভাষারীতিই অনুসরণ করেছেন। অনেক সময় গদ্য-সংলাপের মাঝখানে পদ্য-সংলাপ মিশিয়ে দেওয়ার ফলে অবশ্য গিরীশচন্দ্রের গৈরিশী ছন্দের ভাব অনুযায়ী সুস্পষ্ট বিভাগ হয় নাই। পদ্যরচনায় ভাঙা মিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তনে রাজকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। 'হরধনুভঙ্গ' নাটকের ভূমিকায় তিনি এই ছন্দ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

"শুভক্ষণে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ দেখা দিয়াছিল, এবং অভিনয় ক্ষেত্রে অভিনীত হইয়াছিল। নহিলে আধুনিক 'ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ' হইত কিনা সন্দেহ। এই ছন্দ আভিনায়িক নাটকের পক্ষে জলবৎতরলম্ এবং লেখকের পক্ষে তাহাই। লোকের অনুরোধে বা নিজের ইচ্ছায় দুই চারিদিনের মধ্যে এক একখানা বড় বড় নাটক পদ্যে লিখিতে হইলে এই জলবৎতরল ছন্দই—এই অমিত্রাক্ষর, ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দই বিশেষরূপে উপযোগী।"

তাঁর অন্যান্য নাটকের মধ্যে 'অনলে বিজলী', 'হরধুনভঙ্গ', 'রামের বনবাস', 'তরণীসেন বধ' উল্লেখযোগ্য।

কাটোয়ার জগদানন্দ, যিনি প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন পরে বৈষ্ণব হন। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা। তাঁকে বাংলায় যাত্রার প্রচলক বলা যেতে পারে। তাঁর রচিত যাত্রার সঙ্গীতসমূহ শব্দ-বিন্যাসে, ভাবে ও ছন্দ-মাধুর্যে অতুলনীয়। তাঁর রচিত বহু সঙ্গীত শিশিরকুমার ঘোষ সম্পাদিত 'পদকল্পতরুতে' প্রকাশিত হয়েছে। সাতগেছিয়ার দুলাল তর্কবাগীশের (১৭৩১–১৮১৫) কনিষ্ঠ পুত্র গুরুচরণ 'শ্রীকৃষ্ণ-নীলাম্বুধি' নামে সংস্কৃত নাটক রচনা করেন (১৮৩১)।

খাঁড় গ্রামের ধনকৃষ্ণ সেন (১৮৬৪–১৯০২) ১২৯৫ সালে 'সুদর্শনের রাজ্যাভিষেক' নামে একটি নাটক লেখেন। এছাড়াও তাঁর অন্যান্য নাটক হলো শতাশ্বমেধ যজ্ঞ, কর্ণবধ, সতীমালতী প্রভৃতি। তাঁর রচিত ও প্রকাশিত নাটকের সংখ্যা ১৩।

রানীগঞ্জের বায়বাহাদুর নির্মল শিব বন্দ্যোপাধ্যায় (২২.৬.১২৯১–১৭.৫.১৩৫১) ১৩১২ বঙ্গাব্দে লাভপুরে একটি নাট্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রচিত "রূপকুমারী" একটি গীতিনাট্য।

পরমানন্দ অধিকারীর (১১৪০??–১২৩০) জন্মস্থান বর্ধমান না বীরভূম সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। সে যাই হোক যাত্রাজগতে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি যাত্রাপালাকার গোবিন্দ অধিকারীর বৃত্তিগুরু বলে জনশ্রুতি। তাঁর যাত্রারীতির বৈশিষ্ট্য ছিল দূতিয়ালীতে।

প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের (৩.২.১৮৭৩–৫.৪.১৯০২) জন্ম মাতুলালয় ধবনী গ্রামে। আদি নিবাস ছিল গুরুপ। জানোয়ারচন্দ্র শর্ম্মা ছদ্মনামে তিনি 'সূক্ষ্মলোম পরিণয়' নামে একটি পঞ্চাঙ্ক নাটক লেখেন, নাটকটি অমুদ্রিত রয়ে গেছে।

এবার বর্ধমান শহরে নাট্য আন্দোলন ও নাট্যচর্চার প্রসঙ্গে আসা যাক। বর্ধমানের নাট্যচর্চায় ও নাট্য আন্দোলনে বর্ধমানের রাজ পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ বিষয়ে মহারাজ বিজয়চাঁদ মহতাবের অবদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তিনিই এই আন্দোলনে উদ্যোগী হয়ে ১৯০৫ সালে রাজবাড়ীর মধ্যে মঞ্চ তৈরী করে শেক্সপীয়ারের ইংরাজী নাটক 'ম্যাকবেথ' অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। এর পর বাংলা নাটক দক্ষযজ্ঞের অভিনয় হয়। বিজয়চাঁদ নিজেও এতে অভিনয় করেন দক্ষের ভূমিকায়। আর শিবের ভূমিকায় অভিনয় করেন অশ্বিনী ভট্টাচার্য। ১৯১৫–১৯২০ সালে বিজয়চাঁদের পরিচালনায় বিজয়চাঁদের স্বরচিত নাটক 'চন্দ্রজিৎ' অভিনীত হয়। তিনি নিজেও এতে অভিনয় করেন।

এরপব উদয়চাঁদের সময় রাজবাড়ী চত্বরে উদয়চাঁদের উদ্যোগে প্রহ্লাদ চরিত্র নাটকের অভিনয় হয়। উদয়চাঁদ 'হিরণ্যকশিপু'র ভূমিকায় অভিনয় করেন।

বিজয়চাঁদের বর্ধমানের নাট্য আন্দোলনে আর একটি অবদান, বোরহাটে নাট্যমঞ্চের প্রতিষ্ঠা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বর্ধমান শহরে তিনটি রঙ্গমঞ্চের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৮৭ সালে মহাজনটুলির ভিতর সিংদরজার কাছে ভিক্টোরিয়া থিয়েটার নামে একটা স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ ছিল। বোরহাটে বর্তমান জলের ট্যাঙ্কের কাছে বিজয়চাঁদের প্রতিষ্ঠিত 'বিজয় থিয়েটার' গড়ে ওঠে।

১৯১৭ সালে জগৎবেড়ে পিয়ারী দাস ও ব্রজেন দাসের উদ্যোগে 'ব্রজেনবাবুর থিয়েটার' নামে আর একটি রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়েছিল। সিংদরজার 'ভিক্টোরিয়া থিয়েটার', বোরহাটের 'বিজয় থিয়েটার' ও জগৎবেড়ের 'ব্রজেন দাসের থিয়েটার' কোনটিরই আজ আর অস্তিত্ব নাই।

ভিক্টোরিয়া থিয়েটারে বিভিন্ন সময়ে অভিনীত হয়েছিল—আলিবাবা, আলমগীর, অ্যায়সা কী ত্যায়সা, সাজাহান, ভদ্রা, মেবার পতন, রঞ্জিৎ সিংহ প্রভৃতি নাটক। অভিনয় করেছিলেন মহারাজ বিজয়চাঁদ, প্রমোদীলাল ধৌন, মুকুন্দলাল মাড়োয়ারী, নানু বাবু, সৈয়দ মকবুল। প্রমোদীলাল একবার উদ্যোগী হয়ে অর্ধেন্দু মুস্তাফী ও কুসুমকুমারীকে কলকাতা থেকে আনিয়ে ভিক্টোরিয়া থিয়েটারে অভিনয় করান। ভিক্টোরিয়া মঞ্চের মহিলা অভিনেত্রীদের মধ্যে রানী মাসি, কালো পুঁটি, রাঙাপুঁটির নাম উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত মঞ্চ ও চলচ্চিত্র অভিনেতা কমল মিত্রের আদি বাড়ি ছিল এই সিংদরজার অনতিদূরে মহাজন-টুলিতেই। তিনি এবং বর্ধমানের কৌতুক অভিনেতা নবদ্বীপ হালদারও (জন্ম কুড়মুন-পলাশী গ্রামে) এই রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেছিলেন।

বিজয় থিয়েটারে বিল্বমঙ্গল, জয়দেব, নীলদর্পণ, মেবার পতন এবং বিজয়চাঁদের স্বরচিত নাটক 'বরুণা' অভিনীত হয়। এখানকার অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন প্রবোধবাবু, ক্ষেত্রমোহনবাবু, কালোপুঁটি, রাঙা পুঁটি। তখন তো মহিলা অভিনেত্রী বেশী ছিল না। গৃহস্থবাড়ীর মেয়েরা তখন মঞ্চে অভিনয়ের কথা চিন্তাই করতে পারতো না। কাজেই শহরে যেখানেই অভিনয় হতো, মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য দুই 'পুঁটি'রই ডাক পড়তো। তখন থিয়েটারে প্রবেশ মূল্য ছিল মাথা পিছু দু-আনা।

জগৎবেড়ে ব্রজেনবাবুর থিয়েটারে সখের থিয়েটারের যে অভিনয় হতো সেখানে মেয়ের ভূমিকায় ছেলেরাই মেয়ে সেজে অভিনয় করতো। ব্রজেনবাবুর থিয়েটারের নারী ভূমিকায় অভিনয় করতেন বঙ্কিম দাস।

আমড়াতলার গলিতে বিভূতি কাপুর ও রাসবিহারী ভট্টাচার্যের উদ্যোগে ফ্রেন্ডস ক্লাবের প্রয়োজনে প্রতি মাসেই একটি নাটকের অভিনয় হতো। তবে স্থায়ী

মঞ্চ ছিল না। অস্থায়ী মঞ্চেই অভিনয় হতো। বিভূতিবাবু কিছুদিন রাজবাড়ীতে সেটেলমেন্ট অফিসে কাজ করেছিলেন। আমিও তখন ঐ অফিসে অফিসারের পদে চাকরী করতাম। বিভূতিবাবুর কাছেই বর্ধমানের নাট্যচর্চার গল্প শুনতাম। বর্ধমানে নাট্যচর্চায় ভবানী মেহেরা এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ঐতিহাসিক নাটকে তাঁর অভিনয় মনে রাখবার মত।

রানীগঞ্জ বাজারে এখন যেখানে বিচিত্রা সিনেমা রয়েছে সেখানে পূর্বে দে-বাড়ীর হরিদাস দে'র উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল গৌরাঙ্গ নাট্য নিকেতন। এই মঞ্চে যাঁরা অভিনয় করতেন তাঁদের মধ্যে গিরীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ব্রহ্মপ্রসাদ দত্ত, প্রণবেশ্বর সরকার (টোগো সরকার)। ১৯২৬/২৭ সালে এটি সিনেমা হলে পরিণত হয়, তখন নাম ছিল চিত্রা সিনেমা, পরে এর মালিকানা হস্তান্তরিত হলে পরিবর্তন করে 'চিত্রা'র জায়গায় 'বিচিত্রা' হয়।

বর্তমানের মোহনবাগান মাঠের 'আন্দে' বাড়ীতে রঘুনাথ কালচারাল ক্লাব ছিল।

মিঠে পুকুরে ছিল বিমল মেমোরিয়াল ক্লাব। বিমল চট্টোপাধ্যায় একজন বিশিষ্ট অভিনেতা ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সতীর্থরা মিলে এই ক্লাব স্থাপন করে। প্রয়াত চিকিৎসক ডাঃ সুবোধ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বোরহাটে তরুণ সঙ্ঘ নামে একটি ক্লাব গড়ে ওঠে। ডাঃ সুবোধ মুখোপাধ্যায়ের মঞ্চে নিয়মিত একটি করে নাটকের অভিনয় হতো। ডঃ মুখোপাধ্যায় কেবলমাত্র বিশিষ্ট চিকিৎসকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে সমাজসেবী, সাহিত্যিক, নাট্যকার ও অভিনেতা। আমার সঙ্গে তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। তাঁর কাছ থেকে বর্ধমান রাজবংশের ইতিহাসের বহু মালমালসা সংগ্রহ করেছিলাম।

ডঃ সুবোধ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এবং ডঃ শিশির পাঁজা, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ নবঘন মৈত্রের উদ্যোগে ও সরকারী আনুকূল্যে বোরহাটে রবীন্দ্রভবন নামে স্থায়ী মঞ্চ নির্মিত হয়। এঁরা রবীন্দ্র পরিষদও গঠন করেন। বর্তমানে রবীন্দ্রভবনে গ্রুপ থিয়েটারের পরিচালিত অনেক নাটক অভিনীত হয়।

বর্ধমানের নাট্যজগতে এমনি বহু নাট্যসংস্থা গড়ে উঠেছে। এদের উদ্যোগে অনেক নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে, এখনও হচ্ছে। অনেক নাট্যসংস্থা বর্ধমান ছাড়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে নাটক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে ও অনেক পুরস্কার জিতে এনেছে। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, অভিনেত্রী ও পরিচালকের শিরোপা নিয়ে এসেছে। এদের কয়েকটির তালিকা পরের পাতায় প্রদত্ত হলো।

নাট্যসংস্থা	অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটক	নির্দেশক	মন্তব্য
বর্ধমান রাজ ইউনিট	মহেশ, দিনান্ত, যাদুকর, সত্য সেলুকাস কেয়া-কুঞ্জ,	অজিত ঘোষ	নাট্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে শ্রেষ্ঠ পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতা, অভিনেত্রীর সম্মান লাভ।
মৌলিক নাট্যসংস্থা	গোত্রান্তর হারানের দশটি ছেলে	তরুণ লাহিড়ী তপন লাহিড়ী	
	বিসর্জন, পৃথিবীর জন্যে, সূর্য্যের সন্তান	মঙ্গল চৌধুরী	শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা, পরিচালনা, অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সম্মান
	সাজাহান, ঘুঘু, স্বামী বিবেকানন্দ,	প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়	—
	অরুণোদয়ের পথে, অঘটন, নরক গুলজার, অবিরাম পাঁউরুটি ভক্ষণ,	ললিত কোনার	
	বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ	রমাপতি হাজরা	
সুকান্ত নাট্য সংস্থা	ঘাম, দ্বান্দ্বিক, আদাব	অমর গঙ্গোপাধ্যায়	অনেক পুরস্কার লাভ
ময়ূখ	মৃত্যুহীন প্রাণ, আশাবরী, কেয়াকুঞ্জ, আমেনিসিয়া, প্রেমশশী, যদিও সন্ধ্যা	সুব্রত চক্রবর্তী নিমাই দে	লক্ষ্ণৌ নাট্য প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ পরিচালনার সম্মান লাভ।
শিশুরঙ্গম্	নৃত্য, গীত	অমল বন্দ্যোপাধ্যায়	—

মৌলিকের পরিচালনায় বর্ধমান ড্রামা কলেজ স্থাপিত হয় (১৯৭৯)। এই কলেজ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করেছে।

এগুলি ছাড়াও নব্বই-এর দশকে অঙ্গীকার, অনীক নেপথ্য শিল্পীসমন্বয়, প্রমা, অরিত্র, চয়ান নাট্য গোষ্ঠী, দশরূপক প্রভৃতি অনেক নাট্যগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে।

নির্দেশকদের মধ্যে মৃদুল সেন, নিমাই দে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমিতাভ চন্দ, সঞ্জয় মেহেরা, নীলেন্দু সেনগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য।

নব্বই-এর দশকে বর্ধমানে জেলা পরিষদের উদ্যোগে 'সংস্কৃতি' মঞ্চ তৈরী হয়েছে। মঞ্চটি—শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। এই মঞ্চে বর্তমানে বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগে সিনেমা, থিয়েটার, নৃত্যগীত, সাংস্কৃতিক আলোচনার ব্যবস্থা আছে। অবশ্য এর জন্য জেলা পরিষদকে দক্ষিণা দিতে হয়। বর্ধমানের পশ্চিম প্রান্তে রবীন্দ্রভবন ও কেন্দ্রস্থলে 'সংস্কৃতি' বর্ধমানের স্থায়ী মঞ্চের অভাব অনেকখানি মিটিয়েছে। অরবিন্দ স্টেডিয়াম, রেলওয়ে ইনস্‌টিটিউট-এ মাঝে মাঝে পেশাদারী নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল গার্লস স্কুল, টাউন স্কুল, মিউনিসিপ্যাল বয়েজ স্কুল, বোরেহাট রামকৃষ্ণ স্কুল. সি.এম.এস স্কুল এবং অন্যান্য মহকুমার অনেক বিদ্যালয়ের এখন নিজস্ব মঞ্চ আছে। টিকিট্ কেটে পেশাদারী যাত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়, টাউন হল ময়দানে, পারবীরহাটায় বাঁকার মাঠে, বড়নীলপুর ময়দান ও আলমগঞ্জ ময়দানে।

বর্ধমানের বাইরে মেমারী, গুসকরা, কামারপাড়া, হরিবাটী, মোহনপুর, ভাতার, বেগুট, বলগনা, হাটগোবিন্দপুর, কুড়মুন প্রভৃতি গ্রামেও সখের যাত্রাপার্টি গড়ে উঠেছিল। বৈদ্যপুরের রঞ্জন ক্লাব, বৈঁচির বহুজনী, রসুলপুর বৈদ্যডাঙ্গার 'জয় যাত্রী সঙ্ঘ', বড়শুলের ইয়ং ক্লাব, 'ইয়ং ম্যান্‌স্ এসোসিয়েশন', ও 'মৃগয়া', বড় বৈনানের ও রামবাটির নাট্য প্রতিযোগিতা উল্লেখযোগ্য। রায়নার তরুণ সঙ্ঘ, পহলানপুরের নাট্যসঙ্ঘ, মিতালীর সাংস্কৃতিক চক্র, রতিবাটির মিলন সঙ্ঘ, মানকরের নাট্যমন, কাটোয়ার উড়নচণ্ডী, শক্তিগড়ের নাটকওয়ালা উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

দুর্গাপুরের শিল্পায়নের আগে থেকেই নাট্যচর্চা ও নাট্য আন্দোলন জেলার লোকসংস্কৃতিতে এক বিশেষ মাত্রা সংযোজন করেছে। সেই প্রাচীনকাল থেকে গ্রামে গ্রামে পূজা উৎসব উপলক্ষে যাত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। আড়াগ্রামে জমিদার ভুবন চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে 'রাঢ়েশ্বর অপেরা' গঠিত হয়। মহিষাসুর, জনা, মিথিলায় ভগবান, প্রবীরার্জুন প্রভৃতি যাত্রাপালার অনুষ্ঠান করে। গোপালপুর গ্রামে 'বীণাবাণী নাট্য সমাজ' অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে যাত্রাপালার অনুষ্ঠান করতো। নাচন গ্রামে ছিল 'নাচন নাট্য সমাজ'। সগরভাঙ্গা গ্রামবাসীগণের উদ্যোগে গঠিত হয়েছিল 'ভৈরব নাট্য সমাজ', ভিড়িঙ্গী গ্রামে 'নাট্য অপেরা'—সিরাজউদ্দৌল্লা, লক্ষ্মণবর্জন, কর্ণার্জুন যাত্রাপালা সাফল্যের সঙ্গে অভিনয়ের ব্যবস্থা করতো। দূরদূরান্ত থেকে গ্রামের লোকেরা পায়ে হেঁটে, গরুর গাড়ী করে যাত্রা শুনতে আসতো। যাত্রা হতো প্রায় সারারাত ধরে। ভিড়িঙ্গীর

জমিদার বসন্তগোপাল মুখোপাধ্যায় গ্রামের নাট্যসংস্থাকে উৎসাহ দিতেন; অর্থ সাহায্য করে যাত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতেন।

যাত্রা ছাড়া লেটো ও পৌরাণিক পালাগানে আঢ়া গ্রামের খ্যাতি ছিল। এই সব পালাগান গাইতেন লক্ষ্মণ দাস, জলধর বাগ্দী, গোপাল বাগচী সম্প্রদায়।

স্বাধীনোত্তর কালে দুর্গাপুর অঞ্চলে ভিড়িঙ্গী, নডিহা, সগড়ভাঙ্গা, গোপালপুর, অণ্ডালে সখের থিয়েটার গড়ে ওঠে। বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রানীগঞ্জে গড়ে ওঠে বার্নস ক্লাব। এদের উদ্যোগে ১৯৫৮–৫৯ সালে অভিনীত হয় 'মাটির ঘর', 'দুঃখীর ইমান', 'পথের শেষে', 'পতিব্রতা'। এর পাশাপাশি R.Y.M.L.A. নামে সংস্কৃতি সংস্থা গড়ে ওঠে। এখানে কৃষ্ণলাল ব্যানার্জী, হীরালাল সাও প্রমুখের উদ্যোগে 'লালপঞ্জী', 'আজকাল' অভিনীত হয়।

বাঁশিয়া গ্রামের 'অরুণোদয় সংঘ' সিরাজউদ্দৌল্লা, সংগ্রাম, শয়তানের চর প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ করে। বেনাচিতি মহিষাখাপুর অঞ্চলে সখের যাত্রাদল মিলন সংঘ গড়ে ওঠে। এরা সাফল্যের সঙ্গে 'আকালের দেশ' ও 'রক্তস্নানের' অভিনয় করে। এই সংস্থাই পরে অগ্রণী সাংস্কৃতিক পরিষদ নাম গ্রহণ করে।

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার গ্যারেজের কর্মীরা মিলে 'শৌভিক' নাট্যসংস্থা গঠন করে যাত্রার মহড়া শুরু করে। এখানে অভিনেতাদের মধ্যে ডাঃ মদনমোহন দত্ত, ডাঃ পি. কে. দত্ত, বাসুদেব চক্রবর্তী, হিমাঙ্গ গাঙ্গুলী প্রভৃতি কয়েকজন অভিনয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। ১৯৬০ সালে গড়ে ওঠে মিলনী নাট্য সঙ্ঘ। উদ্যোক্তা ছিলেন স্বদেশ চট্টোপাধ্যায়। মিলনী নাট্য সঙ্ঘের অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন তপেন চট্টোপাধ্যায়, গোপাল ভট্টাচার্য, শান্তনু ঘোষ। মিলনীতে মহিলার ভূমিকায় অভিনয়ে অংশ নেন মহিলা কর্মীবৃন্দ। স্বাগত সাহিত্য পরিষদ : 'সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা,' 'নতুন নতুন সাহিত্যিকদের উৎসাহ দান', পত্রিকা প্রকাশ করে তাদের লেখা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে গঠিত হলেও পরিষদের নাট্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবদান কম নয়। এখানে অভিনয় করতেন তপেন চট্টোপাধ্যায়, মধু চট্টোপাধ্যায়, আরতি বসু (পুং), মিনতি মুখার্জী, নমিতা বসু প্রভৃতি অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ। শিল্পনগরীর বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক নাট্য-সংস্থা গড়ে ওঠে। স্মারক আর্ক থিয়েটার, অয়ন, ডি.এস.পি এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ, অনামী, আবির্ভাব, শিল্পায়ন, চৌরঙ্গী ক্লাব, কল্লোল থিয়েটার, গ্রুপ, মহুয়া, পটদীপ, নাট্যায়ন প্রভৃতি নাট্যসংস্থায় শেখর চ্যাটার্জী, সনৎ চ্যাটার্জী (ডি.পি.এল.), অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি চট্টোপাধ্যায়, পান্নালাল চ্যাটার্জীর নির্দেশনায় যুগোপযোগী বহু নাটক মঞ্চস্থ হয়। এখানে গণনাট্য সংস্থার

দুটি শাখা—'তুর্য্য' ও 'দুন্দুভি' নিয়মিত নাটক মঞ্চস্থ করে। এছাড়া একে একে গড়ে ওঠে অনেক নাট্য সংস্থা। যেমন—ময়ূখ (১৯৬১), আনন্দম্ (১৯৬০), মঞ্চরূপা (১৯৬২), মিশ্র ইস্পাত সংগঠনী (১৯৬৫), স্যাটেলাইট (১৯৬৬), বার্নার (১৯৬৯), সৃজনী (১৯৬৯), সম্ভাবনা (১৯৭৪), স্মারক (১৯৭৬), প্রত্যয় (১৯৭৯) প্রভৃতি। ইস্পাত নগরীতে ১৯৭৭ সালে রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী বুদ্ধদেব সেনগুপ্তের উদ্যোগে 'রম্যবীণা' নাট্যসংস্থা গড়ে ওঠে।

আসানসোলে স্বাধীনতার বহু আগে বিশের দশক থেকেই নাট্যচর্চা শুরু হয়ে যায়। ১৯২৮ সালে আসানসোল গ্রামে 'রায় অপেরা' নামে একটা অ্যামেচার যাত্রা পার্টি গড়ে ওঠে। অপেরার অভিনীত যাত্রাপালার মধ্যে 'চাষার ছেলে', 'রাবণ বধ', 'চন্দ্রহাস', নাটক খুব নাম করেছিল। চুরুলিয়াতে গড়ে উঠেছিল 'শ্যামা অপেরা', এরা প্রথমে সখের যাত্রা রূপে গড়ে উঠলেও পরে আধা পেশাদারী যাত্রা পার্টিতে পরিণত হয় ও চুরুলিয়া গ্রাম ছাড়াও পাশের গ্রামে যাত্রাপালা গাইতে যেত। এখানকার অভিনেতাদের মধ্যে বিমলাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌর মণ্ডল, দুলালেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় খুব নাম করেছিলেন।

পরে রামশঙ্কর চৌধুরীর উদ্যোগে গণনাট্য সঙ্ঘের শাখা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একাধিক নাট্যসংস্থা গড়ে ওঠে। আসানসোলের সতীর্থ নাট্য সংস্থা (১৯৬৮) একটি উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এখানে বাণীব্রত রাজগুরুর নির্দেশনায় প্রথম পাঠ, লফড়া, আপনদেশে প্রভৃতি পথ-নাটিকাও সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। আসানসোলের অন্য নাট্য সংস্থার মধ্যে বলাকা, রূপকার এক উল্লেখযোগ্য নাম। আসানসোলের কাছে সেন র‍্যালে কারখানার কর্মীদের উদ্যোগে সেন র‍্যালে কালচার‍্যাল ইউনিট, চিত্তরঞ্জনের 'অযান্ত্রিক' 'পরবাস,' নাট্যরূপ, বার্ণপুরের দিশারী, অগ্নিবীণা সাংস্কৃতিক চক্র, সিয়ারসোলের কিশলয় নাট্য গোষ্ঠী, কুলটির মিতালী গোষ্ঠী, জামুরিয়ার 'চেনা মুখ', কাঁকসা অঞ্চলের পানাগড়ের বি.ডি.এ, সুকান্ত সাংস্কৃতিক সংস্থা, বৈশালী থিয়েটার ইউনিট, জঙ্গলমহল সাংস্কৃতিক পরিষদ উল্লেখযোগ্য নাট্যসংস্থা।

জেলায় ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের প্রায় ১৪টি শাখা আছে। বর্ধমান শহরের গণনাট্য সংস্থার শাখার উদ্যোগে বর্ধমান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে নিয়মিত নাট্যচর্চা ও নাটক মঞ্চস্থ করার কাজ চলছে।

বর্ধমান জেলার কয়েকজন বিশিষ্ট নাট্যকারের পরিচয় : পূর্বস্থলী থানা ভাতশালাব মতিলাল রায় ও ধবনীর নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে।

১. *লাউসেন বড়াল* : ঊনবিংশ শতকের ৬ষ্ঠ দশকে তাঁর জন্ম। 'হরিশচন্দ্র' পালা রচনায় তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর 'মনসার ভাসান' পালা বেশ সাড়া জাগিয়েছিল।

২. *কালীপদ মুখোপাধ্যায়* (১৮২৩--১৮৮০) : বৈকুণ্ঠপুরে জন্ম। তাঁর রচিত পালার মধ্যে 'প্রহ্লাদ চরিত্র', 'কালীয় দমন', 'ব্রজলীলা,' 'সংবরণ' উল্লেখযোগ্য। তাঁর নাটক নবদ্বীপের নীলমণি কুণ্ডুর স্ত্রী মুক্তামণি দাসীর দলে (বউ কুণ্ডুর দলে) সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হতো।

৩. *অহিভূষণ কাব্যতীর্থ (ভট্টাচার্য)* : বর্ধমান জেলার মেমারী থানার কোক-সিমলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩০ সালে তাঁর প্রথম পালা দণ্ডীপর্ব সমাপ্ত হয়। তাঁর কৃতিত্ব যাত্রার সংলাপে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও গদ্য সংলাপের প্রবর্তন। এ বিষয়ে তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। তবে তাঁর পালায় গানের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর নাটক সাঁতরা কোম্পানীর দলে অভিনীত হতো।

৪. *ধনকৃষ্ণ সেন* : মেমারী থানার খাঁড় গ্রামে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ধনকৃষ্ণের জন্ম। তিনি ছিলেন সে কালের গ্রাজুয়েট; কলকাতা মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বি.এ. পাশ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর নাট্যপ্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। তাঁর প্রথম পালাগান 'সুদর্শনের রাজ্যাভিষেক।' তাঁর নাটকে পুরাতন প্রথানুযায়ী জুরীর গান প্রভৃতি থাকলেও কিছু নূতনত্ব ছিল। তাঁর অন্যান্য নাটক—'পৃথ্বীরাজের শতাশ্বমেধ', 'কর্ণবধ', 'অভিমন্যু' 'হংসধ্বজের মহামুক্তি' 'মহাপরীক্ষা' 'বিল্বমঙ্গল' প্রভৃতি। ৩৮ বছর বয়সে ১৯০২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর অধিকাংশ পালাগান ত্রৈলোক্য পাইনের দলে অভিনীত হতো।

৫. *নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায়* : মেমারী থানার সানুই গ্রামে নিতাইপদর জন্ম। প্রথম জীবনে তিনি শশীভূষণ অধিকারীর 'গ্র্যান্ড অপেরায়' অভিনয় করতেন। তাঁর নাটকের অধিকাংশ ভক্তিমূলক। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে—শ্মশানে মিলন, শৈশব সাধনা, অবজাদেবী, শ্রীবৎস চিন্তা, সপ্তমাবতার, অন্নপূর্ণা উল্লেখযোগ্য। তাঁর নাটকে গদ্য ও পদ্যের অপূর্ব সমন্বয় তাঁর নাটকগুলিকে বৈশিষ্ট্য দান করে। তাঁর নাটক সত্যম্বর অপেরা, বিল্বগ্রাম নট্ট কোম্পানী, নবদ্বীপের বঙ্গনাট্য সমাজ প্রভৃতি দলে অভিনীত হতো।

৬. *ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী* : বর্ধমান থানার রায়ান গ্রামে ১৮৯০ সালে আশ্বিন মাসে ভোলানাথ রায়ের জন্ম। পিতা নুটবিহারী। নাটক রচনাই তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। এর জন্য তিনি বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দেন। তাঁর প্রথম নাটক কুবলাশ্ব। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

ও ভারতী পত্রিকার সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে কাব্যশাস্ত্রী উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর নাটকে দার্শনিক যুক্তি ও সমস্যার সমাধান এক বিশিষ্টতা আনে। তাঁর অন্যান্য নাটকের মধ্যে কালচক্র, আদিশূর, পৃথিবী, জাহ্নবী, বিন্ধ্যাবলী, পঞ্চনদ, ধনুর্যজ্ঞ, দাক্ষিণাত্য, বজ্রদৃষ্টি, প্রাণে প্রাণে, অজাতশত্রু, জরাসন্ধ, ভগ্নপূজা, বাসুকী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর নাটকের অধিকাংশ গণেশ অপেরাতেই অভিনীত হতো। তাঁর 'প্রিয়ব্রত' নাটক শশিভূষণ অধিকারীর গ্র্যান্ড অপেরাতে অভিনীত হয়েছিল। তাঁর বিন্ধ্যাবলীর সংস্কৃতরূপ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় মিনার্ভায় অভিনীত হয়েছিল। তাঁর থিয়েটারের জন্য লেখা মঞ্চসফল নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—জাহ্নবী, বৃত্র-সংহার, গঙ্গাবতরণ প্রভৃতি। ১৩৩৯ সালের ২৩ শে চৈত্র তাঁর জীবনাবসান হয়।

৭. *ভবতারণ চট্টোপাধ্যায়* : পিপলন গ্রামে জন্ম। এই লোকনাট্যকারের রচিত নাটকের মধ্যে অজামিল উদ্ধার, রুক্মিণী হরণ, দেবব্রত, দুষ্মন্ত কীর্তি ও শ্রীকৃষ্ণের শাকান্নভোজন উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত নাটক দুটি শ্রীচরণ ভাণ্ডারীর দলে অভিনীত হয়।

৮. *গঙ্গেশ চট্টোপাধ্যায়* : জন্ম পিপলনে। তাঁর রচিত মহিষাসুর, রানী ভবানী, কৃষ্ণমাতা ও বাল্মীকি উল্লেখযোগ্য। তাঁর নাটক শংকর অপেরা ও রাধাকৃষ্ণ নাট্যসমাজ অপেরায় অভিনীত হতো।

৯. *ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়* : বর্ধমান জেলার মূলা গ্রামের অধিবাসী, ১৯৩৪ সালে জন্ম। তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'নাচমহল'। তাঁর নাটকে যুগ-সমস্যা ও সমসাময়িক ঘটনা বিধৃত। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে—একটি পয়সা, পদধ্বনি, অশ্রু দিয়ে লেখা, সাহারার কান্না, কান্না-ঘাম-রক্ত, সতী একাবতী, রক্তে রোয়া ধান উল্লেখযোগ্য। তাঁর নাটক সত্যেম্বর অপেরায় অভিনীত হয়।

(কৃতজ্ঞতা : শম্ভু বাগ)

জেলার বর্তমান নাট্যকারদের মধ্যে শম্ভু বাগের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য. তাঁর রচিত 'লেনিন' সারা দেশে সাড়া জাগিয়েছিল। তাঁর কয়েকটি জনপ্রিয় বিপ্লবাত্মক নাটক হলো—ঘুম ভাঙ্গার গান, হিটলার, রক্তাক্ত আফ্রিকা প্রভৃতি। তিনি অভিনেতা ও পরিচালক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে মুক্তমঞ্চ গড়ার কাজ অনেকটা এগিয়েছে। জেলার নাট্যকারদের মধ্যে গোপাল দাস, দেবেশ ঠাকুর, রাখাল সিংহ, পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, মধু চট্টোপাধ্যায়, অজিত ঘোষ, মৃন্ময় কাঞ্জিলাল, মৃদুল সেন, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, মানস দাশগুপ্তের নাম আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। পরিচালনার ক্ষেত্রে বর্ধমানের

মৃদুল সেন, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিত কোনার, মঙ্গল চৌধুরী, নারায়ণ ঘোষ। আজকের থিয়েটারের জয়ন্ত ঘোষ, মেমারী অঞ্চলেব ললিত দাস, কাটোয়ার মানিক মণ্ডল, অনাদি চক্রবর্তী, রানীগঞ্জের নীলাঞ্জন ঘটক, চিত্তরঞ্জনের সুনীল ভট্টাচার্য, বৈদ্যপুরের বনজ রায় বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

অভিনেত্রীদের মধ্যে বেলা দাস, গোপা চৌধুরী, মীনা দেবী, ভারতী শীল, ডলি সাহা, বীণা মণ্ডলের অভিনয়-কৃতিত্ব দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেছে।

বর্তমানে অনেক গৃহবধূও অভিনয়ের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন এবং অনেকেই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

ষাটের দশকে জেলার নাট্যচর্চায় যে জোয়ার এসেছিল সত্তর দশক থেকে তাতে যেন ভাটা পড়তে শুরু করে।

সত্তর দশক থেকেই নাটকের আঙ্গিকে, সংলাপে, মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তনের সূচনা হয়। ক্রিকেটের ক্ষেত্রে যেমন টেস্ট ম্যাচের চেয়ে one day series এর রমরমা বেড়েছে, নাটকের ক্ষেত্রেও তেমনি আগের পঞ্চাঙ্ক নাটকের পরিবর্তে একাঙ্ক নাটিকার প্রচলন বেশী হয়েছে। অবশ্য কারণও আছে। পূর্ণাঙ্গ নাটকের অভিনয় করতে গেলে অনেক টাকা, অনেক লোক ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনেক সময়ের দরকার হয়। আগে রাজা-জমিদাররাই নাটক, মঞ্চ ও অভিনয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। লোকের হাতে সময়ও ছিল অঢেল। সারারাত যাত্রা থিয়েটার উপভোগ করে, পরদিন সারাদিন ঘুমিয়ে কাটান যেত। আর আজ রাজাও নাই, জমিদারও নাই; এখন আমরা সবাই রাজা মোদের রাজার রাজত্বে। প্রতিটি মানুষ জীবন যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট—রুজি রোজগারের দিকে সবারই ঝোঁক বেশী, সাংস্কৃতিক চর্চার তাদের সময় কোথায়? কাজেই এখন স্বল্প লোক নিয়ে, স্বল্প খরচে কিছু recreation-এর জন্য একাঙ্ক নাটিকার দিকেই ঝোঁকটা বেশী দেখা যাচ্ছে। আর এই নাটক নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে কিছু শিরোপা পাওয়াও সহজ। তাই আজকাল উৎসবে প্রধানত এদেরই ডাক পড়ছে। বেশীর ভাগ মানুষ তাই একাঙ্ক নাটিকা উপভোগের মাধ্যমে জীবনরস উপভোগের পথ খুঁজছে। একাঙ্ক নাটিকার বৈশিষ্টই হলো—Unity of place, unity of time, unity of character and unity of design and impression. মঞ্চসজ্জার জন্য একাধিক 'সিন্' লাগে না। সিনেমার মত একটা সাদা পর্দা খাটিয়ে তাতে আলোকসম্পাতের কারসাজিতে নাটকের উপযোগী আলোর মায়াজাল সৃষ্টি করে অভিনয়ে নতুনত্ব আনা হয়েছে। যেখানে আলোর মায়াজাল-সৃষ্টির পথ নাই সেখানে একটা মাত্র 'সিন' খাটিয়ে নাটকের উদ্দেশ্যসাধন করা হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই নাট্য আন্দোলনের ফলে আঙ্গিক, বিষয়বস্তু ও শিল্পরীতির মধ্যে যেমন বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এসেছে, তেমনি নাট্যমঞ্চ, ধারা এবং সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধেও একটা বিদ্রোহী মনোভাব দেখা যাচ্ছে। সমাজের প্রগতিমূলক ও সমাজতান্ত্রিক জীবনাদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে আজ নাটকে। আগে পূর্ণাঙ্গ নাটকে একজন কি দুজন অভিনেতা বা অভিনেত্রীর সাফল্যের দিকেই বেশী জোর দেওয়া হতো। ছোট চরিত্র উপেক্ষিত হতো, এখন একাঙ্ক নাটিকার চরিত্রও কম, তাই প্রতিটি চরিত্রের ওপর সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। নাটকের প্রতিটি চরিত্রে সহযোগিতার দ্বারা নাট্যরস ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। আর একটা অভিনব ধারার প্রবর্তন হয়েছে। আলোকসম্পাত—আগেই এর উল্লেখ করেছি। আলোকসম্পাতের মায়াজাল দর্শকদের বেশী মুগ্ধ করছে। অভিনয়ের দুর্বলতা আলোকের মায়াজালে চাপা পড়ে যাচ্ছে। নবান্ন নাটকে প্রথম যে মাইকের প্রবর্তন শুরু হয়েছে এখন এর ব্যাপকতা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। যন্ত্রের ব্যবহার একবার শুরু করলে আর তাকে ছাড়া যায় না; যন্ত্রের এটাই যন্ত্রণা। এখন যাত্রাতেও মাইক চাই। বর্তমানে অনেক নাট্য সংস্থার কর্মীরা প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছেন; ফলে তাদের মতবাদের আদর্শ অনুযায়ী নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। স্বাধীনতার আগে নাটকের পাণ্ডুলিপি লিখে পুলিশের কাছ থেকে ছাড়পত্র নিতে হতো। স্বাধীনতার পর থেকে 'ও সবের' বালাই আর নাই। কাজেই নাট্যকার স্বাধীনভাবে নিজের মতাদর্শ অনুযায়ী নাটক লিখতে ও মঞ্চস্থ করতে পারেন।

বর্তমানের নাট্যান্দোলনের সবচেয়ে বড় ক্ষতি করছে যাত্রা। কারণ সাম্প্রতিককালে যাত্রাদলগুলি আর আগেকার মত যাত্রা মঞ্চস্থ করে না। যাত্রার মধ্যে থিয়েটার-রীতির প্রয়োগ পদ্ধতি, আলোকসম্পাত, মাইকের ব্যবহার সবই ঢুকে গেছে। যাত্রাও আজকাল ঘন্টা দুই-এর মধ্যেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। কাজেই যাত্রার পালাগানে এখনও একাঙ্কের প্রচলন না হলেও এর প্রচলন হতে আর খুব বেশী দেরী নাই। কাজেই লোকে এখন পেশাদারী, অপেশাদারী যাত্রার দিকেই বেশী ঝুঁকছে। বেশী পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে থিয়েটারে যাচ্ছে না। সে কারণেই বোধ হয় সিনেমা, টেলিভিশনের যুগে যাত্রা তার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছে ও গণসংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ হিসেবে টিকে আছে নিজ প্রাণশক্তির জোরে। খোলা মঞ্চে সমবেত হাজার হাজার লোককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পারে যাত্রা। আধুনিক কালে স্বল্পস্থায়ী যাত্রা পালাগান রচনায় শম্ভু বাগ, ব্রজেন দে, ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।

'মফঃস্বল বাংলার প্রথম চলচ্চিত্র—বরাতের ফের।'

বঙ্গসংস্কৃতি উৎসব ১৮০৭-এর সম্পাদক শ্রীদেবেশ ঠাকুরের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বর্ধমানের রাজকুমার উদয়চাঁদ মহতাব বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৩০ সনে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে কলকাতার রিপন থিয়েটারে মফঃস্বল বাংলার প্রথম চলচ্চিত্র 'বরাতের ফের' প্রথম মুক্তি পায়। ছবিটির প্রযোজক The Star of India Film Co.। এই কোম্পানীর মুখপাত্র হিসেবে ছিলেন বর্ধমানের খোসবাগানের নাগ ষ্টুডিও-র নাগ ভ্রাতৃদ্বয়—সূর্যকুমার নাগ এবং অরুণকুমার নাগ। রিপন থিয়েটারে ছবিটি মুক্তি পাবার পরই ২৮শে ফাল্গুন ১৩৩৬ সালে বুধবার 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার কলকাতা সংস্করণে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়।

বর্দ্ধমানে নূতন ফিল্ম কোং

বর্ধমানের কতিপয় ভদ্র সন্তানের উদ্যোগে "দি স্টার অফ্ ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোং" নামক ফিল্ম তুলিবার একটি প্রতিষ্ঠান হইয়াছে। ইহাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় প্রায় ২/৩ মাস কঠিন পরিশ্রমের ফলে 'দি ফেট অব্ এ প্রিন্স' নামে চলচ্চিত্র নির্মিত হইতেছে। আলোকচিত্রের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্যের ভার বর্ধমানের সুপরিচিত ও সুদক্ষ চিত্রশিল্পী "নাগ এণ্ড সন্স"-এর শ্রীযুক্ত অরুণকুমার নাগ মহাশয়েরা লইয়াছেন এবং ইহারা নিজ ব্যয়ে বহু মূল্যের যন্ত্রাদি আনিয়াছেন। বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ কুমার বিশেষ অনুগ্রহ্ করিয়া দিলখোশ বাগিচার মধ্যে এই ফিল্ম তুলিবার সুযোগ দিয়াছেন। সেজন্য সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহাও আমাদের পরম গৌরবের কথা যে এই ছবিখানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই বর্ধমানের অধিবাসী। আমরা সর্বান্তকরণে কামনা করিতেছি তাঁহাদের উদ্যম সার্থক হউক।

কিন্তু সে সময়কার বিখ্যাত সিনেমা পত্রিকা Beioscope-এ ২০শে সেপ্টেম্বর এই সংবাদটি প্রকাশিত হয় :

The star of India Film Co. Burdwan, under the kind patronage of Maharaj Kumar Uday Chand Mahatab BA of Burdwan have just completed their first production. The WHEEL Of FORTUNE, a story of romance which we understand will be released in Screen. We expect the first production of the newly started company will be appreciated by the public.

অমৃতবাজার পত্রিকার ১৫ই ও ১৮ই সেপ্টেম্বর এ-বিষয়ে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়—১৫ তারিখের বিজ্ঞাপনটি ছিল নিম্নরূপ :

A Super Indian Production
A WHEEL OF FORTUNE
at
RIPON THEATRE
38, Mechuabazar Street
Sat. 15th, Sunday 16th Nov. at 6
and 9.30 P.M

Madan Theatres Ltd. presents
The Star of Burdwan Film Company's
Latest Indian Film
A WHEEL OF FORTUNRE
Or
BARATER FER
With an all Star Cast (Sic)
An Unique (Sic) FILM IN BEATUTY IN DRAMA
AND IN GREAT HEART APPEAL
hilarious drama with comedy situation
and tense in emotions with a crashing climax
A HEART STIRRING STORY OF
DARINGATIONS (Sic)

বিজ্ঞাপনে ব্যাকরণগত ভুল ও বানান ভুল লক্ষ্যণীয়। তাছাড়া বঙ্গবাণীর বিজ্ঞাপনে ছিল দি ফেট অফ্ এ প্রিন্স। কিন্তু পরের বিজ্ঞাপনগুলিতে হয়ে গেল THE WHEEL OF FORTUNE or BARATER FER

এ পরিবর্তন সম্পর্কে দেবেশবাবুর মন্তব্য—শোনা যায়, 'ফেট অফ প্রিন্স' এ প্রযোজক রাজকুমারের আপত্তি ছিল। তিনি নিজের ছাপ দেখেছিলেন কি? উদয়চাঁদ ছিলেন আলোকপ্রাপ্ত। বাবার সঙ্গে নানা বিষয়ে মতানৈক্যের কথাও জানা যাচ্ছিল নথি থেকে। নৌকাডুবির ফলে এক ডাকাতদল দ্বারা জমিদার চন্দ্রনাথের কন্যা 'নীরা' এবং ডাকাত দলের দ্বারা অপহৃত বিলাসপুরের রাজা

কামেশ্বর শর্মার একমাত্র পুত্র কমলকুমারের ভাগ্য বিড়ম্বনার কাহিনী নিয়ে গড়া এই চলচ্চিত্র। এই ভাগ্যবিড়ম্বনার কারণ শোকসন্তপ্ত মহারাজের মদ্যপ হীরেন্দ্রকুমারকে দত্তকপুত্র রূপে গ্রহণ। প্রাচীন ভারতীয় সাজপোশাক, সুসজ্জিত হস্তী, সিংহ অরণ্যের জীবজন্তু এ ছবির অন্যতম আকর্ষণ।

এই চলচ্চিত্রে মহারাজকুমার পৃষ্ঠপোষকতা করা ছাড়া রাজপ্রসাদ, রাজোদ্যান, যানবাহন, সুসজ্জিত হস্তী ঘোটক প্রভৃতি ব্যবহার করতে দিয়ে সহায়তা দান করেছিলেন।

শ্রেষ্ঠাংশে ছিলেন শ্রীমতী লতিকাদেবী, মীরাবাঈ, রেণুদেবী, বীণাদেবী প্রভৃতি। দেবেশবাবুর প্রদত্ত তথ্য অভিনবত্বের দাবী রাখে। এজন্য জেলাবাসী দেবেশ বাবুর নিকট কৃতজ্ঞ থাকবেন।

তিন অধ্যায়

সাময়িক পত্রের ইতিহাসের ধারা

বাংলা ভাষায় সাময়িক পত্রের অভাব প্রথম অনুভব করেন মার্শম্যান। ১৮১৮ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী বাংলা ভাষায় সাময়িকপত্র প্রকাশের জন্য শ্রীরামপুর মিশনের অনুমতি লাভ করেন। তবে শর্ত ছিল, কোন রাজনৈতিক সংবাদ প্রকাশ করা যাবে না। বড় খবর ও সাধারণ সকল সংবাদ মুদ্রিত করা যাবে। এই নির্দেশ মেনে ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে দিগ্‌দর্শন অর্থাৎ "যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা নির্দেশ" প্রকাশিত হলো। এটি ছিল মাসিক পত্রিকা, এর প্রায় এক মাস পরেই ২৩শে মে ১৮১৮ প্রকাশিত হয় মার্শম্যানের আর এক বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ'। ঐ বৎসর ৪ঠা জুলাই-এর সংখ্যায় এই পত্রিকার শীর্ষদেশে একটি শ্লোক মুদ্রিত হয় যার থেকে এই পত্রিকার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যাবে :

দর্পণে মুখসৌন্দর্য্যমিব কার্য্য বিচক্ষণাঃ
বৃত্তান্তমিহ জানন্তু সমাচারস্যদর্পণে।

কিন্তু এগুলি ছিল বিদেশীদের দ্বারা সম্পাদিত পত্রিকা। এ দেশবাসীর বিশেষ করে এ জেলাবাসীর সম্পাদনায় প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে পূর্বস্থলী থানার বহড়া গ্রামের গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, নাম দেন 'বাঙ্গাল গেজেটি'। কিন্তু সমাচার-দর্পণ ও বাঙ্গাল গেজেটি কোনটি জ্যেষ্ঠত্বের দাবীদার সেটি জানবার কোন উপায় নাই।

সমাচার দর্পণের প্রথম কপি পাওয়া গেছে—তার প্রথম পৃষ্ঠার শিরোনামে আছে।

সমাচার দর্পণ

১সংখ্যা শনিবার ॥ ২৩শে মে সন ১৮১৮ ১০ই জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৫

কিন্তু বাঙ্গাল গেজেটির কোন কপি পাওয়া যায় নাই। কারও কারও মতে 'সমাচার দর্পণ' সাপ্তাহিক পত্রিকাটি 'বাঙ্গাল গেজেটি'র ১০/১৫ দিন আগে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু তথ্যটি বিতর্কিত। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য পুস্তিকায় লিখেছেন "গঙ্গাকিশোরের বাড়ী ছিল শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী 'বহরা' গ্রাম।" দৈনিক দামোদর শারদ সংখ্যা ১৩৮১-তে প্রকাশিত সাংবাদিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী দাশরথি তা-এর একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় গঙ্গাকিশোরের বাড়ী ছিল 'পুরথুল' বা পূর্বস্থলী থানা বহড়া গ্রামে। গঙ্গাকিশোরের 'চিকিৎসার্ণব' পুস্তকে তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তার থেকে দাশুরথি তা-র মত সমর্থিত হয়—

সুরধনি তিরে ধাম ধন্য সে বহরা
গঙ্গাকিশোর নাম দ্বিজদীন অতি গ্রাম॥
চন্দ্রতেজ করি.চুর তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর
ভুবনে দ্বিতীয় শূর মহারাজা তাঁর
অধিকার বসতি॥

বাঙ্গাল গেজেটি প্রকাশের জ্যেষ্ঠত্বের দাবী স্বীকার করে 'দৈনিক সংবাদ প্রভাকর'এর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৫২ সালে লেখেন—বাঙ্গাল গেজেটি প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৫মে শুক্রবার অর্থাৎ সমাচার দর্পণ প্রকাশের আটদিন পূর্বে। ঈশ্বর গুপ্তের ঐ প্রবন্ধের ইংরাজী অনুবাদ ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ৮মে 'ইংলিশম্যান এণ্ড মিলিটারী ক্রনিকেল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ফলে পাদ্রী লঙ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পূর্ব মত পরিবর্তন করে "লঙস ডেসক্রিপটিভ্ ক্যাটালগ অফ বেঙ্গলী ওয়ার্কস' গ্রন্থে গঙ্গাকিশোর সম্পাদিত 'বাঙ্গাল গেজেটি'কেই প্রথম সংবাদপত্রের মর্যাদা দান করেন।

সাতাশ বছর পর বর্ধমান থেকে প্রকাশিত হয় 'বর্দ্ধমান জ্ঞান প্রদায়িনী' এবং 'বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়।' ব্রজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাময়িক পত্র' গ্রন্থে বলেছেন যে পত্রিকা দুটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু বলাই দেবশর্মা তাঁর 'বর্দ্ধমানের ইতিহাসে' ও দাশরথি তা তাঁর 'সাংবাদিকতায় বর্ধমান' প্রবন্ধে মত প্রকাশ করেছেন যে পত্রিকা দুটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু তাঁদের মতের সমর্থনে কোন তথ্যসূত্র দেন নাই। এই সময় থেকে ১৮৯৯ পর্যন্ত জেলায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যা ১৩; এদের মধ্যে মাসিক পত্রিকাই ৫টি—বর্ধমান মাসিক পত্রিকা (১৮৬৬), প্রচারিকা (১৮৭০), ভারত ভাতি ও দিবাকর (১৮৭৬), জ্ঞানদীপিকা (১৮৭৭)। সাপ্তাহিকের মধ্যে ছিল—বর্দ্ধমান

জ্ঞান প্রদায়িনী (১৮৪৯) ও বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয় (১৮৪৯), সংবাদ বর্ধমান (১৮৫০) প্রচারিকা (১৮৭৪), বিশ্ব সুহৃৎ (১৮৭৬), কালনা প্রকাশ (১৮৭৮), বর্দ্ধমান সঞ্জিবনী (১৮৭৮) পল্লীবাসী (১৮৯৬)। এদের মধ্যে 'বর্দ্ধমান সঞ্জিবনী' ছিল ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র আর এই সমস্ত পত্রিকার মধ্যে একমাত্র 'পল্লীবাসী' এখনও টিকে আছে। ১৯৯৬-তে শতবর্ষ পূর্ণ করেছে।

প্রাক্ স্বাধীনতাযুগে বর্ধমান জেলা থেকে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য সাময়িক পত্রের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

পত্রিকা	কোন সালে প্রথম প্রকাশিত	সম্পাদক	পত্রিকার শ্রেণী	মন্তব্য
সংবাদ জ্ঞান প্রদায়িনী	১৮৪৯	বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	সাপ্তাহিক	—
বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়	১৮৪৯	রামতারণ ভট্টাচার্য	সাপ্তাহিক	—
সংবাদ বর্দ্ধমান	১৮৫০	কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়		বর্ধমান মহারাজার পৃষ্ঠ-পোষকতায় প্রকাশিত।
অরুণোদয়	১৮৫১?	রেভঃ লালবিহারী দে		পত্রিকা দুটি সম্ভবত কালনা বা বর্ধমান থেকে প্রকাশিত হতো না— কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হতো।
বেঙ্গলী ম্যাগাজিন	১৮৭৭–৮৯	ঐ		
বর্দ্ধমান মাসিক পত্রিকা	১৮৬৬	—	মাসিক	
প্রচারিকা	১৮৭০	প্যারীলাল সিংহ	মাসিক	
,,	১৮৭৪	,,	সাপ্তাহিক	
ভারত ভাতি	১৮৭৬	রাজেন্দ্রলাল সিংহ	মাসিক	
দিবাকর	১৮৭৬	—	মাসিক	
জ্ঞান দীপিকা	১৮৭৬	রাখালদাস হাজরা	মাসিক	
আর্য্য প্রতিভা	১৮৭৭	কৈলাসচন্দ্র ঘোষ	মাসিক	
কালনা প্রকাশ	১৮৭৮	—	সাপ্তাহিক	কালনা থেকে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা।
বর্দ্ধমান সম্মিলনী	১৮৭৮	যোগেশচন্দ্র সরকার	সাপ্তাহিক	ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র

পত্রিকা	কোন সালে প্রথম প্রকাশিত	সম্পাদক	পত্রিকার শ্রেণী	মন্তব্য
পল্লীবাসী	১৮৯৬	শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	সাপ্তাহিক	১৯৯৬ সনে শতবর্ষ অতিক্রান্ত।
কালিকাপুর গেজেট	১৯০০	কাশীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও অক্ষয়কুমার জ্যোতিরত্ন	মাসিক	
তরুণ	১৯০০	--	দ্বি-সাপ্তাহিক	--
প্রসূন	১৯০৯–১০	—	—	
নবারুণ	১৯১৯	চণ্ডীদাস মজুমদার	মাসিক	
বর্ধমান	১৯২২	স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী	সাপ্তাহিক	
শক্তি	১৯২৩	বলাই দেবশর্মা	সাপ্তাহিক	
আসানসোল সমাচার	১৯২৪–২৫	—	,,	এই অঞ্চলের প্রথম পত্রিকা।
বর্ধমান বাণী	১৯২৭	মৌলভী নাজিরুদ্দিনী আহম্মদ	সাপ্তাহিক	এখনও টিকে আছে।
ভীমরুল	১৯২৭	—	,,	
তরুণ	১৯৩০	--	,,	রাজরোষে বন্ধ হয়।
আসানসোল হিতৈষী	১৯৩১	গোপেন্দ্রভূষণ সাংখ্যতীর্থ	,,	ঐ
সাম্য	১৯৩২	—	,,	
দেশপ্রিয়	১৯৩৪	সুধাংশুমোহন ভট্টাচার্য	,,	
শান্তিজল	১৯৩৪	ভূজঙ্গভূষণ সেন	মাসিক	
সংবাদ	১৯৩৬	,,	সাপ্তাহিক	
দামোদর	১৯৩৬	দাশরথি তা	,,	
বৰ্দ্ধমান বার্তা	১৯৩৮	—	,,	
ছাত্র	১৯৩৯	অজিতকুমার রায়	মাসিক	বর্ধমান জেলা ছাত্র ফেডারেশনের মুখপত্র।
পল্লীকথা	১৯৪০	—	সাপ্তাহিক	
শ্রী	১৯৪১	বলাই দেবশর্ম্মা	মাসিক	
দৃষ্টি	১৯৪৪	কৃষ্ণকিশোর রায়	সাপ্তাহিক	
আর্য্য পত্রিকা	১৯৪৬	বলাই দেবশর্ম্মা	সাপ্তাহিক	এখনও প্রকাশ অব্যাহত।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করার পর থেকে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন বিপ্লবাত্মক রূপ ধারণ করে। এ জেলাতেও তার ঢেউ এসে লাগে। জেলায় স্বাধীনতা আন্দোলনকালে বহু পত্রিকা জেলাতে প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনকে জোরদার করা ও আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নেতৃত্বকে আন্দোলনে উৎসাহিত করা। অনেক পত্রিকাতে স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করে জোরালো সম্পাদকীয় লেখা হতে থাকে। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যে সব পত্র-পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করেছিল, তাদের অনেকের প্রকাশ নিয়মিত ছিল না বা অনেকগুলি দীর্ঘদিন প্রকাশিত হতে পারেনি। কারণ এই সমস্ত পত্র-পত্রিকার বেশীর ভাগই স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নেতাদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হতো। কাজেই নেতারা অন্তরীণ হলে বা কারারুদ্ধ হলে এদের প্রকাশও বন্ধ হয়ে যেত। তাছাড়া কিছু পত্রিকা রাজরোষে পড়ে বন্ধ হয়ে যায়। এই সময়ের পত্রিকাগুলির মধ্যে ছিল—বর্ধমান (অক্টোবর ১৯২২), শক্তি (আগষ্ট ১৯২৩), বর্দ্ধমান বাণী (এপ্রিল ১৯২৭), ভীমরুল (১৯২৭), তরুণ (এপ্রিল ১৯৩০), আসানসোল হিতৈষী (এপ্রিল ১৯৩১), সংবাদ (১৯৩৬), দামোদর (মার্চ ১৯৩৬), বর্দ্ধমান বার্তা (১৯৩৮), ছাত্র (১৯৩৯), শ্রী (১৯৪১), দৃষ্টি (১৯৪৪), আর্য্য পত্রিকা (১৯৪৬)। বর্দ্ধমান বাণী পত্রিকায় পূর্বে কোর্টের নীলাম ইস্তাহার ছাপা হত। কাজেই এই ইস্তাহার ছাপার জন্য এই পত্রিকার প্রকাশ খুবই নিয়মিত ছিল।

এই সমস্ত পত্রিকার মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনে 'শক্তি' পত্রিকার ভূমিকা প্রশংসনীয় ছিল। 'তরুণ' পত্রিকা তো জন্মকালেই রাজরোষে পড়ে ও অচিরেই বন্ধ হয়ে যায়। আর্য্য পত্রিকার ভূমিকাও প্রশংসনীয় ছিল। রাজরোষ এড়াতে দামোদর, বর্দ্ধমান বার্তা, পল্লীর কথা ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হতে থাকে।

ক্যানেলকর আন্দোলনের সময় বর্ধমান বার্তা, বর্ধমান বাণী, শ্রী, আর্য্য পত্রিকা ও 'বর্ধমান' বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা বলতে হবে যে, ১৯২০ সালে মুজাফ্ফর আহমদের সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'নবযুগ' পত্রিকায় যে ভাবে বিপ্লবী ভাবধারার জোয়ার বইয়ে ছিলেন কিংবা নজরুল নিজে ১৯২২ সালে তাঁর সম্পাদিত 'ধূমকেতু' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে পূর্ণ স্বরাজের দাবীতে জ্বালাময়ী ভাষায় ইংরেজকে বিব্রত করে তুলেছিলেন যার ফলে সরকার তাঁর পত্রিকাটি বন্ধ করে দেন, সেই উগ্র বিপ্লবাত্মক স্বাদেশিকতার প্রকাশ জেলার সাময়িক পত্রে দেখা যায় নাই। এই সব পত্রিকায় যে দেশানুরাগের প্রকাশ ঘটেছিল সেটা ছিল বিনয় ঘোষের ভাষায়

'বনফুলের স্বাভাবিক রূপরস গন্ধ বর্জিত কৃত্রিম কাগজের ফুলের মতো দূর থেকে দেখনসই' "সমস্ত বিজাতীয়তা থেকে মুক্ত স্বদেশ চিন্তার বলিষ্ঠ সুর" এই সব পত্রিকার মধ্যে তেমন প্রতিফলিত হয় নাই। ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল। কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই সীমিত।

স্বাধীনোত্তর কালে ১৯৪৮ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত জেলায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই সময়ে জেলায় বিভিন্ন শ্রেণীর প্রায় ২৮৫টি সাময়িক পত্র বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল।

১.	দৈনিক	—	১০
২.	সাপ্তাহিক	—	৯২
৩.	পাক্ষিক	—	৬৭
৪.	মাসিক	—	২০
৫.	দ্বিমাসিক	—	৩
৬.	ত্রৈমাসিক	—	৪২
৭.	ষান্মাসিক	—	৮
৮.	বাৎসরিক	—	১
৯.	অন্যান্য	—	৪২
	মোট :		২৮৫

স্বাধীনোত্তর কালে জেলায় প্রকাশিত সাময়িক পত্রের সংক্ষিপ্ত তালিকা

বর্ধমান সদর মহকুমা

পত্রিকার নাম	শ্রেণী	সম্পাদক	প্রকাশকাল
বর্ধমান	সাপ্তাহিক	নারায়ণ চৌধুরী	১৯৪৮
বর্ধমানের ডাক	,,	রাধাগোবিন্দ দত্ত	১৯৪৯
খোলা কথা	,,	সদানন্দ দাস	১৯৬২
সাহিত্য সানাই	ত্রৈমাসিক	বিশ্বনাথ ঘোষ	১৯৬৬
উদয় অভিযান	সাপ্তাহিক	সমীরণ চৌধুরী	১৯৬৭
চলমান	পাক্ষিক	সচ্চিদানন্দ মণ্ডল	১৯৬৮
আলিকালি পত্রিকা	পাক্ষিক	সুভাষ দেব রায়	১৯৬৮
বর্ধমান জ্যোতি	সাপ্তাহিক	মদন দাস	১৯৭০
পূর্বক্ষণ	,,	তারকনাথ রায়	১৯৭০
বিজয়তোরণ	,,	সুধীরচন্দ্র দাঁ	১৯৭১
পল্লী বর্ধমান	সাপ্তাহিক	সুকুমার সেন	১৯৭২

পত্রিকার নাম	শ্রেণী	সম্পাদক	প্রকাশকাল
ভাবনা চিন্তা	পাক্ষিক	শ্যামাপ্রসাদ কুণ্ডু	১৯৭৩
ধ্বনি	সাপ্তাহিক	সুধীর অধিকারী	১৯৭৫
সময়ের ভিড়	পাক্ষিক	শম্ভু কর্মকার	১৯৭৫
মুক্তি চাই	সাপ্তাহিক	শ্যামাপদ চৌধুরী	১৯৭৫
বর্ধমান শ্রুতি	,,	গোবিন্দ দাস	১৯৭৬
বর্ধমান রিপোর্টার	,,	নীহারেন্দু আদিত্য	১৯৭৬
বর্ধমান ডায়েরী	পাক্ষিক	সন্ধ্যা ভট্টাচার্য	১৯৭৭
গণচিন্তা	সাপ্তাহিক	নারায়ণচন্দ্র চ্যাটার্জী	১৯৭৭
নতুন চিঠি	,,	অশোক ব্যানার্জী	১৯৭৭
খণ্ডঘোষ সমাচার	,,	দেশবন্ধু হাজরা	১৯৭৭
অভিযান সাময়িকী	দ্বিমাসিক	সমীরণ চৌধুরী	১৯৭৮
চাষ আবাদ	পাক্ষিক	বিন্ধ্যনাথ ঘোষ	১৯৭৮
সংস্কৃতি সংবাদ	,,	অলোক চ্যাটার্জী	১৯৭৮
গ্রাম্য সমাচার	পাক্ষিক	ভজন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৭৮
সুইট ইণ্ডিয়া	সাপ্তাহিক	সমীর ঘোষ চৌধুরী	১৯৭৮
মেয়েদের বার্তা	পাক্ষিক	তৃপ্তি গঙ্গোপাধ্যায়	১৯৭৮
কৃষি সমবায় পত্রিকা	পাক্ষিক	সদানন্দ দাস	১৯৭৯
কবুতব	পাক্ষিক	পঞ্চানন দত্ত	১৯৭৯
ধন্যভূমি	ত্রৈমাসিক	তাপস সরকার	১৯৮০
দৈনিক মুক্ত বাংলা	দৈনিক	পুরুষোত্তম সামন্ত	১৯৮০
শুভ লিপিকা	সাপ্তাহিক	প্রণয়কুমার ভট্টাচার্য	১৯৮১
পবিত্র বাণী	পাক্ষিক	পল্লব রায়চৌধুরী	১৯৮১
মঙ্গলকোট বার্তা	পাক্ষিক	দেবকুমার ভট্টাচার্য	১৯৮১
দেশমাতৃকা	পাক্ষিক	সুধাংশু চৌধুরী	১৯৮২
ছোটদের কথা	মাসিক	কল্পনা সুর	১৯৮২
মহিলামহল	পাক্ষিক	অনীতা রায়চৌধুরী	১৯৮৪
স্বাস্থ্য ও মানুষ	ত্রৈমাসিক	বৃন্দাবন কুণ্ডু	১৯৮৫
আগামী আওয়াজ	পাক্ষিক	শুভময় দে	১৯৮৫
বর্ধমান সমাচার	সাপ্তাহিক	শ্যামাপদ কুণ্ডু ও সমীরণ চৌধুরী	১৯৮৭
সাপ্তাহিক প্রফুল্ল	সাপ্তাহিক	শিবেশ তা	

পত্রিকার নাম	শ্রেণী	সম্পাদক	প্রকাশকাল
কালনা মহকুমা			
সীমায়ন	ত্রৈমাসিক	গোবিন্দচন্দ্র রায়	১৯৭৩
সঙ্গীত শিল্পীতীর্থ	ত্রৈমাসিক	কমল মুখোপাধ্যায়	১৯৭৫
চিন্তা	ষান্মাসিক	সমীর ঘোষ	১৯৭৬
দীপায়ন	মাসিক	মন্মথনাথ সেন	১৯৭৯
জবা ভবা	মাসিক	সদয়-চাঁদ চৌধুরী	১৯৮০
হোত্রী	পাক্ষিক	গোবিন্দচন্দ্র রায়	১৯৮২
ক্রমান্বয়	ত্রৈমাসিক	—	—
কাটোয়া মহকুমা			
সর্বোদয়	সাপ্তাহিক	নন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৫৩
সাপ্তাহিক কাটোয়া	,,	শশাঙ্কশেখর চট্টোপাধ্যায়	১৯৬৫
কাটোয়ার হিতৈষী	সাপ্তাহিক	মদন চৌধুরী	১৯৭৭
কাটোয়ার কলম	সাপ্তাহিক	সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৭৭
কাটোয়া জোয়ার	,,	নিমাইচন্দ্র প্রামাণিক	১৯৭৯
যুবজোয়ার	পাক্ষিক	মোল্লা আবুল হায়াত	১৯৮০
তথ্যদর্পণ	সাপ্তাহিক	শীলা ঘোষাল	১৯৮১
তোমাদের কথা	পাক্ষিক	নিমাইচন্দ্র প্রামাণিক	১৯৮১
ধূলামন্দির	পাক্ষিক	লক্ষ্মী বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৮২
দাঁইহাট বিচিত্রা	পাক্ষিক	অজয় আইচ	১৯৭৭
আসানসোল মহকুমা			
জি. টি. রোড	সাপ্তাহিক	বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ	১৯৫৩
শ্রী লেখা	মাসিক	গীতাময় রায়	১৯৫৩
আসানসোল বাণী	সাপ্তাহিক	সুধাকৃষ্ণ গুপ্ত	১৯৬২
কোলফিল্ড ট্রিবিউন	সাপ্তাহিক	দামোদর গুপ্ত	১৯৬৩
পর্যবেক্ষক	,,	সুশীল মানখণ্ডী	১৯৬৪
আসানসোল কথা	,,	জগদীশপ্রসাদ কেডিয়া	১৯৭৬ (বাংলা ও হিন্দী)
আসানসোল অবজারভার	,,	মির্জা ইউসুফ আহমেদ বেগ	১৯৭৭
কথা বলো	সাপ্তাহিক	তুষার সরকার	১৯৭৭
দৈনিক লিপি	দৈনিক	সত্যরঞ্জন কর্মকার	১৯৮১
আসানসোল পরিক্রমা	দৈনিক সান্ধ্য	—	—

'আসানসোল সমাচার'ই আসানসোল শিল্পাঞ্চলের প্রথম প্রকাশিত পত্রিকা। সম্পাদক ছিলেন গোপেন্দ্রভূষণ সাংখ্যতীর্থ। এটি ছাপা হতো কালনার 'বিশ্বম্ভর' প্রেস থেকে। এই পত্রিকার বৈশিষ্ট্য ছিল এতে আসানসোল কোর্টের নিলাম ইস্তাহারের সংবাদ পরিবেশিত হতো। এই ইস্তাহার প্রকাশের জন্য পত্রিকাটির প্রকাশ নিয়মিত হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু সম্পাদকের নিয়োজিত ম্যানেজারের গাফিলতিতে এর প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে পড়লে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। তখন গোপেন্দুবাবু 'নবদূত' নামে দ্বিতীয় সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। গোপেন্দুবাবুর সম্পাদনায় 'আসানসোল হিতৈষী' নামে আর একটি পত্রিকা ১৯৩১ সালের ১৮ই এপ্রিল বের হয়। পরে এই পত্রিকাটি সম্পাদনার ভার নেন অনিলবরণ গোস্বামী। তাঁর মৃত্যুর পর এর স্বত্ব গোপিকারঞ্জন মিত্রের স্ত্রী মিনতি মিত্র কিনে নেন ও তিনি আজও চালিয়ে যাচ্ছেন।

দুর্গাপুর মহকুমা

পত্রিকার নাম	শ্রেণী	সম্পাদক	প্রকাশকাল
দুর্গাপুর বাণী	সাপ্তাহিক	কালিদাস রায়	১৯৬৩
পানাগড় বার্তা	সাপ্তাহিক	নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৭৩
কোলফিল্ড এক্সপ্রেস	ঐ	সুবীর ঘটক	১৯৭৩
দুর্গাপুর সংবাদ	ঐ	বিন্ধ্যনাথ ঘোষ	১৯৭৬
বর্ধমান দুর্গাপুর হেরাল্ড	ঐ	পি. কে. রায়	১৯৭৮ ইংরাজী
ইন্‌ডাসট্রি লাইফ	ঐ	গৌরাঙ্গচন্দ্র সাহা	১৯৭৮ ঐ
দুঃসাহস	ঐ	প্রসাদজী রঘুবীর	১৯৭৯ হিন্দী
দুর্গাপুর পার্সপেকটিভ	ঐ	অশোক চ্যাটার্জী	১৯৮৩
শিল্প পরিক্রমা	ঐ	সমীর ঘোষ	১৯৮১
দুর্গাপুর জনজীবন	ঐ	ইরা ব্যানার্জী	১৯৮৪
দুর্গাপুর কথা ও কাহিনী	ঐ	দেবব্রত আচার্য	১৯৮৫

এক সময় দুর্গাপুর বাণী, দুর্গাপুর সংবাদ, দুর্গাপুর, দুর্গাপুরম্, দুর্গাপুর বার্তা, সংবাদ মহাভারত, ইস্পাত বলয়, শিল্পাঞ্চল একসুর, রাঢ়বেঙ্গল, অবজারভার, দুর্গাপুর জনসমাচার, প্রীতি ও সংহতি, দুর্গাপুর মতামত, শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস, শিল্পভারতী, যুগান্তরী, এলাকার খবর, যুগহিতৈষী, জনচিন্তা, শিল্প পরিক্রমা, প্রভৃতি সাময়িক পত্র দুর্গাপুর থেকে প্রকাশিত হতো। এই সংবাদপত্রগুলি দুর্গাপুরের শিল্পাঞ্চলের বহু খবর পরিবেশন করতো। বর্তমানে এদের অনেকগুলি

অবলুপ্তির পথে। কল্যাণ দত্তের সম্পাদনায় দুর্গাপুর থেকে প্রকাশিত 'দক্ষিণবঙ্গ' নামে পত্রিকা কালের সঙ্গে সংগ্রাম করে আজও টিকে আছে।

১৯৯৬–৯৭ সালের জেলার অনুমোদিত পত্রিকার মহকুমাভিত্তিক তালিকা

বর্ধমান সদর মহকুমা :

দৈনিক . দৈনিক মুক্তবাংলা, দৈনিক স্বীকৃতি

সাপ্তাহিক : সোচ্চার, বর্ধমান সমাচার, পূর্বক্ষণ, বর্ধমান দর্পণ, মুক্তবাংলা, স্বীকৃতি, বর্ধমান শ্রুতি, প্রফুল্ল, দামোদর, মুক্ত কলম, গণচিন্তা, বিজয়তোরণ, অজানা পথিক, আর্য্য, জ্যোতি, নতুন চিঠি, পল্লী বর্ধমান, মুক্তি চাই, ধ্বনি।

পাক্ষিক : আলিকালি পত্রিকা, জিরো পয়েন্ট, সংস্কৃতি সংবাদ, ক্রীড়াক্ষেত্র, ভাগ্যের সন্ধানে, মেমারী সংবাদ, কামদুঘা, পরিবহন সমাচার, চাষ আবাদ, সময়ের ভিড়, সহানুভূতি, সত্যবাক, পবিত্র বাণী, কৃষি সমবায় পত্রিকা, চিন্তাভাবনা, রসুলপুর বার্তা, বর্ধমান মজদুর, যুগভেরী, গ্রাম্য সমাচার, দক্ষিণ দামোদর প্রকাশনী পত্রিকা, ম্যাসেঞ্জার, রোদবৃষ্টি, বর্ধমানবাণী, সাহিত্য সম্মেলন বার্তা, বর্ধমান ঐকতান, ভাবনাচিন্তা, কলকল্লোল, বার্তাকুলি, ভূমিপূজা।

মাসিক : কাঁচামিঠা, জাতীয় পত্রিকা, দৈনিক লিপি।

ত্রৈমাসিক : সাহিত্য সানাই, র‍্যাডার, সময়ের কথা, ধন্যভূমি, কলমের মুখ, নভস্পৃক্।

আসানসোল মহকুমা :

দৈনিক : জাতীয় পত্রিকা, দৈনিক লিপি

সাপ্তাহিক : ইন্ড্রাসট্রিয়াল অর্গান (হিন্দী), ইন্ড্রাসট্রিয়াল অর্গান (বাংলা), প্রান্তভূমি, আসানসোল অবজারভার, আসানসোল বাণী, আসানসোল হিতৈষী, পর্যবেক্ষক।

পাক্ষিক · কুলটি বার্তা, গ্রামাঞ্চল শিল্পাঞ্চলের খবর, আঞ্চলিক সংহতি, জামুরিয়া দর্পণ।

ষান্মাসিক : প্রতিভার সন্ধানে।

ত্রৈমাসিক . দিগন্ত সাহিত্য সংকলন, বাংলা গল্প একাদেমী।

মাসিক : আজকের যোধন।

দুর্গাপুর মহকুমা :

দৈনিক : খবর, সেতু, দৈনিক বঙ্গ পত্রিকা।

সাপ্তাহিক : বিষান (হিন্দী), হালচাল-রাজনৈতিক (হিন্দী), কোলফিল্ড পোস্ট,

দুর্গাপুর জনজীবন, পানাগড় বার্তা, বর্ধমান-দুর্গাপুর-হেরাল্ড (ইংরাজী) দুর্গাপুর সংবাদ, খনি ও ইস্পাত, খোলাকথা।

পাক্ষিক : দুর্গাপুর জন সমাচার, প্রীতি ও সংহতি, ইস্পাত, শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস, শতাব্দীর সংবাদ।

মাসিক : শিল্পসাহিত্য গবেষণা

ত্রৈমাসিক : ইস্পাতের চিঠি, সিবিল সাঁদেশ (সাঁওতালি), বিভাস, প্রতিশ্রুতি।

ষান্মাসিক : ছোটদের শিক্ষা ও সাহিত্য, দুর্গাপুরের আনন্দধারা। দুর্গাপুর-আসানসোল শিল্পাঞ্চলে প্রকাশিত পত্রিকার মধ্যে ৪টি হিন্দী, একটি ইংরাজী ও একটি সাঁওতালি ভাষায় প্রকাশিত।

কাটোয়া মহকুমা :

সাপ্তাহিক : কাটোয়ার জোয়ার, কাটোয়ার কলম, এক টুকরো বাঁশ, কাটোয়া দর্পণ, কাটোয়া হিতৈষী, সাপ্তাহিক কাটোয়া।

পাক্ষিক : গোপন তথ্য, তথ্যতর্পণ, তোমাদের কথা, ধূলামন্দির, কথার কথা।

কালনা মহকুমা :

সাপ্তাহিক—পল্লীবাসী

মাসিক : দীপায়ন, প্রাথমিক শিক্ষক পত্রিকা

পাক্ষিক : সাম্প্রতিক, হোত্রী, অম্বিকা সমাচার, পাক্ষিক, দেশমাতৃকা, সংবাদ পল্লীচিত্র, অম্বুকণ্ঠ।

ত্রৈমাসিক : সীমায়ন, ক্রমান্বয়, ভোরের তারা

ষান্মাসিক : পৌর দিশারী, শুভ মহুয়া।

পত্রিকাগুলির মধ্যে সাম্য, ছাত্র, সংবাদ, নতুন পত্রিকা, পর্যবেক্ষক, কাটোয়ার কলম ও খণ্ডঘোষ সমাচারের চরিত্র বামপন্থী।

সত্তরের দশকে নকশাল আন্দোলন, জরুরী অবস্থা ও সন্ত্রাসবাদের শিকার হয়ে 'নতুন পত্রিকা'কে বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে অবশ্য নতুন রূপে 'নতুন চিঠি' নামে আত্মপ্রকাশ করে।

ধ্বনি, স্বাস্থ্য ও মানুষ, প্রীতি ও সংহতি, ইন্ডাসট্রিয়াল অর্গান, সংস্কৃতি সংবাদ, চাষ-আবাদ, কৃষি সমবায় পত্রিকা, শিল্প-সাহিত্য গবেষণা এগুলি ভিন্ন স্বাদের পত্রিকা।

ধ্বনি, সংস্কৃতি সংবাদ, শিল্প-সাহিত্য গবেষণা—এই সব পত্রিকায় স্থানীয় কিছু সংবাদ ছাড়াও সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপর বেশী জোর দেওয়া হয়। 'ধ্বনি'র

প্রকাশ কিছুদিন বন্ধ থাকার পর বর্তমানে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। 'স্বাস্থ্য ও মানুষ' পত্রিকায় স্বাস্থ্য পরিষেবার ওপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়, 'চাষ আবাদ'-এ কৃষকদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা এবং 'কৃষি সমবায়' পত্রিকায় কৃষক ও কৃষির ক্ষেত্রে সমবায়ের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। স্পষ্ট কথা ছিল হিন্দু মহাসভার আদর্শ অনুসারী; পত্রিকাটি বর্তমানে বন্ধ আছে।

শিশুদের জন্য 'ছোটদের কথা' জেলার বাইরেও প্রচারিত হতো। ছোটদের শিক্ষা ও সাহিত্যে ছেলেদের জন্য লেখা ও ছেলেদের লেখা প্রকাশ করা হয় এবং শিশুদের মনোরঞ্জনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সত্তরের দশকে তৃপ্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনার মেয়েদের বার্তায় ও আশির দশকে অনীতা রায়চৌধুরী 'মহিলা মহল' পত্রিকায় মেয়েদের নানা সমস্যা, মেয়েদের লেখা প্রকাশ প্রভৃতির ওপর জোর দেওয়া হয়।

জেলার অনুমোদিত সাময়িক পত্রিকাগুলির সরকার অনুমোদিত প্রচার সংখ্যা হিসেব করে দেখা যাচ্ছে বর্ধমান সদরের প্রকাশিত পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ২,২৮,২৩৫। বর্ধমান সদরের লোকসংখ্যা (শহর এলাকা ধরে) ১৭,২৬,২৯১ অর্থাৎ ৮৭২ জনের জন্য গড়ে একটি করে সাময়িক পত্রিকা ভাগে পড়ে। কালনা মহকুমার লোকসংখ্যা (শহর এলাকা সহ) ৮,১৮,৫২৩ আর পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ২৩,২৮৫ অর্থাৎ গড়ে প্রতি ৩৫ জনের জন্য একটি পত্রিকা। জেলার লোকসংখ্যা ৬০,৫০,৬০৫ আর সাময়িক পত্রের প্রচার সংখ্যা ৬,০৭,৬২৯ অর্থাৎ গড়ে ১০ জনের জন্য একটি পত্রিকা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় সরকারী অফিসে ও বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছেই পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছে দেওয়া হয় বা ডাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এইসব পত্রিকার সাধারণ গ্রাহক বড় একটা নজরে পড়ে না। সরকারের ফাইলে যে প্রচার সংখ্যা থাকে সেটা মুদ্রাকরের রিপোর্টের ভিত্তিতে রেকর্ড করা হয়। মুদ্রাকরের রিপোর্ট ভাল করে যাচাই করার ব্যবস্থা থাকলে অন্য চিত্র দেখা যেত।

সরকারও যে এ বিষয়ে অবহিত নন তা নয়। প্রতিটি পত্রিকার সঠিক প্রচার সংখ্যার পরিসংখ্যান নেওয়ার জন্য শশাঙ্কশেখর সান্যাল কমিটি নিয়োগ করা হয়। সান্যাল কমিটি ১৯৮০ সালে যে রিপোর্ট দেন তাতে দেখা যায় শতকরা ৭৫ ভাগ পত্রিকার গড় প্রচার সংখ্যা ২০০ এবং ৫০০ এর মধ্যে। ১২ শতাংশের প্রচার সংখ্যা ২০০ থেকে ৫০০০ এর মধ্যে।

বর্তমানে অবশ্য কিছু কিছু দৈনিক পত্রিকা ও কিছু সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রচার খানিকটা বেড়েছে তবে খুব বেশী বেড়েছে বলে মনে হয় না। ব্যতিক্রম অবশ্যই

আছে। যেমন—দৈনিক মুক্ত বাংলা ও দৈনিক স্বীকৃতি, উদয় অভিযান পত্রিকায় স্থানীয় সংবাদ ছাড়াও বাইরের কিছু কিছু সংবাদ পরিবেশন করা হয়, তা ছাড়া স্থানীয় নবীন লেখকদের লেখা ছেপে নবীন লেখকদের উৎসাহিত করা হয়। শিশুদের জন্যও পৃথক বিভাগ আছে। এই ভাবে পত্রিকাগুলিকে আকর্ষণীয় করার চেষ্টা হয়। প্রচারও দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

আর্য, বিজয়তোরণ, বর্ধমান, দামোদর, প্রফুল্ল—পত্রিকাগুলি শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশ করে বেশ কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করতো। এখনও কিছু কিছু পত্রিকা শারদসংখ্যা প্রকাশ করে। সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এগুলির অবদান যথেষ্ট।

অধুনা অপ্রকাশিত দামোদর পত্রিকায় স্থানীয় সংবাদ ছাড়াও পল্লীর সংবাদ পল্লীসংস্কার ও গঠনমূলক কার্যের প্রতি জোর দেওয়া হতো। পূর্বে প্রয়াত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বর্ধমান শাখার মুখপত্র "ত্রৈমাসিক রাঙামাটি" পত্রিকায় বহু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। কিছু দিন প্রকাশিত হবার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। 'উদয় অভিযান' পত্রিকায় বর্ধমানের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

তবে অধিকাংশ সাপ্তাহিকে ২/৪টি স্থানীয় চুটকি সংবাদ ও স্থানীয় সরকারী অফিসের কিছু খবর ছাড়া বিশেষ কিছুই থাকে না। পত্রিকার বার আনা অংশই বিজ্ঞাপনে ভর্তি। আর সম্পাদকীয় যা থাকে তাতে বিশেষ রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটে কিংবা ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করার দিকে বেশী জোর দেওয়া হয়। কিছু কিছু পত্রিকা আছে সেগুলি কেবল আত্মপ্রচাব ও নিজের লেখা ছাপাবার জন্য প্রকাশ করা হয়।

মফস্বল-শহর থেকে যে-সমস্ত পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তাদের ২/১ জন স্থানীয় রিপোর্টার থাকে তারা সরকারী অফিস থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে পত্রিকায় প্রকাশ করে, তাও সব সংবাদ সমান গুরুত্বসহ প্রকাশিত হয় না। সরকারী সংবাদ ছাড়া স্থানীয় কিছু সংবাদ, রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতা, সভাসমিতির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। গ্রামের সংবাদ বিশেষ থাকে না। সমাজের ভিতরে এদের শিকড় নাই। শহরের সামান্য তুচ্ছ খবরও এই সব পত্রিকায় স্থান পায়, পল্লীর গুরুত্বপূর্ণ খবরের উল্লেখ থাকে না। অথচ এই সব পত্রিকা থেকে যদি ব্লকে ব্লকে কিছু রিপোর্টার নিয়োগ করা হয়, পল্লীবাসীদের সমস্যা চাষ-আবাদের খবর, পল্লীতে সাক্ষরতা প্রসারের অগ্রগতি এই সব খবর ও সেই সঙ্গে গোটা সপ্তাহের দেশে বিদেশের খবরের হেডলাইন প্রকাশ করা হয়, তা হলে এই সমস্ত পত্রিকার গুরুত্ব

বৃদ্ধি পায়। পল্লীবাসীদের মধ্যে প্রচার বৃদ্ধি পায়, মাঝে মাঝে সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কিত প্রবন্ধ, শিশুদের বিভাগ সংযোজিত হলে পত্রিকাগুলি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে ও পত্রিকার প্রকাশ সার্থকতা লাভ করে।

ছোট ছোট পত্রিকা প্রচারের পিছনে নিশ্চয়ই কিছু তাগিদ আছে। ডঃ কবিতা মুখোপাধ্যায় বর্ধমান চর্চা পুস্তকে বর্ধমানে পত্রপত্রিকা—অতীত থেকে বর্তমান প্রবন্ধে এই তাগিদগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। তাঁর ভাষায়—"পত্রিকা প্রকাশের পিছনে কাজ করে ভিন্ন ভিন্ন রুচি, চিন্তা ও মনন। সুস্থ সাহিত্যচেতনা গড়ে তোলা ও সঠিক সংবাদ পরিবেশনের উদ্দেশ্য নিয়ে যেমন পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে থাকে, বিপরীত ভাবে শুধু রাজনৈতিক চিন্তা বা স্বার্থকে চরিতার্থ করা অথবা ব্যবসায়িক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে বা ব্যক্তিগত কিছু আক্রোশ নিয়েও অনেকে পত্রিকা প্রকাশ করে থাকেন। আবার দেখা যায় নিজের লেখা ছাপাবার উদ্দেশ্য নিয়েও অনেকে লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ করে।"

বর্ধমান জেলার পশ্চিমাঞ্চল প্রধানত শিল্পাঞ্চল আর পূর্বাঞ্চল প্রধানত কৃষিপ্রধান। কৃষিপ্রধান অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাময়িক পত্রিকা কৃষকদের সমস্যা, তাদের অভাব অভিযোগ উন্নত চাষের পদ্ধতি, গ্রামীণ সমাজজীবন এই সব সম্পর্কিত সংবাদ পরিবেশন ও এই সম্পর্কিত প্রবন্ধ প্রকাশ করলে পত্রিকাগুলির প্রকাশের উদ্দেশ্য সার্থক হতে পারে। তেমনি শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক-জীবন, তাদের অভাব-অভিযোগ, কলকারখানার উৎপাদন বৃদ্ধির সমস্যা, শিল্পজাত দ্রব্যের বিপণন ব্যবস্থা সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশ বা এ সম্পর্কিত প্রবন্ধ প্রকাশ করলে পত্রিকাগুলি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে—প্রচারও দিন দিন বৃদ্ধি পাবে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রিকার সমস্যাও অনেক। এদের পুঁজি অল্প, প্রযুক্তি সেকেলে, সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা অব্যবস্থিত, সংগঠন দুর্বল এবং প্রচার সীমিত। বিপণনের ব্যবস্থা নাই বললেই হয়। এদের অস্তিত্ব নির্ভর করে সরকারী বিজ্ঞাপন ও স্থানীয় ব্যবসাদারদের বিজ্ঞাপনের ওপর। অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্যের ভাষায় "ক্ষুদ্র পত্রিকার ক্ষেত্রে পুঁজির দাসত্ব নেই, বৃহৎ মুনাফা অর্জনের তাড়না নেই; কোন কায়েমি স্বার্থের সেবার বাধ্যবাধকতা নেই; স্বাধীনতা তার কাছে অনেক বেশী বাস্তব; তার লেখকদের বাঁচার জন্য লিখতে হয় না বলেই লেখার জন্য বাঁচার সুযোগ আছে। পক্ষপাতিত্ব তার অস্তিত্বের শর্ত বলে নিরপেক্ষতার মুখোশে তার প্রয়োজন নাই; বৃহৎ পত্র-পত্রিকার আঙিনার মধ্যে গিয়ে তাদেরই সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামা ক্ষুদ্র পত্রিকার পক্ষে সম্ভব নয়, কাম্যও নয়। তার নিজের ক্ষেত্রটি আলাদা। প্রেক্ষিত ভিন্নতর।"

তাই শত বাধাবিঘ্নের মধ্যে ক্ষুদ্র পত্রিকাগুলি আজও টিকে আছে, ভবিষ্যতে টিকে থাকবে। আর্থিক অনটনের জন্য হয়ত কিছু কিছু পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাবে। তার জায়গায় আবার নতুন পত্রিকার আবির্ভাব ঘটবে। তবে পত্রিকাগুলিকে ভালভাবে টিকে থাকবার জন্য পত্রিকার মানোন্নয়ন করে প্রচার সংখ্যা বাড়াতে হবে। তেমনি এদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সরকারকেও এগিয়ে আসতে হবে। শশাঙ্কশেখর সান্যাল কমিটির সুপারিশমত সরকারকে কেবল বিজ্ঞাপন দিলেই হবে না, সস্তায় প্রয়োজনীয় সাইজের নিউজ প্রিন্ট সরবরাহ করতে হবে, ব্যাঙ্ক থেকে সহজ কিস্তিতে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে, মাঝে মাঝে প্রদর্শনী করে প্রচার বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে হবে, গ্রামীণ সংবাদ সংস্থা গঠন করে গ্রামীণ সংবাদ প্রকাশের ওপর জোর দিতে হবে। সাংবাদিক প্রশিক্ষণের ওপরও গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

সাময়িক পত্রের ইতিহাস আজ ১৮০ বছরের ইতিহাস। ১৮১৮ সালে মার্শম্যানের হাতে দিগ্‌দর্শনের আবির্ভাব লগ্ন থেকে এর যাত্রা শুরু। তারপর নানা বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়ে ইংরেজ সরকারের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে পত্রিকা প্রায় দুটো শতাব্দী পার করে নিয়ে এল। আশা করবো সাময়িক পত্রগুলি বর্ধমানের ঐতিহ্যকে বহন করে "দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব" হয়ে উঠবে বর্ধমানের জনজীবনের দর্পণ।

দ্বিতীয় পর্ব

চার অধ্যায়

জেলার মেলা ও তার সমাজতাত্ত্বিক অবদান

মেলার আক্ষরিক অর্থ মিলন—মেলার মধ্যে একটা চলার নেশা আছে, আছে মানুষের গ্রামীণ একঘেয়েমি জীবন থেকে কিছুক্ষণের জন্য পলায়ন। মেলায় আছে দোকানের পসরা। মেলার অনুষঙ্গ বারব্রত, পূজাপার্বণ উৎসব। মেলাগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কোন উৎসবকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। শিবরাত্রি বা শিবের গাজন, চড়ক, ধর্মরাজের গাজন, গ্রাম্য লৌকিক দেবদেবীর পূজাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে মেলা—আবার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষ উৎসবে আউল বাউলদের আবির্ভাব-তিরোভাব উৎসব, মুসলমান সম্প্রদায়ের উরস উৎসব, পীরসাহেবের মেলা, আদিবাসী সম্প্রদায়ের উৎসবভিত্তিক করমপূজা, ছাতাপরব, বাঁধনা উপলক্ষেও কয়েকটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামীণ জীবনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন ধর্মীয় চিন্তার সঙ্গে উৎসবের আমেজ যুক্ত হয়ে গড়ে ওঠে মেলা।

হিন্দুজাতির পূজাপার্বণ হিন্দুজাতিকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করেছে। সারা বছর আপন আপন সীমাবেষ্টনীর মধ্যে বাস করে মানুষের মন অত্যন্ত ক্লান্ত ক্লিষ্ট ও সংকুচিত হয়ে পড়ে। স্বার্থের সেই স্বরচিত কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে মানুষের অন্তরলোক থেকে আসে আহ্বান। মেলার মধ্যে গ্রামীণ মানুষ সুযোগ পায় পারস্পরিক মেলামেশার, দেশকালঘটিত নানা টাটকা খবর পায়—বৃদ্ধি পায় মনের প্রসারতা, পারস্পরিক ভাব বিনিময়। আত্মিক লেনদেনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে একটি অখণ্ড সামাজিকতা। মেলার মধ্যে যেমন আছে সর্বজনীনতা, তেমনি আছে আঞ্চলিক সংস্কৃতির স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি। যুগযুগ ধরে মেলাকে অবলম্বন করে আঞ্চলিক সংস্কৃতি আত্মপ্রকাশের সুযোগ লাভ করে আসছে। তাই গ্রামীণ সংস্কৃতিতে মেলার গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রামের মেয়েরা মেলায় আসে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে, কিছু বিনোদনের আস্বাদ পেতে, কোন দেবতার কাছে মানত শোধ করতে, কোন বিশেষ পুকুরে অবগাহন

করে রোগমুক্তির আশ্বাস পেতে। এই আশ্বাস-বিশ্বাসই গ্রামেগঞ্জে মেলা গড়ে ওঠার কারণ। এছাড়া মেলা গড়ে ওঠার কারণ সম্বন্ধে ৩০।৪।৯১ তারিখের দেশ পত্রিকায় সুধীর চক্রবর্তী মহাশয় মন্তব্য করেছেন—নিছক নষ্টামি কিংবা রঙ্গ, ইতরতা বা স্ফূর্তি, মদ ও বারবিলাসিনী, হালকা প্রণয়, পলকা পরিণয় তো গ্রাম্যমেলার প্রখ্যাত পরম্পরা। তাই মেলা দেখতে আসা কিশোরীর অন্তর্ধান একছার। গ্রাম্য বড়াই বুড়িদের বা মালিনী মাসিদের স্থান কি শুধু সাহিত্যে? বীরনগরের ওলাইচণ্ডীর জাত (জাত মানেও মেলা) নিয়ে মেয়েমহলের আমিষ ছড়া ছিল এই প্রকার—

সবাই দেবে গায়ে হাত
তবে হবে উলোর জাত।

শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে গ্রাম্যমেলায় বারাঙ্গনাদের রমরমার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বর্তমানে মেলায় এই নষ্টামি নাই বললেই হয়।

মেলার সঙ্গে ধর্মের স্পর্শ বা হালকা প্রণয় যাই থাকুক না কেন মানুষের অবাধ মিলন, পারস্পরিক ভাববিনিময় ও এক ঘনিষ্ঠ সামাজিক বিকাশের কথা অস্বীকার করা যায় না।

মেলা অনুষ্ঠিত হয় সাধারণত নদীতীরে, দেবমন্দিরের অঙ্গনে কিংবা কোন উন্মুক্ত প্রান্তরে—যে প্রান্তর ঘুমিয়ে থাকে সারা বছর, পড়ে থাকে নিঃসঙ্গ নির্জনতায়। আর মেলার নির্দিষ্ট দিনের কয়েকদিন থাকতে সহসা কোন অলৌকিক মন্ত্রবলে জেগে ওঠে সেই জনশূন্য প্রান্তর, অবহেলিত নদীর বালুর চর, মন্দির প্রাঙ্গণ। দোকানপাট, সার্কাসের তাঁবু, বাউলের গান, হাজার হাজার পুণ্যার্থী, দর্শনার্থীর ভিড়ে তাদের আনন্দ-উচ্ছ্বাস, কলকোলাহলে মুখর হয়ে ওঠে শূন্যপ্রান্তর—রূপান্তরিত হয় জনসমুদ্রে।

'পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা ৫ম খণ্ড' সংকলনে ডঃ অশোক মিত্র জেলায় ৩৬৯টি মেলার এক সারণী সংযোজন করেছেন। ডঃ গোপীকান্ত কোঙার পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার (১৪০৩) 'বর্ধমান জেলার মেলা' প্রবন্ধে জেলার ৪৮২টি মেলার উল্লেখ করেছেন। ডঃ মিত্র স্থানীয় সংবাদদাতার তথ্যের ভিত্তিতে মেলার সারণী প্রস্তুত করেছেন আর ডঃ কোঙার অক্লান্ত পরিশ্রম করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে মেলার তথ্য যোগাড় করেছেন—সে কারণে মনে হয় উভয়ের মেলা সংখ্যার এই সংখ্যাতাত্ত্বিক পার্থক্য। ডঃ কোঙার মেলাগুলির উপলক্ষ বা যে বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ করেছেন তার থেকে জেলায় মেলার নিম্নলিখিত রূপটি ধরা পড়ে।

মেলার সংখ্যা :

ক. শিবপূজা, শিবরাত্রি, শিবের গাজন বা চড়ক উপলক্ষে মেলার সংখ্যা প্রায় ৬০
খ. কালী ও শক্তিদেবীর পূজা উপলক্ষে প্রায় ৭৫
গ. ধর্মরাজের পূজা ও গাজন উপলক্ষে প্রায় ৩০
ঘ. লৌকিক ও গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা ও উৎসব উপলক্ষে প্রায় ৫০
ঙ. মনসা পূজা ও ঝাপান উপলক্ষে প্রায় ৫০
চ. রাধাকৃষ্ণ, দোল, ঝুলন, মহাপ্রভুর উৎসব ইত্যাদি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মেলা প্রায় ১০০
ছ. তিথিঘটিত বা পুণ্যস্নান উপলক্ষে প্রায় ৩০
জ. পীর, ফকির, উরস ইত্যাদি মুসলমান সম্প্রদায়ের উৎসবভিত্তিক প্রায় ৫০
ঝ. অন্যান্য উৎসব ও জন্মতিথি পালন, বড়দিন, যুব উৎসব উপলক্ষে ৩৭

মোট — ৪৮২

ডঃ অশোক মিত্র ও কোঙারের থানাভিত্তিক মেলার যে সারণী সংযোজন করেছেন তা পর্যালোচনা করলে ৪০ বৎসরের মধ্যে থানাভিত্তিক মেলার বৃদ্ধি / হ্রাস চোখে পড়বে—

থানা	ডঃ মিত্রের তথ্য	ডঃ কোঙারের তথ্য
বর্ধমান	২৮	৬৬
মেমারি	৩২	৫৩
জামালপুর	৩৩	৪৭
কালনা	৩৭	৩৮
ভাতার	১০	৩৩
মন্তেশ্বর	১৮	২২
পূর্বস্থলী	৬	২৬
কাটোয়া	২৪	১৯
কেতুগ্রাম	১৯	২২
মঙ্গলকোট	১৪	১৫
আউসগ্রাম	২২	১১
গলসী	৬	১৪
খণ্ডঘোষ	২২	১৫
রায়না	২৮	১৮
বুদবুদ	১০	৪

থানা	ডঃ মিত্রের তথ্য	ডঃ কোঙারের তথ্য
কাঁকসা	৯	৮
ফরিদপুর	৫	২
রানীগঞ্জ	১১	২
দুর্গাপুর	১	২
নিউটাউন	—	১
জামুরিয়া	১২	১৫
অণ্ডাল	১০	১৩
আসানসোল	৪	৯
কুলটি	৫	৯
সালানপুর	২	৬
হীরাপুর		৬
চিত্তরঞ্জন	—	২
বরাবনি	১	৪
মোট	৩৬৯	৪৮২

জেলার মেলাগুলির মাসভিত্তিক বিশ্লেষণ :

১. শিবপূজা গাজন চড়ক সম্পর্কিত মেলা	ফাল্গুন-চৈত্র
২. ধর্মপূজা সম্পর্কিত মেলা	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়
৩. শক্তিপূজা, কালী, যোগাদ্যা, দেবী জয়দুর্গা, সিদ্ধেশ্বরী সম্পর্কিত	মাঘ থেকে জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন-কার্তিক মাসে ও কিছু কিছু স্থানে হয়।
৪. মনসা-ঝাপান	জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র
৫. ক্ষেত্রপাল, শীতলা, পঞ্চানন ইত্যাদি লৌকিক দেবদেবী	মাঘ থেকে শ্রাবণ
৬. পুন্যস্নান	পৌষসংক্রান্তি, মাঘ ও বৈশাখ
৭. মুসলমান সম্প্রদায়ের উরস	মাঘ-চৈত্র

মাসভিত্তিক মেলার সংখ্যা :

বৈশাখ-২৯, জ্যৈষ্ঠ-৩৫, আষাঢ়-৫১, শ্রাবণ-২০, ভাদ্র-৩০, আশ্বিন-১৭, কার্তিক-১৭, অগ্রহায়ণ-৪, পৌষ-৪৬, মাঘ-৭৯, ফাল্গুন-৯০, চৈত্র-৬৪।

উপরের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পৌষ-ফাল্গুন, চৈত্র মাসেই অধিকাংশ মেলার অনুষ্ঠান হয়। এর কারণ মনে হয় কৃষিভিত্তিক এ-জেলার গ্রামবাসীদের ঘরে ধান ওঠে। এরপর আলু ও রবিখন্দের ফসল খামারজাত করা হয়, কাজেই কিছু চাষীদের হাতে কিছু পয়সাও আসে। অবসরও পায়, কাজেই সারা অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে কঠোর পরিশ্রমের পর একটু বিনোদনের ব্যবস্থা হিসেবে এই সময়েই মেলার অনুষ্ঠান।

জেলার প্রায় অর্ধসহস্র মেলার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মেলা হচ্ছে— মঙ্গলকোট থানার দধিয়ায় বৈরাগ্যচাঁদ নামক সাধুর তিরোধান উৎসব উপলক্ষে মাঘ মাসের মকরসংক্রান্তি থেকে প্রায় মাসব্যাপী বিরাট মেলা, বাবলাডিহির নেংটেশ্বর শিবের শিবরাত্রি উপলক্ষে মেলা, চৈত্রমাসের রামনবমীতে আউসগ্রাম থানার কয়রাপুরে দেবীর সপ্তাহকালব্যাপী মেলা. চৈত্রমাসের সংক্রান্তিতে কড়ুই-এর বুড়োশিবের গাজন উপলক্ষে মেলা, সদর থানার কুড়মুনের ঈশানেশ্বর শিবের গাজন উপলক্ষে মেলা, বৈশাখ মাসে বড়ো-বলরামের অক্ষয় তৃতীয়ায় চক্ষুদান উৎসব উপলক্ষে সপ্তাহকালব্যাপী-মেলা, বর্ধমানে নবাবহাটে ১০৮ শিবমন্দিরে শিবরাত্রি উপলক্ষে পক্ষকালব্যাপী মেলা, আসানসোলের সন্নিকটে উষাগ্রামে ঘাঘরাবুড়ীর পূজা উপলক্ষে মেলা, সদব থানার মাহিনগর গ্রামে খড়ি নদীর তীরে পৌষসংক্রান্তিতে সপ্তাহব্যাপী মেলা, ভাতার থানার কামারপাড়ার শ্যামসুন্দর তলায় মনসার ঝাপান উপলক্ষে মেলা, নারায়ণপুরে ফাল্গুন মাসে তারিক্ষ্যে পূজা উপলক্ষে মেলা, এরুয়ার গ্রামে শ্রাবণ মাসে জোড়াকালী পূজা ও সন্ন্যাসী গোঁসাই-এর তিরোধান উপলক্ষে মেলা, উদ্ধারণপুর, কোগ্রাম, সদরঘাট-এ মকর স্নানের মেলা, বরাকর, রূপনারায়ণপুর, বিল্বেশ্বর, বর্ধমানের আলমগঞ্জের ভিখিরি বাগানে ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উপলক্ষে মেলা; কাইগ্রাম কুসুমগ্রাম, নেড়োদিঘি ও সুয়াতায় পীরের উরস্ উৎসব উপলক্ষে ফাল্গুন মাসে মেলা, মঙ্গলকোট দিসেরগড় কৃষ্ণপুরে চৈত্রমাসে পীরের উরস উপলক্ষে মেলা, কালনা থানার নারিকেলডাঙ্গা ও মন্ডলগ্রামে জগৎগৌরী পূজা উপলক্ষে মেলা, নাড়ুগ্রামে নাড়েশ্বরের গাজন উপলক্ষে ময়ূরপঙ্খী নাচ ও মেলা, কালনা থানার গোপালদাসপুরে রাখালরাজের দোল উপলক্ষে রামনবমীতে মেলা, হাটগোবিন্দপুরে আষাঢ়ে নবমীতে পঞ্চাননের মেলা, জাড়গ্রামে কালুরায়ের গাজন

ও সুহারীর জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় ধর্মরাজের জ্যৈষ্ঠমাসে গাজন উপলক্ষে মেলা, বৈদ্যপুরের আশ্বিনের দুর্গানবমীতে সাঁওতালদের জাগরণ উপলক্ষে মেলা, কেতুগ্রাম থানার সীতাহাটিতে ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে ভাদুপূজা উপলক্ষে মেলা, মন্তেশ্বরের চামুণ্ডা পূজার মেলা, বনকাপাসীর ক্ষেত্রপাল পূজা উপলক্ষে মেলা ইত্যাদি।

পূর্বে অধিকাংশ মেলা রাজা, জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছিল; বর্তমানে রাজাও নাই, জমিদারও নাই। কাজেই বর্তমানে গ্রামের ক্লাব বা গ্রামের প্রবীণ-নবীনদের নিয়ে গঠিত মেলা কমিটিগুলি মেলা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কোন দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য পুরোহিত বা সেবাইতগণ মেলার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় পুণ্যস্নান বা বারোয়ারী পুজো উপলক্ষে যেখানে বিশাল জনসমাবেশ হয়, সেখানে যাত্রী বা পূজার্থীদের মধ্যে তাদের প্রয়োজন বুঝে আইসক্রীম, বাদাম, পাঁপর ভাজা, মিষ্টান্নের বা পূজার সামগ্রী যেমন ফুল-মালা, সিঁদুর, লোহা বিক্রয় করে কিছু লাভের আশায় ফেরীওয়ালারা মেলার সূচনা করে; তাদের দেখাদেখি অন্যান্য জিনিসের পসরা নিয়ে বিক্রি করে লাভের আশায় নানা জিনিসের দোকানপাট বসতে শুরু করে। মেলার সূচনা হয় এইভাবে; তারপর মওকা বুঝে ক্লাব বা মেলা কমিটি এগিয়ে আসে।

বর্তমানে সরকার ও কিছু কিছু ক্লাব সাংস্কৃতিক মেলার পরিচালনার ব্যাপারে এগিয়ে এসেছেন। সরকার পরিচালিত মেলার মধ্যে আছে সাংস্কৃতিক মেলা, বইমেলা, স্বাস্থ্যমেলা, শিশুমেলা, বস্ত্রমেলা, কৃষিমেলা, বাণিজ্যমেলা, শিল্পমেলা। এইসব মেলার উদ্দেশ্য মেলায় জিনিসপত্রের ব্যাপক প্রচার, ক্ষুদ্রশিল্পী ও লোকশিল্পীদের উৎসাহ দেওয়া, স্বাস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদি। এইসব মেলাতেও মানুষের ঢল নামে, তবে জিনিসপত্র কেনবার উদ্দেশ্যে যত লোক আসেন তার বহুগুণ আসেন হুজুগে পড়ে। বর্ধমানে উদয় সঙ্ঘ ক্লাব বইমেলা ও অনেক সাংস্কৃতিক মেলার অনুষ্ঠান করে। মেলার সাজসজ্জা ও পরিকল্পনার দিক থেকে প্রায় সমস্ত মেলারই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রায় এক। মেলার এক একটি অংশে সারিবদ্ধভাবে বসে এক একরকমের সাজানো দোকান—মিষ্টির দোকানেরই রমরমা বেশী, সারি সারি মিষ্টির দোকানে বিশাল রাক্ষুসে সাইজের রাজভোগ, ছোট নোড়ার সাইজে পানতুয়া, বড় বড় খাজা সাজানো, গরম গরম পেটা পরোটা, কোথাও ঢাকাই পরোটা আর তরকারি লোকে গোগ্রাসে গিলছে, একদিকে গরম গরম জিলিপি ভেজে রসে ডোবানো হচ্ছে; শিঙ্গাড়া, বড় বড়

ঢাউস সাইজের কচুরি, গজা, বরফি, শনপাপড়ি সব থরে থরে সাজানো। পাশেই বসেছে বেগুনি, চপ, পাঁপর ভাজার দোকানের সারি, কোনখানে বাদাম, হরেকরকম চানাচুর, পাউরুটি, বিস্কুটের দোকানের সারি, তাঁতের শাড়ি, হাওড়ার মঙ্গলাহাটের সস্তা দরের ফ্রক, ইজের, ব্লাউজ-এর পসরা সাজিয়ে দোকানী খদ্দের ডাকছে। কোথাও মণিহারী, কোথাও কৃষ্ণনগরের পুতুলের, পাশাপাশি স্থানীয় ছুতার মিস্ত্রীদের তৈরী মাটির পুতুল, প্লাস্টিকের নানারকমের পুতুল, প্লাস্টিক ও স্টেনলেস স্টিল ও অ্যালুমিনিয়ামের তৈজসপত্রের দোকানের পাশেই কুমোরের 'পনে' পোড়ানো মাটির হাঁড়ি-কলসী, মালসা, খাপুরি, কুজো টিমটিম করছে। এখন অ্যালুমিনিয়াম স্টেনলেস স্টিলের রমরমা, মাটির হাঁড়ি মালসার চাহিদা কম। কোথাও মাদুর, শীতলপাটি, বাশের চাটাই-এর দোকান সাজিয়ে বসেছে মেদিনীপুরের পসারীরা। চায়েব দোকান, রেস্টুরেন্টের সারি মেলার একপাশে, বাঁশি, বেলুন ও আইসক্রীমের বাক্স নিয়ে অনেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে মেলাময়। আবার একটা বাঁশের শীর্ষভাগে তিনফুট বাই তিনফুট বাখারি দিয়ে চালিব মত করে তাতে হরেক কিসিম মাল সাজিয়ে হেঁকে বেড়াচ্ছে ফেরিওয়ালা—ঐটুকু চালির মধ্যে নাই কি—ফিতে, সেফটিপিন থেকে আরম্ভ করে আয়না চিরুনি, প্লাস্টিকের পুতুল, আবার ফেরিওয়ালার হাতে কোমরে, কাঁধের ব্যাগেও সস্তা পাঁজি, ব্রতকথার বই, লক্ষ্মীর পাঁচালি, শিশুদের ছড়ার বই—এইসব নিয়ে মেলাময় ঘুরে ঘুরে ফেরি করে বেড়াচ্ছে। দেবতার স্থানে দেবতার পূজার ফুল-মালা পূজার ডালি নিয়েও পসরা বসে। শীতকালের মেলা হলে শাঁকআলু ঢেলে খোলা আকাশের নীচে ব্যাপারীবা সস্তা দর হাঁকতে থাকে, আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের মেলায় আম কাঁঠাল আনারসের ঢালাও বিক্রির ব্যবস্থা—এর পাশে বসে আম লেবু নারকেলের কলমের সম্ভার নিয়ে কোন নার্শারীর মালিক। কোথাও দেখা যায়—মেলার একপ্রান্তে সার্কাসওয়ালা তাঁবু ফেলেছে, ঘোড়ার পায়ের খুরের শব্দ, খাঁচার ভিতর বাঘের ঘোরা-ফেরা দেখতে দর্শনার্থীর ভিড়, ঝাপান উপলক্ষে সাপুড়েদের সাপ খেলানো একটা বড় আকর্ষণ। বর্তমানে মেলায় নানা বিচিত্রানুষ্ঠান, যাত্রা, থিয়েটার, কীর্তন, রামায়ণ গান, বাউল সঙ্গীত, কবিয়ালের তর্জা, আলকাপ, লেটো, সিনেমা, মেলার সংস্কৃতিকে তুলে ধরে। কোথাও বা লটারীর খেলা, কোথাও বা চাঁদমারির খেলা, পটুয়াদের আতস কাঁচের ভিতর বক্সে ভ্রাম্যমাণ সিনেমা প্রদর্শনী। আগে মেলায় পৌরাণিক বা মহাকাব্যের কাহিনীকে কিংবা সমসাময়িক সামাজিক ঘটনা, যেমন বধূর দ্বারা শাশুড়ীর হেনস্থা, শাশুড়ীর বধূনির্যাতন—এসব ঘটনাকে রূপায়িত করে বড় বড় মাটির মূর্তির প্রদর্শনী

হতো। মহারাজার আমলে সর্বমঙ্গলা মন্দিরের পূর্বে উইলবাড়ীর মেলায় এরকম সুন্দর সুন্দর নয়নাভিরাম মূর্তির প্রদর্শনী ছিল বড় আকর্ষণ। মেলায় বাঁদর-খেলা এবং ভালুক নাচও বাদ যায় না।

বর্তমানে নাগরদোলা, মেরী-গো রাউন্ডে ঘুরতে ঘুরতে ছেলেমেয়েদের হুল্লোড় চোখে পড়বার মত। বর্তমানে ভিডিও এবং 'ব্লু ফিল্ম'-এর মেলায় অনুপ্রবেশ ঘটছে। ফলে মেলার সংস্কৃতির পাশে অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ মেলার সুস্থ পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলছে।

মধ্যে মধ্যে উদ্যোক্তাদের মাইক থেকে শোনা যাচ্ছে অমুক গ্রামের অমুক তোমার বাবা-মা আমাদের মঞ্চে অপেক্ষা করছে, তুমি যেখানেই থাকো তাড়াতাড়ি আমাদের মঞ্চে চলে এসো। মিষ্টির দোকানের সামনে কোন এক আদিবাসীর ছেলে বা ভিখিরি বালক জুলজুল নয়নে দোকানে সাজানো মিষ্টির দিকে তাকিয়ে আছে—কোন ছেলে হয়ত বাবা-মার কাছে আবদার ধরেছে ঐ মিষ্টিটা খাবো, পানতুয়া খাবো, আইসক্রীম খাবো—বাবার পয়সা নাই কিনে দেবার তাই বাবা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে সস্তায় দু'আনা দামের আইসক্রীম কিনে দিয়ে তাকে ভোলাবার চেষ্টা করছে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে মুলুকরাজ আনন্দের The lost child গল্পের সেই হারিয়ে যাওয়া ছেলেটির কথা—বসন্ত উৎসব উপলক্ষে বাবা-মায়ের সঙ্গে মেলায় এসে নাগরদোলায় চাপবার আবদার জানিয়ে ছেলেটি খুঁজে পেল না তার বাবা-মাকে। তার চোখে নেমে আসে অন্ধকার। চোখের জলে নাগরদোলা, সাপুড়ের সাপ খেলানো, মিষ্টির দোকানের বরফি সব একাকার হয়ে গেল।

A sweet meat seller hawked Gulab Jamun, rasogolla, burfi, Jelapi—The child stared open eyed and his mouth watered for burfi—that was his favourite sweet. ...A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple baloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colours and he was possessed by an overwhelming desire to possess it them all. But he well knew his parents would never buy him the baloons. A juggler stood playing a flute to a snake. There was a round-about in full swing, men women and children carried in a whirling motion and cried with dizzy laughter.... he made a bold request—I want to go on the round-about. Please father,

mother. There was no reply... কোথায় বাবা মা কারও কোন সাড়া নাই— বাবা মা বলে ছুটে বেড়াচ্ছে মেলাময় কেউ সাড়া দেবার নাই। শিশুর কাছে গুলাবজাম, বরফি, সাপের ফণা তুলে খেলা, নাগরদোলা সব মুছে একাকার হয়ে গেল. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother I want my father. মেলার এ এক বাস্তব চিত্র।

মেলার সামগ্রিক আনন্দময় পরিবেশ অনাথ শিশুর বেলুনের ইন্দ্রধনুর দিকে তাকিয়ে অশ্রুসজল নেত্রে আকুল আবেদন মেলার আনন্দময় পরিবেশে বিষাদের প্রলেপ লাগিয়ে দেয়। এরই প্রতিচ্ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সুখ দুঃখ' কবিতায়—

আজকে দিনের মেলামেশা
যত খুশি যতই নেশা
সবার চেয়ে আনন্দময়
ওই মেয়েটির হাসি
এক পয়সায় কিনেছে ও
তালপাতার এক বাঁশি।

এরই পাশে দুঃখের ছবি—

আজকে দিনের দুঃখ যত
নাইরে দুঃখ উহার মতো,
ওই যে ছেলে কাতর চোখে
দোকান পানে চাহি,
একটি রাঙা লাঠি কিনবে
একটি পয়সা নাহি,
চেয়ে আছে নিমেষহারা
নয়ন অরুণ,
হাজার লোকের মেলাটিরে
করেছে করুণ।

সুদূর কোন অতীতকাল থেকে জেলায় এই মেলাগুলি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে, তবু তারা পুরানো হয় না, আধুনিকতার প্রলেপে তারা নিত্যনতুন। এগুলির মধ্যে শোনা যায় আবহমানকালের জনচিত্তের মর্মরিত হৃৎস্পন্দন।

লোকধারক যে ধর্ম—তাকেই ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, আনন্দ-উৎসব অনুষ্ঠান। এই ধর্ম এক এক গোষ্ঠীকে, গোষ্ঠীতন্ত্রকে যেমন

ধরে রেখেছে তেমনি বিভিন্ন ধর্মের সংঘাতে একে অপরকে প্রভাবিত করেছে। ধর্মস্থানে তীর্থস্থানে দেখা যায় সব ধর্মের মানুষ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। জেলার মেলাগুলিকে দেখলে এর সত্যতা উপলব্ধি হয়।

জেলার আধুনিককালের সাংস্কৃতিক মেলা, বাণিজ্য মেলা, বইমেলা, কৃষিমেলা, শিল্পমেলাগুলিকে বাদ দিলে প্রাচীনকাল থেকে আবহমানকাল ধরে যে-সব মেলা চলে আসছে সেখানে দেখা যায় এক এক সম্প্রদায়ের উদ্যোগে মেলাগুলি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু মেলা যখন বসে যাচ্ছে তখন সেখানে বিশেষ সম্প্রদায়ের কোন প্রাধান্য থাকে না। 'ব্যক্তি ডুবে যায় দলে,/ মালিকা পড়িলে গলে /প্রতি ফুলে, কেবা মনে রাখে।' মেলা তখন হয় জাতিধর্মনির্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার মিলনক্ষেত্র।

নবাবহাটে ১০৮ শিবমন্দিরে শিবরাত্রি উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী যে মেলা বসে—সেখানে শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, হিন্দু-মুসলমান, হাড়ি, মুচি, চণ্ডাল, কুমারী, সধবা, বিধবা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই যোগ দেয়। দধিয়া-বৈরাগ্যতলায় মাঘ মাসে মাকরী সপ্তমী থেকে বৈরাগ্যচাঁদ বাবাজীর তিরোধান উপলক্ষে যে মাসব্যাপী বিরাট মেলা বসে সেখানে কেবলমাত্র বাবাজীরাই যোগ দেয় না—তারা সংখ্যায় হয়ত বেশী থাকে, কিন্তু শাক্ত, শৈব এমনকি মুসলমান সবাই মেলা দেখতে আসে। জামালপুরের বুড়োবাজের মেলা, নারকেলডাঙ্গায় জগৎগৌরীর মেলায় উগ্রক্ষত্রিয়, সদগোপদের পাশাপাশি হাড়ি, ডোম, মুচি, বাগ্‌দী, বাউড়ী ছাড়াও বৈষ্ণব, শৈব এমনকি মুসলমানও অংশগ্রহণ করে। বুড়োরাজের মেলায় তো মুসলমানরা মানত করে। ছাগবলিও দেয়। আবার সুয়াতা ভালকী, নেড়োদিঘি ও বোহারে পীরের উরস উৎসব উপলক্ষে মেলায় হিন্দু-মুসলমান সকলে যোগদান করে। মঙ্গলকোটে পীর পঞ্চাননের মেলায়, কুসুমগ্রাম, মণ্ডলগ্রামের পীরের মেলায় মুসলমানদের প্রাধান্য থাকলেও হিন্দুরা যোগ দেয়, হিন্দু-নারীরা পীরের কাছে শিরনি দেয়, তাগা বাঁধে। এইভাবে দেখা যায় মেলায় বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সুর ধ্বনিত হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এক মেলবন্ধনের চিত্র চোখে পড়ে। আসানসোলের ঊষাগ্রামের কাছে ঘাগর চণ্ডীর পৌষমাসের মেলায় হিন্দুদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হলেও এ-মেলায় আদিবাসীদের প্রাধান্য বেশি। চৈত্রমাসে চড়কের মেলাতেও সাঁওতালরা দলে দলে যোগ দেয়, মাদল বাজিয়ে ময়ূরের পালক নিয়ে মেয়েপুরুষে নৃত্য করে।

এইভাবে মেলায় এসে ধনী, নির্ধন, উচ্চ-নীচ, হিন্দু-মুসলমান, ইতর-ভদ্র, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মিলেমিশে এক হয়ে যায়, তাই তো এর নাম মেলা। বিভিন্ন

সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ, আহার-বিহার, পারস্পরিক ভাব বিনিময় গ্রামবাংলার জনজীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। মেলার কয়েকদিন পল্লীর একঘেঁয়েমি জীবনে আনন্দের জোয়ার আসে। দধিয়া বৈরাগ্যতলায়, রানীগঞ্জের পীরের মেলায়, বরাকরের ও নবাবহাটের শিবরাত্রির মেলায় মানুষের ঢল নামে—বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন সমাজ, বিভিন্ন জাতির ঘটে সমন্বয়। জেলার মেলাগুলিতে গঙ্গাসাগর মেলা, হরিহরছত্রের মেলা কিংবা প্রয়াগের কুম্ভমেলার মত সর্বভারতীয় চরিত্র খুঁজলে হয়ত হতাশ হতে হবে, কিন্তু জেলার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর একটা চিত্র নজরে পড়বে। মেলায় এই যে বিরাট জনসমাবেশ ঘটে এর উদ্দেশ্যও বহুমুখী। কেউ আসে পুণ্য অর্জন করতে, কেউ আসে ব্যবসা করতে, সাধারণ মানুষ আসে সংসারের একঘেঁয়েমি ও নিরানন্দময় জীবনে কিছুটা আনন্দ উৎসাহের রসদের খোঁজে। যাত্রা পার্টি, লেটোর দল, সার্কাস পার্টি আসে জনগণকে আনন্দ দিতে ও সেই সঙ্গে কিছু অর্থ উপার্জনের আশায়। আউল, বাউল, ভিখারী, অন্ধ, খঞ্জ আসে কিছু ভিক্ষে পাবার আশায়। গাঁটকাটা চোর- ছেঁচরও ঘুরে বেড়ায় শিকারের লোভে। লুম্পেন ছোকরারা আসে মদ খেয়ে জুয়া খেলে, ভিডিও, ব্লু-ফিল্ম দেখে নষ্টামি করতে, আবার বেশ্যারা আসে 'চারিগাছা মলের ঝনঝনানিতে গ্রাম্যচার্যীদের ও পাইক পেয়াদা নগদীদের তৃষিত চিত্ত উদভ্রান্ত করতে'। আবার---

আউল বাউল কপনিধারী
যতশুদ্ধাচারী জপে মালা।
উদাসীন দরবেশ গোঁসাই
ফুৎকার অবধৌতি নিতাই
উন্মত্ত সদাই গ্যাঁজাডলা ॥

(রামাত নিমাই ব্রহ্মচারী)

এই বর্ণনায় মেলার আর একচিত্র ফুটে ওঠে। মেলায় ঘটে ধর্ম-অর্থ-কামের সহাবস্থান। মেলা সমাজের মুকুর, এই মুকুরে গ্রামীণ সমাজের এক পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়। "একটা সহজ লেনদেনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে মেলায়। সেই লেনদেন নানাবর্গের মানুষের ভাবগত। আর কত রকমের, কত স্বভাবের মানুষ—বিকিকিনির মানুষ ধর্মকর্মের মানুষ, সাধু-ফকির, আমীর-গরীব, গুরু-শিষ্য, মুর্শিদ-মুরিদ সব এক ঠাঁই। মেলা মানেই মেলামেশা। ইতর-ভদ্রে ভেদ নাই, জাতাজাতির বিভাজন নেই, খাদ্যাখাদ্যে বিকার নেই। কিছুটা অনিয়ম আছে। ধুলোয় বসে কলাপাতায় খাওয়া। পানীয় জল বলতে নদীর জল। .....আখড়ায়

আখড়ায় গানের আসর, কীর্তন, দেহতত্ত্বের গান, কোথাও বা ফকিরি শব্দগান, মুর্শিদি গান, যত গ্রাহক তার একশো গুণ শ্রোতা। তারা বুঝদার, মরমী, সব ঠাঁই খাওয়ার আহ্বান। গাছতলা ঘিরে আশ্রয়। সেইখানেই একেবারে নীল আকাশের নীচে, ঘাসের শয্যায় শুয়ে পড়া। এমন মুক্ত দুশ্চিন্তাহীন জীবন, হোক না একদিনের বা দুদিনের—তবু বড় রোমাঞ্চকর, বড় মনোরম।" কেউ আসে মেলার টানে, কেউ আসে মানুষ দেখতে জানতে বুঝতে, কেউ বা সাধুসঙ্গ লোভে, কেউ স্থান-মাহাত্ম্যে..... কেউ আসে স্ফূর্তি করতে, মজা লুটতে। 'গ্রামে এখন বড় দলাদলি নোংরা রাজনীতি। তার থেকে সরে এসে দুয়েক দিন নিশ্চিন্তে থাকা আর কি? মেলা তাহলে একটা আড়াল, একটা পলায়নভূমি।' (দেশ, ৩০।৪।৯১)

"মেলা মানে জনসমুদ্র, সামনে লোক, পেছনে লোক, লোক ডাইনে বাঁয়ে। এখানের কারো গতি একমুখী নয়—বহুমুখে চলেছে জনতার মিছিল। লোক চলছে, চলছে চলা-নামের মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে।"

মেলার সাংস্কৃতিক মূল্যও কম নয়। যাত্রা, থিয়েটার, কীর্তন, বাউল গান, পুতুল নাচ, লেটো গান, আলকাপ, সিনেমা সবই আছে। মেলায় হয় কবিয়ালের লড়াই, মৃৎশিল্পীদের প্রতিযোগিতা, নানারকম ছবি, পটুয়াদের পট, সোলাশিল্পের কাজ ও খড়ের ছবির, কাঠের মূর্তির প্রদর্শনী, ডোকরা শিল্পের তামা পিতলের মূর্তির প্রদর্শনী, মেলা গ্রামীণ লোকশিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছে। মেলা অনেক শিল্পের নতুন করে প্রাণসঞ্চার করেছে—শিল্পীদের উৎসাহ যুগিয়েছে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিকতার প্রলেপ পড়ছে—অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটছে। গ্রামের যে-সব ছুতোর মিস্ত্রী আগে নানারকম মাটির পাখী, বাঘ, সিংহ, পুতুল গড়ে জমকালো রঙ দিয়ে বিক্রি করতো, প্লাস্টিকের পুতুলের দৌলতে গ্রামের মৃৎশিল্প আস্তে আস্তে লোপ পাচ্ছে। ছুতোর মিস্ত্রীরা আগে গ্রাম থেকেই কাঠ সংগ্রহ করে সেই কাঠ কুঁদে রঙ দিয়ে ছোট ছোট নারী মূর্তি, গৌরনিতাই তৈরী করে মেলায় দু'আনা এক আনায় বেচে দু'পয়সা রোজগার করতো—তাও লোপ পেতে বসেছে। এখন কাঠ, শোলা, খড়, পোড়ামাটির বড় লোকদের ঘর সাজানো সৌখীন সূক্ষ্ম sophisticated art-এর রমরমা। এগুলির সাংস্কৃতিক মূল্যও কম নয়। কিন্তু এ-সমস্ত শিল্পীরা জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্তির দিকে লক্ষ্য রেখে. সরকারের স্বীকৃতি আদায়ের তাগিদে সুন্দর সুন্দর নয়নাভিরাম সব মূর্তি তৈরী করছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথায় 'হেতু আসিয়া যেখানে মুরুব্বি হইয়া বসে সেইখানেই সৃষ্টি মাটি হয়।' কিন্তু প্রকৃত লোকশিল্প লোক আপনিই সৃষ্টি করে আসছে। আমাদের গ্রামের মৃৎশিল্পীরা 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' যে-সব মাটির পুতুল,

কাঠের পুতুল তৈরী করতো তার মধ্যে সৌখিনতার ছাপ ছিল না। ছিল না সূক্ষ্ম শিল্পচেতনা কিন্তু লোকশিল্প বলতে যা বোঝায় যেটা লোকসাধারণ আপন খেয়ালে তৈরী করে আসছেন—সেই শিল্প। সেই শিল্প বর্তমানের সৌখিন শিল্পের মধ্যে খুঁজতে গেলে হতাশ হতে হবে। মেলায় আগে যে-সব যাত্রা-থিয়েটার হতো গ্রামের ক্লাব, গ্রামের জনগণের মধ্য থেকে কুশীলব নির্বাচন করে মাসাবধিকাল রিহার্সাল দিয়ে আসরে নামত—কি উৎসাহ, উদ্দীপনা ছিল সেসব যাত্রার কুশীলব ও গ্রামের জনগণের মধ্যে। শিল্পীদের সফলতা, ব্যর্থতা জনগণই ভাগ করে নিত। তাছাড়া এইরকম যাত্রার মহড়া দিতে দিতে গ্রাম থেকে ভাল ভাল শিল্পী বের হয়ে আসতো। আজ আর সে সব সখ যেন উঠে গেছে। এখন শহর থেকে নামীদামী কোম্পানীকে ৩০।৪০ হাজার টাকার বায়না করে ২।১ জন সিনেমা আর্টিস্টের অভিনয়ের প্রচার চালিয়ে মেলার উদ্যোক্তারা টিকিট বিক্রি করে যাত্রার অনুষ্ঠান করে। সিনেমা আর্টিস্টের নাম শুনে লোকে টিকিটও কেনে। উদ্যোক্তাদের লাভও হয় কিন্তু গ্রামের যাত্রাদলের অভিনয়ের যে উৎসাহ উদ্দীপনা মাসাবধিকাল ধরে চলত তার ছিটেফোঁটা শহুরে যাত্রায় অনুভূত হয় না। কমলালেবুর আস্বাদ কি 'সি' ভিটামিনে পাওয়া যায়? আগে মেলায় আলকাপ, লেটোর আয়োজন হত, তা আজ অবলুপ্তির পথে। লেটো বা নেটো বর্ধমান জেলার লোকসংস্কৃতিকে দীর্ঘদিন সমৃদ্ধ করে রেখেছিল। নজরুল ইসলাম প্রথম জীবনে লেটো দলে গান করেছেন, লেটোর গান বেঁধেছেন। আজকাল সংস্কৃতির এই ধারাটি শুকিয়ে এসেছে 'কিছুটা আলকাপ কিছুটা যাত্রাগানের রূপ' নিয়ে ধুঁকছে। লেটোর দল যখন গান ধরতো—

বিরস রমণী তুমি
মিছে কেন আঁখি ঠারো,
আমি না মজিলে পরে
তুমি কি মজাতে পারো,
মাকড়সার জাল পেতে তুমি
আকাশের চাঁদ ধরতে পারো।

তখন শ্রোতাদের মধ্যে 'ইনকোর', 'ইনকোর', ধ্বনি; মুখের 'সিটি'তে মেলা সরগরম হয়ে উঠতো। এখন ভিডিওই এসবের স্থান নিয়েছে। এখন সময় এসেছে গ্রামীণ সংস্কৃতিকে আবার জাগিয়ে তোলার, মেলার অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলে মেলার সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার—আমাদের সম্মিলিত ও গতিশীর্ণ সংস্কৃতিকে রক্ষা করার এ দায়িত্ব মেলার উদ্যোক্তাদেরই নিতে হবে।

ডঃ গোপীকান্ত কোঙার তাঁর 'বর্ধমান জেলার মেলা' প্রবন্ধে আশা প্রকাশ করেছেন। "আমাদের সংস্কৃতি সম্মিলিত ও গতিশীল। সংস্কৃতির স্বচ্ছন্দ প্রকৃতির এটা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। কালের পরিবর্তনে বা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মেলাগুলির প্রকৃতি, পরিবর্তন অথবা বিবর্তন মানুষের সুস্থ সংস্কৃতি-সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করতে পারবে বলে আশা করা যায়।"

বর্তমানে সরকার এই সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছে। এটা আশার কথা। সরকারের সহযোগিতায় স্থানীয় ক্লাবের কিংবা সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের পরিচালনায় সংস্কৃতি-মেলা, যুবমেলা এইসব মেলার অনুষ্ঠানে একদিকে যেমন সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে ধরে রাখাব চেষ্টা হচ্ছে তেমনি এই মেলার শিল্পদ্রব্য, কৃষির প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কৃষির উন্নততব পদ্ধতি, লোকশিল্পীদের শিল্পসামগ্রীর প্রচার ও আদানপ্রদানের এবং লোকশিক্ষার দিকটিও উপেক্ষণীয় নহে।

মেলাব অর্থনৈতিক দিকটিও উল্লেখ করার মত। অতীতে কৃষিনির্ভর গ্রামগুলি ছিল স্বনির্ভর, স্বয়ংসম্পূর্ণ। চাষী মাঠে সব্জী, রবিখন্দ ফলাতো, তাঁতী তাঁত বুনতো ও কাপড় গামছা তৈরী করতো, কুমোর হাঁড়ি কলসী তৈরী কবতো, কাঠের মিস্ত্রী দরজা জানালা তৈবী করতো। গ্রামের এই সব জিনিস নিয়ে চাষী, মিস্ত্রী মেলায় আসতো—মেলায় এসে যাত্রীরা নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিস পছন্দ করে কিনে নিয়ে যেত। এখন গ্রামের সঙ্গে শহরের যোগাযোগ সহজ ও সরল হয়েছে। এ্যালুমিনিয়াম, স্টেনলেস স্টীল, প্লাস্টিকের বালতি, মগে বাজার ছেয়ে গেছে। কাজেই হাঁড়ি কলসী, কাস্তে কাটারির দিন গিয়েছে। তা বলে মেলায় অর্থনৈতিক লেনদেন এব ঘাটতি তো হয় নাই বরং অনেকগুণ বেড়েছে। গ্রামের লোকের যাওয়া-আসা কমে নাই ববং অনেক পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে।

"বিক্রিবাটা অবশ্য সবচেয়ে বেশি মিষ্টির দোকানে আর ভাতের হোটেলে। মিষ্টির দোকানে বিশাল রাক্ষুসে সাইজেব রাজভোগ বিক্রি হচ্ছে অক্লেশে। বড় বড় খাজা সাজানো। গরম গরম পেটা পরোটা ঢাকাই পরোটা, আর তরকারি খুব বিকোচ্ছে। গরম জিলিপির লোকপ্রিয়তা কয়েক দশকে কিছুমাত্র কমেনি। পাঁপর, আইসক্রীম, বাদামভাজা, তেলেভাজার বাজার খুবই ভালো।" তাছাড়া সার্কাস পার্টি, পটের গান, নাগরদোলা, যাত্রাপার্টি, কাপড়ের ব্যবসাদার, অন্যান্য দোকানদার সবাই আসে কিছু রোজগারের আশায়। ভিক্ষুক আসে, বেশী ভিক্ষে পাবার সুযোগ পায়। গ্রামের চাষীরা এখন বছরে দুই তিন বার ফসল ফলিয়ে অবস্থা স্বচ্ছল করে ফেলেছে। শ্রমিকদের দিন মজুরি অনেক বেড়ে গেছে, মোটের ওপর পৌষ থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত গ্রামের লোকের হাতে দু পযসা জমে। মেলায়

সেই সব বাড়তি পয়সা খরচ করে। গ্রামের ব্যবসাদারের মধ্যে সেই উদ্বৃত্ত অর্থ বন্টিত হয়, গ্রামীণ অর্থের সচলতা বাড়ে। আবার অন্য দিকটাও উপেক্ষণীয় নয়। গ্রামের লোকে একদিকে যেমন মেলা থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করে অন্যদিকে আবার গ্রামে উৎপাদিত জিনিসপত্র যেমন হাতা, খুন্তি, বাঁশের কুলো, ডালা, চাঙাড়ি, কুমোরদের হাঁড়ি কুড়ি খাপুড়ি, ছুতোর মিস্ত্রীর তৈরী দরজা-জানালা, খেলনা, পুতুল, প্রচুর না হোক কিছু তো বিক্রি হচ্ছে। আঞ্চলিকভাবে উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্র এই মেলা। মেলার দোকানদারের অনেকের কাছে এক মেলা থেকে আর মেলায় দোকান নিয়ে যাওয়া ও মেলায় ব্যবসা করাই প্রধান জীবিকা। এই ভাবে গ্রামীণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মেলার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

কিন্তু বর্তমানে মেলার চরিত্র, মেলার চালচিত্র দিন দিন বদলাচ্ছে। এসবে অংশ গ্রহণকারীদের মর্জি বদলাচ্ছে। মেলার জন্য নির্দিষ্ট স্থান দিন দিন সংকুচিত হচ্ছে। জনগণের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা মেলার পরিসরকে সঙ্কুচিত করছে। লোকসংখ্যা যত বাড়ছে মাথা গোঁজার ঠাঁই-এর জন্য মানুষ এই পড়ে থাকা জায়গার ওপরই আগে হাত বাড়াচ্ছে; চারদিকে বস্তি, বাড়ী, জনপদ গড়ে উঠছে। সাধারণের পড়ে থাকা জায়গা হিসেবে মেলার আসরই সহজলভ্য। তাছাড়া মেলার উদ্যোক্তাগণ মেলার যাত্রীদের থাকার একটা আস্তানার কথা ভেবে মেলাপ্রাঙ্গণের চারদিকে ছোট ছোট ঘরবাড়ী তৈরী করে নিজেদেরও দুপয়সা আয়ের ব্যবস্থা করছে। এ উদ্যোগ অবশ্য ভাল, কিন্তু তার জন্যে মেলার পরিসরকে সঙ্কুচিত না করে আশেপাশের জায়গা সংগ্রহ করে সেখানে যাত্রীদের আশ্রয়শিবির তৈরী করলে মেলার পরিসর কমতো না। কারণ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মেলায় যাত্রী-সংখ্যাও দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। দোকানপসারীর সংখ্যাও বেড়েই যাচ্ছে। আবার অনেক মেলা উদ্যোগের অভাবে উঠে যাচ্ছে। ভাতার থানার চাঁদাই-এ পঞ্চাননতলায় ফাল্গুন মাসে এক বিরাট মেলা হতো, বিভিন্ন জেলা থেকে দোকান পসারী আসতো। যাত্রা, কবিগান, কীর্তন, বাউল সংগীতে পক্ষকালব্যাপী এ-অঞ্চল সরগরম হয়ে থাকতো। উদ্যোগের অভাবে সে মেলা উঠে গেছে। বর্ধমানে উইলবাড়ীর মেলা উঠে গেছে।

মেলায় অংশগ্রহণকারীদের চরিত্র, মর্জি, রুচি বদলাচ্ছে। বেশির ভাগ "মেলার আদি উদ্দেশ্য ক্ষীয়মান হয়ে, হুজুগ সর্বস্ব বিনোদনে খণ্ডিত হয়ে গেছে। মেলা তো শুধু উৎসব বা রিচুয়াল নয়, এ হলো বিশেষ এক সংহত জীবনবোধের যাপনগত বিভঙ্গ। ...মেলা যে বদলাচ্ছে তার একটা কারণ গ্রাম বদলাচ্ছে, অর্থনীতি ও বিপণন পদ্ধতি পালটে যাচ্ছে।"

বাঙালী চরিত্র বদলাচ্ছে। শুধু শহরে নয় গ্রামেও। তাছাড়া বিনোদনের টেকনিক বদলাচ্ছে। আজকাল আলকাপ লেটো ঝুমুর সব vulgar বলে মনে হচ্ছে। আগে যাত্রার আসর বসতো সন্ধ্যার পর; ভোর হলে তবে পঞ্চমাঙ্ক ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক শেষে ডুগডুগি বাজতো। এখন যাত্রা সিনেমা মাফিক আড়াই / তিন ঘন্টায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। আগে যাত্রায় ইন্দুবাবু (পুর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়?) বড় ফণী (ফণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়), ছোট ফণী (ফণিলাল মতিলাল) আসরে নামলে আসর সরগরম হয়ে উঠতো। তাদের গলা আধ মাইল দূর থেকে শোনা যেত আর আজ আসরের চারিদিকে মাইক ঝুলিয়ে কখনও স্পট লাইট দিয়ে যাত্রা হচ্ছে। ভিডিও ব্লু-ফিল্মের আকর্ষণ দিন দিন বাড়ছে।

মেলায় আগে লোকে পায়ে হেঁটে গরুর গাড়ী করে মেলায় আসত। মেলার বাইরে নদীর ধারে বা মাঠের মধ্যে গাড়ী রাখতো। আর এখন সাইকেল, স্কুটার, টেম্পো আকছার। মেলার জায়গাও অনেকখানি দখল করছে। ধোঁয়ায়, হর্ণে মেলার পরিবেশকেও দূষিত করছে।

আগে মেয়েরা বাড়ী থেকে মুড়ির পুঁটুলি নিয়ে আসত। মেলাতলায় নদীতে স্নান করে ঠাকুরের পূজো দিয়ে বেগুনি, চপ, পাঁপর ভাজা কিনে নদীর ধারে পা ছড়িয়ে মৌজ করে পাঁচ জনে মুড়ি খেতো আর প্রাণ উজাড় করে মনের কথা বলতো। সংসারের একঘেয়েমি থেকে দিনেকের তরে পালিয়ে এসে মুক্তির স্বাদ উপভোগ করতো। আর আজ? স্বামীর পিছনে স্কুটারে চেপে আসছে। রেষ্টুরেন্টে চপ-কাটলেট কফি খাচ্ছে। কিংবা মিষ্টির দোকানে এক টেবিলে বসে মোগলাই বা ঢাকাই পরোটা, মাংস খাচ্ছে। এখান ওখান ঘুরে আবার স্কুটারেই ফিরে যাচ্ছে। ছেলে ছোকরারা বনভোজনের ব্যবস্থা করে মেলার এক পাশে নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়ে ছেলেমেয়ে মিলে সারাদিন হৈ হুল্লোড় ফস্টিনস্টি করে ভিডিও দেখে বাজী পোড়ানো দেখে রাত্রে বাড়ী ফিরছে।

মেলা বদলাচ্ছে কারণ রুচি বদলাচ্ছে। রুচি বদলের টানে সরবতের বদলে এসেছে কোল্ড ড্রিঙ্কস, কাঠের সাবেক নাগরদোলার বদলে ডিজেল চালিত আধুনিক ডিজাইনের সু-উচ্চ দেখনদারি নাগরদোলা আর তার পাশে ঘুরছে হেলিকপ্টার। মেলা বদলাচ্ছে, কারণ উদ্যোক্তা বদলাচ্ছে। রাজা জমিদার কবে চলে গেছে—তাদের জায়গা নিয়েছে মেলা কমিটি, ক্লাব, পঞ্চায়েত, এমন কি সরকার। গ্রামেও বদলাচ্ছে শহরেও বদলাচ্ছে। শহরে এখন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মেলার চেয়ে সাংস্কৃতিক মেলার রমরমা বেশী। সাংস্কৃতিক মেলা, বইমেলা, শিশুমেলা, স্বাস্থ্যমেলা, কৃষিমেলা, বাণিজ্যমেলা, শিল্পমেলা। আবার শিল্পমেলা

রকমফেরও আছে। ক্ষুদ্রশিল্প, বস্ত্রশিল্প, লোকশিল্প, চর্মশিল্প, কত কি? পরিশেষে সুধীর চক্রবর্তী ও ডঃ কোঙারের মন্তব্য দিয়ে শেষ করি।

"আজকের সমাজে মেলার চরিত্র ও চালচিত্র বদলে যাচ্ছে। একথা বলা সোজা, বাহ্যত বস্তুগতভাবে প্রমাণ করাও কঠিন নয়, কিন্তু মূল বদলটা অনেক গভীরে, মর্মরসে সেটা বুঝতে পারাই আসল বোঝা। সত্যিকারের ক্ষতটা অনেক জটিল গ্রামীণ বিন্যাসে গাঁথা আছে, অনেক অতলে। প্রতিদিনের গোপালন, হরিনাম, তুলসীবৃক্ষ সেবা, মন্দির প্রদক্ষিণ বা ব্রাহ্মণকেন্দ্রিক পূজাতেই যে প্রকৃত বাঙালিয়ানা বেঁচেবর্তে আছে তা নয়। হয়তো আছে নানা বিমিশ্রণে, দ্বিচারিতায়, দ্বন্দ্ব ও উৎসর্জনে।" তাই গ্রাম, গ্রামীণ সমাজ, গ্রামীণ অর্থনীতি বদলের সঙ্গে মেলার চরিত্র বদলানো রোধ করবে কে?

ডঃ গোপীকান্ত কোঙার বোধহয় ঠিকই বলেছেন—

"আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে যান্ত্রিক সভ্যতার প্রকাশ সামাজিক কাঠামোর মধ্যে গতিশীলতা এনে দিলেও আমূল পরিবর্তন সম্ভব হয়নি, মেলার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কালের ঐতিহ্য লোপ পায়নি। তাই আজও অনেক ক্ষেত্রে গ্রাম্যজীবন মেলার ধারাবাহিকতাকে কেন্দ্র করে বেঁচে আছে। গ্রামীণ শিল্পসামগ্রীর চাহিদা গ্রাম্য মানুষের কাছে আজও অনেক ক্ষেত্রে অপরিবর্তিত রয়েছে। শতাধিক বৎসরের রেলপথ, শত শত রাজপথ গ্রামীণ রাস্তাঘাট নির্মাণ গ্রামের মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধকে পুরোপুরি অপসারণ করতে পারেনি।" তাই মেলা আজও বেঁচে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে।

বর্ধমান জেলার মেলা সম্বন্ধে যে কোন আলোচনায় ১৯৫১ সালের জনগণনাকে ভিত্তি করে ডঃ অশোক মিত্রের 'পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা' ১ম খণ্ড সংকলনটি বিশেষ সহায়ক। কিন্তু বইটি বর্তমানে প্রায় দুষ্প্রাপ্য। এই সংকলনের পরিশিষ্ট অংশে সারণীতে জেলার থানা ও মৌজাভিত্তিক মেলার তথ্য দেওয়া আছে। তা থেকে সমকালীন গ্রামীণ বাংলার মেলার একটা রূপরেখা পাওয়া যাবে। তাছাড়া বর্ধমান গেজিটিয়ার ১৯৯৪-এ মেলার তালিকা প্রদত্ত হয়েছে। এই উভয় তালিকা সমন্বয় করে জেলার মেলার তালিকার সংকলনটি এর সঙ্গে সংযোজিত হলো।

মেলা সারণী

(বাংলা মাসে অনুষ্ঠেয় মেলার বিবরণ ডঃ মিত্রের সারণী থেকে
ইংরাজী মাসের তালিকা বর্ধমান গেজেট ১৯৯৪ থেকে ও * চিহ্নিত বিবরণ ব্যক্তিগত তথ্যসংগ্রহ)

	থানা	মৌজা নং	মেলার স্থান	মেলা অনুষ্ঠানের সময়	উপলক্ষ	মেলার স্থায়িত্ব (দিন)	লোক সমাগমের গড়
১.	কেতুগ্রাম	৭	শ্রীগ্রাম	বৈশাখ	শিবের গাজন	১০ দিন	৫০০০
২.		১১	আনখোনা	মাঘ	পীরের উরস	৩	৩০০
৩.		১৪	বেরুগ্রাম	পৌষ	গোপাল বাবাজীর তিরোধান	৩	২০০০
৪.		৩০	আমগড়িয়া	অগ্রহায়ণ	রাধামাধব জিউ-র উৎসব	৬	৩০০০–৪০০০
৫.		৩৫	শ্রীপুর	চৈত্র	শিবেব গাজন	৪	—
৬.		৩৬	কানারা	ফাল্গুন	শাহ্ সাহেবের উরস	২	২০০
৭.		৩৭	কোমারপুর	আষাঢ়	কালাচাঁদ তলা মেলা	২	৫০০
৮.		৪৮	দধিয়া	মাঘ	বৈরাগ্যচাঁদ বাবাজীর তিরোধান	১৫	৭০,০০০
৯.		৪৯	আইয়াপুর	মাঘ	সরস্বতীপূজা	৩	৫০০০
১০.		৫০	গোন্নাসেরান্দি	মাঘ	পঞ্চাননপূজা	১	—
১১.		৫০	গোন্নাসেরান্দি	চৈত্র	চড়কপূজা	১	—
১২		৬৯	দক্ষিণডিহি	মাঘ	অট্টহাসদেবীর পূজা	৩	১০০০
১৩		৭৫	বিল্বেশ্বর রসুই	ফাল্গুন	বিশ্বনাথের শিব চতুর্দশী	৪	২০০০
১৪		৯৩	নবগ্রাম	চৈত্র	চড়ক	১	—
১৫		৯৮	বহড়ান	চৈত্র	চড়ক		

	থানা	মৌজা নং	মেলার স্থান	মেলা অনুষ্ঠানের সময়	উপলক্ষ	মেলার স্থায়িত্ব (দিন)	লোক সমাগমের গড়
১৬.	কেতুগ্রাম	৯৯	ঝামটপুর	আশ্বিন	কৃষ্ণদাস কবিরাজের আবির্ভাব ও তিরোভাব	৩	৭০০০/৮০০০
১৭.		১১০	কল্যাণপুর	জ্যৈষ্ঠ	দশহরা	১	৪০০০–৫০০০
*১৮.	৭২	৭২	করুই	চৈত্র	বুড়োশিবের গাজন	২	২০০০–৩০০০
১৯.		১১৭	নৈহাটি	চৈত্র	শিবের গাজন	১ দিন	৪০০০–৫০০০
২০.		১১৮	উদ্ধারণপুর	মাঘ	উত্তরায়ণ উৎসব	৭	৮০০০–১০,০০০
২১.			কেন্দ্রা	মার্চ	শাহ্ শাহেবের মেলা	২	২০০
২২.	কাটোয়া	৭	শ্রীখণ্ড	অগ্রহায়ণ	নরহরিঠাকুরের তিরোধান উৎসব	৩	—
২৩.		১৬	বাঁদরা	মাঘ	কালু রায়ের উৎসব	১	—
২৪.		১৭	যাজিগ্রাম	চৈত্র	চড়কপূজা	২	১০০০
২৫.		২৯	রাধাকৃষ্ণপুর	ফাল্গুন	খাদিমবিবির তিরোধান	সাম্প্রতিক	—
২৬.		৩৭	করজ গ্রাম	পৌষ	পঞ্চাননতলার মেলা	১	৫০০
২৭.		৩৯	বান্দামুরা	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৪	—
২৮.			গোপালপুর	বৈশাখ	শিবের গাজন	৪	—
২৯.		৪০	আলমপুর	মাঘ	পঞ্চাননপূজা	৫	—
৩০.		৪৭	কারুলিয়া	মাঘ	পঞ্চাননপূজা	৩	২০০০
৩১.		৪৮	কাইখান	মাঘ	কাইখান হট্টলা	১	২০০০
৩২.		৫৩	পুইনি	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	৮-১০	—
৩৩.		৫৭	চন্দ্রপুর	মাঘ	মাঘী পূর্ণিমা	৬-৭	২০০০–৩০০০
৩৪.		৬৩	পলশনী	ফাল্গুন	ধর্মরাজের গাজন	—	—
৩৫.		৬৩	”	”	দোলযাত্রা	—	—

	থানা	মৌজা নং	মেলার স্থান	মেলা অনুষ্ঠানের সময়	উপলক্ষ	মেলার স্থায়িত্ব (দিন)	লোক সমাগমের গড়
৩৬.	কাটোয়া	৭৪	মূল গ্রাম	পৌষ	পঞ্চাননতলার মেলা	১	৫০০
৩৭.		৭৪	”	আষাঢ়	অম্বুবাচী	১	১৫০
৩৮.		৯০	দাঁইহাট	পৌষ	পৌষসংক্রান্তি	১	১০০০
৩৯.		১০২	দেয়াসিন	শ্রাবণ	মনসাপূজা	—	—
৪০.		১১২	অগ্রদ্বীপ	চৈত্র	বারুণীস্নান	৭	১০০০
৪১.		১১৪	ছোটকুল গাছী	অগ্রহায়ণ	নবান্ন	৭	৫০০
৪২.		১২৩	চাঁদুলী	আষাঢ়	গঙ্গাপূজা	১	৫০০
৪৩.		১৩১	গৌরডাঙ্গা	আশ্বিন	গৌরচণ্ডীপূজা		২০০০–৩০০০
৪৪.		২৮	খাজুরডিহি	ফেব্রুয়ারী	ভৈরবনাথের মেলা	২	৮০০
৪৫.		১২১	সিঙ্গী	জুলাই	ক্ষেত্রপালপূজা (বৈরাগ্যদাস বাবাজীর)	৩	১০০০
৪৬.	মঙ্গলকোট	৩৩	কাশিয়ারা	মাঘ	তিরোধান উৎসব	২০	৭০০০০
৪৭.		৩৬	ঝিলেরা	পৌষ	শিবপূজা	৪	৯০০০–১০,০০০
৪৮.		৪৬	পিলসোঁয়া	পৌষ	আউল চাঁদ	২	—
৪৯.		৫৮	কোগ্রাম	পৌষ	উজ্জয়িনীপূজা	৩	২০০০
৫০.		৫৯	নতুন হাট	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	৪	১০০০
৫১.		৫৯	নতুনগ্রাম	মাঘ	যতীন্দ্র মেলা	৩৭	৫০০
৫২.		৬৪	মঙ্গলকোট	মাঘ	পীরসাহেবের মেলা	৭	৩০০০
৫৩.		৬৮	বাবলাডিহি	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	৭	৫০০০
৫৪.		৬৯	পলসোনা	মাঘ	ঝড়েশ্বরীপূজা	৭	—
৫৫.		১০৭	বনকাপাসী	মাঘ	ক্ষেত্রপালপূজা	১	৫০০
৫৬.		১১২	চৈতন্যপুর	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	১	—

	থানা	মৌজা নং	মেলার স্থান	মেলা অনুষ্ঠানের সময়	উপলক্ষ	মেলার স্থায়িত্ব (দিন)	লোক সমাগমের গড়
৫৭.	মঙ্গলকোট	১১৫	শীতলগ্রাম	পৌষ	ধনঞ্জয় পণ্ডিতের তিরোধান	৩	১০০০
৫৮.		১২৮	ক্ষীরগ্রাম	বৈশাখ সংক্রান্তি	যোগাদ্যা মেলা	১	৫০০০
৫৯.		১২৯	খরিজা—ক্ষীরগ্রাম	চৈত্র	ক্ষীরগ্রাম মেলা	৬	২০,০০০
৬০.		৮১	পালিশ গ্রাম	ফেব্রুয়ারী	মুশাফির মেলা	২	৫০০
৬১.	মন্তেশ্বর	১	শ্যামনগর	মাঘ	মহোৎসব	১	—
৬২.		২৪	শুশুনী	বৈশাখ	মনসাপূজা	৩	—
৬৩.		২৫	মূলগ্রাম	”	মহোৎসব	৪	—
৬৪.		২৯	খরমপুর	পৌষ	পঞ্চাননপূজা	১	৪০০
৬৫.		৩৮	সিংহালী	মাঘ	সরস্বতীপূজা	১	—
৬৬.		৪১	মন্তেশ্বর	বৈশাখ	চড়ক	২	৪০০-৬০০
৬৭.		–	ইচুডাঙ্গা	মাঘ	বুড়োরাজপূজা	১	২০০০
৬৮.		–	”	জ্যৈষ্ঠ	”	৩	২০০০
৬৯.		৯৩	রায়গ্রাম	মাঘ/ফাল্গুন	গোরাচাঁদ মেলা	৭	১০০০
৭০.		১১৩	কুলে	মাঘ	পীরসাহেবের মেলা	২	৫০০০
৭১.		১৩৯	ভেলিয়া	চৈত্র	রঞ্জাশরীফ মেলা	৪	৫০০
৭২.		৪২	লোহার	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	৪	—
৭৩.		৪৪	ভারুচা	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	১	—
৭৪.		৬৪	পুটসুরি	শ্রাবণ	গজকালীপূজা	২	—
৭৫.		৬৬	দেনুড়	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	১	—
৭৬.		৭১	কুসুমগ্রাম	মাঘ	পীরসাহেবের মেলা	৫	২০০০
৭৭.		৯৩	রাইগ্রাম	ফাল্গুন	পীরের উরস	৩	—

	থানা	মৌজা নং	মেলার স্থান	মেলা অনুষ্ঠানের সময়	উপলক্ষ	মেলার স্থায়িত্ব (দিন)	লোক সমাগমের গড়
৭৮.	মন্তেশ্বর	১০৪	যোশু ভাগড়া	বৈশাখ	বুড়োরাজ	৪	২০০০
৭৯.		২৯	খরমপুর	জানুয়ারী	উরস মেলা	৪	১২০০
৮০.	পূর্বস্থলী	৪৬	জামালপুর	জ্যৈষ্ঠ	বুড়োরাজ মেলা	—	১০,০০০–১২,০০০
৮১.		৪৬	,,	,,	শিবপূজা	১০	১০,০০০
৮২.		৮১	পলাশীপুর	ফাল্গুন	শীতলাপূজা	২	—
৮৩.		৮৭	ভাণ্ডারটিকুরী	শ্রাবণ	মনসাপূজা	১	৪০০০–৫০০০
৮৪.		৯১	জাহান্নগর	শ্রাবণ	,,	১	
৮৫.		১৮৩	মালুইডাঙ্গা	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	১	
৮৬.			শিবনগর	ফেব্রুয়ারী	সাবিত্রী মেলা	৩	৩০০০
৮৭.			পোলার হাট	আগষ্ট	ব্রাহ্মণী মেলা	৩	৫০০০
৮৮.	কালনা	২৮	রাণী বন্ধ	আষাঢ়	চণ্ডীপূজা	৪	
৮৯		৩৪	মেদগাছী	মাঘ	ধর্মরাজপূজা	৭	১০,০০০–১২,০০০
৯০.		৪৬	(গোপারঘাট) মালতী পুর	মাঘ	উত্তরায়ণ উৎসব	১	৫০০–২০০০
৯১.		,,	,,	পৌষ	গোপাই মেলা	১	৫০০–২০০০
৯২.		৭৮	বাগনাপাড়া	মাঘ	মহোৎসব মেলা	৪	৩০০০
৯৩.		৫১	কৃষ্ণপুর	বৈশাখ	গোষ্ঠবিহার	১	৩০০
৯৪.		৫৩	সারগড়িয়া	বৈশাখ	শীতলাপূজা	২–৩	৫০০–৬০০
৯৫.		৫৪	বৃন্দপাড়া	,,	গাজনের মেলা	১	১২০০
৯৬		৫৬	মছলন্দপুর	জ্যৈষ্ঠ	সিদ্ধেশ্বরীপূজা	১	৫০০–৬০০
৯৭.		৫৭	সিমলোন	আশ্বিন	মনসাপূজা	৯	১৫০০
৯৮.		৫৮	আটঘরিয়া	শ্রাবণ	,,	১	৫০০–৬০০

থানা	মৌজা নং	মেলার স্থান	মেলা অনুষ্ঠানের সময়	উপলক্ষ	মেলার স্থায়িত্ব (দিন)	লোক সমাগমের গড়
৯৯. কালনা	৬২	ভাট্‌রা	আষাঢ়	চণ্ডীপূজা	২	
১০০.	৬৪	উপলতি	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	১	১০০
১০২.	৬৬	সুলতানপুর	বৈশাখ	কালীপূজা	২	২৫০০
১০৩.	৭১	গোপালপুর	শ্রাবণ	মনসাপূজা	১	২০০
১০৪.	৭৩	হাটবেলে	”	”	১	৪০০
১০৫.	৭৪	তেহাটা	”	”	১	৩০০
১০৬.		বেলের হাট	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	১	১০০
১০৭.	৯৫	ধর্মডাঙ্গা	শ্রাবণ	মনসা	১	২০০
১০৮.	”	”	মাঘ	সরস্বতীপূজা	১	২০০
১০৯.	১০২	একচারী	চৈত্র	চড়ক		
১১০.	১০৬	অকাল পৌষ	আষাঢ়	ঝাপান		
১১১.	১০৭	নারেঙ্গা	শ্রাবণ	মনসাপূজা	১	২০০
১১২.	১১০	ঝিকরা	”	”	১	৩০০
১১৩.	১২৮	বৈদ্যপুর	আষাঢ়	ঝাপান	১	১৫০০
*১১৪.	”	”	”	রথযাত্রা	২	৫০০-৬০০
১১৫.	”	”	কার্তিক	রাসযাত্রা	৩	৫০০
১১৬.	”	”	আশ্বিন	নবমী পূজা	—	—
১১৭.	১৩০	নারিকেলডাঙ্গা	আষাঢ়	ঝাপান	১	১০০০
১১৮.	১৩৪	উদয়পুর	”	”	২	১০০০
১১৯.	১৩৮	কুমারপাড়া	বৈশাখ	জটাধারীপূজা	১	২০০
১২০. কালনা	১৩৯	সিঙ্গারকোণ	চৈত্র	জগৎগৌরীপূজা	১	৫০০

থানা	মৌজা নং	মেলার স্থান	মেলা অনুষ্ঠানের সময়	উপলক্ষ	মেলার স্থায়িত্ব (দিন)	লোক সমাগমের গড়
১২১. কালনা	১৩৯	সিঙ্গারকোণ	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	১২	১৫০
১২২.	১৪২	মাতিলপাড়া	জ্যৈষ্ঠ	ঝাঁপান	১	৫০০–৭০০
১২৩.	১৪৩	বড়বাহার	আশ্বিন	ঝাঁপান	১	১৫০
১২৪.	১৪৫	কোলা	চৈত্র	গোষ্ঠবিহার	১	৩০০
১২৫.	১৪৬	কুলটি	আশ্বিন	ঝাঁপান	১	১৫০
১২৫.	১৪৬	কুলটি	আশ্বিন	ঝাঁপান	১	১৫০
১২৬.	১৬২	কোয়ালডাঙ্গা	শ্রাবণ	”	২	৫০০–৭০০
১২৭.		চণ্ডীতলা হাট	জুলাই	আষাঢ়ে নবমী	৩	১৫০০
১২৮.	৪৬	মালতীপুর	ফেব্রুয়ারী	মকর সপ্তমী	১	২৫০০
১২৯.	৫১	কৃষ্ণপুর	অক্টোবর	মনসা পূজা	১	৩০০
১৩০.		বিরিলিয়া	জুলাই	কালীমাতা পূজা	১	১০০
১৩১.		”	নভেম্বর	বাস্তুপূজা	১	১০০
১৩২.	১২৮	বৈদ্যপুর	জুন	রাখী	৭	১৫০০
১৩৩.		”	এপ্রিল	চৈত্র সংক্রান্তি	১	২০০
১৩৪.		কাদিপুর	আগস্ট	ঝাপান	১	২০০
১৩৫.		পুরনহাট	সেপ্টেম্বর	গজলক্ষ্মীপূজা	১	৫০০
১৩৬.		”	মে	মনসাপূজা	১	৫০০
১৩৭		জামুরতলা	মে	ঝাপান	১	১০০
১৩৮.		সর্বমঙ্গল	মে	সর্বমঙ্গলাপূজা	১	২০০
১৩৯.	১৭১	সাতগাছি	মার্চ	দোলযাত্রা	১	২০০
১৪০.		কাঁচড়াগেরিশ	এপ্রিল	জটাধারীপূজা	১	২০০

থানা	মৌজা নং	মেলার স্থান	মেলা অনুষ্ঠানের সময়	উপলক্ষ	মেলার স্থায়িত্ব (দিন)	লোক সমাগমের গড়
১৪১. কালনা	১৩৮	কুমারপাড়া	মে	শীতলা পূজা	১	২০০
১৪২.	২২	চৌঘরিয়া	সেপ্টেম্বর	ঝাপান	১	১৬০
১৪৩.	৪৮	গ্রামকালনা	ফেব্রুয়ারী	মকর সপ্তমী	১	১৫০০
১৪৪.	৬৭	ইসবপুর	এপ্রিল	কালী মেলা	২	১০০০
*১৪৫.	—	গোপালদাসপুর	চৈত্র (রামনবমী)	রাখাল রাজেব দোল	১	৫০০
*১৪৬.		পাতিলপাড়া	জ্যৈষ্ঠ	হরগৌরীর ঝাপান	১	২০০
১৪৭. মেমারী	৪	সারগাছী	চৈত্র	রঙ্গিলা ফকিরের তিরোভাব	১	৫০০
১৪৮.	৭	মণ্ডলগ্রাম	শ্রাবণ	জগৎগৌরীর ঝাপান	২	৩০০০
১৪৯.	৩৯	পালসিত	বৈশাখ	মহোৎসব	৪	৩০০
১৫০.	৪৪	দাদপুর	জ্যৈষ্ঠ	ধর্মরাজের গাজন	৩	৭০০
১৫১.	৮১	সাতগেছিয়া	চৈত্র	চড়ক	১	—
১৫২.	”	”	জ্যৈষ্ঠ	মনসা পূজা	১	—
১৫৩.	৮৯	বিটিরা	মাঘ	রাজরাজেশ্বরী পূজা	৩	—
১৫৪. মেমারী	৯৩	বোহার	চৈত্র	গদাইফকিরের উরস	৭	
১৫৫.	৯৮	মুট্রা	শ্রাবণ	মনসা পূজা	১	
১৫৬.	১০৩	হরকলা	ভাদ্র	মনসার ঝাঁপান	২	
১৫৭.	১৫৪	শ্রীধরপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	১	
১৫৮.	১১৬	পাতরা	বৈশাখ	ষষ্ঠী মেলা	১	৫০০
১৫৯.	১৩২	কেজা	বৈশাখ	গাজন	৪	৫০০০
১৬০.	”	”	শ্রাবণ	মনসাপূজা	২	
১৬১.	”	”	মাঘ	দাতার সাহেব উরস	২	

থানা	মৌজা নং	মেলার স্থান	মেলা অনুষ্ঠানের সময়	উপলক্ষ	মেলার স্থায়িত্ব (দিন)	লোক সমাগমের গড়
১৬২. মেমারী	১৪৮	বড়র	মাঘ	পীরের উরস	১	
১৬৩.	১৫২	মেমারী	শ্রাবণ	মনসাপূজা	১	৭০০
১৬৪.	১৫৭	কৃষ্ণপুর	,,	,,	১	
১৬৫.	,,	,,	পৌষ	শ্মশানকালীপূজা	১	
১৬৬.	১৬৭	গন্তার	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	চণ্ডীপূজা	৭	৭০০
১৬৭.	১৬৯	মন্ডলজনা	আষাঢ়	,,	১	
১৬৮.	,,	,,	শ্রাবণ	মনসাপূজা	১	
১৬৯.	১৭৩	মগরা	ভাদ্র	মনসাপূজা	১	
১৭০.	১৭৫	ঘোষ পাঁচঘে	পৌষ	অন্নপূর্ণাপূজা		৯–১০
১৭১.	১৮৯	ইছাবাচা	মাঘ	ধর্মরাজজাত উৎসব	৩	
১৭২.	১৯৬	কালীবেলে	শ্রাবণ	মনসাপূজা	১	
১৭৩.	২০২	বাগ্‌গড়িয়	পৌষ	পৌষ-পার্বণ	১	
১৭৪.	২০৭	শশিনাড়া	জ্যৈষ্ঠ	গঙ্গাপূজা	১	৬০০–৭০০
১৭৫.	২০৮	কলসী	শ্রাবণ	ঝাঁপান	১	১৫০০
১৭৬.	২১৫	চৌত্‌খণ্ড	,,	মনসার ঝাঁপান	২	৮০০০
১৭৭.	২১৬	পাত্র	জ্যৈষ্ঠ	ষষ্ঠী মেলা	১	৫০০
১৭৮.	—	গয়েশপুর	চৈত্র	পীর আউলিয়া সাহেবের মেলা	২	৫০০
১৭৯. জামালপুর	২	চক্ষণজাদি	ফাল্গুন	ওলাইচণ্ডী মেলা	১	১০০০
১৮০.	৭	সাদিপুর	বৈশাখ	স্নানযাত্রা	২	৩০০–৪০০
১৮১.	৮	নাঘড়া	পৌষ	পৌষ-পার্বণ	২	
১৮২.	১৫	সরকার ডাঙ্গা	মাঘ	পীরের উরস	১	

থানা	মৌজা নং	মেলার স্থান	মেলা অনুষ্ঠানের সময়	উপলক্ষ	মেলার স্থায়িত্ব (দিন)	লোক সমাগমের গড়
১৮৩. জামালপুর	১৯	জামালপুর	মাঘ	উত্তরায়ণ স্নান	১	১০০০
১৮৪.	৩২	বেড়ুগ্রাম	ভাদ্র	জন্মাষ্টমী	১	৫০০–৬০০
১৮৫.	৩৬	শ্রীকৃষ্ণপুর	শ্রাবণ	মনসাপূজা	১	২৫০০–৩০০০
১৮৬.	”	”	ফাল্গুন	পঞ্চম দোল	১	২৫০০
১৮৭. জামালপুর	৪৩	শুঁড়ে কালনা	ভাদ্র	নৌকা বিলাস	১	২০০০
১৮৮.	”	”	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	১	২০০০
১৮৯.	৪৪	কাঁশড়া	বৈশাখ	শিবের গাজন	৪	৪০০০
১৯০.	”	”	ফাল্গুন	দোল যাত্রা	৪	৪০০০
১৯১.	”	”	”	শিবচতুর্দশী	১	৪০০০
১৯২.	৫০	হালাড়া	আষাঢ়	বিপদভঞ্জনীপূজা	১	২০০০
১৯৩.	৫১	বেত্রাগড়	ফাল্গুন	শীতলাপূজা	৪	২০০০
১৯৪.	৫৪	বসন্তপুর	বৈশাখ	রক্ষাকালীপূজা	১	২০০০
১৯৫.	”	”	ভাদ্র	মনসাপূজা	১	২০০০
১৯৬.	৫৬	রঙ্কিনী মহল্যা	বৈশাখ	রঙ্কিনীদেবীর পূজা	১	
১৯৭.	৬৫	সোনার গড়িয়া	ভাদ্র	মনসাপূজা	১	১০০১–১২০০
১৯৮.	৬৮	নন্দনপুর	বৈশাখ	রক্ষাকালীপূজা	৪	
১৯৯.	”	”	জ্যৈষ্ঠ	মহোৎসব	১	
২০০.	৭২	সিয়ালী	পৌষ	কালীপূজা	১	৩০০
২০১.	৭৩	অমরপুর	ভাদ্র	মনসাপূজা	১	১২০০
২০২.	৭৫	দাসপুর	চৈত্র	চড়ক	১	৪০০–৫০০
২০৩.	৭৯	মনিরামবাটী	শ্রাবণ	মনসাপূজা	১	৫০০

থানা	মৌজা নং	মেলার স্থান	মেলা অনুষ্ঠানের সময়	উপলক্ষ	মেলার স্থায়িত্ব (দিন)	লোক সমাগমের গড়
২০৪ জামালপুর	৮৩	বোড়ো বলরাম	বৈশাখ	বলরামের	১০-১২	৪০০–৫০০
	(মৌজাটি বর্তমানে রায়না থানাভুক্ত)			চক্ষুদান উৎসব		
২০৫.	”	”	ভাদ্র, পৌষ	গাজন উৎসব	১১	৪০০–৫০০
২০৬.	”	”	মাঘ	বলরামের উৎসব	১১	৪০০–৫০০
২০৭.	১০২	সাহাপুর	মাঘ	রক্ষাকালী পূজা	২	৬০০
২০৮.	১০৪	মহিন্দর	ফাল্গুন	শ্মশানকালী পূজা	২	১০০০
২০৯.	১০৪	চিলেডাঙ্গা	বৈশাখ	কালীপূজা	৩	২০০–৩০০
		(মৌজা মহিন্দব)				
২১০.	১১৪	জৌগ্রাম	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	৭	৫০০০
২১১.	—	রক্ষিনদহ	চৈত্র	চৈত্রসংক্রান্তি	১	২০০
২১২.	১১৮	কুলীন গ্রাম	পৌষ মাস	মদনগোপাল	২০	৮০০
				ঠাকুরের মেলা		
২১৩.	৬১	জাড়গ্রাম	বৈশাখ / জ্যৈষ্ঠ	কালুরায়	১২	২০০–৩০০
				(আষাঢ় মাসের যে		
				কোন মঙ্গলবার)	গাজন	
২১৪.	১১৪	জৌগ্রাম	ফেব্রুয়ারী	সাবিত্রী মেলা	৭	৫০০০
২১৫.	—	ধুলুক	বৈশাখ	রক্ষাকালী পূজা	১	৪০০
২১৬. রায়না	৩	মাছ খাড়া	মাঘ	ওলাইচণ্ডী পূজা	১	
২১৭.	১০	বড় কয়রাপুব	চৈত্র	চড়কপূজা	৪	
২১৮.	২২	নান্দাল	ফাল্গুন	বাসন্তী পূজা	২	
২১৯.	৩৭	নতু	পৌষ	ওলাইচণ্ডী পূজা	২	

থানা	মৌজা নং	মেলার স্থান	মেলা অনুষ্ঠানের সময়	উপলক্ষ	মেলার স্থায়িত্ব (দিন)	লোক সমাগমের গড়
২২০. রায়না	৪১	শুকুর	অগ্রহায়ণ	ওলাইচণ্ডী পূজা	৪	
২২১.	৭৮	শিবরামপুর	ফাল্গুন	কালীপূজা	১	
২২২.	৫৭	বোড়	মাঘ	মাকরী সপ্তমী মেলা	২	
২২৩.	”	”	বৈশাখ	নৃসিংহ চতুর্দ্দশী মেলা	২	
২২৪.	৭৩	মির্জাপুর	”	গাজন	১	
২২৫.	”	”	”	পীরের উরস	৩	
২২৬.	৯৭	নারায়ণপুর	চৈত্র	কালীপূজা	৫	
২২৭.	১০০	রসুই খণ্ড	বৈশাখ	গাজন	১	
২২৮.	১২১	রামবাটী	মাঘ	সিদ্ধেশ্বরী কালী	৫–৬	
২২৯.	১২৭	মসজিদ্ পুর	চৈত্র	বারুণী	১	
২৩০.	১২৯	কাট্‌নাবিল	শ্রাবণ	মনসাপূজা	১	
২৩১.	১৩১	উচালন	মাঘ	মকদুম পীরের উরস	১	
২৩২.	১৩২	খুষ্টে নন্দনপুর	শ্রাবণ	মনসাপূজা	৭	
২৩৩.	১৪০	রামপুর	ভাদ্র	মনসাপূজা	১	
২৩৪.	১৪২	কেঁউটে	চৈত্র	রথযাত্রা	১	
২৩৫.	১৫৮	ভাদিয়াড়া	জ্যৈষ্ঠ	মনসাপূজা	২–৩	
২৩৬.	১৬৪	কাইতি	চৈত্র	বারুণী স্নান	১	
২৩৭.	১৬৭	ছোট বৈনান	বৈশাখ	গাজন	১	
২৩৮.	”	”	পৌষ	কালীপূজা	১	
২৩৯.	”	”	চৈত্র	শীতলাপূজা	১	
২৪০.	১৭২	পহলানপুর	মাঘ	পীরের উরস	৪	

থানা	মৌজা নং	মেলার স্থান	মেলা অনুষ্ঠানের সময়	উপলক্ষ	মেলার স্থায়িত্ব (দিন)	লোক সমাগমের গড়
২৪১. রায়না	১৮৩	আলমপুর	ফাল্গুন	চণ্ডীপূজা	৪	
২৪২.	১৮৪	মাধবডিহি	মাঘ-ফাল্গুন	আহর চণ্ডীমেলা	৪	১০০০
		(বর্তমানে মাধবডিহি পৃথক থানা)				
২৪৩.	১৮৮	বারপুর	ফাল্গুন	পীরের উরস	৩	৫০০—৬০০
২৪৪.	১৯৬	বৈদ্যপুর	বৈশাখ	গাজন	১	১০০০
২৪৫.	২০০	দামিন্যা	ফাল্গুন	পীরের উরস	৩	—
২৪৬.	১৪	নাড়ুগ্রাম	বৈশাখ	নাড়েশ্বরের গাজন	৫	২০০
২৪৭. খণ্ড ঘোষ	৯	কুমার কোলা	পৌষ	রাধাগোবিন্দের মেলা	৪	
২৪৮.	১৫	খেজুরহাটি	মাঘ	জাহাঙ্গীর পীরের উরস	৪	
২৪৯.	১৮	খণ্ড ঘোষ	ফাল্গুন	শ্মশান কালী পূজা	১	
২৫০.	”	”	”	কমললোচন জিউএর নবম দোল	১	
২৫১.	২৬	বেড়ুগ্রাম	বৈশাখ	শিবের গাজন	২	
২৫২.	৩৫	বোঁয়াই	আষাঢ়	বোঁয়াই চণ্ডীর মেলা	১	৩০০০
২৫৩.		দাসপুর	মাঘ	পীর সাহেবের উরস	৩—৪	৫০০
২৫৪.	৪৫	ওঁয়াড়ি	মাঘ	ওনাড়ি পূর্বপাড়া মেলা	১২	২০০০
২৫৫.	৫৬	ন'পাড়া	বৈশাখ	যোগাদ্যা পূজা	২	
২৫৬.	৫৮	শশঙ্গা	বৈশাখ	গাজন	১	
২৫৭.	৬৫	চৈতন্যপুর	পৌষ	গৌরাঙ্গ ঠাকুরের উৎসব	১	
২৫৮.	৬৮	কেশবপুর	চৈত্র	পীর সাহেবের মেলা	৪	১২০০
২৫৯.	—	নাসিকা	আষাঢ়	ধর্মরাজপূজা	৩	১০০০
২৬০.	—	খেতকুড়ী	চৈত্র	গাজন	৩—৪	১০০০

থানা	মৌজা নং	মেলার স্থান	মেলা অনুষ্ঠানের সময়	উপলক্ষ	মেলার স্থায়িত্ব (দিন)	লোক সমাগমের গড়
২৬১. খণ্ডঘোষ	—	নওহাট	মাঘ	উরস মেলা	২—৩	৫০০
২৬২.	৭৮	সগরাই	পৌষ	পীর সাহেবের মেলা	১	২০০০
২৬৩.	৭৯	বাদুলিয়া	বৈশাখ	শিবের গাজন	৪	
২৬৪.	৮২	আলাদিপুর	মাঘ	পীরমেলা	৩	৭০০
২৬৫.	৯৬	কৈয়র	শ্রাবণ	ঝুলন	৪—৫	
২৬৬.	১০৪	তোড়কোনা	বৈশাখ	গাজন	১	
২৬৭.	”	”	শ্রাবণ	মনসাপূজা	১	
২৬৮.	১০৭	গোপালবেড়া	মাঘ	পীরের উরস	১	২০০০
২৬৯.		বাহেরাগড়া	জানুয়ারী	পীরের মেলা	৭—৮	১০০০
২৭০.		গৈতানপুর	”	গৌরাঙ্গঠাকুরের মেলা	১	১০০০
২৭১. খণ্ডঘোষ	—					
২৭২. বর্ধমান	৯	আলমপুর	চৈত্র	বুড়োপীর মেলা	৪	৩০০
২৭৩.	১৬	নবাবহাট	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	৭	৮০০০
২৭৪. বর্ধমান	১৯	মাটিয়াল	মাঘ	সত্যপীর মেলা	২	৩০০
২৭৫.	৩০	বর্ধমান	বৈশাখ	মহোৎসব	৩	৩০০
২৭৬.	”	”	চৈত্র	শিবরাত্রি	১	
*২৭৭.	”	বর্ধমান (সদর ঘাট)	১ লা মাঘ	উত্তরায়ণ বর্ধমানেশ্বর	১	
২৭৮.	”	বর্ধমান	চৈত্র	চড়ক	১	
২৭৯.	”	মহন্তর অস্থল	শ্রাবণ	ঝুলন যাত্রা	৫	২০০০
২৮০.	২৭	বারাসতী	জ্যৈষ্ঠ	ধর্মরাজপূজা গাজন	৫-৬	
২৮১.	৫৮	তুবগ্রাম	আষাঢ়	দশহরা	২	৫০০

থানা	মৌজা নং	মেলার স্থান	মেলা অনুষ্ঠানের সময়	উপলক্ষ	মেলার স্থায়িত্ব (দিন)	লোক সমাগমের গড়
২৮২. বর্ধমান	৬১	শোনপুর	জ্যৈষ্ঠ	সিদ্ধেশ্বরী কালীপূজা	৩	
২৮৩.	৬৩	ভিটা	বৈশাখ	শিবের গাজন	৪	
২৮৪.	৬৬	মির্জাপুর	আষাঢ়-শ্রাবণ	জয় দুর্গা পূজা	৩	৪০০০
২৮৫.	৬৮	রায়ান	ফাল্গুন	শিবচতুর্দশী	৪	৫০০
২৮৬.	”	নেড়োদিঘি	”	পীরের উরস	৫	৩০০
২৮৭.	”	হটুদেওয়ান	”	”	২	৫০০
২৮৮.	১০৩	কলিগ্রাম	আষাঢ়	জয়দুর্গাপূজা	৩–৪	২০০০
২৮৯.	১০৬	কুড়মুন	চৈত্র	ঈশানেশ্বরের গাজন	১০	৬০০০
২৯০.	১৩৬	হাটগোবিন্দপুর	শ্রাবণ	মনসার ঝাপান	১	২০০০
২৯১.	১৬৩	বড়শূল	জ্যৈষ্ঠ	ধর্মরাজপূজা	১	
২৯২.*	১	মাহিনগর	পৌষ সংক্রান্তি	খড়ির মেলা	৭	২০০০
২৯৩.*		সুহাড়ি	জ্যৈষ্ঠ	ধর্মরাজ গাজন	৪	৫০০
২৯৪.		কাঞ্চননগর	জুন-জুলাই	রথযাত্রা	২	৫০০
২৯৫. ভাতার	৩৩	মাহাতা	মাঘ	গোবিন্দ জিউর উৎসব	৭	৩০০
২৯৬.	৩৪	ঝারুল	আষাঢ়	রথযাত্রা	১	
২৯৭	৩৮	এড়ুয়ার	শ্রাবণ	জোড়া কালীপূজা	৭	৩০০
২৯৮.	”	”	মাঘ	সরস্বতীপূজা	৩০	১০০০
৩০০.	৪৭	পাড়হাট	বৈশাখ	ধর্মপূজার গাজন	১	—
৩০১.	৪৮	নুনাড়ী	চৈত্র	ফকির সাহেবের মেলা	৪	১০০০
৩০২.	৬৬	ভাতাড়	কার্তিক	লক্ষ্মীজনার্দনপূজা	৩–৪	
৩০৩.	৬৮	মুরাতিপুর	মাঘ	ফকিরের মেলা	৪	২০০

থানা	মৌজা নং	মেলার স্থান	মেলা অনুষ্ঠানের সময়	উপলক্ষ	মেলার স্থায়িত্ব (দিন)	লোক সমাগমের গড়
৩০৪. ভাতার	৮৯	নাসিগ্রাম	বৈশাখ	মহোৎসব	১	
৩০৫.		মান্দারডিহি	মার্চ	মৌলভি সাহেবের মেলা	৪	৫০০
৩০৬.*	২১	কামার পাড়া	শ্রাবণ	মনসার ঝাপান	৩	৫০০
৩০৭. *		নারায়ণপুর	ফাল্গুন	তারিক্ষ্যে মেলা	১	৮০০
৩০৮. গলসী	৩	মাড়ো	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	৭	
৩০৯.	১৬	চকতেঁতুল	চৈত্র	শিবের গাজন	১০—১২	
৩১০.	২০	কসবা	পৌষ	বেহুলা ভাসান	৭	১৫০০
৩১১.	২৫	অমরপুর	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	১	
৩১২.	৩৭	মানকর	মাঘ	ভবানীপূজা	৩	৫০০
৩১৩.	,,	,,	আষাঢ়	রথযাত্রা	২	
৩১৪.	,,	,,	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	৪	
৩১৫.	,,	,,	বৈশাখ	রবীন্দ্র জয়ন্তী	৩	
৩১৬.	৪৮	পিঁড়াজ	বৈশাখ	পিরাজ মেলা	৫	
৩১৭.	৬৩	রামগোপালপুর	চৈত্র	আনন্দমেলা	৩	
৩১৮.	৭০	গোহগ্রাম	চৈত্র	চড়কপূজা	১	৫০০
৩১৯.	৭৮	আদরা	কার্তিক	মহোৎসব	৮	
৩২০.	৮৫	পুরসা	পৌষ	পীর সাহেবের মেলা	৪	১০০০
৩২১.	৯৭	কুরকুবা	শ্রাবণ	কমলামাতার গাজন	৩—৪	
৩২২.	১০৩	ইরকোনা	মাঘ	শ্রীপঞ্চমীর মেলা	৭	২০০০
৩২৩.	১২৮	পরগুড়া	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৪	
৩২৪.	১৩৭	উড়া	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	৩	৫০০

থানা	মৌজা নং	মেলার স্থান	মেলা অনুষ্ঠানের সময়	উপলক্ষ	মেলার স্থায়িত্ব (দিন)	লোক সমাগমের গড়
৩২৫. গলসী		বড়দীঘি	ফেব্রুয়ারী	পীরের দরগা	২	৪০০
৩২৬.		বড়সোনা	,,	বড়সাহেবের মেলা	৪	৬০০
৩২৭.		পারাজ	এপ্রিল	পারাজ মেলা	৫	১০০০
৩২৮.		মানকর	ফেব্রুয়ারী	ভব (Bhaba) মেলা	৫	৫০০
৩২৯. আউসগ্রাম	১৮	মাজুরিয়া	বৈশাখ	গাজন	৩	
৩৩০.	২০	ছোট রামচন্দ্রপুর	,,	দিদি ঠাককন পূজা	২	
৩৩১.	,,	,,	,,	অষ্টমঙ্গলা উৎসব	১	
৩৩২.	৩৮	রামচন্দ্রপুর	জ্যৈষ্ঠ	দিদি ঠাকরুন পূজা	২	৩০০০
৩৩৩.	৪৯	বনকুল	বৈশাখ	ধর্মরাজপূজা	৪	
৩৩৪.	৫২	পাড়ুক	জ্যৈষ্ঠ	মহোৎসব	৫	
৩৩৫.	,,	,,	কার্তিক	কালীপূজা	১	
৩৩৬.	৮৪	খাণ্ডারী	মাঘ	সরস্বতী পূজা	৪	
৩৩৭.	৯০	সুয়াতা	পৌষ	বহমানপীরের উরস	৪–৫	২০০০
৩৩৮.	,,	,,	অগ্রহায়ণ	মহাপ্রভুর আস্তানা	৩	৩০০০
৩৩৯.	৯৩	এড়াল	কার্তিক	কালীপূজা	৭–৮	
৩৪০. *	১৭১	তকিপুর	,,	,,	২	১০০০
৩৪১.	৯৫	সর	ফাল্‌গুন	দোল যাত্রা	১১	
৩৪২.	১২১	বেলুটি	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৪	
৩৪৩.		কয়রাপুর	ফাল্গুন-চৈত্র	দেবীপূজা	৭	১০০০
৩৪৪	১২২	বেরেন্ডা	মাঘ	রাধাকৃষ্ণ উৎসব	৩	১৫০০
৩৪৫.	১৩২	বুদরা	জ্যৈষ্ঠ	দশহরা	৩-৪	১০০

থানা	মৌজা নং	মেলার স্থান	মেলা অনুষ্ঠানের সময়	উপলক্ষ	মেলার স্থায়িত্ব (দিন)	লোক সমাগমের গড়
৩৪৬. আউসগ্রাম	১৫৮	গুসকরা	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	৫	১৮০০
৩৪৭.	১৬৯	দিগ্‌নগর	আষাঢ়	রথযাত্রা	১	
৩৪৮.	১৭০	ভোতা	মাঘ	মাঘী পূর্ণিমা	৩	৬০০
৩৪৯.		খাগরাই	চৈত্র	শাহ সাহেবের মেলা	২	৮০০
৩৫০.		রাধাপুর	বৈশাখ	ধর্মরাজপূজা	১	৪০০
৩৫১.		ধরমপুর	মে	ধর্মরাজ মেলা	১	৪০০
৩৫২. কাঁকসা	৩৫	বসুধা	চৈত্র	চণ্ডীপূজা	৭	
৩৫৩.	৪২	রক্ষিতপুর	বৈশাখ	গাজনের মেলা	১	
৩৫৪.	৬৩	বাবনা বেড়া	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	৪	১০০০
৩৫৫.	৬৫	গোপালপুর	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	১	২০০০
৩৫৬.	”	”	মাঘ	মাঘী সপ্তমী	১	২০০০
৩৫৭.	”	”	চৈত্র	চৈত্র সংক্রান্তি	৪	২০০০
৩৫৮.	৭২	রাজকুসুম	বৈশাখ	মহোৎসবের মেলা	৭	
৩৫৯.	৮০	মোবারক গঞ্জ	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	৪–৫	
৩৬০.	৯০	সিলামপুর	পৌষ	মকর সংক্রান্তি	৩	১০০০
৩৬১. ফরিদপুর	৫	বৈদ্যনাথপুর	মাঘ	মকরস্নান	৮	২৫০০০
৩৬২.	৩৫	সারপাই	বৈশাখ	গঙ্গাপূজা	৩	১০০০
৩৬৩.		সাগরভাঙ্গা	চৈত্র	গাজন	২	১০০০
৩৬৪.	৪২	কাঁটাবেড়া	কার্তিক	গোষ্টাষ্টমী	৮	১০০০
৩৬৫.	”	”	অগ্রহায়ণ	”	১	৫০০
৩৬৬.		দুর্গাপুর	জুন	রথযাত্রা	১	১০০০

থানা	মৌজা নং	মেলার স্থান	মেলা অনুষ্ঠানের সময়	উপলক্ষ	মেলার স্থায়িত্ব (দিন)	লোক সমাগমের গড়
৩৬৭. ফরিদপুর		ওয়ারিয়া	নভেম্বর	গোষ্ঠমেলা	৭	১০০০
৩৬৮.		ইছাপুর	মে	গঙ্গাপূজা	৩	১০০০
৩৬৯.		মেজিডিহি	এপ্রিল	ধর্মরাজ	২	১০০০
৩৭০.		নডিহা	এপ্রিল	শিবগাজন	২	৫০০
৩৭১.		ফরিদপুর	”	ধর্মরাজ	২	৫০০
৩৭২. রানীগঞ্জ	৪৩	ধোয়াবনী		কবি নীলকণ্ঠের তিরোধান উৎসব	১	১০০০
৩৭৩.	১২	নারায়ণকুড়ি	পৌষ	মহোৎসবের মেলা	৭	
৩৭৪.	১৭	সিয়াবসোল	আষাঢ়	রথযাত্রা	৭	৩০০০–৪০০০
৩৭৫.	২০	বাঁশড়া	বৈশাখ	ধর্মরাজ পূজা	৩	
৩৭৬.		নারায়ণ বাড়ী	মাঘ	ধর্মরাজপূজা	৭	৪০০০–৫০০০
৩৭৭.	২৩	রোনাই	”	পীরসাহেবের মেলা	৫	৭০০০–৮০০০
৩৭৮		রাই রাইয়ান বাড়ী	ফেব্রুয়ারী	ধর্মরাজ	৭	৪০০০–৫০০০
৩৭৯. অণ্ডাল	১০	মহল	পৌষ	রয়ানীপূজা	৭	৫০০
৩৮০.	১৮	উখরা	আষাঢ়	রথযাত্রা	১	৫০০
৩৮১.		”	শ্রাবণ	ঝুলনযাত্রা	৪	১০,০০০
৩৮২.		পাণ্ডবেশ্বর	পৌষ	শিবপূজা	৩	৫০০০
৩৮৩.	৩২	খন্দ্রা	চৈত্র	কালীপূজা	২	১০০০
৩৮৪.	৩৬	দক্ষিণ খণ্ড	বৈশাখ	শিবপূজা	৪	২০০০
৩৮৫.	৪১	কাজোড়া	আষাঢ়	রথযাত্রা	১	৩০০০–৪০০০

থানা	মৌজা নং	মেলার স্থান	মেলা অনুষ্ঠানের সময়	উপলক্ষ	মেলার স্থায়িত্ব (দিন)	লোক সমাগমের গড়
৩৮৬. অন্ডাল	৪১	কজোড়া	চৈত্র	শিবপূজা	৪	৩০০০–৪০০০
৩৮৭.	৫১	রামপ্রসাদপুর	চৈত্র	শিবের গাজন	৩	৫০০০
৩৮৮.	৫২	অন্ডাল দক্ষিণ বাজার	বৈশাখ	মহাবীর ঝান্ডা	৩	৭০০
৩৮৯. জামুরিয়া	১৮	শিবপুর	বৈশাখ	শিবের গাজন	৩	
৩৯০.	১৯	নন্দী	মাঘ	সরস্বতীপূজা	৩	
৩৯১.	২০	দামোদরপুর	আশ্বিন	ছাতাপরব (সাঁওতাল উৎসব)	২	৪০০০
৩৯২.	২১	জামুরিয়া	চৈত্র	শিবের গাজন	২	৫০০
৩৯৩.		সালতোর	বৈশাখ	ধর্মরাজের গাজন	২	৫০০
৩৯৪.	২৩	পরিহারপুর	আশ্বিন	ছাতাপরব	২	২০০০
৩৯৫.	২৬	জোবা	আষাঢ়	কালীপূজা	১	
৩৯৬.	৩১	বেনালী	মাঘ	কেন্দুলী মেলা	৩	৫০০
৩৯৭.	৩১	বেনালী	চৈত্র	রামরাজাপূজা	৩	৫০০০
৩৯৮.	৪১	কুমারডিহা	বিশাখ	পীরসাহেবের মেলা	২	২০০
৩৯৯.	৪৪	দরবারডাঙ্গা	পৌষ	কালীপূজা	১	৫০০০
৪০০.		শিকপুর	চৈত্র	পীরসাহেবের মেলা	২	২০০
৪০১. আসানসোল	১৫	ধাদকা	মাঘ	কালীপূজা	১	৫০০০
৪০২.	২৩	আসানসোল (গ্রাম)	বৈশাখ	শিবপূজা	৩	২০০

থানা	মৌজা নং	মেলার স্থান	মেলা অনুষ্ঠানের সময়	উপলক্ষ	মেলার স্থায়িত্ব (দিন)	লোক সমাগমের গড়
৪০৩. আসানসোল	২৫	উষাগ্রাম	পৌষ	ঘাঘর বুড়ী পূজা	১	
৪০৪.		ঘাগরবুড়ী	,,	কালীপূজা	১	৫০০
৪০৫. হীরাপুর	৩৩	কালাঝরিয়া	মাঘ	উরস মেলা	১	১০০০
৪০৬.	৫৭	পুরুষোত্তমপুর	চৈত্র	চৈত্র সংক্রান্তির মেলা	১	৫০০
৪০৭.	৬১	আলুনিয়া	মাঘ	সরস্বতীপূজা	১	৪০০
৪০৮. হীরাপুর		থুনুট	মাঘ–কার্তিক	মঙ্কেশ্বরী মেলা	১	৩০০০
৪০৯. কুলটি	৩০	বরাকর শিবমন্দির	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	২	৫০০০
৪১০.	৩৯	দিশেরগড়	বৈশাখ	পীরের মেলা	১	২০০
৪১১.	৫২	নিয়ামতপুর	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	২	৩০০০
৪১২.		পল্টনডাঙ্গা	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	১	৫০০
৪১৩.		কল্যাণেশ্বরী	মাঘ	সরস্বতীপূজা	১	৫০০
৪১৪. বরবাণী	৫০	দোমহানীচটী	অগ্রহায়ণ	গোশালা মেলা	৩	২০০
৪১৫. সালানপুর	৫৫	জীতপুর	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	১	১০০
৪১৬.		জেমিহারী	,,	শিবরাত্রি	৩	২০০০
৪১৭. বর্ধমান		খাজা আনোয়ার বেড়	১লা মাঘ	খাজা আনোয়ারের উরস	১	৫০০০

পাঁচ অধ্যায়

সংস্কারের বিভিন্ন ধারা

শাস্ত্রীয় সংস্কার :

শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে একবিংশ শতাব্দীর শুভ সূচনার যখন মঙ্গলশঙ্খের ধ্বনিতে বিশ্বজগৎ মুখরিত, যখন কম্পিউটার চালিত যন্ত্রসভ্যতার সুখস্পর্শের অনুপ্রবেশ ঘটেছে সর্বত্র, রঙিন টেলিভিশনের প্রচার মাধ্যমে যখন নিত্যনূতন ফ্যাশন সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে আপ্লুত করেছে, তখনও কিন্তু আমাদের প্রাচীন সংস্কার-আচার-বিচার-কুসংস্কারের ভূতকে সমাজের ঘাড় থেকে আমরা নামাতে পারি নাই। প্রাচীনকালের শাস্ত্রীয় আচার এ-জেলায় বর্তমানে কিভাবে লৌকিক আচারে পরিণত হয়েছে বিশ্লেষণ করাই এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

আজও আমাদের দেশে তিন হাজার বছর আগেকার বিবাহসভায় যে মন্ত্র পড়া হত এখনও সেই মন্ত্র পড়ান হয় বিবাহের ছাদনাতলায়। পুরোহিত মন্ত্র বলেন, আমরাও তোতাপাখীর মত আওড়ে যাই। "যদিদং হৃদয়ং তব, তদিদং হৃদয়ং মম।" সব মন্ত্র শুদ্ধভাবে উচ্চারিত হয় না, সব মন্ত্রের অর্থও বুঝিও না তবুও নববধূকে পড়িয়ে যাই। ওঁ ধ্রুব মসি ধ্রুব অহ মপতি কুলে ভূয়া সম্ (ওঁ ধ্রুমসি ধ্রুবাহং পতি-কুলে ভূয়াসম্)। তাতে বর বা বধূ কেউ বুঝুক আর নাই বুঝুক; বরও পড়িয়ে যায় বধূও অস্ফুটস্বরে বলে যায়।

সংস্কার কথার অর্থ কি? বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করে কখনও মন্ত্রপূত জলের ছিটে দিয়ে বা উৎসর্গীকৃত বস্তুর ওপর হাত রেখে মন্ত্রপূত জলের ছিটে দিলে সেটিকে ঋগ্‌বেদের ভাষায় বলা হয় 'সংস্কৃত' হল। যেমন গৃহসংস্কার, পূর্বজন্মের সংস্কার। যে ভাষাকে আমরা 'সংস্কৃত' ভাষা বলি, সেও তো আগে বৈদিক ভাষা (ছান্দস) ছিল। দীর্ঘদিন ব্যবহারে যে ভাবে তার মধ্যে অপভ্রংশ ঢুকে পড়েছিল পাণিনি তাকে সংস্কার করেন বলেই তো 'সংস্কৃত' ভাষার উদ্ভব।

মনে হয় সংস্কার সম্পর্কে মীমাংসা দর্শনের সংজ্ঞাই ঠিক—সংস্কারো নাম স ভবতি যস্মিন্ জাতে পদার্থে ভবতি যোগ্যঃ কস্যচিৎ অর্থস্য। অর্থাৎ, সংস্কার হলো কোন একটি পদার্থকে কোন বিশেষ প্রয়োজনের যোগ্য করে তোলা। এক কথায় গুণাধান ও দোষাপনয়ন এই দুটি সংস্কারের উদ্দেশ্য। মনে হয় অন্নপ্রাশন, উপনয়ন এই সব সংস্কারের মধ্যে এক রকমের মানসিক সামাজিক তুষ্টি বা আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি পায়। যে সময় সংস্কারগুলির সৃষ্টি তখন হয়ত এর সামাজিক প্রয়োজন ছিল। তারপর যুগ যুগ ধরে সেটা চলে আসছে আমাদের জীবনের রক্ত-মাংস-মজ্জায়; বংশপরম্পরায় আমরা সেগুলিকে Tradition হিসেবে মেনে চলছি। কাজেই বর্তমানে সমাজে সেগুলির প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক—সে বিচার আমরা করি না। সে সংস্কারগুলি না মানলেই যেন মনে হয় একটা খুঁত থেকে গেল। তাই এখনও এর অনেকগুলি আছে এবং আরও বহুদিন টিকে থাকবে।

শাস্ত্রীয় সংস্কারের মধ্যে অনেক বিকৃতি এসেছে; ঢুকেছে অনেক আচার বিচার, কুসংস্কার। অশিক্ষিত পুরোহিতের উচ্চারণে 'বিদ্যাস্থানেভ্যঃ এব চ' যদিও "বিদ্যাস্থানে ভয়েবচ" হয়ে যাচ্ছে তবুও আমরা সেই পুরোহিতকে বাদ দিতে পারি না, আমরা ভয়ে ভয়ে বলে যাই "বিদ্যাস্থানে ভয়ে বচ"।

যাই হোক, শাস্ত্রীয় সংস্কার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করে পরে প্রচলিত কুসংস্কারের ক্ষেত্রে প্রবেশ করা যাবে।

বৈদিক যুগে সংস্কার ছিল চল্লিশটি—চত্বাবিংশৎ সংস্কারা অষ্টো চাত্মগুণাঃ। মনুসংহিতায় ৪০টি সংস্কার কমে দাঁড়ায় ১৩টিতে—গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামধেয়, নিষ্ক্রামন. অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, কেশান্ত, সমাবর্তন, বিবাহ ও শ্মশান। এ জেলায় পরবর্তীকালে নিষ্ক্রামণ, কেশান্ত ও সমাবর্তন বাদ দিয়ে দাঁড়ায় ১০টি সংস্কারে। বর্তমানে অন্নপ্রাশন, নামকরণ, চূড়াকরণ ও উপনয়ন নিয়ে একত্রে হয় একটি উপনয়ন অনুষ্ঠান। বিবাহ ও শ্রাদ্ধ এই চারটিতে ঠেকেছে। এর মধ্যে শ্রাদ্ধকেও বাদ দেওয়া হয়। মৃত আত্মার সংস্কার হবে? তবে অন্নপ্রাশনের আগে কোন কোন পরিবারে গর্ভাধান, পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়নের পরিবর্তে পঞ্চামৃত, সাধভক্ষণ কুলাচার হিসেবে পালিত হয়।

গর্ভাধান : গর্ভাধান অনুষ্ঠানের মধ্যে আছে যেমন নরনারীর দৈহিক মিলনের তাৎপর্য তার চেয়ে বেশী আছে সন্তান-বাসনা ও সন্তান-ধারণের তাৎপর্য। গর্ভন্ধেহি সিনীবালি গর্ভন্ধেহি সরস্বতি। গর্ভস্তে অশ্বিনৌই দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ। এই মন্ত্রের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে গর্ভাধানকালে অভিজ্ঞ নারীর

তত্ত্বাবধান যেমন দরকার, উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শও তেমনি দরকার—সিনীবালী ও সরস্বতী অভিজ্ঞ তত্ত্বাবধানকারিণী নারীর প্রতীক আর অশ্বিনীকুমার তো দেববৈদ্য। স্মার্ত মতে ঋতুকাল থেকে ষোলো দিনের মধ্যে গর্ভাধানের অনুষ্ঠানটি করতে হয়। সন্তানটি যাতে পুত্রসন্তান হয় তার জন্যে জ্যোতিষশাস্ত্রে বলা আছে দিনের বেলায় ব্রতপূজা হোমের পর্ব সেরে সূর্যকে অর্ঘ্য দিতে হবে। এর নাম নব পুষ্পোৎসব। এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। বিশ্ব পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে একান্ত করার প্রচেষ্টা ও ফলবতী বৃক্ষদেবতার মত পুষ্পবতী রমণীরও সন্তানরূপ ফলবতী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। অন্তত মন্ত্র তাই বলে—'বিশ্বাত্মা বিশ্বকর্তা চ বিশ্বেশো বিশ্বদক্ষিণঃ নবপুষ্পোৎসবে হ্যেতং গৃহাণার্ঘং দিবাকর'। তবে এই গর্ভাধান প্রথম সন্তান লাভের আগেই করা বিধেয়। আধুনিকতার স্পর্শে অনুষ্ঠান করে গর্ভাধান হয় না কিন্তু কার্যত পরিবারে অভিজ্ঞা শ্বাশুড়ী বা বয়োজ্যেষ্ঠা অন্যথায় অভিজ্ঞা নার্সের তত্ত্বাবধান এবং অভিজ্ঞ গায়নকলোজিস্টের পরামর্শ গর্ভবতী নারীর জন্য নেওয়ার চলন প্রায় সব পরিবারেই আছে।

পুরুষের শক্তি স্ত্রীলোকের গর্ভে প্রবেশ করে, এক অদ্ভুত উপায়ে সন্তান সৃষ্টি করে, গর্ভ নষ্ট হওয়ার ফলে সন্তান জন্ম নিরস্ত হতে পারে। তাই হয়তো সম্ভোগের পূর্বে দেবতার বর প্রার্থনার উদ্দেশ্যে এই গর্ভাধান অনুষ্ঠান। বর্তমানে বর ও কনে উভয়েই অধিক বয়সে বিবাহ করে, এখানে নারী পুরুষের অভিসন্ধিই প্রধান, কাজেই এখন বাসরঘরের ও কালরাত্রির সংযমই অনেকেই মানে না। সম্ভোগই একমাত্র কাম্য, কাজেই গর্ভাধানের যৌক্তিকতাও উঠে গেছে।

পুংসবন : 'সবন'-এর অর্থ প্রসব, পুং-এর অর্থ পুত্র। অর্থাৎ পুত্রসন্তান প্রসবের জন্য অনুষ্ঠান। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা। পুরুষশাসিত সমাজে পুত্রসন্তানই কাম্য। এর একটা মনস্তত্ত্বের দিকও আছে। সন্তানের মাধ্যমে অহং বা মমতার যে পুষ্টি হয়, কন্যা তা দিতে পারে না। তাছাড়া মানুষ চায় বৃদ্ধ বয়সে সন্তান খেতে পরতে দেবে, সেবা-শুশ্রূষা করবে। কন্যা তো কাছে থাকবে না, বিয়ের পরই সে 'পর' হয়ে যাবে। তাই বোধ হয় পুত্র-সন্তান লাভের জন্য এত কাণ্ড। তাছাড়া পুত্র বংশরক্ষা করবে এ আকাঙ্ক্ষা মানুষের থাকে।

এই অনুষ্ঠানে স্বামী স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলে—বাণ যেমন তূণের মধ্যে অবস্থান করে তেমনি তোমার গর্ভে একটি পুরুষ আসুক। আ তে যোনিং গর্ভ এতু পুমান্ বাণ ইবে যুধি। দশ মাসের মধ্যে একটি বীর পুত্র লাভ করুক এই প্রার্থনা।

গর্ভলাভ করার তৃতীয় মাস থেকে অষ্টম মাস পর্যন্ত যে কোন একটি সময়ে এই অনুষ্ঠান বিধেয়। অবশ্য যাজ্ঞবল্কের মতে গর্ভমধ্যে শিশু নড়াচড়া করার

আগেই এই অনুষ্ঠান করে ফেলতে হবে। পুংসবনের শাস্ত্রীয় বিধি হচ্ছে অনুষ্ঠানের আগের দিন গর্ভিণীকে হবিষ্যান্ন করতে হয়। পরের দিন স্ত্রী নববস্ত্র পরিধান করে স্বামীর বাঁ পাশে এসে বসবেন। বৃদ্ধি শ্রাদ্ধের পর শুভলগ্নে স্বামী স্ত্রীর ডান হাতে দুটি দই মাখানো মাষকলাই-এর দানা ও একটি যব রেখে স্ত্রীকে ৩ বার প্রশ্ন করবেন—কিংপিবসি? স্ত্রী উত্তর করবেন, পুংসবনং পিবামি। মনে হয় দুটি মাষকলাই-এর দানা ও একটি যব পুরুষের নিম্নাঙ্গের প্রতীক। তাই পুত্র কামনায় এটি পানেব নির্দেশ।

যাই হোক, পুংসবন অনুষ্ঠান আর হয় না গর্ভিণীর ৯ মাসে একটি শুভ দিন দেখে সাধভক্ষণ অনুষ্ঠান হয়। নয় রকম মিষ্টান্ন, পরমান্ন-এর আয়োজন করা হয়। তারপর শুভ লগ্নে একটি পুরুষ শিশুকে গর্ভিণীর কোলে দিয়ে তাকে পরমান্ন মিষ্টান্ন খেতে দেওয়া হয়।

সীমন্তোন্নয়ন : সিঁথি কেটে চুল ভাগ করে দেওয়ার নাম সীমন্তোন্নয়ন। অনুষ্ঠানটি ছোট—স্বামী একটি ডুমুর গাছের জোড়াফলসহ দুটি স্তবক, কুশ ও শ্বেতবিন্দু সমন্বিত সজারুর কাঁটা নিয়ে স্ত্রীকে বাঁ পাশে বসিয়ে তার কেশ ভাগ করে দেবেন। রক্ত পিপাসু রাক্ষসী পিশাচীদের হাত থেকে রক্ষা করতে সীমন্তোন্নয়নের মাধ্যমে লক্ষ্মীশ্রীকে আবাহন—এক কথায় সন্তান রক্ষাই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। বর্তমানে গর্ভাবস্থায় চিকিৎসকের নানা বিধিনিষেধ সীমন্তোন্নয়নের স্থান নিয়েছে। যেমন গর্ভলাভ সঠিকভাবে জানার পর রতিক্রিয়া বা অতিরিক্ত পরিশ্রম, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ নিষেধ। গর্ভিণীর যাতে এ অবস্থায় রক্তক্ষরণ না হয় সে কারণে অথবা গর্ভিণীর দেহে অন্য কোন কাবণে অস্ত্রোপচারও নিষেধ। পঞ্চম মাস থেকে গর্ভস্থ শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটতে থাকে। কাজেই এসময়ে গর্ভিণীকে লক্ষ্মীশ্রী দান করে তার মনকে সদা প্রফুল্ল রাখতে হবে। গালমন্দ ঝগড়া-ঝাঁটি করা বারণ। এই জন্যেই এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা।

জাতকর্ম : বৃহদারণ্যকে আছে পুত্রজন্মের সঙ্গে সঙ্গে নবজাতকের মুখে এক ফোঁটা গব্য ঘৃত লেহন করাতে হবে, তারপর স্তন্যপান বিধেয়। এই অনুষ্ঠানের বিধান হল দধিঘৃত সহযোগে সমন্ত্রক হোম ও নবজাতকের কানে তিনবার 'বাক্' শব্দ উচ্চারণ অর্থাৎ তিন বেদের জ্ঞানকে নবজাতকের অন্তরে প্রতিষ্ঠা। কারও কারও মতে দই, ঘি ও মধুর মিশ্রণ একটা সোনার আংটি দিয়ে নবজাতককে লেহন করানো।

পরবর্তীকালে এই অনুষ্ঠানের পরিবর্তন হয়েছে। পুত্রসন্তান জন্মের পর প্রদীপ জ্বালিয়ে পিতা পুত্রের মুখ দর্শন করে স্নান করে আসবেন, তারপর পুত্রের

শতায়ু কামনায় সোনার কাঠি দিয়ে ঘি-মধু পুত্রের মুখে দিবেন। এর পর মা নবজাতককে প্রথমে দক্ষিণ স্তন ও পরে বাম স্তন পান করাবেন। বর্তমানে এত সব কাণ্ড উঠে গেছে। পল্লীগ্রামে পুত্রসন্তান জন্মালে নবজাতকের মুখে মধু দেওয়া হয় ও শঙ্খধ্বনি দ্বারা সকলকে এই শুভ সংবাদ জানান হয়। পল্লীগ্রামে এখনও স্তনদুগ্ধ দেবার রীতি আছে। শহরে তো Nursing Home, মধুর পাট নাই। আর স্তনদুগ্ধ দেবার রীতি উঠে যাচ্ছে, গ্লুকোজের জলই ভরসা।

নামকরণ : নামকরণ সাধারণত বিভিন্ন জাতির অশৌচকর্মের বিধান অনুযায়ী সম্পন্ন হয়। ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে শিশুর জন্মেব দশ দিন পর, ক্ষত্রিয়ের ১২ দিন, বৈশ্যের ১৫ দিন ও শূদ্রের ৩০ দিন পর নামকরণের বিধান। নামকরণের আসল উদ্দেশ্য Identification, প্রতীকী পরিচয় সমাজে প্রতিষ্ঠা করা।

অনুষ্ঠানের নিয়ম হল নামকরণের আগে মা ও নবজাতক উভয়কেই স্নান করতে হবে। তারপর মা ছেলেকে বাবার কোলে দেবেন। বাবা কুশ দিয়ে জল ছিটিয়ে কিছু প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান সারবেন। এসবের উদ্দেশ্য মন্ত্রশুদ্ধির দ্বারা নবজাতককে মার্জনা করা। তারপর বাবা নবজাতকের কানের কাছে বলবেন—আজ তোমার নামকরণ হল...। এমন ভাবে বলবেন যাতে সমবেত অতিথি সকলে শুনতে পায়। নামকরণের এই নাম সকলের স্বীকৃতি পায়। পুত্রের নাম হবে দুই অক্ষরের আর কন্যার নাম হবে তিন অক্ষরের। এখন অবশ্য এসব কেউ মানে না। ছেলের জন্মের আগে থেকেই নাম সব ঠিক করে রাখে। সিনেমা স্টার, বড় বড় মহাপুরুষ, এমনকি ডেভিড, রবার্ট নামও চলে যাচ্ছে।

নিষ্ক্রমণ : 'নিষ্ক্রমণ' কথার অর্থ গৃহ থেকে বহির্গমন। অর্থাৎ অশৌচান্তে সূতিকা গৃহ থেকে শুভক্ষণ দেখে প্রসূতি ও নবজাতককে বাইরে নিয়ে আসা। অনুষ্ঠান খুবই ছোট, পিতা পুত্রকে কোলে নিয়ে সূর্যকে দেখাবেন; মন্ত্র পড়ে বলবেন—দেখ বৎস ওঁ তচ্চক্ষুচ্ছুবহিতং পুরস্তার্দ্দে ক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতম্, জীবেম শরদঃ শতম্, ভবাম শরদঃ শতম্, শৃনবাম্ শরদঃ শতম্, প্রব্রবাম শরদঃ শতম্, অজীতাঃ স্যাম শরদঃ শতম্। পিতাপুত্র উভয়ে শত শরৎ দেখবেন, শত শরৎ বাঁচবেন, শত শরৎ থাকবেন, শত শরৎ শুনবেন, শত শরৎ বলবেন, শত শরৎ অজীত হবেন—তারই প্রার্থনা।

এর পর পিতা পুত্রকে মাতৃক্রোড়ে প্রদান করবেন। মা-ও পুত্রবতী নারী পরিবৃত হয়ে উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি সহকারে স্বগৃহে নবজাতককে প্রতিষ্ঠিত করবেন। বর্তমান কালে আর এসবের বালাই নেই। নার্সিংহোম থেকে এসে সোজা বাড়ী

ঢোকে—কেউ কেউ স্ব-স্ব বর্ণের প্রথামাফিক অশৌচ পালন করে আর অতি আধুনিকদের একেবারে সরাসরি গৃহপ্রবেশ। তবে গ্রামে-গঞ্জে প্রসূতি সুতিকাগৃহে থাকার সময় শিশুর জন্মের পাঁচ দিন পর নাপিত ডেকে প্রসূতির 'নখ' কাটান, ষষ্ঠ দিনে মা ষষ্ঠীর পূজা দেওয়া হয়। ঐ রাত্রেই নাকি ভাগ্যদেবতা নবজাতকের কপালে যে বিধিলিপি লিখে দেন, সারা জীবনে তার ফলভোগ করতে হয়, এর থেকে কারও পরিত্রাণ নাই—এই মানুষের বিশ্বাস। এব পর ১৩ দিন বা ২১ দিন পর প্রসূতিকে স্নান করিয়ে গৃহ থেকে নিষ্ক্রমণ করা হয়। একমাস পরে প্রসূতি স্নান করে সর্বশুদ্ধা হবেন। তখন তাঁর দেবকার্যের অধিকার।

অন্নপ্রাশন : এই অনুষ্ঠানটি এখনও প্রায় সব পরিবারেই পালিত হয়। কোন কোন পরিবারে বেশ ঘটা করে পূজা হোম প্রভৃতি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ও বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করে ভুরিভোজে আপ্যায়িত করে। আবার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নারায়ণের পরমান্ন ভোগ দিয়ে বা সর্বমঙ্গলা কিংবা গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা দিয়ে সেই প্রসাদ নবজাতককে খাইয়ে অন্নপ্রাশন সারা হয়।

শাস্ত্রীয় মতে অন্নপ্রাশনের দ্বারা রেতঃ, রক্ত ও গর্ভাপঘাতের দোষ নষ্ট হয়। অন্নপ্রাশন জন্মের ষষ্ঠ মাসেই বিধেয়—ষষ্ঠে অন্নপ্রাশনং জাতেষু দন্তেষু বা। বেশ বোঝা যাচ্ছে শিশুর দাঁত উঠলে তার শক্ত খাবার খাওয়ার সুবিধে হয় বলেই এই ব্যবস্থা। আবার অনেক পরিবারের কুলাচার আছে অন্নপ্রাশনে "জাতেষু দন্তেষু" অমঙ্গলজনক। এ জেলার অনেক গ্রামে ও শহরে এই আচার পালিত হয়। তবে যদি ছয় মাসে অন্নপ্রাশনের পূর্বে দাঁত উঠেই যায়, তখন কি অন্নপ্রাশন হবে না? নিশ্চয়ই হবে, তারও বিধান আছে। সে ক্ষেত্রে শিশুকে খাওয়াবার পূর্বে শক্ত ক্ষীর দিয়ে দাঁত ঢেকে দিতে হবে। এর বৈজ্ঞানিক কারণ মনে হয় শিশুর ছমাস বয়সে তার উপযুক্ত সহজ পাচ্য খাবার দিতে হবে। ষন্মাসং চৈনম্ অন্নম্ প্রাশয়েদ্ লঘুহিতঞ্চ। যে সব শিশুর ছ-মাসে অন্নপ্রাশনের অসুবিধা থাকে তার আট মাসেও অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান হতে পারবে।

অন্নপ্রাশনের শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান মতে পিতা প্রায়শ্চিত্ত হোম ও দ্বিষ্টিকৃৎ হোম করবেন। তারপর মাতা সুস্নাত ও অলংকৃত নবজাতককে কোলে নিয়ে পতির বাম পাশে বসবেন এবং সব্যঞ্জন ও ক্ষীরযুক্ত অন্ন এক সঙ্গে মেখে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে পুত্রের মুখে দেবেন। বৈদিক মতে অবশ্য পরমান্নের সঙ্গে মধু, ঘি, ও সোনার রেণু ঘষে দেওয়ার রীতি ছিল।

বর্তমানে এ জেলায় প্রচলিত রীতি হচ্ছে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান শেষে শিশুকে স্নান করিয়ে রাজবেশ অর্থাৎ গরদের জোড় সোলার বা ফুলের মুকুট, অলঙ্কার প্রভৃতি পরিয়ে নানা ব্যঞ্জন মাছ পরমান্ন মিষ্টান্ন প্রভৃতি নতুন থালায় সাজিয়ে ছেলের মাতুল বা মাতুল-স্থানীয় কেহ শিশুকে কোলে নিয়ে নানা রকম ব্যঞ্জন মাছ মেখে শিশুর মুখে দেবেন। এরপর পরমান্ন ও মিষ্টান্ন মুখে দিয়ে আচমন করাবেন। শেষে একটা থালায় রজতমুদ্রা, গীতা, মাটি, সোনার অলঙ্কার, কলম রেখে শিশুকে থালার কাছে বসিয়ে দেবেন—শিশু কোনটি স্বেচ্ছায় ধরে পরীক্ষা করার জন্য। সংস্কার : কলম ধরলে শিশু বিদ্বান হবে, মাটি ধরলে জমিদার, গীতা ধরলে ধার্মিক আর টাকা বা অলঙ্কার ধরলে ধনী হবে।

চূড়াকরণ : চূড়ার অর্থ এখানে চুল; √কৃ + অট্ প্রত্যয় দ্বারা 'করণ', অর্থ নিষ্পন্ন করা। চূড়াকরণ এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, মাথার ওপর উঁচু করে চুল রাখা। সোজা কথায় 'টিকি' রাখা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এর উল্টোটাই ঘটে। চূড়াকরণ অর্থে মাথা ন্যাড়া করে মাথার ওপর টিকি রাখা হয়, উদ্দেশ্য দোষাপনয়ন ও গুণাধান। চূড়াকবণের দ্বারা পাপ নষ্ট হয়, দীর্ঘ জীবন লাভ হয়, যশ লাভ হয়।

আসল কথা, প্রাচীনকালে তো এখানকার মত চিরুনীর প্রচলন ছিল না। শজারুর কাঁটা দিয়ে আর কতটা মাথা পরিষ্কার হবে? তাও আবার সহজলভ্য ছিল না, ফলে মাথায় 'মাসিপিসি' বা ঐরকম ক্ষতের সৃষ্টি হতো। মাথা ন্যাড়া করে দেওয়ার ফলে মাথাটা বেশ পরিষ্কার থাকতো আবার হাওয়া বাতাসও লাগতো। তা ছাড়া চিকিৎসক সুশ্রুতের মতে হর্ষ লাঘব-সৌভাগ্য-করণম্ উৎসাহ বর্দ্ধনম্। টিকি রাখার তাৎপর্য সম্বন্ধে সুশ্রুতের মত—মাথার পিছনে যেখানে টিকি রাখা হয় সে ঘূর্ণাবর্ত (স্থানীয় ভাষায় 'মরাই') স্থানটুকু খুবই সংবেদনশীল। কতকগুলি শিরার সন্ধিস্থল কাজেই এই সংবেদনশীল স্থানে যাতে কোন রূপ আঘাত না লাগে তার জন্যেই ঐ স্থানে এক গুচ্ছ চুল বা টিকি রেখে দেওয়া হয়।

শাস্ত্রীয় মতে জন্ম থেকে তৃতীয় পঞ্চম বা সপ্তম বৎসরে চূড়াকরণের নিয়ম। তবে বর্তমানে এখানে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের উপনয়নের সময় একেবারে চূড়াকরণ ও উপনয়ন সম্পন্ন হয়। কারও কারও বা উপনয়নের সময়েই নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ এক সঙ্গে করা হয়।

চূড়াকরণের সময় নতুন ক্ষুর ও নতুন কাঁসার পাত্র নাপিতের কাছে রাখা হয়। তারপর যাতে বালকের মাথা কামাবার সময় মাথা কেটে না যায় বা মাথার কোন ক্ষতি না হয় সেজন্য পুরোহিত ক্ষুরটিকে মন্ত্রপূত করে দেন।

শিশুর মাথায় যাতে কোনরূপ ক্ষতি না হয় সে জন্য নাপিতকে অতি সর্তকতার সঙ্গে চূড়াকরণ করতে বলবেন—অক্ষুন্বং কুমারং কুশলী কুরু। এর পর নাপিত 'করবানি' বলে অগ্নিসমক্ষে কর্তন করবে। এরপর মঙ্গলাচার সহকারে স্নান করিয়ে নতুন সূচ দিয়ে কর্ণ বেধ করা হয় ও অলঙ্কার পরিয়ে মায়ের কোলে দেওয়া হয়। কর্ণবেধও একটি সংস্কার। মনে হয় প্রাচীনকালে পুরুষেরও কর্ণভূষণ পরার রেওয়াজ ছিল। বর্তমান কালে উপনয়নের পূর্বে নাপিতই ব্রহ্মচারীর মাথা ন্যাড়া করে একেবারে কান ফুটো করে একটা সুতো পরিয়ে দেয় আর কান ফুটো করবার সময় ব্রহ্মচারীকে ফলমূল মিষ্টি খেতে দেওয়া হয়। উপনয়নের সময় হোম হতে চরু রাঁধতে অনেক দেরী হবে বলেই মনে হয় তার আগেই কিছু খাইয়ে দেবার ব্যবস্থা। কর্ণবেধ সম্পর্কে সুশ্রুতের মত হচ্ছে, কানের লতিতে ফুটো করলে হার্নিয়া, হাইড্রোসিল বা অন্ত্রবৃদ্ধির আশঙ্কা খানিকটা দূর হয়। শঙ্খোপরি চ কর্ণান্তে বিধ্যেদ্ অন্ত্রবৃদ্ধি নিবর্তয়ে।

উপনয়ন : উপনয়ন শব্দটি এসেছে, উপ + √নী + অন্ প্রত্যয় করে। উপ অর্থে নিকটে ও 'নী' ধাতুর অর্থ নিয়ে যাওয়া। সুতরাং উপনয়নের অর্থ দাঁড়াচ্ছে আচার্যের কাছে শিক্ষার জন্য বালককে নিয়ে যাওয়া। এখন থেকেই আরম্ভ হয় বালকের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। বর্তমানে 'উপনয়ন' চলিত কথায় দাঁড়িয়েছে 'পৈতে'-তে। এই অনুষ্ঠানে এখন বালকের মাথা ন্যাড়া করে কান ফুটো করে পৈতের অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ হোম, চরুরান্না, দীক্ষা এসব সম্পন্ন করা হয় ও ব্রহ্মচারীকে গৈরিক কৌপীন পরিয়ে প্রথমে কুশ, পরে মৃগচর্মের পৈতে ধারণ করান হয়। শেষে হাতে বেউল বাঁশের দণ্ডী, কাঁধে ঝুলি, গলায় সুতোর পৈতে, পাযে খড়ম পরিয়ে ভিক্ষুকেব বেশ ধাবণ করান হয়। এরপর গৈরিক বসন ও গৈরিক উত্তরীয় নিয়ে ব্রহ্মচারী ভিক্ষার মহড়া করে। প্রথমে ঘর থেকে সন্ন্যাসী হয়ে বের হওয়ার অনুষ্ঠান হবে। ব্রহ্মচারী 'আড়াই পা' অগ্রসব হবে, মা তার পা চেপে ধরবে, যাতে ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে বের হয়ে না যায়। সংস্কার নাকি আড়াই পা-এর বেশী গেলে ছেলে ভবিষ্যতে সন্ন্যাসী হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যাবে। তারপর ব্রহ্মচারী প্রথমে মায়ের কাছে ভিক্ষা চাইবে। 'ভবতি ভিক্ষাং, দেহি মাতঃ।' পরে আত্মীয়-স্বজন নিমন্ত্রিত সকলের কাছে ভিক্ষার চাওয়ার মহড়া হবে। ব্রহ্মচারীর থলি নানা ফল, আতপ্ চাল, মিষ্টান্ন, আংটি, পেন, টাকা প্রভৃতিতে উপচিয়ে পড়বে। এর পর মা ব্রহ্মচারীর মুখ ঢেকে তাকে অন্ধকার ঘরে নিয়ে যাবেন। এখানেই ব্রহ্মচারীকে তিনদিন থাকতে হবে—সূর্যের মুখ দেখা নিষেধ। ঘরের মধ্যেই প্রয়োজনীয় কর্ম, স্নান, ত্রিসন্ধ্যায় আহ্নিক সারতে

হবে। এই তিন দিন আহার হবে হবিষ্যান্ন ও ফলমূল। তিন দিন পর ব্রাহ্মমুহূর্তে ব্রহ্মচারীকে ঘর থেকে বের করে সূর্যের মুখ দেখান হবে, ও রাজবেশ পরিয়ে নিয়মভঙ্গ করা হবে। এই হচ্ছে এ জেলার প্রচলিত রীতি।

প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মচর্য বালকের ছাত্রাবস্থা—যৌবনসন্ধির সূচনা। পুরোহিত ব্রহ্মচারীর কানে সাবিত্রী মন্ত্র বলে তাকে দীক্ষা দেবেন। "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো য়োনঃ প্রচোদয়াৎ"—'এই সমস্ত ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্গলোককে যেমন হে সবিতা নিমেষেই প্রকাশের মধ্যে প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহার প্রেরিত জগৎ দিয়া সেই জগদীশ্বরকে উপলব্ধি করি। তাঁহার প্রেরিত এই বুদ্ধি দিয়া সেই চেতন স্বরূপকে ধ্যান করি।'

উপনয়ন সংস্কারের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ দ্বিতীয়বার জন্মলাভ করে। সংস্কারবাদ্ দ্বিজঃ উচ্যতে। সব সম্প্রদায়েরই এই রকম একটা সংস্কার আছে। খ্রীষ্টানদের হয় Baptism, মুসলমানদের সুন্নৎ। পার্শিদের 'নৌজত্' (নবজন্ম)। নৌজৎ থেকে বোঝা যায় আর্য ভাষাভাষী গোষ্ঠী ইরানি গোষ্ঠীদের সঙ্গে যখন একাত্ম ছিল তখন থেকেই এর সূচনা। উপনয়নের তাৎপর্য হলো মানবক আচার্যের কাছে উপনীত হবে আর আচার্য তার দক্ষিণহস্ত ধারণ করবেন, প্রকৃত পক্ষে মানবককে শিষ্যত্বে অঙ্গীকার করার প্রতীক। আচার্য মানবককে তাঁর অন্তরের গর্ভে ধারণ করেন; তাই বোধ হয় তিনদিন ব্রহ্মচারীকে অন্ধকার ঘরে রাখার প্রথা। তিনদিন পর গায়ত্রীর সঙ্গে জন্মলাভ ক'রে শিষ্য ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হবে; মানবক দ্বিজত্ব লাভ করবে। ব্রহ্মচারীকে আচার্য নির্দেশ দেবেন 'মা দিবা স্বাপ্সী।' দিনে ঘুমাবে না, আচার্যের কাছে অধ্যয়ন করবে। সমিধ সংগ্রহ করবে, প্রাতঃকালে ভিক্ষার জন্য ভ্রমণ করবে। ব্রহ্মচারীও বলবে 'ওঁ বাঢ়ম্'। হাঁ তাই করবো। আচার্য আয়াদ ধৌম্য-এর শিষ্য আরুণি, বেদ ও উপমন্যু এই রকম ব্রহ্মচারী গুরুভক্তির পরকাষ্ঠা দেখিয়ে গুরুর আশীর্বাদে সর্ব বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে গৃহে ফিরে যাবার অনুমতি পান। উপমন্যু, আরুণি সমিধ কাষ্ঠ হস্তে আচার্যের কাছে নীত হলেন। আচার্য সমিধ কাঠ দেখে বিদ্যাদান আরম্ভ করলেন—উপনয়নের ধারের কাছেও গেলেন না। আর এক মানবক জাবাল সত্যকাম হারিদ্রুমত গৌতমঋষির কাছে গিয়ে নিজের মাতৃপরিচয় দিল কারণ সে পিতৃপরিচয় জানে না; গৌতম বললেন তুমি সত্যবাক্য থেকে চ্যুত হও নাই তুমি সত্যকাম, আর দেরী নয়। সমিধং সৌম আহর—

"অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।"

ব্যস! সত্যকামের উপনয়ন হয়ে গেল। যজ্ঞ হোম চরুরান্না, 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি মাতঃ', আড়াই পা এগিয়ে যাওয়া, তিন দিন অসূর্যম্পশ্য—কিছুরই বালাই ছিল না। তবে 'পৈতে'-র উৎস কি? মনে হয় আদিতে গুরুগৃহে ব্রহ্মচারীর পরিধান ছিল দুটি—নিম্নাঙ্গের একখণ্ড বসন ও উত্তমাঙ্গের উত্তরীয়। কখনও বা সুতোর আবার কখনও বা কৃষ্ণসার মৃগচর্মের—তাই ৯টি সূত্রগুচ্ছ এখন উত্তরীয়ের স্থান নিয়েছে। উপনয়নের পর ২৪ বৎসর কাল গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। পাঠ সমাপনান্তে স্নান করে স্নাতক হতে হত—সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সমাবর্তনের (convocation) পর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সমাপ্তি ঘটতো। এবার ঘরে ফেরার পালা—বিবাহের পর গার্হস্থ্য আশ্রমের সূচনা। এখন সে আচার্য নেই, সেই উপমন্যু, আরুণি, সত্যকামের মত শিষ্যও নেই। এখন ছাত্রকে ভিক্ষা করতে বললে ছাত্রই গুরুকে ভিক্ষা করতে বাধ্য করবে। যে গায়ত্রী মন্ত্রের মাধ্যমে উপনয়নে মানবক দীক্ষিত হয় সে গায়ত্রীর অর্থবোধ তো দূরের কথা সঠিক ভাবে তার উচ্চারণ যে কয়জন করতে পারে তাদের সংখ্যাও খুবই সীমিত। যা সন্ধ্যা সা তু গায়ত্রী। স্মৃতি অনুসারে ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী—

গায়ত্রী নাম পূর্ব্বাহ্নে সাবিত্রী মধ্যমে দিনে।
সরস্বতী চ সায়াহ্নে ত্রৈব সন্ধ্যা ত্রিষু স্মৃতঃ।

বর্তমানে তিন কালে ত্রিসন্ধ্যার কথা বললে উপহাসের পাত্র হতে হবে। জীবনযুদ্ধের তাগিদে মানুষ গায়ত্রীই ভুলে যাচ্ছে, তো দিনে তিনবার? এখন উপনয়ন একটা অনুষ্ঠান-মাত্র উৎসব।

বিবাহ : ১৩২২ সালের চৈত্র সংখ্যার "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় বিমলাকান্ত ঘোষ মহাশয় বিবাহের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলেছেন—"সমাজতত্ত্বাধ্যায়ী পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকের মত এই যে, মনুষ্যজাতির প্রাথমিক অবস্থায় বিবাহ ব্যবস্থা ছিল না, অর্থাৎ যৌন সম্মিলন সম্বন্ধে স্ত্রী বা পুরুষকে এক বা ততোধিক নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সঙ্গী বা সঙ্গিনীতে আবদ্ধ থাকিতে হইত না। তৎকালে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক অবাধ ও নির্বিচার ছিল। ম্যাক্‌লেনান, মরগ্যান, স্যারজন লাবক্, পোষ্ট, উইলকেন, বেবেল প্রভৃতি মানববিজ্ঞানবিদ্‌দের এই মত। হার্বার্ট স্পেন্‌সরও প্রায় এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছিলেন। তবে তিনি ইহা স্বীকার করেন যে, "প্রাগৈতিহাসিককালে যৌন সম্মেলন ব্যাপার সাধারণত অবাধ ও নির্বিচার হইলেও ব্যক্তিনিবদ্ধ যৌন-সম্বন্ধ যে একেবারেই ছিল না, এরূপ নহে। তবে যাহা ছিল, তাহাও এত অল্প সংখ্যক যে ধর্তব্যের মধ্যে নহে। কিন্তু একটি কথা প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রাগৈতিহাসিক যৌন-সম্মিলন নির্বিচার হইলেও

তাহা আপন আপন সম্প্রদায় বা সমাজের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। ....স্যার জন লাবক ইহাকে (communal marriage) সাম্প্রদায়িক বিবাহ বলিয়াছেন। প্রসঙ্গত একটা কথা বলে রাখি, বর্তমানে অতি আধুনিক সমাজে (ultra modern society) অনেক ক্ষেত্রে যে "Live Together" পদ্ধতি চালু হচ্ছে সেটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের অবাধ যৌন সম্মিলনকে ছাড়িয়ে গেছে। এই পদ্ধতিতে সমাজ বা সম্প্রদায়ের দায়বদ্ধতাও নাই।

বি + বহ্ + ঘঞ বা বিশিষ্ট বহন বা স্বীকার, দারপরিগ্রহণ, পাণিগ্রহণ, উদ্বাহ, গার্হস্থ্যজীবনের অঙ্গীকার। বিবাহ আবার শাস্ত্রের মতে আট প্রকার—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস, পৈশাচ (মনু ৩.২১)। এই আট প্রকার বিবাহ পদ্ধতির মধ্যে সবগুলি কিন্তু সমাজে প্রচলিত ছিল না। তাছাড়া বিভিন্ন বর্ণের বিবাহের বিভিন্ন রীতি। এই আটটির মধ্যে বর্তমানে দুটি রীতির প্রাধান্য দেখা যায়। তা হল প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব। গ্রামেগঞ্জে শহরেও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাজাপত্য বিবাহই এখনও চলছে। কতদিন চলবে ভবিষ্যৎই বলতে পারে। এই বিবাহে পিতামাতাই পাত্রী পছন্দ করে বিবাহ স্থির করেন। পাত্রের বা পাত্রীর পছন্দ-অপছন্দের কোন স্থান নাই। গান্ধর্ব-রীতি ক্ষত্রিয় সমাজে প্রচলিত ছিল; এই বিবাহে পাত্রপাত্রী পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে নিজেরাই বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়। বর্তমান কালে বিশেষ করে শহরে যে Love marriage ও Registry marriage-এর রেওয়াজ চলেছে সেটাই গান্ধর্ব বিবাহের প্রথম পর্যায়। গ্রামেও অল্পকাল হলো এর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আসুর বিবাহে কন্যাপক্ষকে বশীভূত করা হত। বর্তমান পণপ্রথা এর বিকৃত রূপ। রাক্ষস বিবাহে জোর করে কন্যাকে হরণ করা হত। মহাভারতের সুভদ্রা হরণ, পৃথ্বিরাজ চৌহানের সংযুক্তা-হরণ এর দৃষ্টান্ত। বর্তমান কালেও প্রেমিক-প্রেমিকা গোপন চুক্তি করে মাঝরাতে ঘর থেকে পালিয়ে গিয়ে মালাবদল করে কিংবা কোন দেবদেবীর মন্দিরে গিয়ে সিঁদুর পরে নিয়ে যে বিয়ে করছে সেটাই রাক্ষস বিবাহের বিকৃত রূপ বলা যেতে পারে। মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যে যে বিবাহরীতির উল্লেখ পাওয়া যায় সেটি বৈদিক ও লৌকিক পদ্ধতির মিলিত রূপ। বর ও কনের উভয়ের সম্মতিতে শুভ দিন দেখে "কন্যা দরশনী দিয়া করিলা লগন।" 'কন্যা দরশনী' অর্থে একটা অলঙ্কার দিয়ে কন্যা-আশীর্বাদ বা বর্তমানের পাকা দেখা। সেকালেও ঘটকালি, পণপ্রথা, দান-সামগ্রীর রেওয়াজ ছিল, তবে জোর জুলুম ছিল না। বিবাহের পূর্বদিন অধিবাস হত, বর্তমানের গায়ে হলুদ, ভোরবেলায় নিশিজল আনা, ক্ষীরচিঁড়ে খাওয়ার প্রথা আর কি? বিবাহকালে অঞ্চলভেদে কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান হত। যেমন

সপ্তপ্রদক্ষিণ (সাতপাকে বাঁধা), মালাবদল, পিতা-মাতা বা তৎস্থানীয় কারও দ্বারা কন্যা সম্প্রদান, জামাতৃবরণ। সমস্ত কর্মের হোতা ছিলেন পুরোহিত; এখনও হয়। আভ্যুতিক (আভ্যুদায়িক চলিতে আভ্যুতিক), হাতে সুতো বাঁধা, মালাবদল, কন্যা সম্প্রদান, সাতপাকে বাঁধা সবই আছে, কিছু কিছু স্ত্রী আচারের অনুপ্রবেশ ঘটেছে মাত্র বর্তমান কালে। আর আছে ছাদনা তলায় আট হাঁড়ি সাজিয়ে কুশণ্ডিকা, লাজহোম এবং পাত্র কর্তৃক কন্যার সিঁথিতে সিঁদুরদান ও বাম হাতে লোহা-পরান। কুশণ্ডিকা বিবাহের পরদিনই সাধারণত অনুষ্ঠানের নিয়ম। তবে অনেক ক্ষেত্রেই রাত্রেই সারা হয়। এসব অবশ্য ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রেই বেশী প্রযোজ্য। ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে কুশণ্ডিকার প্রচলন নাই। বিবাহের রাত্রে সিঁদুরদান হয়ে যায়। লৌহদান কোথাও কুশণ্ডিকার সময়ে বা ছাদনাতলাতেই হয় আবার কোথাও কোথাও লৌকিক আচার মতে কনে বরের ঘরে পা দিলে সেখানেই পরিয়ে দেওয়া হয়। এই সিঁদুর দান ও লৌহদান রাক্ষস বিবাহ ও অনার্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী। অনার্যদের মধ্যে একটা রীতি ছিল কন্যাকে জোর করে তার অমতে ধরে আনতে গিয়ে তার মাথা ফাটিয়ে হাতে লোহার বেড়ি বেঁধে আনা হত—সিঁদুর সেই রক্তের প্রতীক আর হাতের লোহা সেই বেড়ির প্রতীক।

বর্তমান কালে বিবাহরীতি দ্রুত বদলাচ্ছে। রেজেষ্ট্রি বিবাহের প্রচলন খুব বেড়ে যাচ্ছে। রেজেষ্ট্রি বিবাহের একটা সুবিধে পণ বিশেষ লাগে না, লোকজন নিমন্ত্রণ করে 'বিয়ে বাড়ি' ভাড়া করে বিরাট প্যান্ডেল খাটিয়ে খাওয়ানর বিশেষ বালাই নাই। তবে একটা জিনিসের অভাব আনন্দ উৎসবের মাধ্যমে পাড়া প্রতিবেশীকে আনন্দের অংশীদার করার, বহু জনেব শুভ কামনা মাথায় নিয়ে নতুন জীবন সূচনা করার যে আনন্দ, যান্ত্রিক সভ্যতার রেজেষ্ট্রি বিবাহ সেই আনন্দের স্বর্গসুখ থেকে আমাদের বঞ্চিত করছে।

দেশভেদে সম্প্রদায়ভেদে বিবাহের বিচিত্র রূপ। হিন্দুসমাজে যেখানে অগ্নিসাক্ষী ও নারায়ণসাক্ষী করে জীবনসঙ্গিনীর সঙ্গে উদ্বাহ অঙ্গীকার করা হয়, খ্রীষ্টানসমাজে গীর্জায় গিয়ে যাজকের কাছে শপথ গ্রহণ করে রেজেষ্ট্রি খাতায় স্বাক্ষর করে বিবাহ সম্পন্ন করা হয়। মুসলমান সমাজে বিবাহরীতি আবার অন্যরকম। মোল্লা পাত্র-পাত্রীর কাছে উপস্থিত হয়ে উভয়ের সম্মতি ও পাত্রপক্ষের কাছ থেকে 'দেন মোহরের' স্বীকৃতি নিয়ে কাবিলনামায় পাত্রপাত্রীর নাম নথিভুক্ত করবেন। 'দেন মোহর'-এর উল্লেখ এই জন্য যে যদি পাত্র কোন দিন পাত্রীকে তালাক (Divorce) দেন, তাহলে তাকে পাত্রীকে খোরপোষের জন্য ঐ টাকা দিতে হবে। বর্তমানে অবশ্য সুপ্রিম কোর্টের রুলিং হয়ে গেছে যে পাত্র-

পাত্রীকে Divorce করলে তার ভরণপোষণের খরচ পাত্রকে দিতে হবে। মুসলমান সমাজে একাধিক বিবাহ আইনসম্মত। কিন্তু খ্রীষ্টানসমাজে একাধিক বিবাহ বে-আইনী। হিন্দুসমাজে কৌলীন্য প্রথার যুগ শেষ হয়েছে, আর এক স্ত্রী থাকতে দ্বিতীয় বিবাহ সম্পূর্ণ বে-আইনী ঘোষিত হয়েছে।

নিম্নজাতি আদিবাসীদের মধ্যে সিঁদুরদানই বিবাহের একমাত্র মুখ্য আচার। সাঁওতালদের বিবাহ সম্বন্ধে W. W. Hunter তাঁর The Annals of Rural Bengal যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তা উল্লেখ করা যেতে পারে। As the Santals have attained an age of discretion before they marry, a freedom of selection is allowed to them, wholly unknown among the Hindus. (হিন্দুদের গান্ধর্ব রীতি কিন্তু অন্য কথা বলে)। The formal proceedings being by the lad's father sending a wedding messenger (rai bari) to the girl's father, who receives the Proffer in silence and after advising with his wife replies : "Let the youth and maiden meet, then these things is to be talked over." An interview is arranged at a neighbouring fair and at the close of the day, if the young people are pleased with each other, the lad's father buys a trifling present for the girl, who prostrates herself before him as a public acknowledgement that she is willing to be his daughther-in-law." এরপর কনে-কর্তাও বরের বাড়ী যায় সেখানেও উপহার দেওয়া-নেওয়া হয়। এরপর বরের বাবা বিজোড় সংখ্যায় কিছু টাকা কনের বাবার কাছে উপহার পাঠায়। কনের বাবা ঐ টাকা গ্রহণ করলেই আইন সম্মতভাবে কনে হস্তান্তর সম্পন্ন হল। এরপর বিয়ের প্রস্তুতি চলে। কনের বাবা পাড়ায় একটা বিয়ের চালা (shed) তৈরী করে। সেখানে একটা রাস্তার দু'পাশে বরপক্ষ ও কনেপক্ষ বসে। ছাদনা তলার জন্য একটা মহুয়া গাছের ডাল পোঁতা হয়। এর নীচে এক ভাঁড়ে কিছুটা ধান জল আর সিঁদুর মাখিয়ে রাখা হয়। বর ও কনেকে স্নান করিয়ে নতুন জামাকাপড় পরান হয়। এর পর জনা পাঁচেক বরযাত্রীসহ একজন বরকে কাঁধে করে কনের বাড়ী নিয়ে যায়। কনের ভাই বা ভ্রাতৃস্থানীয় বরকে বরণ করে। এর পর কনেকে একটা ঝুড়িতে বসিয়ে বাইরে আনা হয়। বর আর কনের মাঝখানে একটা কাপড়ের আড়াল থাকে। তার দুপাশ থেকে বর ও কনে পরস্পরের গায়ে জল ছিটিয়ে দেয়। তারপর পর্দা ছিঁড়ে দেয়।

(সূত্র : শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৭১, শারদীয়া আনন্দবাজার ১৪০৫, পুরোহিত দর্পণ, The Annals of Rural Bengal W.W. Hunter ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা)

কনের বাপের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হল। পরের অনুষ্ঠান কনের বাড়ী থেকে জ্বলন্ত কাঠ-কয়লা এনে ঘরের ওকলি (Okli) গাছের ডাল দিয়ে কাঠকয়লা গুড়িয়ে জল ছিটিয়ে নিভিয়ে দেয়। কনের বাপের বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হল। এর পরের অনুষ্ঠান মশাল যাত্রা, একটা মশাল জ্বেলে মাদল ঢাক বাজিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে কনের বরানুগমন। বিয়ের অনুষ্ঠান ৫/৬ দিন চলে। কনেকে নিয়ে মশাল যাত্রার আগে মহুয়া ডালের নীচে সেই জল সিঁদুর মাখানো ধানের ভাঁড় দেখানো হয়। যদি অনেক ধান অঙ্কুরিত হয় তাহলে অনেক ছেলেপিলে হবে। যদি কম অঙ্কুরিত হয় তাহলে ২/১ টি ছেলে হবে আর যদি ধান পচে যায় তাহলে খুবই অশুভ। সাধারণত এক বিবাহই প্রচলিত। কনে বিধবা হলে দেবর বিয়ে করতে পারে। বিবাহ-বিচ্ছেদ বড় একটা হয় না। যদি সে রকম ক্ষেত্র উপস্থিত হয় বরপক্ষকে সভা ডেকে তার সমর্থন নিতে হবে।

লৌকিক সংস্কার : অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ও বিবাহ সম্পর্কিত লৌকিক সংস্কার পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

শিশুর বিদ্যারম্ভ সাধারণত হয় তার ৫ বছর বয়সে। নারায়ণের মন্দিরে কিংবা সরস্বতী পূজার সময় ছেলের নামে সংকল্প করে নৈবেদ্য নিবেদন করে ছেলের হাত ধরে তাকে ৫/৬টি বর্ণমালার উচ্চারণ করান ও রামখড়ি ধরিয়ে তার হাত ধরে মেঝেতে কিংবা নতুন স্লেটে লেখান হয়। আজকাল অবশ্য বাপ মায়ের আর সবুর সইছে না। ৩ বছর হতে না হতেই ছেলের হাতে খড়ি দিয়ে ইংরেজী মাধ্যম স্কুলে ভর্তি করছেন।

রাত্রে মৃত্যু হলে রাত্রেই নিয়ে যাওয়া বিধি। অন্তিমকালে মুখে দুধ গঙ্গাজল দিতে হয়—সাধারণত ছেলেই দেয়।

শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় মৃত ব্যক্তির বুকের ওপর একটা লোহার জিনিস চাপিয়ে দিতে হয়। শবকে তুলে নিয়ে গেলে সেখানে একটা পেরেক পুঁতে দেওয়ার রীতি ছিল। বর্তমানে পাকা বাড়ীতে সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। একটা লোহার জিনিস নামিয়ে রাখা হয় ও সেই স্থানে তিন দিন প্রদীপ-ধূপ দেওয়া হয়। শবকে শ্মশানে নিয়ে গেলে গোবরমিশ্রিত জল (ছড়া) দেওয়া হয় আর বাইরের দরজার পাশে একটা রান্নার মাটির পাত্র বা কড়াই উপুড় করে সেখানে আগুন জ্বেলে দেওয়া হয় আর মাটির পাত্রের সঙ্গে একটা আঁশ বটি দেওয়ারও রীতি আছে। যদি মৃতদেহ গঙ্গায় নিয়ে যাওয়া হয় তবে যিনি মুখাগ্নি করবেন তাঁকে সেখান থেকেই 'কাচা' অর্থাৎ নতুন থানেব ছোট কাপড় ও তারই উত্তরীয় পরে আসতে হয়। শ্মশানে মৃতের মুখে পিণ্ডদানের রীতিও আছে। যারা গঙ্গায় দাহ না

করে স্থানীয় শ্মশানে নিয়ে যাবে তাদের ক্ষেত্রে প্রথম দিন যে মুখাগ্নি করবে তাকে সারাদিন উপবাসী থেকে সন্ধ্যায় তারা দেখে ফলমূল দিয়ে জল খেতে হয়। পরের দু'দিনও ফলমূলই আহার। রাত্রে খড় বিছিয়ে তার ওপর কম্বল বিছিয়ে শোয়া..., চতুর্থ দিনে স্থানীয় পুষ্করিণীতে বেনাগাছ পুঁতে তাতে গুড় বা পাটালি ও ছোলার ডাল ভিজিয়ে বেনাগাছে দিয়ে অশৌচান্তের দিন পর্যন্ত নিকট আত্মীয় সকলের জল দেওয়াই রীতি, বেনাগাছই মৃতের প্রতীক। ঘাট থেকেই 'কাচা' পরে আসতে হয়। পুত্রদের প্রতিদিন এক বেলা হবিষ্যান্ন রাত্রে ফলমূল বা খই আহার। ব্রাহ্মণদের ১০ দিনে অশৌচান্ত। ক্ষত্রিয়দের ১২ দিনে, বৈশ্যদের ১৩ দিনে ও শূদ্রদের এক মাসে অশৌচান্ত। তবে বর্তমানে ব্রাহ্মণেতর সকলেই ১৩ দিনেই অশৌচান্ত করে। পরদিন শ্রাদ্ধ—শ্রাদ্ধের প্রধান অঙ্গ গোয়ালে অগ্রদানীর পিণ্ডভক্ষণ। তবে অগ্রদানীর কাজ করতে এখন কেউ বিশেষ রাজী হয় না, আর রাজী হলেও পিণ্ডভক্ষণ কেউ করে না, ঘ্রাণেন ভোজনম্ রীতিই চালু হয়ে গেছে। শ্রাদ্ধ বাড়ীতে নিমন্ত্রিত কেউ অন্নগ্রহণ করে না, তবে পাকান্নে দোষ নাই। প্রতি মাসে একাদশী, অমাবস্যা বা মৃত্যুর তিথিতে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করার রীতি। তবে বর্তমানে অধিকাংশ ব্যক্তি বৎসর শেষে এক দিনেই সব সারেন। বাড়ীতে বিবাহ, উপনয়ন, প্রতিমাপূজার ব্যাপার থাকলে সপিণ্ডন এক বৎসরের আগেও করা যায় তবে বার মাসের এক সঙ্গে করতে হবে। বর্তমানে একোদ্দিষ্ট তো দূরের কথা, আদ্যশ্রাদ্ধই অনেক অতি আধুনিক বা বিশেষ রাজনৈতিক মতালম্বীদের মধ্যে উঠে যাচ্ছে। এঁদের মতে শ্রাদ্ধ তো শ্রদ্ধা নিবেদন, সেটা মৃতের ফটোতে ফুলের মালা দিয়েও শ্রদ্ধা জানান হয়। মুসলমানদের কারো মৃত্যু হলে মৃত ব্যক্তিকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরিয়ে সমস্ত আত্মীয়-স্বজনদের জড়ো করে শোক করা হয়। পারিবারিক বা সাধারণ কবরে কবর দেওয়া হয়। চল্লিশ দিন পর আত্মার উদ্দেশ্যে কোরান পাঠ হয়।

খ্রীষ্টানদের মৃতদেহ গীর্জার প্রাঙ্গণে নিয়ে যাওয়া হয় এবং অন্তিম ঘন্টা-ধ্বনির (Death Khell) সঙ্গে প্রার্থনা করা হয়। গীর্জা-প্রাঙ্গণে বা খ্রীষ্টানদের নির্দিষ্ট কবরস্থানে কবর দেওয়া হয়।

এই সমস্ত আচার-বিচার ছাড়া প্রধানত বর্ণ-হিন্দু গৃহস্থের প্রাত্যহিক জীবনে ও নানা রকম আচারবিচার মানা হয়। অবশ্য গ্রামবাসীদের মধ্যেই এগুলির প্রচলন। শহরবাসীদের মধ্যে ২/১ প্রজন্ম পালন করে, পরের প্রজন্মের কেউ আর মানে না। শিক্ষাবিস্তার ও বৈজ্ঞানিক চেতনা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীদের মধ্যেও এগুলি আস্তে আস্তে লোপ পেতে বসেছে।

আধুনিক প্রযুক্তির যুক্তিতর্কের বিচারের ফলে একদিন এই সব লৌকিক ও গ্রামীণ আচার-বিচার লোপ পেয়ে যাবে। কেউ হয় তো ইতিহাসের পাতা খুঁজেও এগুলির হদিস পাবে না। কেউ জানবে না এই সব আচারের বিচারের কথা, কেউ এদের যৌক্তিকতা নিয়েও গবেষণা করবে না; কিন্তু এগুলির কিছু সার্থকতা যে ছিল সেটা অস্বীকার করা যায় না। অনেক আচার-বিচার নষ্ট হয়ে গেছে তবুও এখনও যা আছে বা যে কতকগুলির সন্ধান পেয়েছি সেগুলির উল্লেখ না থাকলে জনগণের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

গৃহস্থ বাড়ীতে ভোরবেলায় প্রতি দরজায় জল ছিটিয়ে বালতিতে গোবর গুলে উঠোনে বাইরের দরজায়, তুলসীতলায় ঠাকুরবাড়ীতে গোবর জলের 'মারুলী', ন্যাকড়ার 'ন্যাতা' দিয়ে গোলাকার করে লেপে দেওয়া হয়। সন্ধ্যার সময় আবার জল ছিটানোর পালা চলে। প্রতি বাড়ীতে একটা তুলসী গাছ লাগাতে দেখা যায়। সন্ধ্যায় প্রদীপ, ধূপ বা ধূনো প্রতি ঘরে, তুলসীতলে, ঠাকুরবাড়ীতে দেখান হয়। সন্ধ্যায় শঙ্খধ্বনি করারও রীতি আছে। গ্রামের অধিকাংশই মাটির বাড়ী, কাজেই সারাদিন রাত্রের ধূলা ময়লা যা জমে জল ছিটিয়ে গোবর জলের মারুলি দিলে তা দূর হয়। তুলসী গাছের ভেষজ গুণ অনস্বীকার্য। এই গাছ নাকি বজ্রনিরোধক বলে শুনেছি। গোবরের কিছুটা antiseptic গুণও আছে। অন্ধকার দূর করতে মশার উৎপাত কমাতে প্রদীপদান ও ধূপ-ধূনার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। মনে হয় এই কারণেই 'ছড়া মারুলি'র ব্যবস্থা। ব্রাহ্মণ বালকদের উপনয়ন না হলে দেব-পূজার অধিকার নাই। উপনয়ন শিক্ষার প্রথম ধাপ। কাজেই শুদ্ধভাবে মন্ত্র উচ্চারণের জন্যই এই বিধান। মেয়েদের ঋতুকালে তিনদিন দেবমন্দিরে প্রবেশ নিষেধ ও কোন শুভকার্যে অংশগ্রহণ করাও বারণ। মনে হয় এসময়ে মেয়েদের শারীরিক অস্বস্তির কথা মনে রেখেই এই রীতির প্রচলন হয়েছে। ব্রাহ্মণদের মলমূত্র ত্যাগকালে কানে পৈতে দেওয়ার রীতি আছে যাতে উত্তরীয়ের প্রতীক এই পৈতে মলমূত্রের স্পর্শে অপবিত্র না হয় তার জন্যে এই রীতির প্রচলন।

হিন্দুদের ধারণা, বৈশাখ মাসের ১৩ তারিখ থেকে নূতন মেঘের সূচনা। কালবৈশাখীর সংকেত। গ্রামের অধিকাংশ বাড়ীর চাল খড় দিয়ে ছাওয়া, তাই যাতে ঝড়ে চাল না উড়ে যায়, তার জন্য ঐ তারিখে বিকালে প্রতি ঘরের ঈশান কোণের চালে শেওড়া গাছের ডাল দেওয়ার রীতি আছে। আগে হয় তো শেওড়া গাছের ভারী কাঠ চালে চাপানো হত। এখন তারই প্রতীক এই শাখা। তবে গ্রামেও অনেক বাড়ী করগেটের চালের বা টালির হচ্ছে, কিছু কিছু পাকা বাড়ীও উঠছে কাজেই শেওড়া ডাল দেবার প্রথাও লোপ পেতে বসেছে।

উৎসবে, অনুষ্ঠানে, পূজা-পার্বণে বাহির দরজায় বা মন্দিরের আটচালায় আম্রপল্লবের মালা টাঙিয়ে দরজার দুপাশে ছোট ছোট কলাগাছ মাঙ্গলিক চিহ্ন হিসেবে দেওয়ার রীতি আছে। এখন উৎসব অনুষ্ঠানে বড় বড় প্যাণ্ডেল হয়, সুসজ্জিত গেট হয়। গেটে অনুষ্ঠানের নামও প্লাষ্টিকে বা শোলা কিংবা ফোম দিয়ে লেখা থাকে। তখন তো এসব ছিল না—আম্রপল্লব, কলাগাছ অনুষ্ঠান-বাড়ীকে চিহ্নিত করতো।

বৈশাখ মাসে অশ্বত্থ গাছ, বেলগাছে স্নানের সময় জল দেওয়া, তুলসী গাছের ওপর 'ঝারা' দেওয়ার কিংবা বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা উৎসব বর্তমানের সামাজিক বনসৃজনের প্রতীক। এখনও পল্লীগ্রামে প্রাচীনরা পুকুর থেকে স্নান করে এসে এই সব বৃক্ষে জল দেয়। পরের প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা আর দেবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া সামাজিক বনসৃজন উৎসবের ফলে এর প্রয়োজনীয়তাও ফুরিয়েছে।

অনেক পরিবারে বৈশাখ মাসের ১৬ তারিখ থেকে মেয়েদের বিয়ের দিন ধরার নিয়ম নাই। ক্ষীরগ্রামে তো নাই-ই, কারণ, ১৫ই বোশেখ থেকে যোগাদ্যা লগ্ন। যাঁরা এই সংস্কার মানেন তাঁদের ধারণা যোগাদ্যা লগ্নে বিয়ে দিলে মেয়ে বিধবা হয়।

প্রতি বৃহস্পতিবার অনেক পরিবারে সধবা মেয়েরা নিরামিষ খান ও যাঁরা সন্তোষী মায়ের ব্রত করেন তাঁরা কোন শুক্রবারে অম্লজাতীয় কিছু স্পর্শ করেন না।

বিধবাদের বিশেষ করে ব্রাহ্মণঘরে বিধবাদের একাদশীতে নির্জলা উপবাসের বিধান আছে। অবশ্য যাঁরা বিধান দেন তাঁরা একাদশীতে 'লুচি-দশী' করেন। তাই সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ব্যঙ্গ করে লিখেছেন—

উড়িয়ে লুচি আড়াই দিস্তে দেড় কুড়ি আম সহ—
একাদশীর বিধান দাতা করে একাদশী।

*** *** *** ***

ওদিকে ঐ ক্ষীণ মেয়েটি নিত্য একাহারী
একাদশীর বিধান পালন করছে
প্রাণে ম'রে,
কণ্ঠতে প্রাণ ধুঁকছে, চোখে সর্ষে ফুলের সারি,
তৃষ্ণাতে জিভ অসাড়, মালা জপছে ঠাকুরঘরে।

তবে আজকাল অধিকাংশ বিধবাই রুটি, ছানা, সাগু এসব খেয়ে থাকেন। ব্রাহ্মণেতর বিধবাদের এসবের বালাই নাই।

জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা ও পর পর চারটি পঞ্চমী তিথিতে মনসার বারব্রত। এই কয়দিন মাষকলাইের ডাল, কচু, পুঁইশাক, ডিম, কলমী ও পাটশাক এসব খাওয়ার Taboo আছে। তাছাড়া এই কয়দিন বাড়ীর একজন মনসার পূজা দিয়ে চিঁড়ে ফলার করে। সাপের পিচ্ছিল অঙ্গ ও বিষাক্ত লালার প্রতীক হিসেবে এই সব খাদ্য বর্জন করার রীতি। আবার এও হতে পারে এই সব খাদ্য খাওয়ার ফলে সাপে দংশন করলে সাপের বিষের ক্রিয়া তীব্রতর হতে পারে। এটা অনুমান, বৈদ্যরাই সঠিক তথ্য দিতে পারেন।

"জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠী পুজো ছেলের হাতে দড়ি, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা লোকের হুড়োহুড়ি।" জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠী (অরণ্য ষষ্ঠী) তিথিতে ষষ্ঠীর পুজো দিয়ে হলুদমাখা সুতো ছেলেদের হাতে মায়েরা পরিয়ে দেয়। কপালে তেল-হলুদ-দই-এর ফোঁটা। যাদের বাড়ীতে নতুন জামাই হয়েছে তাদের জামাই বাবাজীকেও শাশুড়ী ঠাকরুন এই হলুদের ফোঁটা দেন। তার সঙ্গে অবশ্য ধুতি, শার্ট, কিংবা প্যান্ট-শার্টের ছিট সহ মোটা রকমের তত্ত্ব ও ভূরিভোজনের ব্যবস্থাও করতে হয়।

"জ্যৈষ্ঠের আট, আষাঢ়ের সাত/ তবে ছাড়বে মিগের বাত।" অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ৮ দিন ও আষাঢ় মাসের প্রথম ৭ দিন এই পনের দিনে মৌসুমীর আবির্ভাব হয়। প্রায়শ ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ে, মাটিকে রসসিক্ত করে। এর পরই অম্বুবাচী। তিনদিন পালন। বিধবাদের তিনদিন অন্ন নাই। চিঁড়ে ফলারই ভরসা। তাও একবেলা, রাত্রে মুড়ি। কাঠের আগুন জ্বালিয়ে রন্ধন নিষেধ। মৌসুমী বায়ুর আবির্ভাবের ফলে পৃথিবী রসসিক্ত-রজঃস্বলা। এ সময়ে জমিতে লাঙ্গল দেওয়া নিষেধ, ঋতুকালে নারীদের পুরুষ সংসর্গ যেমন নিষিদ্ধ। আদিবাসী সাঁওতালদের মধ্যেও অম্বুবাচীর অনুরূপ "এবঃ কিসিম" পার্বণ পালিত হয়। উভয় পার্বণের পালন মোটামুটি একই রূপ।

শ্রাবণ মাসে নাগপঞ্চমীর আগে চোদ্দ শাক উপড়িয়ে কচুগাছের পাতায় মুড়ে বাড়ীর দরজায়, তুলসী তলায়, মাঝ উঠানে এই রকম ১৪টি জায়গায় রেখে সিঁদুর, ফুল দিয়ে কাস্তের উল্টো পিঠ দিয়ে বলি দেওয়ার ও ১৪ রকম শাক একত্রে রান্না করে খাওয়ার একটা রীতি আছে। মনে হয় বর্ষায় গ্রামের বাড়ীর চারপাশে নানা আগাছার জঙ্গল হয়, সেখানে সাপের আস্তানা থাকার সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে চোদ্দ শাকের পর্ব দিয়ে আগাছা নিড়ানের (weeding) ব্যবস্থা।

ভাদ্রের সংক্রান্তিতে অনেক পরিবারে বিশেষ করে যারা বিশ্বকর্মা পূজা করে কিংবা মনসা পূজা দেয়, তারা অরন্ধন পালন করে। আঞ্চলিক ভাষায় বলে

'আরাঙ্'—ভাদ্রের সংক্রান্তিতে রান্না করে রেখে ১লা আশ্বিন সেই বাসী খাবার খাওয়ার রীতি আছে। বর্ধমানে অনেক জেলে কৈবর্তদের মধ্যেও এই রীতি পালন করা হয়।

আশ্বিনের সংক্রান্তি থেকে কার্তিকের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যায় তুলসীতলায় দক্ষিণমুখ করে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে প্রদীপ দেওয়ার রীতি আছে। তবে কোন কোন পরিবারে ঐ সময় একই উদ্দেশ্যে আকাশ প্রদীপ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। শ্যামাপূজা উপলক্ষে ভূত-চতুর্দশীতে চোদ্দ প্রদীপ দানের উদ্দেশ্য একই। শ্যামাপূজা ও দীপাবলীতে গৃহে আলোকসজ্জা তো বর্তমানে একটা ফ্যাসনে দাঁড়িয়েছে, সাধারণত মোমবাতি দিয়ে ও বিশেষ বিশেষ সঙ্গতিসম্পন্ন বাড়ীতে টুনি লাইট দিয়ে গোটা ঘরকে আলোকসজ্জায় সাজান হয়। ছোট ছোট ছেলেরা ঐ দিন পাঠকাঠির আঁটি বেঁধে আগুনে ধরিয়ে 'উজোল পুজোল' খেলা খেলে। সন্ধ্যায় প্রদীপদান, আকাশপ্রদীপ, চোদ্দ প্রদীপদান দীপাবলী এ-সবের উদ্দেশ্য "শ্যামা পোকা" ধ্বংস করা। বর্ষার শেষে ছোট ছোট পোকার উৎপাত ঘটে। লক্ষ লক্ষ পোকা মারবার জন্যে এসব ব্যবস্থা।

কার্তিকের সংক্রান্তি; অগ্রহায়ণের প্রথম দিন, অঘ্রানের প্রতি রবিবার ও সংক্রান্তিতে ভোরবেলায় 'ইতু'র ঘট আনার রীতি আছে। 'ইতু' আনার বিভিন্ন গ্রামে বা বিভিন্ন পরিবারে বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। অধিকাংশ স্থানে ভোরে উঠে গৃহকর্ত্রী একটি ঘটে কলমী শাকের লতা, আম্রপল্লব ও কলা, সুপুরি দিয়ে ঘট এনে তুলসীতলায় রেখে ঘটের গায়ে সিঁদুরের পুতুল এঁকে দেয় আবার দুপুরে বিসর্জন দেয়। বৈদ্যপুর অঞ্চলে কার্তিক সংক্রান্তিতে একটা বড় মালসায় মাটি ভরে তাতে কচুগাছ, হলুদগাছ, ধান, কলমীলতা রেখে গাঁদাফুল দিয়ে সাজিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঠাকুরঘরে বা নির্দিষ্ট স্থানে রাখা হয়। কার্তিকের সংক্রান্তি, ১লা অগ্রহায়ণ ও প্রতি রবিবার গৃহিণী এতে ফুল জল দিয়ে পুজো করে। অগ্রহায়ণের সংক্রান্তিতে ইতুর ঘট বা হোলার কাছে সূর্য পূজা করে পরমান্ন আস্‌কে সরু চাক্‌লি করে ভোগ দেওয়া হয়। ছড়াও আছে "এ সংক্রান্তি গুঁড়ি (চালের গুঁড়ি) হাত / আসছে সংক্রান্তি পিঠে ভাত।" ইতু মনে হয় বৈদিক মিত্র (অর্থাৎ সূর্য) এর অপভ্রংশ মিত্র / ইত্র / ইতু। ইতু শস্যদেবতা, শস্য উৎপাদনের সঙ্গে সূর্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; তাই অগ্রহায়ণ মাসে নতুন শস্য বাড়ীতে আসবে সেই উপলক্ষে 'ইতু' পরব। Fertility cult-কে কেন্দ্র করেই কৃষিভিত্তিক এ-জেলার বেশীর ভাগ উৎসব। 'ইতু' সম্পর্কে ব্রত-পার্বণ অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা যাবে।

পৌষ মাসের প্রথম পাঁচদিন বিশেষ ভাবে পালন করা হয়। এই কয়দিন মুড়ি-ভাজা, সোডায় কাপড় কাচা, কোন কিছু পুড়িয়ে খাওয়া নিষিদ্ধ। পৌষ সংক্রান্তিতে পিঠে খেজুর গুড়ের ব্যবস্থা। শীতের মধ্যে চালের গুঁড়ির খাবার, খেজুর গুড় শরীরকে গরম রাখে। পৌষ সংক্রান্তিতে 'বাউনী' বাঁধা ও পৌষ ডাকারও রেওয়াজ আছে। নতুন ধানের খড় লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে রাত্রে শোবার আগে ভাঁড়ার ঘরের জিনিসপত্রে, রান্নাঘরের হেঁসেলে, লক্ষ্মীর আটনে, ক্যাশ বাক্সে, আলমারিতে, তুলসী গাছে, সারকুড়ে, গোয়ালে এক গাছি করে খড় বেঁধে দেওয়া হয়। পৌষ মাস শেষ হয়ে যাচ্ছে, পৌষ মাস লক্ষ্মীর মাস, পল্লীর ঘর খামার বাড়ী মাঠের ধানে ভরে গেছে। কাজেই পৌষ মাস যেন না যায়। তাই পৌষের সঙ্গে ঘরের সব সম্পদকে বেঁধে রাখার এক অন্ধ বিশ্বাস। আর এই কারণে কোথাও কোথাও শুতে যাবার আগে, কোথাও বা আবার সংক্রান্তির ভোরবেলায় ঘরের দরজায়, মাঝ উঠানে, তুলসীতলে, ধানের গোলার তলে, ৩টি বা ৫টি গোবরের নাড়ু পাকান, মূলো ফুল, সরষে ফুল, সিঁদুর ও চালগুঁড়ি দিয়ে পৌষলক্ষ্মীকে ডাকা হয়। পৌষলক্ষ্মী যেন তার অফুরন্ত ভাণ্ডার নিয়ে জন্ম জন্ম গৃহে অবস্থান করে। পৌষ সংক্রান্তির রাত্রিকে না পোহাইবার জন্য প্রার্থনা এই পৌষ ডাকা।

এসো পৌষ যেও না।
জন্ম জন্ম ছেড়ো না।
পৌষ আসছে গুঁড়ি গুঁড়ি
পৌষের মাথায় টাকার ঝুড়ি।
আন্দারে পান্দারে পৌষ
বড় ঘরের মেঝেয় বোস।

মাঘ মাসে শীতলা ষষ্ঠীর দিন আবার অরন্ধন। সরস্বতী পুজোর দিন ভাত, তরিতরকারী ও গোটা সিদ্ধ। রান্না করে রেখে ষষ্ঠীর দিন বাসি খাওয়া। এর বিশেষ আকর্ষণ গোটা সিদ্ধ। গোটা বিরিকলাই (মাষকলাই) ভেজে, তার সঙ্গে গোটা গোটা ছোট বেগুন, আলু, জোড়া সিম, জোড়া মটরশুঁটি, জোড়া কুল, রাঙা আলু, সজনে ফুল, আদা, মৌরি দিয়ে সিদ্ধ করে পান্তাভাতের সঙ্গে খাওয়ার রীতির মধ্যে অনেকে একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি খাড়া করেন। এ ভাবে যে গোটা সিদ্ধ হয়, তাকে 'বাসি' করলে গুটি বসন্তের প্রতিষেধক হয়। তাই মনে হয় এই ব্যবস্থা।

মাঘ মাস থেকে কচি নিমপাতা খাওয়ার রীতি আছে। তবে একটা Tabooও এর সঙ্গে যুক্ত। "শনি মঙ্গলবারে নিম খায়/পরের বন্ধনে বন্ধন যায়।" শনি ও মঙ্গলবারে নিম খাওয়া যে কেন নিষিদ্ধ তার কারণ খুঁজে পাই নাই।

দোলের সময় আবীর মাখলে গুটি বসন্তের ভয় থাকে না বলেই শুনেছি।

কাজেই দেখা যাচ্ছে আচারবিচারের মধ্যে কিছু বৈজ্ঞানিক যুক্তি, কিছু দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য বা সংস্কার। যুগের সঙ্গে তাল রেখে পরিবর্তন পরিমার্জন বা সংস্কারেরও সংস্কার হতে পারে। নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন ২১শে ডিসেম্বর ১৯৯৯ অমিয় দাশগুপ্ত স্মৃতি বক্তৃতায় মহামতি আকবরের উদ্ধৃতি দিয়ে ঠিক এই কথাই বলেছেন—"The pursuit of reason and rejection of traditionalism are so brilliantly patent as above the need of argument. If traditionalism were proper, the prophets would merely have followed their elders (and not come with new messages)."

কুসংস্কার : সংস্কারগুলি প্রচলিত থাকার ফলে পাশাপাশি অনেক কুংসস্কারও আমাদের সমাজে ঢুকে পড়েছে। এর মূলে আছে অশিক্ষা ও আমাদের রক্ষণশীল মনোভাব। সংস্কার ও কুসংস্কারের মধ্যে ব্যবহারিক পার্থক্য বিশেষ নাই বললেই হয়। দুটোই যুক্তি বহির্ভূত ব্যাপার। তবে স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে এদের রকমফের ঘটে। আধুনিক প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী মানুষ ক্রমশ সংস্কার-বিরোধী হয়ে উঠছে আর কুসংস্কার তো সব সময় নিন্দার্হ। তবু তো এখনও মানুষ সম্পূর্ণরূপে কুসংস্কার-মুক্ত হতে পারে নাই। অনেক বৈজ্ঞানিক এমন কি পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী মানুষের মধ্যেও, কিছু কুসংস্কার দেখা যায়।

'হাঁচি টিকটিকি বাধা / তিন না মানে সাধা।' বাড়ী থেকে বের হবার সময় বা কোন শুভ কাজ আরম্ভের সূচনায় কেউ যদি হাঁচে বা দেওয়ালে টিকটিকি টক্‌টক্ শব্দ করে বা কোন বাধা পড়ে তাহলে যাত্রা শুভ হয় না বা শুভকার্য সুসম্পন্ন হয় না—এ ধারণা এখনও অনেকের মনে বাসা বেঁধে আছে। যাত্রাকালে যদি সামনে শকুনি বা হিজড়ে (enunch) দেখা যায় কিংবা পশ্চাতে বিড়াল, তা হলে নির্ঘাত যাত্রাপথে কোন বিপদ ঘটবে বলে গ্রামবাসীদের বিশ্বাস। "সামনে যদি দেখ ধোপা / এক পা না বাড়াও বাপা।" সামনে ধোপা দেখলেও বিপদ। এক পা বাড়ান চলবে না। তিন, তের, তেইশে / কোথা যাস রে নির্বংশে। মাসের ৩রা, ১৩ই ও ২৩শে—এই তিন দিনের যাত্রা শুভ হয় না। অশ্লেষা মঘা / এড়াবি ক' ঘা। অশ্লেষা ও মঘা নক্ষত্রযুক্ত দিন চরম অশুভ। মাসের ৩০ দিনের মধ্যে তিনটি দিন ও ২৭টি নক্ষত্রের মধ্যে মাত্র দুটি নক্ষত্র যে কি অপরাধ করেছে কিংবা বহুজাতিক দেশে ধোপা বা হিজড়েদের কি অপরাধ তার হদিস খুঁজে পাওয়া যায় না। ট্রাক বা বাস চালকদের ক্ষেত্রে দেখা যায় বিড়াল সামনে দিয়ে

রাস্তা পার হলে তারা অগ্রসর হতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়। অন্তত কিছুক্ষণ অপেক্ষা না করে আর এগোবে না। এ কুসংস্কার নাকি পাশ্চাত্য দেশের কোথাও কোথাও আছে। পাশ্চাত্য দেশেও ১৩ সংখ্যা খুবই দুর্ভাগ্যজনক, তাদের কাছে unlucky thirteen। রাজনীতিকদের মধ্যেও নানারকম কুসংস্কার দেখা যায়। নির্বাচনের আগে নমিনেশন পত্র দেবার আগে অনেকে জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হন ও স্থানীয় অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবীর কাছে পুজো দিয়ে তবে নমিনেশন পত্র জমা দেন। রাজীব গান্ধী তো মাচান বাবার শ্রীচরণের স্পর্শ মাথায় নিয়ে তবে নমিনেশনে নামতেন। ইন্দিরা গান্ধী আনন্দময়ী মায়ের দেওয়া মালা সব সময় ধারণ করতেন ও আপদে বিপদে মায়ের আশীর্ব্বাদ নিতে ছুটে যেতেন। অধ্যাপক হীরেন মুখার্জীর একটি প্রবন্ধে দেখলাম (২১/১২/৯৯, স্টেটসম্যান) রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ জহরলাল নেহরুকে ১৯৫০ সালে ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ভারতীয় শাসনতন্ত্র গ্রহণ করতে নিষেধ করেছিলেন। কারণ, ঐদিনটি জ্যোতিষের বিচারে খুবই অশুভ ছিল। জহরলাল অবশ্য তাঁর কথায় আমল দেন নাই। এর জন্যে নাকি সঙ্ঘ পরিবারের জহরলাল-এর ওপর গোঁসা হয়েছিল। তাবড় তাবড় রাজনীতিকরা যখন কুসংস্কারের শিকার, তখন এ জেলার গ্রামের অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত মানুষের মধ্যেও কুসংস্কার থাকবে এতে আর আশ্চর্য কি?

অমার পর 'পি' / আর পূর্ণিমার পর 'দ্বি'। অর্থাৎ অমাবস্যার পর প্রতিপদে ও পূর্ণিমার পর দ্বিতীয়ায় যাত্রা নিষেধ। ভোরে উঠে মুখ ধোবার আগে কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তির মুখ দেখে উঠলে যদি সেদিন তার কোন ক্ষতি হয় তা হলে সেই অবাঞ্ছিত ব্যক্তির মুখকেই দায়ী করা হয়। যাত্রার সময় সামনে 'মাকুন্দ' অর্থাৎ বয়সকালে যার দাড়ি গোঁফ ওঠে নাই তার মুখ দেখাও অশুভ সংকেত। রাত্রে হাত থেকে কোন কিছু পড়ে গেলে সে রাত্রে বাড়ীতে নিশিকুটুম্ব অর্থাৎ চোর আসার সম্ভাবনা আর দিনের বেলায় হাত থেকে পড়লে কুটুম্বের আগমনের আশঙ্কা। মেয়েদের দক্ষিণ চক্ষুর স্পন্দন অশুভ সংকেত। এমন কি কবি মধুসূদন দত্ত নিজে মাইকেল হলেও মেঘনাদ বধ কাব্যে মেঘনাদের মৃত্যুতে তাঁর কাল্পনিক চরিত্র মেঘনাদ জায়া প্রমীলার "বামেতর নয়ন' নাচিয়ে ছেড়েছিলেন, শুধু তাই নয় "আত্মবিস্মৃতিতে হায়, অকস্মাৎ সতী মুছিলা সিন্দূর বিন্দু সুন্দর ললাটে।" এটাও কুসংস্কারের পর্যায়ে পড়ে। "আগে চলে, মাঝে ফলে পাছে বলে।" এই প্রবাদের মধ্যেও কুসংস্কারের ছায়া। এর অর্থ পায়ের তলার অগ্রভাবে 'সুড়সুড়ি' দিলে সেই ব্যক্তিকে সেদিন অনেক পথ হাঁটতে হবে, মাঝখানে চুলকালে সেদিন কিছু লাভের সম্ভাবনা আর পশ্চাদ্‌ভাগ চুলকালে কারো সঙ্গে ঝগড়া নির্ঘাত।

কিভাবে যে এই সব উদ্ভট কুসংস্কারের উদ্ভব হলো—বুদ্ধিতে তার ব্যাখ্যা চলে না। তবে এই খানেই শেষ নয়। আরও আছে। পরীক্ষার আগে বের হবার সময় মা ছেলের বুকে ঠাকুরের আশীর্বাদী ফুল দিয়ে কপালে দই-এর ফোঁটা দিয়ে দেন। ধারণা পড়াশোনা না করলেও ঠাকুরের আশীর্বাদী ফুল আর দই-এর ফোঁটা ছেলেকে পরীক্ষার বৈতরণী পার করে নিয়ে আসবে। ছেলের কঠিন অসুখ হলে অতি আধুনিক এমন কি বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদী মায়েরাও দেবতার কাছে ছেলের আরোগ্যের কামনায় মানত না করে বা পূজা না দিয়ে পারেন না। অসুখ-বিসুখ নিরাময়ের জন্য জলপোড়া, তেলপোড়া, নুনপোড়া, মাদুলি ধারণ—এ সব বুজরুকি গ্রামেগঞ্জে বহুল প্রচারিত। শহরের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও দশ আঙুলের আটটি আঙুলে আটটি বিশেষ বিশেষ দামী পাথর বসান আংটি পরে গ্রহের কুদৃষ্টি থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন। কারো কিছু হারালে ওঝাকে দিয়ে হাত চালান বা মন্ত্রপূত চাল-পোড়া খাওয়ান, নখ-দর্পণ, নল চালান-এর সাহায্য নিয়ে চোর ধরার চেষ্টাও আর এক কুসংস্কার। তবে এর পিছনে খানিকটা মনস্তাত্ত্বিক কারণও আছে বলে আমার ধারণা। শুভকার্যে বের হবার সময় সঙ্গে কাঁঠাল, ডিম বা কলা নিয়ে গেলে কার্যের ফল না-কি অষ্টরম্ভা বা ঘোড়ার ডিম হওয়ার আশঙ্কা।

১৩৮৫ সালের ২রা অঘ্রানের সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে (কুসংস্কার-সংস্কার-প্রগতি) লেখক বলেছেন—"সংস্কার তথা কুসংস্কার সমাজের মধ্যে না থেকেও পারে না অথচ সমাজের পক্ষে সম্ভাব্য বিপদের কারণও বটে। বলা যেতে পারে যত বেশী মানুষ যত দৃঢ়ভাবে সংস্কারে আবদ্ধ, সংস্কার ততই শক্তিশালী। সমাজের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বা উল্লেখযোগ্য ক্ষমতার আসনে যাঁরা অধিষ্ঠিত, তাঁরা যখন এই বন্ধনে বদ্ধ হন তখনো সংস্কার যে তুলনামূলকভাবে বেশী শক্তিশালী হবে তাতে আশ্চর্য কী? ...আমাদের মতন প্রাচীন দেশে প্রচুর ছাই-ও যেমন জমা আছে, রতন অন্বেষণে তাকে উড়িয়ে দেখাও হয়ত খুবই দরকার। সংস্কার থেকে সক্রিয় কুসংস্কারগুলিকে বেছে আলাদা করতে পারলে সমাজের পক্ষে কল্যাণকর শক্তি তা নিশ্চয়ই যোগাতে পারে।"

ছয় অধ্যায়

আধুনিক যুগে আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম ও গুরুবাদ

আধ্যাত্মিকতা একটি সূক্ষ্ম ধারণা; এর প্রকৃত অর্থ ও আদর্শ নিয়ে বিতর্কের অন্ত নাই। তবে একটা কথা পরিষ্কার যে অনাদিকাল থেকে কোন না কোন সূত্র ধরে ধর্মকেই আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে সভ্যতা। এখন প্রশ্ন—ধর্ম কি? ধৃ + মন্ + ক এই প্রকৃতি প্রত্যয় নিষ্পন্ন 'ধর্মের' অর্থ অনুসারে ধর্ম হচ্ছে লোকধারক, ধর্ম হচ্ছে শাস্ত্রের অনুশাসন। এই ধর্ম নিয়ে যুগে যুগে দ্বন্দ্ব হিংসা ঘটে গেছে এখনও ঘটছে। তবে এক বিশেষ ধরনের দৃঢ়বদ্ধ বিশ্বাসকে অবলম্বন করেই এক এক জাতির মধ্যে এক এক ধর্মমত গড়ে উঠেছে। কোন এক জাতির বিশেষ ধর্মকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রথমে যে কোন ধর্মের একটা মূল ধারা থাকে তার সঙ্গে যুক্ত হয় বিভিন্ন উপধারা। রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন Polarisation ঘটছে ধর্মের ক্ষেত্রেও তেমনি ঘটছে। মূল ধর্ম বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হচ্ছে। কিন্তু মূল ধারার সঙ্গে এক উপধারার সংঘাত ঘটে ও সংঘাতের পর চলতে থাকে সমন্বয় ও সমীকরণ। ফলে সৃষ্টি হয় এক নতুন ধর্মের।

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের মধ্যে পাঁচ ধর্মসম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায় বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর ও গাণপত্য। এদের মধ্যে সূর্যের উপাসক সৌর সম্প্রদায় এবং গণপতির উপাসক গাণপত্য সম্প্রদায় বর্ধমান জেলায় নাই বললেই হয়। মাড়োয়ারীদের মধ্যে বিশেষ করে ব্যবসাদারদের মধ্যে গণপতি পূজার প্রচলন আছে। তবে হিন্দুর যে কোন অনুষ্ঠানের সূচনায় গণপতি ও সূর্যের পূজা করা বিধিসম্মত। এ ছাড়া শিখ, বৌদ্ধ, জৈন ধর্মাবলম্বীও কিছু কিছু আছে তবে এদের সংখ্যা দিন দিন কমে আসছে। ইসলাম ও খ্রীশ্চান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা অবশ্য এ জেলায় উল্লেখযোগ্য। এদের বিষয় পুস্তকের প্রাচীন যুগ বিভাগের পঞ্চদশ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে সে বিষয়ে আরও বিশদভাবে আলোচনা করে আধুনিক যুগে ধর্মের গতি-প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করা হচ্ছে। জেলায় আছে

বহু আদিবাসী, তাদের একটা ধর্ম আছে যাকে Peterson তাঁর ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে জেলার গেজেটে 'Animism' বলেছেন যার আভিধানিক অর্থ হল The belief in a supernatural power that organises and animates material universe—বলা যায় সর্বপ্রাণবাদ। ইতিহাসের প্রাচীন যুগ বিভাগের পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রাগৈতিহাসিক যুগের অধিবাসীদের ধর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে animism-এর উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমান কালে আদিম অধিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালরাই প্রধান। এদের ধর্ম সম্বন্ধে W. W. Hunter তাঁর Annals of Rural Bengal-এ মন্তব্য করেছেন—of a supreme and beneficient God the Santal has no conception. His religion is a religion of terror and deprecation. Hunted and driven from country to country by a superior race he cannot understand how a Being can be more than himself...But although the santal has no God from whose benignity he may expect favour, there exist a multidude of demons and evil spirits, whose spite he endeavours by supplications to avert. So far from being without a religion, his roles are infinitely more numerous than those of the Hindu...

সাঁওতালদের ধর্ম আদিম ধর্ম—তাঁদের ধর্মের একদিকে আছে গৃহদেবতা (ওরাবোঙ্গা), যার অবস্থান গৃহের এক কোণে, আর আছে গ্রামদেবতা যার অধিষ্ঠান বনের বৃক্ষের মধ্যে। গৃহদেবতার অধিষ্ঠান যে ঘরে সেখানে শস্য ও অন্যান্য দ্রব্য সঞ্চয় করে রাখা হয়। একমাত্র গৃহকর্তাই গৃহদেবতার নাম ও উপাসনার মন্ত্র জানে—বাড়ীর অন্য কাকেও বলার নিয়ম নেই। এই ঘরের দরজার কাছেই দেবতার কাছে সব কিছু উৎসর্গ করা হয়। দেবতার কাছে গৃহকর্তার প্রার্থনা, কোন কিছু প্রাপ্তির আশীর্বাদ চাওয়া নয়—সবরকম বিপদ থেকে রক্ষার প্রার্থনা, ওরাবোঙ্গা ঝড়ের হাত থেকে ছোট কুঁড়েটিকে রক্ষা কর, ধানক্ষেত থেকে যেন পোকামাকড় পাশ দিয়ে চলে যায়, আমার বউ যেন মেয়ে-ছেলে প্রসব করে না, এইসব।

এদের বিশ্বাস, গ্রামের সন্নিহিত বনের বৃক্ষে বাস করে গ্রামের সবার গৃহদেবতা। বছরের মধ্যে মাঝে মাঝে ভালো কাপড়-জামা পরে ভাল করে সেজে বৃক্ষ-দেবতার কাছে গ্রামের সব মানুষ সমবেত হয়, দেবতার উদ্দেশ্যে গান করে লাল মোরগ, ছাগল বলি দেয়। তারপর তার মাংস রেঁধে সবাই একত্রে হাঁড়িয়া (মদ) খায়। এছাড়া তারা বিশ্বাস করে গ্রামদেবতা ছাড়া বনের বৃক্ষে বাস করে নানা অপদেবতা, দৈত্যদানা প্রভৃতি—নদীতে বাস করে দা-বোঙ্গা, কুয়োতে থাকে দাদ্দি বোঙ্গা, পুকুরে থাকে 'পক্‌রী বোঙ্গা', পাহাড়ে থাকে 'বুড়ু বোঙ্গা', বনে থাকে

বীর বোঙ্গা। এই সমস্ত অপদেবতা ভর করলে ডাইনী বৈদ্য বা 'জান'-এর ডাক পড়ে। সাঁওতালদের জান একরকম গুরুদেব; অপদেবতা তার উপর 'ভর' করে—তার মুখ দিয়ে এদের দুর্ভাগ্যের কথা বলে। কি ভাবে উদ্ধার পাবে তার উপায় বলে দেয়। এই জানপণ্ডিতের কাছে শুধু সাঁওতাল নয়, হিন্দুসমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর অনেকে ভূত ছাড়াবার জন্য এদের কাছে ধর্না দেয়। জানপণ্ডিতের আবার কারও সর্বনাশ করার ক্ষমতা আছে বলে এরা বিশ্বাস করে। সেকারণে জানপণ্ডিতকে খুবই সমীহ করে চলে। যদি জানপণ্ডিত কাউকে ডাইনী বলে ফতোয়া দেয়, তবে তাকে এরা খুন করতেও পিছপা হয় না। তবে আজকাল সাঁওতাল আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন হয়েছে—তাছাড়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে এসে এদের ডাইনী-সংক্রান্ত কুসংস্কার অনেক দূর হয়েছে। সরকার, আদিবাসী কল্যাণ সমিতি, উপজাতি বিভাগ ও অনেক জনকল্যাণমূলক সংস্থা নানাভাবে প্রচার চালিয়ে এদের মধ্যে কুসংস্কার দূর করার চেষ্টা করছেন—এদের মধ্যে শিক্ষার আলোক দিচ্ছেন—ফলে এরা অনেকে এম.এল.এ. হচ্ছে, সরকারী চাকরী করছে।

হিন্দুসমাজে মাতৃতান্ত্রিকতারই প্রাধান্য বেশী। শক্তিপূজা বা মাতৃতন্ত্রের আরাধনাই রাঢ় বাংলার প্রধান ধর্ম। শাক্তধর্মের মূলভাব হল পুরুষ ও প্রকৃতি, স্থিতি ও গতির মিলন—অর্ধনারীশ্বর। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এখানে শক্তিপূজার প্রাধান্য। ঋগ্বেদে দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্তে এই শক্তিপূজার উল্লেখ পাওয়া যায়। কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকের মতে অম্বিকা রুদ্রের স্ত্রী। আরণ্যকের নারায়ণ উপনিষদে আছে—

তামাগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনী,
কর্মফলেষু জুষ্টাম্
দুর্গাংদেবীং শরনমহং প্রপদ্যে
সুতরসি তরসে নমঃ

আমি সেই বিরোচনী অর্থাৎ পরমাত্মা কর্তৃক দৃষ্ট অগ্নিবর্ণা স্বীয় তাপে শত্রু দগ্ধকারিণী, কর্মফলদাত্রীর শরণগত হই। হে সুতারিনি, হে সংসার ত্রাণকারিনি দেবী, তোমাকে প্রণাম করি।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মেও শক্তিদেবীর উল্লেখ আছে। হিন্দুতন্ত্রের দশমহাবিদ্যার বর্ণনা বৌদ্ধতন্ত্রেও পাওয়া যায়। বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দিরে রক্ষিত বর্তুলাকার স্ফটিক মূর্তির মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব লক্ষিত হয়। কুব্জিকাতন্ত্রে ক্ষীরগ্রামসহ ৪২টি সিদ্ধ পীঠের উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্ধমান তথা রাঢ়ে নয়টি সিদ্ধপীঠের

উল্লেখ আছে। বিনয় ঘোষের মতে সরস্বতী ও কালী বাংলার এই জনপ্রিয় দেবীদ্বয় বৌদ্ধতন্ত্রের সৃষ্টি।

জৈন ধর্মেও শক্তিবাদ প্রবেশ করেছে—ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের মতে বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মূলত জৈন স্বস্তিকাদেবী। বিনয় ঘোষ মনে করেন কালনার অম্বিকা জৈনদেবী ছিলেন। মাতৃসাধনার পীঠস্থান এই বর্ধমান। সাধক কমলাকান্তের সাধনার ক্ষেত্র চান্না ও কোটাল-হাটে। চান্নার অধিষ্ঠাত্রী বিশালাক্ষী কমলাকান্তের প্রথম জীবনের আরাধ্যাদেবী। কোটাল-হাটের কালী, দীপান্বিতা কালী শিবের উপর দাঁড়িয়ে বিশ্বকে বরাভয় দিচ্ছেন। তিনি অশুভনাশিনী দুরিতহারিণী তাঁর 'নবজলধর কায়, কালোরূপ আঁখি জুড়ায়।'

তন্ত্রপুরাণে মা কালীর রূপভেদ দেখা যায়—কোথাও চামুণ্ডা-কঙ্কালেশ্বরী, কোথাও শ্মশানকালী, কোথাও ভদ্রকালী, কোথাও রক্ষাকালী, কোথাও আদ্যাকালী, গুহাকালী (কল্যাণেশ্বরী)। কীর্তিবাসের যোগাদ্যা বন্দনা থেকে মনে হয় দেবী আদিতে কালী ছিলেন—

দক্ষিণ হস্তে খর্পর মায়ের বাম হস্তে খাণ্ডা।
রাবণের ঘরে মাতা ছিলে উগ্রচণ্ডা ॥

মহারাজ মহতাবচাঁদ ভদ্রকালীকে অনুরূপ ভাবেই বর্ণনা করেছেন—

কৃষ্ণবর্ণা চতুর্ভুজা এ নারী কে ভয়ঙ্করী
পাষাণ ডমরুশূল কপাল করে করি।

রাজপরিবারের কুলদেবী চণ্ডীদেবীর শিলামূর্তি লক্ষ্মীনারায়ণজীর চত্বরে অধিষ্ঠিতা।

যেখানে মন্দিরে দেবী প্রতিষ্ঠিতা তা সে যে নামেই হোক সর্বমঙ্গলা, কঙ্কালেশ্বরী, চামুণ্ডা. সিদ্ধেশ্বরী, জয়দুর্গা, ভদ্রকালী, দুর্লভা-কালী-দেবী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, কল্যাণেশ্বরী, সেখানে দেবীর নিত্য পূজা হয়। দুর্গাপূজা, দীপান্বিতা, বাসন্তী প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক পূজার দিনে মহাসমারোহে মহাপূজার অনুষ্ঠান হয়। এগুলি পর্ব-বিশেষের পূজা নয়—সারা বছর ধরেই তিনি নানা স্থানে নানা নামে তাঁর মহাসমারোহে আনুষ্ঠানিক পূজা পান—মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে 'রটন্তী', বৈশাখ মাসে রক্ষাকালী, জ্যৈষ্ঠ মাসে ফলহারিণী কালিকা, অগ্রহায়ণ মাসে প্রতি রবিবার মেয়েলি ব্রত নাটাই চণ্ডী, পৌষ মাসে অমাবস্যায় পৌষকালী। চৈত্র মাসে মারিভয় নিবারণে রক্ষাকালী পূজা।

শৈবতন্ত্র : এদেশে শৈবধর্মের কবে উদ্ভব হয়েছিল সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় / চতুর্থ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত এখানে

আর্যধর্ম প্রবেশ করে নাই। তার আগে পর্যন্ত এদেশের অধিবাসীরা ছিল ব্রাত্য। সিন্ধু সভ্যতার পশু-পরিবৃত্ত যোগাসনে রত শিবমূর্তি, পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত শিবের বাহন স-ককুদ বৃষ ও পশুমূর্তির মিল থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এদেশে লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে আর্যদের দ্বারাও লিঙ্গপূজা স্বীকৃত হয়। গুপ্তযুগেও এ জেলায় পৌরাণিক শৈবধর্ম প্রসারলাভ করেছিল। গৌড়াধিপ শশাঙ্ক ছিলেন পরম শৈব। পালরাজা নারায়ণ পাল কলসপোতা গ্রামে শিবমন্দির নির্মাণ করে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কাটোয়ার সন্নিকটে প্রাপ্ত বল্লালসেনের নৈহাটি তাম্রশাসনে শিব অর্ধনারীশ্বর রূপে বন্দিত।

শিবের লিঙ্গপূজা জেলার সর্বত্র প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও মূর্তি পূজাও অপ্রচলিত নাই। (১) চন্দ্রশেখর, নটরাজ, সদাশিব, ন্যাংটেশ্বর, উমামহেশ্বর, অর্ধনারীশ্বর কল্যাণসুন্দর, (২) অঘোর ভৈরব, অঘোররুদ্র; বটুক ভৈরব, বিরূপাক্ষ, অঘোরশিব এই রূপে নানা স্থানে শিবমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে ও মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিত্যপূজার ব্যবস্থা হয়েছে। এদের মধ্যে ১নং তালিকায় লিখিত মূর্তিগুলি শিবের সৌম্য, রক্ষক ও বরাভয় দাতার মূর্তি, ২নং তালিকার মূর্তিগুলি শিবের রুদ্ররূপী মূর্তি।

বরাকর শিবমন্দির নির্মিত হয় ১৩৮২ শকে (১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে ফাল্গুন মাসে শুক্লা অষ্টমী তিথিতে)। নির্মাণ করিয়েছিলেন গোপভূমের সদ্‌গোপরাজ হরিশ্চন্দ্রের মহিষী হরিপ্রিয়া। অণ্ডাল থেকে গোপভূম পর্যন্ত গোপভূম অঞ্চলে এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শিবমন্দিরের প্রতুলতা দেখে মনে হয় সদ্‌গোপ বংশীয় রাজারা শৈবতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। জেলার প্রায় সর্বত্রই শিবমন্দিব দেখা যায়। বিভিন্ন অঞ্চলে শিব বিভিন্ন নামে পরিচিত। বর্ধমানের ঈশানেশ্বর, প্রতাপেশ্বর, বর্ধমানেশ্বর, ভুবনেশ্বর, মিত্রেশ্বর, বাণেশ্বর, রামেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর, ইন্দ্রেশ্বর; কালনায় প্রতাপেশ্বর; কাটোয়ায় বাণলিঙ্গ, বাবা বৃদ্ধশিব; ক্ষীর গ্রামে ক্ষীরেশ্বর; কড়ুই-এর বুড়োশিব; বাবলাডিহির ন্যাংটেশ্বর; জামালপুরের বুড়োরাজ, কামারপাড়ার বুড়োশিব; মোহনপুরের দুধ-কমলা; রায়নার গঙ্গাধর, লোচনেশ্বর; অণ্ডালের কালাগ্নিরুদ্র; নাড়ুগ্রামের নাড়েশ্বর; হরিবাটীর হরেশ্বর; জামুরিয়ার নীলকণ্ঠ ভৈরব। গলসীর মানিকেশ্বর, মল্লিকেশ্বর, আদরাহাটির আদারেশ্বর, খণ্ডঘোষের মৃত্যুঞ্জয়, কুড়মুনের ঈশানেশ্বর, এমনি আরও কত বিভিন্ন নাম। বর্ধমানে শিব ও ধর্মরাজ প্রায় একাকার হয়ে গেছে। জামালপুরের বুড়োশিবের 'বুড়ো' ও ধর্মরাজের 'রাজ' মিশে গিয়ে হয়েছেন বুড়োরাজ। বুড়োরাজের কাছে কাহার, কুম্ভকার, ডোম, তেলী, বাগ্‌দী, কুর্মি, কেওড়া, খয়রা,

তাঁতি-বাউড়ী সবাই পুজো দিতে পারে। শৈব-ধর্ম প্রসারে বর্ধমানরাজের পৃষ্ঠপোষকতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্মীনারায়ণজী মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে মহারাজ ত্রিলোকচাঁদ প্রতিষ্ঠিত ভুবনেশ্বর শিবলিঙ্গ মন্দিরের নিম্নভাগে ভূগর্ভে অধিষ্ঠিত। ত্রিলোকচাঁদের মহিষী-মহারাণী বিষ্ণুকুমারী বিবিনবাবহাটে ১৭৮৮ সালে ১০৯ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে কালনাতে ১০৯টি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন—শাকেচন্দ্র শিবাক্ষি সপ্তিকৃমিতে শ্রীতেজচন্দ্রাভিধে রাজা। নবাবহাট, কুড়মুন, মোহনপুর, বর্ধমান, গলসী, ভাতার, জামুরিয়া, নাড়ুগ্রাম, কাঁকশা, কড়ুই, বাবলাডিহির শিবস্থানগুলিতে শিবচতুর্দশী ও চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবের গাজন উপলক্ষে মেলা, উৎসবের মধ্য দিয়ে বর্ধমান জেলার শৈবতন্ত্রের ধারা চিরবহমান।

বৈষ্ণব সম্প্রদায় : চৈতন্যদেব আনুষ্ঠানিক বিধিবিধান বাদ দিয়ে স্ত্রী পুরুষ ও উচ্চনীচ জাতি-নির্বিশেষে সকলকে প্রেমভক্তিমূলক ধর্মে দীক্ষা দিবার প্রথা প্রচলন করেছিলেন। ফলে যে কোন জাতি এমন কি মুসলমানও বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে। জাতিভেদের ব্যবধান শিথিল হয়। স্ত্রীলোকেও হরিনাম সংকীর্তনে অংশগ্রহণ করতে থাকে—'সংকীর্তন মাঝে নাচে কুলের বৌহারি।' কিন্তু এই ধর্মবিপ্লবের ফলে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে যে একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তা এক শতাব্দীর বেশী স্থায়ী হল না। বৌদ্ধ সহজিয়া ও তান্ত্রিক দল পূর্ব থেকেই এদেশে ছিল। কেবল চৈতন্য প্রবর্তিত সাত্ত্বিক-প্রেম ও ভক্তিবাদের জোয়ারে তাদের প্রভাব কিছু কমে যায়। কিন্তু শীঘ্রই বৌদ্ধ সহজিয়াবা তান্ত্রিকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হল। এদের ধর্মাচরণের বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল পরকীয়া প্রেম, যার পরিণতি হয় পরস্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ প্রেম ও ব্যভিচার।

ঊনবিংশ শতকে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বিশুদ্ধ ভক্তিবাদের এই পরিণতি দাঁড়ায়। ক্রমে সহজিয়ারা নানা শাখায় বিভক্ত হয়, যেমন—আউল, বাউল, শাই, দরবেশ, নেড়া, সহজিয়া, কর্তাভজা, সখীভাবক, গৌড়বাদী, সাহেব ধনী, পাগল পন্থী প্রভৃতি। ঘোষপাড়া, রামকেলি, নদীয়া, কেঁদুলি, বাঁকুড়া, বর্ধমানে সহজিয়াদের অনেক কেন্দ্র আছে। তবে বর্ধমানে গৌরবাদী ও বাউলদের প্রাধান্য বেশী দেখা যায়। গৌরবাদীরা গৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ মনে করে, কারণ রাধাকৃষ্ণের মিলিত রূপ গৌরাঙ্গ বলেই তাঁদের ধারণা। এদের ধর্মের সারমর্ম—সহজ উপায় ভিন্ন ধর্মাচরণের অন্য পথ নাই। সহজপন্থা গুরুর মুখে শুনতে হয়। এই সহজপন্থার একটা প্রকৃষ্ট নির্দশন বাউল সম্প্রদায়ের পন্থা। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন এদের সাধনতত্ত্ব সম্পর্কে বলেছেন—ধর্ম সম্প্রদায়ের

প্রথাবদ্ধতা, গতানুগতিকতা ও রীতিপ্রবণতা থেকে বাউলরা মুক্ত। ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। দলবদ্ধ আচার-অনুষ্ঠানের পূজা-পদ্ধতির সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। বাউলেরা জাতি, পঙ্‌ক্তি, তীর্থ পরিক্রমা, শাস্ত্রবিধি, ভেখ-আচরণ মানেন না। মানবের মধ্যে সর্ববিশ্বচরাচর—সেখানেই সাধনা। তাঁদের সাধনার মূলতত্ত্ব হল প্রেম। 'জ্ঞানের অগম্য তুমি প্রেমের ভিখারী।' এই জীবন্ত প্রেমের সন্ধান শাস্ত্রে মেলে না—মেলে মানুষের কাছে—প্রেমে প্রাণে, রসে ভরপুর গুরুর কাছে—

ও তোর কিসের ঠাকুর ঘর?
(যারে) ফাটকে তুই রাখলি আটক
তাবে আগে খালাস কর।

শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রাধান্য বর্ধমান জেলায় দেখা যায়। বিনয় ঘোষের মতে গৌরাঙ্গ পূজার প্রবর্তন হয় শ্রীখণ্ডে ও শ্রীপাট অম্বিকা কালনায়। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ও তাঁর শিষ্য কোগ্রামের লোচনদাসের রাগাত্মিকা বা রাগানুরাগ, ভজন-পদ্ধতি, রাধা ও নাগরভাব-এর মধ্যে বাউল-বাউলীর সহজ সাধনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

নরহরি সরকারের পদে চণ্ডীদাসের প্রভাব খুব বেশী—

কিনা হৈল সই মোর কানুর পিরীতি
আঁখি ঝুরে পুলকেতে প্রাণ কাঁদে নিতি।

নরহরি সরকারের নাগরভাবে সহজ-সাধনের প্রভাব এত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ যে তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না।

আগে রাধাকৃষ্ণ রসে নির্মল পীরিতি।
শ্রীখণ্ড ভূখণ্ড মাঝে যার অবস্থিতি॥
বৃন্দাবনে মধুমতি নাম ছিল যার।
রাধাপ্রিয় সঙ্গী তিহো মধুর ভাণ্ডার।
এ যে কলিকালে গৌর-সঙ্গে নর হরি।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমের ভাণ্ডারে অধিকারী। (চৈতন্যমঙ্গল)

বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউল সম্প্রদায়ের ওপর এই কারণে মনে হয় শ্রীখণ্ডের নরহরি সবকার ঠাকুর ও তাঁর শিষ্য লোচনদাস এবং পরবর্তীরা বেশ প্রভাব বিস্তার করেন। এঁদের প্রভাবে বৈদ্যখণ্ড বা শ্রীখণ্ড বর্ধমানের বৈষ্ণবসাধনার প্রধান কেন্দ্র রূপে গড়ে ওঠে।

নরহরি সরকারের ভণিতায় সহজ সাধন ঘটিত কয়েকটি পদ পাওয়া গেছে যেমন—

সহজ সাধন কোথায় নাই
খুঁজিলে তাহারে নিকটে পাই।
মরা মানুষ হয়্যা যদি কাড়রে রা
তবে লাগিবে প্রেমের বা।
কহে নরহরি অমিঞা রাশি
সঙ্গে রহ মন সহজে পশি।

এ প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষের মন্তব্য উল্লেখের দাবী রাখে।

'বৈষ্ণব-ধর্ম প্রসারে ও বৈষ্ণব সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে বর্ধমান জেলার কাটোয়া, শ্রীখণ্ড, নৈহাটি, কোগ্রাম, দেনুড়, ঝামটপুর ও কুলীনগ্রামের অবদান অসামান্য। মালাধর বসু, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, লোচনদাস, নরহরিদাস, জ্ঞানদাস—এঁরা সব বর্ধমানের মাটিতে প্রতিষ্ঠা পান। রাঢ়ের বিষ্ণুপুর ও বর্ধমান থেকেই বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার ও প্রচার হয় বাংলাদেশে। সমাজের উঁচু স্তরেই বৈষ্ণব-ধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তলার স্তরে লোকধর্মের জোয়ার সমানভাবেই বইতে থাকে দেখা যায়।

শ্রীপাট শ্রীখণ্ড ও অম্বিকা কালনা ছাড়া জেলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তিবাদের অন্যতম পীঠস্থান মানকরের ভক্তলাল প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভ মন্দির। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-প্রণেতা গুণরাজখান মালাধর বসুর জন্মস্থান কুলীনগ্রাম বৈষ্ণব-ধর্মের আর এক পীঠস্থান—

কুলীন গ্রামের কথা কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেও কৃষ্ণনাম গায়।

বাঘনাপাড়া রাঢ়ে গোস্বামীদের পীঠস্থান। শ্রীচৈতন্যের পার্শ্বচর বংশীবদন গোস্বামী চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারে বাঘনাপাড়ায় এসে মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন ও অনেককে বৈষ্ণব-ধর্মে দীক্ষা দেন। বংশীবদনের পুত্র চৈতন্য দাশ ও তাঁর পুত্র রামাই-এর সময় বাঘনাপাড়ার প্রতিপত্তি অনেক ছড়িয়ে পড়ে। বর্ধমানে মিঠাপুকুরে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যমঠে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের আখড়া গড়ে উঠেছে। বর্তমান অধ্যক্ষ ভক্তিজীবন আচার্য মহারাজ।

গুরুবাদ : সহজিয়া বাউলদের গুরুবাদ থেকে সম্ভবত দেশের সর্বত্র এবং সেই সঙ্গে এ জেলাতেও সরাসরি ঈশ্বর আরাধনার পথ পরিত্যাগ করে গুরুর মাধ্যমে পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার, ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের, যোগসাধনের তত্ত্ব প্রসার লাভ করেছে। পরিবর্তনশীল জগতে এই জীবন ও জগতের অন্তরালে এক

অপরিবর্তনীয় সত্তার অবিনশ্বর অস্তিত্ব—ভারতীয় সংস্কৃতির বার্তা। সেই সত্তাকেই বলা হয় পরম আত্মা বা ব্রহ্ম। একমাত্র তাঁকে পেলেই মানুষ মৃত্যুকেই অতিক্রম করে অমৃতের সন্ধান পায়। মৃত্যোঃ মা অমৃতং গময়। অজ্ঞানের মোহে সেই আত্মার স্বরূপ উপলব্ধ হয় না বলেই জগতে এত দুঃখ। সে অজ্ঞানের মোহকে দূর করার জন্য চাই গুরুর উপদেশ।

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া
চক্ষুরুন্মিলিতৈঃ যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।

গুরুর উপদেশ ব্যতীত আত্মার স্বরূপ উপলব্ধ হয় না। গুরুর উপদেশ ছাড়া আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি হয় না (যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ)। এই ভাবে জন্ম নিল গুরুবাদ। কিন্তু গুরু কে? যঃ শিষ্যং গারয়তে তথা বিজ্ঞাপয়তি স গুরুঃ। যিনি শিষ্যের নিকট আত্মতত্ত্ব বলেন তিনিই গুরু। কেবলমাত্র শাশ্বত ভারতের আগমে নিগমে ও সাধনায় এই গুরু উপাসনার কথা রয়েছে তা নয়, রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান ধর্মের মধ্যে এরকম গুরুপূজা ও আত্মসমর্পণের ধারা ছিল। খ্রীষ্টধর্মে এই আত্মাকে বলা হতো The Elder—গরীয়ান An Elder was one who took your soul, your will in His soul and will, শিখ-সমাজেও গুরুবাদের সূচনা করেন গুরু নানক। মুসলমান সমাজেও গুরুর স্থান কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের যুগে একদিকে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের প্রকট হিন্দুবিদ্বেষ, ভারতীয় ধর্ম ও সমাজ জীবনে বিদ্বেষ সৃষ্টি করলো। অন্যদিকে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের কুসংস্কার ও কুপ্রথা দূর করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এই কুপ্রথা দূর না করলে হিন্দুসমাজের অস্তিত্বই বিপন্ন হতো।

হিন্দুসমাজকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ। রামমোহন ধর্মীয় সংস্কার ও মূর্তি পূজার পরিবর্তে বেদান্তের ওপর ভিত্তি করে একেশ্বরবাদী ধর্মের পুনরুজ্জীবন সাধন করতে এগিয়ে এলেন। পৌত্তলিক হিন্দুধর্মকে সংস্কার করে উপনিষদকে ভিত্তি করে রামমোহন ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ নামে একেশ্বরবাদী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন। উপনিষদকে ভিত্তি করে 'সংস্কৃত' হিন্দুধর্মই হল ব্রাহ্মধর্ম—মূল মন্ত্র নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা—সর্বম্ খল্বিদম্ ব্রহ্ম। দলে দলে দেশের শিক্ষিত প্রগতিবাদী মানুষ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হতে লাগল। দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্বগত পরিবর্তন সাধন করে ব্রাহ্মধর্মকে শাস্ত্রের ওপর ভিত্তি না করে উপাসনা ও হৃদয়ের উদারতার ওপর প্রতিষ্ঠিত করলেন।

বর্ধমানেও এই ব্রাহ্ম আন্দোলনের ঢেউ এল। রামমোহনের সঙ্গে বর্ধমান রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকলেও তখন তিনি ব্রাহ্মধর্ম উদ্ভাবন করেন নাই। রামমোহনের বাবা বিষ্ণুকুমারীর খাস দেওয়ান ছিলেন। জাল প্রতাপ মামলায় প্রতাপের বিধবাদের পক্ষে বড় খুঁটি ছিলেন রামমোহন। কিন্তু তাঁর দ্বারা বর্ধমানরাজ ব্রাহ্মধর্মের সংস্পর্শে আসেন নাই।

বর্ধমানে ব্রাহ্মধর্মের প্রসার ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। বর্ধমানরাজ মহতাবচাঁদের সঙ্গে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। ঐ বৎসর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ মহারাজের অতিথি হয়ে বর্ধমানে আসেন। মহারাজের রাজবাড়ীর অতিথিশালা উইলবাড়ীতে তাঁর অবস্থানের ব্যবস্থা হয়। মহারাজ মহর্ষির আপ্যায়নের কোন ত্রুটি হতে দেন নাই। সেই বছরই বর্ধমানে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। ঐ বছরেই ব্রাহ্ম নেতৃবৃন্দ বর্ধমানে প্রথম ব্রাহ্ম বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কথিত আছে ব্রাহ্মনেতা ভগবানচন্দ্র বসু সেই সময় সরকারী উচ্চপদে বর্ধমানে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁর পুত্র জগদীশচন্দ্র সেই সময় ব্রাহ্মসমাজ বালক বিদ্যালয়ে পাঠ শুরু করেন। কিন্তু ক্যালেন্ডারের কোথাও ব্রাহ্মসমাজ বয়েজ বালক বিদ্যালয়ের নাম নাই বা জগদীশচন্দ্রের ভর্তিরও কোন রেকর্ড পাওয়া যাচ্ছে না। মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের প্রবীন শিক্ষক পাঁচুগোপাল রায়ের কাছে এ-তথ্য পাওয়া গেছে। কারণ তাঁর মতে ব্রাহ্ম বয়েজ হাইস্কুল ১৮৫৫ থেকে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলেছিল, তবে ব্রাহ্মসমাজের ছেলেরা বরাবরই পরীক্ষা দিয়েছিল বর্ধমান ইংলিশ স্কুল এই নামের ছাত্র হিসাবে। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজ বালক বিদ্যালয় মিউনিসিপ্যাল স্কুলে পরিণতি লাভ করে।

যাই হোক, মহর্ষির সংস্পর্শে এসে মহারাজ মহতাবচাঁদ একসময় ব্রাহ্ম-ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। রমনার বাগানে ব্রাহ্ম-আশ্রম স্থাপনের পরিকল্পনাও ছিল তাঁরই। মহর্ষিও মধ্যে মধ্যে বর্ধমানে এসে রমনার বাগানে উপাসনা করতেন। বিনয় ঘোষ মহাশয়ের 'সাময়িক পত্রে সমাজ চিত্র (১৮৪০-১৯০৫) প্রথম খণ্ড' সংবাদ প্রভাকর-এর ২৪শে আষাঢ় ১২৪৮ (জুলাই ১৮৫১) তারিখের এক সংবাদে জানা যায় 'বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আপনার কন্যা ও ভ্রাতৃকন্যাকে বেথুন সাহেবের বিদ্যালয়ে পাঠাইবার সিদ্ধান্ত করায় আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে। বর্ধমানের মহারাজা ঐ বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই সংবাদ থেকেও বর্ধমান-রাজের ব্রাহ্মসমাজ ও ইংরাজী শিক্ষার প্রতি আনুগত্যের কথা সমর্থিত হয়। ব্রাহ্ম-আশ্রমের এক স্তম্ভলিপি থেকে জানা

যায় ১৩২২ সালে আশ্রমটির সংস্কার সাধন করে নব কলেবর দান করা হয়। সে সময় বর্ধমানে কতজন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। আমার এক সহকর্মী হর্ষ বোসের কাছে শুনেছি ওঁদের বংশের পূর্বপুরুষরা ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। অবশ্য রাজপরিবারের ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকর্ষণ বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। তাছাড়া রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মদের ওপর নানারকম অত্যাচার ও উৎপীড়ন আরম্ভ করেছিল। এ তথ্য জানা যায় শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনা সংগ্রহ ২য় খণ্ড থেকে। সংবাদ প্রভাকরের ১২৫৭ সালের ১৫ই বৈশাখের সংবাদে জানা যায় কৃষ্ণনগর কলেজের জুনিয়ার ডিপার্টমেন্টের প্রধান শিক্ষক বাবু রামতনু লাহিড়ী মহাশয় বর্ধমান স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হয়ে বর্ধমানে আসেন। বর্ধমানের সরকারী বিদ্যালয় ছিল তখন বার্ডোয়ান স্কুল। শিবনাথ শাস্ত্রী মশাই লিখছেন—'১৮৫১ সালের এপ্রিল মাসে লাহিড়ী মহাশয় বর্ধমানে গেলেন বটে, কিন্তু সেখানেও বহুদিন সুস্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর উপবীত পরিত্যাগের গোলযোগ উপস্থিত হইল। ...হিন্দুসমাজের লোক দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার ধোপা নাপিত বন্ধ করিল। দাসদাসীগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র নবকুমার তখন শিশু, পূর্বে চৈত্র মাসে কলিকাতা শহরে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। এই শিশুপুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংসারের সমুদয় কার্যনির্বাহের ভার তাঁহার বালিকাবধূর উপর পড়িয়া গেল। যিনি অপরের ক্লেশ সহ্য করিতে পারিতেন না, সেই লাহিড়ী মহাশয় যে স্বীয় পত্নীর ক্লেশ দেখিয়া অস্থির হইয়া উঠিবেন, তাহাতে আশ্চর্য কি? তিনি জল বহা, কাষ্ঠ কাটা, বাজার করা প্রভৃতি ভৃত্যের সমুদয় কার্য নিজেই নির্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু লোকের নির্যাতনের সমুদয় ভাব বিশেষভাবে তাঁর পত্নীব উপর পড়িত। পাড়ার অজ্ঞ স্ত্রীলোকদিগের অবজ্ঞাসূচক বাক্যে ও আত্মীয়স্বজনের আর্তনাদে তিনি অস্থির হইয়া উঠিতেন। তাঁর মনস্তাপ দেখিয়া লাহিড়ী মহাশয় ক্ষুব্ধ চিত্তে বাস করিতে লাগিলেন।

"বর্ধমানের আন্দোলন বশতঃই হউক অথবা শিক্ষাবিভাগের বন্দোবস্ত বশতঃই হউক এক বৎসরের অধিককাল তিনি বর্ধমানে থাকেন না। ১৮৫২ সালে তিনি উত্তরপাড়ার ইংরাজী স্কুলের হেডমাস্টার হইয়া আসিলেন।" রক্ষণশীল হিন্দুদের এরূপ অত্যাচারে ব্রাহ্ম আন্দোলন বর্ধমানে বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই।

রামকৃষ্ণ মিশন : উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যখন চিন্তাজগতে অতি আধুনিক প্রবণতা ও হিন্দুধর্মের প্রতি অবিশ্বাস চরম সীমায় ওঠে, সেই সময় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব। রামকৃষ্ণদেব হিন্দুধর্মকে বাহ্যিক আচার-

অনুষ্ঠানের সীমারেখার বাইরে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হন। মানবতার প্রতি সর্বজনীন আবেদনই ছিল তাঁর ধর্মমতের মূল কথা। 'যত মত তত পথ' ছিল তাঁর ধর্মমতের বাণী। রামকৃষ্ণদেব কামারপুকুর থেকে গরুর গাড়ী করে বর্ধমানে আসতেন ও এখান থেকে কলকাতা যেতেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের কয়েক মাসের মধ্যেই হাওড়া থেকে হুগলী রেললাইন সম্প্রসারিত হয়। রামকৃষ্ণের জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত 'ধর্মপ্রচারক' নামক একটি পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে জানা যায় রামকৃষ্ণদেব মধ্যে মধ্যে স্বেচ্ছাক্রমে বর্ধমানের রাজবাটীতে আসিতেন।' ১৩৫৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যার ভারতবর্ষ পত্রিকায় ''শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন'' শীর্ষক প্রবন্ধে নরেন্দ্রনাথ বসু বর্ধমান-রাজ মহতাবের সময় প্রায়শই রাজবাড়ীতে আসার কথা উল্লেখ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি থেকে জানা যায় যে, রামকৃষ্ণ হৃদয়রামকে সঙ্গে নিয়ে কামারপুকুর থেকে দক্ষিণেশ্বরে ফেরার পথে বর্ধমানে এসে শ্যামসায়রের পাড়ে মহারাজ তেজচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত অতিথি নিবাসে অবস্থান করেছিলেন। এই অতিথি নিবাসের কাছে ছিল শিবের প্রিয় কাঁটাবন। কাঁটাবন থেকে কাঁটা নিয়ে তিনি ঈশানেশ্বরের পূজা করেন—

কি এক কন্টক তার নাম নাহি জানি।
পূজিলে তাহায় বড় তুষ্ট শূলপাণি॥

কণ্টক লইয়া মত্ত হইল পূজায়।
আবেশে মহেশ পদে কণ্টক প্রদান॥

(রামকৃষ্ণ পুঁথি)

এই অতিথি নিবাসেই স্থাপিত হয়েছে বর্ধমান রামকৃষ্ণ মিশন। এই মিশন বেলুড় মঠের অনুমোদিত। তবে এখানে দীক্ষা দেওয়া হয় না। বেলুড় থেকে দীক্ষা দেবার ভারপ্রাপ্ত কোন মহারাজ এখানে এলে তিনি দীক্ষা দেন; অন্যথা দীক্ষা গ্রহণেচ্ছু ভক্তকে বেলুড়ে গিয়ে দীক্ষা নিতে হয়। বর্ধমান জেলায় রামকৃষ্ণ মঠের বহু শিষ্য রামকৃষ্ণ আদর্শে অনুপ্রাণিত।

সোহং ধর্ম : এই ধর্ম প্রচার করেন সুবিখ্যাত সিদ্ধযোগী তিব্বতী বাবা। বর্ধমানে ছিলেন তাঁর শিষ্য নিরালম্বস্বামী। নিরালম্বস্বামীর সন্ন্যাসপূর্ব নাম যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩০)। যতীন্দ্রনাথের জন্ম বর্ধমান জেলার চান্না গ্রামে। কলেজে পড়ার সময় তিনি যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার আগ্রহে গৃহত্যাগ করেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শে সামরিক বিদ্যা অর্জন করতে

তিনি বরোদা যান ও সেখানে শ্রী অরবিন্দের সংস্পর্শে আসেন। পরে পাঞ্জাবে যান। এখানে সিদ্ধযোগী সোহংস্বামী ভগবান্ তিব্বতী বাবার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় গড়ে ওঠে ও তাঁর কাছে তিনি সোহং মন্ত্রে দীক্ষা নেন ও নিরালম্বস্বামী নামে পরিচিত হন। এর পর তিনি স্বগ্রাম চান্নায় ফিরে আসেন। তাঁর কাছে অনেকে মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন,—এদের মধ্যে বনপাস কামারপাড়ার কিঙ্করচন্দ্র দাস, শশিভূষণ দাস, হরেরাম দাস, ত্রিভঙ্গ রায়, অহিভূষণ সাহার কথা জানা যায়। এঁরা সোহং মন্ত্রে দীক্ষা নেওয়ার জন্য সমাজে ব্রাত্য বলে গণ্য হন। দীর্ঘদিন কোন ব্রাহ্মণ এঁদের বাড়ীতে জলগ্রহণ করে নাই। কিঙ্করচন্দ্র দাস সোহং মন্ত্রে দীক্ষিত হলেও তাঁদের বাড়ীতে ধূমধাম করে শিবদুর্গা, লক্ষ্মীপূজা ও কার্তিকপূজা হতো—লক্ষ্মীপূজা ও কার্তিকপূজায় বহু দরিদ্রনারায়ণ ভোজন করান হতো। সোহং ধর্মের মূল মন্ত্র ছিল—'সঃ অহম্' অর্থাৎ আমিই সেই; উপাস্য ও উপাসকের একাত্মতাই এঁদের মন্ত্রের প্রতিবাদ্য। এঁরা মূর্তি পূজায় বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু যাদের বংশে পুরুষানুক্রমে মূর্তি পূজা বা নারায়ণের নিত্যপূজার প্রচলন ছিল—তাঁরা সেটি বন্ধ করেন নাই।

তিব্বতী বাবা : পরম সিদ্ধযোগী ভগবান্ তিব্বতী বাবা পরিব্রাজক ও সন্ন্যাসী। তিব্বত, পাঞ্জাব পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র তিব্বতী বাবার ছিল যাতায়াত। হিমালয়ের গুহায় তিনি সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন—উপাস্য ও উপাসকের একাত্মতা উপলব্ধি করেন এবং শিষ্যদের এই মন্ত্রে দীক্ষা দেন। সোহং ধর্মমতাবলম্বীগণ মূর্তি পূজায় বিশ্বাস করতেন না। পাঞ্জাবে তিব্বতী বাবার কাছে বিপ্লবী যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সোহং মন্ত্রে দীক্ষিত হন ও তাঁর নাম হয় নিরালম্বস্বামী। তিব্বতী বাবার অনেক অলৌকিক কাজকর্ম ভক্তদের মুগ্ধ করত।

তিনি প্রায় ১৫০ বৎসর বেঁচে ছিলেন। তিনি অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির ঔষধ জানতেন ও ভক্তদের অসুখ বিসুখ হলে তাঁর ঔষধ দিয়ে নিরাময় করতেন। বর্ধমান থেকে মাইল ৩/৪ দূরে পালিতপুরে তিব্বতী বাবার মঠ স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে মঠটি বেদখল হয়ে গেছে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ : প্রণবানন্দ স্বামী প্রতিষ্ঠিত আশ্রম। প্রণবানন্দের সন্ন্যাসপূর্ব নাম ছিল বিনোদ ভুঁইঞা (১৮৯৩-১৯৪১)! এঁর জন্ম ফরিদপুর জেলার বাজিতপুর গ্রামে—১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী। তিনি অল্প বয়সে গৃহ ত্যাগ করে কাশী যান ও কঠোর তপস্যার পর সিদ্ধিলাভ করেন। এরপর তিনি স্বগ্রামে ফিরে এসে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে মাঘী পূর্ণিমার দিন সেখানে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রয়াগে কুম্ভমেলায় যান পুণ্যার্থীর সেবায় ও

সেখানে শ্রীমৎ স্বামী গোবিন্দলাল গিরির কাছে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা নেন—তাঁর নাম হয় স্বামী প্রণবানন্দ। সেখানে থেকে ফিরে এসে স্বগ্রামে প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের নাম দেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ২১১নং রাসবিহারী এ্যাভেনিউ-তে সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সঙ্ঘের কাজ প্রসারিত হয়েছে। বর্ধমানে সর্বমঙ্গলা মন্দিরের পূর্বে উইলবাড়ীর সন্নিহিত হিন্দু মিলন মন্দির ভারত সেবাশ্রম অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া ছোট নীলপুরে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শাখা কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত। সঙ্ঘের বর্তমান অধ্যক্ষ প্রদীপ মহারাজ। আসানসোল বার্ণপুর প্রভৃতি স্থানেও ভারত সেবা সঙ্ঘ অনুমোদিত হিন্দু মিলন মন্দির সঙ্ঘের আদর্শ অনুযায়ী সঙ্ঘের সেবামূলক কার্যে নিয়োজিত। সঙ্ঘের আদর্শ মানবসেবা ও ধর্মীয় মানসিকতার পুনরুজ্জীবনের আদর্শ প্রচার। বন্যা, ভূমিকম্প সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিধ্বস্ত আর্ত মানুষের সেবাই সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের ব্রত। প্রধান কার্যালয় থেকে বিভিন্ন শাখায় চারণদল প্রেরিত হয় সঙ্ঘের সেবাকার্যের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। তাছাড়া সঙ্ঘের প্রধান প্রধান উৎসবে প্রধান কার্যালয় থেকে সন্ন্যাসীগণ শাখা অফিসে আসেন। তাঁদের যিনি নেতৃত্ব দেন এবং তিনি শাখা অফিসে ভক্তদের দীক্ষা দেন কিংবা দীক্ষা গ্রহণেচ্ছুকে প্রধান কার্যালয় থেকে দীক্ষা নিতে হয়। জেলায় সঙ্ঘের দীক্ষিত বহু ভক্ত আছেন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ও রামকৃষ্ণ মিশন উভয় প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়। উভয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় স্কুল, কলেজ, পলিটেকনিক, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাকেন্দ্র, নিজস্ব চিকিৎসালয়, এ্যামবুলেন্স ও ত্রাণ সমস্ত কিছুর পরিষেবার এক আদর্শ প্রতিষ্ঠান।

সীতারাম দাস ওঁকারনাথ (১৮৯১-১৯৮২) : হুগলী জেলায় ডুমুরদহে জন্ম। সন্ন্যাস পূর্বনাম প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়। দীর্ঘ সাধনার পর উচ্চমার্গের সাধক রূপে স্বীকৃতি পান। সংসারের মধ্যে থেকেও তিনি সাধক সন্ন্যাসীর মত জীবনযাপন করেছেন। তিনি শাস্ত্রসমূহকে ঈশ্বরের বাঙ্ময় রূপ বলে মনে করতেন। নামে, প্রেমে, গানে, ভক্তিতেই জীবের মুক্তি—এই ছিল তাঁর ধর্ম প্রচারের মূলমন্ত্র। বরাহনগরের মহানির্বাণ মঠ তাঁর প্রতিষ্ঠিত, ডুমুরদহেও আশ্রম আছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনেক মঠ ও আশ্রম গড়ে উঠেছে এবং সীতারাম দাস প্রবর্তিত রামনামের মাহাত্ম্য প্রচার করে যাচ্ছে—

শ্রীরাম শরণং সমস্তজগতাং রামং বিনা কা গতী
রামেন প্রতিহন্যতে কলিমলং রামায় কার্য্যং নমঃ।

সীতারাম দাস ওঁকারনাথের মতে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রবিহিত স্মৃতিশাস্ত্রসম্মত ধর্মীয় সংস্কারপালন শিষ্যদের অবশ্য পালনীয়। শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয় কলিকাতা থেকে মঠের মুখপত্র আর্য্যশাস্ত্র প্রকাশিত হয়। বর্ধমানের অধ্যাপক সদানন্দ চক্রবর্তী ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত Mother পত্রিকা প্রকাশিত হতো। শ্রীশ্রী সীতারামদাস প্রবর্তিত হিন্দুশাস্ত্রের বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি, পুরাণ-রামায়ণ ধর্মশাস্ত্রের বাংলা অনুবাদসহ মূল শ্লোক নিয়মিত প্রকাশিত হয়। লোকশিক্ষা ও প্রাচীন হিন্দু-ধর্মের ঐতিহ্য জাগরণের ক্ষেত্রে আর্য্যশাস্ত্রের অবদান অনস্বীকার্য। বহু পণ্ডিত ও উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি ওঁকারনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত অধ্যাপক সদানন্দ চক্রবর্তী (কিঙ্কর ভূমানন্দ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক ডঃ মহাদেব অধিকারী, বর্ধমানের প্রসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী তারাপদ রায় ও শহর, গ্রামগঞ্জের বহু মানুষ ওঁকারনাথের মন্ত্রে দীক্ষিত। আসানসোল বি. বি. কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সত্যকালী মুখোপাধ্যায় নিজ গ্রাম পানাগড়ের নিকট সোমগ্রামে তাঁর নিজ পাকা বাড়ী পুকুর, বাগান ও ৮০ বিঘা জমি ওঁকারনাথকে প্রণামীস্বরূপ দান করেন। সেখানে সোমেশ্বর মঠ গড়ে উঠেছে ও অখণ্ড তারকব্রহ্ম নাম ১৯৬৯ সাল থেকে চলছে।

সৎসঙ্গ আশ্রম : অনুকূল ঠাকুর (১৮৮৮-১৯৬৯) প্রতিষ্ঠিত। শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুরের জন্ম পাবনা জেলায় হিমায়েতপুর গ্রামে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর। ন্যাশন্যাল মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাশ করে গ্রামে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ক্রমে শ্রীশ্রী ঠাকুরের অধ্যাত্ম চেতনার উন্মেষ হয়। পাবনা শহরের উপকণ্ঠে হিমায়েতপুরে সৎসঙ্গ নামক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। দেশ বিভাগের প্রাক্কালে সৎসঙ্গ দেওঘরে স্থানান্তরিত হয়। সৎজীবন, নিরামিষ আহার, পরোপকার ও সংযমী সাংসারিক জীবনযাপনই ঠাকুরের ধর্মপ্রচারের মূলকথা। সৎসঙ্গ কেবলমাত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়—জনশিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য পরিষেবা ও জনকল্যাণই সৎসঙ্গের আদর্শ। শ্রীশ্রী ঠাকুরের দেহান্তের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র 'বড়দা' সঙ্ঘ পরিচালনার দায়িত্বে আছেন। বর্ধমানে বড়নীলপুরে সৎসঙ্গের শাখা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সঙ্ঘ থেকে সকাল সন্ধ্যায় প্রতিদিন ঠাকুরের নামগান প্রচারিত হয়—বড় বড় উৎসবে দরিদ্রনারায়ণ ভোজন করান হয়। বড়দার বর্ধমানে আগমন হলে শহরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাসহ নাম সংকীর্তন বের করা হয়। জেলার সর্বত্র ঠাকুরের বহু শিষ্য আছেন।

সন্তানদল : সাধক বালক ব্রহ্মচারীর আদর্শে গঠিত হয়েছে সন্তানদল। বালক ব্রহ্মচারীর সন্ন্যাসপূর্ব নাম বীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী। জন্ম—ঢাকা-বিক্রমপুরের মেদিনীমণ্ডল গ্রামে। শিশুকাল থেকেই তাঁর আচরণে নানা অলৌকিক ভাবের প্রকাশ পায়। দেশ বিভাগের পর তিনি ভারতে চলে আসেন ও সুখচরে তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ভাবাদর্শে সন্তানদল গঠিত হয়। তাঁর প্রচারিত ধর্মের মূলকথা বৈদিক সাম্যবাদের আদর্শ—তাঁর মন্ত্র 'রামনারায়ণ রাম'। দেশে বিদেশে তাঁর বহু শিষ্য সেবক গড়ে উঠেছে। বর্ধমানেও তাঁর আশ্রম আছে, এখানেও তাঁর বহু শিষ্য আছেন।

ওঁ ক্লীং সম্প্রদায় : বর্ধমান সদর ঘাট রোডের ধারে বাক্‌সিদ্ধ অভয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত ওঁ ক্লীং কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত। পূর্বাশ্রমে তিনি ছিলেন নাড়ুগ্রাম নিবাসী। নিকটবর্তী জুবিলা গ্রামে মাটির নীচে বসে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। ত্রিবেণী এবং নাড়ুগ্রামেও তাঁর আশ্রম আছে। তিনি মৌনীবাবা নামেও পরিচিত। তিনি তাঁর শিষ্যদের 'ওঁক্লীং' মন্ত্রে দীক্ষা দিতেন। তাঁর দেহান্তের পর ভক্তানন্দ গিরি আশ্রমের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। বর্তমানে কিছু চিকিৎসক, ঔষধ ব্যবসায়ী, শিক্ষকসহ বহু ব্যক্তি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। প্রধান উৎসব ও কালীপূজা উপলক্ষে বহু দরিদ্রনারায়ণের সেবা নেওয়া হয়।

জ্ঞানানন্দ সেবাসঙ্ঘ : শ্রীশ্রী পরমহংস জ্ঞানানন্দ প্রতিষ্ঠিত আশ্রম। জ্ঞানানন্দ স্বামীর সন্ন্যাসপূর্ব নাম প্রবোধচন্দ্র ভট্টাচার্য, পিতা রজনীকান্ত ও মাতা চন্দ্রভামিনী। জন্ম ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরের অন্তর্গত মণিরামপুরের ঘটকপাড়ায় ১২৯৭ সালের ২৭শে শ্রাবণ শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে। ৩০ বৎসর কাল সংসারধর্ম পালন করার পর তিনি সংসার ত্যাগ করেন ও কাশীতে তান্ত্রিক সাধক কালিকানন্দ পরমহংসের কাছে দীক্ষা লাভ করেন। কথিত আছে জগৎগুরু শঙ্করাচার্য সূক্ষ্মদেহে দেখা দিয়ে প্রবোধচন্দ্রকে জ্ঞানানন্দ নামে অভিহিত করেন। ১৩৮২ সালের ৩১শে আষাঢ় আকস্মিক মোটর দুর্ঘটনায় তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে। তাঁর ধর্মপ্রচারের মূল কথা—যখন জীব গণ্ডীর বাইরে আসে তখন সে মনুষ্যমাত্রকেই এক মহা মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত মনে করে—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম জ্ঞানে সকলের সেবা করে—ইহাই প্রকৃত সেবাধর্ম। কর্মের দ্বারাই কর্মের খণ্ডন হয়। কলকাতায় ৫১নং মধু রায় লেনে প্রধান কার্যালয়। বোলপুর, লাভপুর, কাঁচড়াপাড়ার সন্নিকটে কাঁপা, ঈশ্বরীগাছা, কৃষ্ণনগর ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঠাকুরের আশ্রম আছে। কাঁপা আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য ও উত্তরসূরী স্বামী আত্মানন্দ

সরস্বতী। প্রধান প্রধান উৎসবে বিশেষ করে ঠাকুরের জন্মতিথিতে বহু দরিদ্রনারায়ণ ভোজন ও বস্ত্র বিতরণ করা হয়। কাঁপায় একটি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকেন্দ্র ও সল্টলেকে ঠাকুরের নামাঙ্কিত হাসপাতাল গড়ে উঠেছে। বর্ধমান জেলায় তাঁর বহু শিষ্য-সেবক আছেন।

এছাড়া জেলার বহু ব্যক্তি হরিদ্বারের ভোলানন্দ গিরি, ২৪ পরগনার আচার্য দুর্গাপ্রসন্ন, স্বামী স্বরূপানন্দ প্রমুখ গুরুর নিকট গুরুমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছেন।

আরও হয়ত অনেক গুরুই আছেন—সকলের তথ্য দেওয়া সম্ভব হল না। সূচনায় আউল-বাউলদের কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম—তাঁদের কথায় গুরুপ্রসঙ্গের সমাপ্তি ঘটাই—

অধিক গুরু পথিক গুরু গুরু অগণন্
গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন॥

সাত অধ্যায়

লোকসংস্কৃতির বিচিত্র ধারা

জেলার অধিবাসীদের সমাজ ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান অঙ্গ পালাপার্বণ, পূজা, ব্রত, উৎসব—১২ মাসে তেরো কেন, বোধহয় একশো তেরো পার্বণ।

উৎসব-পার্বণের সূচনা ১লা বোশেখ হালখাতার মধ্য দিয়ে আর শেষ চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজন ও চড়কের মধ্য দিয়ে। মাঝখানে আছে রক্ষাকালী, গন্ধেশ্বরী, ফলহারিণী কালিকা, গঙ্গা, মনসা, রথযাত্রা, ব্রাহ্মণী, বিশালাক্ষি, জগৎগৌরী, অষ্টনাগ, ভাদ্রলক্ষ্মী, বিশ্বকর্মা, দুর্গা-লক্ষ্মী, শ্যামা, দীপাবলী, জগদ্ধাত্রী, ইতু, নবান্ন, পৌষপার্বণ, শীতলা, দোল, অন্নপূর্ণা, বাসন্তী, রামনবমী আরো কত লৌকিক, অলৌকিক পূজাপার্বণ তার ইয়ত্তা নাই। ষষ্ঠী পূজাই আছে সাত রকমের :– জ্যৈষ্ঠ মাসে অরণ্য ষষ্ঠী, শ্রাবণে লুণ্ঠন ষষ্ঠী, ভাদ্রে চর্পটা ষষ্ঠী, ঘেঁটু ষষ্ঠী, আশ্বিনে দুর্গা ষষ্ঠী, অঘ্রানে গুহ্য ষষ্ঠী, মাঘে শীতলা, চৈত্রে অশোক ষষ্ঠী। কত রকমের অষ্টমী—জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, জিতাষ্টমী, বীরাষ্টমী, ভীষ্মাষ্টমী। চতুর্দশীও চার রকম—সাবিত্রী, চম্পক, অনন্ত ও শিব চতুর্দশী।

মেয়েদের ব্রতই কি কম! পুণ্যি পুকুর, দশ পুতুল, গোকাল, অক্ষয় তৃতীয়া, ঘেঁটু ষষ্ঠী, শিবরাত্রি, অশোক ষষ্ঠী, নীল—এই রকম কম করে ১১২ রকম ব্রতের হদিশ পেয়েছি। এছাড়া বারমেসে মঙ্গলবার, সোমবার যথাক্রমে শক্তি ও শিবের পুজো, প্রতি বৃহস্পতিবারে বারমেসে লক্ষ্মীব্রত, শনিবারে গ্রহরাজ, আবার নতুন সংযোজন হয়েছে শুক্রবারে সন্তোষীমা। গ্রামে-গঞ্জে, বৃক্ষতলে, মন্দিরে, গৃহ-প্রাঙ্গণে অসংখ্য লৌকিক দেবদেবী। অট্টহাস, কালীবুড়ী চণ্ডী, পলাশচণ্ডী, ভাতারচণ্ডী, কলাইচণ্ডী, ঢেলাইচণ্ডী, নাটাইচণ্ডী, উড়নচণ্ডী, এলাইচণ্ডী, ঘাগরাচণ্ডী, রূপাইচণ্ডী, খাড়াচণ্ডী, শাঁকাইচণ্ডী, কুলাইচণ্ডী, বসনচণ্ডী, ওলাইচণ্ডী, ঝাঁকলাইচণ্ডী, পোড়ামা, ওলাবিবি, ধর্মরাজ, মনসা, জয়চণ্ডী, তারাখ্যা, দিদি

ঠাকরুন, বুড়োরাজ, বুড়োশিব, রক্ষাকালী, শাকম্ভরী, রুক্মিণী, শুভচণ্ডী, সিদ্ধেশ্বরী, সর্বমঙ্গলা, কঙ্কালেশ্বরী আরও কত আছে ইয়ত্তা নাই। এই সমস্ত দেব-দেবীর পূজা-পার্বণ, উৎসব, ব্রতকথার, পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রকাশিত না হলে একটা জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এছাড়া আছে প্রায় সারা বছর ব্যাপী নানা জায়গায় নানা উপলক্ষে মেলা। ডঃ অশোক মিত্র মহাশয় তাঁর সম্পাদিত 'পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা (৫ম খণ্ড)' গ্রন্থে বর্ধমান জেলায় ৩৬৪টি মেলার হদিস দিয়েছেন। ডঃ গোপীকান্ত কোঙার তাঁর "বর্ধমান জেলার মেলা—সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা" নামক গবেষণাগ্রন্থে জেলার মোট ৪৬২টি মেলার উল্লেখ করেছেন। কাজেই জেলার বারো মাসের হাজার পূজাপার্বণ ও ব্রতকথা, মেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখলে একটা বিরাট অভিধান হয়ে যাবে। 'বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি'-র সীমিত ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব নয়, কাম্যও নয়। তবু যতটা সম্ভব উল্লেখযোগ্য ব্রত-পার্বণ দেব-দেবী ও মেলার উল্লেখ না করলে জাতির ইতিহাসের অঙ্গহানি হবে। কারণ ইতিহাস দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার তুলনায় কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় রাজা, মহারাজা, নবাব, সুবাদার, শাসক সম্প্রদায়ের আচার, আচরণ, ধর্মকর্ম, যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিলাসবৈভবের বিবরণ নয়। অতুলচন্দ্র গুপ্ত ইতিহাস চিন্তার যে তাত্ত্বিক বিচার করেছেন, তাতে মনে হয় 'সত্য গল্প' ও ইতিহাসের দ্বন্দ্ব পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু গৌতম ভদ্রের মতে 'ইতিহাস এ সব মনোরঞ্জকদের দলে নয়। তার লক্ষ্য উঁচু।... ইতিহাসের মূল লক্ষ্য হচ্ছে অতীতের আলোতে বর্তমানকে পথ দেখানো, সমাজ ও গোষ্ঠীর চলাচলের পথ ও বিপথ দেখিয়ে মানুষকে সাবধান করা। ইতিহাস কাহিনীকার নয়, ইতিহাস উপদেষ্টা। মানুষের চরিত্রের নিগূঢ় তত্ত্বদর্শীদের নীতিসূত্রের ভাষ্য হচ্ছে ইতিহাস।'
(ইতিহাসের মুক্তি, ১৯৫৭)।

এই হিসেবে বর্ধমানের ইতিহাস রচনায় পূজা-উৎসব-পার্বণের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—দেশের লোকসংস্কৃতির মধ্যে অতীত যুগের সংস্কৃতির এমন বহু নিদর্শনাদি সংগুপ্ত আছে, যেগুলি আমাদের জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচন'র মূল্যবান উপকরণ হতে পারে। ঐ নিদর্শনগুলি গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন।

নববর্ষ উৎসব ও হালখাতা :

পয়লা বৈশাখ থেকে আমাদের বাঙালী হিন্দুদের নববর্ষের সূচনা। হয়তো কোন এক সময় ১লা অগ্রহায়ণ থেকে নববর্ষের সূচনা হত। অগ্রহায়ণ নামের

মধ্যেই এই তথ্য সংরক্ষিত। প্রাচীনকালে কৃষিভিত্তিক সমাজে ১লা অগ্রহায়ণ 'মুট' আনার উৎসবের মাধ্যমে নতুন শস্য ঘরে তোলার দিনটিকে নববর্ষ হিসেবে পালন করা হত। ফাল্গুনী পূর্ণিমাতেও এক সময় নববর্ষের সূচনা হত। হোলি উৎসব তার স্মৃতি বহন করছে।

পরে যখন আকবরের সময় থেকে বঙ্গাব্দের সূচনা হল, তখন থেকেই ১লা বৈশাখকে নববর্ষের দিন বলে ধরা হল। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ এর একটা কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। নববর্ষের আগের দিন চড়ক উৎসব—উর্বরতাতন্ত্রের (Fertility cult) প্রতীক। চড়ক, যে শাল বা গর্জন গাছের গুঁড়িকে জলে ভিজিয়ে চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন তৈলাক্ত করে মাটিতে পোঁতা হয়—এর নাম গাছ-জাগানো। গাছ শিবলিঙ্গের প্রতীক। ধরিত্রী এখানে গৌরপট্ট বা পার্বতীর প্রতীক। সুতরাং গাছ-জাগানোর মাধ্যমেই উর্বরতা কামনার ইঙ্গিত রয়েছে। তাই মনে হয় কৃষিভিত্তিক বাংলার সঙ্গে কৃষিপ্রধান এ জেলাতেও ১লা বৈশাখ নববর্ষ উৎসব পালিত হয়। হালখাতার প্রধান অঙ্গ হালখাতাপূজা ও গণেশপূজা। মোগল শাসন থেকে কৃষি-অর্থনীতিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল 'হাল'—লৌকিক ভাষায় যার অর্থ লাঙ্গল বা কৃষিযন্ত্র। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে রাজস্বই রাজ্যের আয়ের প্রধান উৎস। কাজেই আকবরের সময় থেকেই রাজস্বের হিসেব রাখবার জন্য হালখাতার সূচনা, প্রথমে ইসলামীয় রীতি অনুসারে চান্দ্রমাসের হিসেবে হালখাতা উৎসব হত। কিন্তু চান্দ্রমাসের বৎসর ৩৬৫ দিন থেকে ২১ দিন কম; কাজেই প্রত্যেক বছর নববর্ষের দিন বদলাতে থাকে ফলে বছরে ২ বার নববর্ষ হওয়াও বিচিত্র নয়। কাজেই সৌরবছরে ১লা বোশেখকেই হালখাতার দিন বলে স্থির হল। পরবর্তীকালে কেবল রাজস্বের ওপর নির্ভর করে রাজ্য চালান দুষ্কর হয়ে উঠলো। ব্যবসা-বাণিজ্যেরও দরকার কাজেই 'হালখাতার' সঙ্গে সিদ্ধিদাতা গণেশপূজারও প্রচলন হল। (পূজাপার্বণের উৎস কথা—পল্লব সেনগুপ্ত)

এই নববর্ষের অন্য অঙ্গ গঙ্গায় পুণ্যস্নান—নব বস্ত্র পরিধান। তা-ছাড়া ঐ দিন ভোর থেকেই স্থানীয় অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবীর মন্দিরে ব্যবসায়ীদের নতুন খেরো খাতা আর টাকা নৈবেদ্য নিয়ে ব্যবসায়ীদের লম্বা লাইন; পুরোহিত দক্ষিণা নিয়ে খাতার ওপর টাকার ছাপ দিয়ে গণেশপূজা করেন—"বক্রতুণ্ড মহাকায় সূর্য্যকোটি সমপ্রভ। নির্বিঘ্নং করু মে দেব শুভ কার্য্যার্থ সিদ্ধয়ে।" আর বিকালে খাতা মহরৎ—ব্যবসায়ীদের দোকানে ধার-বাকী আদায় আর নতুন বৎসরে খরিদ্দারদের নাম নতুন খাতায় পত্তন করার পন্থা। খরিদ্দার কিছু অর্থ জমা দেন আর দোকানদার একটা মিষ্টির প্যাকেট ও একটা সুদৃশ্য কালেণ্ডার হাতে ধরিয়ে দেন। পল্লীগ্রামে সাধারণত ধার-বাকী আদায়ের জন্যই এই মহরৎ।

এই দিন কোন কোন প্রতিষ্ঠান বা ক্লাবের পক্ষ থেকে প্রভাত ফেরী ও বিকালে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি পালন করা হয়।

রক্ষাকালী পূজা

বৈশাখ মাসে জেলার অনেক গ্রামে গ্রাম্যদেবী রক্ষাকালীর পূজার প্রচলন আছে। কোন কোন গ্রামে মাসের প্রথম মঙ্গল বা শনিবার আবার কোথাও বৈশাখী সংক্রান্তিতে এই পূজার অনুষ্ঠান হয। কোথাও সদ্য দিনে মূর্তি গড়ে রাত্রে পূজার ব্যবস্থা আছে, আবার কোথাও গ্রামের মধ্যস্থলে বা প্রান্তে বাঁধানো বেদীতে—বেদীর দেওয়ালে দেবীর মূর্তি এঁকে দিনেই পূজার ব্যবস্থা আছে। অনেক গ্রামেই এই পূজা অতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। বাঙালীর আদিমতম সংস্কার বিশ্বাসের সঙ্গে মা কালীর ঘনিষ্ঠ যোগ। রোগে, শোকে, সম্পদ কামনায়, গ্রামে মহামারী দেখা দিলে মায়ের পূজার ব্যবস্থা। গ্রামে ভক্ত-অভক্ত এমন লোক খুব কমই আছে যে মা কালীকে ভয় করে না। মা কালীর আরাধনা এ জেলায় কেবল কার্তিক মাসের অমাবস্যায় দীপান্বিতা শ্যামাপূজার মত পর্ব বিশেষের পূজা নয়। সারা বছরেই মায়ের পূজার আয়োজন; ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন নামে নানা রূপে। মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে রটন্তী রূপে, চৈত্র / বৈশাখ মাসে রক্ষাকালী বা যোগাদ্যারূপে, জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যায় ফলহারিণী কালিকা রূপে, অঘ্রান মাসের প্রতি রবিবার মেয়েলি ব্রতে নাটাই চণ্ডী রূপে। তাছাড়া যে কোন কৃষ্ণাষ্টমী বা অমাবস্যা তিথিতে এমন কি শনি / মঙ্গলবারেও মায়ের পূজার ব্যবস্থা আছে। চৈত্র মাসে গ্রামে কলেরা বসন্তের মহামারী দেখা দিলে কিংবা আষাঢ় / শ্রাবণে প্রচণ্ড খরা দেখা দিলে গ্রামবাসীরা রক্ষাকর্ত্রী দেবী রক্ষাকালীর কৃপা কামনায় তাঁর পূজার আয়োজন করে। গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী গ্রাম্যদেবতা (Tutalar deity) রক্ষাকালী। করালবদনা মুক্তবেশী, ভয়ঙ্করী মহামেঘের মত তাঁর বর্ণ, শবারূঢ়া, মহীপদ্ম, ঘোরদ্রংষ্ট্রা, বরপ্রদা, লসজিহ্বা, দুই অধর বেয়ে রুধির ধারা, গলায় বিবর্তনবাদের প্রতীক বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন বর্ণের, এক একটি বীজমন্ত্রের দ্যোতক এক পঞ্চাশৎ নৃমুণ্ডমালা; বরাভয়প্রদা মৃত্যুরূপা মহামায়া। বিদ্যাপতির বর্ণনায়—

> বাসর বৈনি সবাসন শোভিত
> চরণ চন্দ্রমণি চূড়া।
> কতওক দৈত্য মারি মুহুঁ মেলল
> কত-ও উগিল কৈল কুড়ায়।
> সামরবরণ নয়ন অনুরজিত

জলদ জোগ ফুল কোকা
কট কট বিকট ওঠ পুট পাঁড়রি
লিধুর ফেন উঠ ফোকায়।

দিবসরজনী তোমার চরম শবশোভিত, কত দৈত্যকে বধ করে মুখ মেলেছ কতগুলিকে আবার উগারি ফেলছ। কালো রঙের দেহে ঐ লাল চোখ যেন যুগল লালপদ্ম, ওষ্ঠাধরে মাংসচর্বণের কটকট ধ্বনি, রক্তের ফেনায় উঠেছে বুদ্‌বুদ্‌, মুণ্ডমালা এই ধ্বংসের প্রতীক। (আ. বা. পত্রিকা ৩০/৭/১৪০৬)

কিন্তু রক্ষাকালী আরও ভয়ঙ্করী—লোচনত্রয় সংযুক্তাং নাগযজ্ঞো পবীতিনীম্। দীর্ঘনাসাং দীর্ঘজঙ্ঘাং; দীর্ঘাঙ্গীং, দীর্ঘ জিহ্বিকাম্। ব্যাঘ্রচর্ম-শিরোবদ্ধাং জগৎত্রয়বিভাবিনীম্।

কিন্তু যে রক্ষাকালী মূর্তির পূজা হয় তিনি কালী করালবদনা মুক্তকেশী মহা-মেঘবর্ণা শবরূপী শিবারূঢ়া ভগবতী দিগম্বরী মৃত্যুরূপা কালী। জেলায় রক্ষাকালী পূজা হয় ভাতার থানার হরিবাটী ও জয়রামপুবে চৈত্র মাসে শনি বা মঙ্গলবারে আর বৈশাখ মাসের সংক্রান্তিতে মহাপূজা; কেতুগ্রাম থানার কাঁদড়ায় চৈত্রের শুক্ল পক্ষের শনি অথবা মঙ্গলবারে দক্ষিণ কালিকার মৃন্ময়ী মূর্তি গড়ে, জামালপুর থানার বেড়ুগ্রামে বৈশাখে শনি/মঙ্গলবারে সদ্য দিনে মৃন্ময়ী মূর্তি গড়ে রাত্রে, দাসপুরে বৈশাখে, ধুলুকে মায়ের আটনে-মেমারী থানার মণ্ডলজনায় চৈত্রে, খণ্ডঘোষ থানার বাদুলিয়া গ্রামে বৈশাখে। কোথাও বা সদ্য দিনে মূর্তি গড়ে আবার কোথাও বা অশত্থ বা বটবৃক্ষতলে বেদীতে মায়ের সদ্য দিনে মূর্তি এঁকে, কোথাও বা সারা দিনব্যাপী কোথাও বা সারা রাত্রিব্যাপী পূজা ও বলি চলে। সব জায়গাতেই পূজা সর্বজনীন ও অসংখ্য ছাগ বলি হয়।

হরিবাটীর রক্ষাকালী গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী গ্রাম্যদেবী। প্রায় ১৫০ বৎসরের প্রাচীন। পূজা হয় বৈশাখী সংক্রান্তি দিনের বেলায় সদ্য অঙ্কিত মূর্তিতে। পূর্ব দিন রাত্রে মায়ের 'দোলা'। কাঠের সুসজ্জিত দোলায় দেবীর ছবিসহ হরিবাটী ও কামারপাড়ার বিভিন্ন অঞ্চল পরিক্রমণ, মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে দোলা নামিয়ে নিম্নশ্রেণীর মানুষদের লাঠি খেলা ও উদ্দাম নৃত্য। গোটা গ্রাম উৎসব-মুখর। দোলা নিয়ে পরিক্রমণ গ্রামের প্রান্তে দেবীর স্থায়ী দেবীর কাছে এনে শেষ হয়। তারপর গ্রামে স্থানে ফিরে আসে। পর দিন সকাল থেকেই দেবীর নতুন মূর্তি অঙ্কনের পালা চলে। মূর্তি প্রায় এক ফুট উঁচু, করাল বদনা, মুক্তকেশী, মহামেঘবর্ণা। শবরূপী শিব মায়ের পদতলে শায়িত, ভগবতী দিগম্বরী। দুই পাশে দুটি সিংহ,

সদ্য ছিন্নমস্তক বাম করে, শৃগাল সেই মুণ্ড থেকে নিঃসৃত রক্ত পানে রত। মায়ের মূর্তির অঙ্কন শেষ হলেই পূজা আরম্ভ। গঙ্গাজলে বেদীকে ধুয়ে পঞ্চগব্য দিয়ে পবিত্র করে পূজা শুরু। গ্রামের যে যেখানেই থাকুক এই পূজায় সকলেই আসবেই। গ্রামের প্রতি ঘরে আত্মীয়-স্বজনের ভিড়। গ্রামের চারপাশের গ্রাম থেকে কাতারে কাতারে লোক মানসিক ও পূজা নিয়ে সারাদিন ধরেই আসতে থাকে। মা জাগ্রত দেবী শরণাগত দীনার্ত ভগবতী মনোবাঞ্ছাদাত্রী জগজ্জননী। কত লোকের দুরারোগ্য রোগ মায়ের মাছে মানত করে একেবারে নিরাময় হয়ে যায় তার ইয়ত্তা নাই। সকলেই মানত করে পাঁঠা নিয়ে আসে; মাকে উৎসর্গ করে, বেল কাঁটা দিয়ে বুক চিরে রক্ত দেয়; প্রণাম খাটে, ধুনা পোড়ায়; পূজা, বলি, হোম হতে প্রায় দিন কাবার। এর পর গ্রামের প্রতি ঘরে ও লাগোয়া কামারপাড়ায় অনেক ঘরে দরজায় দরজায় 'র' পুজো। গ্রামের সমস্ত লোক জাতিধর্মনির্বিশেষে এই পূজায় অংশ নেয়। মুসলমানরাও পূজা দেয়। সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ সব মুছে যায়। মা জগজ্জননী, সকলের মা। গ্রামের সকলের চাঁদায় পুজো চলে। দেবীর সামনে শিবের কণ্টকগুল্মঝোপের মধ্যে মহাপ্রভুর স্থান। মায়ের পূজা শেষে সেখানে 'মালসা ভোগ'—সেই ভোগ নিয়ে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে কাড়াকাড়ি চলে। পূজার পর আগে কলকাতা দলের ত্রৈলোক্যতারিণী, সত্যম্বর, নট্ট কোম্পানীর যাত্রা হত। গ্রামের হিন্দু মুসলমান সকলের চাঁদায় যাত্রা কোম্পানীর খরচ চলতো। যারা চাঁদা দিতে পারতো না তারা গরুর গাড়ী বা যাত্রার আসর তৈরীতে শ্রমদান করতো। কয়দিন গ্রাম আনন্দে মুখর হয়ে থাকতো। হৈ-হৈ-রৈ-রৈ ব্যাপার। বর্তমানে গ্রামের অনেক মানুষ শহরমুখী হয়ে গেছে। টিভিও গ্রামে ঢুকে গেছে। যাত্রাদলের দক্ষিণাও আকাশ ছোঁয়া, কাজেই ওসব এখন উঠে গেছে। মাঝে কিছু দিন গ্রামের ছেলেরা সখের যাত্রা করতো। তাও আর কারো সময় হয় না। পূজা আছে, সংস্কার আছে তবে সে আনন্দ হৈ-হুল্লোড় আর নেই। কালে কালে বোধ হয় সবই চলে যাবে। যন্ত্রসভ্যতা পল্লীসংস্কৃতির সব কিছু গ্রাস করবে। সেদিন বুঝি আগত ঐ।

ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যাদেবী

ভূতদাত্রী মহামায়া ভৈরব ক্ষীব কণ্টক
যুগাদ্যা সা মহামায়া দক্ষানুঙ্গুষ্ঠ : পদো মম॥

(তন্ত্রচূড়ামণি)

অতি প্রাচীনদেবী এই যোগাদ্যা—কুব্জিকাতন্ত্রের ৭ম পর্বে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যোগাদ্যা সম্পর্কিত শ্লোক উদ্ধার করেছিলেন।

ক্ষীর গ্রামং বৈদ্যনাথং জানীয়াদ্ বামলোচনে।
কামরূপং মহাপীঠং সর্বকামফলপ্রদম্ ॥

ক্ষীরগ্রাম ৫১ পীঠের এক পীঠ—বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন সতীর দেহের দক্ষিণ পদাঙ্গুলীমূল পতিত হয়। অবশ্য ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নয়টি পীঠের উল্লেখ আছে। কবিকঙ্কণের মতে ক্ষীরগ্রামে দেবীর পৃষ্ঠদেশ পতিত হয়—দেবী যোগাদ্যা।

মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে যোগাদ্যার বর্ণনা করেছেন।

তবে সদাশিব রায় মহা পরিশ্রম পায়
ক্ষীর গ্রামে করিলা বিশ্রাম।
তাহে পৃষ্ঠদেশ পড়ে দেবের আনন্দ বাড়ে
যোগাদ্যা হইল তার নাম।

ষোড়শ শতকে রচিত শিবচরিতে দেবীর নাম যোগাদ্যা ও গ্রামের নাম ক্ষীরগ্রামের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্লোকটি তন্ত্রচূড়ামণিতে উক্ত শ্লোকের প্রায় অনুরূপ :

ক্ষীর গ্রামে মহাদেব ভৈরবঃ ক্ষীর-কণ্টকঃ।
যুগাদ্যাসা মহামায়া দক্ষাঙ্গুষ্ঠাং পদোমম্ ॥

কৃত্তিবাসী রামায়ণে যোগাদ্যা বন্দনায় ক্ষীরগ্রামের মহাপীঠ-আদ্যাং, সর্বতেজোময়ী, শ্যামাং, করালবদনাং, মুক্তকেশী-চতুর্ভুজাং—বন্দনাগীত ছাড়াও মহীরাবণবধ পালায় মহীরাবণের পূজিতা দেবী ভদ্রকালী বা যোগাদ্যার উল্লেখ আছে। মহীরাবণ-বধের পর দেবীর আদেশে শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে ক্ষীরগ্রামে প্রতিষ্ঠার জন্য আদেশ দিলে—

মাথায় প্রতিমা করি আন্যা হনুমান।
অবনী-মণ্ডল মধ্যে ক্ষীরগ্রাম নাম।

রামানন্দ যতির চণ্ডীমঙ্গল, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, কেতকাদাসের মনসামঙ্গলেও ক্ষীরগ্রামের সর্বমঙ্গলার উল্লেখ আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৪৭০ নং পুঁথিতে ধর্মের বন্দনাতে ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যার, এড়বারে (এরুয়ার?) কালিকার, অম্বায় অম্বিকা সিদ্ধেশ্বরী, মণ্ডলগ্রামের জগৎগৌরীসহ অনেক শক্তিদেবীর উল্লেখ আছে।

ক্ষীরগ্রাম ধেঞা পরগনার অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে মঙ্গলকোট থানার ১২৮নং ক্ষীরগ্রাম মৌজার পরিমাণ ১১৩৯-৪৮ হেক্টর, লোকসংখ্যা ২৭২৯; এর মধ্যে

তপসিলী জাতির সংখ্যা ১১২৬; গ্রামের মোট জনসংখ্যার ৪১.২৬ শতাংশ। বর্ধমান থেকে সোজা বাসে যাওয়া যায়, আবার কৈচর ষ্টেশন থেকেও বাসে যাওয়া যায়। বর্ধমান থেকে দূরত্ব প্রায় ৪০ কিমি। গ্রামে ধোপা, কলু, কুম্ভকার ও মুসলমানের বাস নিষিদ্ধ; গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যোগাদ্যা। গ্রামের মধ্যস্থলে প্রাচীর বেষ্টিত দেবীর মন্দির, মন্দির চত্বরের তিন ভাগ। মূল অংশে দেবীর মন্দির, উত্তরে ফুলবাগিচা, ফুলবাগিচার পশ্চাতে মালির ঘর; পূর্বে ও পশ্চিমে দুটি প্রবেশদ্বার; পূর্বের প্রবেশদ্বার জোড়াবাংলা রীতিতে নির্মিত, পশ্চিমের প্রবেশদ্বারে দোচালা রীতি। মন্দিরের পশ্চাদ্ ভাগে শিলা; পূর্বদিকের গজগম্বুজাকৃতি প্রস্তরখণ্ড ও গোলমন্দিরে প্রবেশদ্বারে প্রস্তরখণ্ডদ্বয় ও বালি পাথরের চৌকাঠ অষ্টম শতাব্দীর বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। বর্ধমানের মহারাজ কীর্তিচাঁদ প্রাচীন মন্দির চত্বরের ওপর নতুন মন্দির, বেদী, নাটমন্দির নির্মাণ করে দেন। মূল মন্দিরের গর্ভগৃহ ৩০ ফুট উঁচু, ত্রিরথাকৃতি। অর্ধমণ্ডপের ছাদ গম্বুজাকৃতি। যোগাদ্যা মন্দিরের অদূরে ক্ষীরকন্টক ভৈরবের মন্দির ৪০ ফুট উঁচু ত্রিস্তর মন্দির।

দেবীর রত্নবেদীতে একটি অষ্টধাতুর সিংহবাহিনী মূর্তি, একটি অষ্টধাতুর লক্ষ্মীমূর্তি, একটি শিলাময়ী গদাধর মূর্তি, একটি শিলাময়ী সিংহবাহিনী মূর্তি, একটি অষ্টধাতুর জগদ্বাত্রী মূর্তির নিত্যপূজা হয়। মায়ের নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে। প্রতিদিন পাঁচ ছটাক ভিজা ছোলা ও পাঁচ ছটাক মিষ্টি। ভোগের ব্যবস্থা ছিল আড়াই সের আতপ চাউল, সোয়াসের দুধ, আড়াই পোয়া মিষ্টি, পাঁচ ছটাক ঘৃত ও অতিথি প্রতি আধসের চাউল। মাছ প্রতিদিন চাই। বর্তমানে দুর্মূল্যতার জন্য ও মহারাজের জমিদারী চলে যাওয়ায় নৈবেদ্য ও ভোগের বরাদ্দ অনেক কমেছে। কষ্টিপাথরে নির্মিত দেবীর শিলাময়ী সিংহবাহিনী মূর্তি। দেবী জলতল-বাসিনী। প্রাচীন মূর্তিটি চুরি যায়; পরবর্তীকালে দাঁইহাটের নবীন ভাস্কর-কে দিয়ে অনুরূপ অপরূপা শিলাময়ী দশভুজা সিংহবাহিনী দুর্গামূর্তি নির্মিত হয়েছে। কৃত্তিবাসের যোগাদ্যাবন্দনায় দেবীর যে মূর্তির বর্ণনা আছে তাতে দেখা যায় দেবীর আদি মূর্তি ছিল কালিকামূর্তি—আদ্যাং সর্বতেজোময়ীং, শ্যামাং করালবদনাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্। ক্ষীরগ্রামবাসী দ্বিজ দয়ারামের 'যোগাদ্যা বন্দনা'তে আছে—

বন্দিব যোগাদ্যা মাতা খিরগ্রাম বাসী।
অবণিতে মহাপিট গুপ্ত বারাণসী ॥
বাম হস্তে খর্পর মাএর দক্ষিণ হস্তে খান্ডা।
লঙ্কায় রাবণের ঘরে ছিল উগ্রচন্ডা ॥

যোগাদ্যা বন্দনাতেই দেবীর দশভূজা সিংহবাহিনী মূর্তির উল্লেখ আছে। দেবী হরিদত্ত রাজাকে স্বপ্নে পূজার নিয়ম বলেছেন। স্বপ্নে পূজার বিধান পেয়ে রাজা—

"সাত দিন পূজা কৈল দিয়া সাত বালা।
অবশেষে ক্ষিরগ্রামে করে দিল পালা ॥

গ্রামের অন্য সবার পালা শেষ হলে শেষে এক ব্রাহ্মণের পালা এল। ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্র, দ্বিতীয় পুত্র নাই। সেকারণে "স্ত্রীপুত্র লয়্যা দ্বিজ যায় পলাইয়া।" পথে ব্রাহ্মণীর বেশে দেবী ব্রাহ্মণের পথ আগলালেন। তাঁর পালাবার কারণ জিজ্ঞ্যেস করায় ব্রাহ্মণ সত্য কারণ নিবেদন করল "প্রাণরক্ষা নাহি পায় ক্ষিরগ্রামে রয়্যা।" তখন হাসিয়া কহে দেবী কাত্যায়নী। যার ভয়ে পালাও তুমি সেই দেবী (যোগাদ্যা) আমি॥ ব্রাহ্মণের বিশ্বাস হয় না। প্রমাণ চান—দেবীকে আশ্বিনের অম্বিকা মূর্তিতে দেখা দিতে বলেন। তখন

"ভক্ত বৎসলা দেবী মাতা কাত্যায়নী।
ব্রাহ্মণের আগে হইলা মহিষমর্দ্দিনী ॥"

* * * * *

এত বলি মহামায়া বসিলা মন্দিরে।
স্ত্রীপুত্র লয়্যা দ্বিজ চলো নিজ ঘরে।

অন্য একটি যোগাদ্যা বন্দনায় এরপর আছে—

তখনি হইল বাণী সুন বাপু গুণমনি
আমার কথায় কর মন।
কাল হইতে নরবলি ঘুচায় সকল পালি
ইছা যায় আনিব আপন।
আজ হইতে জলে বাস করিলাম অভিলাস
মাসে মাসে করিয় উতাল।

ইহার পর দেবী ক্ষীরদীঘির জলে বাস করিলেন এবং এই কথা শুনিয়া 'আঘুরি—আত্মজ'—

কাঁদিয়া আকুল হইয়া ক্ষীর দিঘী তীরে যাইয়া
কাঁদে মা মা তারিণী বলিয়া।
তখন সকল বলি বানি শুন বাছা, গুণমণি
আমার কথায় দেয় মন।
বট এ বৈশাখ মাস ঢাক ঢোল অবকাঁস

করহ পূজার আয়োজন।
তারপর ঝাকে ঝাকে
মাদলের অপরূপ জাত।

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তাঁর এক ফরমান অনুসারে কাটোয়ার সন্নিকটস্থ খাজুরডিহিনিবাসী বঙ্গাধিকারী কানুনগো হরিনারায়ণ মিত্র হিজরী ১০৯১ অব্দে (ইং ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ) যোগাদ্যা দেবীর সেবার জন্য ১৬০০ টাকার ভূসম্পত্তি দান করেন। বর্ধমানরাজ কীর্তিচাঁদ মন্দির নির্মাণ ছাড়াও দেবীর সেবা পূজার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পুরোহিত, ঢাক, মাদল, বাজনদার, ডোম, বলিদানের ঘাতক, মালি সকলকে চাকরান জমি দেওয়া আছে। নদীয়ারাজ ৩১শে বৈশাখ ক্ষীরদীঘি থেকে দেবীকে তোলার সময় মশালের আলো দানের ব্যবস্থা করেন। নদীয়ারাজ নাই—তাঁর মশাল দানও বন্ধ হয়েছে কিন্তু আজও ঐ সময় যে মশাল জ্বালান হয় তাকে নদের মশালই বলে।

দেবীর পূজার প্রস্তুতি শুরু হয় চৈত্র সংক্রান্তিতে; তিনটি যজ্ঞ ও সেই তিন যজ্ঞীয় জলের আধার 'ক্ষীর কলস' নামক পবিত্র কলসকে কেন্দ্র করে। যজ্ঞের সময় মালাকার ক্ষীরদীঘিতে বাদ্যসহকারে একটি ছোট ঘট পূর্ণ করে এনে মায়ের মন্দিরের পূর্ব গায়ের সংলগ্ন গণেশ মুণ্ডে (?) রক্ষা করবেন। এরপর ১৫ই বৈশাখে দেবীর লগ্ন উৎসব। লগ্ন উৎসবের পর থেকে ২৯শে পর্যন্ত ঢাকের পরিবর্তে মাদল বাদ্য হয়। ২৯শে পাটনাড়ার দিন। ঐ দিন নরসোনা গ্রামের চক্রবর্তীরা চাল, ডাল, তরকারী, ফুল বেলপাতা নিয়ে ভাণ্ডারীকে দেন। গোহগ্রাম থেকে মাসিপিসির ঝাঁপি করে এক জোড়া শাঁখা আসে। পূজার আর একটি অঙ্গ ময়ূর নাচ। ১৭শে যজ্ঞকুণ্ডে যজ্ঞ করা হয়। ৭ জন পতাকী পার্ষদগণ ঝাঁপিতে পতাকা ঠেকিয়ে বাজনার তালে তালে 'মোর' নাচ করে। পূজার দিন জোড়া ঢাক পুরাতন মন্দিরের আলিশায় অনেকক্ষণ বাজিয়ে সকলকে জানান দেয়। বৈশাখ মাসের সংক্রান্তিতে ভোর হতে মন্দির প্রাঙ্গণে চলে "ডোম চোয়াড়ি"। তলোয়ার হাতে ব্রাহ্মণ ও লাঠি হাতে ডোমেদের মধ্যে চলে যুদ্ধের মহড়া, দেবী পূজার অধিকার নিয়ে উচ্চবর্ণের সঙ্গে প্রতীকী দ্বন্দ্ব। সারা বৈশাখ মাস ক্ষীরগ্রামে হাল-লাঙ্গল বন্ধ থাকে। ৩০শে বৈশাখ বিকালে 'হাল লাঙ্গল' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রামের কৃষিকার্য শুরু হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অংশগ্রহণকারী বাগদীরা। নিত্যপূজা ব্যতীত মায়ের মহাপূজা মন্দিরে হবে। এছাড়া ক্ষীরদীঘির পাড়ে মায়ের নিমজ্জন স্থানের কিছু দক্ষিণে অতি পুরাতন ছাদবিহীন মন্দিরে ষোড়শ উপচারে ৭টি বলিসহ মায়ের পূজা হওয়ার রীতি।

মহাপূজার মন্ত্র :

জয়ন্তি কালি ভূতেসি সর্বভূত সমাদৃতে।
রক্ষ মাং নিত্যভূতেভ্যঃ বলিং গৃহ্ন শিবপ্রিয়ে ॥
মাতর্মাতর্বরে দুর্গে সর্বকামার্থ-সাধিনী।
অনেক-বলিদানেন সর্বান্ কামান্ প্রযচ্ছ মে।
এবং দত্বা বলিং শক্র ততো দেব্যা বতারয়েৎ ॥

মন্দিরে দুর্গার ধ্যানে "জটাজুট সমাযুক্তামর্দ্ধেন্দু কৃত শেখরাম্" ধ্যানেই পূজা বিধেয়। স্নানার্থ প্রচুর জল ঢালা হয়।

কলস্তৈ সহস্রেন গংগোদকপ্রপুরিতৈঃ।

পাঁচজন পাঠক চণ্ডীপাঠ করবেন। কর্মকার জোড়া ঢাকসহ ক্ষীরদীঘি প্রদক্ষিণ করবে। মহারাজার পূজার পর নানা স্থানের জমিদার, সাধক ও মানতকারীদের বলিসহ ক্ষীরদীঘির চার পাড়ে পূজা হতে থাকবে। পূর্বে নাকি নরবলি হত। এখন দেবীকে জল থেকে তোলবার সময় ডোমেরা বেলকাঁটা দিয়ে বুক চিরে রক্তদান করে আর নরবলির জায়গায় বৈশাখের মহাপূজায় ও দুর্গা নবমীতে মহিষবলি হয়। ২টি হোম হয়: সংক্রান্তির বলি ও মহিষবলির জন্য সন্ধ্যায় গুয়া ডাকা হয়। মূল মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে একটি বেদীতে মালাকার পান ও সুপারি নিয়ে প্রথমে 'ফোপল' অর্থাৎ ডোমদের, তারপর সম্ভ্রান্ত উগ্রক্ষত্রিয়দের ডাক দেয়। অমন্ত্র বলির মাংসসহ মায়ের মন্দিরে মহাভোগ হয়। ভোগে এই দিন দুর্গাদীঘির মাছ দেওয়া হয়। মহিষবলির পর মানতকারীরা সারাদিন উপবাসী থেকে দণ্ডবৎ প্রণাম খাটে ও পুষ্পাঞ্জলি দেয়। ক্ষীরগ্রামের মহিলাসমাজ রাত্রিতে মায়ের শ্রীচরণ দর্শনের পর ব্রাহ্মমুহূর্তের সময় দেবীকে নিরঞ্জন দেওয়া হয়। নিরঞ্জনের পূর্বে ডোম অমন্ত্রক ও অস্নাতক একটি ছাগকে পূর্ব মুখে দাঁড়িয়ে বলি দেয়। এর নাম 'মেরুয়া' কাটা। ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ গভীর রাত্রে মাকে জল থেকে তুলে জনসাধারণের দর্শনার্থে বলিসহ পূজা ও অভিষেক হয়। আবার নিরঞ্জন হয়। এইভাবে মাস-ব্যাপী উদ্যোগের পর মহাপূজা সাঙ্গ হয়। সারা বৈশাখ মাস গ্রামবাসীদের কতকগুলি অবশ্য পালনীয় নির্দেশ আছে। সারা মাস হলকর্ষণ হবে না; কুম্ভকার গ্রামে থাকবে না। পূর্ণগর্ভা নারীকে অন্য গ্রামে পাঠাতে হবে। সলিতা পাকান নিষিদ্ধ। স্ত্রী পুরুষে একত্রে শয়ন চলবে না। স্ত্রীকে অন্যত্র পাঠানোই বিধেয়। সারা মাস ছাতা মাথায় দেওয়া চলে না, ধান ভাঙাও হবে না. উত্তর দুয়ারী ঘরেও বাস নিষেধ।

শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যোগাদ্যা: প্রাচীন কালে শস্য উৎপাদনের জন্য আদিম জাতি যে নরবলি দিত সেই নরবলির প্রচলন ক্ষীরগ্রামেও ছিল। প্রাচীন মিশরের

আইসিস, মেসোপটেমিয়ার ইস্তার প্রমুখ সমস্ত সংস্কৃতির প্রধান দেবী মাতৃকাদেবী শস্যদায়িনী। আদিম মাতৃকা উপাসনার ধারা ক্রমশ কৃষিপর্বে প্রবাহিত হল, তখন থেকেই দেবীর পৌরাণিক রূপের উৎস। অনুরূপভাবে শাকম্ভরী দেবী ও শস্যদাত্রী দেবীরূপে কল্পিত। এই সমস্ত দেবীপূজার মধ্যে প্রাচীন অনার্য সংস্কৃতির ওপর আর্য সংস্কৃতির প্রলেপ পড়ে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। জলতলবাসিনীর কারণ হিসেবে যে গাথাই তৈরী হোক, মনে হয়, আদিতে কোন বিধর্মী সম্প্রদায়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য দেবীকে জলে ডুবিয়ে রাখার ব্যবস্থা হয়।

জামালপুরের বুড়োরাজ :

পূর্বস্থলী থানার জামালপুর একটি ছোট্ট গ্রাম, জে এল ৪৬, আয়তন ৯৮.৪১ হেক্টর, লোকসংখ্যা ১০৮৭, এর মধ্যে তপসিলী সম্প্রদায় ৭৫০; গ্রামের মোট জনসংখ্যার ৬৯ শতাংশ। কাটোয়া থেকে বাসে কিংবা পাটুলি রেলস্টেশন থেকে বাসে বা রিক্সায় যাওয়া যায়। গ্রামের অধিবাসীদের অধিকাংশই গোপ, বাগ্‌দী আর বাউড়ী, কয়েকঘর ব্রাহ্মণ ও মুসলমান আছে। গ্রামের অধিষ্ঠাতা গ্রাম্যদেবতা বুড়োরাজ। স্থানীয় বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের গৃহদেবতা রূপে বিরাজমান। যদিও পূর্বে গঙ্গা গ্রামের পাশ দিয়েই প্রবাহিত হত; আজ গঙ্গা তিন ক্রোশ দূরে সরে গেছে। রেখে গেছে মরাগঙ্গা কুমীড়ার খাল; অন্য সময়ে সামান্য জল থাকলেও গ্রীষ্মকালে নিশ্চিহ্ন। বুড়োরাজ যম ও ধর্মরাজ হিসাবে পরিচিত হলেও শিবপূজার সব রকম অনুষ্ঠান পালিত হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমশাই বুড়োরাজকে বুদ্ধদেবের প্রতিরূপ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। বুড়ো শিবের বুড়ো আর ধর্মরাজ-এর 'রাজ' মিলে হয়েছে বুড়োরাজ; শিব ও ধর্মের একাত্মরূপ —সর্বজনপূজ্য লোকদেবতা। বিনয় ঘোষের মতে রাঢ়ের অন্যতম গণদেবতা (তথাকথিত অনুন্নত সমাজের); ধর্মঠাকুরকে ক্রমে হিন্দুসমাজের শ্রেষ্ঠ দেবতা শিবঠাকুর আত্মসাৎ করে ফেলেছেন।

বুড়োরাজের আবির্ভাব সম্পর্কে সেই চিরাচরিত বন, গাভী ও এক প্রস্তরখণ্ডের ওপর গাভীর দুধের ধারাবর্ষণের কাহিনী জড়িত। কথিত আছে যদু ঘোষ নামে এক স্থানীয় গোপের শ্যামলী নামে গাই ঘরে এক ফোঁটা দুধ দেয় না। শুকনো বাঁট নিয়ে বন থেকে চরে আসে। যদু ঘোষের সন্দেহ হয়, কেউ মাঠে দুধ দুইয়ে নেয় কিনা। একদিন গাভীর পিছু পিছু গিয়ে দেখে তা'র শ্যামলী-গাই বনের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে আর তার বাঁট থেকে দুধের ধারা ঝরছে। এই সংবাদ গ্রামের চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। যদু গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত চাটুজ্যে মশাই-এর কাছে গেলেন পরামর্শের জন্য। চাটুজ্যে মশাই বনের নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দেখলেন এক

পাথরের মাথায় দুধ জমা—এই পাথরই বুড়োরাজ অনাদি লিঙ্গ শিব, সেই রাত্রেই চাটুজ্যে মশাই স্বপ্ন পান তিনি বুড়োরাজ, তাঁর পূজা হবে অনাড়ম্বরে।

যদুর বাড়ী পাশের গ্রাম নিমদহে। সে কারণে আজও নিমদহে পুজো প্রথম হয়। নিমদহে গোপরা আর নাই। কিন্তু গ্রামবাসীরাই পুজো পাঠায়। তাদের বলিই আগে হয়। বর্তমানে চাটুজ্যে মশাই-এর দৌহিত্র বংশ বাঁড়ুজোরাই বাবার সেবাইত।

জামালপুরের বুড়োরাজের উত্থানের দিন বুদ্ধ-পূর্ণিমা। ঐ দিন বাবার মহাপূজা ও মেলা হয়। সাত দিন আগে থেকে হাজার হাজার সন্ন্যাসী ভক্ত সমবেত হয়। শত শত ভক্ত বাবার কাছে মানত করে। কঠিন সমস্যা, দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি পায়। সন্তানহীনার মনস্কামনা পূরণ হয় বাবাব কাছে হতো দিলে। সকল জাতির ভক্তদের এখানে অবারিত দ্বার; মুসলমানরাও ছাগ বলি দেয়। কিন্তু বলির পাঁঠা নিয়ে যায় না। বিচিত্র সব বস্তু বাবার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়। বুড়োরাজের কোন পাকা মন্দির নেই—চাটুজ্যে মশাই-এর নির্দেশে। সাধারণ বাঁকানো খড়ের চালাঘর, নতুন করে ঘর ছাইলেও নাকি চাল ফুটো হয়ে যায়। পুরানো চালেব ওপরেই ঘর ছাওয়া হয়। ছাইয়ে দেয় স্থানীয় বাগ্‌দীরা বিনা পারিশ্রমিকে। বাবার সব কাজ এরাই করে। এদের সম্মান এঁরা বলিদানে ছাগের মাথার মালিক।

বুড়োরাজ অনাদি লিঙ্গ শিব। কোন প্রতিষ্ঠাতা ছিল না। কিন্তু কিভাবে তিনি ধর্মরাজে রূপান্তরিত হলেন সেটা রহস্যে ঢাকা। শিবের মহাপূজা উৎসব গাজন চৈত্র সংক্রান্তিতে হয়, জামালপুরের বুড়োরাজই বোধ হয় একমাত্র ব্যতিক্রম। বুড়োরাজের গাজন হয় বৈশাখ মাসের বুদ্ধ পূর্ণিমায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে বুড়োরাজ বুদ্ধ প্রভাবিত। তাই বুদ্ধ পূর্ণিমাতেই গাজন। এখানকার নিয়ম হল শিবের সঙ্গে ধর্মরাজের পুজো ও গাজন হবে। এর জন্যে ঠাকুরের নৈবেদ্যের মাঝে একটা লাইন কেটে দুভাগ করে দেওয়া হয়। এক ভাগ শিবের আর এক ভাগ ধর্মরাজের। বাবা মধুসূদন চাটুজ্যেকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই অনুসারেই পূজার পদ্ধতি সরল ও সাধাবণ। আতপ চাল, ফল ও মিষ্টির নৈবেদ্য আর কেবলমাত্র দুধের ভোগ। গরীবের ঠাকুর বুড়োরাজ, তাই মন্দিরেও কোন আড়ম্বর নাই। গরীবের চালাঘর আর পূজার নৈবেদ্য, ভোগেরও কোন বাড়াবাড়ি নাই। শিবের সামনে কোন বলিদানের নিয়ম নেই। কিন্তু ধর্মরাজের কাছে বলিদান হয়। সবই বলিদান হয়। পাঁঠা, হাঁস এমন কি শূয়োর পর্যন্ত বলিদান হয়। তাই একটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। বলি হয় অমন্ত্রক, মন্দিরের সামনে হয় না। মন্দিরের আশেপাশে যত্রতত্র বলি হয়। উৎসবে গোপ আর ব্যগ্রক্ষত্রিয়দের বিশাল

সমাবেশ। পাঁঠা নিয়ে কাড়াকাড়ি লাঠালাঠি হয়। ১৯৪৬ সালে একবার হিন্দু-মুসলমানদের বিরাট দাঙ্গা হয়। দোকানদারদের লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়। বাবার ঘরে অগ্নি সংযোগেরও চেষ্টা হয়। কিন্তু অঘটন আজো ঘটে। হঠাৎ প্রবল বর্ষণ আরম্ভ হয়ে দুষ্কৃতকারীদের সব পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয়। তারপর থেকে গোপ ও বাগ্‌দীরা লাঠিসোঁটা নিয়ে মেলায় আসে, মারামারি দাঙ্গা-হাঙ্গামার আশঙ্কায়; তাই সরকার থেকে ব্যাপক পুলিশি ব্যবস্থা করা হয়।

ধর্মরাজের পুজোয় সাধারণত বাগদী, বাউড়ীদের অধিকার, কিন্তু বুড়োরাজের পুজোয় পুরোহিত ব্রাহ্মণ কারণ বুড়োরাজ আগে 'বৃদ্ধশিব' পরে 'রাজ'; কাজেই শিবের পুরোহিত হিসেবে ব্রাহ্মণের অধিকার। কিন্তু পুজোয় পুরোহিতের ঐ টুকুই যা অধিকার; উৎসবের বাকি অংশে বাগ্‌দী বাউড়ীদেরই প্রাধান্য। এই আপোসের মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মের উদারতা, পুরোহিতদের দূরদর্শিতা ও আর্য-অনার্য বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার এক অপূর্ব সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত জামালপুরের বুড়োরাজ। তাছাড়া গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে মুসলমানরাও আসছে, পুজো দিচ্ছে, বলি দিচ্ছে, কোন সংস্কার নেই। তাই বিনয় ঘোষের মতে সব সংস্কারমুক্ত উদারতার প্রতীক 'বুড়োরাজ' বাংলার নিজস্ব মানবধর্মের প্রতিমূর্তি।

অন্যান্য দেবতার কাছে মানত করে যে ধুনো পোড়ানো হয় সেখানে ব্রাহ্মণদের অধিকার, দক্ষিণা ব্রাহ্মণদেরই পাওনা কিন্তু বুড়োরাজের কাছে ধুনো পোড়ানোর সহায়তা করে বাগ্‌দীরা, দক্ষিণা তাদেরই প্রাপ্য।

জাগ্রত দেবতা বুড়োরাজ—যক্ষ্মা, মৃগী, বাত, হাঁপানি, অম্লশূল যে রোগী 'বাবা'র কাছে আসুক, বাবার কাছে হত্যে দেয়, স্বপ্নাদ্য ওষুধ পায়। নিরাময় হয়ে যায়। যক্ষ্মাগ্রস্ত মুসলমানও বাবার কাছে হত্যে দিয়ে সেরে গেছে এমন দৃষ্টান্ত আছে। গলিত কুষ্ঠ রোগী সেরে গিয়ে আজীবন বাবার সন্ন্যাসী হয়েছে। যাত্রীরা চতুর্দশীর দিন উপবাস করে, তিন ক্রোশ দূর থেকে মাথায় করে গঙ্গার জল আনে, বাবার মাথার ঢালে। দিনরাত মন্দিরের দ্বার ভক্তদের জন্য খোলা থাকে। মন্দিরে প্রবেশের জন্য যেমন কোন দক্ষিণা নাই, মানসিকেরও কোন নিয়ম নাই। কাপড়, চিনি, মণ্ডা, ফল, ডাব, সোনা যার যা খুশি মানসিক দেয়। আগে পালাজ্বর হত। পালাজ্বর প্রকৃত প্রস্তাবে ম্যালেরিয়া। দীর্ঘদিন ম্যালেরিয়ায় ভোগার পর ওষুধপত্র কিছু খেলে জ্বর ছাড়ত, কিন্তু কারও ক্ষেত্রে একদিন অন্তর, কারও বা দু-দিন অন্তর ঠিক একটা নির্দিষ্ট সময়ে কম্প দিয়ে জ্বর আসতো। শত ওষুধ খেলেও অনেকের কমতো না। নানা রকম শেকড়বাকড় দেওয়ার রীতি ছিল কিন্তু ঐ পর্যন্ত। জ্বর ঠিক পালা করে আসতো। কিন্তু বুড়োরাজের কাছে এসে সেবাইতের

কাছে স্বপ্নাদ্য ওষুধ নিয়ে খেলেই ভালো হয়ে যেত। সেবাইতদের কোন দাবী নাই। তবে বারো মাসে বারোটি সোমবার করতে হয়। মাসের প্রথম বা যে সময়েই হোক শুক্লপক্ষের সোমবার—এর পালন করতে হয়। আগের দিন নিরামিষ খেয়ে সংযম করতে হয়। সোমবার স্নান করে বাবার নামে শিবমন্দিরে পুজো দিয়ে দিনে একবার হবিষ্যান্ন কিংবা ফলমূল, কাঁচা দুধ খেয়ে থাকতে হয়। বুড়োরাজের 'ভর' হয়, কোন সেবাদাসীর মূর্ছিত অবস্থায় তার মাধ্যমে বাবার আদেশ বা ওষুধপত্রের নির্দেশ পাওয়া যায়। বিজ্ঞানচেতনা-সম্পন্ন মানুষরা অবশ্য এসব বিশ্বাস করে না—বলে বুজরুক, স্রেফ ধাপ্পা। হয় তো তাই কিংবা হয় তো লোকের বিশ্বাস। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর।

মন্ত্রে-তীর্থে দ্বিজে দেবে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

অনেক ভক্ত পাঁচ সিকে দিয়ে মনের কোন গোপন বাসনা সফল হবে কিনা বা কোন দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় হবে কিনা জানবার জন্য বাবার মাথায় ফুল চড়ায় ও প্রাণপণে বাবাকে ডাকে, ঢাকীরা প্রাণপণে ঢাক বাজায়। যদি ফুল পড়ে যায়, তাহলে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে বা রোগ তা যতই দুরারোগ্য হোক নিরাময় হবে। এর মূলেও বিশ্বাস তবে অনেকের মতে ঢাকের জোর আওয়াজে বায়ুতে vibration হয়, তার ফলে নাকি ফুল পড়ে যায়। যাদৃশী ভাবনা যস্য।

বৈশাখ ছাড়াও বুড়োরাজের মহাপূজা জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় ও মাঘী পূর্ণিমাতে হয়, তবে এরকম গাজন, আড়ম্বর বা জনসমাগম হয় না।

বাবার কাছে মানত করে কি ফল হয় জানি না, ভরের আদেশ ফলে কিনা সে সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা বা কোন জ্ঞান নাই; হত্যে দিলে স্বপ্নাদ্য ওষুধ মেলে কিনা সে অভিজ্ঞতাও নাই। তবে এটা ঠিক আড়ম্বরহীন জাতিধর্মনির্বিশেষে ভক্তের ভগবান, শৈবতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রের সমন্বয়ের প্রতীক বুড়োরাজ বিশ্বমানবতার প্রতীক—যার কাছে কোন জাতিভেদ নাই; কোন পাণ্ডার অত্যাচার নাই, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের জোর জুলুম নাই। রাঢ় বাংলার লোকসংস্কৃতির এ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বড়ো বলরাম :

রায়না থানা ৮৩নং বোড়ো গ্রাম—বড়ো বলরাম হিসেবেই সমধিক পরিচিত। আয়তন ২৮৬.৭০ হেক্টর, লোকসংখ্যা ২২১৮, এদের মধ্যে তপসিলী সম্প্রদায় ১৩০৯; গ্রামের মোট জনসংখ্যার ৫৯ শতাংশ, তবে উচ্চবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, উগ্রক্ষত্রিয়, গোপ, কায়স্থ ও সদ্‌গোপই প্রধান; গ্রামের মধ্যে একটা 'ট্যাবু'

(taboo) আছে যে গ্রামে মুসলমান, কর্মকার, কুম্ভকার ও রজক-এর বাস নিষিদ্ধ। ক্ষীরগ্রামেও দেখেছি ঠিক এই রকম 'ট্যাবু'—মনে হয় দেবদেবী থাকার জন্যই এই রকম একটা সংস্কার চলে আসছে। গ্রামের অধিষ্ঠাতা দেবতা বলরাম। নিম-কাঠের দারুময় বিরাট মূর্তি প্রায় ৭/৮ হাত (১২/১৩ ফুট) উঁচু, দণ্ডায়মান; হাত চৌদ্দটি, মাথায় ১৩টি সাপের ফণার ছাতি, এর মধ্যে নারায়ণের অনন্তশয্যায় শায়িত রূপ কল্পনার ইঙ্গিত, অহি ছত্র সমন্বিত বিষ্ণু ও সকর্ষণের মিলিত রূপ কল্পনার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। বিগ্রহের পশ্চাতে চালচিত্রের ছবি। কয়েক বছর অন্তর নব কলেবর হয়। বিনয় ঘোষের মতে মূর্তিটি ১৭ শতকের পূর্বের কোন এক সময়ের কারণ কাঠের বিগ্রহের প্রচলন আগে ছিল না। তাছাড়া কৃষ্ণহীন বলরাম বিগ্রহ চৈতন্যের সময় বা পরে হতে পারে না। সেকারণেই মনে হয় কৃষ্ণহীন বলরাম মূর্তি ১৭ শতকের আগে। মূর্তির এক হাতে বলরামের প্রিয় অস্ত্র লাঙ্গল, উর্বরতার প্রতীক। বলরামকে বিষ্ণুর দশ-অবতারের ষষ্ঠ অবতার বলা হয়। বিবর্তনবাদের হলধর বলরাম।

এখানে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও সুধীজনের দৃষ্টি আকষর্ণের জন্য একটা বিষয়ের উল্লেখ করছি। প্রখ্যাত প্রকৃতিবিদ্ চালর্স ডারউইন প্রশান্ত মহাসাগরের গ্যালাপ্যাগাস দ্বীপে এক বিশাল কচ্ছপ দেখে H. Spencer এর The Survival of the Fittest তত্ত্বকে গ্রহণ করেও তার ওপর ভিত্তি করে তাঁর বিবর্তনবাদ তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন। কিন্তু আমাদের বিষ্ণুপুরাণ (১১/২), শতপথ ব্রাহ্মণ তৈত্তিরীয় সংহিতায় অবতারতত্ত্বের মধ্যেই এই বিবর্তনবাদের nucleus রয়েছে; তা নিয়ে কেউ গভীর আলোচনা করেছেন বলে আমার জানা নাই। অবতারতত্ত্বের মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ (নর-বানর?), বামন (Negrito) অবতারের পর এলেন হলধারী বলরাম। উর্বরতার প্রতীক (Fertility cult) ও কৃষিভিত্তিক সমাজ গঠনের হোতা। সর্পছত্রধারী অনন্তশয্যায় শায়িত নারায়ণের নাভিপদ্ম থেকে উদ্ভূত স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা কোন ঋষির কল্পনা নয়। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূতে গড়া দেহের মধ্যে স্বয়ম্ভূ-তত্ত্বের হদিস খুঁজে পাওয়া যাবে। ১৩.৭.৯৬ তারিখে দেশ পত্রিকাতে এ সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। এই স্বয়ম্ভূ থেকে Selection of Sex ও The Survival of the Fittest তত্ত্বের সূত্র মিলবে। হলায়ুধ বলরাম এই বিবর্তনবাদের একটি স্তর।

যাই হোক, মূল বক্তব্যে ফিরে আসা যাক। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে বড়ো বলরামের বলরাম মূর্তি বিষ্ণুর রূপভেদ; এর মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু দেব-কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটেছে বলে তিনি এর নাম দিয়েছেন লোকেশ্বর বিষ্ণু।

(বোড়োর বলরামের হাতে আছে মুষল, গদা, লাঙ্গল, শঙ্খ, ডমরু, চক্র, পদ্ম ও অন্যান্য হাত বিভিন্ন মুদ্রায় প্রসারিত। মূর্তির রঙ সাদা তিনটি চক্ষু গোলাকার। মূর্তির ঊর্ধ্বাংশ পুরুষ ও নিম্নাংশ প্রকৃতি। এখানে উল্লেখযোগ্য মথুরা থেকে ৮ মাইল দূরে বলদেব গ্রামে বলরামের মূর্তি হিসেবে নাগ মূর্তি দেখা যায়।

দেবকীর যখন সপ্তম গর্ভের সঞ্চার হয় তখন গর্ভস্থ শিশুকে কংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য যোগমায়া গর্ভসঙ্কর্ষণ করে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করলেন, তাই তার আরেক নাম সঙ্কর্ষণ। ভাগবতে সঙ্কর্ষণের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় সঙ্কর্ষণের বাহু রজতশুভ্র, তাঁর বসনের রঙ নীল, পিঠে হাল, কানে কুণ্ডল, বাহু দুখানি অতি সুন্দর, তাঁর গলে বৈজয়ন্তীমালার শোভা; ধ্যানমন্ত্রেও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় ''ওঁ বলদেবং দ্বিবাহুঞ্চ শঙ্খকুন্দেন্দুসন্নিভম্। বামে হলায়ুধবরং দক্ষিণে মুষলং করে। হালালোলং নীলবস্ত্রং হেলাবন্তং স্মরেৎ পরম্।'' ভাগবতে সঙ্কর্ষণের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তার সঙ্গে একমাত্র হলায়ুধ ছাড়া বড়োর বলরামের কোন মিল পাওয়া যায় না। কারণ অনন্তশয্যায় নাগচ্ছত্র শোভিত শ্রীকৃষ্ণ ও অনন্তের পুরীতে অনন্তগুণের আধার সঙ্কর্ষণের একীভূত রূপ বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবকল্পনার সংমিশ্রিতরূপ—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তি। বলরামের মুখে দুধের ধারা। এই ধারার পিছনে এক কাহিনী প্রচলিত আছে। এককালে সেবাইত পূজারীর অনুপস্থিতিতে তাঁর কিশোর পুত্র, বলরাম উপবাস যাবে মনে করে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করে বলরামকে দুধ ও কাঁচা গুড় গ্রহণ করাতে ব্যর্থ হয়ে বলরামের হাতের গদা নিয়ে আত্মঘাতী হতে যায়। বালককে আত্মঘাতী হতে দেখে বিগ্রহ বালকের হাত থেকে দুধের বাটি নিয়ে দুধ পান করেন। পূজারী ফিরে এসে দেখেন বালকের প্রাণহীন দেহ পড়ে আছে আর দুধের বাটি নীচে পড়ে, দেবতার মুখ দিয়ে দুধের ধারা বইছে। তারই স্মারক চিহ্ন এই দুধের ধারা।

দেবতার এই গ্রামে প্রতিষ্ঠা বিষয়ে আর এক কাহিনী জড়িয়ে আছে। দামোদরের দেবখাল-এর উত্তরে ডিঙ্গি-দহে নৌকাডুবির শিকার এক বৃদ্ধের কাহিনী। ডিঙ্গি-দহে নৌকাডুবি হলে এক বৃদ্ধ সব হারিয়ে এই গ্রামের এক উঁচু জায়গায় আশ্রয় নেন। দিনরাত ভগবানকে ডাকতে থাকেন। এক রাতে বলরাম তাঁকে স্বপ্ন দেন। আমি বাসুদেব, দহে আছি; আমাকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা কর তোর সব অভাব পূরণ হয়ে যাবে। দেবতার প্রতিষ্ঠার এই কাহিনী হয়ত নিছক কাহিনী কিন্তু গ্রামবাসীদের কাছে—এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন—এটাই ঘটনা।

এক বিশাল প্রাঙ্গণের মধ্যে ২০ ফুট উঁচুতে মন্দির স্থাপিত। মন্দির-প্রাঙ্গণে উঠতে বিশাল চওড়া সিঁড়ি। সিঁড়ির প্রবেশ-পথে বিশাল তোরণ, মাঝখানে বাংলা চালাঘরের মত। খিলানের অলংকরণ ও দেওয়ালের কুলুঙ্গি মোগল ভাস্কর্যের ঐতিহ্যবাহী; চার দেওয়ালের কারুকার্যের ক্ষীণ রেখা পূর্ব স্মৃতির সাক্ষ্য দিচ্ছে। এই তোরণ দিয়ে বিশাল প্রাঙ্গণে ঢুকতে হয়। প্রাঙ্গণটি ৮২ × ৬৫ ফুট। প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে মন্দিরে উড়িষ্যার জগমোহনের শিল্পরীতির স্পষ্ট স্বাক্ষর। মন্দিরের ঊর্ধ্বভাগ মোট সাতটি ধাপে উঠে গেছে কিন্তু উড়িষ্যার জগমোহনের মত আমলকশিলা নাই—আছে চাল তোলা ঘন্টাকৃতি অলংকরণ। কোন এক সময় এর ওপরে ছিল কলসের অলংকরণ ও তার ওপর বিষ্ণুমন্দিরেব চক্র লাঞ্ছন—দুই-ই এখন অদৃশ্য। একটি বজ্রনিরোধক লৌহদণ্ড তার স্মৃতি বহন করছে। মন্দিরের চারপাশে পলতোলা খাঁজ কাটা—পিরামিড আকৃতি-বিশিষ্ট খাঁজে খাঁজে ভাগ করা—অলঙ্করণ বর্জিত সরল সুন্দর ও সুদৃঢ় স্থাপত্য। প্রবেশদ্বারে বাংলা চালাঘরের স্থাপত্য, মন্দিরের গায়ের চুনের আস্তরণে ঢাকা পোড়া মাটির ভাস্কর্যের সামান্য চিহ্ন দেখে মনে হয় এককালে মন্দিরগাত্র পোড়ামাটির কারুকার্য শোভিত ছিল।

এই মন্দিরের লাগোয়া ডান দিকে আর একটি লাল রঙের পঞ্চরত্ন মন্দির। কিন্তু মন্দিরে কোন বিগ্রহ নাই, মন্দির শূন্য, হয়তো কোন এক সময় কোন এক বিগ্রহ ছিল কিংবা এও হতে পারে প্রথমে বলরামের আদি কোন মূর্তি ঐ মন্দিরে অধিষ্ঠিত ছিল পরে বর্তমান মন্দির নির্মিত হলে বলরামের নবকলেবর এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়, ঐ মন্দিরের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়।

এই বিশাল মন্দিরে বলরামের বিশাল মূর্তি, বিচিত্র তার গঠন, বিচিত্র তার অলংকরণ, বিচিত্রতর তার বেশ, পূজা ও উৎসবের পদ্ধতি বিচিত্রতর। ঠাকুরের নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে। বিশেষ পূজা ও উৎসব হয় বৈশাখের অক্ষয় তৃতীয়ার দিন, ঐদিন বলরামের স্নানযাত্রা, স্নানের পর অঙ্গরাগ; তৃতীয়া থেকে ত্রয়োদশী পর্যন্ত মন্দিরের দরজা বন্ধ। নৃসিংহ চতুর্দশীর দিন বিগ্রহের চক্ষুদান উৎসব ও গাজন।

শিবের গাজন হয় সাধারণত চৈত্র সংক্রান্তিতে। ব্যতিক্রম জামালপুরের বুড়োরাজের ক্ষেত্র। বুড়োরাজের গাজন বৈশাখী পূর্ণিমায়। কারণ তিনি তো শুধু বৃদ্ধ শিব নয় তিনি রাজ অর্থাৎ ধর্মরাজও বটেন। ধর্মরাজের গাজন বৈশাখ ও কোন কোন স্থানে জ্যৈষ্ঠ মাসেও হয়। তাই বুড়োরাজের ক্ষেত্রে শিবের গাজন ও ধর্মরাজের গাজনের কালের মধ্যে একটা সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। আবার কৃষ্ণ

বলরামের গাজনের কথা কোথাও শোনা যায় না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর Discovery of Living Buddhism of Bengal নিবন্ধে মন্তব্য করেছেন ধর্মঠাকুর বৌদ্ধদেবতা! আরও অনেকের ধারণা ধর্মঠাকুরে মহাযানী বৌদ্ধ-দেবতার প্রভাব বর্তমান। বৌদ্ধধর্মের পতনের পর অনুন্নত সমাজের মধ্যে বুদ্ধদেব ধর্মঠাকুরের ছদ্মবেশে অনুপ্রবেশ করেছেন। বুদ্ধপূর্ণিমায় ধর্মঠাকুরের বিশেষ পূজাপার্বণ, গাজন অনুষ্ঠিত হওয়ায় বৌদ্ধস্তূপের Replica বর্তুলাকার ধর্মমূর্তির কল্পনা। ধর্মঠাকুরের পূজায় নৈবেদ্য ফুল দেওয়া ও পূজাচারের মধ্যে তন্ত্রযানী বৌদ্ধ প্রভাব অনুভূত হয়। এই সব লক্ষ্য করে অনেক গবেষক মনে করেন ধর্মঠাকুর ও তার পূজাচারের মধ্যে বৌদ্ধভাবনা প্রচ্ছন্ন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে বলরামের মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধদের কল্পনার সমন্বয় ঘটেছে, তা যদি হয় তাহলে বৌদ্ধপ্রভাবিত বলরামের মধ্যেও ধর্মঠাকুরের রূপ-কল্পনার ইঙ্গিত পাওযা যায়। যার ফলে ধর্মরাজ ঠাকুরের অনুকরণে বলরামেরও গাজন হয় এবং সেই গাজন হয় বুদ্ধপূর্ণিমার প্রাক্কালে অনন্ত চতুর্দশীতে। কিংবা এমনও হতে পারে বর্তমানে বলরাম যেখানে অধিষ্ঠিত আছেন সেখানে পূর্বে ধর্মঠাকুরের বেদী ছিল। আর একটা বিষয় লক্ষণীয়, ধর্মরাজের ক্ষেত্রে যেমন নিম্নশ্রেণীর মানুষ সন্ন্যাসী হয় বলরামের ক্ষেত্রেও তেমনি সন্ন্যাসী হয় সাধারণত নিম্নশ্রেণীর মানুষ। যারা সন্ন্যাসী হন তারা একাদশীতে আত্মগোত্র ত্যাগ করেন ও পুরোহিত তাঁদের বলরাম গোত্রে দীক্ষিত করেন। সন্ন্যাসীদের পরনে সাদা থান। একাদশীর দিন দিনান্তে একবার নিরামিষ আহার। দ্বাদশীর দিন হবিষ্যান্ন, ত্রয়োদশীতে ফলভোগ, চতুর্দশীতে সম্পূর্ণ উপবাস, পূর্ণিমায় সন্ন্যাসীদের পাট ভাঙ্গা। এই অনুষ্ঠানে মন্দিরের বাইরে একতল ছাদ থেকে নীচে খড়ের গাদায় লম্ফপ্রদান।

বৈশাখে চক্ষুদান উৎসব ছাড়াও ভাদ্রে অনন্ত চতুর্দশীতে, পৌষে মকর সংক্রান্তিতে ও মাঘ মাসের মাকরী সপ্তমীতে মহাপূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তবে বৈশাখ মাসের মত এত জন-সমাগম হয় না। পৌষ মাসের মকর সংক্রান্তিতে বলরামের বাহান্ন ভোগের ব্যবস্থা আছে। বৈশাখ মাসের চক্ষুদান উৎসবে ও মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত মন্দির প্রাঙ্গণে বিরাট মেলা বসে। চারপাশের গ্রাম থেকে প্রচুর লোক সমাগম হয়। গ্রামবাসীদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও যেমন বিক্রয় হয়, ছেলেদের খেলনা ও মিষ্টির দোকান আমদানী হয়। নাগরদোলা, যাত্রা, থিয়েটার এই সব আমোদপ্রমোদেরও ব্যবস্থা আছে। সমাজের দ্রুত পরিবর্তন সত্ত্বেও গ্রামবাংলার একঘেয়ে জীবনে মেলা ও উৎসব কিছু বৈচিত্র্য নিয়ে আসে। এই মেলা সামাজিক মিলনের ধারাটিকেও

অব্যাহত রাখে। মেলার মধ্যে সমাজের স্তরভিত্তিক উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য অনেক দূরীভূত হয়। উৎসবের এই দিন কয়েকের জন্য দুঃখদারিদ্র্যদীর্ণ সমস্যা-কন্টকিত গ্রাম্যজীবনে কিছুটা আনন্দের প্রলেপ পড়ে।

বড়ো বলরামের লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তির মত দেনুড় গ্রামে ও মন্তেশ্বর অঞ্চলের কোথাও কোথাও লোকেশ্বর বিষ্ণুর মূর্তি আছে। কিন্তু বড়োর লোকেশ্বর বিষ্ণু সর্পচ্ছত্রধারী চতুর্দশবাহু হলাধারী বলরাম এক প্রাচীন মূর্তির পরিণত রূপ। রাঢ় সংস্কৃতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত। "বোড়ো গ্রামের বলরাম নত কৈনু শির।"

নারিকেলডাঙ্গার জগৎগৌরী ও জেলায় মনসাপূজা—আদিমতা ও তত্ত্ব :

বর্ধমান জেলার কালনা থানার ১৩০ নং মৌজা নারিকেলডাঙ্গা। ছোট্ট গ্রাম আয়তন ৪৯.৯৮ হেক্টর, লোকসংখ্যা ১৭৮, এর মধ্যে তপসিলী সম্প্রদায়ই ৭৬, গ্রামের জনসংখ্যার ৪২.৬৯ শতাংশ। বৈঁচি স্টেশন থেকে বৈদ্যপুর বা কালনা বাসে বৈদ্যপুরের রামকৃষ্ণ উচ্চ বিদ্যালয়ের কাছে রথতলায় নেমে দক্ষিণ মুখে সামান্য কিছু দূর গেলেই নারিকেলডাঙ্গা। গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জগৎগৌরী। আষাঢ় মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে অর্থাৎ দশহরার পর প্রথম পঞ্চমী তিথিতে জগৎগৌরী পূজা ও ঝাঁপান। ঠিক একই সময়েই মেমারী থানা ৭নং মণ্ডলগ্রামেও জগৎগৌরী পূজা ও ঝাঁপান হয়। দেবী অতি প্রাচীন। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে নারিকেলডাঙ্গায় বেহুলা কর্তৃক মনসাপূজার উল্লেখ আছে। নিকটে ঝাঁপানতলার পাশ দিয়েই বেহুলা নদী প্রবাহিত।

নারিকেলডাঙ্গার জগৎগৌরী মূর্তির মধ্যে বিশেষ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এ মূর্তি সাধারণ মনসা মূর্তি নয়। নারিকেলডাঙ্গার জগৎগৌরী জগদ্ধাত্রী ও মনসার মিশ্রিত রূপকল্পনায় বিধৃত। মূর্তিটি পাল আমলের ৭ম/৮ম শতকের বলে অনুমান করা হয়। মূর্তিটি অতি মনোরম। মূর্তিটি কষ্টিপাথরে তৈরী। দেবী সিংহের উপর উপবিষ্টা। সিংহের পৃষ্ঠে পদ্ম। পদ্মের উপর দেবী আসীনা। দেবী শিরদাঁড়া সোজা করে উপবিষ্টা। ডান পা ঝোলান, বাঁ পায়ের হাঁটু মোড়া। বামক্রোড়ে একটি শিশু। শিশুটিকে গণেশ বলে মনে করা হয়। এখানে গণেশজননী দুর্গার রূপ-কল্পনা। সিংহবাহিনী মূর্তির মধ্যে দুর্গার বা জগদ্ধাত্রীর রূপকল্পনা বিধৃত। দেবীব মাথার ওপর অষ্টনাগ ফণা বিস্তার করে ছত্রধারীরূপে ক্ষোদিত। দেবীর পদতলে ছিন্নমুণ্ডটি কলির ছিন্নমুণ্ড বলে প্রবাদ। দেবী কলিনাশিনী। এই মূর্তির সঙ্গে মণ্ডলগ্রামের জগৎগৌরী মূর্তির রূপকল্পনার প্রভেদ লক্ষ্য করার মত। মণ্ডলগ্রামের জগৎগৌরী কষ্টিপাথরে নির্মিত। দেবী চতুর্ভুজা শিরে অষ্ট নাগচ্ছত্র. দুটি পদ হাঁটুতে মুড়ে ঝোলান। আবার এই থানার উপলতি

গ্রামের বেহুলা নদীর তীরে যে বেহুলা মন্দির আছে, সেখানে যে মনসার মূর্তি আছে সেটি আরও অদ্ভুত; দেবীর মুখমণ্ডল সিঁদুর লিপ্ত—তিনটি মূর্তি আছে মনসা, বেহুলা ও নেতা ধোপানী। মনসার আদি কবি মনসার যে মূর্তিরূপ বর্ণনা করেছেন তার সঙ্গে আবার এসব কোন মূর্তির মিল নাই।

বিচিত্র নাগ করে দেবী গলায় সুতলি।
শ্বেতনাগে করে দেবী বুকের কাঁচুলি।
অনন্ত নারায়ণে পদ্মার মাথার মণি।
বেত নাগে করে দেবী কাঁকালি কাছনি ॥
সোনা নাগে দেবী করিলা চাকী বলি।
মকর লাগে করে দেবী পায়ের পাসুলি ॥
অমৃত নঞান এড়ি দেবী বিষ নঞানে চায়।
চন্দ্র সূর্য্য গিয়া তবে আভেতে লুকায়।
দর্পণ হাতে করি দেবী বেশ বানায়।
মনসার চরণে লাচাড়ী হরি দত্ত গায় ॥

যে ধ্যান-মন্ত্রে মনসার পূজা হয় সেখানেও অন্য মূর্তি কল্পনা আভাসিতা। ওঁ দেবীমম্বামহীনাং শশধর বদনাং চারুকান্তিং বদন্যাং হংসারূঢ়াম্ উদারাম-অরুণিত বসনাং সেবিতাং সিদ্ধি কামৈঃ। স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কনকমনিগনৈর্নাগরত্নৈর-নেকৈর্ব্বন্দে অহং সাষ্টনাগামুরুকুচযুগলাম্ ভোগিনীং কামরূপাম্।

নারিকেলডাঙ্গার জগৎগৌরী মণ্ডলগ্রামের জগৎগৌরী কিংবা উপলতির মনসার রূপকল্পনায় কারো সঙ্গে কারো মিল নাই। প্রত্যেকটিই শিল্পীর নিজস্ব কল্পনাপ্রসূত। তবে মণ্ডলগ্রাম ও নারিকেলডাঙ্গার জগৎগৌরীর সঙ্গে ধ্যানের সাষ্টনাগামুরুকুচযুগলাম্ এই অংশের মিল দেখা যায়।

অবশ্য নারিকেলডাঙ্গার জগৎগৌরীর ক্ষেত্র পৃথক। কারণ, তিনি তো শুধু মনসা নন, তিনি জগদ্ধাত্রী ও মনসার মিলিত রূপ। তিনি হরগৌরীর অর্ধনারীশ্বর রূপের মত "পদ্মাগৌরী ঘুচে হলো জগৎগৌরী মা।" তিনি পরমা সুন্দরী, তাই জগদ্ধাত্রী। আর সে কারণে জগৎগৌরী পূজায় প্রথমে জগদ্ধাত্রী ধ্যানে পূজা হয়, পরে মনসার ধ্যানে। জগদ্ধাত্রীজ্ঞানে সিংহস্কন্ধাধিসংরূঢ়াং নানালঙ্কার ভূষিতাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্...রত্নদ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে। প্রফুল্ল-কমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাম্ ভবগেহিনীম্ ধ্যানে প্রথম পূজা একটা বিষয় লক্ষ্য করার মত। কানা হরি দত্তের মনসার রূপকল্পনায় যেমন আছে, "বিচিত্র নাগে করে দেবী গলায় সুতলি" তেমনি জগদ্ধাত্রীর ধ্যানে দেখি তিনি "নাগ যজ্ঞোপবীতিনীম্"।

প্রসিদ্ধি আছে জগৎগৌরী পূর্বে বৈদ্যপুরের বৈদ্যরাজ কিঙ্করমাধব সেনের শ্মশানের অধিষ্ঠাত্রী শ্মশানকালী ছিলেন। ঝাঁপানতলার পাশেই এক শ্মশান আছে। এখানে কিঙ্করমাধব সেনের বধ্যভূমি ছিল। বহু দিন আগে এখানে একটি কূপ খননের সময় মাটির দশ হাত নীচে নরকঙ্কালের টুকরা ও শ্মশানের ছাই পাওয়া গেছে। কোন এক সময় কালাপাহাড়ের আক্রমণের আশঙ্কায় এই বিধর্মীর হাত থেকে দেবীকে রক্ষা করবার জন্য দেবীকে বেহুলার জলে নিক্ষেপ করা হয়। সুলেমান করনানীর পুত্র বায়াজিদের সঙ্গে ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পুরীর যাত্রাপথে দেবদেবীর ধ্বংসযজ্ঞে মত্ত হয়েছিলেন কালাপাহাড়। এখানকার গ্রামবাসীদের ধারণা মূর্তিটি ৭/৮ শত বৎসরের প্রাচীন। কিঙ্করমাধবসেন গৌড়াধিপতি সেন বংশোদ্ভূত বলে অনেকের অনুমান। কিন্তু কিঙ্করমাধবসেন যে সেন বংশোদ্ভূত ছিলেন ও তিনি যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি এর সমর্থনে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ৩০/৭/৯৪ তারিখের পাক্ষিক 'দেশ' পত্রিকায় মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের "পশ্চিম হিমালয়ে সেনবংশ" প্রবন্ধে সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণসেনের অধঃস্তন ঊর্নবিংশ (১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ) উত্তর পুরুষের একটি তালিকা সন্নিবেশিত আছে। কিন্তু সে তালিকায় কিঙ্করমাধবসেনের নাম নাই। অবশ্য এই তালিকায় লক্ষ্মণ সেনের চতুর্থ পুরুষ এক মাধবসেন বা মধুসেনের নাম পাওয়া যায়।

পঞ্চরক্ষা নামক বৌদ্ধ গ্রন্থ থেকে জানা যায় গ্রন্থটি ১২১১ শকে (১২৮৯ খ্রীষ্টাব্দ) পরমেশ্বর পরমসৌগত পরম মহারাধিরাজ গৌড়েশ্বর মধুসেনের রাজ্যে লিখিত হয়েছিল। এই মধুসেন যদি মাধবসেন বা কিঙ্করমাধব সেন হন, তাহলে সে সময় গৌড়েশ্বর ছিলেন বুখরা খান বা তাঁর ২য় পুত্র রুকনুদ্দিন কাইকায়ুস ও তিনি সপ্তগ্রাম থেকে বর্ধমানভুক্তি শাসন করতেন। বুখরা খানের শাসনকালে শিথিল শাসনব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে বর্ধমান ও রাঢ়ের স্থানীয় সামন্তগণ প্রায় স্বাধীনভাবেই এই অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে মধুসেন বা মাধবসেন কিংবা কিঙ্করমাধব সেন যদি সেন বংশোদ্ভব হন তাহলে তিনি গৌড়েশ্বরের অধীনে এক সামন্তরাজা হতে পারেন। তাঁকে পঞ্চরক্ষার লেখকের পোষ্টা হিসেবে গৌরবে গৌড়েশ্বর বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকতে পারে। দীপক দাস তাঁর কালনার ইতিবৃত্ত গ্রন্থে বৈদ্যপুরের বৈদ্য জমিদার কিঙ্করমাধবসেনের উল্লেখ করেছেন। ইনি হুগলী ফৌজদারের রাজস্ব আদায়কারী ছিলেন। পরে তিনি মুর্শিদকুলির কাছ থেকে জমিদারী পান। ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খান অনেক হিন্দু জমিদার সৃষ্টি করেন। কিন্তু কিঙ্করমাধবসেনের নাম পাচ্ছি না। দীপক দাসের তথ্য বিশ্বাস করতে হলে জগৎগৌরী সম্পর্কিত অন্য সব কাহিনীর যৌক্তিকতা থাকে না।

এখন বিচার্য এই মাধবসেন বা মধুসেনই কি কিঙ্করমাধবসেন? জাতীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক শাখার হীরকজয়ন্তী সম্মেলনের সুভ্যেনিরে বৈদ্যপুরে সামন্তরাজা কিঙ্করমাধবসেনের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে—তাতে দেখা যায় বৈদ্যপুরের কিংবদন্তীর রাজা কিঙ্করমাধবসেন সম্ভবত সেন বংশোদ্ভব ছিলেন। তিনি সেন রাজাদের মত নিজেকে ব্রাহ্ম ক্ষত্রিয় বলে বর্ণনা করেছেন। বৈদ্য পুরের অদূরে বল্লালদীঘি নামে এক দীঘি সেনবংশের স্মৃতি বহন করছে। কিঙ্করমাধবসেন যদি সত্যই সেন বংশোদ্ভব হন; তাহলে অনুমিত হয় তাঁর প্রকৃত নাম মাধবসেন, তিনি নিজেকে শ্মশানকালীর কিঙ্কর (দাস) হিসেবে দেবীর প্রতি ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে নিজের নামের আগে কিঙ্কর এই বিশেষণ যুক্ত করেন। লক্ষ্মণসেনের চতুর্থ পুরুষ হলে তাঁর রাজত্বকাল ত্রয়োদশ শতকে হতে পারে ও সে ক্ষেত্রে জগৎগৌরীর ৭/৮ শত বৎসরের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। সে ক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যুর বহু পরে তাঁরই বংশের কেউ কালাপাহাড়ের ভয়ে দেবীকে বেহুলাতে নিক্ষেপ করে থাকতে পারেন।

ক্ষেমানন্দের 'জগতীমঙ্গলে' বর্ণনা আছে বেহুলা নারিকেলডাঙ্গায় দেবী মনসার মৃন্ময়ী মূর্তি পূজা করেছিলেন। ক্ষেমানন্দের কাব্যে বারা খাঁর উল্লেখ আছে, সেই হেতু তাঁর কাব্য সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত হয় বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। কাজেই বেহুলার পূজার সময় কিঙ্করমাধব সেনের বিগ্রহ বেহুলার নদীতে। সেক্ষেত্রে বেহুলার পক্ষে মনসার মৃন্ময়ী মূর্তি পূজা করাই স্বাভাবিক ছিল। তারপর কোন সময় বেহুলা নদী থেকে কিঙ্করমাধব সেনের আরাধ্য দেবী শ্মশানকালীর বিগ্রহ নদী থেকে উদ্ধার করে মনসা ও জগদ্ধাত্রীর মিলিত রূপে জগৎগৌরীর পূজা প্রচলিত হয়।

জগৎগৌরীর মন্দিরের পশ্চাতে বেহুলা নদীর মূল পূর্বখাত ও দক্ষিণমুখী খাতের সংযোগস্থলে বাঁকের মুখে এক ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয়; এই স্থানেই কোন এক জেলের জালে দেবীর বিগ্রহ ওঠে। কিংবদন্তী আছে বৈদ্যপুরের মেজ নন্দীর বাড়ীতে এক সাধিকা ছিলেন; তিনি স্বপ্নাদেশ পেয়ে জেলের বাড়ী থেকে দেবীর বিগ্রহ নিয়ে এসে স্বগৃহে স্থাপন করেন। কয়েক বৎসর পর দেবীর পুনরায় স্বপ্নাদেশ পেয়ে নারিকেলডাঙ্গার এক ব্রাহ্মণের হাতে অর্পণ করেন। দেবী তখন কুঁড়েঘরে পূজিতা হতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের বংশলোপ পায়, তখন তাঁর ভাগিনেয় পূর্বস্থলীর গৌঠপাড়া-গ্রাম নিবাসী কৈলাস বন্দ্যোপাধ্যায় মামার দেবীপূজার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র সাধক দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাধনার দ্বারা দেবীকে জাগ্রত করেন, সেটা ১৮৯৩ সালের কথা। তাঁর সাধনায় জাগ্রত দেবীর খ্যাতি

নিকটবর্তী সমস্ত গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। চারদিক থেকে দেবীর মানতের পূজা দিতে আসে। সেবাইতের বেশ আয় হতে থাকে। শেষে এক কলু দেবীর মন্দির ও প্রাসাদ নির্মাণ করে দেন। তার ফলে দেবী সাধারণ্যে কলুর ঠাকুর বলে পরিচিত হন। জেলের জালে প্রথম উঠেছিলেন বলে তাঁকে জেলের ঠাকুরও বলে। দুর্গাদাস-বাবুর মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্রগণ দেবীর সেবা চালান।

ফাল্গুন মাস থেকে আষাঢ় মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমীতে দেবীর মহাপূজা ও ঝাঁপানের সময় পর্যন্ত প্রতি শুক্লপক্ষের সোম কিংবা শুক্রবার দেবী দোলায় চেপে ভক্তদের কাঁধে গ্রাম পরিক্রমায় বের হন। যে গ্রামে দেবীকে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে পরের দিন মঙ্গল বা শনিবার দেবীর পূজা ও বলিদান হয়। স্থানীয় রামনগরের 'র' পূজা একটু অন্যরকম। এখানে দেবীর মাষকলাই এর খিচুড়ি ও শোলমাছের ঝোল ভোগ হয়। পরিক্রমা শেষে দেবী স্বমন্দিরে স্থাপিতা হন ও সেখানে দশহরার পরের পঞ্চমীতে আষাঢ় মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমীতে দেবীর মহাপূজা, উৎসব ও ঝাঁপান হয়। অবশ্য দেবীর প্রথম ঝাঁপান হয় মায়ের পরিক্রমা কালে বৈশাখ মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে সিঙ্গেরকোন গ্রামে। এটি নারিকেল-ডাঙ্গার ঝাঁপানের ক্ষুদ্র সংস্করণ।

নারিকেলডাঙ্গায় মহাপূজার পূর্বদিন দেবীকে রাজবেশ পরিয়ে সাড়ম্বরে দেবীর অধিবাস হয়। এই উপলক্ষে নারিকেলডাঙ্গা, বৈদ্যপুর, রামনগর, আটকেটিয়া প্রভৃতি গ্রামে ডগর বাজিয়ে নাচঘর বের হয়। এর নাম সয়লা উৎসব। একটা গরুর গাড়ীতে বাঁশ, বাখারি, কাপড় দিয়ে ঘরের মত তৈরী হয়। স্থানীয় যুবকেরা ও নিম্নশ্রেণীর পুরুষ কেহ নারীবেশে কেহ পুরুষবেশে ঘরে ঘরে নাচঘর নিয়ে যায় আর ডগর বাজিয়ে উদ্দাম নৃত্য করে; সঙ্গে চলে গান। গানগুলি ঠিক ভাদুগানের মত, সমসাময়িক ঘটনা, রাজনীতি, রেশন ব্যবস্থা, যুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে গান বেঁধে নাচের তালে তালে সেই সব ব্যঙ্গাত্মক গান গায়। এ গান জেলার লোকসংগীতের এক অনন্য ফসল। ঘরে ঘরে ধামায় করে চাল, টাকা আদায় করে, ঝাঁপানের শেষে নিজেদের মধ্যে ভোজ বা ফিষ্ট করবার জন্য।

ঝাঁপানের দিন মায়ের মন্দিরে দেবীর পূজা, ছাগবলি ও হোম সম্পন্ন হয়। তারপর দেবীকে চতুর্দোলায় করে ঝাঁপানতলায় মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বেদীতে দেবীকে স্থাপন করে সারাদিনব্যাপী পূজা ও বলিদান চলে। তিনজন পণ্ডিত চণ্ডীপাঠ করেন। সহস্রাধিক না হলেও কয়েক শত তো বটেই পাঁঠা মেষ বলিদান হয়। আগে মহিষ বলি প্রচলিত ছিল এখন কেবল ছাগ ও মেষই চলে, তবে হাঁস বা মুরগী বলি হয় না। যাদের হাঁস বা মুরগী মানত থাকে তারা মুরগী

বা হাঁস এনে মায়ের মন্দিরের সামনে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। সাঁওতাল বাউড়ীরা শূকরও আনে, তারা মন্দিরের পিছনে বলি দেয়। হিন্দু-মুসলমান সকলে সমান ভাবে এ পূজায় অংশ নেয়।

ঝাঁপান উপলক্ষে ঝাঁপানতলায় বিরাট মেলা বসে। চারপাশের গ্রাম থেকে হাজার হাজার লোক এ মেলায় জড় হয়। এ মেলার বৈশিষ্ট্য মাহেশের রথের মেলার মত আম, আনারস, কাঁঠাল, কলা, নারিকেল, শাল, মহুয়া, কাজু প্রভৃতি গাছের চারা বিক্রয় হয়। গ্রামবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত বৃক্ষরোপণ উৎসবের মহড়া। তাছাড়া টুগরী টুগরী আম, আনারস, কাঁঠাল প্রভৃতি ফলও বিক্রয়ের জন্য আসে। মিষ্টির দোকান, হাঁড়ি-কলসী, খোলা-খাপুরির দোকান এসব তো আছেই। ছেলেদের খেলনা ও আমোদ-প্রমোদের নানা উপকরণের সম্ভার নিয়ে শহর থেকে এই মেলায় আসে দু'পয়সা উপার্জনের জন্য। ঠাকুর সাজানো বেদীর মত বাঁশ বাখারি দিয়ে ধাপ সিঁড়িসহ উচ্চ মঞ্চ তৈরী হয়। এই মঞ্চে পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন করে নানা পালা অনুসারে যেমন রাইরাজা, পুতনাবধ, কালীয়দমন, হরধনুভঙ্গ, মহিষাসুর বধ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ এবং সামাজিক নানারূপ ব্যঙ্গাত্মক ঘটনার মূর্ত রূপ মাটির পুতুলের সাহায্যে তুলে ধরা হয়। আগে কদমার থাকের মত পাক করা চিনির বিরাট আকারের ছাঁচে ঢালা মন্দিরের চুড়ো, কলস, পিতলের গামলায় সাজিয়ে মেলায় আনা হত। দেবীর কাছে এগুলি নিবেদন করে প্রদর্শনীর জন্য মঞ্চে রাখা হত। পূজার ও উৎসবের পরিচালনায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা প্রদর্শনীর ছবির শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করে শিল্পীকে পুরস্কৃত করেন। মূর্তিগুলি লোক-শিল্পের যেমন এক মডেল তেমনি লোকশিক্ষারও একটা অঙ্গ। তবে আজকাল এসব প্রায় উঠে যেতে বসেছে। এই রকম মনসার ঝাপান উপলক্ষে জেলার অনেক স্থানেই ঝাঁপানের অনুষ্ঠান হয়। ঝাঁপানের বিশেষ আকর্ষণ মাল বা সাপুড়েদের জ্যান্ত সাপ খেলানো। মনসার ভাসান গানও এই উপলক্ষে অন্যতম আকর্ষণ।

এই প্রসঙ্গে এ-জেলায় মনসাপূজার আদিমতা, পূজার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও মনসার বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা মনে হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসা। মনসাপূজা পৃথিবীর আদিকাল থেকেই চলে আসছে। ভয় থেকে হয় ভক্তির উদ্ভব; এই ভয় থেকেই প্রত্যেক সমাজে উপাসনা, প্রার্থনা ও পূজার সূচনা হয়েছিল বলেই পণ্ডিতদের ধারণা। মনসাপূজার পিছনেও মানুষের মনে সর্পভয় বিশেষভাবে কাজ করেছিল। মহেঞ্জোদারোর শিলমোহরে প্রোটো শিবের প্রতীক সর্প মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। আর্যদের আগমনের পর প্রথম বেদ ঋগ্‌বেদে সর্পপূজার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। তবে পরবর্তী বৈদিক স্তোত্র

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ইন্দ্র ও দেবগণের শত্রু বৃত্রকে অহি ও সর্পবংশীয় হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। বৌধায়ন সূত্রে সর্পপূজার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

এ জেলার মানুষের প্রচলিত বিশ্বাস মনসা শিবের কন্যা; শিব ও সর্প পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। শিবের অলঙ্কারই সর্প। পৌরাণিক উপাখ্যানে মহাপ্রলয়-কালে নারায়ণ সর্পছত্র ধারী অনন্তনাগ রচিত শয্যায় শায়িত। কৃষ্ণের কালীয়দমন এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। বৌদ্ধধর্মেব সঙ্গে নাগের যোগ ছিল। বৌদ্ধ মহাযানী জাঙ্গুলী হচ্ছেন পরিবর্তিত রূপে মা মনসা।

রাঢ়বঙ্গে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে জৈনধর্মের জোয়ার আসে। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে পার্শ্বনাথের সর্পভূষিত মূর্তি, শালতোড়া চুয়াবেড়িয়াতে বিহারীনাথ সর্প-দেবতার পূজা প্রচলিত ছিল, পার্শ্বনাথের শাসন যক্ষিণী পদ্মাদেবী সর্পবাহনা ও সর্পভূষিতা। তিনি মনসারূপেই পূজা পান। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বিষ্ণুপুর, শালতোড়া ঊনবিংশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত দক্ষিণ রাঢ় ও বর্ধমানভুক্তি বলেই পরিচিত ছিল। এই সমস্ত তথ্যই রাঢ়বঙ্গে মনসার প্রাচীনতা প্রমাণ করে।

তা সত্ত্বেও মনসা কখনও পৌরাণিক ধ্রুবপদী দেবতা রূপে গণ্য হন নাই। লৌকিক দেবতারূপেই জেলায় পূজা পেয়ে আসছেন। মনসাপূজা অনেক স্থানেই নিম্নবর্গদেরই পূজা। তুর্কী, পাঠান, মোগল শাসনকালে মানুষ আত্মশক্তিতে আস্থাহীন হয়ে স্বধর্ম রক্ষায় অপারগ হয়। বরাভয়ের প্রত্যাশায় তারা নিজেদের সমাজের আর্য দেবদেবীর বাইরে অনভিজাত সাধারণ মানুষের লৌকিক দেবদেবীর শরণ নিলেন। ভয়ঙ্করী মনসা পরিচিতা হলেন শিবতনয়া রূপে; উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণ সববর্ণের মানুষ এক সঙ্গে মনে করেন অতিমানবিক শক্তিধারিণী এই দেবী পরিতুষ্ট হলে ভক্তের সব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। ধীরে ধীরে মনসা নিম্নবর্ণের মানুষের সঙ্গে উচ্চবর্ণের সমাজে পূজিতা হয়ে থাকেন এবং এখনও হয়ে আসছেন।

নদীমাতৃক এই দেশে সর্পপূজার মাধ্যমে সর্পভয় নিবারণের জন্য মনসা পূজার প্রচলন। সর্পভয় নিবারণের জন্য নারিকেলডাঙ্গায় জগৎগৌরীর কাছে আজও মানত করা হয়। সাধারণের ধারণা দেবী কুপিতা হলে সর্পের উপদ্রব বাড়ে।

মনসাপূজা, বৃক্ষপূজা ও টোটেম পূজার পরিণতি। শিব কর্তৃক বিল্ববৃক্ষ আশ্লিষ্ট হবার ফলে মনসার জন্ম। এই গল্পের মধ্যে বৃক্ষপূজারই সমর্থন মেলে। দেবীর আর এক নাম কেতকা বা কেয়া ও পদ্মা। মেদিনীপুরে ও বাঁকুড়ায় মনসা শাকম্ভরী রূপেও পূজিতা হন। আদ্যাশক্তির অন্য নাম শাকম্ভরী। শতবর্ষ অনাবৃষ্টি

হলে দেবী নিজের দেহ থেকে বীজ উৎপন্ন করে জীবনধারক শাক দ্বারা পৃথিবীর লোককে রক্ষা করেছিলেন। তাই তিনি শাকম্ভরী।

এ জেলায় মনসাপুজার আগে চোদ্দ শাক খাওয়ার ও চোদ্দ শাককে কচু পাতায় মুড়ে কাটার রীতি প্রচলিত আছে। মনসাদেবী আরো কত নামেই না পরিচিতা। তিনি শিবের শিষ্যা বলে শৈবা, বিষ্ণুভক্তা বলে বৈষ্ণবী, জনমেজয়ের যজ্ঞে নাগদের প্রাণরক্ষা করেছিলেন বলে নাগেশ্বরী, বিষহরণকারিণী বলে বিষহরী, মহাদেবের কাছ থেকে সিদ্ধযোগ পেয়েছিলেন বলে সিদ্ধযোগিনী, শস্যের অধিষ্ঠাত্রী বলে শাকম্ভরী, পদ্মাসীনা বলে পদ্মা, কেতকীপ্রিয়া তাই কেতকা। সর্বোপরি শিবের মানসকন্যা তাই মনসা।

মহাযানী বৌদ্ধদের জাঙ্গুলী যদি মনসার পূর্বসূত্র হয় তাহলে জাঙ্গুলীর উৎস 'জঙ্গল'-ও বৃক্ষ উপাসনার ইঙ্গিত দেয়। মনসা শুধু সর্পবাহনা নন তিনি হংসবাহনা, গজবাহনা আবার নারিকেলডাঙ্গার মত কোথাও সিংহবাহিনী। চ্যাঙ মাছ মনসা পূজার উপকরণ হিসেবে কোথাও কোথাও ব্যবহৃত হয়। শিবভক্ত চন্দ্রধরের কাছে মনসা "চ্যাঙমুড়ি কানি"। এই সব নামের মনসাপূজার মধ্যে বৃক্ষপূজা ও টোটেমপূজার দ্যোতনা বর্তমান।

শিবের মানসকন্যা হিসেবে মনসা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সঙ্গে সম্পর্কিত বলে অনেকে মনে করেন। মনসাকে মহাজ্ঞানের অধিকারী হিসেবে মনসা বিদ্যাদেবী সরস্বতীর সঙ্গে সম্পর্কিত; সরস্বতীর বাহন হংস, আবার মনসার বাহনও হংস। লৌকিক সংস্কারে বাস্তুনাগ সম্পদরক্ষক। সাত রাজার ধন একটি মানিক এই সর্পমণির কল্পনাও গুপ্তধনের প্রহরী হিসেবে মনসা লক্ষ্মীর সঙ্গেও সম্পর্কিত। লক্ষ্মীর নাম কমলা আবার মনসাও পদ্মা নামে অভিহিতা। গজলক্ষ্মীর বাহন গজ, গজবাহিনী মনসারও উল্লেখ পাওয়া যায়।

সাপের সঙ্গে প্রজননেরও একটা সম্পর্ক আছে লৌকিক সংস্কারে। রাত্রে সাপের স্বপ্ন দেখলে সন্তান সম্ভাবনা ঘটে। সাপের যৌনমিলন (শঙ্খ লাগা) দেখাকে দর্শকের সৌভাগ্যের দ্যোতক বলে; এ ও লৌকিক সংস্কার। মনসার কত রূপ মনসা জাঙ্গুলী, মনসা সরস্বতী, মনসা লক্ষ্মী, মনসা বৃক্ষদেবতা, প্রজননের অধিষ্ঠাত্রীদেবী মনসা ষষ্ঠী। মনসা জেলার বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন নামে পূজিতা হন। পাঁড়ুই গ্রামে তিনি পাণ্ডুলক্ষ্মী; মূল্যে গ্রামে ও দামোদর পাড়ায় মনসা মনুই; মণ্ডলগ্রাম, নারিকেলডাঙ্গা, সিঙ্গের কোণে ও চোৎখণ্ডে জগৎগৌরী; বামুনাড়া গ্রামে বামরী, উচিতপুরে বিষহরি; কাঁকোড়া গ্রামে কঙ্কনাগ; পোষলায় ঝাঁকলাই।

একটা বিষয় লক্ষ্য করবার মত; বর্ধমানের পশ্চিমে শিল্পাঞ্চল ও খনি এলাকায় মনসাপূজার খুব বেশী প্রচলন নাই, যদিও এই অঞ্চল জঙ্গলমহল ছিল।

কালনা থানাতেই মনসাপূজার বেশী প্রচলন। কালনা, কাটোয়া, বর্ধমান, মঙ্গলকোট, মন্তেশ্বর, মেমারী, জামালপুর থানাতেই পূজা ও উৎসবের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে মনসার ঝাপান হয়। কালনা থানার অকাল পৌষ; বৈদ্যপুর, নারিকেলডাঙ্গায় ও উদয়পুরে আষাঢ়ে; মাতিলপাড়ায় জ্যৈষ্ঠে; কুলটি গ্রাম ও বড়বাহারে আশ্বিনে; কোয়ালডাঙ্গায় শ্রাবণে; মণ্ডলগ্রামে আষাঢ়ে; হরকোলা, কেজা, সাহানুই, চোৎখণ্ডে শ্রাবণে ঝাঁপান; গলসী থানার কসবায় পৌষ মাসে বেহুলার ভাসান; ভাতার থানার কামারপাড়া ও কুরুম্বায় শ্রাবণে দশহরার পর চতুর্থ পঞ্চমীতে ও জামালপুর থানার নবগ্রামে আষাঢ় মাসে ঝাপান হয়। এই ঝাঁপান উপলক্ষে নানা পসরা সাজিয়ে বহু দোকান বসে। নানা আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা তো থাকেই, তাছাড়া সব চেয়ে বড় আকর্ষণ মালেদের জ্যান্ত সাপ খেলানো। সাপুড়েরা সাপের ঝাঁপি নিয়ে গরুর গাড়ীর ওপর চড়ে ঝাঁপি থেকে জ্যান্ত সাপ বার করে সাপকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তার ক্রোধকে জাগ্রত করে। সাপ তখন ফণা বিস্তার করে ছোবল মারতে উদ্যত হয়। সাপকে গলায় জড়িয়ে সাপের চুম খেয়ে এমন কি সাপকে মুখের ভেতর পুরে নানা রকম দুঃসাহসিক খেলা দেখায়। খুব সম্ভব সাপের বিষ আগে থাকতেই বের করে নেওয়া হয়, কারণ এই বিষ বিক্রয় সাপুড়েদের একটা লাভজনক ব্যবসা। আবার গাড়ী থেকে নেমে গলায় সাপ জড়িয়ে দর্শকদের কাছে পয়সা আদায় করা নানারকম জড়িবুটি দিয়েও পয়সা আদায় করা, এদের আর এক কৌশল। ডঃ পল্লব সেনগুপ্তের মতে "এই খেলা তাদের কাছে পুরুষকার প্রতিষ্ঠার প্রতীক, দেবতার কোপকে প্রতিহত করার দ্যোতক। যথা অর্থে তাই তাঁরা বেহুলার প্র-সন্ততি, চাঁদের উত্তর পুরুষ। আর কোন্ পরবের উৎসে এমন মর্ত্য সীমাচুর্ণী অমর মহিমার সন্ধান মেলে না শ্রাবণী সংক্রান্তিতে মনসাপূজায় এই ঝাঁপানের খেলা ছাড়া?"

মনসাপূজা উপলক্ষে কত লোকসাহিত্য, লোকশিল্প ও লোকসঙ্গীতের সৃষ্টি হয়েছে। কত কবিকে লোকগাথা রচনায় প্রেরণা যুগিয়েছে মা মনসা। কানা হরিদত্ত থেকে শুরু করে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব, দ্বিজ বংশীদাস, সকলেই মা মনসার মহিমা কীর্তন করে তাঁদের অমর কাব্য রচনা করেছেন। 'মনসামঙ্গল কাব্য বাংলার চিরন্তন অশ্রুনির্ঝর বেদনাবিধুর গাঙুর নদীর জল ভরে গিয়েছে যুগ-যুগান্তের কান্নাবারিতে।' "ভাসানের গান শুনে কতবার ঘর আর খড় গেল ভেসে"—গেয়েছেন জীবনানন্দ। করুণতম কাহিনীর অভিব্যক্তিই মানুষের মধুরতম সঙ্গীত। মনসামঙ্গলে শোকার্ত মাতৃহৃদয়ের হাহাকারের সঙ্গে যখন সদ্য পতিহারা বেহুলার শোকখিন্ন কণ্ঠে শুনি—

"এ নব যৌবন আমার গেল ছারখার। কপাল চিরিয়া দেখি কিবা আছে আর," তখনই কাব্যখানি মানুষের মর্ম্মস্পর্শী মধুরতম সঙ্গীতে পরিণত হয়।

শুধু মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতেই নয়, তন্ত্রের প্রভাব ও সর্প চিকিৎসকের (ওঝার) নানা মন্ত্রেও তুকতাকের মধ্যেও মনসার প্রভাব বর্তমান। চাঁদ সদাগর তাঁর ইষ্টদেবতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন মহাজ্ঞান, যার দ্বারা তিনি মনসার শক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পেরেছিলেন। ওঝার সর্প চিকিৎসার মধ্যেও এই মহাজ্ঞানের উল্লেখ পাই—

কুজ্ঞান, দুর্জ্জ্ঞান আর মহাজ্ঞান।
ফুৎকারে সব করি খান খান ॥
কার আজ্ঞা, সিদ্ধি গুরুর পাও।
যথা ইচ্ছা তথায় যাও ॥

এই সব মন্ত্রে আবার ডাকিনী যোগিনী এবং চণ্ডীরও দোহাই দেওয়া হয়—

ডাকিনী সাপিনী আপা কাকিনী আর।
অমুকের অঙ্গের বিষ ছাড় শীঘ্র ছাড় ॥

কিংবা

খোলা লোলা সাত খোলা।
তুমি মা চণ্ডীর পোলা ॥
আইতে কাটুম্ যাইতে কাটুম।
অমুকের অঙ্গের বিষ বিনাশ করুম ॥

সত্য থাক আর নাই থাক ওঝাদের অদ্ভুত অর্থহীন এই সব মন্ত্রে গবেষকরা কিসের সন্ধান পাবেন জানি না, তবে মন্ত্রগুলি যে কৌতূহলোদ্দীপক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আশ্বার কথা অধিকাংশ সাপেরই বিষ নাই। তাই ওঝাদের তুকতাক এখনও আছে আর মানুষের কুসংস্কার মানুষের বিশ্বাস যতদিন থাকবে ততদিন ওঝাদেরও বুজরুকি থাকবে।

মৈমনসিংহগীতিকা ও পূর্ববঙ্গগীতিকাতে মনসা এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে—

"শায়ন মাসেতে লোকে পূজে মনসা।"

কিসের ঢাক কিসের ঢোল কিসের বাদ্য বাজে।
শায়ান্যা সংক্রান্তে রাজা মনসারে পূজে॥
শায়ন মাসেতে দূতি পূজিলা মনসা।
সেইতে না পুরিল গো আমার মনের আশা॥

(মৈমনসিংহগীতিকা)

শাওন বাওনা মাস আখাল পাখাল পানি।
মনসা পূজিতে কন্যা হইল উদ্‌যোগিনী॥
কান্দিয়া বসাইল ঘট আপনার গিরে।
প্রাণপতি ঘরে আইসে মনসার বরে॥

(পূর্ববঙ্গগীতিকা)

মনসার ভাসান লোকসঙ্গীতে আপন স্থানে করে নিয়েছে।

কালের অগ্রগতির সঙ্গে বিজ্ঞান প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতির সঙ্গে তাল রেখে আমরা আধুনিক হয়ে উঠেছি। সব কিছুই যুক্তি তর্কে বিচার করে তবে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করছি, কিন্তু বাস্তুসাপকে এখনও ভক্তি করি, সাপের স্বপ্ন দেখলে সন্তান সম্ভাবনার আতঙ্কে ভুগি; পঞ্চমী, দশহরা উপলক্ষে এখনও পুঁই, ডিম, কলমী শাক খেতে সংস্কারে বাধে। এই সংস্কার ও বিশ্বাস যতদিন থাকবে ততদিন আমাদের মেয়েরা কেউ না কেউ মনসার ব্রত করবে, শ্রাবণমাস ভোর বিজয়-গুপ্ত বা কেতকাদাসের মনসার পাঁচালী পড়বে, শ্রাবণমাসের মনসাপূজার দিন বাড়ীর চারিদিকে গোবর গোলা জলের বের দেবে, শ্রাবণ বা ভাদ্রের সংক্রান্তিতে বাড়ীতে হবে আরাঙ্ (অরন্ধন); ভাসান যাত্রা ও রয়ানী গানের অনুষ্ঠানে আমরা মুগ্ধ হবো। শঙ্খলাগা সাপসাপিনীর ওপর নতুন গামছা ফেলে দিয়ে সেই গামছা নিয়ে শুভ কাজে ব্রতী হবো, মনসার ঝাপানে সাপুড়েদের সাপ খেলানো দেখে মুগ্ধ হবো আর মনসাপূজার উন্মাদনায় ক-দিন মত্ত হয়ে থাকবো। এ-সংস্কার আমাদের ঐতিহ্য, এ উন্মাদনা আমাদের অন্তরের ভয় ও ভক্তির ফসল।

বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা ও মহিষাসুরমর্দিনীর আদিমতা ও বর্ধমান

সর্বমঙ্গলা শাক্তদেবী অসুরনাশিনী দেবী দুর্গারই অন্যরূপ। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্যগ্রন্থে' লিখেছেন—"ধর্মমতের ক্রমাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমন্বয় ও স্বীকরণের ফলে শাক্তধর্মের বিবর্তন ও সমন্বয় ঘটে। শাক্তদেবীর নানা রূপের সমন্বয়েরও প্রমাণ মেলে। আমাদের শাক্ত সাহিত্যের মধ্যে উমাকে পাই, তিনিই পার্বতী গিরিজা; আমরা দক্ষকন্যা সতীকে পাই, তিনিই আবার দশমহাবিদ্যারূপে রূপান্তরিতা; একান্ন মহাপীঠে তাঁর একান্ন দেহাংশ অবলম্বনে একান্নদেবী; আমরা অসুরনাশিনী চণ্ডীকে পাই, তিনি দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, অভয়দায়িনী অভয়া; মঙ্গলকারিণী সর্বমঙ্গলা।" সর্বমঙ্গলা বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মূর্তিটি সাত/আট শত বৎসরের প্রাচীন। মানিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলে বিভিন্ন স্থানের সর্বমঙ্গলার উল্লেখ দেখি; যেমন বেতায় সর্বমঙ্গলা, বর্ধমানে সর্বমঙ্গলা,

নাড়চার সর্বমঙ্গলা, মেদিনীপুরে কেশিয়াড়ী ও গড়বেতার সর্বমঙ্গলা। কিন্তু বর্ধমানেশ্বরী সর্বমঙ্গলা বলতে আমরা বৃহৎ পাঁচটি রথচূড়া সমন্বিত নবরত্ন মন্দিরাভ্যন্তরে রৌপ্যমণ্ডিত সিংহাসনে কষ্টিপাথরে ক্ষোদিত সিংহবাহিনী মহিষাসুরমর্দিনী অষ্টাদশ প্রহরিণী অষ্টাদশভুজা দেবী দুর্গার মূর্তিই বুঝি। দেবী অষ্টাদশভুজা কৃষ্ণপ্রস্তরময়ী, চরণতলে মহিষ তার নিকটে অসুর। মাতা শূলাঘাতে অসুরবক্ষ নির্ভিন্ন করছেন। এই মূর্তিকে মন্বন্তরা মূর্তিও বলা হয়। অর্থাৎ দৈবীর মূর্তি প্রতি মন্বন্তরেই বিদ্যমান ছিলেন। দেবীর চরণতলের নীচে পৈশাচী অক্ষরে কিছু লেখা ছিল। কিন্তু মূর্তি উদ্ধারের সময় থেকে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত হবার মধ্য পথে সেই লিপিগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় প্রত্নতাত্ত্বিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এর পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নাই। দেবীর নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে। মহাপূজা হয় শরৎকালে দুর্গাপূজা ও বসন্তকালে বাসন্তীপূজার সঙ্গে। তবে শরৎকালের পূজার আড়ম্বর ও গুরুত্ব বেশী, যদিও কৃত্তিবাস এই উৎসবের জন্য শরৎকালকে অকাল ও বসন্তকালকে শুদ্ধিকাল হিসেবেই বর্ণনা করেছেন। তবে মার্কণ্ডেয় পুরাণে এই পূজার অনুষ্ঠান শরৎকালেই করার কথা বলা হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীতে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গলে মহিষমর্দিনী দশভূজা চণ্ডীর রূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা অষ্টাদশভুজা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন যুগের মহিষমর্দিনী মূর্তি ও অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ পর্যালোচনা করে দেখা যায় দেবীকে কোথাও দ্বিভুজা, কোথাও চতুর্ভুজা, কোথাও দশভুজা, কোথাও অষ্টাদশভুজা, কোথাও বা বিংশতিভুজা, অষ্টাবিংশভুজা এমন কি দ্বাত্রিংশভুজা রূপে দেখান হয়েছে। বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা ১১ ইঞ্চি × ৮ ইঞ্চি কষ্টিপাথরে ক্ষোদিত, পশ্চাদ্‌দেশ রূপার পাতে মোড়া। মূর্তিটির গঠন ও শিল্প-সৌন্দর্য নবম/দশম শতকের পালযুগের ভাস্কর্য বলেই অনুমিত হয়। কারণ প্রাচীনকালে সাধারণত দেবীকে পরিজন ছাড়াই এককভাবে মহিষমর্দিনী ও সিংহবাহিনীরূপে পূজা করা হত। বর্ধমানের সর্বমঙ্গলাও পরিজন ছাড়াই একক মূর্তি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসের যুগবিভাগ অনুযায়ী দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মধ্যযুগের সূচনা বলে চিহ্নিত করা হয়। সেই হিসাবে প্রাচীনযুগে ও মধ্যযুগের প্রথম দিকের ভাস্কর্যে দেবীকে সিংহারূঢ়া বা সিংহের পাশে দণ্ডায়মানা অথবা মহিষাসুরের প্রতিরূপ মহিষকে বা মহিষের মস্তকসহ পুরুষকে অথবা মহিষের গলা থেকে নির্গত পুরুষকে দেখা যায়। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের মতে বর্ধমান নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে মঙ্গলাস্বস্তিকা মূর্তি। এই স্বস্তিকা মঙ্গলা-দেবী মূলত জৈনদের প্রতিষ্ঠিত। জৈন মহাবীরের আবির্ভাবকাল জৈন সন্ন্যাসী হেমচন্দ্রের

মতে ৪৬৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। ১০৮ শিবমন্দির দ্বিশতবার্ষিকী উৎসবের স্মরণিকা গ্রন্থে ডঃ মণ্ডল মন্তব্য করেছেন যে মহাবীর রাঢ় দেশে এসে বজ্রভূমি ও সূক্ষ্মভূমিতে বহু বৎসর যাপন করেছিলেন ও উজুবালিয়া নদীর তীরে আর্হৎ লাভ করেন, এ নদী হল বল্লুকা চম্পানদী বা আধুনিককালের কংস বা জলকুলান নদী; অজয়ের একটি শাখা। এই নদীর তীরে যক্ষমন্দির বৈর্য্যাবত চৈত্য হচ্ছে সাতগাছিয়ার বড়োয়াঁ গ্রাম। এখন অবশ্য এই নদী বা স্তূপের চিহ্ন নাই। মেমারী থানার বরারি (১৪) সাতগাছিয়ার অনতিদূরে বর্তমানের মায়ানদীর তীরে অবস্থিত, আবার ঐ থানাতেই ১২৬নং বরেয়া গ্রাম আছে, গ্রামটি বাঁকা নদী থেকে কিছুটা দূরে, তবে সাতগেছে থেকে দূরত্ব বরারি গ্রাম থেকে বেশী। মনে হয় বরারিই (১৪) এখন বঁড়োয়ার বিকৃত নাম। ডঃ মণ্ডলের বক্তব্য সত্য হলে মঙ্গলার স্বস্তিকা মূর্তি এখানেই কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকতে পারে। বলাইদেব শর্মা মহাশয় রচিত বর্ধমানের ইতিহাস স্মারকগ্রন্থে লেখক মন্তব্য করেছেন বর্ধমানের প্রাচীন দেবী বলে বিখ্যাত যে সর্বমঙ্গলা তিনি মূলত ধর্মঠাকুর, রামাই পণ্ডিতের ধর্মপুরাণে যাকে বর্তুলাকার বলে ধ্যান করা হয়। মন্দিরের প্রাচীন পুরোহিত মঙ্গলা ভট্টাচার্যও তাঁর এইমত সমর্থন করেছিলেন এবং বক্তব্যের সমর্থনে দেবীর আদি বর্তুলাকার স্ফটিক মূর্তির উল্লেখ করেন। দেবীর আদি ইতিহাসে জানা যায় চুন্‌রীরা (জাতিতে বাগ্‌দী) প্রথমে এই মূর্তি পূজা করতো। সে কারণেই দেবীর পুজোয় গুগ্‌লী ভোগ দেওয়ার রীতি আছে।

সর্বমঙ্গলার আদি ইতিহাস সম্বন্ধে আরও কিংবদন্তী জড়িয়ে আছে। দেবীর মূর্তি বর্তমানের বাহির সর্বমঙ্গলা মৌজায় জলের তলে নিমজ্জিত ছিল। ঐ অঞ্চলের বাগ্‌দীরা মাছ বা গুগলি ধরার সময় ঐ মূর্তিকে জলের তল থেকে উদ্ধার করে ও তার পিছনে গুগ্‌লি ভাঙতে আরম্ভ করে। শামুক গুগ্‌লির খোলা পুড়িয়ে তারা চুন তৈরী করতো। একসময় শামুক গুগলির খোলার সঙ্গে দেবীর মূর্তি চুনের ভাটিতে নিক্ষিপ্ত হয়। পরে ভাটি থেকে চুন বের করার সময় চুনের সঙ্গে তারা ঐ মূর্তিও বের করে। আশ্চর্যের কথা, মূর্তি তখনও অক্ষত অবস্থায় ছিল। তারা মূর্তি দেখে বিস্ময় ও ভয়ে আপ্লুত হয়ে ওঠে। যখন তারা সেই মূর্তি পর্যবেক্ষণ করছিল, সে সময় দু'জন ব্রাহ্মণ সেই স্থান দিয়ে যাচ্ছিল। তারাও কৌতূহলী হয়ে মূর্তিটি দেখে ও এটি অষ্টাদশভূজা মহিষমর্দ্দিনী দুর্গার মূর্তি দেখে বাগ্‌দীদিগকে নানারকম পাপের ভয় দেখিয়ে মূর্তিটি তাদের কাছ থেকে নিয়ে যায়। এদিকে বর্ধমানাধিপতি চিত্রসেনরায় পূর্ব রাত্রে দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে সকালেই ঘোড়া ছুটিয়ে বাগ্‌দী পাড়ায় যান ও তাদের কাছ থেকে সংবাদ পান যে

কিছু পূর্বে দুজন ব্রাহ্মণ তাদের কাছ থেকে সে মূর্তি নিয়ে গেছে। মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে তাদের যাত্রাপথ অনুসরণ করে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে ব্রাহ্মণদ্বয়কে ধরেন ও তাঁদের মায়ের স্বপ্নাদেশের কথা বলে মূর্তি দাবী করেন। তাঁরা প্রথমে দিতে অস্বীকার করে, পরে মহারাজ মন্দির নির্মাণ করে মূর্তি সেখানে প্রতিষ্ঠা করে তাঁদেরই স্থায়ীভাবে দেবীর পুরোহিত নিযুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিলে তাঁরা মূর্তিকে মহারাজার নিকট অর্পণ করে। এরপর মহারাজ বাঁকার পাড়ে মঙ্গলাপাড়ায় যেখানে মিত্রেশ্বর বাণেশ্বর ও রামেশ্বর শিবমন্দির আছে তার পার্শ্বে এক বেলগাছের নীচে কিছুদিন রেখে নবরত্ন মন্দির নির্মাণ করান ও মন্দিরে দেবীকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করে ব্রাহ্মণদ্বয়কে দেবীর পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করেন। দেবীর নিত্যসেবা পূজার ব্যবস্থা করেন।

কিছুদিন আগে এই দু' জন ব্রাহ্মণ বাঁকুড়ার না বেগুটের সে নিয়ে একটা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিতর্কের সূচনা হয় প্রধান শিক্ষক সমিতির ৩৯তম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থে নন্দদুলাল ঘোষ মহাশয়ের সর্বমঙ্গলা সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদনকে কেন্দ্র করে। নন্দবাবু লিখেছেন এই দু'জন ব্রাহ্মণ ছিলেন বাঁকুড়ানিবাসী। নন্দবাবুর লেখায় সর্বমঙ্গলা ট্রাস্ট বোর্ডের সদস্য ও মায়ের প্রধান পুরোহিত ক্ষেত্রনাথ অধিকারী ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কারণ তাঁর দাবী যে ঐ দুজন ব্রাহ্মণ ছিলেন বেগুটনিবাসী তাঁর পূর্বপুরুষ। তাঁর দাবীর সমর্থনে তিনি মন্দিবের মধ্যে তাঁর পিতামহ যদুনাথ অধিকারী (বন্দোপাধ্যায়) মহাশয়ের ফটোগ্রাফটি দেখান। অথচ মজার কথা ১৯৫৪ সালে গোলাপবাগে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে নারায়ণচন্দ্র চৌধুরীর সম্পাদনায় যে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাতে এবং ১০৮ শিবমন্দিরে দ্বিশতবর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে ১৩৯৫-এ (১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দ) প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থে অভয়াদাস মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদনে ও ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত যজ্ঞেশ্বর চৌধুরীর গবেষণামূলক গ্রন্থ "বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি" গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে ঐ একই বাঁকুড়ানিবাসী ব্রাহ্মণদ্বয়ের উল্লেখ আছে। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন অভিযোগ ওঠে নাই। এই অভিযোগের প্রধান কারণ হলো বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যার "রাঢ়ের গ্রামদেবতা" নামক পুস্তকের 'সর্বমঙ্গলা' শীর্ষক প্রবন্ধের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে।

এরপর আমি নিজে ক্ষেত্রনাথবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি ও তার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করে বুঝেছি যে, মিহিরবাবু প্রধানত ক্ষেত্রনাথবাবুর বক্তব্যের ওপর নির্ভর করে তাঁর প্রবন্ধে যে বিতর্কিত বিষয়টি উপস্থাপিত করেছেন সে কাহিনী

সংক্ষেপে এইরূপ : প্রাচীনকালে বাহির সর্বমঙ্গলাপাড়ার বাগ্‌দীরা স্থানীয় একটি পুকুর থেকে মূর্তি জালে তুলে আনে ও শিলাটিকে শামুক গুগলি ভাঙার কাজে ব্যবহার করতে থাকে। এক সময় দামোদর তীরের চুনারীদের শামুক খোলা নেবার সময় মূর্তিটি তাদের চুনের ভাটায় চলে যায়। সেই রাত্রেই বর্ধমানের মহারাজা সম্ভবত সঙ্গম রায় (দশম শতাব্দীতেও একজন সঙ্গম রায় নামক রাজা ছিলেন, ইনি সে সঙ্গম রায় নন) স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে চুনারীদের কাছে যান ও তাদের কাছ থেকে জানতে পারেন যে তিনজন ব্রাহ্মণ শিলাটিকে পুজো করতে নিয়ে গেছেন। মহারাজা সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে সেই তিন ব্রাহ্মণকে ধরে ফেলেন ও তাঁদেরকে পূজারী হিসেবে নিয়োগ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মূর্তিটি নিয়ে আসেন। তদনুসারে দেবীর শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত হলো বর্ধমান রাজবাটী সংলগ্ন বাঁকা নদীর পাড়ে মঙ্গলাপাড়ায়। এই অজ্ঞাতনামা ব্রাহ্মণত্রয় ছিলেন বেগুট গ্রামের। এক সময় শোনা গেল কালাপাহাড় আসছে মন্দির ধ্বংস করতে, অমনি দেবীকে রক্ষার জন্য পূজারীরা মন্দিরে তালা দিয়ে পালিয়ে যান। দেবী দীর্ঘদিন উপবাসী আছে দেখে মহারাজ প্রথমে এক তান্ত্রিক সাধককে ও পরে তাঁরই সুপারিশে রায়ান গ্রামের ব্রাহ্মণদের পৌরোহিত্যে বরণ করেন। তারপর পুরীতে কালাপাহাড়ের মৃত্যু হয়। তখন বেগুটের সেই তিন ব্রাহ্মণ ফিরে আসেন ও রায়ানের ব্রাহ্মণদের চলে যেতে বলেন। পরে মহারাজের মধ্যস্থতায় উভয় দলের পালাক্রমে পুজো করার ব্যবস্থা হয়। ফলে বেগুটের ব্রাহ্মণরা মাসের প্রথম ১৫ দিন ও রায়ানের ব্রাহ্মণরা মাসের শেষ ১৫দিন পৌরোহিত্যের অধিকারী হন। সেই Tradition আজও চলে আসছে।

আপাত দৃষ্টিতেই দেখা যায় মিহিরবাবুর প্রবন্ধের মধ্যে বহু ঐতিহাসিক তথ্যগত ভুল আছে। আমি এবিষয়ে প্রধান শিক্ষক সমিতির ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসের বুলেটিনে বিশদভাবে আলোচনা করেছি ও প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি—মিহিরবাবুর সর্বমঙ্গলা সম্পর্কিত কাহিনী শুধু ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে অসমর্থিতই নয়, কাহিনীটি বিভ্রান্তিমূলক।

যাই হোক, মূল কাহিনীতে ফিরে আসা যাক। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের স্বস্তিকা-মঙ্গলা জৈনদেবী ও বিনয় ঘোষের জৈনদের উপাস্যদেবী অম্বিকার কাহিনী বিশ্বাস করতে হলে সর্বমঙ্গলা অতি প্রাচীন দেবী। প্রথমে তিনি স্বস্তিকামঙ্গলা জৈনদেবী হিসেবে পূজিতা হন। তারপর বর্তুলাকার মূর্তিতে বাগদীদের পূজা পান। এরপর মনে হয় গোদা মৌজার কিংবদন্তীর সামন্তরাজ গদাধরের দ্বারা দশম থেকে দ্বাদশ শতকের কোন একসময় মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে মহালক্ষ্মীর বিবরণমত পাতুন বা অন্য কোন স্থানের ভাস্করদের দিয়ে দেবীর অষ্টাদশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী সিংহবাহিনী মূর্তি নির্মাণ করিয়ে তাঁর পূজার ব্যবস্থা করেন। পরে ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে

কালাপাহাড়ের আক্রমণের ভয়ে মূর্তিটি বাহির সর্বমঙ্গলার চুনারী পুষ্করিণীতে নিক্ষিপ্ত হয় যাতে দেবীর মূর্তি কোনরকমে রক্ষা পায়। পরের ঘটনা বাগ্‌দীদের দ্বারা চুনারী পুকুর থেকে মূর্তি উদ্ধার ও মহারাজ কর্তৃক মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দেবীর সেবাপূজার ব্যবস্থা। এখন প্রশ্ন এই মহারাজ কে? নারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বর্ধমানের ইতিহাস গ্রন্থে বলাই দেবশর্মা সর্বমঙ্গলাকে বর্তুলাকার ধর্মরূপে পূজার কথা বলেছেন ও এই গ্রন্থে মহারাজ চিত্রসেন কর্তৃক বাগ্‌দীদের কাছ থেকে সর্বমঙ্গলার মূর্তি উদ্ধারের কথা বলেছেন। অভয়াদাস মুখোপাধ্যায়, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, নন্দদুলাল ঘোষ সকলেই চিত্রসেনের কথাই উল্লেখ করেছেন। সর্বমঙ্গলার প্রাচীনত্বের নিদর্শন পাওয়া যায় ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের জৈন মূর্তি হিসেবে স্বস্তিকা মঙ্গলাদেবীর বর্ণনায় ও বলাইদেব শর্মার বর্তুলাকার ধর্মমূর্তির কল্পনায়; তাঁর মতে রাঢ়ের ধর্মপূজা রামাই পণ্ডিতের বিধান। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড প্রথম পর্ব)' গ্রন্থে রামাই পণ্ডিত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি অনুমান করেছেন—বর্ধমানের বল্লুকা নদীর কাছে কোন স্থানে ধর্মপূজা প্রচারক রামাই পণ্ডিতের জন্ম হওয়া সম্ভব। "বাড়ী মোর বল্লকায়। পূজি শ্রীনৈরাকায়।" তাহলে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের সর্বমঙ্গলার আদি স্বস্তিকা বল্লুকা তীরে বড়োয়াঁগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও বলাই দেবশর্মার বর্তুলাকার ধর্মপূজার কাহিনী মিলে যায়। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় রামাই পণ্ডিতের ব্যক্তিত্ব বিষয়ে প্রথমে সন্দেহ প্রকাশ করলেও পরের পঙ্‌ক্তিতে তিনি রামাই পণ্ডিতের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে লাউসেন ও রামাই পণ্ডিতকে খ্রীষ্টীয় দশম শতকের লোক বলে মনে করেছেন। ডঃ শাহীদুল্লাহ লামা তারানাথের তিব্বতী ভাষায় লেখা বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসকে ভিত্তি করে রঞ্জাবতীর গুরু রামাই পণ্ডিতের আবির্ভাবকাল দ্বাদশ শতাব্দী বলে অনুমান করেছেন। এই তথ্য যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহলে আমার পূর্ব বক্তব্য বাগ্‌দীদের দ্বারা সর্বমঙ্গলার বর্তুলাকার মূর্তি ধর্মরাজের পূজার সমর্থন মেলে। রূপরামের ধর্মমঙ্গলে সর্বমঙ্গলা মূর্তির উল্লেখ পাওয়া যায়—

বর্ধমানে বন্দো দেবী সর্বমঙ্গলা।
অধিষ্ঠান হন দেবী ঠিক দুপুর বেলা ॥

রূপরামের গ্রন্থরচনার কাল :

'রসের উপরে রস তাহে রস দেহ' অর্থাৎ ৯৯৯ হিজরী বা ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ দেবীমূর্তির অস্তিত্ব ষোড়শ শতকের পূর্বেই ছিল। সে-সময় সর্বমঙ্গলা কিংবদন্তীর রাজা গদাধরের পূজিতা দেবী হওয়া সম্ভব। তারপর হয়

কালাপাহাড়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য কিংবা দামোদরের বানে দেবীমূর্তি নিকটস্থ বাহির সর্বমঙ্গলা মৌজায় চুনারীপুকুরে জলতলবাসিনী হয়েছিলেন বলে অনুমিত হয়। এরপর বর্ধমানের মহারাজা উদ্ধার করেন। মহারাজ কীর্তিচাঁদ ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে (১১৪৭ বঙ্গাব্দে অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাসপ্তমীতে) পরলোকগমন করেন। এরপর তাঁর পুত্র চিত্রসেন সিংহাসনে বসেন। তিনি মাত্র ৪ বৎসর রাজত্ব করেন। এর মধ্যে ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে কালনার সিদ্ধেশ্বরী মন্দির নির্মাণ করান ও ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানে ব্যাপক বর্গী হাঙ্গামার সময় আত্মরক্ষার জন্য ভাগীরথী তীরে কাউগাছিতে পলায়ন করেন। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিলে মারাঠারা কাটোয়ার পথে অগ্রসর হওয়ার সংবাদ পেয়ে যদি মহারাজ চিত্রসেন বর্ধমানে ফিরে আসেন, তাহলে সে-সময় মারাঠা বিধ্বস্ত বর্ধমান শহরকে রক্ষা করা এবং বিধ্বস্ত শহরের হৃতসম্পদ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারেই তাঁকে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করাই স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে করা সঙ্গত। সেক্ষেত্রে সে-সময় সর্বমঙ্গলা উদ্ধার ও মন্দির নির্মাণ তাঁর পক্ষে সম্ভব নহে। তাছাড়া ১৭৪২-এর আগেই সর্বমঙ্গলার মন্দির নির্মিত হয়েছিল বলে ডঃ মিহিরবাবু ও ক্ষেত্রনাথ-বাবুর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়। কারণ, তাঁদের কথায় চিত্রসেন বর্গী দাঙ্গার পর দীর্ঘদিন মন্দির বন্ধ দেখে রায়ানের ব্রাহ্মণদের পৌরোহিত্যে নিয়োগ করেন। এই সমস্ত ঘটনা ও তথ্য পর্যালোচনা করে আমার ধারণা—মহারাজ কীর্তিচাঁদ (১৭০২–১৭৪০) বাগ্‌দীদের কাছ থেকে মূর্তি উদ্ধার করে কাঞ্চননগরে প্রতিষ্ঠা করেন।

অজ্ঞাতনামা কবির লোকগাথায় কীর্তিচাঁদ যে কাঞ্চননগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার উল্লেখ পাই—

রাজা রাজ বলহো
যাগেশ্বর দিয়ে দীঘি নাম রহিল॥
বন কেটে বসালেন রাজা কাঞ্চননগর।

এই সময় তিনি কাঞ্চননগরে সোনামুখীর শ্রীরামচন্দ্র মিস্ত্রীকে দিয়ে জোড়াবাংলা মন্দির নির্মাণ করিয়ে থাকবেন ও সেখানে সর্বমঙ্গলাকে প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর ঐ মিস্ত্রী কালনায় চিত্রসেনের আমলে ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির নির্মাণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কালনার সিদ্ধেশ্বরীদেবী-মন্দির নির্মাণের প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ মন্তব্য করেছেন "কালনা ও কাঞ্চননগরের জোড়াবাংলা মন্দিরের স্থাপত্য ও গঠনশৈলী দেখে অনুমান হয় যে উভয় মন্দির একই মিস্ত্রীর দ্বারা নির্মিত।" যাই হোক, এরপর কীর্তিচাঁদ তাঁর দীর্ঘ ৩৮ বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে কোন একসময় বাঁকার উত্তরতীরে মঙ্গলাপাড়ায় মিত্রেশ্বর ও অন্যান্য

শিবমন্দিরের পূর্বে সর্বমঙ্গলার নবরত্নমন্দির নির্মাণ করিয়ে সেখানেই দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা পরিষ্কার করে বলে রাখা ভাল। সর্বমঙ্গলার মন্দিরের নির্মাণের সমর্থনে কোন শিলাকলঙ্ক নেই। দেবী সম্পর্কিত সুদূর অতীতের কাহিনী সম্পর্কিত বিতর্কের যুক্তিনিষ্ঠ তথ্যভিত্তিক সমাধানের চেষ্টা করা কতটা সম্ভব বা আদৌ সম্ভব কিনা জানি না। তবে পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও তথ্য (Circumstantial evidence)-এর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে আমার নিজস্ব ধারণামত মোটামুটি একটা গ্রহণযোগ্য বিবরণ খাড়া করার চেষ্টা করেছি মাত্র।

ডঃ সুকুমার সেনও ১০৮ শিবমন্দিরের দ্বিশতবর্ষ পূর্তি উৎসবের স্মারক-গ্রন্থে একটি প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন যে সর্বমঙ্গলা শহর বর্ধমানের গ্রামদেবী। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে সর্বমঙ্গলার নাম কীর্তিত হয়ে আসছে। এখানে দেবী প্রতিষ্ঠিত ছিলেন যে মহলে তা এখন বাহির সর্বমঙ্গলা নামে সিদ্ধ। এখন যেখানে আছেন সেখানে প্রতিষ্ঠিত হন অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে।

বাহির সর্বমঙ্গলা মৌজায় এখনও 'চুনুরী পুকুর' বলে একটি পুকুর আছে। এখনকার প্রধান বাসিন্দা সেখ মোসলেম খাঁয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে জেনেছি যে এ-অঞ্চলে পূর্ণ বাগ্‌দী বলে এক বাগ্‌দীর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে বর্ধমান রাজবংশের কোন রাজা খুব সম্ভবত কীর্তিচাঁদ সর্বমঙ্গলার মূর্তি থাকার খবর পেয়ে উদ্ধার করে নিয়ে যান ও মন্দির নির্মাণ করিয়ে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ণ বাগ্‌দীর বংশধররা এই একই কথা বলেছে; তারা আরও বলেছে যে তাদের কাছ থেকে মূর্তি নিয়ে যাবার পরিবর্তে মহারাজা তাদেরকে জমি দিয়েছিলেন। তবে কোন দলিল দেখাতে পারে নাই। 'বর্ধমানের কথা' গ্রন্থের লেখক সুশীল সেন তাঁর পুস্তকে কীর্তিচাঁদের দ্বারাই বাগ্‌দীদের কাছ থেকে মূর্তি উদ্ধারের কথাই লিখেছেন। এই সমস্ত তথ্য ও বিভিন্ন গ্রন্থ পর্যালোচনা করে আমি কীর্তিচাঁদ কর্তৃক মূর্তি উদ্ধারের সিদ্ধান্ত করেছি।

দেবীর উদ্ধার ও মন্দির-প্রসঙ্গ শেষ করে দেবীর পূজা প্রসঙ্গে আসি। বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী সর্বমঙ্গলা প্রকৃত অর্থেই বর্ধমানেশ্বরী। তাঁর নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে। ভোরে দেবীকে খাটে শয়ান থেকে উঠিয়ে সরবৎ নিবেদন করা হয়। তারপর স্নান করিয়ে 'শ্বেতাননা নীলভুজা সুশ্বেতস্তনযুগলা রক্তমধ্যা রক্তপাদা নীলজঙ্ঘোরু-রুন্মদা' ধ্যানে মায়ের ষোড়শোপচারে পূজা হয়। মঙ্গলবার ও শনিবারেই যাত্রীদের পূজা দেবার বেশী ভিড়। জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রত্যেকেই পূজা দিতে পারেন। যাদের মানত থাকে তারা পাঁঠা বলিদানও দেয়। দুপুরে নিত্য

পঞ্চব্যঞ্জনসহ আতপ চালের অন্নভোগ—এই ভোগে থাকে গুগলী, মাছের টক ও পরমান্ন অন্যতম উপকরণ। যদি কেউ মাগুর মাছ নিয়ে আসে অতি অবশ্যই রান্না করে মায়ের ভোগে নিবেদন করতে হবে। এরপর মায়ের শয়ান। সন্ধ্যায় লুচি মিষ্টিসহ শীতলারতি। এরপর মাকে সিংহাসন থেকে উঠিয়ে সন্নিহিত খাটে শয়ান দিয়ে মশারি পর্যন্ত খাটিয়ে দেওয়া হয়। এই অর্থে আমরা দেবীকে প্রকৃত অর্থেই স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীর আসনে বসিয়েছি। আমাদের বাঙালিয়ানার এই এক বৈশিষ্ট্য। আগেই বলা হয়েছে, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার সময় ও বসন্তকালে বাসন্তীপূজার সময়, মায়ের মহাপূজা—কৃত্তিবাসের অকাল ও শুদ্ধকালের পূজার মেলবন্ধন। তবে আশ্বিন মাসের পূজারই আড়ম্বর বেশি। আশ্বিন মাসে দুর্গাষষ্ঠীতে দেবীর বোধন ও ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ দেবীর অধিবাস। সপ্তমীর দিন নবপত্রিকা ও ঘট এনে দেবীর ষোড়শোপচারে সপ্তমীবিহিত পূজা ও চণ্ডীপাঠ। সপ্তমীর দিন থেকেই মায়ের কাছে পূজা দেবার জন্য কাতারে কাতারে নারী-পুরুষের ভিড়। ভিড় সামলানোর জন্য স্বেচ্ছাসেবক এমন কি পুলিশের ব্যবস্থা করতে হয়। মায়ের পুরোহিতদের দুই অংশীর শরিকরা মায়ের মূল মন্দিরের চারপাশে নাটমন্দিরে পূজা নিতে বসে যান। পূজার দিনের প্রধান পুরোহিত মায়ের সিংহাসনের সামনে বসে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ান ও দক্ষিণার পরিবর্তে ব্রাহ্মণ পূজারীকে মায়ের আদি বর্তুলাকারে স্ফটিক মূর্তি দেখান। অষ্টমীর দিন সন্ধিপূজা ও বলিদান। এদিন সহস্রাধিক পুণ্যর্থীর ভিড়। বলিদানের মুহূর্তে মন্দিরের বাইরে বাঁকা নদীর তীরে বটগাছের নীচে কামানতলায় দশ কেজি বারুদের কামান দাগা হয়। জমিদারী উচ্ছেদের আগে বলিদানের মুহূর্তের পূর্বে তিনবার কামান দাগা হত। ৪০ কেজি বারুদ বরাদ্দ ছিল। এই কামানের শব্দ শুনে বর্ধমানের চারপাশের ১২/১৪ মাইল দূরের গ্রামেও অষ্টমীর বলিদান হত। এই দিন রাতে বলিদানের সময় হলে সারারাত্রি পূজা ও চণ্ডীপাঠ চলে। তবে গত তিন বছর কামান দাগা বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ যতদূর মনে পড়ে ১৯৯৭-এর পূজার সময় বলিদানের মুহূর্তে কামানদাগার সময় কামান প্রচণ্ড শব্দে ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। একশ গজ দূরের বাড়ীতে কামানের জ্বলন্ত টুকরো গ্রিল ভেদ করে ভিতরে ঢোকে, সেই থেকে কামানদাগা বন্ধ হয়ে গেছে। মহানবমীর দিন অজস্র বলিদান হয়। প্রথমে ট্রাস্টের সরকারী পাঁঠাবলি, তারপর পূর্ণ বাগ্দীর (যাদের পূর্ব-পুরুষদের কাছ থেকে মূর্তি উদ্ধার করা হয়েছিল) বংশধরদের বলি। এরপর মানতকারীদের বলি। সবশেষে ট্রাস্ট কমিটির মহিষবলি। ছাঁচি কুমড়া, গোটা আখও বলি হয়। চণ্ডীপাঠ কুমারীপূজা হোম সবই যথারীতি হয়। দশমীর দিন অপরাজিতা পূজা ও

ষষ্ঠীর দিনে আনা ঘট ও নবপত্রিকা বিসর্জন। বাসন্তী পূজার সময় দুর্গাপূজার মত যথারীতি পূজা ও ছাগবলি হয়।

নতুন খাতা পূজা থেকে আরম্ভ করে যে কোন পূজায় শহরবাসী মঙ্গলাবাড়ীতে পূজা দেন। বিপত্তারিণী ব্রতের সময় আষাঢ় মাসের রথযাত্রার পরের মঙ্গল ও শনিবার পল্লীগ্রাম থেকে অসংখ্য পুণ্যার্থিনী মায়ের মন্দিরে পূজা দিতে আসেন ও লাল ডুরী পরে যান। এখানে নাটমন্দিরে বিপত্তারিণী ব্রতকথাও শোনান হয়। ষষ্ঠীপূজা, মাকালপূজা, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী সব পূজাতে মায়ের কাছে লোকে পূজা দিতে আসে। আদিত্যবর্ণা নীলা কোটি-সূর্য্যসম-প্রভা সর্ব্বমঙ্গলা সর্বদেবদেবীর একীভূত রূপ। মায়ের ভোগেই হয় নবজাতকের অন্নপ্রাশন, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের অনেকেই মায়ের মন্দিরেই যজ্ঞোপবীত ধারণ করে সাবিত্রীমন্ত্রে দীক্ষা নেয়। প্রেমিক-প্রেমিকা মা-কে সাক্ষী রেখে মালাবদল করে নবজীবন শুরু করে। এমন কি স্কুটার বা নতুন মোটরগাড়ী কিনে মায়ের মন্দিরে এনে মা-কে পুজো দিলেই যেন শুভযাত্রার ফাইন্যাল লাইসেন্স পাওয়া যায় বলেই ভক্তের বিশ্বাস। সর্ববাঞ্ছাদাত্রী শুভদা বরদা দেবী জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সবার মা সর্বমঙ্গলা।

সর্বমঙ্গলা মহিষাসুরমর্দিনী এই প্রসঙ্গে মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তির আদিমতা ও প্রাচীনতা সম্পর্কে আলোচনা প্রাসঙ্গিক হবে। মহিষাসুরমর্দিনীর প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় মধ্য ভারতের উদয়গিরিতে চন্দ্রগুপ্তের কালে নির্মিত প্রস্তরমূর্তিতে। মূর্তিটি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের; দেবী দশভূজা—কিন্তু বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা অষ্টাদশভূজা। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর মহালক্ষ্মীর ধ্যানে এই অষ্টাদশভুজা মূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়। দেবী অষ্টাদশ হস্তে অষ্টাদশ প্রহরণধারিণী; রুদ্রাক্ষের জপমালা, কুঠার, গদা, শর, বজ্র; পদ্ম, ধনু, অসি, কমণ্ডলু, দণ্ড, শক্তি, ঢাল, শঙ্খ, ঘন্টা, সুরাপাত্র, শূল, পাশ ও সুদর্শন চক্র।

ওঁ অক্ষস্রক্‌পরশুং গদেষুকুলিশং পদ্মং ধনুঃ কুণ্ডিকাং
দণ্ডং শক্তিমসিঞ্চ চর্ম জলজং ঘন্টাং সুরাভাজনম্।
শূলং পাশসুদর্শনে চ দধতীং হস্তৈঃ প্রবালপ্রভাং
সেবে সৈবিভমর্দিনীমিহ মহালক্ষ্মীং সরোজস্থিতাম্॥

বৈকৃতিকরহস্য তন্ত্রমতে দেবী সহস্রভুজা হলেও অষ্টাদশভুজা রূপে পূজ্যা ও ধ্যেয়া। ব্রহ্মাস্তবে দেবী বিষ্ণুদেহ হতেই জাগ্রত হলেন, অসুরগণকে মহামায়া দ্বারা বিমোহিত করলেন, ফলে অসুরবধ হল। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' গবেষণাগ্রন্থে মহিষাসুরমর্দিনী সম্বন্ধে বলেছেন—বেদে মহিষ পশু এই অর্থে যেমন ব্যবহৃত দেখা যায়, তেমনই সায়নাচার্য্য কোন

স্থলে (ঋগ্‌বেদ ৮/১২/৮) 'মহিষ' শব্দটি 'মহান' অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। সেক্ষেত্রে মহিষাসুর কথার অর্থ মহান অসুর। দেবী হয়ত মূলে মহান অসুরমর্দন করিয়াই মহিষাসুরমর্দিনী। মহান অসুরই পরবর্তীকালে পশু মহিষের মূর্তি ধারণ করিয়াছেন। মহিষমর্দিনী দেবী সম্পর্কে ডঃ দাশগুপ্ত একটি ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন। 'দুর্গা হইলেন ভূমধ্য সাগরের ব্যাইর্গো (Virgo) দেবী—ইনি সমরপ্রিয়াদেবী এই ভূমধ্যসাগরাঞ্চলবাসীগণ কর্তৃক মনখের জাতির বিজয়ই মহিষমর্দিনী দেবীমূর্তির মূল কথা।''

ডঃ দাশগুপ্তের এই প্রত্নতাত্ত্বিকতা ও ঐতিহাসিকতা কতটা প্রাসঙ্গিক সে সম্বন্ধে ডঃ পল্লবকুমার সেনগুপ্ত তাঁর "পূজাপার্বণের ইতিকথা" গ্রন্থে সমালোচনা করে বলেছেন; যথার্থ রূপে মহিষাসুরমর্দিনীরূপে যাঁকে গণ্য করা যেতে পারে তার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন যা পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে প্রাচীন যে কয়টি, তারা সবাই হন গুপ্তযুগের। ...যে ধরনের ঐতিহাসিক পটভূমিকার কথা ডঃ দাশগুপ্ত বলেছেন তার বয়স আরো অনেক প্রাচীন। ঐ ধরনের কোন ঘটনা যদি ঘটেও থাকে তাহলে তার সম্ভাব্য সময়কাল আর্যজাতির আক্রমণের পূর্ববর্তী। এ ঘটনা প্রত্ন-দ্রাবিড় প্রত্ন-অস্ট্রিক জাতিসমূহের অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘটনা সূচিত করে, সে ক্ষেত্রে মহিষমর্দিনী মিথের সৃষ্টি পৌনে চার হাজার বছর আগেকার। অথচ প্রকৃত অর্থে মহিষমর্দিনী চণ্ডীর প্রাচীনতম নিদর্শন দেড় হাজার বছরের বেশী নয়। এই যুক্তিতে ডঃ সেনগুপ্ত মনে করেন মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত দেবী চণ্ডিকা প্রধানত প্রাক্ আর্যভাষী দ্রাবিড় বা অষ্ট্রিক জাতি-গোষ্ঠীর উপাসিত—এক প্রধান মাতৃকাদেবতা (যিনি শস্য, বিত্ত, সন্তান, সাফল্য দান করেন বলে মনে করা হয়)। এর উৎস খুঁজতে হবে পৌরাণিক নয়, লৌকিক সংস্কৃতির মধ্যে।

ডঃ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৩৯০ সালের শারদীয়া দেশ পত্রিকায় "মহিষাসুরমর্দিনীর উৎস সন্ধানে" প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন, "মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তির সর্বাপেক্ষা প্রাচীন দুটি বৈশিষ্ট্য হল—দেবীর সঙ্গে সিংহের অবস্থান এবং দেবী কর্তৃক একটি মহিষকে, যাকে মহিষাসুর রূপে সনাক্ত করা যায়, মর্দন। এই বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ আছে পরবর্তীকালে রচিত বিষ্ণু-ধর্মোত্তর পুরাণ, মৎস্যপুরাণ, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে। দেবীর সঙ্গে মহিষাসুরের যুদ্ধের সবিস্তারে বর্ণনা আছে মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য অংশে। মথুরার নিকট আবিষ্কৃত একটি খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের পোড়ামাটির ফলক যার উপর উৎকীর্ণ মূর্তি সম্ভবত মহিষামর্দিনীর।" এই সমস্ত তথ্য পর্যালোচনা করে উপসংহারে ডঃ মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন "এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশের

উত্তর-পশ্চিম অংশে শক পল্লবদের রাজত্ব আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল এবং শিবের শক্তি দুর্গা থেকে আগত ধারণার মাধ্যমে সিংহবাহিনী হয়ে উঠেছিলেন। কুষাণ যুগ থেকে মহিষমর্দিনী সংক্রান্ত বিশ্বাস ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে ও পরবর্তীকালে দেবীর মহিষাসুরমর্দিনীরূপে পূজা বার্ষিক উৎসবে পরিণত হয়।

এখন প্রশ্ন যে মহিষাসুর স্বর্গের দেবতাগণকে পরাভূত ক'রে স্বর্গের অধিপতি হন (জিত্বা চ সকলান্ দেবানিন্দ্রো অভূন্মহিষাসুরঃ) এবং যে মহিষাসুর বধ করার জন্য দেবতাগণ আপন আপন তেজ দ্বারা দেবীকে সৃষ্টি করেন ও আপন আপন অস্ত্র দিয়ে মহিষাসুরকে বধ করার জন্য দেবীকে মহিষাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করেন সেই মহিষাসুরকে কেন দেবীর সঙ্গে পূজা করা হয়।

বরাহপুরাণ মতে মহিষাসুর দৈত্য বিপ্রচিত্তির কন্যা মাহিষ্মতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। কালিকাপুরাণে বলা হয়েছে মহিষাসুর এক স্ত্রী-মহিষের গর্ভজাত রম্ভাসুরের পুত্র। সিন্ধুদ্বীপ নামক ঋষির অভিশাপে মাহিষ্মতী স্ত্রী-মহিষে পরিণত হন।

কালিকাপুরাণে আছে একদা মহিষাসুর স্বপ্ন দেখে ষোড়শভুজা দেবী ভগবতী তাঁর মাথা কেটে রক্তপান করছেন। মহিষাসুর ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। কারণ, তার বিশ্বাস তার স্বপ্ন মিথ্যা হবার নয়। কাজেই তিনি অমাত্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে দেবী আরাধনায় তৎপর হন ও একনিষ্ঠ ভক্তি দ্বারা দেবীর আরাধনা করে দেবীকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করেন। দেবী তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে মহিষাসুরের সম্মুখে আবির্ভূতা হন ও মহিষাসুরকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। দেবী দর্শন দিলে মহিষাসুর দেবীকে বললেন "দেবী আমার স্বপ্ন মিথ্যা হবে না। কারণ তোমার হাতে আমার মৃত্যু পূর্ব-নির্দ্দিষ্ট। কাত্যায়ন ঋষির পুত্রতুল্য শিষ্য রৌদ্রাশ্বকে আমি নারীর বেশে প্রলুব্ধ করি। ক্রুদ্ধ কাত্যায়ন আমাকে অভিশাপ দেন—'নারীর বেশে তুই যখন রৌদ্রাশ্বকে প্রলুব্ধ করেছিস, তখন নারীই তোকে বধ করবে।' তবে আপনার হাতে মৃত্যু তো আমার পরম সৌভাগ্য। তবে একটি বর প্রার্থনা করি। আপনাকে প্রদত্ত যজ্ঞভাগের একটি অংশ যেন আমি পাই। দেবী বললেন—হে মহিষাসুর, যজ্ঞভাগ দেবতারা বহু পূর্বেই নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছেন। তবে এই বর দিলাম যতদিন উগ্রচণ্ডা ও ভদ্রকালীরূপে মর্তে আমার পূজা হবে ততদিন আমার পদলগ্ন হয়ে তুমিও পূজিত হবে।"

(আ. বা. পত্রিকা ৪.১.২০০০)

দেবীর পূজার সময় সিংহকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করা হয়। দেবী এই সিংহ পান হিমালয়ের কাছ থেকে। বাংলাদেশে এখনও অনেক বাড়ীতে ঘোড়ামুখো সিংহকে দেবীর বাহনরূপে গড়া হয়। এই ঘোড়ামুখো সিংহ একটি বিলুপ্ত

প্রজাতির পাহাড়ী সিংহ। ঋগ্বেদে বিষ্ণুকে পাহাড়ী সিংহ বলা হয়েছে। এর থেকে মনে হয় নারায়ণের চতুর্থ অবতার রূপে নৃসিংহ অবতারের কল্পনা। যাই হোক, বিষ্ণু-র অপর এক রূপ পাহাড়ী সিংহ তাই বিষ্ণুরূপে সিংহও মায়ের সঙ্গে পূজা পায়। আবার মহেন্দ্রনাথ দত্তের "কলকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা" গ্রন্থে আছে কলকাতায় অনেক বাটীতে দুর্গাপূজা হইত। শাক্তের বাটীতে দুর্গার সিংহ সাধারণভাবে ও গোঁসাই-এর বাটীতে দুর্গার সিংহ ঘোড়ামুখো হইত। সাধারণত শাক্ত ও বৈষ্ণবদের মধ্যে এই প্রভেদ রাখিত। অপর সব বিষয় একই হইবে। (১৯৭৫ সংস্করণ, পৃ. ১২৩)

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় বর্ধমানের সর্বমঙ্গলারও জৈনদেবী স্বস্তিকামঙ্গলা থেকে বর্তুলাকার ধর্ম ও পরে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর মহালক্ষ্মীর অনুসরণে মহিষাসুর সিংহবাহিনী অষ্টাদশ-প্রহরণ-ধারিণী অষ্টাদশভূজা। দেবী সর্বমঙ্গলা মূর্তিতে বিবর্তনের এক ঐতিহাসিক ঘটনার পরিণত রূপ। যাই হোক দেবী সর্বমঙ্গলা বর্ধমানবাসীর কাছে দেবী দুর্গতিনাশিনী দুর্গরক্ষাকারিণী একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা। তিনি সর্বদিক দিয়েই—

বর্ধমানেশ্বরি বর্ধমানাত্মিকা বর্ধমানেশ-বন্দ্যা
বর্ধমানাশ্রয়া মাতঃ পরিপাসি বর্ধমানম্।
(মার্কণ্ডেয় চণ্ডী অনুসরণে)

সবশেষে মায়ের কাছে ভক্তের প্রার্থনা—

স্বস্তিকা বর্তুলার জানি না প্রমাণ
জানি না কি লেখে তন্ত্র পুরাণ চণ্ডিকে।
শুধু জানি তুমি মা বর্ধমান ঈশ্বরী,
সর্বমঙ্গল প্রদায়িনী সর্বার্থসাধিকে ॥

জয়দুর্গা :

জয়দুর্গা পূজা হয় গলসী থানার উড়ো গ্রামে, বর্ধমান থানার মীর্জাপুর ও কলিগ্রামে।

উড়ো, গলসী থানার ১৩৭নং গ্রাম। গ্রামটির আয়তন ৪৬৫.৪৬ হেক্টর, লোকসংখ্যা ৩০৪৫, বেশীর ভাগ উগ্রক্ষত্রিয়। তপসিলী জাতির লোকসংখ্যা ১৪১৭। বাঘ রায়ের খাস তালুক উড়ো গ্রাম। এখানে বাঘ রায়ের প্রতিষ্ঠিত জয়দুর্গার মূর্তির নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে। বাৎসরিক ও মহাপূজা হয় আশ্বিন মাসের দুর্গাপূজার সঙ্গে। দেবীর পূজার সূচনা হয় দুর্গাপূজার নির্দিষ্ট দিনের ১৫

দিন আগে বোধনবমী থেকে। ঐ দিন জয়দুর্গার নবম্যাদি কল্পারম্ভ ও বোধন। মূর্তিটি কষ্টি পাথরের তৈরী দেবী অষ্টভুজা, দশভুজা নন। দেবীর মূর্তি আড়াই ফুট উচ্চ দেড় ফুট চওড়া। দেবীর গায়ে সোনার অলঙ্কার। দেবীর মূর্তি দুবার চুরি যায়। দেবীর গহনা বাসনপত্র সবই অপহৃত হয়। স্থানীয় লোকজনের বক্তব্য দেবীর গহনাপত্র ও বাসনকোসন খোয়া গেলেও দেবীর আদি মূর্তি অলৌকিকভাবে আবার ফিরে পাওয়া যায়। দেবীর মূর্তি পরিজনবিহীন। গলসী থানার গোহগ্রামের ভগবতী, সালানপুরের কল্যাণেশ্বরী, ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা ও আউসগ্রাম থানার কয়রাপুরের দেবীমূর্তির সঙ্গে উড়োর জয়দুর্গা মূর্তির অনেক মিল আছে। গ্রামের মানুষের ধারণা চণ্ডীমঙ্গলের নায়ক শ্রীমন্ত সদাগরকে দেবী এই মূর্তিতেই উদ্ধাব করেন। কিন্তু মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের "সপ্তম দিবস নিশা জাগরণ" পর্বে দেবী যখন শ্রীমন্তকে মশান থেকে উদ্ধার করতে যান তখন দেবী—

ধরিআ বিশাল কায়া হইলা দেবী মহা কায়া
কপালে ঠেকিছে দিনমুনি।
কোপে কম্পমান তনু ভুরুযুগে বাষ ধনু
গগন পুরিল ঘোর ধ্বনি।
সমারূঢ়া-মহাগজা দেবী হইল দশভুজা
কর-ধরি নানা প্রিয় বাণ
শূল ধনু আদি পাশে বারিঘ তোমার পাশে
সিখর সমর শরাসন।
গায়ে আরোপিল রাঙ্গি ভুসন্ডি ডাবুস টাঙ্গি
তবক বেলক চক্রবাণ
করে লইল ভিন্দি-পাল যমদন্ড করবাল
ফাঞি-ফট্ট কামাল কৃপাণ।

তারপর দেবী বৃদ্ধাবেশে কোটালের কাছে যান।

হাথে নড়ি কাখে ঝুড়ি উচ্চস্বরে বেদ পড়ি
বিনয় বলেন ধীরে ধীরে
করজোড়ে কৃতগর্ভা কুসুম চন্দন দুর্বা
আরোপিআ কোটালের শিরে।
আইলঙ তোমার সন্নিধানে
চিরজীবী হও তুমি অক্ষয়ধনের স্বামী
এই শিশু মোরে দেহ দানে।

সালিবান রাজার সঙ্গে যুদ্ধের সময়ও দেবী—

"রুষিআ সমরে / পুরিআ অম্বরে / কালিকা কাদম্বিনী।"

সে যাই হোক দেবী সম্বন্ধে মানুষের বিশ্বাসই বড় কথা।

উড়োর দেবীপূজা হয় শ্রীশ্রীচণ্ডীর চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত কালভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দু রেখাং শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখম্। এই জয়দুর্গা ধ্যানে। উড়ো গ্রামের দক্ষিণ পাড়ার মন্দিরে দেবীর মূর্তি শুরু থেকেই আছে। সেখানেই নিত্যপূজা ও নিত্যভোগের ব্যবস্থা। যে বাঘরায় বংশের প্রতিষ্ঠিতা দেবী, সেই রায়বংশ এখন ছয় ভাগ। প্রত্যেক বছর এক এক অংশীর পালা পড়ে। তখন অংশীর বাড়ীর সামনে তালপাতার তৈরী মন্ডপে দেবীর পূজার ব্যবস্থা। আগে রায়বাড়ী থেকে সন্ধিপূজার বলিদানের সময় বন্দুকের গুলি ছুঁড়ে বলির ক্ষণ জানানো হত—মনে হয় সর্বমঙ্গলা বাড়ীর কামানদাগার অনুকরণে তখন রায়-বাড়ীর বন্দুকের আওয়াজ শুনে আশেপাশের গ্রামেও অষ্টমীর বলিদান হত। এখন এসব বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আর বন্দুকও নাই আর বন্দুক ছোঁড়ার লোকও নাই। ছয় অংশীতে ভাগ হয়ে সব বন্ধ হয়ে গেছে। তবে একটা তামার বড় পাত্রে জলে ভাসে ছোট একটা তামার বাটি। ঐ বাটিতে একটা সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। এই সূক্ষ্ম ছিদ্রের জন্যই ছোট্ট বাটি ঠিক ২৪ মিনিটে ডুবে যায়। এই সময়কেই বলে তামি বা তাঁবি। এই তামি গুণেই বলিদানের ক্ষণ ঠিক হয়। নবমীতেও ছাগ বলি হয়। পুজোর খরচ চলে দেবোত্তর ৭ একর জমির ফসল ও বিশাল দীঘির মাছ বিক্রি করে। তবে রায়-পরিবার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পূজার সে পূর্ব জৌলুস চলে গেছে। তবু পুজোর অনুষ্ঠানের ধারা এখনও আছে। কতদিন থাকবে ভবিষ্যৎই বলতে পারে।

বর্ধমান থানার ১০৩নং কলিগ্রামেও জয়দুর্গার পূজা হয়। কলিগ্রাম বেশ বড় গ্রাম আয়তন ৬৯৭.৫৯ হেক্টর। জনসংখ্যা ২৫১৫। এর মধ্যে তপসিলী জাতির লোকসংখ্যা ১১৪০ জন। বর্ধমান তিনকোনিয়া বাস স্ট্যান্ড থেকে কুসুমগ্রামের পথে বাসে যাওয়া যায়। এখানকার জয়দুর্গাপূজা একটু অন্যরকমের। দেবীর মূর্তি প্রস্তরনির্মিত অষ্টভুজা মহিষমর্দিনীর মূর্তি। একটি সুউচ্চ চার-চাল চালাঘরে দেবী প্রতিষ্ঠিতা। দেবীর নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে। আষাঢ় মাসের রথের এক পক্ষকাল পরে দ্বিতীয়া তিথিতে দেবীর বাৎসরিক পূজা হয়। পূজার দিন দেবীকে রথে চাপিয়ে গ্রাম পরিক্রমা করা হয় এবং মহিষ, শূকর ও ছাগ বলি হয়। বলির

পূর্বে গ্রামের পঞ্চাননতলায় অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষেরা দেবীর উদ্দেশে পূজা করে ও বলি দেয়। এই পূজা রাখালী পূজা নামে খ্যাত। এই রাখালী পূজা না হলে মূল মন্দিরে দেবীর বলি হয় না। এই রাখালী পূজা ও শূকর বলিদান থেকে অনুমান হয় দেবী পূর্বে এখানকার অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মঠাকুর কিংবা মনসা হিসেবে পূজিতা হতো এবং সে পূজা হতো পঞ্চাননতলায়। পরে হয়ত গ্রামের উচ্চবর্ণের মানুষ বিগ্রহটিকে অষ্টভুজা মহিষমর্দিনী দেখে বাগ্দী বাউড়ীর কাছ থেকে নিয়ে চারচালা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন ও বাগ্দীদের সঙ্গে শর্তমত তাদের রাখালী পূজা মেনে নেন। দেবীর মূর্তির সঙ্গে সূর্যমূর্তি ও বিষ্ণুমূর্তিও আছে। এই বিষ্ণুমূর্তিকে শীতলাজ্ঞানে পূজা করা হয়।

বর্ধমান থানার মির্জাপুর গ্রামেও জয়দুর্গাপূজা হয়। মির্জাপুর গ্রাম ৬৬নং মৌজা, বেশ বড় গ্রাম, আয়তন ১১৬২.২১ হেক্টর, লোকসংখ্যা ৪৮৬৭ জন, তপসিলী জাতির সংখ্যা ১৮৬৩ জন ও সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতি আছে ৪৬৯ জন। জয়দুর্গা সাধারণের দেবী। গ্রামে একটি প্রাচীন মন্দিরে দেবীর শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। দেবীর শিলামূর্তি অষ্টভুজা মহিষমর্দিনী। এখানেও রথের পনের দিন পর দ্বিতীয়া তিথি থেকে চারদিনব্যাপী দুর্গাপূজার ন্যায় দেবীর বাৎসরিক পূজা হয়। দেবীর নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে।

উৎসবের প্রথম দিন বেদীস্থিত সিংহাসনসহ দেবীমূর্ত্তিকে প্রায় আট হাত কাঠের রথে চাপিয়ে ঢাক ঢোল কাড়া-নাকড়া বাজনাসহ শোভাযাত্রা বের করা হয়। এই শোভাযাত্রা মন্দির থেকে দেওয়ান দীঘি, কুসুমগ্রামের রাস্তা দিয়ে পশ্চিম প্রান্ত থেকে পূর্ব প্রান্তে হাজির হয়। একটি পুকুরপাড়ে বেদীতে দেবীকে রথ থেকে নামিয়ে স্থাপন করা হয়। এখানে যথারীতি পূজার পর আবার শোভাযাত্রা সহকারে দেবীকে মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। যাত্রাপথে অনেক গৃহস্থ রথ থামিয়ে মায়ের পূজা ও ছাগ বলি দেয়। এই পূজায় বৈশিষ্ট্য হল যে সাঁওতালরাও এই পূজায় অংশগ্রহণ করে ও তারাই দেবীর রথের দড়ি টানে। মন্দিরে স্থাপন করার পর ষোড়শোপচারে পূজা হয় ও বহু পাঁঠাবলি হয়। চারপাশের গ্রাম থেকে লোকে পূজা ও বলি নিয়ে আসে। বাউড়ী, বাগ্দী ও অন্যান্য নিম্নজাতির হিন্দুরা মন্দিরের বাইরে দেবীর উদ্দেশে পূজা ও বলি দেয়। এ পূজাও কিন্তু ব্রাহ্মণেরাই করে থাকেন। এই দিন রাত্রি দ্বিপ্রহর থেকে 'রওয়া পূজা' বের হয় ও গ্রামের প্রায় প্রতি গৃহস্থ বাড়ীতে দেবীকে নামান হয় এবং পূজা ও ছাগবলি দেওয়া হয়। উৎসবটি বহু প্রাচীন।

আউসগ্রাম থানার কয়রাপুর গ্রামের দেবীপূজা :

আউসগ্রাম থানার কয়রাপুর (১৭৯) বর্ধমান-সিউড়ি রোডের ধারেই অবস্থিত একটি ছোট গ্রাম। আয়তন ৫২১.৭৫ হেক্টর, লোকসংখ্যা ২০৪২, তপসিলী জাতি ৫৭১, সাঁওতাল উপজাতির সংখ্যা ৩৮০; গ্রামের মুসলমানও বেশ কয়েক ঘর আছে। তবে দাস বৈরাগ্য, কায়স্থ, গোপ, সদগোপ-এর সংখ্যাই বেশী। বর্ধমান থেকে গুসকরা (ভায়া সিউড়ি রোড) বাসে যাওয়া যায়; দূরত্ব বর্ধমান থেকে প্রায় ১৪ কিমি। গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—"দেবী"। দেবী অষ্টভুজা মহিষাসুরমর্দিনী কষ্টিপাথরের মূর্তি চার ফুট উঁচু ও আড়াই ফুট চওড়া। আদিদেবী জলতলবাসিনী ছিলেন। কিন্তু প্রায় ৩৬/৩৭ বছর আগে মূর্তিটি চুরি যায়। সেই আদি মূর্তিও অষ্টভুজা ও মহিষাসুরমর্দিনী ছিল, তবে পাশে কোমর কোমরনীর মূর্তি ছিল। নতুন মূর্তিটি বনপাস কামারপাড়ার ভাস্কর-শিল্পী ত্রিভঙ্গ রায় নির্মাণ করে দেন। দেবীপূজা হয় জটাজুট সমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃত-শেখরাম্। লোচনত্রয় সংযুক্তা; পূর্ণেন্দু সদৃশাননাম্... এই দুর্গার ধ্যান মন্ত্রে। দেবীর নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে। বর্তমান পুরোহিত শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়। বৎসরে দুবার মহাপূজা হয় একবার আশ্বিনে দুর্গাপূজার সঙ্গে আর একবার চৈত্রে বাসন্তীপূজার সময়। তবে বাৎসরিক পূজার চৈত্রের আড়ম্বর বেশী। রামনবমীতে মহাপূজা ও বলিদান হয়। প্রচুর লোকসমাগম ও বিরাট মেলা বসে। দেবীর যারা মানত করে তারাও রামনবমীতে ছাগবলি দেয়। আশ্বিনে দুর্গাপূজার চারদিনই পূজা ও বলিদান হয়। তবে এ সময় মেলা হয় না।

এক অনন্য দেবীমূর্তি ভৈরবেশ্বরী

বর্ধমান শহরের সর্বমঙ্গলা পাড়ার বর্ধমানেশ্বরী সর্বমঙ্গলা স্বমহিমায় বিরাজমান। কিন্তু এই মন্দির এলাকার ঠিক পশ্চিমে মিদ্যাপুকুরের দক্ষিণদিকে আছে শিখগুরু নানকের পাদপূত গড়গড়াঘাট ও ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রাচীন গুরুদ্বার, আর এই পুকুরের উত্তরপাড়ের এক গলিতে জরাজীর্ণ মন্দিরাভ্যন্তরে আছে এক বিরল কালীমূতি; ভৈরবেশ্বরী। সাধারণ্যে এর পরিচিতি অন্ধকালীবাড়ী বা উমা ঠাকুরের কালীবাড়ী বলে। অন্ধকালীবাড়ী কথাটি দ্ব্যর্থক হতে পারে। প্রথমত এই দেবীর সেবাইত অশীতিপর বৃদ্ধ অন্ধ উমাকান্ত ভট্টাচার্য। দ্বিতীয়ত, এখন যদিও কিছু আলোর ব্যবস্থা হয়েছে আগে মন্দির এক অন্ধকার গলির মধ্যেই ছিল।

ভৈরবেশ্বরী এক দুর্লভা কালীমূর্তি। ইনি কিন্তু লাকুর্ডাডির মশানে অধিষ্ঠিতা প্রাচীনা শিলাময়ী দুর্লভা কালী নন। ইনি আক্ষরিক অর্থেই দুর্লভা। মূর্তিটি প্রায়

৪ ফুট উচ্চ ৩ ফুট শবরূপী মহাদেবের উপর দণ্ডায়মানা, দেখতে কতকটা দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর মূর্তির মত। তবে এই মূর্তি প্রাচীন পদ্ধতিতে নির্মিত —অর্ধডিম্বাকৃতি মুখমণ্ডল, পটলচেরা আকর্ণ বিস্তৃত নয়ন, বাঁশপাতার মত ভ্রূযুগল—ঘোর কৃষ্ণবর্ণা, করালবদনা, ঘোরা চতুর্ভুজা, লম্বাজিহ্বা, কণ্ঠাবযুক্ত মুণ্ডালী চতুর্বাহুযুক্তা বরাভয়করা দক্ষিণা কালিকা মূর্তি। প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে অঙ্গরাগ হয়। এই দুর্লভা মূর্তির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি সম্পূর্ণরূপে একখণ্ড বৃহৎ নিমগাছের গুঁড়ি খোদাই করে তৈরী। এইরূপ নিমকাঠের কালীমূর্তি দেখা যায় কালনায়। অলৌকিক ভাবধারায় নির্মিত চতুর্ভুজা সিদ্ধেশ্বরী ভৈরবী মূর্তিও নিমকাঠের তৈরী। নিমকাঠ বা অন্য কাঠের মূর্তি অনেক জায়গায় দেখা যায়—পুরীর জগন্নাথ-মূর্তি সম্পূর্ণ কাঠের। কালনা থানার গোপালদাসপুরের রাখালরাজ-এর মূর্তি নিমকাঠের, খণ্ডঘোষ থানায় বেদগর্ভের শ্রীপাট কৈয়রের বেদগর্ভ সেবিত মদনগোপাল, বিজয়গোপাল ও লক্ষ্মী জনার্দনের মূর্তি নিমকাঠের। বড়ো বলরামের বলরামমূর্তিও দারুমূর্তি, কাটোয়ার গৌরাঙ্গ বাড়ীর গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, জগন্নাথ ও ষড়ভুজ গৌরাঙ্গর মূর্তিও দারুময়। শ্রীচৈতন্যের পরবর্তীযুগে কৃষ্ণ-বলরাম, জগন্নাথের দারুময় মূর্তি অনেক স্থলে দেখা গেলেও একখণ্ড নিমকাঠের এ কালীমূর্তি অনন্য।

উমাকান্তবাবুর মতে এ কালীমূর্তি ৫০০ বছরের প্রাচীন; এ অঞ্চলে সাধারণ্যে ধারণা মূর্তিটি ৩০০ বছরের প্রাচীন। ঐতিহাসিক বিনয় ঘোষের মতে কাঠের বিগ্রহের প্রচলন সপ্তদশ শতকের আগে ছিল না। কাজেই উমাকান্তবাবুর ৫০০ বছরের প্রাচীনত্বের দাবী টেকে না। যা হোক, এ প্রসঙ্গ পরে আলোচিত হবে।

দেবীর নিত্যপূজা ও শীতলের ব্যবস্থা আছে—উমাকান্তবাবুই এখনও পূজা করে আসছেন, তবে অসুস্থ হলে অন্য পূজারী পূজা করে। কার্তিক মাসের অমাবস্যায় দেওয়ালীতে দেবীর মহাপূজা হয় তখন মানসিকের ৩টি পাঁঠাবলি হয়। আর একবার সাড়ম্বরে মহাপূজা হয় মাঘ মাসের রটন্তী চতুর্দশী তিথিতে—ঐ দিন দেবীর প্রতিষ্ঠা তিথি। এই প্রতিষ্ঠার কাহিনী অদ্ভুত।

উমাকান্তবাবুর কথায় বর্তমান রাজপরিবারের ঊর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ ছিলেন—কাপুরবংশীয় ভৈরবচাঁদ কাপুর। ভৈরবচাঁদ ছিলেন নিঃসন্তান। বংশরক্ষার আগ্রহে আকুলভাবে দিবারাত্রি জগন্মাতা কালিকাদেবীকে ডাকতেন। তাঁর আকুল ক্রন্দনে দেবী সত্যিই বিচলিত হয়ে একরাত্রে ভোরবেলায় ভৈরবচাঁদকে স্বপ্ন দিলেন—"তোর সন্তানকামনা পূর্ণ হবে, আমিই তোর কাছে তোর মেয়ে হয়ে থাকবো। তোদের বাড়ীর

পূবদিকে কিছুদূর গেলেই দেখবি এক পুকুরের উত্তরপাড়ে এক বিশাল নিমগাছ—ঐ গাছেই আমার অধিষ্ঠান। তুই ঐ গাছ কাটিয়ে ওর গুঁড়ি দিয়ে আমার পূর্ণাবয়ব মূর্তি তৈরী করিয়ে ঐ স্থানেই প্রতিষ্ঠা কর—তোর সন্তানকামনা পূর্ণ হবে।" ভৈরবনাথ ভোরে উঠেই ছুটলেন পূর্বদিকে পুকুর ও নিমগাছের খোঁজে। কিছুদূর গিয়েই দেখলেন একটি ছোট্টপুকুর। পুকুরের উত্তর পাড়ে দেখলেন বিশাল নিমগাছ। স্থানটি তাঁরই জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। এরপর নিমগাছ কাটিয়ে দক্ষ মিস্ত্রীকে দিয়ে এই অপরূপা দক্ষিণা কালিকা মূর্তি তৈরী করিয়ে নিমগাছের স্থানেই মন্দির নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠা করলেন—মাঘ মাসের রটন্তী চতুর্দশী তিথিতে। এই প্রতিষ্ঠা-দিবসে আজও সাড়ম্বরে দেবীর মহাপূজা সম্পন্ন হয়। মাঘ মাসে স্থানীয় লোকের কাছে চাঁদা তুলে এবং পূজার্থীদের দানে সাড়ম্বরে পূজা ও বলিদান হয়। উমাকান্তবাবুর বাড়ী দামোদর পাড়ে খণ্ডঘোষ থানার সগড়াই-এর কাছে জুবিলা (জে.এল. ৭৬)। উমাকান্তবাবুর কর্তাবাবা (পিতামহ) শ্রীনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন মহারাজ বিজয়চাঁদের অন্যতম সভাসদ। মনে হয় সেই সূত্রেই উমাকান্তবাবু সেবাইত হয়েছেন। অবশ্য এই সেবাইত হওয়ার পিছনেও এক ইতিহাস আছে। ভৈরবচাঁদ তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে রাজবংশেরই বিভূতি কাপুরকে দত্তক নেন। বিভূতি কাপুররা তিন ভাই—বিভূতি, বিমল ও কচি। এই তিন ভাই মিলে খুব সম্ভবত বাংলা ১৩৬১ সালে রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে উমাকান্ত ভট্টাচার্যকে বংশানুক্রমে ভৈরবেশ্বরীর সেবাইত নিযুক্ত করে দেন। এর জন্য বার্ষিক ব্যয় বরাদ্দ করেন ১৫২ টাকা। উমাকান্তবাবু বলেন বিভূতিবাবু ও তাঁর ভাইরা মারা গেছে—বিভূতিবাবুর বড়ছেলে মুরারি আছে কিন্তু কেউ তাঁকে এই টাকা দেয়নি। বার্ষিক বরাদ্দ ঐ কাগজে-কলমে। সাধারণের দানেই দেবীর সেবাপূজা চলে। উমাকান্তবাবুর চার ছেলে; একমাত্র ছোট ছেলেই তাঁর কাছে থাকে আর সব আপন আপন বাড়ী করে চলে গেছে। উমাকান্তবাবুর আশা তাঁর ছোট ছেলেই মায়ের পূজা চালিয়ে যাবেন। দেবীর কোন প্রচার নেই, কোন রমরমা নেই; তবু আজও বিরলমূর্তি দারুময়ী দেবী অন্ধকার এক গলির মধ্যে জীর্ণমন্দিরাভ্যন্তরে এক অশীতিপর অন্ধ-বৃদ্ধ সেবাইতের হাতেই পূজা পেয়ে যাচ্ছেন।

দেবীর মূর্তি যে ৫০০ বছরের প্রাচীন হতে পারে না—সেকথা আগেই বলেছি। এখন ৩০০ বছরের প্রাচীনত্ব নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

উমাকান্তবাবুর কথায় ভৈরবচাঁদ বর্তমান রাজপরিবারের, উর্ধতন পঞ্চম পুরুষ ছিলেন। রাজবংশের শেষ রাজা উদয়চাঁদ মহতাবের উর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ হচ্ছেন মহারাজ তেজচন্দ্র (১৭৭০–১৮৩২)। তাঁরই রাজত্বকালে বর্ধমানে কাপুরবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কাশীনাথ কাপুর। তিনি পাঞ্জাবের

কোটলী মহল্ল্যা থেকে সপরিবারে জগন্নাথ-দর্শনে বের হয়ে বর্ধমানে আসেন অষ্টাদশ শতকের আশির দশকে। মহারাজ তাঁকে স্বজাতিভুক্ত দেখে ময়ূরমহল এলাকায় বসতি করান। কাশীনাথ যখন আসেন তখন তাঁর পুত্র পরাণচাঁদের বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি (পরাণচাঁদের জন্ম ১২৫১ সালের অগ্রহায়ণ অর্থাৎ ১৮৫৪ সালের ডিসেম্বরে)। পরাণচাঁদের একপুত্র চুনীলালকে তেজচন্দ্র দত্তক নেন—নাম হয় মহতাবচাঁদ আর এক পুত্র রাসবিহারী, সোয়াইনিবাসী—জহুরিলালকে দত্তক নেন, নাম হয় বনবিহারী কাপুর। বনবিহারী বিজয়চাঁদের নাবালক অবস্থায় কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্-এর ম্যানেজার ছিলেন। এই বনবিহারীর কনিষ্ঠ পুত্র বিজনবিহারী কাপুর। ভৈরবচাঁদ এদের বংশেরই কেউ হতে পারেন। তাছাড়া উমাকান্তবাবু বলেছেন ভৈরবচাঁদ বিভূতিভূষণ কাপুরকে দত্তক নেন। আমি যখন সেটেলমেন্ট বিভাগে পঞ্চাশের দশকে রাজবাড়ী অফিসে অধিষ্ঠিত ছিলাম তখন এই বিভূতিবাবু ঐ বিভাগে খুব সম্ভবত মোহরার পদে কাজ করতেন। তখনই তাঁর বয়স প্রায় ৫৫।৫৬; কাজেই এতদিন তিনি বেঁচে থাকলে তাঁর বয়স ১০০-এর কিছু বেশী হতো। কাজেই আমার ধারণা ভৈরবেশ্বরী মূর্তি বড়জোর সোয়া-শ বা দেড়শ বছরের বেশী মনে হয় না। সে যাই হোক, সাধারণ মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস, দেবী ৩০০ বছরের প্রাচীন—এ বিশ্বাসকে সহজে হটানো যাবে না। যাক বা না-যাক, দেবী ভৈরবেশ্বরী ৩০০ বছরের প্রাচীনত্বের ছাপ নিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে স্বমহিমায় বিরাজ করবেন। তবে আমার মতে একটি ট্রাস্ট কমিটি গঠন করে অচিরেই এই মন্দিরের আমূল সংস্কার দরকার ও সর্বমঙ্গলা মন্দিরের ট্রাস্ট কমিটির মত ট্রাস্ট কমিটির দ্বারা দেবীর মূর্তির যথাযথ সংরক্ষণ ও সেবাপূজার সুবন্দোবস্ত করা দরকার আর সেই সঙ্গে মিডিয়ার সাহায্যে দেবীর প্রচারও দরকার।

কালনার মহিষমর্দিনী :

কালনায় মহিষমর্দিনীর পূজা আশ্বিনে দুর্গাপূজার সঙ্গেই হয়। কালনা মিউনিসিপ্যাল শহর। আয়তন ৬.৪৭ বর্গ কি.মি., লোকসংখ্যা ৪৭২২৯, এর মধ্যে তপসিলী জাতির সংখ্যা ১২৭০৬ ও সাঁওতাল উপজাতির সংখ্যা ৪৮৮। বর্ধমান-কালনা বাসে যাওয়া যায়। ব্যাণ্ডেল, কাটোয়া রেললাইনে লোকাল ট্রেনেও যাওয়া যায়। ব্যাণ্ডেল থেকে দূরত্ব ৪২ কি.মি.। প্রকৃত নাম অম্বিকা কালনা তবে বর্তমানে কালনা বলেই বেশী পরিচিত। বর্ধমান জেলার পূর্বাংশে অবস্থিত পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে এর নাম ছিল অম্বুয়া মুলুক। অম্বিকা দুর্গারই অপর নাম। বিনয় ঘোষ তাঁর পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—আসলে অম্বিকা হলেন

জৈনধর্মীদের বিখ্যাত উপাস্য দেবী, পরে বাংলার পলিমাটিতে দুর্গায় পরিণত হয়েছেন। জৈনদেবী অম্বিকার উপাসনা শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দশম-একাদশ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বিশেষ প্রচলিত ছিল মনে হয়। তাঁর মতে জৈনদেবী ক্রমে বৌদ্ধ ও হিন্দুদেবদেবীর গুণাগুণের অধিকারী হয়েছিলেন। অম্বিকাকে তাঁরা নানারূপে কল্পনা করেছিলেন—দ্বিভুজা, চতুর্ভুজা, অষ্টভুজা এমনকি বিংশতিভূজা পর্যন্ত। অষ্টভুজার হাতে শঙ্খ, চক্র, ধনু, খড়্গ, শস্য, আম্রলুম্বি, পাশ প্রভৃতি অস্ত্র আছে। কুব্জিকাতন্ত্রে সিদ্ধপীঠ প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে—বদরী চ মহাপীঠ অম্বিকা বর্দ্ধমানকম্। ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার তাঁর Sakta Pithas গ্রন্থে বলেছেন অম্বিকা নামক সিদ্ধপীঠের অবস্থান হলো বর্তমান অম্বিকা কালনায়। অন্যদিকে অম্বিকা ও প্রাক দ্রাবিড়িয়ান মাতৃকাদেবীর মূর্তি ও পূজা পদ্ধতির মধ্যে অনেক মিল পাওয়া যায়। জৈন অম্বিকা মূর্তির সঙ্গে নারকেলডাঙ্গার জগৎগৌরী, ক্ষীরগ্রামের যুগাদ্যা ও বর্ধমানের সর্বমঙ্গলার মিল থাকা সম্ভব বলে অনেকে মনে করেন। মহিষমর্দিনীকে অম্বিকারূপেই বরণ করা চলে। James Long-এর 1846 সালের বিবরণে দেখা যায়—The village of Ambika is situated near it (mission house), so was called from 'Ambika'—Goddess Durga। দুর্গা ও অম্বিকার অপর নাম মহিষমর্দিনী।

আশ্বিনে অম্বিকামূর্তি যদি দেখিতে পাই
তবে সে প্রত্যয় হয় ঘরে ফিরে যাই ॥

অম্বিকা কালনার মহিষমর্দিনীর পূজা বহুকালের—বিনয় ঘোষের বক্তব্য বিশ্বাস করতে হলে এই পূজা দশম-একাদশ শতাব্দী থেকে চলে আসছে নানা নামে নানা রূপে। নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহিষমর্দিনী বলে প্রচলিত ধারণা কিন্তু বর্ধমান গেজেটিয়ার ১৯৯৪এ সিদ্ধেশ্বরীকে নগরের অধিষ্ঠাত্রী বলা হয়েছে— "The presiding deity of the town is the goddess Ambika who is said to be a Jain deity of the past merging into the concept of Sakti of the Hindus. The position of the presiding deity is now assumed by Siddheswari represented by an icon of Kali with four hands." দুর্গাপূজার সময় ষষ্ঠী থেকে পাঁচদিন দেবীর মহাপূজা ও বলি হয়। প্রতি বৎসর পরিজন পরিবৃত মায়ের দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি গড়ে মহাসমারোহে পূজা হয়—বিজয়ায় বিসর্জন, দেবী নিজালয়ে ফিরে যান। সম্বৎসরব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ।

কাঞ্চননগরের কঙ্কালেশ্বরী ও চামুণ্ডার আদিমতা :

বর্ধমানের সন্নিহিত পশ্চিমাংশে কাঞ্চননগর একটি ছোট পল্লী। জে.এল.-২৬; আয়তন ৩১৯.৩৯ হেক্টর, লোকসংখ্যা ১৮৮২, এদের মধ্যে তপসিলী জাতিভুক্ত ৪৭৪। জনগণের বেশীর ভাগ বর্তমানে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু। অথচ এই কাঞ্চননগরই ছিল একসময় বাণিজ্যকেন্দ্র, বণিকশ্রেষ্ঠ ধূসদত্তের বাসস্থান; পরে মহারাজ কীর্তিচাঁদ এখানে নগর পত্তন করেন—গড়ে ওঠে সোনার নগর কাঞ্চননগর। এখন সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। এখন শহরের উপকণ্ঠে একটা পল্লী—শহরতলী। বর্ধমান কোর্ট থেকে উদয়পল্লী টাউন সার্ভিস বাসে যাওয়া যায়। কাঞ্চননগরের এককালে খ্যাতি ছিল ক্ষুদ্রশিল্প ছুরিকাঁচির জন্য—সে শিল্পের রমরমা চলে গেছে—কোন রকমে নিজের অস্তিত্বটুকু বজায় রেখেছে। কাঞ্চননগরের খ্যাতি এখন বারদুয়ারী ফটক; জোড়াবাংলা মন্দির আর অধিষ্ঠাত্রীদেবী কঙ্কালেশ্বরীর জন্য।

কঙ্কালেশ্বরীর আবির্ভাব সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী জড়িয়ে আছে। প্রবাদ : এই মূর্তি দামোদরের নিকটবর্তী কোন এক স্থানে খড়্গেশ্বর রাজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হন; পরে উক্ত রাজবংশ নিশ্চিহ্ন হলে রাজবাড়ীর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মূর্তি চাপা পড়ে; বহু বৎসর পর পরিব্রাজক কমলাকান্ত নামে এক সাধক মূর্তিটি উদ্ধার করে কাঞ্চননগরে স্থাপন করেন ও মায়ের নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেন। অন্য এক কিংবদন্তী অনুসারে দেবী দামোদরের বন্যায় প্রায় ৩৫ ফুট বালির নীচে চাপা পড়ে। বালি তোলার সময় দৈবক্রমে স্থানীয় ধোপারা এটি দেখতে পায় ও পাথরের শিলা মনে করে এর পিছনে কাপড় কাচতে থাকে। পরে হঠাৎ শিলাটি উল্টে গেলে তারা মায়ের ভয়ঙ্করী মূর্তি দেখে আতঙ্কিত হয়। তাদের মুখ থেকে মায়ের ভয়ঙ্করী মূর্তির কথা প্রচারিত হয়; তান্ত্রিক সাধক সম্ভবত পরিব্রাজক কমলাকান্ত এটিকে কাঞ্চননগরের নবরত্নবিশিষ্ট জোড়াবাংলা মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন ও সেখানে মায়ের নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেন। ধীরে ধীরে মায়ের মাহাত্ম্য চারিদিকে প্রচারিত হয় ও জনসাধারণের দানে মায়ের নিত্যপূজা ও কার্তিক মাসের অমাবস্যায় মহাপূজার ব্যবস্থা হয়। দেবী অষ্টভুজা; কৃষ্ণপ্রস্তরের ওপর ক্ষোদিত মূর্তি। উচ্চতায় ছয় ফুট/সাড়ে ছয় ফুট ও প্রস্থে প্রায় দেড় ফুট। দেবী লোলজিহ্বা, কোটরাক্ষী; গলায় মুণ্ডমালা ও রুদ্রাক্ষের মালা, ডানদিকের চার হাতের দুই হাতে ত্রিশূল, এক হাতে অসি ও চতুর্থ হাতে নরমুণ্ড, বাম দিকের চারটি হাতের দুটিতে নরমুণ্ড, একটিতে পরশু ও আর এক হাতের অনামিকা দংশন-উদ্যত। প্রায় ধ্যানানুগ ভীষণ দর্শনামূর্তি—ত্রিনয়না, কোটরাক্ষী, নির্মাংসা, অস্থিসারা, শবরূপে

শায়িত দেবাদিবের উপর দণ্ডায়মানা, শিরে একটি গজ, পদতলে করজোড়ে শায়িত পুরুষের শব, অনামিকা দংশনের দ্বারা দেবী ভয়হরণ করছেন।

মনে হয় চামুণ্ডার আদি ও অকৃত্রিম রূপ কাঞ্চননগরের কঙ্কালেশ্বরীর মধ্যে রূপায়িত। তিনি নতকুচ, চণ্ডমুণ্ডকে সংহার করে দেবী নৃত্য করছেন—পদতলে শিব ও মহাকাল, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহাদেব তাঁর আরাধনা করছেন। মোক্ষদাত্রী তিনি কালীরূপে অভয় দিচ্ছেন। চামুণ্ডার ধ্যানেও প্রায় এইরকম মূর্তির বর্ণনা, ডান হাতে তার পানপাত্র, অসি, ডমরু ও শূল, বামহাতে ত্রিশূল দিয়ে চণ্ডমুণ্ডকে বধ করছেন। কাঞ্চননগরের এই চামুণ্ডারূপী কঙ্কালেশ্বরী মূর্তির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি আক্ষরিক অর্থেই কঙ্কালেশ্বরী; অস্থির উপর শিরা-উপশিরা ও কঙ্কালের ন্যায় পাথরের উপর ক্ষোদিত। মনে হয় এ মূর্তির ভাস্করের শারীরবিজ্ঞান ও মায়ের ধ্যান সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ছিল। এই মূর্তি অনন্য ও প্রায় বিরল। নবরত্ন মন্দিরটি প্রায় ২৫০ বছরের প্রাচীন; মন্দির সংলগ্ন বিল্বকুঞ্জে তন্ত্রসাধনার পঞ্চমুণ্ডী আসন; বহু তন্ত্রসাধক এখানে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। মন্দিরে কোন টেরাকোটা অলংকরণ নেই।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত চামুণ্ডার এই কঙ্কালেশ্বরী মূর্তিতে ধৃতা চামুণ্ডার উৎপত্তি সম্বন্ধে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন—কৃষ্ণবর্ণা ভয়ঙ্করী চামুণ্ডাদেবীকে আমরা কালী বা কালিকা দেবীর সহিত পরবর্তীকালে অভিন্ন দেখিতে পাই। কিন্তু মনে হয় ইঁহারা মূলে দুই দেবী ছিলেন। আকার সাদৃশ্যে ও সাধর্মে ইঁহারা পরবর্তীকালে এক হইয়া গিয়াছেন।

পুরাণে চামুণ্ডার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে তাতে দেখা যায়—অসুরপতি দুই ভাই শুম্ভ ও নিশুম্ভ; তাদের কর্তৃত্বে স্বর্গে দেখা দেয় সন্ত্রাস। দেবতারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেলেন ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মা তাঁদের অভয় দিয়ে হিমালয়ে স্থিতা দেবী অম্বিকা দুর্গার নিকট সমুপস্থিত হয়ে নিজেদের বিপদের কথা জানাতে বলেন। দেবী তাঁদের অভয় দিয়ে শুম্ভ-নিশুম্ভ বধে উদ্যোগী হলেন। তাঁর শরীরকোষ থেকে আর এক দেবী নির্গতা হলেন। দেবীর শরীরকোষ থেকে নির্গতা হয়েছিলেন বলে দেবীর নাম হলো কৌশিকী। কৌশিকী অপরূপা সুন্দরী ছিলেন—তাঁর রূপে শুম্ভ-নিশুম্ভ মুগ্ধ হলেন। তাঁরা দেবীর পাণিপ্রার্থী হলেন। দেবী তাদের তাঁর সম্মুখে সমুপস্থিত হয়ে যুদ্ধে পরাস্ত করতে বললেন। শুম্ভ-নিশুম্ভ তখন চণ্ড ও মুণ্ডের চতুরঙ্গ বাহিনী নিয়ে দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হলেন। তাদের রণসজ্জা দেখে দেবীর মুখ ক্রোধে কালিবর্ণ হয়ে গেল, তখন তাঁর ভ্রুকুটি ললাট থেকে করালবদনা কালীমূর্তি আবির্ভূতা হলেন।

ভ্রূকুটি-কুটিলাং তস্যা ললাটফলকাদ্ দ্রুতম্।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসি পাশিনী ॥
বিচিত্র খট্বাঙ্গধরা নরমালা বিভূষণা।
দ্বীপিচর্ম পরিধানা শুষ্ক মাংসাতি ভৈরবা ॥

এই মূর্তিতেই দেবী অসুরবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন ও শুম্ভ-নিশুম্ভকে সংহার করলেন এবং তাদের মুণ্ড নিয়ে পার্বতী অম্বিকাকে উপহার দিলেন। তখন দেবী বললেন—

যস্মাচ্চণ্ড মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি, ভবিষ্যসি ॥

(মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

বিনয় ঘোষও চামুণ্ডাদেবীর সংস্কৃতির সমন্বয়ের কথা বলেছেন—"চামুণ্ডা হিন্দুদেবী হলেও একেবারে বৌদ্ধপ্রভাব মুক্ত নন। হিন্দু বৌদ্ধ যাই হোন তিনি, তাঁর মধ্যে অনার্য ও বৈদিক প্রভাবও অল্প নয়। চীনের নিষিদ্ধ শহর পিপিঙে যেসব দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে তার মধ্যে চামুণ্ডার মূর্তিও আছে। চামুণ্ডা যে বজ্রযানী বৌদ্ধদের দেবী ছিলেন তা বেশ বোঝা যায় এবং চামুণ্ডার পূজা পূর্ব ভারত থেকে নেপাল হয়ে চীন পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। বৌদ্ধ সাধনায় বলা হয়েছে মহাকাল সপ্তদেবী পরিবৃতা হয়ে থাকবেন। প্রত্যেকেরই মূর্তি ভয়াবহ। পূর্বে মহামায়া, দক্ষিণে যমদূতী, পশ্চিমে কালদূতী, উত্তরে মহাকাল নিজে। প্রত্যেকেরই মূর্তি ভয়াবহ। এছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব কোণে কালিকা, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে চর্চিকা, উত্তর-পশ্চিম কোণে চণ্ডেশ্বরী, উত্তর-পূর্ব কোণে কুলিদেবী থাকবেন। এদেরও প্রত্যেকের মূর্তি ভয়াল। চালুক্য ভাস্কর্যে এবং উড়িষ্যা ও বাংলার চামুণ্ডা অস্থিচর্মসার কোটরাক্ষীরূপে রূপায়িতা। বিনয় ঘোষ মনে করেন পালযুগের বৌদ্ধ ও হিন্দুতান্ত্রিক দেবদেবীর মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দুতান্ত্রিক দেবদেবীর মিলন, মিশ্রণ ও একাত্মীকরণ ঘটতে থাকে। বৌদ্ধ ও হিন্দুতান্ত্রিক উভয়ের লক্ষ্য ছিল অসভ্য ও অনার্য আচারপরায়ণ জনসাধারণকে নিজেদের ধর্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করা। এই সময় আরও অনেক দেবদেবীর মতন চামুণ্ডাদেবীও বাংলার ধর্ম-সংস্কৃতির ইতিহাসে একটা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বর্ধমানের কঙ্কালেশ্বরী ও মন্তেশ্বরের চামুণ্ডা তারই স্মৃতিবহন করছে।

মন্তেশ্বরের চামুণ্ডা সার্বজনীন গ্রাম্যদেবী। গ্রামের চক্রবর্তীরা এঁর পুরোহিত। চামুণ্ডার নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে। চামুণ্ডার মহাপূজা হয় বৈশাখ মাসের শুক্লাষষ্ঠী থেকে দশমীর দিন পর্যন্ত পাঁচ দিন। ষষ্ঠীর দিন ঘটপূজার মধ্য দিয়ে পূজার সূচনা। সপ্তমীতে পূজার পর দেবীকে গাঁয়ের পুকুরে ডুবিয়ে রাখা হয়।

অষ্টমীর দিন দুপুরে পুকুর থেকে তুলে গ্রামের মেড়তলায় স্থাপন করে গ্রামের ভট্টাচার্যদের পূজা ও বলিদান হয়। সন্ধ্যায় দেবীকে মাইচতলায় আনা হয়। সেখানে দেবীর মহাসমারোহে ষোড়শোপচারে দেবীপূজা ও বলিদান হয়। পূর্বে মহারাজের মহিষ বলিদান হতো—বর্তমানে জমিদারী উচ্ছেদের পর মহারাজের প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তির আয় থেকে এখন খরচ চলে। এরপর সর্বসাধারণের মানত করা ছাগল, ভেড়া এমন কি শুয়োর পর্যন্ত বলি হয়। এরপর গ্রামের ধীবর ও ব্যগ্রক্ষত্রিয়রা চামুণ্ডাকে সিংহাসনে স্থাপন করে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে—গ্রামের স্থানে স্থানে নির্মিত বেদীতে দেবীকে স্থাপন করে পূজা ও বলিদান দেওয়া হয়। দশমীর দিন দেবীকে নিজ মন্দিরে স্থাপন না করা পর্যন্ত দেবী বাইরেই থাকেন। দেবীকে নিয়ে ধীবর ও ব্যগ্রক্ষত্রিয়ের দ্বারা গ্রাম-প্রদক্ষিণ ও মহাপূজা এবং বাৎসরিক পূজার চারদিন দেবীকে মন্দিরের বাইরে পূজা করার প্রথা থেকে অনুমান হয় দেবী প্রথমে নিম্নবর্ণের দ্বারাই পূজিতা হতেন, পরে গ্রামের ভট্টাচার্যরা তাদের কাছ থেকে দেবীকে নিয়ে গিয়ে দেবীর ওপর উচ্চবর্ণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন ও মহারাজের কাছ থেকে ভূসম্পত্তি দেবোত্তর হিসেবে লাভ করেন। কিন্তু মহাপূজার সময় ধীবর ও বাগ্‌দীদের পূর্ব অধিকারকে স্বীকৃতি দেবার জন্য মন্দিরের বাইরে পূজা এবং ধীবর ও বাগ্‌দীদের দ্বারা দেবীকে নিয়ে গ্রাম-প্রদক্ষিণ করানোর অধিকার মেনে নেন। দেবীর নিকট মহিষ, শুয়োর বলিদান ও দেবীকে গ্রাম-প্রদক্ষিণ অনার্য সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী।

মন্তেশ্বর গ্রামে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর পূজা হয়। এই গ্রামে বাগ্‌দীদের ও নাপিতদের ধর্মরাজ পূজা ও বাগ্‌দীদের দ্বারা ধর্মরাজ ও মদের ভাঁড়াল নিয়ে গ্রাম-প্রদক্ষিণ থেকেও মনে হয় এ অঞ্চলে নিম্নবর্ণের মানুষ ও অনার্যদের প্রথমে প্রতিপত্তি ছিল।

কালনার সিদ্ধেশ্বরী :

অম্বিকা কালনা শহরের অধিষ্ঠাত্রীদেবী সিদ্ধেশ্বরী। দেবী চতুর্ভুজা কালীর দারুমূর্তি। দেবী জোড়বাংলা রীতিতে নির্মিত মন্দিরে অধিষ্ঠিতা। মন্দিরটি বর্ধমানের মহারাজ চিত্রসেন ১৬১৩ শকাব্দে (১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠালিপিতে সোনামুখীর মিস্ত্রী শ্রীরামচন্দ্রের নাম ক্ষোদিত আছে।

শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১৬৬৩।২
২৬।৬ শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী দেবী
শ্রীযুক্ত মহারাজা চিত্রসেন রায়স্য।
মিস্ত্রি শ্রীরামচন্দ্র—

বিনয় ঘোষের মতে কাঞ্চননগরের জোড়াবাংলা মন্দির ঐ একই হাতের তৈরী মন্দির। যদিও চিত্রসেন কর্তৃক ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত কিন্তু দেবী আরও প্রাচীন। চিত্রসেনের বহু পূর্বে রূপরাম চক্রবর্তীর তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যে দেবীর উল্লেখ পাই।

তোমার মহিমা মাতা কি বলিতে পারি
অম্বুয়ার ঘাটে বন্দো কালিকা ঈশ্বরী॥

রূপরামের কাব্যরচনাকাল ১৫৭১ শকাব্দ (১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দ)—"রসের উপরে রস তাহে রস দেহ" অর্থাৎ ৯৯৯ হিজরী অর্থাৎ ১৫৭১ শকাব্দ। কাজেই সপ্তদশ শতকের পূর্ব থেকেই সিদ্ধেশ্বরী যে কালনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এবিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিন্তাহরণ চক্রবর্তী প্রমুখের মত উদ্ধৃত করে ড. পল্লব সেনগুপ্ত মন্তব্য করেছেন—দুর্গাপূজার হদিশ যেখানে ১২শ শতকে মিলছে, সেখানে কালীপূজার সূচনা আরও শ'চারেক বছর পরে। কাজেই মনে হয় সিদ্ধেশ্বরী প্রতিষ্ঠা ষোড়শ শতকেই হয়েছিল।

দেবীর নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে। কার্তিকের অমাবস্যায় আড়ম্বর সহকারে দেবীপূজা ও বলিদান হয়।

কাটোয়ার সিদ্ধেশ্বরীতলাতে কাটোয়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সিদ্ধেশ্বরী অধিষ্ঠিতা। প্রায় ৪০০ বছর আগে এই সিদ্ধেশ্বরী বিশু ডাকাতের আরাধ্যা দেবী ছিলেন বলে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। বিশু ডাকাতের মৃত্যুর পর দেবীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে আলম খান কাটোয়ায় বসতি স্থাপন করার সময় দেবীর সন্ধান পান ও হিন্দুদের দান করেন। উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে মুচিরাম দত্ত দেবীর নতুন মন্দির নির্মাণ করে দেন—এই মন্দিরেই দেবী প্রতিষ্ঠিতা। মতান্তরে রামানন্দ নামে এক সাধক এই মূর্তি আবিষ্কার করেন ও পঞ্চমুণ্ডীর আসন স্থাপন করে সাধনা করেন এবং সিদ্ধিলাভ করেন। দেবীর নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে। দেবী চতুর্ভুজা পাষাণময়ী, কার্তিকের অমাবস্যায় দেবীর মহাসমারোহে মহাপূজা ও বলিদান হয়।

এরুয়ারের কালী :

ভাতার থানার এরুয়ার (৩৮নং) একটি বর্ধিষ্ণু ও সমৃদ্ধ গ্রাম। গ্রামের আয়তন ২০৬৩.৪৫ হেক্টর, লোকসংখ্যা ৮০০৭, এর মধ্যে তপসিলী জাতির লোকসংখ্যা ২৫৮৮ ও তপসিলী উপজাতি সাঁওতাল-৩২৬। গুসকরা-বলগনা বাসে যাওয়া যায়। গ্রামে ব্রাহ্মণ, উগ্রক্ষত্রিয় ও কায়স্থরাই প্রধান। কিছু তাম্বুলী ও

সুবর্ণ বণিক আছে। গ্রামের অধিষ্ঠাতা দেবতা মহারুদ্রদেব শিব ও অধিষ্ঠাত্রী দেবী জোড়া কালী। পূর্বে নাকি গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন শাকম্ভরী। ১৭৪২ সালে বর্গী হাঙ্গামার সময় দেবীকে আঢ়াগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সন্ন্যাসী গোঁসাই নামে এক সাধক প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছর পূর্বে গ্রামে লোকালয় বর্জিত অঞ্চলে একটি কুঁড়েঘর নির্মাণ করে অষ্টধাতুর তৈরী দুটি কালীমূর্তি ও মদনগোপাল জিউর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। কালীমূর্তি দুটি এক ফুট উচ্চ অষ্টধাতু নির্মিত। সন্ন্যাসী গোঁসাই-এর মৃত্যুর পর তাঁব ভক্তগণ সেই কুঁড়েঘরের কাছে মন্দির নির্মাণ করে কালী ও মদনগোপাল জিউ-এর মূর্তি দুটি স্থাপন করেন এবং উভয় দেবতার নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেন। সন্ন্যাসী গোঁসাই দেহরক্ষা করেছিলেন শ্রাবণ মাসের অমাবস্যা তিথিতে। তাঁকে গ্রামেই সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর সমাধির উপর একটি বেদী নির্মিত হয়। সেই দুই কালীমূর্তি—একটি বামা কালী ও একটি দক্ষিণা কালী—সন্ন্যাসী গোঁসাই-এর দেহত্যাগের তিথিতে অর্থাৎ শ্রাবণ মাসের অমাবস্যায় গোঁসাই-এর সমাধির উপর বেদীতে স্থাপন করে সারাদিন ব্যাপী সাড়ম্বরে পূজা ও বলিদান হয়। গ্রামের আপামর জনসাধারণ জাতিধর্মনির্বিশেষে এই পূজায় যোগ দেয় ও মানত অনুযায়ী দেবীর কাছে নৈবেদ্য, চিনিমন্ডা, ডাব, ষোলকলা, শাঁখা সিঁদুর, শাড়ী বেদীতে নিয়ে এসে পূজা দেয়। যাদের ছাগ মানত থাকে, তারা ছাগ বলি দেয়। এছাড়া মহিষ, মেষ, হাঁস এমন কি শূকর পর্যন্ত বলি হয়। শূকর অবশ্য দেবীর আটনের পশ্চাতে বলি করা হয়। পূজা ও বলিদানের পর অপরাহ্ণে দেবীকে চতুর্দোলায় বসিয়ে গ্রাম-প্রদক্ষিণ করা হয়। এই সময় গ্রামের বাড়ীতে বাড়ীতে নামিয়ে পূজা দেওয়া হয়। একে 'র'-পূজা বলে। এই পূজা উপলক্ষে দূর-দূরান্ত থেকে বহু ভক্তেব সমাগম হয়। মেলাও বাস। গ্রামের মিশ্ররা পৌরোহিত্যে নিযুক্ত আছেন।

মাজিগ্রামের দেবী শাকম্ভরী ;

মঙ্গলকোট থানার মাজিগ্রাম (৯১) একটি গন্ডগ্রাম। আয়তন ৪২৭৬.০৭ হেক্টর, লোকসংখ্যা ৩৭২৩। বর্ধমান কাটোয়া লাইনে কৈচর স্টেশন থেকে ৪ মাইল (৬ কিমি) পশ্চিমে। মাজিগ্রাম নামের আবার তাৎপর্য আছে। মাজিগ্রাম অর্থে কেউ কেউ মনে করেন শাকম্ভরী মাতাজী বা মা-জী গ্রাম। আবার অনেকের মতে মাজিগ্রাম অর্থাৎ মাঝিদের—সাঁওতাল উপজাতিদের গ্রাম। মাঝিগ্রাম > মাজিগ্রাম। এই গ্রামের উত্তরপূর্ব কোণে ভ্রমরারদহ, যার ওপর দিয়ে সতী বেহুলা মৃত লখীন্দরের দেহ ভেলায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

প্রবাদ : শাকম্ভরীদেবী প্রাচীন কালে ভাতার থানার এরুয়ার গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। সেখানে ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে বর্গী হাঙ্গামার সময় দেবীমূর্তিকে বর্গীদের হাত থেকে বাঁচাতে সেবাইত বিগ্রহকে নিয়ে এলেন তসর-আড়া গ্রামে কিন্তু সেই গ্রামটিও ধীরে ধীরে জনশূন্য হয়ে উঠলো এবং পাশের মাজিগ্রাম ধনেজনে ও সম্পদে আদর্শ গ্রামে পরিণত হয়। তখন সেবাইত মায়ের বিগ্রহকে নিয়ে এলেন মাজিগ্রামে। কিন্তু মাজিগ্রামে মায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করার মত কোন উপযুক্ত স্থান না পেয়ে তিনি দেবীমূর্তি স্থানীয় ঠাকরুন পুকুরের জলে মায়ের শিলাময়ী মূর্তি ফেলে দেন। দীর্ঘকাল পরে গ্রামের জমিদার ও পুকুরের মালিক মহেশ দাঁ বাগ্‌দীদের জানকী সর্দারকে নিয়ে গেলেন ঠাকরুন পুকুরে মাছ ধরতে। এই মাছ ধরবার সময়ে জালে উঠে এলো প্রায় এক হাত উঁচু ও আধ হাত চওড়া এক শিলাখণ্ড। জানকী সর্দার বা মহেশ দাঁ এই প্রস্তর খণ্ডের উপর কোনরূপ গুরুত্ব না দিয়ে প্রস্তর খণ্ডটি ফেলে দিয়ে চলে আসেন। সেই রাত্রেই দেবী মহেশ দাঁ ও জানকী সর্দার উভয়কেই স্বপ্ন দেন। আমি দেবী শাকম্ভরী, আমাকে প্রতিষ্ঠা করলে তোদের মঙ্গল হবে। সেই থেকে শাকম্ভরী প্রতিষ্ঠিতা হন এই গ্রামে—শাকম্ভরী মাজিগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী সার্বজনীন গ্রামদেবী।

কিংবদন্তী, উত্তরপ্রদেশের আগ্রা তালুক থেকে রাজবংশী ক্ষত্রিয় বংশের একটি শাখা চাকুরীর সন্ধানে এসে এখানে বসতি স্থাপন করেন। এই শাখার প্রধান বর্ধমান রাজবাড়ীর অধীনে সৈন্যবাহিনীতে ও পরে নবাবের সৈন্যবাহিনীতে চাকরী গ্রহণ করেন। নবাবের কাছ থেকে তিনি সিকদার উপাধি পান। বর্ধমান রাজবাড়ী থেকে কিছু জমিজমা পান। এই আগ্রা থেকে আসার কাহিনীর সঙ্গে শক্তিপীঠ শাকম্ভরীর কাহিনী জড়িত। উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরের উত্তরে ঝরনার ধারে আছে শক্তিপীঠ শাকম্ভরী। এই শাকম্ভরী হলেন নয় দেবীর এক দেবী। বিষ্ণুচক্রে কর্তিত সতীর মস্তক এখানেই পড়েছিল। শাকম্ভরী ৫১ পীঠের এক পীঠ। কিন্তু তন্ত্রচূড়ামণির মতে যে ৫১ পীঠের উল্লেখ আছে সেই ৫১ পীঠের তালিকায় সাহারানপুর ও শাকম্ভরীর উল্লেখ নাই। তন্ত্রচূড়ামণির মতে ব্রহ্মরন্ধ্র পতিত হয় হিঙ্গুলায়। দেবী কোটরী। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে শ্রীদুর্গা স্বয়ং বলেছেন—

ততঃ অহম্ অখিলম্ লোকম্ আত্মদেহ সমুদ্ভবৈঃ
ভবিষ্যামি সুরাঃ।
শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং
তদা যাস্যামি অহম্‌ভুবি।

পৃথিবীতে যখন একশত বর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টিতে শস্য শুকাইয়া গিয়াছিল।

তখন আমিই শাকরূপ ধারণ করে জগৎ রক্ষা করেছিলাম। তাই আমার নাম শাকম্ভরী। মহাভারতেও আছে।—

ততঃ শাকম্ভরী রীত্যৈব ত্যৈব নাম তস্যাঃ প্রতিষ্ঠিতিম্
শাকম্ভরী ব্রহ্মচারিণী সমাহিতা ॥

ইন্দ্রাক্ষী স্তোত্রেও শাকম্ভরীর উল্লেখ আছে—

ইন্দ্রাক্ষী নাম সা দেবী দেবতে সমুদাহৃতা।
গৌরী শাকম্ভরী দেবী দুর্গানাম্নীতি বিশ্রুতা॥

এই পুণ্যতীর্থে শিবালিক পর্বতমালার পাদদেশে যে বিশাল প্রান্তর আছে তার নাম বীরক্ষেত। কিংবদন্তী, এই বীরক্ষেতেই দেবী চন্ডিকা রক্তবীজকে দমন করে ভীমা ও ভ্রামরী নাম নিয়ে চন্ড ও মুন্ডকে বধ করেন। পরে পর্বতমালার জঙ্গল ভেদ করে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই অসুর বেরিয়ে আসে। এই দুই অসুর দেবতা সমন্বিত দেবীর সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হন। দেবী শেষে চক্র দ্বারা শুম্ভ-নিশুম্ভকে দ্বিখণ্ডিত করেন। কিন্তু এ তো চণ্ডীর কাহিনী। চণ্ডী শাকম্ভরী হলেন কিভাবে? সে প্রশ্ন উঠতে পারে।

পুরাকালে দুর্গম নামে এক ঋষি বীরক্ষেতে দীর্ঘদিন তপস্যা করে ব্রহ্মার দর্শন লাভ করে। ব্রহ্মা দুর্গমের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দিতে চাইলেন। দুর্গম বললেন, হে প্রজাপতি ব্রহ্মা, যদি আমাকে বর দেন তাহলে এই বর দেন যেন আমি চারটি বেদকে পাই ও আমি যেন দেবতাদেরও অজেয় হই। দুর্গম স্বর্গরাজ্য দখল করলো ও দেবতাদের স্বর্গচ্যুত করলো। ফলে পৃথিবীতে নেমে এলো শত শত বর্ষ ধরে অনাবৃষ্টি ও খরা। আর দেবতারা বেদের অভাবে যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকর্ম ভুলে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। পরে দেবতারা বীরক্ষেতে এসে দেবী চন্ডিকার তপস্যা করে দুর্গমকে দমন করার প্রার্থনা জানালেন। এদিকে শতবর্ষের অনাবৃষ্টির ফলে পৃথিবীর কীটপতঙ্গ বৃক্ষলতাদি যে নিঃশেষ হবার উপক্রম হয়ে পড়ে, তাদের পুনরুজ্জীবিত করার বরও দেবী চন্ডিকার কাছে প্রার্থনা করে।

দেবতাদের কাতর প্রার্থনায় দেবীর অন্তর বিগলিত হল। তিনি শতচক্ষু হয়ে সহস্রধারায় অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন। অশ্রুধারা ঝরনাধারায় প্রবাহিত হয়ে আবার পৃথিবীকে শস্যশ্যামলা করে তুলল। এই সময়েই দেবীর দেহ থেকে শাক (কন্দমূল) নির্গত হয়। জীবের প্রাণরক্ষা পেল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সাহারানপুর অঞ্চলে সাহারানপুরে এরকম কন্দ জাতীয় সুখাদ্য মাটি খুঁড়লেই পাওয়া যায়। দেবী শতচক্ষু হন বলে দেবীর আর এক নাম শতাক্ষি ও শরীর থেকে শাক উৎপন্ন

করেছিলেন বলে দেবী শাকম্ভরী বলে পরিচিতা। দুর্গম ঋষিকে নিধন করেছিলেন বলে দেবী দুর্গতিনাশিনী। "শাকম্ভরী শতাক্ষি সা এব দুর্গা প্রকীর্তিতা।"

শ্রীশ্রী চণ্ডীর মূর্তি-রহস্যে দেবীর রূপ ও পূজার ফলাফল বর্ণিত আছে। দুর্গা সপ্তশতীতে শাকম্ভরীর যে বর্ণনা পাই তা হল—

শাকম্ভরী নীলবর্ণা নীলোৎপল বিলোচনা।
গম্ভীর নাভিস্ত্রিবলী বিভূষিত তনূদরী॥ (১২)

অর্থাৎ শাকম্ভরীর আভা নীলবর্ণ, চোখ নীলপদ্মরাগের ন্যায়, গভীর নাভি এবং সুন্দরতাদ্যোতক ত্রিবলীযুক্ত সূক্ষ্ম কটিভাগ। অত্যন্ত কঠিন বরাবর গোল এবং ঘনস্তনী এই দেবী পদ্মাসনে অধিষ্ঠিত, তবে সে দেশের প্রথানুযায়ী দেবী সিঁদুরে রঞ্জিত। তাই ঐ আসল রূপ দেখা যায় না। দেবীর এক হাতে প্রস্ফুটিত পদ্মফুল অপর হাতে বাণ ও নানাবিধ ফুল পল্লব কন্দ মূলাদি শাকসব্জী প্রভৃতি। দেবীর দক্ষিণে আছেন ভীমা দেবী ও ভ্রামরী।

মাজিগ্রামে শাকম্ভরী দেবী ১৮"x ৯" প্রস্তরময়ী চতুর্ভুজা মূর্তি। দেবী সিংহবাহিনী, চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, কৃপাণ ও ত্রিশূল, কোন অসুর বা অন্য কোন দেবদেবী নাই। মূর্তির দেহ থেকে শির বিচ্ছিন্ন। মোম দিয়ে এঁটে রাখতে হয়। মনে হয় পুকুরে ফেলার সময় বা পুকুর থেকে তুলে পাড়ে ফেলার সময় মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দেবীর চোখ দুটি শ্বেত পাথরের, আলাদা বসান। মধ্যে কালো পাথরের চোখের মণি। মনে হয় যেন দেবী সামনে চেয়ে আছেন। মূর্তিটিকে তেল-সিঁদুর মাখিয়ে রাখতে হয়। মনে হয় রুক্ষ্ম রাখলে পাথর ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

দেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে অভয়াদাস মুখোপাধ্যায়-এর একটি প্রতিবেদনে অন্য কাহিনী শোনা যায়। মুঁখোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন, কিংবদন্তী আছে—গ্রামের দক্ষিণে আদুরা নামক একটি পুষ্করিণীতে জনৈক রাম সর্দার নামক বাগ্‌দী মাছ ধরতে যান। ঐ পুষ্করিণীতে অনেক মাছ ধরার পর একটি মাগুর মাছ পান। মাগুরটি বাড়ীতে এনে জিইয়ে রেখে দেন। সেই রাত্রে রাম সর্দার স্বপ্নাদেশ পান যে তিনি মাগুর নন, তিনি দেবী শাকম্ভরী—মাগুরের রূপ ধরে জালে উঠেছেন। তিনি স্থানীয় ব্রাহ্মণ বটব্যাল-বাড়ীতে যান ও তাঁকে স্বপ্নের কথা নিবেদন করেন। বটব্যাল তাকে মাছটি আনতে বলে দেখেন যে মাগুরের পরিবর্তে একটি শিলামূর্তি পড়ে আছে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিবেদনে দেবীর যে বর্ণনা আছে তাতে দেখা যায় দেবীর মূর্তি পাষাণনির্মিত তিন হাত বা সাড়ে তিন হাত উচ্চ দেবী চতুর্ভুজা। অনন্ত নাগোপবিষ্টা পদতলে দুটি মৎস্য ও একটি কর্কট। আষাঢ় মাসের শুক্লা নবমীতে মহাধূমধামের সঙ্গে দেবীর পূজা হয় ও অসংখ্য ছাগবলি হয়।

আমার মনে হয় অভয়াবাবু ঐ থানার মাজিগ্রামের সন্নিকটস্থ ৮৪নং কাঁকোড়া মৌজার কর্কটনাগ মূর্তির সঙ্গে মাজিগ্রামের শাকম্ভরীকে গুলিয়ে ফেলেছেন।

দেবীর নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে। কালভ্রাভাং কটাক্ষৈঃ অরিকুলভয়দাম্ মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাম—জয়দুর্গার এ ধ্যানে মায়ের পূজা হয়। পূজার বীজমন্ত্র হ্রীঁ। প্রতিদিন নিত্যপূজার পর দেবীর নিত্য অন্নভোগ হয়; ভোগে শাক, মাছ ও পরমান্ন চাই-ই। দেবীর সেবাপূজার জন্য ৮ বিঘা জমি দেবোত্তর করা আছে। এর আয় থেকেই পূজার খরচ নির্বাহ হয়। মহাপূজা ও উৎসব হয় আষাঢ় মাসে শুক্লা নবমীতে।

আষাঢ়ে নবমীতে প্রথমে মায়ের মন্দিরে নিত্যপূজা ও বলি হয়। এরপর দ্বিপ্রহরে দেবীকে কাঠের সিংহাসনে বসিয়ে মন্দিরের প্রাঙ্গণে উত্থান মন্দিরে আনা হয়। বটব্যালরাই সেবাইত। ঐ উত্থান মন্দিরে বেদীর ওপর দেবীকে স্থাপন করা হয়। এখানে ষোড়শোপচারে দেবীর বিশেষ পূজা, হোম ও বলিদান হয়। চারপাশের গ্রাম থেকে কাতারে কাতারে লোক পূজা ও মানতের ছাগ নিয়ে আসে দেবীকে উৎসর্গ করার জন্য। প্রথম পূজা হয় ব্রাহ্মণদের, তারপর রায়েদের, পরে অন্যান্য সকল জাতির নৈবেদ্য ফলমূলাদি উৎসর্গ করা হয় ও মানতের ছাগ বলি হয়। লোকের ধারণা, এই সময় বৃষ্টি হলে সে বছর খুব ভাল ধান হয়। প্রবাদও আছে, আষাঢ়ে নবমীর ছিটে ফোঁটা / তবে জানবে বর্ষা গোটা। মহাপূজা উপলক্ষে শাকম্ভরী মন্দির-প্রাঙ্গণে মেলা হয়, তবে এখন আর আগের মত জৌলুস নাই।

শাকম্ভরী দেবীর আর একটি উৎসব হয় চৈত্র মাসের বাসন্তীপূজার পর মদন-ভঞ্জী বা মদন-চতুর্দশী তিথিতে। এই তিথিতে দেবীর বিবাহ উৎসবের অনুষ্ঠান হয়, স্থানীয় দেউলেশ্বর শিবের সঙ্গে। পাত্রপক্ষ হন ভট্টাচার্যগণ আর কন্যাপক্ষ বটব্যালরা। উভয় পক্ষের মাতব্বর ব্যক্তিরা সারাদিন উপবাসী থাকেন। কন্যাপক্ষের উপবাস করেন ব্রাহ্মণরা আর বরপক্ষের উগ্রক্ষত্রিয়রা। বিয়ের অনুষ্ঠান হয় মায়ের মন্দিরের সামনেই। বিয়ের দিন ভট্টাচার্যদের কোন শক্তিশালী যুবক নতুন কাপড় কোমরে জড়িয়ে সে কাপড়ে দেউলেশ্বরকে স্থাপন করে। তারপর বাদ্যভাণ্ড সহকারে লোকজনকে নিয়ে মায়ের মন্দিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। বিভিন্ন পাড়া ঘুরে তবে বর মায়ের মন্দিরে সমবেত হয়। এরপর কনে আর বরপক্ষের লোকজনদের মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তির মহড়া চলে। কনেপক্ষ কিছুতেই বরপক্ষকে মায়ের মন্দিরে ঢুকতে দেবে না, এমনি ভাব। এই রকম মহড়া কিছুক্ষণ চলার পর বরপক্ষ তো কনের মন্দির-প্রাঙ্গণে বর দেউলেশ্বরকে নিয়ে উপস্থিত হল। কনেপক্ষ বরপক্ষকে সাদর আহ্বান জানালেন। তারপর উভয় পক্ষের

ঝগড়া আরম্ভ হল। বরপক্ষ বলে, 'এ মেয়ে কালো বিয়ে হবে না।' কনেপক্ষ বলে, 'এ বর বুড়ো, বিয়ে দেব না।' "কালো কনে বুড়ো বর / বিয়ে হল না চলো ঘর।" বিয়ে অবশ্য শেষ পর্যন্ত হলই না। বরপক্ষ ফিরে গেল। তবে বরপক্ষ ও কনেপক্ষের এই উপলক্ষে বিয়ের ভোজটা ভালই হয়। এই বিয়েকে উপলক্ষ করে গোটা গ্রাম আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে। গ্রামবাসীদের নিরানন্দ একঘেঁয়ে জীবনে কয়েকদিন আসে আনন্দের জোয়ার, এই আনন্দের তুলনা নাই।

দেবীর পুজো হয় বৈদিক মন্ত্রে। কিন্তু আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ সব অনার্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী। শাকম্ভরী দেবী চণ্ডীর আর এক রূপ তাই গ্রামে দুর্গার প্রতিমা গড়ে পূজা হয় না। নবপত্রিকা এনে ঘটে পটে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান হয়। কারণ দেবী শাকম্ভরীই তো দুর্গা, কত নামেই না মায়ের পরিচয়! তিনিই চণ্ডী, অম্বিকা, গৌরদেহা, গৌরী, তিনি কাত্যায়নী, শিবদূতী, শাকম্ভরী, ভীমা, ভ্রামরী।

তাই দেবীর নিকট ভক্তের প্রার্থনা—

বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্।
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ।

শুশুনার তারাক্ষ্যা :

মন্তেশ্বর থানার ১৪নং মৌজা শুশুনা—একটি গণ্ডগ্রাম, আয়তন ৫১২.৮৯ হেক্টর, লোকসংখ্যা ২৬৭১, তপসিলী জাতির লোকসংখ্যা ১১৮৭ আর সাঁওতাল উপজাতি ৫৯। কালনা, মেমারী, বর্ধমান বা দাঁইহাট থেকে বাসে মন্তেশ্বর গিয়ে মালডাঙায় নামতে হয়। সেখান থেকে মাইল দেড়েক বা ২ কিমি পশ্চিমে গেলেই তারিক্ষ্যেতলা। আগে গরুর গাড়ী পাওয়া যেত। এখন ভ্যান, রিক্সা চলছে। বর্তমানে বর্ধমান নাসিগ্রাম বাসেও যাওয়া যায়। শুশুনা গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তারাক্ষ্যা লোকমুখে হয়ে গেছে তারিখ্যে মা; আর শুশুনে হয়েছে তারিখ্যেতলা।

জনশ্রুতি, শীতলচন্দ্র রায় ছিলেন এ অঞ্চলের সদ্‌গোপ সামন্ত রাজা। তারাক্ষ্যাদেবী শীতলচন্দ্র রায়েরই প্রতিষ্ঠাতা দেবী। রায়বংশ জাতিতে সদ্‌গোপ; তাই এখনও মায়ের পূজায় সদ্‌গোপেরই আধিপত্য বেশী।

বর্গী আক্রমণের কয়েক বৎসর পূর্বে গ্রামে খাঁ বংশীয় জমিদারের নাম পাওয়া গেছে। গ্রামের উত্তরে খাঁ পুকুর, বিনোদ খাঁ পুকুর, পাতাল খাঁ পুকুর, খাঁ বংশের অবস্থিতির সাক্ষ্য বহন করছে। গ্রামের দক্ষিণে তারাক্ষ্যা পুকুরের নাম

ছিল পূর্বে বল্লাল খাঁ দীঘি। তাই মনে হয় তারাক্ষ্যা দেবী অষ্টাদশ শতকের শেষে বা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে প্রতিষ্ঠিতা। কিংবা হয়ত দেবী পূর্বে খাঁ বংশের প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন, বর্গী আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য জলে নিক্ষিপ্ত হন। পরে শীতল রায় উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠা করেন।

তারাক্ষ্যা দেবীর মূর্তি কৃষ্ণবর্ণের কষ্টিপাথরের। মূর্তির গঠনশৈলী অপূর্ব, মূর্তির মধ্যে পালযুগের শিল্পশৈলীর ছাপ সুস্পষ্ট। দেবী ত্রিনয়নী, চতুর্ভুজা— দক্ষিণে ঈষৎ বিনত, জটাজুট সমাযুক্ত সুডৌল মুখমণ্ডল। মহাপদ্মের দুই থাক পাপড়ির ওপর দেবী উপবিষ্টা; দক্ষিণ চরণ ঈষৎ মোড়া ও সিংহপৃষ্ঠের ওপর ন্যস্ত, বামচরণ প্রস্ফুটিত পদ্মের ওপর স্থাপিত। দেবী বাম ভাগের ঊর্ধ্ব বাহুর দ্বারা মহাদেবকে বেষ্টন ভঙ্গিমায় স্থাপন করে স্তন পান করাচ্ছেন; নিম্নের হস্তটি ঈষৎ ঊর্ধ্বে উত্থিত। দক্ষিণ ভাগের ঊর্ধ্ব বাহু নিম্নে প্রসারিত, নিম্ন বাহু দ্বারা দেবী গদাধারণ করে আছেন, বাহুটি ঈষৎ ঊর্ধ্বে উত্থিত। দুই পাশে জয়া-বিজয়ার দণ্ডায়মান মূর্তি। পিছনে চালচিত্রে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মূর্তি ক্ষোদিত, মূর্তি প্রায় ১ ফুট ৩ ইঞ্চির মত উচ্চ।

গ্রামস্থ একটি পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারকালে এই মূর্তি পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে, কালাপাহাড়ের আক্রমণ থেকে দেবীমূর্তিকে বাঁচাবার জন্যে দেবীমূর্তি জলে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। মূর্তিটি মহিলা ও শূদ্ররা স্পর্শ করতে পারে না। ব্রাহ্মণদের একচ্ছত্র অধিকার। দেবীর বেদী পঞ্চমুণ্ডীর আসনের ওপর নির্মিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তারাক্ষ্যা মন্দিরে আর একটি ত্রিনয়নী পদ্মাসনা প্রস্তরময়ী মূর্তি আছে। দেবীমূর্তির দুপাশে দুটি হাতী দেবীর মস্তকে যেন জলসিঞ্চন করছে। পঙ্কোদ্ধারের সময় যখন দেবীর মূর্তি উদ্ধার করা হয় তখন মনে হয় নাসিকায় আঘাত লাগে। নাসিকাটি কিঞ্চিৎ ভগ্ন। গ্রামের পুরোহিতের মতে মূর্তিটি গজলক্ষ্মীর। আসলে চণ্ডীমঙ্গলের কমলেকামিনীর মূর্তি বলেই ধারণা। বর্তমানে মূর্তিটির কোন পূজা হয় না।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানে মহারাজা মহতাবচাঁদ তারাক্ষ্যা দেবীর সেবাপূজার ব্যয়ভার গ্রহণ করেন ও বহু সম্পত্তি দেবোত্তর করে দেন। ঘোড়াডাঙ্গা, হোসেনপুর, ক্ষীরগ্রাম, নেড়াগোয়ালিয়া, কালেশ্বর, বুধপুর গ্রামেও তারাক্ষ্যা দেবীর দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল। বর্তমানে সমস্ত সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে।

দেবীর মন্দির পূর্বদ্বারী। এই মন্দিরেই প্রতিদিন দেবীর নিত্যপূজা হয়। নিত্য-পূজা বেলা ৯ টার মধ্যে সম্পন্ন করতে হয়। নৈবেদ্য আতপ চাল আর মিষ্টি।

ব্রাহ্মণ ছাড়া মূর্তিকে কেউ স্পর্শ করতে না পারলেও পূজা কিন্তু সবাই দিতে পারে। দিবা ভাগে দেবীর আরাত্রিক বা হোম হয় না। সন্ধ্যায় শীতল আরতির পর শয়ন। দুপুরে অন্নভোগ—আমিষ ভোগ হয়। মাগুর মাছ দেবীর খুবই প্রিয়। বর্ধমানের সর্বমঙ্গলারও প্রিয় মাগুর মাছ। চিঁড়াভোগ যদি একদিন হয় তবে পরদিন আর হতে পারবে না। গোটা মাঘ মাস খিচুড়িভোগ। তবে মসুর ডাল বা বিরি কলাই-এর ডাল, অর্থাৎ এই দুই ডালের খিচুড়ি চলবে না।

দেবীর পূজা হয় "কালভ্রাভাং কটাক্ষৈঃ", 'অরিকুল ভয়দাং' এই জয়দুর্গার ধ্যানে। বীজ মন্ত্র ওঁ হ্রীং। প্রত্যেক পূর্ণিমায় বিশেষ পূজা আর জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা চতুর্দশীতে (চম্পক চতুর্দশীতে) দেবীর মহাপূজা ও উৎসব। মহাপূজার পূর্ব দিন দেবীর অধিবাস। সেবাইতদের উপবাস ও সংযম। রাত্রে দেবীর অধিবাসের পর সেবাইতের মধ্যে মালা বিতরণ। মালা বিতরণ করে মালাকার। মালা বিতরণ হবে সামাজিক মর্যাদা অনুসারে। প্রথমে সভাপণ্ডিত, পূজারী ও সমবেত ব্রাহ্মণ, গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তি, সদগোপ্ ও বাদ্যকর। মহাপূজার দিন ৯টার মধ্যে দেবীর নিত্যপূজা। তারপর ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে বর্ধমানের মহারাজা, গ্রামের সদ্‌গোপ, ভাণ্ডারডিহি, কালুই, নেড়াগোয়ালিয়া, সামন্তী প্রভৃতি গ্রামের সদ্‌গোপদের। ষোড়শোপচারে পূজার পর দেবীকে মন্দিরের বাইরে দেবীগৃহের মধ্যস্থ বেদীতে বসিয়ে অষ্টকলস গঙ্গাজলে দেবীকে বৈদিক মন্ত্রে স্নান করান হয়। তারপর মালাকার দেবীর অঙ্গরাগ ও অঙ্গসজ্জা সম্পন্ন করে। সজ্জার পর সুসজ্জিত দেবীকে চতুর্দোলায় বসিয়ে গ্রামের বাইরে দক্ষিণে তারাক্ষ্যাদীঘির উত্তর পাড়ে মাসতলা নামে পরিচিত ছোট মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। দেবীর চতুর্দোলা বহন করেন সদ্‌গোপরা। এই মন্দিরে দেবীকে বসিয়ে দিয়ে নৈবেদ্য উৎসর্গ ও বলিদান শুরু হয়। প্রথমে মহারাজার পরে একে একে সভাপণ্ডিত, পূজারী ব্রাহ্মণদের বলির পর সদ্‌গোপদের ও পরে আপামর জনসাধারণের—যাদের বৃত্তি বা মানত আছে তাদের সবার বলি আরম্ভ হয়ে যায়। ছাগ, মেষ, মহিষ, শূকর সবই বলি হয়। বলিদান সারাদিনই চলতে থাকে। সন্ধ্যায় আরাত্রিক। এরপর দীঘির উত্তর পাড়ে গ্রামবাসীদের আপন আপন নির্দিষ্ট স্থানে বেদী করে দেবীকে বসিয়ে নিজ নিজ নামে সংকল্প করে পূজা দেয়। তিনদিন দেবীর মন্দিরে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার। মহিষ বলিদানের পূর্বে পূজারীদের অরন্ধন পালন করতে হয়।

তারাক্ষ্যাদেবী চক্ষুরোগের দেবী। দেবীর স্নানজল চোখে নিলে সব রকম চক্ষুরোগ নিরাময় হয় বলেই পুণ্যার্থীদের ধারণা। চোখের রোগের জন্য রোগীরা দেবীর কাছে সোনা বা রূপার চোখ মানত করে, নতুন শাড়ীও দেয়। পুণ্যার্থীদের

অনেকেই এক একটি নতুন বস্ত্র বা তার মূল্য দিয়ে দেবীর বস্ত্রখণ্ড সংগ্রহ করে। দেবীর মহাপূজা পরিচালনার জন্য পূজাকমিটি গঠিত হয়। মহাপূজা উপলক্ষে ও মেলা পরিচালনার জন্য এই কয়দিন দায়িত্বে থাকে মেলা কমিটি। মহাপূজার পরদিন দেবীর পাড়া পরিক্রমা বা 'পাড়া-বেড়ানী' চলে। দরজায় দরজায় নামিয়ে পূজা হয়। একে 'র' পূজাও বলে। পাড়া-বেড়ানী শেষ হলে দেবীর স্বমন্দিরে অধিষ্ঠান, পঞ্চগব্য, অভিষেক ও আরাত্রিক। পূর্বে শারদীয়া মহানবমীতেও মহিষ বলি হত। এখন সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। মহিষের স্থান নিয়েছে চালকুমড়া।

দেবীর ঔষধ ব্যবহারের কোন নিয়ম নাই। মহাপূজার ৩ দিন ও প্রতি পূর্ণিমায় মুড়ি ভাজা, কাপড় সিদ্ধ, লাঙ্গল দেওয়া নিষেধ। মহাপূজা ছাড়া অন্যান্য দিন পালাক্রমে নিত্যসেবা হয়।

তারাক্ষ্যা নামের মধ্যেই অক্ষির সূত্র মেলে। মনে হয় তারাক্ষ্যা মায়ের মূর্তি যে প্রস্তরে গঠিত সেই প্রস্তরধৌত জলের এমন কোন ভেষজ গুণ আছে যাতে চক্ষুরোগের নিরাময়ের কোন সূত্র আছে। সেটা অবশ্য বৈজ্ঞানিকের গবেষণার বিষয়। এমনও হতে পারে 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'—মানুষের অগাধ বিশ্বাসই চক্ষুরোগীদের মনোবল বাড়িয়ে দেয়। তার ফলে রোগ ধীরে ধীরে এমনিতেই সেরে যায়। দেবীর মহাপূজায় মহিষবলির প্রথা ও দুর্গা নবমীতে মহিষবলি প্রথা থেকে মনে হয় প্রাচীন কালে দেবী হয়ত মহিষমর্দিনী রূপে কিংবা দ্বিতীয় দশমহাবিদ্যা তারা রূপে পূজিতা হতেন। পরে দেবীর স্নানজলে চক্ষুরোগ নিরাময়ের সংবাদ বহুল প্রচারিত হলে দেবী তারা থেকে তারাক্ষ্যা/তারাখ্যা/তারিখ্যেতে রূপান্তরিত হন। তারা দেবীর রূপ-কল্পনার সংগত কারণও আছে। তারাদেবী সম্পর্কে কাহিনী প্রচলিত আছে যে, সমুদ্র মন্থনের সময় যখন সমুদ্র থেকে গরল উঠতে আরম্ভ করে, তখন দেবতা ও অসুরগণ এই ভয়ঙ্কর বিষের হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য ব্রহ্মার নির্দেশে মহাদেবের শরণাপন্ন হন। মহাদেব তখন সমস্ত বিষ এক গণ্ডুষে পান করে কণ্ঠে ধারণ করে 'নীলকণ্ঠ' হন। কিন্তু বিষের জ্বালায় যখন ছটফট করতে থাকেন তখন তারারূপে মহামায়া মহাদেবকে বাম হাতে বেষ্টন করে অঙ্কে স্থাপন করে স্তন্যপান করান ও ফলে অমৃততুল্য মহামায়ার স্তনদুগ্ধ পান করায় মহাদেবের বিষের জ্বালা প্রশমিত হয়। শুশুনার তারাক্ষ্যারও মহাদেবের এই স্তনপানরত মূর্তি। তারিক্ষ্যে পূজা সম্বন্ধে আর একটা বিষয় অনুধাবনযোগ্য। দেবীর অন্নভোগে মাগুর মাছ দেওয়ার রীতি আছে। তাছাড়া মহাপূজায় শূকর বলিও হয়। এর থেকে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে দেবী প্রথমে অনার্য সম্প্রদায়ের নিম্নশ্রেণীর দ্বারা পূজিত হতেন পরে

তুর্কী আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চবর্ণের মানুষ যখন আত্মশক্তিতে আস্থাহীন ও স্বধর্ম রক্ষায় অপারগ হয়ে পড়ে তখন নিজেদের আর্য দেবদেবীর বাইরে অনার্যদের চণ্ডী, মনসা, ধর্ম প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর শরণ নেয়। ফলে অনার্য চণ্ডী শিবঘরনী পার্বতীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান।

যাই হোক, শুশুনার তারিক্ষ্যা মা এ জেলার মাতৃকাতন্ত্রের ঐতিহ্যবাহী—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শুশুনার তারিক্ষ্যা মায়ের পূজা প্রসঙ্গে ভাতার থানার নারায়ণপুর গ্রামের তারিক্ষ্যে পূজার প্রসঙ্গ এসে পড়ে। ভাতার থানার ২৫নং নারায়ণপুর একটি ছোট্ট গ্রাম, আয়তন ৪৮৬.৫৭ হেক্টর, লোকসংখ্যা ১৭৯৫, তপসিলী ৬৮৬ ও সাঁওতাল উপজাতি ২৮৯। দেবী তারিক্ষ্যে মা গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। গ্রামের মধ্যে দেবীর মন্দির আছে সেখানে দেবীর নিত্যপূজা হয়। এখানেও দেবীর ভোগে মাগুর মাছ দেওয়ার রীতি আছে। দৈনিক সন্ধ্যায় শীতল আরাত্রিক হয়।

দেবী চতুর্ভুজা পাষাণময়ী মূর্তি, প্রায় ১ ফুট উঁচু, মূর্তির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চোখ দুটি বড়। মহাপূজা হয় দোল পূর্ণিমার আগের শুক্লা নবমীতে। মহাপূজার আগের দিন মায়ের চাঁচর হয়। ঐদিন সন্ধ্যায় দেবীকে চতুর্দোলায় বসিয়ে গ্রাম-প্রদক্ষিণ করা হয় ও শেষে গ্রামের বাইরে বাঁধান বেদীর নিকট, যেটি তারিক্ষ্যেতলা নামে সাধারণ্যে পরিচিত, সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রবাদ আছে এইখানেই দেবীর প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল। সেখানে পূর্ব থেকে খড়ের স্তম্ভের আকারে 'মেড়' তৈরী থাকে। 'মেড়' মনে হয় মেড়া থেকে এসেছে। নীচে দেবীকে বসানোর জন্য কুলুঙ্গীর মত ত্রিকোণাকার ফাঁকা জায়গা রাখা হয়। এই স্থানে দেবীকে বসিয়ে পূজা করা হয়, পরে দেবীমূর্তি বের করে নিয়ে মেড়-এ আগুন দেওয়া হয়। শ্রীকৃষ্ণের দোলের পূর্ব দিন এরকম চাঁচর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বহ্ন্যুৎসব করা হয়।

পরদিন মহাপূজা। সেদিন মন্দিরে নিত্যপূজা সমাপন করে দেবীকে গ্রামের বাইরে দেবীর আবির্ভাবস্থান নামে কথিত বাঁধান বেদীতে নিয়ে যাওয়া হয় ও বেদীর ওপর দেবীকে স্থাপন করে পঞ্চগব্য দিয়ে বেদীকে শোধন করা হয়। এরপর ঘট স্থাপন করে ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা, চণ্ডীপাঠ ও প্রায় সারাদিন ধরে বলিদান চলে। অজস্র পাঁঠা বলিদান হয়। এই আটনের পাশেই নিমগাছের নীচে একটি প্রাচীন মন্দিরের স্থান ছিল—বর্তমানে মন্দিরের অস্তিত্ব নাই, বিরাট উইঢিবির সৃষ্টি হয়েছে। এখানেই নাকি দেবীকে কাঁদড়ার গর্ভ থেকে পাওয়া গিয়েছিল। পাশেই বেদীর অনতিদূরেই কান্দড়। যাই হোক এই উইঢিবির ওপরেই ইতর-ভদ্র-নির্বিশেষে চুনের জল ঢালে। এরই পাশে নিম্নশ্রেণীর মানুষরা দেবীর

উদ্দেশ্যে পূজা দেয় ও এইখানেই তাদের বলিদান হয়। এর থেকে মনে হয় দেবী প্রথমে এখানেই নিম্নশ্রেণীর দ্বারা পূজিতা হতেন। হয়ত ধর্মরাজরূপে, কারণ ধর্মরাজের পূজায় চুন দেওয়ার রীতি আছে। পরে গ্রামের উচ্চশ্রেণীর মানুষজন দেবীকে নিজেদের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে পূজা করেন কিন্তু দেবীর আবির্ভাবস্থানে নিম্নশ্রেণীর মানুষদের পূজা ও বলির অধিকার স্বীকার করে নিয়েছেন। আটনে দেবীর পূজা ও বলিদান শেষ হলে, দেবীকে নিয়ে গ্রাম-প্রদক্ষিণ করা হয় এবং ঘরে ঘরে দেবীর দোলা নামিয়ে পূজা ও মানত থাকলে বলিদানও চলে। রাত্রে দেবীকে মন্দিরে স্থাপন করে শীতল আরতি করা হয়। পুণ্যার্থীদের বিশ্বাস তারিক্ষ্যে মায়ের স্নানজল ও নির্মাল্য চক্ষুরোগ নিরাময় করে।

রঙ্কিণী মহল্যার (গোপীকান্তপুর) : রঙ্কিণীদেবী

জামালপুর থানার গোপীকান্তপুর একটি প্রাচীন গ্রাম। গ্রামটির পাশেই দামোদরের একটি খাত বা হানা—বর্তমানে কানা দামোদর বলেই পরিচিত। গ্রাম অবশ্য খুবই ছোট, আয়তন ৩২২.০০ হেক্টর, লোকসংখ্যা ২০২৬, তপসিলী সম্প্রদায় ৪৯৮, সাঁওতাল উপজাতি ৮৮০। গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রঙ্কিণী আর দেবীর নামেই গ্রামের পরিচয় রঙ্কিণী মহল্লা বা মৌলা। গ্রামে অধিবাসীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তাঁতি, বাগ্দী ও সাঁওতালের সংখ্যাই বেশী। বর্ধমান-তারকেশ্বর বা মশাগ্রাম-তারকেশ্বর বাসে চকদীঘিতে নেমে মাইল তিনেক পূর্বে গোপীকান্তপুর।

মৌলায় রঙ্কিণী বন্দ্যোযোড় করি পানি।
ভাণ্ডার হাটে বন্দিলাম সাবিত্রী গোসানি॥
মৌলায় রঙ্কিণী বন্দ্যো শুদ্ধ হয়্যা মন।
বালিডাঙ্গায় বটেশ্বরী বন্দিব চরণ॥

রঙ্কিণীদেবী বিশেষ জাগ্রত ঈশ্বরী বলে সাধারণের বিশ্বাস। প্রবাদ আছে, প্রাচীন কালে রাম ব্রহ্মচারী নামে জনৈক তান্ত্রিক গ্রামের পাশে গভীর অরণ্যের মধ্যে রঙ্কিণীদেবীকে প্রতিষ্ঠা করে সাধনা করতেন। এখন আর অবশ্য বন নাই। বন কেটে বসত ও চাষের জমি হয়েছে। মন্দিরের কাছেই একটা প্রাচীন পুকুর আছে। মন্দিরের পূর্বদিকে রঙ্কিণীদহ আসলে কানা দামোদরের অংশ। মন্দিরের ভিতর দেবী মূর্তি; শায়িত শিবের ওপর ১২ ফুট উচ্চ বিরাট ভয়ঙ্করী বিশালাক্ষীর মৃন্ময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরের সামনেই টিনের চালা নাটমন্দির রূপে ব্যবহৃত হয়। সর্বজনীন দেবীর পূজায় সকলের অধিকার। দেবীর নিত্যপূজা হয়, ফাল্গুন থেকে বৈশাখ পর্যন্ত প্রতি মঙ্গল ও শনিবার মায়ের বিশেষ পূজা। এই

পূজায় গ্রামবাসী পালা করে গ্রামের সকলের কাছ থেকে দেবীর পূজার সামগ্রী সংগ্রহ করে। বিশেষ পূজার সময় দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা হয়। আশেপাশের গ্রাম থেকে কাতারে কাতারে লোক মায়ের পূজা ও মানত থাকলে বলির পাঁঠা নিয়ে আসে। কেউ কেউ নতুন শাড়ী, শাঁখা, সিঁদুর, অলঙ্কার ও দক্ষিণা নিয়ে আসে। বৈশাখ মাসের পয়লা মায়ের মহাপূজা ও চড়ক হয়। এই চড়ক উৎসবে সাঁওতালরাও অংশগ্রহণ করে। এর থেকে মনে হয় রঙ্কিণী দেবী কোন এককালে অনার্যদের পূজিতা ছিলেন। ধলভূমে যেখানে রঙ্কিণীর আদি পীঠস্থান সেখানেও সাঁওতাল উপজাতিরা রঙ্কিণীর পূজা করতেন বলে জানা যায়। এ প্রসঙ্গে পরে আসছি। চারপাশের লোকের বিশ্বাস, জাগ্রত দেবী রঙ্কিণীর কাছে মানত করলে যে কোন অসুখ সারে। প্রবাদ আছে, মন্দিরের পাশে যে দেবীর পুকুর আছে সেখানে দেবী পুরোহিতের-কন্যা পরিচয় দিয়ে সাহাবাজারের জনৈক শাঁখারীর কাছ থেকে শাঁখা পরেছিলেন। ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা সম্পর্কেও যোগাদ্যা পুষ্করিণীর পাড়ে পুরোহিত-কন্যার বেশে শাঁখা পরার কাহিনী প্রচলিত আছে। যে কাহিনীকে কবি তরু দত্ত ইংরাজী কবিতায় রূপদান করে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন। পূর্বে দেবীর নিকট নরবলি হত বলে প্রবাদ আছে। এই নিয়ে তৎকালীন সংবাদপত্রে হৈ-চৈ পড়ে যায়। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী 'সমাচার দর্পণে' সংবাদ প্রকাশিত হয়—"সম্বাদ প্রভাকর" পত্র হইতে সমুদায়িক পত্রে প্রকাশ পাইতেছে যে শ্রীশ্রী রঙ্কিণীশ্বর দেবী অর্থাৎ মৃত্তিকা কিম্বা পাষাণক্ষোদিতা মূর্তির নিকট নরবলি হইয়াছে। আমরা জানি পূর্বেও বিস্তর নরবলি হইয়াছে। জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকা ১৮৩৭ সালের ২৩শে ডিসেম্বরে বর্ধমানে নরবলি শীর্ষক সংবাদে প্রকাশ রঙ্কিণীদেবীর নিকট নরবলি হইয়াছে। "সর্বসাধারণের মনে এই অনুভব হইয়াছে যে ঐ অদ্ভুত ব্যাপার বর্ধমানস্থ রাজার তরফে হইতেছে এবং ঐ বংশের মধ্যে যখন কোন ভারী অস্বাস্থ্য উপস্থিত হয়, তখন নরবলিদানের আবশ্যক বোধ করেন। সম্প্রতি ঐ বংশের মধ্যে কোন এক ব্যক্তির, হইতে পারে যুবরাজের, বসন্ত রোগ হওয়াতে নর-বলিদান হইয়াছিল—এমত জনশ্রুতি আছে।...

সম্প্রতি রাজবাটীর মধ্যে এক বিধবা দাসী থাকিত। তাহার একটি পুত্র ছিল। একদিন সে কোথায় গেল তাহার কোন অনুসন্ধান না হওয়াতে ঐ বেওয়া দাসী ঐ বংশে উক্ত প্রকার রীতি আছে জানিয়া বোধ করিল যে, আমার পুত্রকে অবশ্যই বলিদান করিয়াছেন অতএব অনেক আর্তনাদ রোদন করিতে লাগিল।...."

রঙ্কিণী আসলে দরিদ্র আদিবাসীদের দেবী ছিলেন। রঙ্ক কথার অর্থ দরিদ্র, নির্ধন—"নিজ ধন দিতে দিতে তুমি হবে রনক" — ক. চ.

রনক শব্দের আর এক অর্থ রণ। কাজেই রঙ্কিণী যুদ্ধের দেবী—রণকিনী—তার রক্তে পূজিব রণকিনী ভদ্রকালী (ধর্মমঙ্গল—ঘনরাম)। রঙ্কিণীদেবীর উৎসস্থল ধলভূম। ধলভূমের সামন্তরাজা জগদ্দেউ প্রসাদ—এর আদি দেশ ছিল রাজপুতানা। তাঁদের কুল-দেবী ছিলেন রঙ্কিণী। তিনি পরে ধলভূমে এসে সামন্ত রাজ্য গড়ে তোলেন। পরে ঘাটশিলায় রাজধানী স্থাপন করে সেখানে কুলদেবী কংকালীকে প্রতিষ্ঠা করার বাসনায় রাজপুতানা থেকে নিয়ে আসেন। কিন্তু দেবী কুমারীবেশে রাজাব অনুসরণ করে ধলভূমের প্রান্তে এসে একটি মহুয়া গাছের নীচে অবস্থান করেন। রাজাও সেখানেই মন্দির নির্মাণ করে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন। দেবীর নাম পরিবর্তিত হয়ে কংকালী থেকে হল রঙ্কিণী।

ঘাটশিলার কবি কৃষ্ণচন্দ্র বাউলের কাব্যে এর উল্লেখ আছে।

মহুল বৃক্ষের তলে বিশ্রাম আমার,
মহুলিয়া নামে গ্রাম হইবে প্রচার।
আজি হতে নাম মোর হইল রংকিণী,
যাও রাজা এবে তুমি নিজ রাজধানী।

সেই থেকে রঙ্কিণী নামের সঙ্গে মহুলিয়া বা মহল্লা বা মৌলা যুক্ত হয়ে গেছে। রঙ্কিণীপূজার সূচনা ছোটনাগপুরে, বিশেষ করে ঘাটশিলায়। ঘাটশিলার রঙ্কিণীমূর্তি অষ্টভুজা শিলাময়ী, পাদপীঠে শবমূর্তি—উপরে দুই হাতে দুটি হাতী প্রস্তরে ক্ষোদিত। মনে হয় হাতীর উৎপাতের সঙ্গে দেবীপূজা জড়িত।

ঘাটশিলার মূর্তি—শিলামূর্তি। আবার গোপীকান্তপুরের মূর্তি মৃন্ময়ী ভয়ঙ্করী কালীমূত্তি। এই কারণেই বোধ হয় সংবাদ প্রভাকরের পত্র থেকে ১৮৩৭ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী 'জ্ঞানান্বেষণ' যে সংবাদ প্রচার করে তাতে 'মৃত্তিকা কিংবা পাষাণ ক্ষোদিতা' মূর্তির উল্লেখ আছে।

আবার অনেক স্থলে কোন মূর্তি নাই, দেবীর প্রতীক হিসেবে পোড়ামাটির হাতী বা ঘোড়া দিয়ে পূজার ব্যবস্থা আছে। ঘাটশিলার রঙ্কিণী-পূজার সঙ্গে আদিবাসীদের বেঁধা পরব জড়িত। সামন্ত রাজার সামনে এই বেঁধা পরব অনুষ্ঠিত হয়। সাঁওতালরা দুটি পুরুষ মহিষকে নিয়ে এসে শক্ত খুঁটিতে বাঁধে। রাজা এরপর কয়েকটি শাণিত অস্ত্র মহিষের দিকে নিক্ষেপ করেন। রাজার অস্ত্র নিক্ষেপ শেষ হলে আদিবাসীরা টাঙ্গি, বর্শা দিয়ে মহিষ দুটিকে ক্ষত-বিক্ষত করে। শেষে রক্তাক্ত অবস্থায় মহিষ দুটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তখন রাজপুরোহিত এসে খাঁড়া দিয়ে মহিষ দুটিকে বলিদান দেয় ও মস্তক-দুটি দেবীকে উৎসর্গ করে। তবে এই নিষ্ঠুর প্রথা বহু দিন হল বন্ধ হয়ে গেছে। মনে হয় বর্তমানে সাঁওতালের মধ্যে যে বাঁধনা

পরব অনুষ্ঠিত হয় তার উৎস এই বেঁধা পরব। তবে বাঁধনা পরবে বেঁধা পরবের নিষ্ঠুরতা নাই, দুটি মহিষকে নেশাগ্রস্ত করিয়ে তাদের লড়াই দেখার আনন্দটুকু আছে।

অনেকের মতে শিখরভূমের রঙ্কিণী ও বরাকরের কল্যাণেশ্বরী এক ও অভিন্ন। "ধলেতে রঙ্কিণী মাগো—শিখরে কল্যাণী।" মাইথনের কল্যাণেশ্বরী প্রাচীনকালে শিখরভূমের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

গোপীকান্তপুরের রঙ্কিণীদেবীও মনে হয় প্রাচীন কালে আদিবাসীদের পূজিতা ছিলেন। বর্তমানে এ অঞ্চলে আদিবাসীদের সংখ্যাধিক্য। প্রাচীন কালে দেবীর নিকট নরবলি, মহিষবলি প্রভৃতি তথ্য এ কথাই প্রমাণ করে। পরে ইংরাজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হলে এবং সংবাদ প্রভাকর ও জ্ঞানান্বেষণ প্রভৃতি পত্র পত্রিকায় নরবলি নিয়ে হৈ চৈ হওয়ায় এ প্রথা বন্ধ হয়ে যায়। এর পরেই রাম ব্রহ্মচারী দেবীকে আর্যসংস্কৃতির বৃত্তে নিয়ে আসেন। রঙ্কিণীর স্বরূপ যাই হোক—তিনি শাস্ত্রীয়দেবী দুর্গা, কালী, ভৈরবীর আকৃতি ভেদই হন বা লৌকিকদেবী রঙ্কিণী, কঙ্কালী-ই হন, বর্তমানে তিনি শবরূপী শিবোপরি মহাকালী রূপেই পূজিতা। তিনি রক্তাঙ্গীং ধৃত শূল-মুণ্ড-ডমরু-পাত্র, কবৈর্বিপ্রতীম্।

দেবী রঙ্কিণী রক্তবর্ণা শবোপরিস্থিতা অষ্টাভুজা একটি করে মুখ ঢাকা অপর করে অসিধৃতা অন্য করে শূল মুন্ড ডমরু ও পাত্র। অপর দুটি করে হস্তীযুগল বা সর্পদ্বয়, গলে নরমুণ্ডমালা, ইনি হস্তীচর্মাচ্ছাদিতা, দেবী দানবনাশিনী।

যুগের পরিবর্তনে মানুষের রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ধ্যানের ভয়ঙ্করী রঙ্কিণী আজ এই বর্তমান রূপে পূজিতা হচ্ছে।

শক্তিপূজার পীঠস্থান এই জেলায় শক্তিদেবী নানা স্থানে নানা রূপে নানা নামে পূজিতা হয়ে আসছেন। কোথাও যুগাদ্যা, কোথাও সর্বমঙ্গলা, কোথাও তারাক্ষ্যা, কোথাও বা শাকম্ভরী, আবার কোথাও রঙ্কিণী—বিচিত্র সব পূজা-পদ্ধতি, বিচিত্র দেবীর অনুষ্ঠান, বিচিত্র উৎসব। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে দেবী মহাশক্তি এক ও অনন্য। একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।

মাইথনের কল্যাণেশ্বরী :

ধলেতেরঙ্কিণী মাগো শিখরে কল্যাণী।

ধলভূমের যিনি রঙ্কিণী শিখরভূমের তিনিই কল্যাণেশ্বরী। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের W.B. Dist. Records থেকে জানা যায় শিখরভূম সে সময় বর্ধমান চাকলার একটি পরগনা ছিল; অতীতে কুলটি থানার ১নং দেবীপুর মৌজার অন্তর্গত

মাইথন বা কল্যাণেশ্বরী শিখরভূমের অন্তর্গত ছিল। হালদা পাহাড়ের ওপর অবস্থিত এই দেবীস্থান। আজ শিখরভূম, দেবীপুর, হালদা পাহাড় সব লোকের স্মৃতি থেকে উঠে যাচ্ছে। আজ কেবল মাই-কা-থান বা মায়ের স্থান—মাইথন কল্যাণেশ্বরী। আজ দেবীপুর কেন, গোটা কুলটি থানাই urban area ভুক্ত, কুলটি এখন শিল্পনগরী—দেবীপুরের হালদাপাহাড় বিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্যতম কেন্দ্র। এই নগর এলাকার আয়তন ৯৯.৫৭ বর্গ কিমি, লোকসংখ্যা ২৫০২৮০ জন, তপসিলী সম্প্রদায় ৬৩৬৫১ জন, আর উপজাতি সাঁওতাল ১১০১২ জন।

বরাকরের ৮ কিমি দূরে মায়ের মন্দির। এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী কল্যাণেশ্বরী। দেবীর কোন বিগ্রহ মূর্তি নাই। গর্ভ মন্দিরের নীচে সুড়ঙ্গ, তার নীচে দেবী বিমুখ হয়ে মুখ ঘুরিয়ে বসে আছেন। দেবী ভক্তদের কাছে আর মুখ দেখাবেন না, দেবীর বড় লজ্জা। সে এক কাহিনী।

অতীত কালে দেবীর কাছে নরবলি দেওয়া হত। ঘাটশিলা ও গোপীপুরেও রঙ্কিণী দেবীর নিকটও নরবলি দেওয়া হত। এ নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে সংবাদ প্রভাকর ও জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকায় যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তা নিয়ে হইচই পড়ে যায়। কাজেই ধলভূমের রঙ্কিণীর অন্যরূপ। শিখরভূমের কল্যাণেশ্বরীর কাছেও যে নরবলি দেওয়া হত সেটা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। তবে কল্যাণেশ্বরীর নিকট নরবলি এক বিশেষ মাত্রা সংযোজন করেছে। দেবীর পূজারী ভক্তদাস; পূজারীর অনুপস্থিতিতে তার কুমারী নাবালিকা কন্যা ভবানী দেবীর মন্দিরে সন্ধ্যাপ্রদীপ দিতে প্রবেশ করে; সে আর বাড়ীতে ফেরে না। ভক্তদাস বাড়ী ফিরে এসে কন্যাকে দেখতে না পেয়ে মন্দিরে গিয়ে দেখেন দেবীর মুখ ফেরনো। দেবীর মুখে একগুচ্ছ চুল। ভক্তদাসের বুঝতে দেরী হল না যে, দেবী ভবানীই তার কন্যা ভবানীকে ভক্ষণ করে ক্ষুধার জ্বালা মিটিয়েছে, চুলগুলি আর গিলতে পারে নাই। আর পূজারীর কন্যাকে ভক্ষণ করে দেবী লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। সেই থেকে দেবীর মুখ এক কাপড়ে আবৃত আর ফেরানো।

দেবীর নিত্যপূজা হয় এবং কারও যদি মানত থাকে পাঁঠাবলি হয়। শ্রীপঞ্চমী এবং প্রতি রবিবার ও মঙ্গলবার দেবীর বিশেষ পূজা। এই কয়দিন বিশেষ লোক-সমাগম হয়। মাঘ মাসের প্রথমে দেবীর মহাপূজা ও উৎসব হয়। সে সময় হাজার হাজার ছাগ বলিদান হয়।

কল্যাণেশ্বরী দেবীর আবির্ভাব সম্বন্ধে জনশ্রুতি আছে যে জনৈক বিজয়কুমার নামক ব্রাহ্মণ নিকটবর্তী নালা থেকে সালঙ্কারা একটি বাহু জেগে উঠতে দেখে

ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কাশীপুররাজ কল্যাণ সিংহ বাহাদুরকে বিষয়টি জানায়। কল্যাণ সিংহ প্রমাণ চাইলেন। ব্রাহ্মণ তখন রাজাকে সঙ্গে করে নালার ধারে এসে আকুল স্বরে দেবীকে দেখা দিতে বলে। ব্রাহ্মণের আকুল আবেদনে সাড়া দিয়ে দেবী আবার তাঁর বাহু দুটি তুলে রাজাকে দেখান। দেবী সেই রাতে রাজাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে একখণ্ড প্রস্তর দেখিয়ে বলেন—"এই আমার মূর্তি। নালার ধারেই এই মূর্তি পাবে, তুমি আমাকে প্রতিষ্ঠা কর।" রাজা প্রাতঃকালে উঠে পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে প্রস্তরখণ্ড দেখেন ও সেই প্রস্তরখণ্ডের ওপর দেবীর মন্দির নির্মাণ করান। কল্যাণ সিংহের প্রতিষ্ঠিতা বলে দেবী কল্যাণেশ্বরী বলে পরিচিতা হন।

দেবীর আবির্ভাব সম্বন্ধে অন্য এক জনশ্রুতিও প্রচলিত আছে। শিখরভূম রাজ্যের রাজগুরু দেবনাথ দেওঘরিয়া চালনাদহের তীরে দেবীর সেবাপূজা করেন। পরে দেবীর মাহাত্ম্য চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে দেবী কল্যাণেশ্বরী নামে রাজবংশে কুলদেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিতা হন। শিখরভূম রাজ্যের রাজা কল্যাণ সিংহ দেবীর জন্য মন্দির নির্মাণ করিয়ে দেবীকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু সে মন্দির কালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এর পর কাশীধামের শিবচৈতন্য নামক দক্ষিণ ভারতীয় সাধক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে মাইথনে আসেন ও কল্যাণেশ্বরী দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১২৩০ সালে কাশীপুরের রাজা বিক্রম সিংহ পুরানো ধ্বংসস্তূপের ওপর নতুন মন্দির নির্মাণ করান।

ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা ও গোপীকান্তপুরের রঙ্কিণীদেবীর মত কল্যাণেশ্বরী দেবী সম্পর্কে পূজারীর কন্যার রূপ ধরে দামোদর তীরে শাঁখারীর কাছে শাঁখা পরার কাহিনী প্রচলিত আছে। শঙ্খ পরিধানের স্থানটি সিদ্ধাসন নামে খ্যাত।

মন্দিরপ্রাঙ্গণে যূপকাষ্ঠ, একটি আমগাছ ও একটি নিমগাছ আছে। নিম-গাছের নীচে অনেক পাথর জড়ো হয়ে আছে। ঐগুলি সাধারণ্যে কামনাপাথর নামে পরিচিত। জনশ্রুতি পাথরগুলি শিলীভূত কঙ্কাল। পাথরের কাছে মনের বাসনা জানালে নাকি প্রার্থীর মনস্কামনা পূর্ণ হয়। সর্বমঙ্গলাদেবীর কাছে যেমন প্রেমিক-প্রেমিকা দেবীকে সাক্ষী রেখে মালাবদল করে নতুন জীবন শুরু করে, কল্যাণেশ্বরীর কাছেও হিন্দু বিশেষভাবে আদিবাসীরা পুরোহিতের হাতে সিঁদুর পরে ও মালাবদল করে প্রেমিক-প্রেমিকা দাম্পত্যজীবন শুরু করে। দেবীর স্থানে গণবিবাহের সংবাদও পাওয়া যায়।

মাইথন ড্যাম তৈরী হওয়ার পর থেকে মায়ের মাহাত্ম্যের বহুল প্রচারের ফলে দর্শনার্থীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। মাইথন ড্যাম ও হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্ল্যান্টের পাশে দেবী কল্যাণেশ্বরীর অবস্থান ভারতের প্রাচীন

আধ্যাত্মিকতার ধারার সঙ্গে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ধারার এক অপূর্ব মেলবন্ধনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সবই কল্যাণেশ্বরী মাইকা কৃপা।

অমরারগড়ের শিবাক্ষ্যাদেবী :

আউসগ্রাম থানার ৮৮নং অমরাগড় প্রাচীন গোপভূমের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন গ্রাম। আয়তন ১১৬৯.৬৬ হেক্টর, লোকসংখ্যা ৪১৪৭ জন, তপসিলী জাতি ১৭১৫ জন, সাঁওতাল উপজাতি ৭২৯ জন, জনগণের মধ্যে সামান্য কিছু ব্রাহ্মণ ও বেশীর ভাগ সদ্‌গোপ, গোপ ও সাঁওতালই প্রধান। জি. টি. রোডের ধারে মানকরের কাছে বুদ্‌বুদ চটি থেকে গুসকরাগামী বাসে ও বর্ধমান গুসকরা ভায়া বুদবুদ বাসে অমরারগড়ে যাওয়া যায়। অমরারগড় সম্পর্কে ১৯৫১ সালের Dist Hand Book Burdwan থেকে জানা যায়। Amaragarh is traditionally identified as the seat of Mahendra Nath or Mahindri Raja, the only prince of the Sadgop dynasty of Gope-bhum whose name still survives. The long lines of fortification which enclosed his walled town are still visible and consist of a round earth work rampart and ditch enclosing a square of about a mile in area.

গ্রামের অধিষ্ঠাত্রীদেবী শিবাক্ষ্যা। সুয়াতা, ভালকী, অমরারগড়, আউসগ্রাম থানার প্রাচীন গোপভূমের জঙ্গলমহলে অবস্থিত। প্রবাদ, অমরারগড়ের সন্নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রাচীনকালে এক হিন্দু রাজা ছিলেন ভল্লুপাদ। তাঁর রাজধানী ছিল ভালকী। রাজার নাম অনুসারেই গ্রামের নাম হয় ভালকী। অমরাবতী নগরীর এক পূর্ণগর্ভা সদ্‌গোপ মহিলা পুষ্করিণীতে স্নান করতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ এক ভালুক তাঁকে আক্রমণ করে। ভয়ে মহিলার সেখানেই প্রসব হওয়ার উপক্রম। ভালুক মহিলাকে গভীর জঙ্গলে নিয়ে যায়। সেখানেই মহিলা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে। জনৈক ব্রাহ্মণ ঐ পথ দিয়ে যেতে যেতে সদ্যোজাত শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনে ছেলেটির কাছে যান। দয়াপরবশ হয়ে মহিলা ও শিশুকে নিজগৃহ অমরাবতীতে নিয়ে যান। মহিলাটিকে নিজ কন্যার মত ও শিশুটিকে দৌহিত্রবৎ পালন করতে থাকেন। ভল্লুকের বাসা থেকে উদ্ধার করেন বলে শিশুটির নাম রাখেন ভল্লুপাদ। ছেলেটি বড় হয়ে ভালকীর রাজা হলেন। তিনি সদ্‌গোপ কন্যাকে বিবাহ করেন। ভল্লুপাদের কুলদেবী ছিলেন শিবাক্ষ্যা। অমরারগড়ে শিবাক্ষ্যাদেবীর আবির্ভাব সম্বন্ধে আর এক জনশ্রুতি হচ্ছে অমরারগড়ের সদগোপ রাজা ছিলেন রাজা মাহিন্দ্রি বা মহেন্দ্রনাথ। তাঁর স্ত্রী অমরাবতী। অমরাবতীর নাম অনুসারে গ্রামের নাম হয় অমরাবতী। পরে দুর্গের জন্য অমরাবতী অমরারগড়ে পরিণত হয়। যাই হোক রাজা মহেন্দ্রনাথ

স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কাটোয়ার নিকটবর্তী খাজুরডিহির উগ্রক্ষত্রিয় রাজা জগৎ সিংহের গৃহ থেকে জোরপূর্বক স্বর্ণনির্মিত দশভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তি অপহরণ করে এনে নিজ রাজ্য অমরাবতীতে প্রতিষ্ঠা করেন।

এই দেবী শিবাক্ষ্যা নামে খ্যাত। এই শিবাক্ষ্যাদেবী রাজা ভল্লুপাদের কুলদেবী। শিবাক্ষ্যাদেবীর নিকট নিয়মিত নরবলি দেওয়া হত। শিবাক্ষ্যাদেবীর মন্দির ছিল হজরত বহমন পীরের সমাধির পূর্ব কোণে 'মেহালা' পুষ্করিণীর দক্ষিণপূর্ব পাড়ে। বহমন ধার্মিক্ ও বিদ্বান ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশে এসে ভালকীতে বসবাস করেন। তিনি শিবাক্ষ্যার কাছে নরবলি বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর হন। ফলে হিন্দুরাজা ভল্লুপাদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে তিনি নিহত হন। মূর্তিটিকে মুসলমানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ভল্লুপাদ অমরারগড়ে সরিয়ে নিয়ে যান। নিয়ে যাবার সময় মূর্তিটির নাসিকাটি একটু ভগ্ন হয়। মূর্তিটি এখন অমরারগড়ে পূজিতা হচ্ছেন। শিবাক্ষ্যাদেবী প্রথমে হয়ত স্বর্ণনির্মিত ছিলেন কিন্তু পরে সে মূর্তি চুরিই যায় বা অন্য কোন স্থানে লুক্কায়িত হয় তার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পরে আদি মূর্তির অনুরূপ প্রস্তরমূর্তি নির্মিত হয়ে মাহিন্দী রাজার পূজিতা হন। শিবাক্ষ্যা মহিষাসুরমর্দিনী দশভুজা শিলামূর্তি—দেবীর নিত্যসেবার ব্যবস্থা আছে। শারদীয়া দুর্গাপূজার সঙ্গে দেবীর মহাপূজা হয়। বর্ধমানের সর্বমঙ্গলার মন্দিরে অষ্টমীর পূজার মত এখানেও অষ্টমী-নবমীর সন্ধিক্ষণে বলিদানের মুহূর্তে তোপ দাগা হয়। সর্বমঙ্গলা মন্দিরে কামান বিস্ফোরণের পর থেকে সতর্কতামূলক পন্থা হিসেবে সম্প্রতি এই কামানদাগা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নবমীর দিন দেবীকে গ্রামের উত্তর ভাগে জঙ্গলের মধ্যে 'রাজবাড়ী' নামক স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে দেবীর মহানবমীর বিহিত পূজা সম্পন্ন হয় এবং ছাগ ও মহিষ বলি হয়। এরপর সাঁওতালদের ছাগ বলি হয়। বলি দেওয়া মহিষটি সাঁওতালদের প্রাপ্য। এর থেকে মনে হয় দেবী প্রথমে আদিবাসীদের আরাধ্যা ছিলেন। কারণ নবমীর দিন ১ দিনের জন্য যে 'রাজবাড়ী' নামক স্থানে দেবীকে নিয়ে যাওয়া হয় সেটি সাঁওতাল পল্লীতেই অবস্থিত। মন্দির অবশ্য নাই—আছে ধ্বংসাবশেষ। ধ্বংসাবশেষই রাজবাড়ীর স্মৃতি বহন করছে।

Burdwan Gazetteer 1994 অমরারগড় সম্বন্ধে যে বিবরণ আছে তাতেও এই রাজপ্রাসাদের উল্লেখ আছে। There are numerous mounds of earth and bricks strewn over the areas named Hatisala, Bhalluk Sala, Maraitala etc perhaps signifying the kings possession of the older days. There are a number of old temples and deities. There are the Sivakhya Devi and Dugdheswar Siva at this Place... An

archetecturally novel temple of Durga is worth seeing. অমরারগড়ের গড়ও নাই রাজাও নাই। গড়ের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প্রাচীন গোপরাজাদের হাতীশালা, ভল্লুকশালা আজ গোপভূমের স্বর্ণপুরীর স্মৃতি বহন করছে।

কেতুগ্রামের বহুলা, অট্টহাস বা ফুল্লরা :

অতীতের বহুলাপীঠ বর্তমানের কেতুগ্রাম। কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত কেতুগ্রাম একটি প্রাচীন গ্রাম। কাটোয়া থেকে সরাসরি বাসে যাওয়া যায়। কাটোয়া থেকে ১২/১৪ কিমি দূরে, ঈশানী নদীর তীরে অবস্থিত গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বহুলা ও অট্টহাস বা ফুল্লরা, দুটিই শক্তিপীঠ। কেতুগ্রাম সম্পর্কে ১৯৯৪-এর বর্ধমান গেজেটিয়ারে যে বিবরণ দেওয়া আছে তাই দিয়ে শুরু করা যাক।

Ketugram (88.4 E, 23.42 N) The head quarters of the Police Station of the same name (85) having an area of 849.52 hectares and population of 4945 according to the census of 1971. It is a Sakti Pith where the Sati's left arm is said to have fallen and was a seat of tantric worship in medieval times as evidenced by the temple of Bahula located here. The icon is made of black basalt with the icons of Kartik and Ganes on the left and the right respectively. It is said that the King Chandra Ketu first established the icon of Bahula. বর্তমানে ১৯৯১-এর সেন্সাস মতে এর আয়তন ৮৪৯.৩২ হেঃ, লোকসংখ্যা ৬৭৪০ জন, তপসিলী ১৭৭০ জন, উপজাতি ৩১৫০ জন।

কেতুগ্রাম ৫১ পীঠের অন্যতম পীঠ। হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান। সাধারণের ধারণা বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন সতীর অধঃওষ্ঠ ও বামবাহু কেতুগ্রামেই পড়ে আর সেকারণেই যুগ্মপীঠস্থান। অট্টহাস (ফুল্লরা) ও বহুলা। কিন্তু ১৯৯৪ সালের বর্ধমান গেজেটিয়ারে কেতুগ্রামের যে বিবরণ দেওয়া আছে তাতে বহুলার উল্লেখ থাকলেও অট্টহাসের উল্লেখ নাই। সরকারী মতে অট্টহাস বীরভূমে। অবশ্য পীঠস্থানের সংখ্যা সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। দেবী ভাগবত মতে ১০৮, কালিকাপুরাণ অনুসারে পীঠের সংখ্যা ৭, কুব্জিকাতন্ত্রে পীঠস্থান ৪২। সপ্তদশ শতকে রচিত তন্ত্রচূড়ামণি গ্রন্থে পীঠের সংখ্যা ৫১। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তন্ত্রচূড়ামণির মতই সমর্থন করেছেন। "একমত না হয় পুরামত যত। আমি কহি মন্ত্র চূড়ামণিতন্ত্র মত।" মনে হয় ভারতচন্দ্র 'তন্ত্রচূড়ামণি' স্থলে 'মন্ত্রচূড়ামণি' লিখেছেন। জ্ঞানার্ণবতন্ত্রের ৫ম পটলে আটটি পীঠের উল্লেখ আছে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে ৯টি পীঠের উল্লেখ করেছেন। মুকুন্দরামের মতে

রাজবলহাটে দেবীর বামহস্ত পড়ে—এখানে দেবী 'বিশাললোচনী', আর ক্ষীরগ্রামে পড়ে দেবীর পৃষ্ঠদেশ—দেবী যোগাদ্যা। মুকুন্দরামের তালিকায় কেতুগ্রামের বা অট্টহাসের উল্লেখ নাই। কিন্তু কেতুগ্রামের স্থানীয় লোকের মতে কেতুগ্রামেই দেবীর অধঃওষ্ঠ পতিত হয়। বহুলা নদীর তীরে যে মহাশ্মশান সেটি স্থানীয় লোকের কাছে মড়াঘাট নামে পরিচিত। প্রবাদ আছে, দেবী পূর্বে মড়াঘাটেই ছিলেন। যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী তাঁর "বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি" গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে বলেছেন যে অট্টহাস ও বহুলা এই যুগ্ম পীঠস্থান কেতুগ্রামেই। ডঃ অশোক মিত্র তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা (৫ম খণ্ড)' গ্রন্থে যে মেলার সারণী দিয়েছেন সেখানে কেতুগ্রাম মৌজার ঠিক পশ্চিমে ৬৯নং দক্ষিণডিহি মৌজায় মাঘ মাসে তিন দিন অট্টহাস দেবীর মেলার উল্লেখ করেছেন।

অভয়াদাস মুখোপাধ্যায় "১০৮ শিবমন্দিরের দ্বিশত বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ"-এ কেতুগ্রামেই অট্টহাস পীঠস্থানের বর্ণনা দিয়েছেন। এখানে দেবীর অধঃওষ্ঠ পতিত হয়েছিল। দেবী ফুল্লরা ও ভৈরব বিশ্বেশ্বর। সর্বপ্রাচীন কুব্জিকাতন্ত্রে অট্টহাসের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় "রাঢ় দেশান্তর্গত বহুলা নদীতীরস্থিত সিদ্ধ ও চারণসেবিত ফুল্লদেবীর পীঠস্থান।" কিন্তু শিবচরিত্র গ্রন্থে দেখা যায় কেতুগ্রাম উপপীঠ; প্রাণতোষিণী গ্রন্থে আছে অট্টহাস বীরভূম জিলাতে অবস্থিত। পঞ্জিকাতে যে একান্নপীঠের বিবরণ দেওয়া আছে তাতে দেখা যায় বীরভূম জেলার আমোদপুর স্টেশন থেকে প্রায় সওয়া তিন ক্রোশ দূরে লাভপুর, তার ঠিক পূর্বে অট্টহাস অবস্থিত। এখানে আছে মায়ের প্রকাণ্ড শিলামূর্তি অধঃওষ্ঠাকৃতি প্রায় ১২/১৩ হাত পরিমিত স্থান বিস্তৃত। শিবাভোগ এখানকার আশ্চর্য দৃশ্য। উক্ত মন্দিরের পাশে ভৈরবের মন্দির। আমারও মনে হয় অট্টহাস বীরভূমেই অবস্থিত—কেতুগ্রাম উপপীঠ। এখানে দক্ষিণ দ্বারী মন্দির আছে, শিবানন্দ স্বামীর আশ্রম আছে কিন্তু মন্দিরে ভগবতীর কোন মূর্তি নাই। প্রবাদ, কালাপাহাড়ের অত্যাচারে সব নষ্ট হয়ে গেছে। কিংবা এমনও হতে পারে প্রথমে অট্টহাসদেবী এখানেই ছিল কিন্তু কালাপাহাড়ের আক্রমণের আশঙ্কায় দেবীকে লাভপুরের কাছে অট্টহাসে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যাই হোক, কেতুগ্রামের গ্রামবাসীগণ দাবী করেন অট্টহাস তাঁদের গ্রামেই; দেবী ফুল্লরা। কিন্তু কেতুগ্রামে ভৈরব নাই দেবীর ভৈরব বিশ্বেশ্বর গ্রামে। আগেই বলা হয়েছে এখানে দেবীর মূর্তি নাই। ঘটে-পটে-জয়দুর্গার ধ্যানে দেবীর নিত্যপূজা হয় ও শিবাভোগ হয়। তবে কেতুগ্রামে যে সতীর বামবাহু পড়েছিল সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নাই। দেবী বহুলা, ভৈরব ভীরুক। কিন্তু গ্রামে ভীরুকের কোন মূর্তি নাই। শ্রীখণ্ডের ভূতনাথকে ভীরুক

হিসাবে পূজা করা হয়। বহুলার মূর্তি কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্মিত প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট উচ্চ দুর্গামূর্তি। ডান পাশে গণেশ ও বাম পাশে কার্তিক। শারদীয়া দুর্গাপূজায় মহাধূমধামের সঙ্গে দেবীপূজা ও ছাগ বলি হয়।

উজানির বহুলা :

মঙ্গলকোটের উজানিও একান্নপীঠের অন্যতম এক মহাপীঠ। এখানে বিষ্ণু-চক্রে ছিন্ন সতীর বাম কনুই পতিত হয়েছিল বলে তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। দেবী এখানে মঙ্গলচণ্ডী ও ভৈরব কপিলেশ্বর। এই দেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তা হল—কোগ্রাম-উজানির পূর্ব নাম ছিল উজ্জয়িনী—অপভ্রংশে এখন উজানিতে পরিণত হয়েছে। উজ্জয়িনীর রাজা ছিলেন বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমজিৎ। ইনি অবশ্য গুপ্তবংশের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য নন। জনৈক সন্ন্যাসী উজানির মহাশ্মশানে কালী-সাধনা করতেন। মহারাজকে হত্যা করে রাজ্যলাভের বাসনায় সন্ন্যাসী মহারাজকে কালীপূজা দেখতে ও মায়ের আশীর্বাদ নিতে আমন্ত্রণ জানান। মহারাজ যথাসময়ে মহাশ্মশানে যান—পূজা ও বলিদান শেষে সন্ন্যাসী রাজাকে দেবী-সমক্ষে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে বলেন, মহারাজ বলেন তিনি রাজা, ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কাকে বলে জানেন না—সন্ন্যাসীকে দেখিয়ে দিতে বলেন। প্রণামের জন্য সন্ন্যাসী যেমনি নত হয়েছেন অমনি মহারাজ পূজার খড়্গ নিয়ে নিজ হাতে সন্ন্যাসীকে বলি দেন ও কালীকে নিয়ে এসে মঙ্গলচণ্ডী রূপে প্রতিষ্ঠা করেন। দেবী পাষাণ মূর্তি, নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে। কার্তিকের অমাবস্যায় দেবীর মহাপূজা ও উৎসব। জয়দুর্গার ধ্যানে দেবীর পূজা হয়। মঙ্গলচণ্ডীর কাহিনীতে আছে—ধনপতি সাধুর পুত্র শ্রীমন্ত সিংহল যাত্রার প্রাক্কালে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করে সিংহল যাত্রা করেন। মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরের অদূরে একটি উঁচু ঢিবি আছে—এর নাম শ্রীমন্তের ডাঙ্গা। মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরের ভিতর ধ্যানী বুদ্ধের পদ্মাসনে উপবিষ্ট এক মূর্তি আছে। তাছাড়া এখানে ষোড়শ তীর্থঙ্কর শান্তিনাথের মূর্তি আবিষ্কৃত হয়। প্রাচীনকালে উজানি-কোগ্রাম ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের মিলনতীর্থ ছিল। উজানি নগর/অতি মনোহর/বিক্রম কেশরী রাজা/করে শিবপূজা/উজানির রাজা/ কৃপা কৈল দশভুজা।

বর্ধমান জেলায় শক্তিপীঠের প্রসঙ্গ শেষ করার পূর্বে শক্তিপীঠ সম্পর্কে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মন্তব্য উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে। "সতীকে অবলম্বন করিয়া যে দশমহাবিদ্যার কাহিনী ও সতীঅঙ্গে একান্ন পীঠের উৎপত্তি এই সকলই অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের সৃষ্টি বলিয়া মনে হয়।" প্রচলিত কালী, তারা, মহাবিদ্যা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি বলিয়া যে শ্লোকটি পাওয়া যায় তাহা

চামুণ্ডা-তন্ত্রের। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে' বিষ্ণু কর্তৃক খণ্ডিত দেবীঅঙ্গ পতনের দ্বারা পীঠসমূহের উৎপত্তির কথাও দেখি। তন্ত্রচূড়ামণিতে ও 'কালীপুরাণে' এই পীঠসমূহের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

এই জেলায় প্রায় সর্বত্রই শক্তিপূজার প্রচলন আছে—বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন রূপে। এই অধ্যায়ের মধ্যে তাদের কয়েকটির মাত্র বিশদ বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আরও বহু স্থানের বহু দেবীর উল্লেখ পাই। তাদের মধ্যে কতকগুলির একটা তালিকা নীচে দেওয়া হলো। এর থেকেই জেলায় শক্তিপূজার ব্যাপকতা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যাবে।

শক্তিপূজা নানা স্থানে—ভিন্ন রূপে ভিন্ন নামে

নং থানা	মৌজা গ্রাম	দেবীর নাম	পূজা বা মূর্তির কোন বৈশিষ্ট্য
১। কাটোয়া	আখড়া (৯৯)	সিদ্ধেশ্বরী কালী	কার্তিক মাসে ও প্রতি অমাবস্যায়।
২। কাটোয়া	কালিকাপুর (১১১)	শিলাময়ী জয়দুর্গা	অষ্টভুজা বামপার্শ্বে ধ্যানরত মহাদেব, ডানপার্শ্বে পদ্মাসনে পদ্মযোনি; দুপাশে জয়া-বিজয়া, শিরোপরি পঞ্চানন ও তার দুপাশে কালভৈরব ও মহারুদ্র ক্ষোদিত।
৩। কাটোয়া	দেয়াসিন (১০২)	শিলাময়ী মহিষমর্দিনী চণ্ডী	মাঘী পূর্ণিমার পরের অষ্টমীতে মহাপূজা।
৪। কাটোয়া	নলহাটী (৮৫)	কালিকাদেবী বড় ঠাকরুন	কার্তিক অমাবস্যায় মহাপূজা; গ্রামের মধ্যে সকলের ঘর থেকে মুড়ি মুড়কি পাটালি সংগ্রহ করে এয়োজাত। পূজায় মহিষ বলি হয়।
৫। কাটোয়া	ব্রহ্মপুর (৪৩)	সিদ্ধেশ্বরী কালী	পূর্বের শিলাময়ী মূর্তি নষ্ট হওয়ায় বর্তমানে মৃন্ময়ী। ৩০শে বৈশাখ পূজা।
৬। কাটোয়া	গৌরডাঙ্গা (১৩১)	গৌড়চণ্ডী	আশ্বিনে গ্রামের প্রান্তে অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে দেবীর অর্ধভগ্ন শিলামূর্তিতে পূজা।
৭। কালনা	আনুখাল (১০৪)	অষ্টধাতুর জয়দুর্গা	দেবীর গাজন হয়।

নং	থানা	মৌজা গ্রাম	দেবীর নাম	পূজা বা মূর্তির কোন বৈশিষ্ট্য
৮।	কালনা	রানীচন্দ (২৮)	চতুর্ভুজা আরখাই চণ্ডীর পিতলমূর্তি	আষাঢ়ে নবমীতে মহাপূজা। গ্রামবাসীদের ধারণা এখানে সতীর ছিন্ন অংশের এক অংশ পড়েছিল, অবশ্য ৫১ পীঠের তালিকায় কোন উল্লেখ নেই।
৯।	কালনা	মালতিপুর (৪৬)	সিদ্ধেশ্বরী কালী	—
১০।	কালনা	পাতিলপাড়া (৪২)	হরগৌরী	জ্যৈষ্ঠ মাসে ঝাঁপান।
১১।	ভাতার	আমারুন (৯৯)	ক্ষেপাকালী	পাগলের বালা দেওয়া হয়।
১২।	ভাতার	বনপাশ (২১) মণ্ডলপাড়া	সিংহবাহিনী ধাতু মূর্তি	শারদীয়া পূজার সঙ্গে ৪ দিন মহাপূজা মহানবমীতে বিশেষ পূজা। নিত্য পূজা হয়।
১৩।	ভাতার	নাসিগ্রাম (৮৯)	ন্যাড়াকালী বা	অগ্রহায়ণের অমাবস্যায় মহাপূজা, ডাকাতে কালী।
১৪।	ভাতার	বড়বেলুন (৯৩)	১৪ হাত উঁচু কালী — বড়মা	কার্তিক-অমাবস্যায় পূজা।
১৫।	ভাতার	কুলনগর	এক ফুট উচ্চ ঊর্ধ্বাঙ্গ মূর্তি	আষাঢ়ে নবমীতে মঙ্গলচণ্ডীর ধ্যানে পূজা।
১৬।	ভাতার	মাহাতা (৩৩)	ভদ্রকালী	বৈশাখ
১৭।	ভাতার	রায় রামচন্দ্রপুর (মৌজা রামচন্দ্রপুর ৮০)	ভদ্রকালী	মহানবমী
১৮।	মঙ্গলকোট	ইটা (১৩০)	১০" উচ্চ শিলাময়ী এলাইচণ্ডী	নিত্যসেবা পূজা।
১৯।	মঙ্গলকোট	কোঁয়ারপুর	যোগাদ্যা	পূজায় বাগ্‌দীদের প্রাধান্য।
২০।	মঙ্গলকোট	সাঁওতা (১২৩)	শাকতাইচণ্ডী / সাঁওতাচণ্ডী	জ্যৈষ্ঠ মাসে বাৎসরিক মহাপূজা
২১।	মঙ্গলকোট	সিঙ্গারকোণ (১৩৯)	পথের কালী, সিদ্ধেশ্বরী, শ্মশান কালী	আষাঢ়-অমাবস্যায়।

নং থানা	মৌজা গ্রাম	দেবীর নাম	পূজা বা মূর্তির কোন বৈশিষ্ট্য
২২। মঙ্গলকোট	সিমুলিয়া (৭৮)	শিলাময়ী মহিষমর্দিনী দেবীর দক্ষিণ চরণ মহিষের উপর ও বাম চরণ সিংহের উপর স্থাপিত। দেবী জলতল-বাসিনী; দেবী গন্ধেশ্বরীরূপা দুর্গার মৎস্যরূপী দুর্গামূর্তি।	আষাঢ়ে নবমী ও মকর সপ্তমী
২৩। মন্তেশ্বর	করন্দা (১০৩)	করন্দেশ্বরী মহিষমর্দিনী	শ্রাবণ মাসের শুক্লা চতুর্দশীতে মহাপূজা। প্রথম অধিকার হাড়িদের শূকর বলি হয়, পরে অন্যান্যদের পূজা ও বলিদান।
২৪। মন্তেশ্বর	জামনা (১০৮)	পিতলের জয়দুর্গা	গুরু পূর্ণিমায় মহাপূজা। বাৎসরিক পূজা গ্রামের বাহিরে হয়। হাড়িরা শূয়োর বলি দেয়।
২৫। মন্তেশ্বর	ধান্যখেড়ুর (১২৩)	কালিকা দেবী	নিত্যপূজা, কালীপূজায় বিশেষ পূজা। দেবীর কাছে ওষুধ নিলে বাত নিরাময় হয় বলে বিশ্বাস।
২৬। মন্তেশ্বর	পুটশুড়ি (৬৪)	শিলাময়ী, গজকালিকা	শ্রাবণ মাসে বাৎসরিক পূজা।
২৭। মন্তেশ্বর	ভুরকুণ্ডা (৪৮)	অষ্টধাতুর সিংহবাহিনী দুর্গা	পারিবারিক হলেও গ্রামদেবী-রূপে পূজিতা।
২৮। মন্তেশ্বর	মূলগ্রাম (২৫)	বৈশাখমাসে রক্ষাকালী ও জ্যৈষ্ঠ মাসে যোগাদ্যা পূজা।	— —
২৯। রায়না	কাইতি (১৬৪) কাইতি চাপিয়া বন্দো বাণরাজার পাট/ ঊষাবালি পোতা বন্দো শ্বেত গঙ্গার ঘাট।	সিদ্ধেশ্বরী	জনৈক কলুর ঘানিঘরে দেবী সাঁওতাল কুমারী বেশে অদৃশ্য হন। পরে একটি তৈলভাণ্ডে শিলামূর্তি পাওয়া যায়। মৃন্ময়ী কালীমূর্তির সঙ্গে ঐ শিলাকেও পূজা করা হয়। তৈলভাণ্ডটি ঘটরূপে ব্যবহৃত হয়।
৩০। রায়না	পাঁইটা (১৫৯)	কালিকা (গ্রাম্যদেবী)	বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে মহাপূজা।

নং থানা	মৌজা গ্রাম	দেবীর নাম	পূজা বা মূর্তির কোন বৈশিষ্ট্য
৩১। রায়না	রামবাটি (১২১)	দেবী সিদ্ধেশ্বরী	১৬ই মাঘ বাৎসরিক পূজা ও মেলা।
৩২। রায়না	রায়না (১০৪)	যোগাদ্যা	২৯শে বৈশাখ মহাপূজা।
৩৩। রায়না	শ্যামসুন্দর (৭২)	রক্ষাকালী	২১শে পৌষ বার্ষিক পূজা।
৩৪। রায়না	মাছখাড়া (৩)	ওলাইচণ্ডী	মাঘমাসে পূজা ও মেলা।
৩৫। মেমারী	কানপুর (১২০)	প্রস্তর নির্মিত মহিষমর্দিনী সর্বমঙ্গলা	জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে। বিশেষ পূজা।
৩৬। মেমারী	গন্তার (১৬৭)	চণ্ডীপূজা	সীতানবমীতে মহাপূজা। প্রবাদ, এখানে নাকি সতীর কর্ণ পড়েছিল—কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রে এর সমর্থন নাই।
৩৭। মেমারী	মেমারী (১৫২)	শিলাময়ী সিংহবাহিনী	নিত্যপূজা জগদ্ধাত্রী পূজার সময় বার্ষিক পূজা।
৩৮। মেমারী	শঙ্করপুর (১৬৫)	পঞ্চমুণ্ডীর ওপর রক্ষাকালী	বৈশাখে কৃষ্ণপক্ষের শনিবারে পূজা।
৩৯। ফরিদপুর	কেন্দুলী (২৮)	মহিষমর্দিনী	মহাষ্টমীতে একটি থালা দেবীর সামনে পাতা হয়। ওতে সিঁদুরের ওপর পদচিহ্ন অঙ্কিত হলে বলিদান হয়।
৪০। ফরিদপুর	বালিজুড়ি (১৬)	ক্ষ্যাপাকালী ও নবীনাকালী	—
৪১। ফরিদপুর	বৈদ্যপুর (৫)	আচক চণ্ডী	জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় মহাপূজা।
৪২। গলসী	কৈতারা (৭৪)	গাছতলার বেদীতে বিশালাক্ষীর শিলামূর্তি	আষাঢ়ে নবমী ও মহানবমীতে পূজা।
৪৩। গলসী	গলসী (৯৯)	অষ্টভুজা দুর্গা	জয়দুর্গার ধ্যানে পূজা
৪৪। গলসী	চান্না (১৪৬)	সাধক কমলাকান্তের আরাধ্য বিশালাক্ষী	আষাঢ়ে নবমী; পাঁঠা ও শূয়োর বলি।
৪৫। গলসী	দ্বারনড়ী	সিংহবাহিনী (সার্বজনীন)	—
৪৬। গলসী	সাঁকো (১৫৪)	কালিবুড়ী চণ্ডী	বাত ও অন্যান্য রোগের ওষুধ দেওয়া হয়।

নং	থানা	মৌজা গ্রাম	দেবীর নাম	পূজা বা মূর্তির কোন বৈশিষ্ট্য
৪৭।	খণ্ডঘোষ	খণ্ডঘোষ (১৮)	রক্ষাকালী রটন্তী	পৌষ অমাবস্যায় পূজা। মাঘ মাসের চতুর্দশীতে।
৪৮।	অণ্ডাল	খাঁদরা	মহিষমর্দিনী, বুড়ীমা	—
৪৯।	জামালপুর	চকদীঘি (৫৯)	শিলাময়ী কালিকামূর্তি	—
৫০।	জামালপুর	জৌগ্রাম	পঞ্চমুণ্ডি আসনের ওপর মৃন্ময়ী মুক্তকেশী	—
৫১।	জামালপুর	পর্বতপুর (২৬)	শ্মশানকালী	সদ্য দিনে মূর্তি গড়ে ১৬ই ফাল্গুন পূজা।
৫২।	জামালপুর	পাঁচড়া (মৌজা-রূপপুর ৬৫)	১। সিদ্ধেশ্বরী (মৃন্ময়ী) ২। বস্ত্রাচ্ছাদিত বিশালাক্ষী মূর্তি	১৩ই চৈত্র মহাপূজা বার বৎসর অন্তর নব কলেবর হয়। —
৫৩।	জামালপুর	বসন্তপুর (৫৪)	মন্দিরের মধ্যে রক্ষাকালীর শিলাময়ী মূর্তি	বৈশাখে শনি বা মঙ্গলবারে পূজা।
৫৪।	জামালপুর	ময়দা	শ্মশানকালী	১৬ই চৈত্র বিকালে মাটির সঙ্গে মদ মিশিয়ে মূর্তি গড়ে রাত্রে পূজা হয়।
৫৫।	জামালপুর	মাহিন্দর (১০৫)	রক্ষাকালী	১৬ই চৈত্র একদিনে মূর্তি গড়ে পূজা, পুরোহিত নারীবেশে পূজা করেন।
৫৬।	জামালপুর	সালানপুর (মৌজা সাঁচড়া ১৯)	ডোমেদের কালী	বৈশাখের দ্বিতীয় মঙ্গলবার, আড়াই কোদাল মাটি নিয়ে সদ্যমূর্তি গড়ে রাত্রে পূজা।
৫৭।	আসানসোল	উষাগ্রাম (মহিশীলা মৌজা ২৫)	ঘাঘর চণ্ডী বা ক্ষ্যাপাবুড়ি	বৃক্ষের নীচে তিনটি ছোট শিলাখণ্ড-এ পূজা, কাঙাল চক্রবর্তী দেবীকে স্বপ্নে ঘাগরা পরিহিত দেখেন বলে ঘাগরা চণ্ডী বলে। ১লা মাঘ পূজা।

নং থানা	মৌজা গ্রাম	দেবীর নাম	পূজা বা মূর্তির কোন বৈশিষ্ট্য
৫৮। বর্ধমান	বর্ধমান (৩০)	১। লাকুর্ডির মশানে দুর্লভাকালী। ২। তেজগঞ্জে শিলাময়ী কালী। ৩। তিনকোনিয়ার উদয়সঙ্ঘের শিলাময়ী কালী। ৪। বীরহাটা, প্রায় ১০' উচ্চ মৃন্ময়ী ডাকাতে কালী। ৫। সোনাপটিতে লক্ষ্মী-নারায়ণজীর মন্দিরে ক্ষুদ্রকক্ষে বর্ধমান রাজের কুলদেবী শিলাময়ী চণ্ডিকা। ৬। মিঠাপুকুরে সোনারকালী ও অষ্টধাতুর ভুবনেশ্বরী কালী। ৭। সদরঘাট রোডে ওঁ ক্লীং কালী। নিত্যপূজা, শনি / মঙ্গলবার বিশেষ পূজা।	
৫৯। বর্ধমান	জরুর (১৫১) শক্তিগড় (১৫৫)	যোগাদ্যা ১। সিদ্ধেশ্বরী, ২। শিলাময়ী কালিকা	বৈশাখী সংক্রান্তিতে পূজা। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ মঙ্গলবার। নিত্যপূজা।
৬০। আউসগ্রাম	তকীপুর (১৭১)	১৫' বড় কালী	কার্তিক অমাবস্যা।
৬১। আউসগ্রাম	ভালকী (১৮১)	চতুর্ভুজা দুর্গা ও চামুণ্ডা	
৬২। আউসগ্রাম	ছোটরামচন্দ্রপুর (২০)	দিদি ঠাকরুন	বৈশাখে মহাপূজার ৮ দিন পর অষ্ট মঙ্গলা উৎসব।
৬৩। পূর্বস্থলী	নপাড়া (১৪৯)	সিদ্ধেশ্বরী	বৈশাখী পূর্ণিমা।
৬৪। পূর্বস্থলী	ভাতুরিয়া (১১১)	সিদ্ধেশ্বরী পূর্বে শিলাময়ী ছিল— মূর্তি নষ্ট হওয়ায় বর্তমানে মৃন্ময়ী।	—
৬৫। কাঁকসা	শ্যামারূপা গড় (মৌজা-বিষ্ণুপুর)	ইছাই ঘোষের মৃন্ময়ী শ্যামরূপা কালী	অক্ষয় তৃতীয়ায় বিশেষ পূজা।
৬৬। কাঁকসা	বসুধা (৩৫)	রূপাইচণ্ডী	চৈত্র সংক্রান্তিতে পূজা ও গাজন
৬৭। কাঁকসা	মোবারকগঞ্জ (৮০)	শুভচণ্ডী	বৈশাখে পূজা ও গাজন।
৬৮। বুদবুদ	হাঁসুয়া (৬)	হংসেশ্বরী কালী শিলাময়ী	
৬৯। দুর্গাপুর	সগড়ভাঙ্গা	প্রস্তরময়ী কালী	

নং	থানা	মৌজা গ্রাম	দেবীর নাম	পূজা বা মূর্তির কোন বৈশিষ্ট্য
৭০।	মঙ্গলকোট	পালিগ্রাম (২১)	কিরীটেশ্বরী খাঁদাকালী	আশ্বিন মাসে। ভাদ্রমাসে পূজা।
৭১।	জামালপুর	বেড়ুগ্রাম	শিলাময়ী শুভচণ্ডী	নিত্যপূজা শীতল হয়, দুর্গা-পূজার সময় বাৎসরিক পূজা।
৭২।	আউসগ্রাম	এড়াল (৯৩)	গোরক্ষ চণ্ডী	—

বাবলাডিহি–শঙ্করপুরের ন্যাংটেশ্বর :

মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত শঙ্করপুর (পূর্বনাম বাবলাডিহি) জে.এল.৬৮ ছোট্ট গ্রাম। আয়তন ৫৭.৫৩ হেক্টর, লোকসংখ্যা ৭১৮-এর মধ্যে তপসিলী ৩০৮, উপজাতি নাই। গ্রামে না আছে ডাকঘর, না আছে হেল্থ সেন্টার, না আছে হাটবাজার। নিকটবর্তী শহর ২০ কিমি দূরে সেই কাটোয়া। থাকার মধ্যে আছে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় আর আছেন বাবা ন্যাংটেশ্বর। নৈবেদ্যের ওপর মুণ্ডির মত বাবা ন্যাংটেশ্বরই গ্রামের অধিষ্ঠাতা দেবতা; বাবার দৌলতেই বাবলাডিঙ্গি গ্রাম আজ শঙ্করপুর। বর্ধমান কাটোয়া বাসে নিগন স্টপেজে নেমে পশ্চিমমুখে মাইলখানেক গেলেই বাবার স্থান।

কৃষ্ণপ্রস্তরের ওপর ক্ষোদিত বাবার মূল মূর্তি ৩ ফুট ১ ইঞ্চির মত উচ্চ—দিগম্বর তীর্থঙ্কর মূর্তি; পাদপীঠে পদ্মের ওপর একটি মৃগমূর্তি; মূল মূর্তির মস্তকে চূড়া। বিগ্রহের লিঙ্গ ও উদর কিঞ্চিৎ ভগ্ন। মূল মূর্তির দুপাশে শিলার ওপর আর দুটি মূল মূর্তির replica ক্ষোদিত। অপূর্ব শিল্পকার্য। নবম-দশম শতকের পালযুগের ভাস্কর্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। মূল মূর্তির উদর ও লিঙ্গ সামান্য ভগ্ন, দেখে মনে হয় মূর্তিটি কোথাও নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সে-এক কাহিনী। কাহিনীর মধ্যে সবটাই কল্পনা থাকে না, কিছুটা বাস্তবও থাকে। কল্পনা ও বাস্তবের সমন্বয়েই গড়ে ওঠে দেবদেবীর আবির্ভাবের কাহিনী। বহুদিন আগেকার ঘটনা—কতদিনের পুরানো তা গ্রামবাসীরা তো দূরের কথা সেবাইতদের কেউই তা বলতে পারে না। গ্রামের এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন নিঃসন্তান। সন্তানের কামনা নিয়ে বাবা কাশী বিশ্বনাথের কাছে মনের আকুতি জানাতে সদানন্দ যাত্রা করলেন কাশীর উদ্দেশ্যে। পথে মঙ্গলকোটে তাঁর এক বন্ধুকে সঙ্গে নেবেন এই ইচ্ছায় বন্ধুর বাড়ীতে রাতটা কাটাতে মনস্থ করেন। রাত্রে দেখলেন এক অদ্ভুত স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখেন উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের পূজিত মহাদেব তাঁকে বলছেন—আমি ন্যাংটেশ্বর, অদূরে নদীতে নিক্ষিপ্ত আছি, আমাকে উদ্ধার করে

নিজ গ্রামে প্রতিষ্ঠা কর—মনোবাসনা পূর্ণ হবে। সদানন্দের মনে পড়লো উজানির রাজা বিক্রমাদিত্যের কথা, তিনি ছিলেন শিবভক্ত—

উজানি নগর অতি মনোহর
বিক্রমকেশরী রাজা
করে শিবপূজা উজানির রাজা
কৃপা কৈল দশভূজা।

মুকুন্দরামও বিক্রম রাজার কথা বলেছেন—"বিক্রমকেশরী তাহার নগরী/আছে কত সদাগর।" বিনয় ঘোষ তাঁর পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—মঙ্গলকোট-নিবাসী মৌলবী মহম্মদ ইসমাইল সাহেব রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে প্রায় চল্লিশ বছর আগে যে ইতিহাস উল্লেখ করেছিলেন তাতে বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ আছে। এই মঙ্গলকোটে বিক্রমজিৎ নামে এক হিন্দু রাজা ছিলেন। তিনি বীর যোদ্ধা ছিলেন। গজনবী বলে এক গাজী বা ধর্মযোদ্ধা বিক্রমজিৎকে পরাজিত ও নিহত করে মঙ্গলকোট দখল করেন। বিক্রমজিৎ-এর আরাধ্য মহাদেব স্বপ্নে সদানন্দকে জানান কালাপাহাড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা-কল্পে তিনি নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হন। সদানন্দের এই কাহিনী সত্য হলে এই মূর্তি ষোড়শ শতাব্দীতে উদ্ধার করা হয়। কারণ সুলেমান করনানীর পুত্র বায়াজিতের সঙ্গে বিধর্মী কালাপাহাড় ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পুরীতে জগন্নাথ মন্দির ধ্বংস করতে এ অঞ্চলের ওপর দিয়ে গিয়েছিলেন।

এই বিক্রমাদিত্য গুপ্তবংশের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নন। ইনি মনে হয় গোপভূমের কোন সামন্ত রাজবংশের শাখার রাজা ছিলেন। Petersonএর বর্ধমান গেজেটিয়ার ১৯১০-এ এর উল্লেখ আছে। Mangolkot was formerly a great Muhammadan settlement and there are many ruined mosques in the village and in those adjoining it. It is also rich in Hindu remains of an earlier date and may possibly have been one of the out posts of the Sadgop kingdom of Gopebhum. আবার বৈদ্যপুরের প্রাচীনকালের জমিদার কিঙ্করমাধব সেন যিনি নিজেকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর সেন বংশোদ্ভূত বলে দাবী করতেন সেই রকম সেনবংশের কোন উত্তরপুরুষও হতে পারেন। সে যাই হোক, বিক্রমজিতের ঐতিহাসিক ভিত্তি অস্বীকার করা যায় না।

সদানন্দ স্বপ্নে আরও জানেন দেবতার পূজায় আড়ম্বর কিছু নাই অর্থাৎ আরতি ও নৈবেদ্যহীন পূজা—দুপুরে পরমান্ন বা মুনুই ভোগ, তা-ও এমন কিছু

বেশী নয়। কাঁচি তিনপোয়া আতপ চাল, পাঁচ পোয়া দুধ ও কাঁচাগুড়-এর মুনুই। দেবতার পূজার প্রচারের জন্য অম্লশূল, হাঁপানি, বাধক, মেহ প্রভৃতি রোগ দৈবযোগে নিরাময়ের জন্য ঔষধের সন্ধানও দেওয়া হয়।

যাই হোক স্বপ্নের বাস্তবতা পরীক্ষার জন্য পরদিন ভোরে উঠেই নদীগর্ভে স্বপ্নের দেবতার সন্ধানে সদানন্দ বন্ধুকে নিয়ে বেরিয়ে যান ও নদীগর্ভ থেকে মূর্তি উদ্ধার করেন। ৩½ ফুট উচ্চ শিলায় ক্ষোদিত দিগম্বর জৈন মূর্তি। ত্রয়োদশ, কারো মতে একাদশ, কেউ মনে করেন ষোড়শ তীর্থঙ্কর শান্তিনাথের মূর্তি বলেই অনুমিত হয়। সদানন্দ মূর্তি উদ্ধার করে নিজগ্রামে এনে নিজ বাড়ীতে প্রথমে প্রতিষ্ঠা করেন ও পরে বাড়ীর কাছেই মন্দির নির্মাণ করে সেখানেই দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করেন। যেহেতু দিগম্বর মূর্তি সেইহেতু ন্যাংটেশ্বর বলে প্রচারিত হন। "ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যা মহেশং রজতগিরি নিভং চারু চন্দ্রাবতংসম।" এই মহাদেবের ধ্যানেই পূজা হয়। আকৃতি দেখলেই এটিকে দিগম্বর জৈন মূর্তি বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। এই অঞ্চলে লোচনদাসের পাটের কাছে একটি জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি ছিল। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সেটিকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্য সংগ্রহ করে নিয়ে গেছেন। কোগ্রামের পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকও শঙ্করপুরের ন্যাংটেশ্বর মূর্তিকে দিগম্বর জৈন মূর্তি বলে বর্ণনা করেছেন। যজ্ঞেশ্বর চৌধুরীর মতে একাদশ তীর্থঙ্কর শান্তিনাথ শঙ্করপুরে ন্যাংটেশ্বর মহাদেব রূপে পূজিত হচ্ছেন। মহাদেবের ধ্যানের সঙ্গে ন্যাংটেশ্বরের মূর্তির কোন সাদৃশ্যই নাই। বিগ্রহটি জৈন দিগম্বর মূর্তি হওয়া বিচিত্র নয়, কারণ অনুরূপ মূর্তি বর্ধমান জেলার আঝাপুর, সাত দেউলিয়া ও অন্যান্য স্থানে পাওয়া গেছে। কিন্তু এহ বাহ্য। শ্রীশ্রীন্যাংটেশ্বর জেলায় এ অঞ্চলের লোকের কাছে দেবাদিদেব মহাদেবরূপে চারশতাধিক বৎসর ধরে পূজিত হয়ে আসছেন। কাজেই জৈন দিগম্বর হলেও মহাদেব রূপে তাঁর একটা মৌরসীস্বত্ব জন্মে গেছে। একে আর হটানো যাবে না। বিশ্বাসের জোরেই কত মৃত্তিকা-স্তূপ, গাছ, পাথর, পোড়ামাটির হাতিঘোড়া দেবত্ব সংজ্ঞা লাভ করে যুগ যুগ ধরে ভক্তদের পূজা পেয়ে আসছেন, শিবরাত্রি উপলক্ষে দূর-দূরান্ত থেকে কত মানুষ ছুটে আসছে বাবা ন্যাংটেশ্বরকে দর্শন করতে, তাঁকে পূজা দিতে, কত হাঁপানী, অম্ল-শূল ও মেহ-রোগগ্রস্ত মানুষ, কত বন্ধ্যা নারী ছুটে আসছে বাবার জড়িবুটি, গামছা ছেঁড়া নেবার জন্য। আগেও এসেছে, এখনও আসছে, ভবিষ্যতেও আসবে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এগিয়ে যেতে পারে, দূরকে নিকট করতে পারে, মুহূর্তের মধ্যে মানুষের বাণী সাতসমুদ্র তের নদীর পারে পৌঁছে দিতে পারে, গোটা বিশ্বকে হাতের মুঠোয় এনে দিতে পারে—কিন্তু, ভারতবাসীর

অধ্যাত্মচেতনায় এ দেশের মানুষের ধর্ম-বিশ্বাস, মানুষের দেবতার ওপর ভক্তি ও বিশ্বাসে ফাটল ধরাতে পারবে না। এই বিশ্বাসের জগদ্দল পাথর সরাবার ক্ষমতা বিজ্ঞানের নেই। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। এই বিশ্বাসই আনে মানুষের মনে অপার শান্তি, যেটা বিত্ত-বৈভব দিতে পারে না, আর এই শান্তির জন্যেই Leon এর French horticulturist Christopher Rhodes দেশের বিলাসবৈভব ছেড়ে আজ কৌপীনধারী ভিক্ষুক অবধূত কৈলাস ভারতী। যাক্ সে কথা।

হাঁপানি, অম্ল-শূল বা বাধক-এর জন্য বাবার ঔষধ খাবার পালন বিশেষ নাই। তবে চিঁড়ে খাওয়া আর ধোপা বাড়ীর কাপড় পরা নিষেধ। চিঁড়ে খাওয়াটা যদিও মোটামুটি সবাই মানে, আজকাল ধোয়া কাপড় পরার নিষেধ কেউ মানতে পারে না।

শিবরাত্রির দিন সারাদিনরাত্রি নির্জলা উপবাস। রাত্রে চার প্রহরে চারবার পূজা—মন্দিরের সামনে চত্বরে সারারাত্রি রামায়ণ-কীর্তন চলে—ছোটখাট মেলাও বসে। সেবাইতদের ঘরে চাল ডাল সিধে আর দক্ষিণা দিলে এক বেলা খেতে পাওয়া যায়। বাবার ঐদিন মন খানেক দুধ আর আতপ চাল ও গুড়ের মুনুই ভোগ হয়। যাত্রীরা প্রসাদ পান। শিবরাত্রি উপলক্ষে ছোট্ট গ্রাম শঙ্করপুর হাজার হাজার পুণ্যার্থীর ডাকে সরগরম হয়ে ওঠে—জয় বাবা ন্যাংটেশ্বর শিবশম্ভু মহাদেব—

ভজতঃ অখিলদুঃখসমূহ হরং
প্রণামামি শিবম্ শিবকল্পতরুম্।

সিঙ্গির বৃদ্ধশিব :

কাটোয়ার অন্তর্গত ১২১নং সিঙ্গি গ্রাম। আয়তন ৫৩৭.১৬ হেক্টর, লোকসংখ্যা ৪০১৪ জন, তপসিলী ১৪৫৪ জন, সাঁওতাল উপজাতি নাই। প্রাচীন ইন্দ্রাণী পরগনার অন্তর্ভুক্ত এই সিঙ্গি একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। সিঙ্গির খ্যাতির উৎস বাংলা মহাভারতের রচনাকার কাশীরাম দাস, আর গ্রামের অধিষ্ঠাতা দেবতা বৃদ্ধশিব—বড় জাগ্রত দেবতা। শিবলিঙ্গের উচ্চতা আড়াই ফুট, পরিসর বা বেড় দুই ফুট, গৌরীপট্ট পৃথক। প্রথমে গৌরীপট্ট ছিল না, পরে দাঁইহাটের নবীন ভাস্কর এঁর গৌরীপট্ট নির্মাণ করে দেন। লিঙ্গটি মূল্যবান কষ্টিপাথরে নির্মিত।

প্রথমে বিগ্রহ সিঙ্গি গ্রামের পশ্চিমপাড়ার পুকুরের উত্তরপশ্চিম কোণে মাটির তৈরি মন্দিরে স্থাপিত ছিল—সেখানেই নিত্যসেবা হতো। পরে গঙ্গানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এক সময় দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হলে বাবার কাছে

মানসিক করে ব্যাধিমুক্ত হন ও ১২৩৫ সনে গ্রামের মধ্যে বাবার সুদৃশ্য নবরত্ন মন্দির নির্মাণ করে দেন ও সেখানেই বৃদ্ধশিবকে প্রতিষ্ঠা করেন।

১৩২৯ সনে ১৮ই চৈত্র গ্রামের গুরুদাস ভট্টাচার্য পাকা ভোগঘর নির্মাণ করে দেন। পাশেই বাবার অভিষেকের জন্য স্নানবেদীও এই সময় নির্মিত হয়। নিত্যপূজায় ফলমূল, মিষ্টান্ন, দুধ ইত্যাদির নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়। নিয়মিত ভোগের ব্যবস্থা নাই, তবে ভক্তেরা ব্রাহ্মণকে দিয়ে পরমান্ন তৈরি করিয়ে দিলে ভোগ হয়।

ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশী ও চৈত্রমাসে গাজন উপলক্ষে ছোটখাট উৎসব হয়। গাজনের আগে হোমের দিন বৃদ্ধশিবকে নিয়ে গ্রাম-প্রদক্ষিণ করা হয়। পশ্চিমপাড়ায় এনে স্নানের বেদীতে স্থাপন করে ১০৮ ঘড়া গঙ্গাজল ও বিল্বপত্র দিয়ে শিবের অভিষেক হয়। গাজনের সময় যাঁরা সন্ন্যাসী হন তাঁরা সব মস্তক মুণ্ডন করে বৃদ্ধশিবের প্রতিকৃতি বাণেশ্বরকে নিয়ে দাঁইহাটে গঙ্গাস্নানে যান। বানেশ্বরটি সাধারণত বড় বঁটির বাঁটের আকৃতি বিশিষ্ট দুই/আড়াই ফুট লম্বা কাষ্ঠদণ্ড, মাঝখানে ৩।৪টি বড় লৌহশলাকা দেওয়া। সিঁদুর লেপা লৌহশলাকায় কলা বা ফল গাঁথা থাকে। ছুঁচলো অংশে মালা পরান থাকে।

বৃদ্ধশিবের আবির্ভাব সম্পর্কে জনশ্রুতি—দাঁইহাটে স্টেশনের কাছে নওপাড়া ও সাহাপুর স্টেশনের মধ্যস্থলে জঙ্গলপূর্ণ 'সরবেশ' দীঘি—এই দীঘির গর্ভেই বৃদ্ধশিব নিহিত ছিলেন। সিঙ্গি গ্রামের ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে গ্রামের কয়েকজন মাতব্বরকে নিয়ে ঐ দীঘি থেকে বৃদ্ধ শিবকে উদ্ধার করে নিজ গ্রামে মাটির মন্দির নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠা করেন ও নিত্যসেবার ব্যবস্থা করেন।

কড়ুই-এর বুড়োশিব :

কাটোয়া থানার ৪৯নং কড়ুই গ্রাম খুবই বর্ধিষ্ণু গ্রাম। পূর্বে আঠারো পাড়ার গ্রাম ছিল। বর্তমানে পাড়া অনুযায়ী বিভাগ অনেক শিথিল হয়ে গেছে। গ্রামের এলাকা ঠিকই আছে। আয়তন ১৫৩০.৪৬ হেক্টর, লোকসংখ্যা ৭৫০২ জন, তপসিলী ১৮৪১ জন, সাঁওতাল উপজাতি নাই বললেই হয়—মাত্র ২২ জন। গ্রামদেবতা বুড়োশিব ও গৌরী। কড়ুই অতি প্রাচীন গ্রাম—প্রাচীন শাস্ত্র ও পত্রিকায় নাম পাওয়া যায়। পাল রাজাদের সময় এ অঞ্চল বিশিষ্ট বৌদ্ধধর্মের পীঠস্থান ছিল। এখানে উগ্রক্ষত্রিয় রাজারা রাজত্ব করতেন। উগ্রক্ষত্রিয় বংশীয় বৌদ্ধরাজা ছিলেন ধর্মকুণ্ড। তিনি প্রজাদের জলকষ্ট নিবারণের জন্য তিনটি দীঘি খনন করান—রানীদীঘি, ঘোড়ামারা দীঘি ও কুণ্ডের (কুঁড়ের) পুকুর—এই পুকুরের পাড়েই হতো বৌদ্ধদের বার্ষিক উৎসব। পরবর্তীকালে হিন্দুধর্ম যখন

বৌদ্ধধর্মকে গ্রাস করলো, তখন বুদ্ধদেব লৌকিক দেবতা ধর্মরাজে পরিণত হলেন। আর পরে মুসলমান শাসনের সূচনায় ধর্মরাজ উচ্চবর্ণের লৌকিক দেবমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে বুড়োশিবে রূপান্তরিত হন। কালাপাহাড়ের হাত থেকে বুড়োশিবকে রক্ষা করার জন্য এঁকে পুকুরের জলে নিক্ষেপ করা হয়। সেই থেকেই বুড়োশিব জলতলনিবাসী, সারা বছরই জলে অধিষ্ঠান—বেলতলায় বাবার মন্দিরের উদ্দেশ্যে নিত্যপূজা হয়। চৈত্র মাসে মহাধূমধামের সঙ্গে বাবার গাজন হয়—গাজনের পূর্বে হোমের দিন বাবাকে পুকুর থেকে তুলে সন্ন্যাসীরা দোলায় চাপিয়ে কাঁধে করে গ্রামের মাঠ প্রদক্ষিণ করে স্ব-মন্দিরে নিয়ে যান। গ্রামের প্রত্যেকের মাঠেই বাবার মাথায় কলসী কলসী গঙ্গাজল ঢালা হয়। মনে হয় মাঠে বাবার মাথায় জল ঢালার পিছনে সুফসল কামনা চরিতার্থ করা হয়। এর পরে মন্দিরে বিল্ববৃক্ষতলে বেদীতে বুড়োশিবকে স্থাপন করে অভিষেক ও পূজা। পরদিন নীল উপলক্ষে মহাপূজা। এসময় যার যা মানত সব দেয়—সন্ন্যাসীরা প্রণাম বা দণ্ডী খাটে। পূজান্তে আবার দেবতার জলে অধিষ্ঠান। শিবের সঙ্গে গৌরীর পূজাও হয়। (পরিশিষ্টাংশের জন্য বাখনাপাড়ার গোপেশ্বর সম্পর্কিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।)

মাজিগ্রামের দেউলেশ্বর :

কাটোয়া থানার মাজিগ্রামের শাকম্ভরীদেবীর আলোচনা প্রসঙ্গে দেউলেশ্বর শিবের বিবাহোৎসব প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। দেউলেশ্বর অনাদিলিঙ্গ শিব—দেউলঠাকুর নামেই প্রসিদ্ধ। কড়ুই-এর বুড়োশিবের মত দেউলেশ্বরও বৌদ্ধ-স্তূপের রূপান্তর। এখনও দেউলঠাকুর একটি স্তূপের ওপরেই অবস্থিত। দেউলেশ্বরের মন্দিরের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটি নালা, নাম জপতী। এই নালা আসলে বহুলা নদী। প্রবাদ—প্রাচীনকালে বর্ষার সময় চাঁদ সদাগর এই নদী বেয়ে সপ্তডিঙ্গা মধুকর নিয়ে বাণিজ্যে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ মাজিগ্রামে এসে একটা জঙ্গলের পাশে দেখে একটা ইঁদুর বেড়াল ধরছে—অদ্ভুত দৃশ্য। সদাগর তাঁর ডিঙ্গার মাঝিদের নিয়ে এই দৃশ্যের রহস্যের উদ্‌ঘাটন করতে নামলেন। সারা বন তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়ালমুখে ইঁদুরের সন্ধান পেলেন না। বনের মধ্যে দেখলেন একটি শিবমন্দিরে শিব—চাঁদের আরাধ্য দেবতা। চাঁদ শিবের সেবাপূজার ব্যবস্থা করে দিয়ে মাঝিদের এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা করে দেন। মাঝিদের এই বসতি থেকেই গ্রামের নাম মাঝিগ্রাম/মাজিগ্রাম। এই দেউলেশ্বর শিবের সঙ্গেই মদন চতুর্দশীর দিনে গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শাকম্ভরীর বিবাহ উৎসবের মহড়া হয়। দেউলেশ্বর শিবের পূজারী ভট্টাচার্যরা আর শাকম্ভরী দেবীর সেবাইত বটব্যালগণ।

এই দুই পক্ষই যথাক্রমে বরপক্ষ ও কনেপক্ষ। বিবাহের দিন উভয়পক্ষের মাতব্বরগণ উপবাস করেন। বিকালে ভট্টাচার্যদের এক শক্তিশালী যুবক নতুন কাপড় কোমরে বেঁধে তাতে দেউলেশ্বরকে বসিয়ে ঢাকঢোল বাদ্যসহ বরপক্ষদের সঙ্গে শাকম্ভরী মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে মন্দিরে ঢুকতে দেবে না—উভয় পক্ষেই ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হয়ে যায়। শেষে বরপক্ষ বর-দেউলকে নিয়ে মন্দিরে পৌঁছালে কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে সাদর আমন্ত্রণ জানান। মন্দিরে দেবীর দানসামগ্রী ভোজ্য সাজান আর বাইরে দু'পক্ষের বাজনাদারদেব বাজনা, গোটা গ্রাম সরগরম; যত গোল বাধে কনের সাতপাকের সময়। কন্যাপক্ষ বুড়ো বরের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজী নয় আর বরপক্ষও কালো মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী নয়—শুরু হয়ে যায় দু'পক্ষের চাপান-উতোর—

কালো কন্যে বুড়ো বর।
বিয়ে হলো না চল ঘর।

বিয়ে তো হলো না কিন্তু বিয়ের ভোজটা কেউ ছাড়তে চায় না। শেষ রাত্রে ভট্টাচার্যরা বুড়ো বর দেউলেশ্বরকে নিজ মন্দিরে ফিরে যান। শিবরাত্রির সময় দেউলেশ্বর মন্দিরে সারারাত পূজা ও উৎসব চলে। বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

নিগনের নিগনেশ্বর :

মঙ্গলকোট থানার নিগনে আছে নিগনেশ্বর বা লিঙ্গেশ্বর। লিঙ্গেশ্বরের আবির্ভাব সম্বন্ধে গোপ ও গাভীর স্তনের বোঁটা থেকে মাটির ঢিবির ওপর দুগ্ধ-ক্ষরণের কাহিনী জড়িত। জঙ্গলের মধ্যে মাটির ঢিবি হয়ত কোন কালে বৌদ্ধস্তূপ ছিল। ঢিবি খুঁড়ে শিবলিঙ্গ আবিষ্কার ও তাকে প্রতিষ্ঠা। লিঙ্গেশ্বর শিবের গুরুত্ব— এই শিবের প্রসাদ নিয়ে গেলে ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যার পূজো হয়। চৈত্রমাসে মহাধুমধামের সঙ্গে লিঙ্গেশ্বরের গাজন অনুষ্ঠিত হয়।

ঘোষহাটের ঘোষেশ্বর :

কাটোয়া থানায় ঘোষহাটে আছেন ঘোষেশ্বর শিব। প্রকাশ : এই ঘোষেশ্বর শিব রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতিষ্ঠিত। এই ইন্দ্রদ্যুম্ন সম্পর্কে সুধীরচন্দ্র সরকারের পৌরাণিক অভিধানে দুই ইন্দ্রদ্যুম্নের উল্লেখ আছে—এক ইন্দ্রদ্যুম্ন ছিলেন সূর্য্যবংশীয়, কোন তথ্য পাওয়া যায় না—উজ্জয়িনীর রাজা—ইনি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে পুরীর জগন্নাথ মূর্তি নির্মাণ করান। আর এক ইন্দ্রদ্যুম্ন তৈজনের পুত্র—ইনি অগস্ত্যের অভিশাপে হস্তীতে পরিণত হন। পরজন্মে শ্রীহরির স্পর্শে স্বরূপ লাভ করেন। ঘোষহাটের ইন্দ্রদ্যুম্ন এঁদের কোনটাই নয়। কিন্তু আমার মনে হয়, এই

ইন্দ্রদ্যুম্ন গোপভূমের সদগোপ বংশের কোন এক শাখার সামন্ত রাজা। রাজবংশ নিশ্চিহ্ন হলে দেবমূর্তি জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ে। গরু চরাতে এসে গোপবালকগণ এই ঢিবি ওপর খেলত—তাদের দাপাদাপিতে ঢিবির কিছু অংশ ধ্বসে পড়ে আর গামলার মত কোন জিনিস উপুড় করা বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু গোপবালকগণ ঐ গামলা তুলতে ব্যর্থ হয়। পরে তাদের কাছ থেকে সমস্ত ঘটনা শুনে এক বৃদ্ধ গোপ দেখতে আসে ও গামলার মত জিনিসটি তুলে দেখেন তার নীচে এক সুন্দর শ্বেত পাথরের শিবলিঙ্গ। তারপর গ্রামবাসীরা সেখানেই মন্দির নির্মাণ করে ঘোষেশ্বরের নিত্যসেবার ব্যবস্থা করে। আটচালা স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত হয় মন্দির। শিবরাত্রির গাজনে মন্দির ও গ্রাম সরগরম হয়ে ওঠে।

বেগুনকোলার স্ফটিকেশ্বর :

কেতুগ্রাম থানার বেগুনকোলা (১২১) গ্রামের অধিষ্ঠাতা দেবতা স্ফটিকেশ্বর শিব। গ্রামের আয়তন ২০২.৭০ হেক্টর, লোকসংখ্যা ১১৯৩ জন, তপসিলী জাতি ১০৬ জন। শিবের আবির্ভাব সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনী হলো যে এই গ্রামের এক সাধু তাঁর গুরুর কাছ থেকে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ স্ফটিকনির্মিত এই শিবলিঙ্গটি পান। সাধুর মৃত্যুর পর রামজানী দেবী নামক এক ব্রাহ্মণীর দ্বারা এই মূর্তি পূজিত হতো। প্রবাদ : মাঝে মাঝে এই অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ লিঙ্গটি অদৃশ্য হয়। তখন গৌরীপট্টই পূজিত হয়। বর্তমানে বেগুনকোলায় কোন সেবাইত না থাকায় মূর্তিটি এখন 'চড়কী' গ্রামে পূজিত হচ্ছেন।

জঙ্গলেশ্বরের জঙ্গলেশ্বর :

এটিও কাটোয়া মহকুমার জঙ্গলেশ্বর গ্রামের দেবতা জঙ্গলেশ্বর। এই শিবলিঙ্গটি সাধারণ্যে 'জাঙ্গালঠাকুর' নামে পরিচিত। কথিত আছে, এই স্থানটি পূর্বে জঙ্গলাবৃত ছিল। জঙ্গলে ছিল নানা বন্যজন্তু। সন্নিহিত গ্রামের একটি বালক হাম বসন্তে আক্রান্ত রোগের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে জঙ্গলের মধ্যে বন্যজন্তুর মুখে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে জঙ্গলে ঢোকে। জঙ্গলের মধ্যে বন্যজন্তুর খোঁজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে এক সাধু তাকে একটা ওষুধের সন্ধান দেয়। ঘুম থেকে উঠে সে ওষুধের খোঁজে বনে ঘুরতে ঘুরতে জঙ্গলের মধ্যে ওষুধ ও তার কাছেই এক শিবলিঙ্গ দেখে। বালকের কাছ থেকে স্বপ্ন ও শিবের কাহিনী শুনে ছেলেটির বাবার ধারণা হয় ঐ মহাদেবই তাঁর ছেলেকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। তিনি জঙ্গল পরিষ্কার করে মন্দির নির্মাণ করে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। জঙ্গলের

মধ্যেই এঁর অধিষ্ঠান ছিল বলে ইনি জঙ্গলেশ্বর নামেই পরিচিত। গ্রামের নামও হয় জঙ্গলেশ্বর।

বিল্বেশ্বরের বিল্বেশ্বর :

শিবচরিত ও তন্ত্রচূড়ামণিতে উল্লিখিত কেতুগ্রাম থানার বিল্বেশ্বর গ্রামে এই অনাদিলিঙ্গ শিব প্রতিষ্ঠিত। প্রবাদ : লিঙ্গটি বেলচার জঙ্গল নামে এক জঙ্গল থেকে পাওয়া যায়। এই বিল্বেশ্বরের সঙ্গেও গোপ, গাভী ও জঙ্গলের এক স্তূপের ওপর গাভীর স্তনের বোঁটা থেকে দুগ্ধক্ষরণের কাহিনী জড়িত। গাভীর মালিক ঘোষমশাই জমিদার মহারাজ মধুসূদন হাজরাকে সব জানান। তিনি গঙ্গাধর পাল নামে কুম্ভকারকে ঐ ঢিবি খনন করার নির্দেশ দেন। গঙ্গাধর স্তূপ খনন করে একটি শিবলিঙ্গ দেখে মধুসূদন মহারাজকে সব নিবেদন করে। মহারাজ তখন তাঁর পুত্র নারায়ণ হাজরাকে ঐ শিবলিঙ্গের সেবাইত নিযুক্ত করে সেবাপূজার ব্যবস্থা করেন। তন্ত্রচূড়ামণি মতে বিশ্বেশ বা বিল্বেশ অট্টহাসের দেবী ফুল্লরার ভৈরব। প্রতি বৎসর শিব চতুর্দশীতে বিল্বেশ্বরের শিবরাত্রি উৎসব হয়। এই উপলক্ষে মেলাও বসে। বর্ধমানের মহারাজা দেবসেবার জন্য কিছু ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন, তার আয় থেকেই পূজার খরচ চলে।

অমরারগড়ের রাঢ়েশ্বর :

আউসগ্রাম থানার অন্তর্গত অমরারগড়ের সামন্তরাজ ভল্লুপাদের প্রতিষ্ঠিত রাঢ়েশ্বর বর্তমানে দুর্গাপুরগ্রামে প্রস্তর নির্মিত মন্দিরে অধিষ্ঠিত। প্রাচীনকালে রাঢ়বঙ্গে শিব ছাড়া অন্য কোন দেবদেবীর অস্তিত্ব না থাকায় এই শিবলিঙ্গ রাঢ়েশ্বর নামে খ্যাত।

পাণ্ডবেশ্বর :

আসানসোল মহকুমার পাণ্ডবেশ্বর গ্রামে পাণ্ডবেশ্বর শিব অবস্থিত। জনশ্রুতি : এই শিবলিঙ্গ মহাভারতের পাণ্ডবদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কিংবদন্তী অনুসারে দ্বাপরের শেষে পঞ্চপাণ্ডব কিছুদিন এখানে ছিলেন। সেজন্যে স্থানটি পাণ্ডবক্ষেত্র বা পাশক্ষেত্র নামে পরিচিত। গ্রামে একটা প্রাচীন বটগাছের নীচে একটা ভগ্নমন্দিরে শিলাফলকে ক্ষোদিত পঞ্চপাণ্ডবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। নিকটে ভৈরবের নিকট দুর্গানবমীতে ছাগবলি হয়।

পাণ্ডবেশ্বর শিবের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হয় যে, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন যুধিষ্ঠিরের আদেশে ১২ বৎসর বনবাসে গমন করেন। অর্জুন পাশুপত

অস্ত্রলাভের প্রার্থনায় এখানে মহাদেবের তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেন। মহাদেব কিরাতের ছদ্মবেশে অর্জুনের সম্মুখে উপস্থিত হন। কিরাতরূপী শিবের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হয়—অর্জুন পরাজিত হন। অর্জুন তখন শিবের করুণা লাভের জন্য শিবমূর্তি নির্মাণ করে পূজা করেন—পূজাকালে যতবার ফুলের মালা উৎসর্গ করেন ততবারই কিরাতবেশী মহাদেবের পায়ে পতিত হয়। অর্জুন তখন কিরাতকে মহাদেব বলে চিনতে পারেন ও তাঁর শরণাগত হন। কিরাত তখন শিবের মূর্তিতে দেখা দেন। এই শিবই পাণ্ডবেশ্বর নামে পরিচিত।

নাড়ুগ্রামের নাড়েশ্বর :

আদ্য গঙ্গা দামুদর মাত্র পার হয়্যা।
উড়্যার গড় কামালপুর পশ্চিমে রাখিয়া।
বাম দিকেক নাড়ুগ্রাম দক্ষিণে নগরি।

(বিশ্বভারতী পুঁথি ৮৯৮)

বর্ধমান জেলার রায়না থানার নাড়ুগ্রাম (জে: এল ১৪) একটি প্রাচীন গ্রাম। আয়তন ৯২১.৮৯ হেক্টর, লোকসংখ্যা ২৬২৫ জন, এদের মধ্যে তপসিলী ১১৫৭, উপজাতি ২১৪। বর্ধমান থেকে ১২ কিমি। বর্ধমান থেকে বাস সার্ভিস আছে। এই গ্রামের অধিষ্ঠাতা দেবতা নাড়েশ্বর। দেবতার আবির্ভাব সম্বন্ধে সেই চিরাচরিত গোপ, গাভী ও গাভীকর্তৃক বনের মধ্যে শিবমূর্তির উপর দুগ্ধ ক্ষরণের কাহিনী জড়িত। গ্রামের মধ্যে মন্দিরে নাড়েশ্বর প্রতিষ্ঠিত। দেবতার নিত্যসেবার বন্দোবস্ত আছে। দেবসেবায় আপামর জনসাধারণের অধিকার। শিবের সেবাপূজার জন্য ৬৭ বিঘা জমি দেবোত্তর ছিল, নিম্নশ্রেণীদের মধ্যেও পূজার জন্য ৭ বিঘা জমি ছিল। বর্তমানে এই জমির বেশীর ভাগই ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। গাজনের সময় বিরাট উৎসব হয়—এর খরচের জন্য বর্তমানে গ্রামের সকলের কাছে চাঁদা তোলা হয়।

পূজা পরিচালনার জন্য একটা Trust Bodyও গঠিত আছে। নাড়েশ্বরের গাজন উৎসবের অভিনবত্ব আছে। বড়োব বলরামের চক্ষুদান উৎসবের মত এখানে নাড়েশ্বরের গাজনও শুরু হয় বৈশাখে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন। নাড়েশ্বরের এই গাজনে বড়োর বলরামেরও নাম নেওয়া হয়। যেমন বলরামের গাজনে নাড়েশ্বরের নাম নেওয়া হয়। মনে হয় অতীতে এই দুই দেবতার মধ্যে একটা যোগসূত্র ছিল। গাজনে ইতর ভদ্র সকলেই মানত থাকলে সন্ন্যাসী হতে পারে। পূর্বে ৭০।৭৫ জন সন্ন্যাসী হতো—-এখন এই সংখ্যা দিন দিন কমে আসছে। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন বাবার মাথায় জল পড়ে ও অভিষেক হয়। যারা সন্ন্যাসী হবে

তারা ৭দিন হবিষ্যান্ন ও ফল মিষ্টি খেয়ে থাকে। গাজনের বৈশিষ্ট্য হলো ময়ূরপঙ্খী গান ও সন্ন্যাসীদের উর্ধ্বসেবা। গাজনের শেষ দিনে পূর্ণিমায় একটা গরুর গাড়ীতে ময়ূরের আকারে একটা structure তৈরী করে সেটার মধ্যে ২।৪ জন বসে, তাড়িয়ে নিয়ে যায় আর গ্রামের লোক, সন্ন্যাসী দলবেঁধে ময়ূরপঙ্খীর গান গাইতে গাইতে গ্রাম পরিক্রমা করে। তবে উর্ধসেবা সবচেয়ে অলৌকিক। একটা structure-এর দুটি খুঁটির শীর্ষদেশে মুদুনির মত আড়াআড়ি এক বাঁশ বাঁধা হয়। উপবাসক্লিষ্ট সন্ন্যাসী এই বাঁশে পা বেঁধে নীচের দিকে মাথা করে দুলতে থাকে—সবার নীচে থাকে ধুনুচিতে আগুন আর ওপরে বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্রের দাবদাহ। যত জন সন্ন্যাসী ততগুলি এইরকম structure। এই structure নিয়ে গ্রামবাসীরা প্রচণ্ডভাবে দোলাতে দোলাতে গ্রামের বাইরে প্রায় একমাইল, সোয়া মাইল দূরে একটা 'হাট' পুষ্করিণীতে নিয়ে যায়। সেখানে সন্ন্যাসীদের স্নান হয়, তারপর আবার পূর্বের মত উর্ধ্বপদ হয়ে সন্ন্যাসীকে নিয়ে দোলাতে দোলাতে বাবার মন্দিরে এসে যাত্রা শেষ। এরপর নাড়েশ্বরের মাথায় ফুল চাপানো হয়, প্রচণ্ড জোরে ঢাকের বাদ্যি বাজে আর সন্ন্যাসী ও গ্রামবাসীদের সমবেত চিৎকার—'জয়বাবা নাড়েশ্বর। জয়বাবা বলরাম' চিৎকারে ও ঢাকের শব্দে চারদিক মুখরিত হয়ে ওঠে। তারপর ঢাকের শব্দ ও চিৎকারের চোটেই হোক আর অলৌকিক ভাবেই হোক বাবার মাথা থেকে ফুল পড়লে তবে শান্তি। গাজন-পর্ব শেষ ও সন্ন্যাসীদের ব্রত উদ্যাপনের সমাপ্তি। গাজনের সময় ও পরে আগে যাত্রা থিয়েটার রামায়ন গান সব হতো—আগে খুবই রমরমা ছিল, এখন সে জৌলুস কমে গেছে। কোন রকমে নমঃ নমঃ করে উৎসবের সমাপ্তি ঘটানো হয়। যতদিন যাচ্ছে তত মানুষ হয়ে উঠছে আত্মকেন্দ্রিক, পল্লীর মানুষ শহরের দিকে ঝুঁকছে। দূরদর্শনের হিন্দি সিনেমার দিকে মানুষের আকর্ষণ বাড়ছে। এর ফলে পল্লীর এই ময়ূরপঙ্খী গান এই সব উর্ধ্বসেবার অলৌকিকত্ব, যাত্রা, কীর্তন, রামায়ন গান এক কথায় পল্লীর লোকসংস্কৃতি বোধহয় অবলুপ্ত হয়ে যাবে। আধুনিক সভ্যতার জৌলুস পল্লীর ঐতিহ্যকে এমনি করেই একদিন গ্রাস করবে—সেদিনও বোধহয় খুব দূরে নয়। ময়ূরপঙ্খী গানের নমুনা—

"আরে ঐ—
বল, কে গো তোমরা
এই তরীতে।
ভুলাতে আমার মন রঙ্গীতে
আর ভঙ্গীতে।"

কুড়মুনের ঈশানেশ্বর :

বারো আহার তেরো দীঘি
নবুড়ি গড়ে ছ'বুড়ি ডোবা
তিনশ ষাট পুষ্করিণী
এই নিয়ে কুড়মুন জানি ॥

বর্ধমান শহর থেকে ১৪।১৫ কিমি উত্তরপূর্বে কুড়মুন এক প্রাচীন বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। কুড়মুন পলাশী দুই পাশাপাশি গ্রাম। একটির সঙ্গে অপরটির সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংযোগের ফলে কুড়মুন-পলাশী এক সাংস্কৃতিক বলয়ের অন্তর্ভুক্ত। এক গ্রামের উল্লেখ করলে অপর গ্রামের কথা আপনিই এসে পড়ে। গ্রামের বর্ধিষ্ণু মুন্সী পরিবারে ১০৯৪ সনের (ইংরাজী ১৬৮৭) তায়দাদ ও বাগদাদের অধিবাসী মোকদ্দম সাহেবের আস্তানা গ্রামের প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করছে। Bengal Peasant life ও Folk Tales of Bengalএর রচয়িতা রেভারেণ্ড লালবিহারী দে-এর জন্মস্থান পলাশী ও রাজা রামমোহনের দ্বিতীয়া স্ত্রী শ্রীদেবীর পিত্রালয় কুড়মুন—এই দুইগ্রামের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। গ্রামের আয়তন ১২৮৫.২৩ হেক্টর, লোকসংখ্যা ৭১৯৪-এর মধ্যে তপসিলী ৩০৩৫ ও সাঁওতাল উপজাতি ৩৩৫। গ্রামের পাশ দিয়ে খড়ি নদী প্রবাহিত। বর্ধমান-কুসুমগ্রাম বাসে সরাসরি গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, উগ্রক্ষত্রিয়, সদ্‌গোপ, কায়স্থ ও মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। তাছাড়া বাগ্‌দী, কুশমেটে, তেঁতুলে বাগ্‌দী ও দুলেদের সংখ্যাও কম নয়। গ্রামের ধর্ম, শিব ও শক্তির সহাবস্থান। গ্রামের অধিষ্ঠাতা দেবতা ঈশানেশ্বর মহাদেব। আবার ঈশানেশ্বরের মূল মন্দিরে আছেন হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ়া ইন্দ্রাণীদেবীর মূর্তি। চক্রবর্তীদের আছে সিংহবাহিনী মূর্তি ও দত্তদের বাড়ীতে রয়েছে জয়দুর্গার শিলামূর্তি। পূর্বপাড়ায় বুড়িগাছতলায় আছে কালাচাঁদ ধর্মঠাকুরের কূর্মমূর্তি, দুলে-পাড়ায় আছে ধর্মরাজ। তবে ঈশানেশ্বর সবার ওপরে। ঈশানেশ্বরের প্রভাবে অন্য সব গাজন ম্লান হয়ে গেছে। পূর্বে কালাচাঁদের গাজনের অধিকার ছিল তন্তুবায়দের। ধর্মরাজের গাজনের অধিকার বাগ্‌দীদের আর ঈশানেশ্বরের অধিকার ছিল মণ্ডল উপাধিকারী উগ্রক্ষত্রিয়দের উপর।

বর্তমানে কালাচাঁদ ও ঈশানেশ্বরের পূজা এবং গাজনের অধিকার ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্বে। তবে আপসরফার জন্য ঈশানেশ্বর দুই জায়গাতেই থাকেন। ১৩ই চৈত্র রাত্রি থেকে উৎসবান্ত পর্যন্ত মণ্ডলদের তত্ত্বাবধানে শিবের গাজনতলায় আর বাকী সময় ব্রাহ্মণপাড়ার মন্দিরে। ঈশানেশ্বরের এখন দুটি সত্ত্বা—জামালপুরের

বুড়োরাজের যেমন বুড়ো শিবের বুড়ো আর ধর্মরাজের রাজ মিলে বুড়ো-রাজে একাত্ম হয়েছেন ও উচ্চবর্ণের নিম্নবর্ণের পূজার সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঈশানেশ্বরের ক্ষেত্রে কিন্তু তেমনটি হয় নাই। শিব হিসাবে যেমন ব্রাহ্মণদের রয়েছে একচ্ছত্র অধিকার, কিন্তু গাজনে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; অথচ গাজনে সকলের সমান অধিকার থাকা উচিত। তাই একটা আপোস রফা হয়। বিনয় ঘোষের ভাষায় 'ঈশানেশ্বর শিব একপুত্রের জন্ম দিলেন—তিনিও শিব, নাম গাজনেশ্বর। এই গাজনেশ্বরই জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সন্ন্যাসীদের কাঁধে চেপে গ্রাম থেকে গ্রামান্তর প্রদক্ষিণ করেন, সকলের দ্বারা পূজিত হন, স্পর্শিত হন।'

ঈশানেশ্বরের শিবলিঙ্গ অদ্ভুত আকৃতির—ত্রিশূলাকৃতি, পাশেই আবার ত্রিশূল। ঈশানেশ্বরের আবির্ভাব সম্বন্ধে জনশ্রুতি, গ্রামস্থ উগ্রক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত সন্তোষ মণ্ডল বাবা-কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে গ্রামের পাশেই খড়ি নদীর কলমিসায়রের দহ্ থেকে শিবলিঙ্গটি উদ্ধার করে গ্রামের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। তাই ঈশানেশ্বর শিবের গাজনের পরিচালক মণ্ডল উপাধিধারী উগ্রক্ষত্রিয়গণ আর পূজারী ঘোষাল পরিবারের ব্রাহ্মণগণ।

ঈশানেশ্বরের গাজনই প্রধান উৎসব—১৯৫৬ সালে সেটেলমেন্ট বিভাগে যখন চাকরী করি তখন কুড়মুনের প্রবীণ ব্যক্তি কালীবাবু (কানাকালী) ও জাহেদ্ আলি সাহেবের সঙ্গে পরিচয় হয়। তাঁদের আমন্ত্রণে ঐ সময় একবার এই গাজন দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। চৈত্র মাসের ২৫শে এই গাজনের সূত্রপাত। চলবে ৩০শে চৈত্রসংক্রান্তি পর্যন্ত ৬ দিন। ছয় দিনে ছয় রকম বিধি। যাঁরা সন্ন্যাসী হবেন বলে বাবার কাছে মানত করেন তাঁরা ২৫শে সারাদিন উপবাসী থেকে শিবমন্দিরে সন্ন্যাসীর পূজা শেষ করেন। এরপর নিরামিষ আহার গ্রহণ করেন। গাজনেশ্বর পালকি করে ২৫শে থেকে ২৮শে পর্যন্ত চারদিন গ্রাম-প্রদক্ষিণ করেন। সন্ন্যাসীরা পালকি কাঁধে করে বহন করে নিয়ে বেড়ান।

২৬শে চৈত্র সন্ন্যাসীরা গাজনেশ্বরকে ছোট পালকিতে চড়িয়ে পাড়ুই গ্রামে নিয়ে যান; সেখানে পূজা শেষ হলে আবার মন্দিরে ফিরিয়ে আনেন। ২৭শে চৈত্র সন্ন্যাসীরা উপবাস করেন ও দুপুর পর্যন্ত মন্দিরে অবস্থান করতে থাকেন। দুপুরবেলায় ঠাকুর নিয়ে পলাশী গ্রামে যান এবং সেখানে শিবপূজা ও আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ শেষ হলে আবার বাদ্যসহকারে মন্দিরে ফিরিয়ে আনেন। এদিন গভীর রাত্রিতে সন্ন্যাসীরা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেন ও রাত্রে শিবপূজা সমাপনের পর বাকি রাতটা শিবতলাতেই কাটিয়ে দেন।

২৮শে সন্ন্যাসীরা বিভিন্ন রূপে সজ্জিত হয়ে হাতে কৃপাণ নিয়ে শিবতলায় হাজির হন। পলাশীর সন্ন্যাসীরাও আসেন এবং সন্ন্যাসীদের মধ্যে কোলাকুলি চলে। পূর্বে সন্ন্যাসীরা ছৌনাচের মুখোশের মত মুখোশ পরতেন। এখন মুখোশ তৈরীর লোকও নাই আবার রঘুনাথপুর থেকে যে তৈরী করিয়ে আনবেন সে ব্যয় সঙ্কুলান করার মত সন্ন্যাসীদের অর্থেরও সংস্থান নাই, কাজেই প্রথাটি এখন লুপ্ত। কোলাকুলির পর সন্ন্যাসীরা দুইদলে ভাগ হয়ে যায়—সাধারণ সন্ন্যাসী ও শ্মশান-সন্ন্যাসী, শ্মশানে সন্ন্যাসীর দলকে প্রধানের কাছে পাঁচ টাকা জমা দিতে হয়। এই দিন অধিক রাত্রে ঠাকুর নিয়ে নানা ভঙ্গীতে মড়ার মাথা নিয়ে নৃত্য করতে করতে গ্রাম পরিক্রমা করেন ও শেষে শ্মশানে মাথাগুলি ফেলে দিয়ে আসেন। পূর্বে গ্রামের পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর পাড়া থেকে নানা রকম মাটির পুতুল-প্রতিমা এনে গাজনতলায় বাঁশের গ্যালারীতে সাজিয়ে রেখে প্রদর্শনী হত। এই সব ছবির মধ্যে লোকশিল্পের অভিনবত্ব ফুটে উঠতো। এই সব ছবির মধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, পুতনা বধ, কালীয় দমন প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনীকে রূপায়িত করা হত। তেমনি আবার বধূ নির্যাতন, সতীদাহ প্রভৃতি সামাজিক ছবিও লোকশিক্ষার সহায়ক হত। এখন এসব উঠে যাচ্ছে। এই পুতুল তৈরী নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় প্রতিযোগিতা হত। গাজনতলায় সাজানো পুতুলের শ্রেষ্ঠত্বের বিচার হত। যে শিল্পী শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেতেন তাঁকে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় উদ্দাম নৃত্য হত। এর আগে পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে কবিগানের মত 'খেস্যা' গান হতো ও এক পাড়ার গায়কেরা অন্য পাড়ায় খেস্যা গানের মধ্যে কিছু প্রশ্ন রেখে আসতো। আবার সে পাড়ার 'খেস্যা' গায়করা এ পাড়ায় এসে গানের মাধ্যমে তার জবাব দিত। এখন এসবও উঠে যাচ্ছে। পরদিন ২৯শে সকালবেলায় শ্মশান-সন্ন্যাসীরা পাড়ায় পাড়ায় নরমুণ্ড নিয়ে উৎসব নৃত্য করেন। এগুলি আসল নরমুণ্ড—সন্ন্যাসীরা দূর দূর গ্রামে গিয়ে কোথায় কোথায় শিশু বা নারীপুরুষ মরেছে ও তাদের কোথায় কবর দিয়েছে এই সব সন্ধান করে সেই মৃতদেহ রাতারাতি তুলে মুণ্ড কেটে নিয়ে আসে ও সেগুলি উৎসবের জন্য গ্রামে কোথাও পুঁতে রেখে দেয়। ২৯শে সকালে এই মুণ্ড নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় উৎসব নৃত্য করে। তেল সিঁদুর মাখানো বিকৃত এই নরমুণ্ড নিয়ে নৃত্য এক বীভৎস দৃশ্য। কিছুদিন আগে এই নরমুণ্ড নিয়ে খেলাকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলমানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধার উপক্রম হয়েছিল। সময়ে পুলিশি হস্তক্ষেপে সে দাঙ্গা বেশী দূর এগোতে পারে নাই। তবে সেই থেকে বছর পাঁচ-ছয় এই নরমুণ্ড নিয়ে বীভৎস খেলা বন্ধ হয়ে গেছে। এই নরমুণ্ড নিয়ে খেলাকে শ্মশান-জাগানো বলতো। পুতিগন্ধময় সেই নরমুণ্ড নিয়ে উদ্দাম নৃত্য দাঁড়িয়ে

দেখা যেত না। দুর্গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসায় উপক্রম হত। নরমুণ্ডগুলি খেলা শেষে শ্মশানে নদীর ধারে ফেলে দেওয়া হত। শিব-সন্ন্যাসীরা শিবের আত্মীয় তাই তাঁদের সম্মান। ভূতনাথ যেমন "ভূত নাচিয়ে ফেরে ঘরে ঘরে" তেমনি শ্মশানে সন্ন্যাসীরা মড়ার খুলি নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য করেন। এটাই বোধহয় মড়ার মাথার নিয়ে নাচার তাৎপর্য। এই প্রথা গ্রামবাসীদের বিশেষত উচ্চবর্গীয়দের শৈবতান্ত্রিকতার প্রমাণ দেয়। এখন ২৯শে কেবল হয় নীলপূজা। সন্ন্যাসীরা সারাদিন উপবাসী থাকেন ও সন্ধ্যায় শিবতলায় পূজা দিয়ে সারারাত উপবাসী অবস্থায় গাজনতলাতেই কাটিয়ে দেন। আগে ২৯শে রাত্রে বাজি পোড়ান উৎসব হত। চারপাশের গ্রাম থেকে এই উৎসব দেখতে আসত। এখনও হয়, কিছু তুবড়ি ফোটে তবে সে জৌলুস গেছে। একে দাম বেড়েছে, দ্বিতীয়ত শব্দদূষণের বিধি মানার পরোয়ানা আছে। ৩০শে চড়ক উপলক্ষে সন্ন্যাসীরা বাদ্যসহকারে ঠাকুর নিয়ে নদীতে স্নান করিয়ে নিয়ে মন্দিরে ফিরে আসেন। এরপর মন্দিরের চারধা"র প্রণাম খাটা বা দণ্ডী খাটা হয়। দণ্ডী খাটার মধ্য দিয়ে গাজনের সমাপ্তি ঘটে। সন্ন্যাসীরা ব্রতভঙ্গ করেন ও অন্নগ্রহণ করেন। কুড়মুনের ঈশানেশ্বরের গাজন বর্ধমানের লোকসংস্কৃতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

বাঘনাপাড়ার গোপেশ্বর ও শিবলিঙ্গের তাৎপর্য :

থানা কালনা, মৌজা রাধানগর (জে. এল. ৭৮), আয়তন ৬০১.৮৫, লোকসংখ্যা ৪৯৭৮। এদের মধ্যে তপসিলী ১৪৫৪, সাঁওতাল উপজাতি ৪৪১। এই মৌজাই বাঘনাপাড়া, অধিষ্ঠাতা দেবতা গোপেশ্বর শিব। বাঘনাপাড়া সম্পর্কে ১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বর্ধমান গেজেটিয়ারে আছে—Baghnapara (88.20 E 23.24 N) A Railway Station on the Barharawa Katoya Loop line of the Eastern Railway; the place is sacred to the Gaudiya Vaishnavas, being the native place of Bansibadan and Ramai Thakur, the two Vaishnava doyens of the days of Sri Chaitanya.

Legends say that the village derives its name from the cursed Vyaghrapada Muni who resembled the tiger because of the curse, was dispelled after prolonged meditation. Another legend derived from the book named Bansisiksha says that earlier the place was covered with woods infested by tigers. Ram Chandra, the ancestor of the Goswamis of the place is said to have tamed the tigers by uttering the name of Hari and hence the name of the village Bagh-na-para, a village without tigers.

Gopeswar, another deity is also there in the village whose worship with great ceremony takes place in the Bengali month of Chaitra.

এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিনয় ঘোষের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। "বর্ধমান জেলার ভিতর দিয়েই বল্লুকা নদী বয়ে গেছে। এই নদীর তীরে বাঘনাপাড়া, বাঘনাপাড়ার অব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে ধর্মপূজার যে বিরাট প্রতিপত্তি ছিল তা অনুমান করা অন্যায় নয়। ধর্মের এই পূজারীদের বৈষ্ণবরা যে কি চোখে দেখতেন তার স্পষ্ট প্রমাণ আছে চৈতন্য ভাগবতে। ধর্মপূজারীদের বৈষ্ণব গোস্বামীরা বাঘের চেয়েও ভয় করতেন। গোস্বামীদের সঙ্গে ধর্মপূজারীদের বিরোধ হয়েছে প্রথমে তাও অনুমান করা যায়। পরে রামাই গোস্বামী (পণ্ডিত) এই শ্রেণীর পাষণ্ডদের কাউকে কাউকে যদি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দিয়ে থাকেন তারই প্রতীকোপাখ্যান হিসেবে বাঘকে হরিনাম শুনিয়ে উদ্ধার করার কাহিনীর উৎপত্তি হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

বাঘনাপাড়ার ধর্মপূজার ঐতিহ্য এখনও গোপেশ্বর শিবের গাজন ও পূজায় বেঁচে আছে। সংস্কৃতিক ঐতিহ্য সহজে মরে না, রূপান্তরিত হয়।"

গোপেশ্বর শিবলিঙ্গের ভাস্কর্য মূর্তি শিল্পের ভাস্কর্য শিল্পের এক বিরল দৃষ্টান্ত। বর্ধমানেশ্বর শিবলিঙ্গের মত তিনটি পৃথক পৃথক প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা শিবলিঙ্গটি নির্মিত। শিবলিঙ্গের রুদ্রভাগে একটি দশভুজা মূর্তি ক্ষোদিত আছে। এইরূপ ক্ষোদিত মুখাবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গকে মুখ-লিঙ্গ বলে। গোপেশ্বরের রুদ্রভাগে দশপ্রহরণধারিণী দশভুজা মূর্তিটি বদ্ধ পদ্মাসন ভঙ্গীতে আসীন। দশভুজা মূর্তির নিম্নে সেন রাজাদের কুলদেবতা সদাশিবের মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। সেন বংশের অধস্তন পুরুষ ত্রয়োদশ শতকে কালনা মহাকুমায় বৈদ্যপুরের জমিদার হিসেবে রাজত্ব করতেন বলে জনশ্রুতি আছে। বৈদ্যপুরে কিঙ্করমাধব সেন ও মঙ্গলকোটের বিক্রমাদিত্যকে সেন বংশোদ্ভূত বলে অনেকে দাবী করেন। তা যদি হয় তা হলে পরবর্তী কালে কোন এক সময় এই অঞ্চল পরিত্যক্ত হওয়ায় জঙ্গলে পরিণত হয়। পরে এক সময় এক মুখ-লিঙ্গ সদাশিব বিগ্রহ উদ্ধার করে গোপীশ্বর জ্ঞানে পূজা করা হয় বলে ঐতিহাসিক যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী মন্তব্য করেছেন। আমার জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ গোপেশ্বরীদেবী ছিলেন এই বাঘনাপাড়ার মেয়ে। সেই সূত্রে আমিও একাধিক বার বাঘনাপাড়ায় গেছি। সেখানে গোপেশ্বরীদেবীর পিতামহ প্রবীণ রামগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে গোপেশ্বর শিবের অনেক তথ্য জেনেছিলাম। গোপেশ্বর শিবমন্দির বৈষ্ণববাড়ীর প্রাঙ্গণেই প্রতিষ্ঠিত। শিবমন্দিরটি চারচালা রীতিতে নির্মিত, প্রবেশ দ্বারের ঊর্ধাভাগে টেরাকোটার অলঙ্করণ।

নাটমন্দিরের সম্মুখে কষ্টিপাথরের নন্দীবৃষ স্থাপিত আছে। গোপেশ্বর শিবের নিত্যপূজা তো হয়ই আবার চৈত্র সংক্রান্তির সময় গাজনে বিরাট উৎসব হয়। আগে পিঠবান হত, এখনও কপালবান হয়।

শিব ও রুদ্র—রক্ষক ও সংহারক। তিনি তুষ্ট হলে মঙ্গল হয় আর রুষ্ট হলে তিনি ধ্বংস করেন। ড. পঞ্চানন মণ্ডলের মতে বৈদিক রুদ্রই Saive মহাদেব নামে পরিচিত। শিবপূজার ক্ষেত্রে ঘটেছে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণ। আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের.ইতিহাস' গ্রন্থে লৌকিক শিবধর্ম সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন বর্ধমান জেলার শিবপূজা গাজনের প্রসারের ক্ষেত্রে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

"ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এদেশে প্রচার লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বহু উপাদান আসিয়া লৌকিক শৈবধর্মের সঙ্গে মিশ্রিত হইতে আরম্ভ করে। পৌরাণিক শিবের পরিকল্পনাও বুদ্ধদেবের চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত। অতএব বাংলার তদানীন্তন বৌদ্ধসমাজ শিবের চরিত্রের মধ্যেই নিজেদের আদর্শের সন্ধান পাইয়াছিল। জৈন তীর্থঙ্করদের জীবনাদর্শ, গৌতমবুদ্ধ ও পৌরাণিক শিব হইতে বিশেষ স্বতন্ত্র নহে, এই জন্যেই কালক্রমে তদানীন্তন বাংলার বিরাট বৌদ্ধ ও জৈন সমাজ নিজেদের ধর্মীয় উপকরণ দ্বারা এদেশের শৈবধর্মকে অভিনব রূপে পুনর্গঠন করিয়া লইয়াছিল।"

আমরা কড়ুই-এর বুড়োশিব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ধর্মকুণ্ড বৌদ্ধরাজা ও তাঁদের বুদ্ধদেব কেমন ভাবে লৌকিক ধর্মরাজ ও হিন্দু দেবতা বুড়োশিবে রূপান্তরিত হয়েছেন তা দেখেছি। মাজিগ্রামের দেউলেশ্বর বৌদ্ধস্তূপের রূপান্তর, কেতুগ্রামের বিল্বেশ্বর-এর বৌদ্ধস্তূপের আকৃতিবিশিষ্ট স্তূপের উপর গাভীর দুগ্ধক্ষরণের কাহিনী থেকে এ জেলায় বুদ্ধদেবের পৌরাণিক শিবে রূপান্তরিত হওয়ার সমর্থন পাই। বাবলাডিহির ন্যাংটেশ্বর ত্রয়োদশ তীর্থঙ্কর দিগম্বর শান্তিনাথের পৌরাণিক মহাদেবে রূপান্তর, উনানির মঙ্গলচণ্ডীর বুদ্ধমূর্তি ও তীর্থঙ্কর শান্তিনাথের মূর্তি, এড়ালের বুদ্ধেশ্বর শিব ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের বক্তব্যকেই সমর্থন করে। বরাকরে অনেকগুলি প্রাচীন শিবমন্দির আছে যাদের গঠনশৈলী ও স্থাপত্য-শিল্প দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে। এদের মধ্যে একটি তো ৬ষ্ঠ–৭ম শতকের বলে অনুমান করা হয়। অবশ্য এটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত। অন্য দুটির মধ্যে জৈন-প্রভাব সুস্পষ্ট। একটির মধ্যে মৎস্য চিহ্নসহ পাঁচটি শিবলিঙ্গ ও অন্য একটিতে গণেশ ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তিসহ শিবলিঙ্গ আছে। ড. গোপীকান্ত কোঙার তার বর্ধমান জেলার মেলা গ্রন্থে শিবলিঙ্গ সম্পর্কে

বলেছেন—শিবলিঙ্গ হল সৃষ্টির প্রতীক অর্থাৎ প্রজননের চিহ্ন, পিতৃত্বের পরিচায়ক, যোনি (গৌরীপট্ট) স্ত্রীশক্তি সংযোজিত। আবার কেউ কেউ বৌদ্ধদেব স্তূপ বা ছোট ছোট পূজাস্থল থেকে শিবলিঙ্গের আকার কল্পনা করা হয়েছে বলে মনে করেন। "শিবলিঙ্গ পূজার ইতিহাস" প্রবন্ধে শ্রীমৎ স্বামী নচিকেতসানন্দ মন্তব্য করেছেন—"জগৎসৃষ্টির আদি ভূতাপ্রকৃতি পুরুষোত্তমের সঙ্গে মিলিত হয়ে সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করেন বলে শৈবগণ হরপার্বতীর লিঙ্গযোনিকে সৃষ্টির কারণ বলে গ্রহণ করে লিঙ্গ ও যোনিপীঠকে একত্র করে তার পূজা প্রচলন করেন। স্কন্দ-পুরাণে পাই—

আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা।
আলয়ঃ সর্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে ॥

আকাশলিঙ্গ ও পৃথিবী তার পীঠিকা। সকল দেবতাগণের বাসস্থান এই লিঙ্গ বা আকাশ। আকাশলিঙ্গেই সকলে লয় প্রাপ্ত হন।

লিঙ্গ পূজার ব্যাপকতা সত্ত্বেও শিবের মূর্তিপূজাও নানা স্থানে অনুষ্ঠিত হয়—যেমন চন্দ্রশেখর, নটরাজ, সদাশিব, উমামহেশ্বর, কল্যাণসুন্দর, অঘোর ও অঘোষ ভৈরব। এদের মধ্যে অঘোষ ভৈরব, অঘোর ভৈরব উগ্রমূর্তি বাকী সব সৌম্যমূর্তি। বর্ধমান জেলায় শিবলিঙ্গ আবার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পূজিত হন। আলমগঞ্জে (বর্ধমান) বর্ধমানেশ্বর; কুড়মুনে ঈশানেশ্বর ও গাজনেশ্বর; রায়ানের দক্ষিণেশ্বর; এরুয়ারের রুদ্রশিব; বাবলাডিহির ন্যাংটেশ্বর; রঘুনাথপুরে সিদ্ধিনাথ; চৈতন্যপুরে শৈলেশ্বর; কেতুগ্রামের কালরুদ্র; কাটোয়ার বানলিঙ্গ; কড়ুই-এর বুড়োশিব; কাটোয়ায় কালিন্দীনাথ; মাজিগ্রামে দেউলেশ্বর; মন্তেশ্বরে মহেশ্বর; মোহনপুরে দুধকমলা; মেমারীতে জলেশ্বর ও স্ফটিকেশ্বর; জামালপুরে কাশীনাথ ও ভুবনেশ্বর; রায়নার গঙ্গাধর, ভৈরব, লোচনেশ্বর, দক্ষিণেশ্বব, বিশ্বেশ্বর, রামেশ্বর; খণ্ডঘোষের মৃত্যুঞ্জয়; নাড়ুগ্রামে নাড়েশ্বর; গলসীতে মানিকেশ্বর, মল্লিকেশ্বর, আদারেশ্বর; আউসগ্রামে খড়োশ্বর; অন্ডালে কালাগ্নিরুদ্র; জামুরিয়ায় নীলকণ্ঠ; পানুঘাটে ঘোষেশ্বর; বেড়ুগ্রামে জটাধারী; এরুয়ারে চন্দ্রচূড়; সুন্দরচকে মানিকেশ্বর: কেতুগ্রামের নৈহাটীতে মুণ্ডমালা শোভিত চতুর্হস্ত বিশিষ্ট কালরুদ্রশিব; এড়ালে বুদ্ধেশ্বর ও কাঁদড়ায় ঘন্টাকর্ণ ভৈরব।

গোপালদাসপুরের রাখালরাজ :

কালনা থানার বৈদ্যপুরের মাইল তিনেক পশ্চিমে গোপালদাসপুর (জে.এল. ১৪৮) ছোট্ট গ্রাম—আয়তন ৯৮.৭০ হেক্টর, লোকসংখ্যা ২৫৮,

তপসিলী ৭৭, উপজাতি সাঁওতাল ৫১। হাওড়া বর্ধমান মেইন্ লাইনে বৈঁচি স্টেশনে নেমে বৈদ্যপুর বা কালনা বাসে এসে রথতলায় নেমে মাইল তিনেক গেলেই গোপালদাসপুর। ছায়াঘন শান্ত পরিবেশ সর্বত্র, এই পরিবেশের মধ্যে রাখালরাজের মন্দির। রাখালরাজ এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ দেবতা। প্রায় ৪৫০/৫০০ বছরের প্রাচীন দেবতা। গ্রামের প্রান্তে তমাল বকুলের ছায়াঘেরা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মন্দির মধ্যে গোপীনাথ ও রাখালরাজ—দারুময় বিগ্রহ। বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা-কাহিনী বিচিত্র। বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা কাটোয়া থানার খোট্টে গ্রামের অধিবাসী রামকান্ত গোস্বামী। কোথায় কাটোয়ার এক অখ্যাত অজ্ঞাত পল্লী খোট্টে গ্রাম আর কোথায় কালনার থানার এক অখ্যাত গ্রাম গোপালদাসপুর—মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। গোপীনাথ ছিলেন রামকান্ত গোস্বামীর কুলদেবতা। ব্রাহ্মণের বৃত্তি তিন ফুঁক—কানে ফুঁক (গুরুগিরি), শাঁখে ফুক্ (পৌরোহিত্য) আর কানাই-এ ফুঁক (পাচকের বৃত্তি)। রামকান্তর বৃত্তি কানে ফুঁক অর্থাৎ গুরুগিরি। বংশের নিয়ম কোন শূদ্রকে দীক্ষা দেওয়া চলবে না। কিন্তু রামকান্ত ব্রাহ্মণ-শূদ্রের ভেদাভেদ মানেন না। তিনি পারিবারিক প্রথা ভেঙে শূদ্রকে দীক্ষা দেন। বড় ভাই তার এই ঔদ্ধত্যে বিরক্ত হয়ে রামকান্তকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন। রামকান্ত জ্যেষ্ঠের কাছে ভর্ৎসিত হয়ে কুলদেবতা গোপীনাথকে নিয়ে সস্ত্রীক অশ্বারোহণে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। যাত্রা পথে গোপালদাসপুর গ্রাম। এখানে ঘোড়া অসুস্থ হয়ে পড়ে ও মারা যায়। রামকান্ত গোপালদাসপুরেই থেকে যান। বৃন্দাবন যাওয়া আর হলো না। এই খানেই মাটির ঘর নির্মাণ করে বাস করতে থাকেন।

সেকালে নারকেলডাঙা-গোপালদাসপুর দিয়ে মুর্শিদাবাদ যাবার পথ ছিল। এই পথে পাল্কীতে করে যাচ্ছিলেন মুর্শিদাবাদের দেওয়ান। তাঁর বাড়ী ছিল বৈঁচির নিকটবর্তী পোঁটরা গ্রামে। যাবার পথে তাঁর কানে এলো গোপীনাথের আরতির ঘন্টাধ্বনি। তিনি পালকি থেকে নেমে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হন। দেখলেন রামকান্ত একাগ্রচিত্তে গোপীনাথের আরতি করছেন। আরতি শেষে রামকান্ত দেওয়ানজীকে গোপীনাথের প্রসাদ দিয়ে আপ্যায়ন করেন। দেওয়ানজী রামকান্তর আতিথেয়তা ও গোপীনাথের প্রতি তাঁর অচলা ভক্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে যান ও গোপালদাসপুরের ৭০০ বিঘা নিষ্কর জমি দেবোত্তর করে দেন। কিছুকাল পরে রামকান্তর শিশুপুত্রটি মারা যায়। এরপর রামকান্ত পদব্রজে পত্নীসহ বৃন্দাবন যাত্রার আয়োজন করেন। কিন্তু এবারেও বৃন্দাবন যাওয়া হল না। গোপালদাসপুরেই তিনি স্বপ্নাদেশ পান আর বৃন্দাবন যাবার প্রয়োজন নাই। এই গোপালদাসপুরেই বৃন্দাবন প্রতিষ্ঠিত হবে। বৃন্দাবনের রাধাকান্ত এখানেই

আবির্ভূত হবে। গাঙ্গুর নদীর যমুনা খাতে এক কাষ্ঠখণ্ড ভেসে আসবে। ঐ কাষ্ঠ দিয়েই রাধাকান্তর নবরূপ রাখালরাজ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হবে। পরদিন রামকান্ত দেখে সত্যিই এক নিম কাষ্ঠখণ্ড ভেসে এলো। বাঘনাপাড়ার এক বালক-শিল্পী এই কাষ্ঠ দিয়েই রাধাকান্তের বিগ্রহ নির্মাণ করে—নাম দেন রাখালরাজ।

রামকান্তের বংশধররাই সেবাইত। প্রথমে গ্রামের মাঝখানে মন্দির ছিল, পরে গ্রামের প্রান্তে মন্দির নির্মাণ করে রাখালরাজ ও গোপীনাথকে এই মন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়। গ্রামের প্রান্তে ছায়াঘন বকুলবীথি ও বাগানের তরুচ্ছায়ে দাওয়া উঁচু মন্দির। শান্ত সমাহিত চিত্তে দেবতার আরাধনার উপযুক্ত স্থান। রাত্রে মন্দিরপ্রাঙ্গণে কারো থাকার অধিকার নাই। রাত্রেই নাকি রাখালরাজ গোপীনাথকে নিয়ে মন্দির-প্রাঙ্গণে খেলা করেন, গোচারণ করেন।

দারুময় এই দুই বিগ্রহের গঠন-ভঙ্গিমা অপূর্ব, দুটি মূর্তি কৃষ্ণের দ্বৈত সত্তার প্রতীক। গোপীনাথ ত্রিভঙ্গ মুরারি বংশীবাদনরত কৃষ্ণ, আর রাখালরাজের ডান হাতে পাঁচনী, ননী ক্ষীর খাবার ভঙ্গিতে খাড়া দণ্ডায়মান কৃষ্ণ, রাধা নাই।

রাখালরাজের নিত্যসেবার ব্যবস্থা আছে। সকালে গা-তোলানী; ঠাকুরকে শয্যা থেকে ওঠান হয়। গা-তোলানীতে ফলমূল ভোগ হয়। নৈবেদ্য দিয়ে নিত্য-পূজা; দুপুরে অন্নব্যঞ্জন ভোগ। গোটা শীতকাল অন্নব্যঞ্জনের সঙ্গে খিচুড়ি দিতে হয়। অন্নভোগের সঙ্গে তেঁতুল পাতার অম্বল ও কচু শাকের ঘন্ট থাকবেই। গোস্বামীরা অতিথিদের পরিতুষ্ট করে অন্নভোগ খাওয়ান। কেউ ফেরে না।

মাঘ-ফাল্গুন মাসে অঙ্গরাগ ও পরে অধিবাস। ১লা বৈশাখ গোষ্ঠযাত্রা; এই উৎসবে বিগ্রহকে মন্দিরের বাইরে আনা হয়। এই দিন কৃষ্ণযাত্রা ও কীর্তন গানের অনুষ্ঠান হয়। জন্মাষ্টমীতে বিশেষ পূজা, নন্দোৎসবে সংকীর্তন, নারকেল নিয়ে কাড়াকাড়ি ও সংকীর্তনের পর দইএর ভাঁড় ভাঙার মধ্য দিয়ে উৎসবের পরিসমাপ্তি।

গো-পার্বণের অর্থাৎ কালীপূজার পরদিন গোবর্ধন পূজা; রামনবমীতে রাখালরাজের দোল—-পূর্বরাত্রে চাঁচর ও বারুদ পোড়ানো হয়। দোলের দিন বিগ্রহের রাজবেশ; সারাদিন নামসংকীর্তন; এই উপলক্ষে মেলাও বসে।

কৈয়রের বিজয়গোপাল, মদনগোপাল ও রাধাকৃষ্ণ :

খণ্ডঘোষ থানার কৈয়র (৯৬) অতি প্রাচীন গ্রাম। ধর্মমঙ্গলের বর্ণনা অনুসারে মোগল আমলের রাজস্ব আদায়ের কার্যালয় ছিল এখানে। আয়তন—৩৩২.৭৮ হেক্টর, লোকসংখ্যা ২২২৭, তপসিলী ১০৯০, আদিবাসী মাত্র ৮৫। গ্রামে Community Health Centre, ডাকঘর আছে। তবে রাস্তাঘাট কাঁচা,

বাজারহাট পাঁচ কিলোমিটার দূরে নিকটস্থ শহর বর্ধমান। বর্ধমান থেকে বাস সার্ভিস আছে। বেদগর্ভের শ্রীপাট কৈয়র। গ্রামে বেদগর্ভের প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীজনার্দন প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কে এই বেদগর্ভ? সে এক কাহিনী; শ্রীচৈতন্যের দ্বাদশ পার্ষদের অন্যতম পার্ষদ অভিরাম গোস্বামী পর্যটনে বের হয়ে মধ্য পথে এক বেত বনে বিশ্রাম করেন। এরপর তিনি যান শাক্তপ্রধান গ্রাম খানাকুলে। উদ্দেশ্য—বৈষ্ণবধর্ম প্রচার। এই শাক্তপ্রধান গ্রামেও একজন শিষ্য তৈরী করেন। এই শিষ্যই বেদগর্ভ। বেদগর্ভ গুরুজীর সঙ্গে আসেন কৈয়রে। এখানে তিনি লক্ষ্মীজনার্দন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে ভজনা শুরু করেন। সংকীর্তনের সময় গোস্বামী প্রভু বহু অলৌকিক লীলা প্রদর্শন করতে থাকেন। গোস্বামী প্রভুর অলৌকিক ও অপ্রাকৃত লীলা দর্শনে গ্রামবাসীরা মোহিত হয়ে যায় ও দলে দলে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে থাকে। ক্রমে গোস্বামী প্রভুর শিষ্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬৫। প্রত্যেক শিষ্য লক্ষ্মীজনার্দনের সেবাপূজার জন্য এক বিঘা করে জমি দান করে। গোস্বামী প্রভুর তিরোধানের পর বেদগর্ভ বৃন্দাবন যান ও একটি ছোট দারুমূর্তি মদনগোপালকে সঙ্গে নিয়ে আসেন ও কৈয়রে প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে আরো একটি বিগ্রহ আনেন। এটি বিজয়গোপাল, এটিও দারুমূর্তি।

বেদগর্ভের দুই পুত্র চৈতন্য ও নিত্যানন্দ। বেদগর্ভের তিরোধানের সময় চৈতন্যকে লক্ষ্মীজনার্দন, মদনগোপাল ও বিজয়গোপালের সেবাইত নিযুক্ত করে যান। তখন বেদগর্ভের কনিষ্ঠ পুত্র নিত্যানন্দ যান বৃন্দাবন এবং বৃন্দাবন থেকে নিমকাঠের রাধাকৃষ্ণ ও বলরামের দারুমূর্তি নিয়ে আসেন ও কৈয়রে প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে মন্দিরপ্রাঙ্গণ তিন ভাগে ভাগ হয়। গোপালবাড়ী, বলরামবাড়ী ও মাধববাড়ী। গোপালবাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত মদনগোপাল ও বিজয়গোপাল—এখানে চলে আত্মমতে সেবা। মাধববাড়ীতে রাধাকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত, এখানে মন্দিরে রসুই করে ভোগ হয়। আর আছে বলরামবাড়ী, এখানে পাইমাপে ৫ সের আতপ চালের অন্নভোগ ও পরমান্ন ভোগের ব্যবস্থা; তবে মাছও থাকে। রাত্রে শীতল আরতি—খই দুধ আর মিষ্টান্ন নিবেদিত হয়।

প্রধান উৎসব দোল, ঝুলন ও রাস। দোলের আগে অঙ্গরাগ ও অভিষেক; দোলের পূর্ব দিন চাঁচর—গ্রামের প্রান্তে খড়ের ১০/১২ ফুট উচু ত্রিকোণাকৃতি মেড় তৈরী হয়। কাঠামো বাঁশের—নীচে ঠাকুর রাখবার জন্য একটা বড় কুলুঙ্গীর মত রাখা হয়। সংকীর্তনসহ দেববিগ্রহ নিয়ে গিয়ে মেড়ের নীচে স্থাপন করে পূজা করা হয়। তারপর খড়ের কাঠামোতে অগ্নিসংযোগ করে বহ্ন্যুৎসব পালন করা হয়। ঝুলনে বিগ্রহদের রাজবেশ পরিয়ে মহা আড়ম্বরের সঙ্গে পূজা ও

সংকীর্তন—মালসা ভোগ হয়। এই মহোৎসবে মেলাও বসে, আগে ৫ দিন ধরে রামায়ণ গান, কীর্তন ও যাত্রা হতো। এখন ৩৬৫ বিঘা সম্পত্তির অনেকটাই ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত—উৎসবের অনুষ্ঠান সব কিছুই হয়, তবে সে জৌলুস নাই। তবুও মহোৎসবের কয় দিন গোটা গ্রাম সরগরম হয়ে থাকে। গ্রামবাসীদের শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে তাদের গতানুগতিক জীবনধারায় এইসব উৎসব পূজা-পার্বণ যেন একটা আনন্দের জোয়ার নিয়ে আসে। গ্রামের প্রাণশক্তি যেন এই সমস্ত উৎসব, মহোৎসবের মধ্যে নিহিত থাকে। জেলার সমাজজীবনে পূজা-পার্বণের এখানেই গুরুত্ব।

জাড়গ্রামের কালুরায় :

জাড়গ্রামের কালুরায় দেউড়িতে বাড়ী
জামাজোড়া খাসা ঘোড়া উত্তর পাগড়ী।

জামালপুর থানার জাড়গ্রাম এক প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। আয়তন ২৪৫.৭৮ হেক্টর, লোকসংখ্যা ১৯৯১, তপসিলী ৬৭৯, সাঁওতাল উপজাতি ৪৫৪। গ্রামটি এমনি অনুন্নত, প্রাথমিক ও জুনিয়র হাইস্কুল এবং পোষ্ট অফিস থাকলেও হাটবাজার গ্রাম থেকে ৫ কিমি দূরে। নিকটস্থ শহর ও স্টেশন তারকেশ্বর, তাও গ্রাম থেকে ১৪ কিমি দূরে। বাস স্টপ ২ কিমি; তবে বাস স্টপ থেকে গ্রামে যাবার রাস্তাটি মোরাম দেওয়া। গ্রামের পানীয় জলের ভরসা টিউবওয়েল। জাড়গ্রামের খ্যাতি প্রাচীনত্ব ও গ্রাম্যদেবতা কালুরায়ের জন্য।

সেই পাল আমলে এই গ্রামে একটা দুর্গ ছিল বলে জনশ্রুতি। এই পরিত্যক্ত দুর্গটি এখন গড়বাড়ি নামে সাধারণ্যে পরিচিত। পাল আমলে রায় উপাধিধারী সামন্ত রাজারা এখানে শাসন করতেন। তাদের কীর্তি এই গড়বাড়ীর দুর্গ। গড়ের মাঝখানে ছিল রাজবাড়ী। গড়বাড়ীর মধ্যে প্রাচীন দুর্গের ভিত আজ এর সাক্ষ্য বহন করছে। এই গড়বাড়ীর খননকার্যের ফলে ভগ্নস্তূপ থেকে পোড়ামাটির ক্ষোদিত মূর্তি, সিঁদূর লিপ্ত শিলামূর্তি, গালার চুড়ি, বাঁটুল ও "দেবশর্মা—১০৪২ শকাব্দ (১১২০ খ্রীষ্টাব্দ)"-লেখা ইষ্টক ফলক পাওয়া গেছে। প্রত্নতত্ত্বের এই সব উপাদানই গ্রামটির প্রাচীনত্বের প্রমাণ।

এই গ্রামের প্রাচীন ইতিহাস বলে—বাঁকুড়া অঞ্চলের নীলপুরে এক সময় দেব বংশের ছিল প্রবল প্রতাপ। এই দেববংশের দুই ভ্রাতা গর্দ্ধব খাঁ দেবনিয়োগী ও পুরন্দর খাঁ দেবনিয়োগী। এরাই ছিলেন জাড়গ্রামের দেবনিয়োগী বংশের পূর্বপুরুষ। এই দেবনিয়োগী বংশের গোপালচন্দ্র দেবনিয়োগীর দুই পুত্র শ্যামাচরণ

ও হরিচরণ বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানার বোঁয়াই থেকে জাড়গ্রামের পত্তনীদার হয়ে আসেন (১৬৫৮ শকাব্দ); শ্যামাচরণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ আর লক্ষ্মীনারায়ণের পৌত্র রত্নেশ্বর ছিলেন কৃতী পুরুষ। তিনি গ্রামে অনেক মন্দির রাস্তাঘাট নির্মাণ করে দেন। শালপুকুর নামে দীঘিও তাঁর সময়েই খনন করা হয়। এই সব দেবস্থানের সেবা পূজার জন্য বাকুঁড়ার ময়না থানার অন্তর্গত নবগ্রাম থেকে পণ্ডিত কালিকান্ত তর্কপঞ্চাননকে আনিয়ে গ্রামের পূর্ব পাড়ায় বসতি করান। এহ বাহ্য—এসব এখন স্মৃতি—গল্পকথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে যে কালুরায়ের জন্য জাড়গ্রামের খ্যাতি তিনি এখনও স্বপীঠ-স্থানে অধিষ্ঠিত। তাকে কেন্দ্র করেই আমার এই কাহিনীর সূত্রপাত। গ্রামের মধ্যে ইষ্টক নির্মিত মন্দির, সামনে নাটমন্দির, এই মন্দিরের মধ্যেই অশ্বপৃষ্ঠের উপর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ধর্মরাজ শিলা—নাম কালুরায়। মন্দিরটির নির্মাণকাল ১৬৩২ শকাব্দ (১৭১০ খ্রীষ্টাব্দ) দেবতার আবির্ভাব সম্পর্কে জনশ্রুতি—গ্রামের বাসিন্দা রামদাস আদক ধর্মরাজ কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ১৫৮৪ শকাব্দে অনাদিমঙ্গল নামে ধর্মপুরাণ রচনা করেন।

বেদ বসু তিন বাণ শাকে সুপ্রচার
ভাদ্র আদ্যপক্ষ আট দিবস তাহার।

আবার অন্যত্র দেখা যায়—

যাদব রায় দেওয়ান গিরি লইল যেই সনে
রামদাসের গীতের পত্তন হইল সেইক্ষণে ॥

কবি নিজেকে পুরাতন দামোদর খালের অদূরে জাড়গ্রামের প্রসিদ্ধ ধর্মঠাকুর কালুরায়ের কৃপাপ্রাপ্ত বলেছেন। রামদাসের অনাদিমঙ্গলে কালুরায়ের মন্দির ও উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

বহুকাল পূর্বে হুগলী জেলার দিঘীড় গ্রামে এক ইষ্টক নির্মিত মন্দিরে "কালুরায়" অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিংবদন্তী আছে, জাড়গ্রামের পূর্ব পাড়ায় কয়েকঘর দরিদ্র সাহাদের বাস ছিল। এই সাহাদের এক নিষ্কর্মা যুবক পিতামাতার ভর্ৎসনায় অতিষ্ঠ হয়ে হাওড়া জেলার এক পল্লীতে মাসীর বাড়ী চলে যায়। মাসী তাকে মাথায় করে গাঁয়ে গাঁয়ে মদ বিক্রি করতে পাঠান। মদ বিক্রির সমস্ত কড়ি মাসী তার কাছ থেকে কেড়ে নিত। তাছাড়া মদ বিক্রি কম হলে মাসী তাকে তীব্র ভর্ৎসনা করতো। একদিন তার মদ বিক্রি হলই না। মাসীর ভর্ৎসনার কথা চিন্তা করতে করতে এক গাছের নীচে বসে আকুল স্বরে কাঁদতে লাগলো। সেই পথ নিয়ে যাচ্ছিল এক ব্রাহ্মণ। সে বালকের কান্না শুনে যুবকের কাছে এসে তার কাছ

থেকে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে তাকে পরামর্শ দেয় সেই গাছের নীচে সে যদি সমস্ত মদ ঢেলে দেয় তা হলে প্রচুর কড়ি পাবে। যুবকটি ব্রাহ্মণের বাক্য পরীক্ষা করার জন্য সমস্ত মদ গাছের নীচে ঢেলে দিল আর যেখানে মদ ঢেলেছিল সেখানে দেখল প্রচুর কড়ি। এরপর সেই যুবকটি ব্রাহ্মণের নির্দেশমত নিকটস্থ নদীবক্ষে দাঁড়িয়ে "কালুরায়, কালুরায়" বলে চিৎকার করতেই একটি চতুষ্কোণ ধর্মশিলা তার হাতে চলে এলো। ব্রাহ্মণ তাকে বললো,—ইনি ধর্মঠাকুর, তুমি এর পূজা অর্চনা কর, তোমার সমস্ত দুঃখকষ্ট দূর হবে। কিন্তু যুবক তো পূজা অর্চনার কিছুই জানে না; তাছাড়া সে জাতিতে শুঁড়ি তার পূজা করার অধিকারই বা কোথায়? ব্রাহ্মণ তাকে কেবল ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজা করতে পরামর্শ দিয়েই অন্তর্হিত হল। এরপর যুবক মদ বিক্রি ছেড়ে দেয় ও সারা দিন কালুরায়ের পূজা অর্চনা নিয়েই থাকে। তার এই আচরণ পাগলামির নামান্তর মনে করে ঘরের লোকেরা একদিন সেই ধর্মশিলা সারকুড়ে লুকিয়ে রাখে। সেই রাত্রেই যুবক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে সারকুড়ের কাছে "কালুরায়" "কালুরায়" বলে ডাকতেই, কালুরায় তার হাতে উঠে আসে। সেই রাত্রেই যুবক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ধর্মশিলা নিয়ে হুগলীর দিঘীড়তে চলে আসে। চারদিকে ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়। দলে দলে লোক ধর্মরাজের পূজা নিয়ে আসে। তখন জাড়গ্রামের সাহারা কালুরায়সহ যুবককে জাড়গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে আসে ও তাকে পণ্ডিত উপাধি দিয়ে কালুরায়ের সেবাইত নিযুক্ত করে। এরপর যুবক বর্ধমানের মহারাজার খুব সম্ভবত; কৃষ্ণরাম রায়ের কাছে ধর্মরাজের সেবাপূজার জন্য কিছু সাহায্য প্রার্থনা করতে যান। মহারাজ কালুরায়ের মাহাত্ম্যের প্রমাণ দেখতে চান। সেবাইত কালুরায়ের ধর্মশিলা পুষ্করিণীতে ফেলে দিয়ে "কালুরায়" "কালুরায়" বলে আকুল স্বরে ডাকতে থাকলে শিলা সেবাইতের হাতে চলে আসে। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে মহারাজ কালুরায়ের মন্দির ও নাটমন্দির নির্মাণ করে দেন।

কালুরায়ের নিত্যপূজার ব্যবস্থা তো আছেই—"চৈত্র মাসে গাজনের সময় মহা আড়ম্বর সহকারে উৎসব হয়। এই সময় চতুর্দোলায় কালুরায়কে নিয়ে বাদ্যসহ শোভাযাত্রা বের হয়—এই শোভাযাত্রা দিঘীড় গ্রামে শেষ হয়। সেখানেই প্রথম পূজা ও গাজনের সূচনা হয়। তারপর পূজাদির পর আবার তেমনি ভাবে শোভাযাত্রা সহকারে কালুরায়কে জাড়গ্রামে ফিরিয়ে আনা হয়। রামদাস আদকের অনাদিমঙ্গলে আছে—

জাড়গ্রাম বড়স্থান ধর্ম যখন অধিষ্ঠান
দয়ার ঠাকুর কালুরায়

ধর্মগৃহ মনোহর সম্মুখেতে দামোদর
সদাই সঙ্গীত হয় নাটে।

কালুরায়ের গাজনই প্রধান উৎসব। প্রতি বৎসর বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসের কোন এক মঙ্গলবার ধর্মরাজ মন্দিরে নতুন ঘট স্থাপন করে ১৩ দিনের মহোৎসবের সূচনা। এরপর প্রতিদিন কালুরায়ের পূজার পর বিকালে ও সন্ধ্যায় ঘনরামের ধর্মমঙ্গলের ২৪টি পালাগান অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের নবম দিন বুধবার শ্মশান-সন্ন্যাসীরা পাটা ধারণ করেন। মধ্যে পরমান্ন ভোগ ও 'মালা কাড়ান' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় 'আগুনে ঝুল'-এর অনুষ্ঠান হয়; এই অনুষ্ঠানে দু দিকে দুটি বাঁশ পোঁতা থাকে। মধ্যে দুই খুঁটির শীর্ষে একটা বাঁশ আড়াআড়ি বাঁধা হয়। সেই বাঁশে পা দিয়ে ও মাথা নীচে ঝুলিয়ে সন্ন্যাসী 'জয় বাবা কালু বাবা' ধ্বনিসহ ঝুলতে থাকে আর নীচে থাকে আগুনের খাপড়া তাতে ধুনা ছোঁড়া হয়। এই ভাবে কিছুক্ষণ চলার পর সন্ন্যাসীকে নামান হয়। প্রধান সন্ন্যাসীর পর অন্য সন্ন্যাসীদের নিয়েও এই 'আগুনে ঝুল' অনুষ্ঠান হয়। এরপর সন্ন্যাসীদের মহাহবিষ্যান্ন ভোজন। দশম দিনেও মন্দির প্রাঙ্গণে 'আগুনে ঝুল' ও অধিবাস উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। অধিবাসের দিন সেবাইত ও সন্ন্যাসীরা সকলেই সারাদিন উপবাসী থাকেন ও রাত্রে পূজার পর ফলমূলাদি আহার করেন। একাদশ দিন শুক্রবার—এদিন সন্ধ্যায় ধর্মমঙ্গলের কর্পূব ভিক্ষা পালাগান হয়। যে সমস্ত গায়েনরা পালাগান করেন তাদের সকলকেই গ্রামবাসীরা উৎসবের কয়দিন খাওয়াবার ব্যবস্থা করে। রাত্রে মালা কাড়ান পর্ব। মালা কাড়ান শেষে, কালুরায়ের বিবাহ উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। এই উপলক্ষে বাদ্যসহ সন্ন্যাসীরা, সেবাইত সকলে মশাল নিয়ে বিগ্রহসহ নদীতে যান ও বিগ্রহের স্নানাভিষেক সম্পন্ন হয়। এরপর বাজী পোড়ান হয়। বহু লোকের সমাগম হয়। সন্ন্যাসীরা মন্দিরে এসে পঞ্চগুঁড়ি দিয়ে ধর্মরাজের পাদপদ্ম রচনা করেন; সেখানে ধর্মরাজের পূজা ও বিবাহ অনুষ্ঠান হয়। এরপর সন্ন্যাসীরা লুচিমিষ্টি খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করেন।

দ্বাদশ দিন ভোরে পশ্চিম-উদয় পালাগান অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম-উদয় সম্পর্কে ধর্মমঙ্গলের কাহিনী এই রূপ। ময়নাগড়ের রাজা কর্ণসেন তাঁর শ্যালক ও প্রধান অমাত্য মহাম্মদ। মহাম্মদ রাজপুত্র লাউসেনের মাতুল। মহাম্মদের চক্রান্তে কর্ণসেন রঞ্জাবতীর পুত্র ধর্মের একনিষ্ঠ সেবক লাউসেনকে কঠিন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়। মহাম্মদের পরামর্শে গৌড়রাজ বিদ্রোহী ইছাই ঘোষকে দমন করার জন্য লাউসেনকে পাঠান। ইছাই চণ্ডীর অনুগৃহীত, অমিত শক্তিধর। কিন্তু ধর্মঠাকুরের বরপুত্র লাউসেন যতবার তাঁর শিরচ্ছেদ করেন ততবারই চণ্ডীর

কৃপায় কাটামুণ্ড জোড়া লাগে। তখন ধর্মঠাকুরের অনুরোধে দেবতারা চণ্ডীকে শিবের কাছে নিয়ে গেলেন। সেই অবসরে লাউসেন ইছাইকে বধ করে ময়নাগড়ে ফিরে আসেন। তারপর মহাম্মদের প্ররোচনায় ও গৌড়রাজের নির্দেশে লাউসেন প্রবল ঝটিকা প্লাবনের হাত থেকে গৌড়রাজকে রক্ষা করেন ও পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় দেখিয়ে অসাধ্য সাধন করেন। এই হল "পশ্চিম-উদয় পালাগানের কাহিনী"। মধ্যাহ্নে সন্ন্যাসীদের স্নান, বাদ্যসহ শোভাযাত্রা ও 'শালেভর' মালা কাড়ান অনুষ্ঠান ও ধর্মরাজের বিশেষ পূজা, বলিদান, হোম, বৈতরণী পার প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়। অপরাহ্ণে আশেপাশের গ্রাম থেকে বাদ্যভাণ্ড সহ অনেক লোক সঙ্ সেজে নাচতে নাচতে নৈবেদ্য নিয়ে পূজা-মন্দিরে আসে। রাত্রে "লুয়ে পূজা" ও "লুয়ে ছাগবলি" হয়। এই লুয়ে ব্যাপারটা একটু মজার। ছাগবলির পর মাটির হাঁড়িতে ছাগমুণ্ডটি রেখে ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিয়ে ধর্মরাজকে নিবেদন করা হয়। একে বলে লুয়ে পুজো।

এই লুয়ে পূজা প্রসঙ্গে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে ধর্মপূজার ইতিহাস প্রসঙ্গে বিশদ ভাবে আলোচনা করেছেন।

"দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত ছাগ (উৎসবের ২/৩ বৎসর) পূর্ব হইতেই ছাড়িয়া দিবার রীতি রাঢ় অঞ্চলের বহু স্থানেই প্রচলিত আছে। তবে ধর্মের ছাগ সম্পর্কে একটু বিশেষত্ব আছে। ইহার সম্মুখের এক পায়ের খুরের উপর একটি লোহার বেড়ী ডাড়কা পরাইয়া দেওয়া হয়। ইহা দেখিয়াই ইহাকে ধর্মের ছাগ বলিয়া চিনিতে পারা যায়। কোন কোন অঞ্চলে ধর্মের ছাগকে লুয়া বা লুয়ে বলে। সম্ভবত লোহার বেড়ী পরা থাকে বলিয়া লোহা উচ্চারণে লুয়া শব্দটি আসিয়াছে। কোথাও কোথাও দুটি ছাগকে বলি দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ছাগকে বলে 'কোল-লুয়ে'। লুয়ে ছাগকে বলি দেওয়ারও নিয়ম আছে। এই ছাগকে হাড়িকাঠে রেখে বলি দেওয়া হয় না। লুয়ার সামনে ফুল বেলপাতা দিয়ে 'লুয়ে'-কে ছেড়ে দেওয়া হয়। লুয়ে ছাগ যখন সেই বেলপাতা খেতে থাকে তখন বলিকরকে এক কোপে বলিদান দিতে হয়। যদি দু'চোট হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে পূজার কোন ত্রুটি হয়েছে বা লুয়ের কোন খুঁত ছিল। তখন সঙ্গে সঙ্গে 'কোল লুয়ে'-কে আগের পদ্ধতিতে বলি দিতে হয়। এই লুয়ের মাথা একটা মাটির হাঁড়িতে পুরে ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হয়। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস—যদি কোন বন্ধ্যা নারী এই লুয়ের হাঁড়িকে সারারাত কোলে নিয়ে বসে থাকে ও পরের মহাপূজার দিন পূজা অন্তে মাথায় করে পুকুর বা নদীতে নিয়ে বিসর্জন দেয় তাহলে তিনি সন্তানবতী হবেন। সেক্ষেত্রে বিসর্জনের সময় কতকগুলি নিয়ম পালন করতে হয়। নদী বা

পুকুর পাড়ে জলের ধারে লুয়ের হাঁড়ি নামান হয়। সেই বন্ধ্যা নারী ও তাঁর স্বামী পূর্ব মুখ করে বসে থাকবে। পণ্ডিত বা পুরোহিত সংক্ষেপে ধর্মমঙ্গলের কাহিনী ছড়ার আকারে আওড়ে যান। এরপর লুয়ে হাঁড়ির মুখ খুলে মাটির ঢেলা ভরা হয় তবে দেখতে হবে ছাগমুণ্ড যেন চাপা না পড়ে। হাঁড়ি ঢেলা ভর্তি হলে একটি প্রদীপ ছাগমুণ্ডের উপর বসিয়ে দেওয়া হয়। এরপর সেই নারী মাথায় করে নিয়ে জলে নেমে, আগে পুঁতে রাখা বাঁশের কাছে গিয়ে হাঁড়ি নিয়ে ডুব দেন। ভারী হাঁড়ি নদীতে ডুবে যায়। সকলে স্নান করে মন্দিরে আসে। মন্দিরে পরবর্তী উৎসবের জন্য ছাগের খুরে লোহা পরিয়ে উৎসর্গ করে লুয়ে ছাগ ছেড়ে দেওয়া হয়। লুয়ের মাংস রেঁধে ধর্মঠাকুরের ভোগ দেওয়া হয়। H. Whitehead দক্ষিণ ভারতে এরকম লুয়ে মহিষ বলির উল্লেখ করেছেন।"

মধ্যাহ্নে ধর্মরাজ পূজার পর সন্ন্যাসীরা পাটা ত্যাগ করেন রাত্রে। পুরোহিত ছড়া বলে সন্ন্যাসীদের উত্তরীয় খুলে নেন। রাত্রে অষ্টমঙ্গলা পালাগান হয়। কালুরায়ের গাজনের এইখানেই সমাপ্তি।

ধর্মরাজের পুরোহিত কৌঋষি গোত্রীয় শূদ্রবর্ণ পণ্ডিত সাহারা। নানা রোগ নিরাময়ের জন্য ও মনস্কামনা পূরণের জন্য ধর্মরাজের গাজনে লোকে সন্ন্যাসব্রত মানত করে। ষোড়শ উপচারে পূজা দেয়, দণ্ডী খাটে, ধুনো পোড়ায় 'আগুন ঝুল' ব্রতের অনুষ্ঠান করে।

ধর্মরাজ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পূজিত হচ্ছেন। ভাতার থানার বেলগ্রামে কালাচাঁদতলায় ধর্মরাজ কূর্মমূর্তিতে পূজিত হচ্ছেন। বন্ধ্যা নারীদের কাছে কালাচাঁদ জাগ্রত দেবতা। তাঁর দয়ায় বন্ধ্যা নারী হয় পুত্রবতী। তাই প্রতিদিন বিশেষ করে শনি / মঙ্গলবার বারের দিন কালাচাঁদ তলায় পুত্রবতী নারী বাবার দয়ায় প্রাপ্ত শিশুকে নিয়ে মানত দিতে আসে। পোড়া মাটির ঘোড়া মানত দেয়। যাদের বলিদান মানত থাকে, তারা আনে সাদা ছাগ। বৈশাখী পূর্ণিমায় কালাচাঁদের বিশেষ পূজা ও গাজন উৎসব হয়।

খুদকুড়ি গ্রামে উগ্রক্ষত্রিয়দের বাড়ীতে ধর্মশিলার নিত্যসেবা হয়। এখানে নিত্যসেবার সময় আতপ চালের বদলে একসের সিদ্ধ চাল নিবেদন করা হয়। এই ধর্মের গাজনের বৈশিষ্ট্য হল ধর্মঠাকুরের 'জাত' উৎসব। এই উৎসবে ধর্মঠাকুরকে পাল্কি করে নিয়ে আসা হয়। ধর্মশিলাকে স্নান করান হয়, ভক্তরাও স্নান করে। লোটা ভক্তরাও পুকুর পাড় থেকে গড়াতে গড়াতে মন্দির পর্যন্ত যান। লোটা শেষ হলে লোটা ভক্তদের ফুল কাড়ান হয়। ঘটে শ্বেতপদ্ম চাপান হয়। ঢাক বাজে, ফুল নিয়ে ভক্তরাও কাড়াকাড়ি করতে থাকে। এই সময়ে মন্দির-প্রাঙ্গণে যে

কাঠের ধুনি জ্বলে তার থেকে কাঠের জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে লোটা ভক্তরা লোফালুফি করতে থাকে। একে বলে "আগুন কাড়ান।" এরপর অনেক গ্রামবাসী তাদের মনস্কামনা হবে কিনা জানবার জন্য পুরোহিতের হাতে শ্বেতপদ্ম তুলে দেয়। পুরোহিত সেটি ঘটের ওপর মন্ত্র পড়ে চাপিয়ে দেন। প্রচণ্ড শব্দে ঢাক বাজে, "জয় বাবা ধর্মরাজ" শব্দে চারদিক মুখরিত হয়। তারপর হয় তো ফুল পড়ে কিংবা পড়ে না। যার ফুল পড়ে সে সেই ফুল নিয়ে বাবার থানে গড়াগড়ি দেয় ও হাসি মুখে বাড়ী ফেরে। যার ফুল পড়ে না সে মনের দুঃখ চেপে রেখে বিরস বদনে বাড়ী ফেরে। বাৎসরিক পূজার পরের দিন গ্রামের তিনটি ধর্মশিলাকে সন্ন্যাসীরা স্নান করাতে নিয়ে যায়। স্নানপর্ব শেষ হলে শিলাকে আপন আপন মন্দিরে স্থাপন করা হয়। সন্ন্যাসীরা উত্তরীয় খুলে ব্রত ভঙ্গ করে।

পালিগ্রামের ধর্মশিলা ও আদিরাক্ষ :

মঙ্গলকোট থানার ২১নং মৌজা পালিগ্রাম। গুসকরা থেকে সরাসরি বাসে যাওয়া যায়, নিকটে অজয় নদ। আয়তন ৮৩০.০১ হেক্টর, লোকসংখ্যা ৩১১২, গ্রামটি মোটামুটি উন্নত; প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ৪টে, উচ্চ বিদ্যালয়ও আছে, হেলথ সেন্টার, পোষ্ট অফিস সবই আছে। নিকট শহর গুসকরা ৯ কিমি দূরে। গ্রামের মধ্যস্থানে আছে ধর্মরাজের মন্দির; সেখানে ৬টি ধর্মশিলা স্থাপিত আছে। এই ৬টি শিলার মধ্যে ৪টিই কূর্মশিলা। আবার গ্রামের বাইরেও পশ্চিম পাড়াতে একটি ধর্মশিলা আছে, নাম আদিরাক্ষ। ধর্মশিলার দেয়াসী সদ্‌গোপ বংশীয়রা; তবে পূজারী ব্রাহ্মণ। বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজের গাজন হয়। গাজনের আগের দিন হয় অধিবাস, এই দিনের পূর্বাহ্ণে বাণেশ্বর ও ধর্মের প্রতীক পোড়ামাটির ঘোড়া নিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। একে বলে নাবড়াভাঙ্গা। ঐ বাণেশ্বর ও ঘোড়ার মূর্তিকে প্রত্যেক বাড়ীতে নামিয়ে পূজা হয়। বৈকালে ধর্মশিলাকে রথে চড়িয়ে অজয় নদীতে স্নান করাতে নিয়ে যাওয়া হয়। এই স্নানকে বলে মুক্ত স্নান। সন্ধ্যায় সেই রথে চড়িয়ে গ্রামস্থ সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের সামনে আনা হয়। এখানে দেবীর সম্মুখে বাণফোঁড়া অনুষ্ঠান শুরু হয়। তীক্ষ্ণ লৌহশলাকাযুক্ত বাণেশ্বরের উপর দেয়াসীকে লম্বালম্বি শয়ান করান হয়। জিভে বাণ ফোঁড়ান হয়। পূর্ণিমার দিন ধর্মশিলাগুলিকে মন্দিরের বাইরে এনে বারামে (বেদীতে) স্থাপন করা হয়। শুরু হয় ধর্মমঙ্গলের নব খণ্ডের পালাগান। এখানেও দেয়াসীদের জিভ-বাণ, কান ফোঁড়ার প্রথা আছে।

এই দিন গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় আদিরাক্ষ ধর্মশিলার কাছে একটি কলসীতে মদ, ফুল, কলা, জল দিয়ে ভাঁড়াল সাজিয়ে রাখা হয়। সেগুলি গেঁজে ওঠে।

এরপর সেগুলিকে মালা পরিয়ে আদিরাক্ষের কাছে নিবেদন করে দেয়াসীরা মাথায় করে দুপুর রোদের মধ্যে নাচতে নাচতে গ্রাম পরিক্রমা করে। রোদের তাপ পেয়ে সেই ভাঁড়াল উথলে দেয়াসীদের মাথা বেয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে। এই ভাঁড়াল নিয়ে নাচের সময় অন্য কয়েকজন দেয়াসী ধুনুচিতে আগুন নিয়ে ভাঁড়ালে দেয়াসীদের মুখের সামনে ধূনো দিতে থাকবে। উপবাস-ক্লিষ্ট দেয়াসীদের মধ্যে এর ফলে একটা আচ্ছন্নভাব আসে। কেউ কেউ মূর্ছিত হয়ে পড়ে কেউ কেউ আচ্ছন্ন অবস্থায় বিড়বিড় করে বকত্রে থাকে। একে বলে ভর হওয়া। সেবাইতদের কথায় এই ভর অবস্থায় ধর্মরাজ তার ওপর ভর করেন ও তার মধ্য দিয়ে পূজার ত্রুটি বিচ্যুতি সম্বন্ধে নির্দেশ দেয়—কারও কোন জিজ্ঞাস্য থাকলে সেই অবস্থায় তাকে প্রশ্ন করলে বা রোগ নিরাময়ের ওষুধপত্র চাইলে তাও বলে দেয়। তৃতীয় দিনে ঊর্ধ্বসেবা বা আগুন ঝুলের অনুষ্ঠান হয়। দুটো মই দাঁড় করিয়ে দুজন দুদিকে ধরে থাকে মাঝখানে ৬/৭ ফুট উঁচুতে আড়াআড়ি বাঁশ দিয়ে সন্ন্যাসী সেই বাঁশে পা দিয়ে হেঁটমুন্ড হয়ে দুলতে থাকে আর এই অবস্থায় ধুনো পোড়ানো হয়। চতুর্থ দিন সারাদিন উপবাস, রাত্রে কানে তুলো গুঁজে ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করে অন্ধকার ঘরে হবিষ্যান্ন করে নিয়ম ভঙ্গ করে। এর দ্বারাই গাজনের সমাপ্তি।

পাঁচড়ার ধর্মপূজা :

জামালপুর থানার পাঁচড়া গ্রাম; মৌজা রূপপুর (১৫), আয়তন ৭৯৭.০১, লোকসংখ্যা ৫৬২২, তপসিলী ২০৭১, সাঁওতাল উপজাতি ১১৯৪। মশাগ্রাম স্টেশন থেকে বাসে ৪.৫ কিমি। আবার বর্ধমান-তারকেশ্বর বাসে পাঁচড়া বাসস্টপেও নামা যায়। গ্রামে একটি মন্দিরে কূর্মরূপী ধর্মরাজ অধিষ্ঠিত। সেবাইত পণ্ডিত উপাধিকারী ডোম জাতি। বৈশাখ মাসের প্রথম মঙ্গলবার ধর্মরাজের গাজন উৎসবের সূচনা হয়। প্রথম মঙ্গলবার হয় ঘট স্থাপন, দ্বিতীয় মঙ্গলবার ধর্মরাজের নিশান উত্তোলনের মাধ্যমে চারদিনের মহোৎসবের সূচনা। এই চারদিন গাজন উপলক্ষে গ্রাম সরগরম হয়ে উঠে। বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার ধর্মরাজের বিবাহ অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করে গোটা গ্রাম আনন্দে মাতোয়ারা। কেহ কেহ মুক্তা দেবীকে ধর্মঠাকুরের পত্নী বলে মনে করেন। ধর্মের সঙ্গে মুক্তার বিবাহ প্রকৃতপক্ষে একটি কৃষিব্রতের আচার ছাড়া কিছু নয়। মুক্তা বলতে মুক্তাহার ধানের আতপ চাল বোঝায়। এই চালের ওপর মুক্তাদেবীর হয় প্রাণপ্রতিষ্ঠা, আবাহন, অধিবাস, পূজা। তারপর বাদ্যভাণ্ড সহকারে সেই আতপ চাল একটা পাত্রে রেখে ধর্মমন্দিরে আনা হয়। বিবাহের পূর্ব দিন ধর্মমন্দির থেকে তেল-হলুদ,

অধিবাস পাঠাবার রীতি আছে। যেদিন মুক্তাকে আনতে হবে সেদিন রাত্রে পালা ধর্মমঙ্গল আরম্ভ হলে চতুর্দোলায় ধর্মঠাকুরের পাদুকা-প্রতীককে স্থাপন করে বিয়ের সব রকম উপকরণ যেমন মুকুট, বরমাল্য নিয়ে গ্রামের একটা নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা হন বরযাত্রী। পরে ডোম পুরোহিত মুক্তাহার আতপ চাল ৫ সেরের ওপর মুক্তাদেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। পণ্ডিত পুরোহিত মুক্তামঙ্গলা পাঠ করেন। তার পর মুক্তাদেবীসহ ধর্মের প্রতীক চতুর্দোলায় ধর্মমন্দিরে আনা হয়। এই ভাবে ধর্মের বিবাহ অনুষ্ঠান সারতে সারা রাত কেটে যায়। এদিকে ধর্মমঙ্গলের গান চলতে থাকে। পাঁচড়ার গাজনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিন দিন ফুলমেলা ও প্রদর্শনী হয়। গ্রামের দু পাড়ার মধ্যে ফুলের সাজ প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা শুরু হয় ও ফুলের গাছ নিয়ে গোটা গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। চতুর্থ দিন জাঁকজমক সহকারে পূজা, হোম, ছাগবলি ও পাটভাঙ্গা উৎসব হয়। এই উপলক্ষে মেলা বসে।

রায়-রামচন্দ্রপুরে ধর্মপূজা :

ভাতার থানার রায়-রামচন্দ্রপুর (মৌজা রামচন্দ্রপুর) একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গুসকরা বলগনা বাসে রায়-রামচন্দ্রপুর বাসস্টপে নামতে হয়। আয়তন ৪৫১.৮৯, লোকসংখ্যা ২৬৫১, তপসিলী ১৪৯৬। নিকটবর্তী স্টেশন গুসকরা। রায়-রামচন্দ্রপুরের খ্যাতি কটা রায় ধর্মঠাকুর আর তার বিশেষ বলিদান পদ্ধতি নিয়ে।

ধর্মরাজের ৪টি শিলা—কটা রায়, ময়না রায়, মেঘ রায় ও পোড়া রায়, শিলাগুলি কূর্মাকৃতি। দেয়াসী মুচিরা; কিন্তু পূজারী ব্রাহ্মণ। ধর্মক্ষেত্রে ঘটে উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর সমন্বয়। নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে। বৈশাখী পূর্ণিমায় হয় ধর্মরাজের গাজন। গাজনের সূচনা অক্ষয় তৃতীয়ার দিন। এই দিন হয় কুম্ভস্নান। এরপর ৪ দিন ধরে চলে উৎসব।

কটা রায়ের আবির্ভাব সম্বন্ধে এক মজার কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। গ্রামের মুচিদের ছেলেরা নদীর ধারে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে প্রবালের মত উজ্জ্বল একটা শিলাখণ্ড পায়। সেই শিলাখণ্ড নিয়ে ছেলেরা মহানন্দে ময়রার দোকানে গেল। এই মূল্যবান পাথরের পরিবর্তে কিছু মিষ্টি নিয়ে সবাই আনন্দে ভাগ করে খাবে। মোদক মশাই শিলাটি দাঁড়িপাল্লায় ওজন করতে গিয়ে হতবাক। দোকানে যত বাটখারা ছিল, সবগুলি চাপিয়েও শিলার ওজনের সমান করা গেল না। দোকানে যত মিষ্টি তৈরী ছিল তার সমস্ত চাপিয়েও শিলার সমান করা গেল না। বিভিন্ন সূত্রে আগত দেবতা-ভাবনা ও দৈবচিন্তার একীভূত রূপ যে ধর্মঠাকুর তিনি

অপরিমেয়। তাকে কি পরিমাপ করা যায়? মোদক তো বিস্ময়ে ভয়ে বিহ্বল; গ্রামের ব্রাহ্মণদের কাছে এই অলৌকিক ঘটনা ব্যক্ত করেন। ঐ দিন ভোর রাত্রে অশ্বারূঢ় দেবমূর্তি সেই ব্রাহ্মণকে স্বপ্নাদেশ দেন আমি ধর্মরাজ কটা রায়, অভিনব বলিদানে তুষ্ট কর আমাকে। তোমাদের মঙ্গল হবে। প্রতিষ্ঠিত হলেন ধর্মরাজ। মাটি খুঁড়ে আরও তিনটি শিলা পাওয়া যায়। এই চারটি শিলাই কটা রায়, ময়না রায়, মেঘ রায় ও পোড়া রায়। এই সময় থেকে বৈশাখী পূর্ণিমায় মহাপূজার দিন হয় সেই অভিনব বলিদান। একটি লম্বা যূপকাষ্ঠে পর পর ৯টি পাঁঠা সাজিয়ে এক কোপে বলিদান দেওয়া হয়। বলিকরের খড়্গাও সেইরূপ বিরাট আর ওজনও তেমনি। এরপর প্রথমে ৭টি, তারপর ৫টি, ৩টি ও শেষে ১টি পাঁঠায় শেষ। এরপর যাদের মানত থাকে তাদের বলিদান হয়। এই অভিনব বলিদান দেখতে চারপাশের গ্রাম থেকে হাজার হাজার লোক সমবেত হয়। এরপর হোম দণ্ডী খাটা ও শেষে সন্ন্যাসীদের পাট ভাঙ্গার মধ্য দিয়ে গাজনের সমাপ্তি।

হিজলগড়ার ধর্মরাজ ও জেলার ধর্মপূজার মূল্যায়ন :

জামুরিয়া থানার ৪০ নং মৌজা হিজলগড়া—ছোট গ্রাম আয়তন ৮৬৯.২৭ হেক্টর, লোকসংখ্যা ৩৮০৬-এর মধ্যে তপসিলী জাতি ৭৮২ জন, সাঁওতাল উপজাতি ২২৬ জন। গ্রামের মধ্যে একটি প্রাচীন মন্দির আর সেই মন্দিরেই শিব ও ধর্মের সহ-অবস্থান। শিব আবার একটি নয়। চারটি লিঙ্গ—অনাদিনাথ, বুড়োশিব, আবালেশ্বর ও বাণেশ্বর। আর ধর্মশিলা ২টি, ধর্মরায় ও বুড়োরায়। এই ধর্মরাজের গাজন সম্পর্কে যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী মহাশয় বিশদ বিবরণ দিয়েছেন।ঘোষাল ব্রাহ্মণরা পূজারী ও কৈবর্তরা দেয়াসী। মন্দিরের নিকটেই আছে কালাপুকুর, এই পুকুরে আছে কালাপুষ্প নামক জলজ উদ্ভিদ। এই পুষ্পেই হয় ধর্মরাজের পূজা—এই পুষ্প বাতের ঔষধ। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি তেঁতুলের জল দিয়ে এই কালাপুষ্প বাতের জায়গায় লাগালে যন্ত্রণার অনেক উপশম হয়। বৈশাখ মাসের নৃসিংহ চতুর্দশীতে ধর্মরায়ের গাজন হয়। ত্রয়োদশীর দিন ভক্ত্যারা ক্ষৌরকর্ম করেন। এরপর কালাপুকুরে স্নান করে নিকটে শিব ও হনুমানজীর মন্দিরে পূজা দেন। তারপর এক পায়ে দৌড়ে মন্দিরে আসেন। সেখানে লোহার ২টি দণ্ড আড়াআড়ি খাটান আছে। সেই লৌহদণ্ডে পা ঝুলিয়ে হেঁটমুণ্ডে শিবের পূজা করেন। এরপরের অনুষ্ঠান জাগরণ, রাত্রি ২টার সময় বাঁশের ঝাড়ে বাঁশে হাত দিয়ে ছড়া বলে। এর দ্বারা হয় বাঁশের জাগরণ। সকালে সেই বাঁশ কেটে তার থেকে টোকা তৈরী হয়; সেই টোকায় ধর্মরাজকে বসিয়ে কালাপুকুরে নিয়ে যাওয়া হয়। বাদ্যভাণ্ড

সহকারে সকলে সেখানে যায়। এখানে ধর্মরাজকে স্নান করান হয়। চতুর্দশীর দিন মহাপূজা, হোম। পাশের গ্রাম থেকে অনেক ভক্ত পূজা নিয়ে হাজির হন ও মানসিক থাকলে দণ্ডী খাটে। এর নাম স্থানীয় ভাষায় হোলাবান। আবার অনেকে মানত অনুযায়ী শিবকুড়ি নামক স্থান থেকে গড়াগড়ি দিতে দিতে মন্দিরে আসে। ঐ দিন ভোরে আবার মুকতোলা নামক দণ্ডীখাটা অনুষ্ঠান হয়। এর পর হয় আগুন কাড়ান। ভক্তরা জ্বলন্ত কাঠের ধুনি থেকে কাঠের অঙ্গার নিয়ে লোফালুফি খেলে। এর পরের অনুষ্ঠান সগড়বান। একজন ভক্ত্যা শিবকুড়ি থেকে দুটো মইয়ের মাঝখানে আড়াআড়ি খাটানো বাঁশে পা ঝুলিয়ে হেঁটমুণ্ড হয়ে আগুনে আহুতি দিতে দিতে আসে। অন্য ভক্তরা মই বা খুঁটি ধরে নিয়ে আসে। আর একজন নীচে আগুনের খাপুড়ি দুটো বাঁশের ওপর চাপিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বয়ে আনে। পূর্ণিমার দিন কোন পূজা হয় না। দোলায় ধর্মরাজকে স্নান করাতে নিয়ে যাওয়া হয় ও স্নান শেষে বাণেশ্বরে বিগ্রহগুলিকে চাপিয়ে আনা হয়। চতুর্দশীর দিন গাজন। পূজা শেষে বিগ্রহ স্বস্থানে স্থাপিত হয়।

ধর্মরাজ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন পদ্ধতিতে পূজিত হন। যাত্রাসিদ্ধি রায়, স্বরূপ রায়, বাঁকা রায়, কালু রায়, চাঁদ রায়, ক্ষুদি রায়, সুন্দর রায়, স্বরূপ নারায়ণ, বৃহদাক্ষ, মতিলাল, পুরন্দর, কোমললোচন, কটা রায়, খঞ্জ রায়। ধর্ম ঠাকুরের মূর্তিও বিচিত্র—ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি, ত্রিশূলহীন ধুতি পরিহিত মহাদেবমূর্তি, প্রস্তরের কূর্মমূর্তি—এই সব কূর্মমূর্তির কতকগুলিতে পদচিহ্ন থাকে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে থাকেও না। আবার কোথাও রাজবেশধারী মনুষ্যাকৃতি বিশিষ্ট কোন কোন কূর্মমূর্তিতে রূপোর তৈরী চোখ, মুখ কূর্মের ওপর বসানো। কোথাও আবার মনুষ্যাকৃতি—মাথায় পাগড়ী, কানে কুন্ডল, কান দুটি বড় বড়, গোঁফ কান পর্যন্ত কিন্তু দাড়ি নাই। "জামা জোড়া, সাদা ঘোড়া উত্তম পাগড়ী"। আবার ধর্মশিলাও নানা আকৃতির, কোনটি চতুষ্কোণ, আবার কোনটি ঠিক নোড়ার মত, চতুষ্কোণ ধর্মশিলামুন্ডমূর্তি। পোড়ামাটির মাটির ঘোড়ার স্তূপও ধর্মরাজ রূপে পূজিত হন।

ধর্মঠাকুরের পূজা পদ্ধতি তিন প্রকারের—নিত্যসেবা, বারমতি পূজা এবং বাৎসরিক মহাপূজা উৎসব ও গাজন। নিত্যসেবার কোন আড়ম্বর নাই। ফলমূলাদির নৈবেদ্য দিয়ে পূজা, তবে স্থানভেদে রবিবার, শনিবার বা মঙ্গলবার বারের বিশেষ পূজা। বিশেষ পূজার দিন একটু ঘটা করে হয়, মানতকারীরা মানসিক নিয়ে আসে। মানসিক থাকলে সাদা পাঁঠা বা সাদা পায়রা বলি হয়। নৈবেদ্যের সঙ্গে সাদা চুন দেওয়ারও প্রথা আছে।

বারমতি পূজা ১২টি শিলার সমবেত পূজা—বারটি স্থানের বারটি ধর্মশিলা একত্র করে এক জায়গায় ১২ দিন ধরে সকলে মিলে পূজা অর্চনা করে। ধর্মঠাকুরের পূজারীকে পণ্ডিত বলে। সাধারণত ডোম, মুচি, বাগ্‌দী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর হয়। তবে এখন অনেক ধর্মপূজার পুরোহিত ব্রাহ্মণ, দেয়াসী নিম্নশ্রেণীর মানুষ।

বার্ষিক পূজা, উৎসব ও গাজন খুবই আড়ম্বরপূর্ণ। তবে এ পূজা গোষ্ঠীতন্ত্রের পূজা, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে যে কেউ যোগ দিতে পারে। গাজনের সময় সেবাইত, দেয়াসী ছাড়াও অনেকে সন্ন্যাসী হয়। সন্ন্যাসীদের মধ্যে পাট ভক্ত্যা ও ধামাত করনি ২টি ভাগ হয়। এদের মধ্যে বর্তমানের বোলান গানের মতো উত্তর-প্রত্যুত্তর চলে। যেমন—

প্রশ্ন : তিল প্রমাণ দেউল আকাশ প্রমাণ দে' (দেব)
কোথা থুইবে ফুলের সাজি কোথা পূজিবে দে' (দেব)
উত্তর : হয় না তিল প্রমাণ দেউল আকাশ প্রমাণ দে' (দেব)
হৃদয়ে থুব ফুলের সাজি ভাবে পূজিব দে' (দেব)।

কোথাও গাজন ১২ দিন ধরে আবার কোথাও চারদিন চলে। ধর্মপূজার গাজনে অনেক জায়গায় ধর্মমঙ্গলের নব খণ্ড পালাগানের ব্যবস্থা হয়। সন্ন্যাসী বা ভক্ত্যাদের কঠোর সংযম ও উপবাসের মধ্য দিয়ে নানা কৃচ্ছসাধন করতে হয়। শালেভর, বান ফোঁড়া, জিভবাণ, পিঠবান, লৌহশলাকাযুক্ত কাষ্ঠখণ্ডে নির্মিত বাণেশ্বরের উপর শয়ান, ফুল কাড়ান, আগুন কাড়ান, ঊর্ধ্বাসেবা, আগুন ঝুল, দণ্ডী খাটা, কাঁটার ওপর দিয়ে গড়াগড়ি দেওয়া, এক পায়ে দৌড়ান, ভাঁড়াল খেলা, ভর হওয়া, ফুল চাপানো, লুয়ে পূজা, লুয়ে ছাগবলি, মুক্তি স্নান প্রভৃতি নানা কৃচ্ছসাধনমূলক অনুষ্ঠান গাজনের অঙ্গ। ভক্ত্যাদের নিজস্ব গোত্র লোপ পায় তারা উপবীত ধারণ করে, ধর্মের গোত্র ধারণ করে।

ধর্মঠাকুরের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা জনের নানা মত। বিনয় ঘোষের মতে "ধর্মদেবতার উৎপত্তি বহুমুখ অর্থাৎ বিভিন্ন সূত্রে আগত দেবভাবনা ও দৈবচিন্তা মিশে গিয়ে এক হয়ে ধর্মঠাকুরে রূপ নিয়েছে।" ধর্মঠাকুরকে অনেকে ছদ্মবেশী বুদ্ধমূর্তির রূপান্তর মনে করেন। এ দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রতি নিষ্ঠা যখন লোপ পেতে থাকে, তখন তন্ত্রযানী বৌদ্ধরা লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুরের মাধ্যমে বৌদ্ধ সাধনার ধারাকে বজায় রাখে। তারকেশ্বর শিবতত্ত্বে আছে;

বৌদ্ধধর্ম বৌদ্ধচর্চা করিতে নির্মূল
এতাদৃশ অনুষ্ঠান করে সাধুকুল।

ধর্মের ভক্তদের ধারণা ধর্মঠাকুর দুঃখ নিবারণ করেন, বন্ধ্যা নারীকে পুত্রবতী করেন—ধর্মমঙ্গলের বৃদ্ধ রাজা কর্ণসেনের মহিষী রঞ্জাবতী শালে ভর দিয়ে কঠোর তপস্যা করে ধর্মঠাকুরের দয়ায় লাউসেনকে পুত্র রূপে লাভ করেন। তাছাড়া ধর্মঠাকুর বাত ব্যাধি নিরাময় করেন। অনেক গবেষকের মতে ধর্মঠাকুর সূর্য দেবতা, সে-কারণে ধর্মের পূজায় সাদাফুল ব্যবহৃত হয়, নৈবেদ্যতে সাদা চুন দেওয়া কোথাও কোথাও প্রচলিত আছে। সাদা পাঁঠা বা সাদা পায়রা বলি হয়। ধর্মের আদি প্রতীক কূর্ম; কূর্ম বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার, তাই ধর্মকে অনেকে বিষ্ণুর রূপান্তর বলেন। আবার কূর্মের মধ্যে বৌদ্ধস্তূপের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। পরে কূর্ম থেকে উচ্চতর সংস্কৃতি প্রভাবে ধর্মঠাকুর মনুষ্যাকৃতি বা যোদ্ধা বেশে পূজিত হচ্ছেন।

ধর্মঠাকুর ও ধর্মপূজাকে কেন্দ্র করে কত কাব্য, পুরাণ ও মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। কত কবি ধর্মকে আশ্রয় করে কাব্য লিখেছেন, ধর্মকে কেন্দ্র করে কত উপাখ্যান, কিংবদন্তী গড়ে উঠেছে। রামাই পণ্ডিত, ময়ূরভট্ট, রামদাস আদক, ঘনরাম, রূপরাম, যাদবরাম, হৃদয়রাম, রামকান্ত, রামচন্দ্র, রামদাস, গোবিন্দরাম, সীতারাম, শ্যামাপণ্ডিত, ধর্মদাস প্রমুখ কবিকে ধর্মরাজ মঙ্গলকাব্য রচনার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। রাঢ়বাংলার লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধর্মরাজ, ধর্মপূজা ও ধর্মমঙ্গলের অবদান অসামান্য। এই প্রসঙ্গে ড. সুকুমার সেনের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য।

"ধর্মঠাকুর রাজদেবতা, রাজশক্তির প্রতীক। সেইজন্য ধর্মঠাকুরের পূজক পরিচারকদের পদবীতে সেকালের রাজসভার পদিকদের উপাধি চলিয়া আসিয়াছে। ধর্মরাজকে আশ্রয় করিয়া সেকালের প্রায় সব জানপদ-দেবতা পূজাভাগ লাভ করিয়াছেন। যেমন—বাসলী, মনসা, পঁড়াসুর, লৌহজঙ্ঘ, ডামরসাঞি ইত্যাদি। ধানচাষ হইতে আরম্ভ করিয়া—গুড় তৈয়ারি, তামা-কাঁসা-লোহার কাজ, নৌকা চালানো ইত্যাদি প্রধান সাধারণ জীবিকা বৃত্তিগুলি ধর্মঠাকুরের গাজন অনুষ্ঠানে বহুমানিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ধানচাষ বিশেষ মর্যাদা লাভ করিয়াছে। গাজনে ধর্মের বিবাহ অনুষ্ঠান ধান্য কৃষিরই কাব্যময় রূপ। শিবায়নে শিবের চাষপালা ধর্মপুরাণ কাহিনীর রূপান্তর ও উপসংহার।"

(বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ)

জেলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে ধর্মঠাকুর বিরাজমান। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েক স্থানের ধর্মরাজের তালিকা দেওয়া হল।

জেলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামের ধর্মঠাকুরের সারণী

থানা	মৌজা	জে. এল.	ধর্মরাজের নাম	পূজা বা গাজনের সময় ও অন্যান্য রীতি
বর্ধমান	বড়শূল	১৬৩	ধর্মশিলা	দশহরার ৪ দিন পূর্বে গাজন আরম্ভ; পালকিতে শিলা বসিয়ে ৩/৪ দিন বিভিন্ন গ্রাম পরিক্রমা। দশহরার দিন পাটভাঙ্গা, কাঁটাভাঙ্গা ছাগ, শূকর বলি ও হোম।
বর্ধমান	সুহারী	১৫০	কালুরায়	জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা—৪ দিন
বর্ধমান	কলিগ্রাম	১০৩	ধর্মরাজ	—
ভাতার	পারহাট	৪৭	ধর্মরাজ	বৈশাখী পূর্ণিমায়
	বেলগ্রাম, কাঁচগড়িয়া	৯৭	কূর্মমূর্তি	বৈশাখী পূর্ণিমা
	কামারপাড়া (মৌজা বনপাশ)	২১	পোড়ামাটির ঘোড়া-ধর্মরাজ	ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি শূকর বলি ও ভাঁড়াল নাচ হত। এখন উৎসবটি বন্ধ হয়ে গেছে।
	নাসিগ্রাম	৮৯	বুড়ো লাল	বৈশাখী পূর্ণিমা
	রায়-রামচন্দ্রপুর (মৌজা রামচন্দ্রপুর)	৮০	কটা রায়, ময়না রায়, মেঘ রায়, পোড়া রায়	বৈশাখী পূর্ণিমা বলিদান ৯টি পাঁঠা এক কোপে অভিনব বলিদান।
জামালপুর	পাল্লা		ধর্মরাজ	জ্যৈষ্ঠ-এ গাজন (সাঁওতালরাও অংশ নেয়)
	পাঁচড়া (মৌজা রূপপুর)	৬৫	কূর্মরূপী ধর্মরাজ	বৈশাখী পূর্ণিমা
	অমরপুর	৭৩	ধর্মরাজ	”
খণ্ডঘোষ	খণ্ড ঘোষ	১৮	কমললোচন	নবমদোল।
খণ্ডঘোষ	খুদকুড়ি	৬৯	ধর্মশিলা	চৈত্রে জাত উৎসব, অতীতে চড়ক হত, এখন বন্ধ।
মন্তেশ্বর	মন্তেশ্বর	৪১	ধর্মরাজ	বৈশাখী পূর্ণিমা মদের কলস নিয়ে ভাঁড়াল নাচ।
গলসী	উড়ো	১৩৭	কালাচাঁদ	পোড়ামাটির হাতি। (গাজন, এখন বন্ধ)

থানা	মৌজা	জে. এল.	ধর্মরাজের নাম	পূজা বা গাজনের সময় ও অন্যান্য রীতি
	গোহগ্রাম	৭০	বন্য কুড়তলার ধর্মশিলা	রবিবার বিশেষ পূজা বাতের ঔষধ দেওয়া হয়
	অমরপুর	২৫	,,	বৈশাখ
গলসী	ইরকোণা	১০৩	ভোলানাথ	দেয়াসীর ভর হয়, ঢিল পড়ে, বন্ধ্যা নারী ও মৃতবৎসা সন্তান কামনায় দেয়াসীর কাছ থেকে মন্ত্রপূত তেল নেয়।
মেমারী	কানপুর	১২০	ধর্মরাজ	বৈশাখে গাজন
	দাসপুর	৪৪	ধর্মরাজ	জ্যৈষ্ঠ
	ইছাবাছা	১৮৯	,,	মাঘ মাসে জাত উৎসব
জামুরিয়া	চিচুরিয়া	৬৯	,,	বৈশাখী পূর্ণিমায় গাজন— পূর্ণিমার ৪ দিন আগে ২ দিন অন্তর বাণেশ্বর সহ ভক্ত্যা-স্নান, ধর্মরাজের প্রতীক পাদুকা স্নান, পূর্ণিমার আগে রাত্রে কাঁটা খেলা, ফুল কাড়ান, পাতাভরা— পূর্ণিমায় বলিদান।
	হিজলগড়া			বৈশাখী পূর্ণিমায় গাজন
কাঁকসা	রক্ষিতপুর	৪২	,,	বৈশাখী পূর্ণিমা
	রাজকুসুম	৭২	,,	,,
রানীগঞ্জ	বাঁশড়া	২০	ধর্মরাজ	,,
আউসগ্রাম	বনকুল	৪৯	,,	বৈশাখ ৪ দিন
কেতুগ্রাম	শ্রীপুর	৩৫	ধর্মরাজ	আষাঢ় মাসে
কাটোয়া	সুগাছি	১১৭	শিবলিঙ্গ ধর্ম	বৈশাখে
কাটোয়া	পলসোনা	৬৩	ধর্মরাজ	বৈশাখে
	বাঁদড়া	১৬	কালুরায়	মাঘ মাসে বাৎসরিক উৎসব
কালনা	মেদগাছি	৩৪	,,	মাঘ মাসে পূজা ও মেলা

থানা	মৌজা	জে. এল.	ধর্মরাজের নাম	পূজা বা গাজনের সময় ও অন্যান্য রীতি
আউসগ্রাম	এড়াল	৯৯	যাত্রাসিদ্ধি বাঁকুড়া রায়	—
মঙ্গলকোট	পালিগ্রাম	২১	ধর্মরাজ	বৈশাখী পূর্ণিমা গ্রাম প্রদক্ষিণ (নাবড়া ভাঙ্গা)
	পিলসোঁয়া	৪৬	ধর্মরাজ	—
রায়না	সেহারা	৫৫	বুড়োরায়	বুড়োরায়ের, স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে রামকান্ত ধর্মমঙ্গল রচনা করেন।
	পাঁইটা	১৫৯	স্বরূপনারায়ণ, ধর্মশিলা, ক্ষুদিরায় কালুরায়	নিত্য পূজা
আসানসোল	দামড়া	৪০	ধর্মশিলা	বৈশাখী পূর্ণিমায় পুরোহিতের সহকারী (ধামাৎকল্পী) ধর্মশিলা ঝুড়িতে চাপিয়ে পুকুরে স্নান করাতে নিয়ে যায়। এই পুকুরে স্নান করলে বন্ধ্যানারীর বন্ধ্যাত্ব দূর হয় বলে বিশ্বাস।
মন্তেশ্বর	পাতুন	৪৬	কূর্মমূর্তি	—
খণ্ডঘোষ	শশঙ্গা	৫৮	ধর্মরাজ	বৈশাখ

[তথ্যসূত্র : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—ড. বিনয় ঘোষ; পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা (৫ম) —ড. অশোক মিত্র; পূজাপার্বণের উৎসকথা—ড. পল্লব সেনগুপ্ত; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বর্ধমান—ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৩য়)—যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, Bardhaman Gazeteer 1994, লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা]

আট অধ্যায়

বিচিত্র সব লৌকিক দেবদেবী

ক্ষেত্রপাল :

কাটোয়া থানা সিঙ্গি গ্রাম (জে. এল. ১২১)—কবীশদলে মহাপুণ্যবান মহাভারত রচয়িতা কাশীরাম দাসের জন্মভূমি। আয়তন ৫৩৭.১৬ হেক্টর। লোকসংখ্যা ৪০১৪, তপসিলী ১৮৫৪। এই গ্রামের উত্তরপূর্ব ভাগে বৃদ্ধ শিবমন্দিরের কাছে এক প্রাচীন বিশাল বটবৃক্ষ—ইনিই বটবৃক্ষরূপী ক্ষেত্রপাল। ক্ষেত্রপাল বৃক্ষদেবতা—ক্ষেত্রপাল শস্যের দেবতা—ঊনকোটী দানা নিয়ে আসে ক্ষেত্রপাল। ক্ষেত্রপালের কোন মূর্তি নাই—বৃক্ষ বা কাঁসার বাটী থালা সমন্বয়ে দশ দশুই ক্ষেত্রপালের প্রতীক। একেবারে মূর্তি নাই বলা বোধহয় ঠিক হবে না। আশুতোষ মিউজিয়ামে প্রাচীন গদাপ্রহরণধারী ক্ষেত্রপালের একটি প্রস্তর মূর্তি আছে। গদাপ্রহরণধারী ক্ষেত্রপালের মূর্তির মধ্যে এঁর শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়। শাস্ত্রীয় মতে ক্ষেত্রপাল দিকপাল। তিনি গদাহস্তে গ্রামের সকল দিক রক্ষা করেন। ক্ষেত্র অর্থে যদি শস্যক্ষেত্র বোঝায় তাহলেও ক্ষেত্রপাল শস্যরক্ষাকারী দেবতা। ক্ষেত্রকে যিনি রক্ষা করেন তিনিই ক্ষেত্রপাল। এই হিসাবে তিনি কোথাও কোথাও ইক্ষুদেবতা পৌণ্ড্রাসুর হিসেবেও পূজিত হন।

যজমানায় হিতার্থায় গুড়বৃদ্ধি প্রদায়িনে
পৌণ্ড্রাসুর ইহা-গচ্ছ ক্ষেত্রপাল শুভপ্রদ।

যাই হোক সিঙ্গির ক্ষেত্রপাল বৃক্ষদেবতা—গ্রামবাসীদের জাগ্রত দেবতা; তিনি মানুষের মনস্কামনা পূর্ণ করেন। তাঁর নিকট প্রার্থনা করলে পুত্রহীনার পুত্রলাভ হয়। অন্তত ২০০/২৫০ বছর আগে গ্রামের নিঃসন্তান রাম ভট্টাচার্যকে তাঁর প্রার্থনামত পুত্রসন্তান দিয়ে তাঁর বংশরক্ষা করেছিলেন। আর এই বিশ্বাসেই রাম ভট্টাচার্য মশাই তাঁর বংশধরের নাম রাখেন ক্ষেত্রনাথ। তিনি ক্ষেত্রপাল বৃক্ষের একটি শাখা চক পুরুষোত্তম মৌজায় প্রতিষ্ঠা করেন। সেই বৃক্ষই বর্তমানের ক্ষেত্রপালরূপে পূজিত হচ্ছেন।

আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতে মহাসমারোহে ক্ষেত্রপালের মহাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। চারপাশের গ্রাম থেকে দলে দলে লোক নৈবেদ্য ও মানসিকের পাঁঠা নিয়ে পূজা দিতে আসে। ক্ষেত্রপালের কাছে ছাগ মেষ শূকর বলিদান হয়।

পূজার পূর্বদিন থেকে এর প্রস্তুতি চলে। সেদিন সন্ধ্যায় ছোট ছোট ছেলের দল নিমগাছের বা কলকে ফুলের ডাল হাতে নিয়ে ঢাক ঢোল বাদ্যভাণ্ড সহকারে গ্রাম পরিক্রমা করে আর বাজনার তালে তালে নাচতে নাচতে গান গেয়ে যায়—

গিজো গিজো গিজো
রাত পোহালে কাল আমাদের ক্ষেত্রপালের পুজো।

অর্থাৎ গ্রামের সকলকে পরের দিন ক্ষেত্রপালের পুজোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পূজার দিন সকাল ৮টা/সাড়ে ৮টা থেকে গ্রামের লোকজন পূজার সামগ্রী নিয়ে ক্ষেত্রপালতলায় হাজির হয়। সেখানে বাবার চারদিকে নৈবেদ্য স্থাপন করে সব সম্প্রদায়ের মানুষ পূজা দেয়—সন্ধ্যায় শীতল আরতি হয়।

প্রতিদিন সকালে বাবার নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে। শনি আর মঙ্গলবারে বিশেষ পূজা হয়। ঐ দিন ভক্তের সমাগম হয়—দৈব ঔষধ দেওয়া হয়—প্রধানত বন্ধ্যাত্বমোচনের ওষধি। শীতল আরতি বারোমাস হয় না, কেবল মহাপূজার দিন শীতল আরতি হয়। ওঁ ভ্রাজচ্চণ্ড-জটাধরং ত্রিনয়নং নীলাঞ্জনাদ্রিপ্রভং। দোর্দ্দণ্ডাভং গদাকপালমরুন স্রগ্‌গন্ধ বস্ত্রোজ্জ্বলম্। ঘন্টামেখলঘর্ঘর-ধ্বনি-মিলজ্‌ঝঙ্কারভীমং বিভুংবন্দে সংহিত—সিত-সর্পকুণ্ডলধরং শ্রীক্ষেত্রপালং সদা। ওঁ ক্ষৌং ক্ষেত্রপালায় নমঃ এই ধ্যানে ক্ষেত্রপালের পূজা হয়। পুরোহিত মিশ্র উপাধিধারী ব্রাহ্মণরা আর মিশ্রদের নির্দেশেই শনি-মঙ্গলবার বাবার বিশেষ পূজা হয়। এঁরাই কবচ মাদুলি ওষুধ দেন এবং মহাপূজার দিন পূজা ও রাত্রে আরতি করেন।

ক্ষেত্রপাল প্রাচীন দেবতা। সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে আছে—"গ্রাম্য লোকেরা জীববলি দিয়ে পাথর পূজা করে। গাছতলায় ক্ষেত্রপাল অর্চনা করে। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির পৌরাণিক উপাখ্যানে আছে—বৌদ্ধ মহাযানীরা এদেশে এই ক্ষেত্রপালকে অন্যান্য কিছু লৌকিক দেবতার সঙ্গে তাঁদের দেবকুলভুক্ত করেছিল। মঙ্গলকাব্যেও ক্ষেত্রপালের বন্দনা আছে—ধর্মঠাকুরের পূজায় দিক ক্ষেত্রপালের বন্দনা করা হয়—

পূর্বে থাকিয়া এস গোরিয়া ক্ষেত্রপাল
উত্তরে থাকিয়া এস কালিয়ে ক্ষেত্রপাল।
পশ্চিমে থাকিয়া এস মহুদ্ধি ক্ষেত্রপাল।

দক্ষিণে থাকিয়া এস ঠাকুর দক্ষিণ রায়।
ভাটিয়া আর শহরে তোমার পূজা হয়।

পুরোহিতদের মতে ক্ষেত্রপাল শিবের অনুচর ভৈরব।

ড. শীলা বসাক 'বাংলার ব্রতপার্বণ' গ্রন্থে শিবব্রত, শিবরাত্রিব্রতের সঙ্গে ক্ষেত্রপালব্রতকে শিবের পর্যায়ভুক্ত করেছেন।

কোন কোন অঞ্চলে ক্ষেত্রব্রত বা ক্ষেত্রপালব্রত পালিত হয়। অগ্রহায়ণ বা মাঘ মাসে যে কোন শনি বা মঙ্গলবার পূর্বাহ্ণে ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। ব্রতের কোন মূর্তি নাই—শেওড়া ডাল পুঁতে তার তলায় খই, চিঁড়ে, আতপচাল, বুট, মটর, সিমের বীচি, মুগ, অড়হর এই আটপদ ভাজা দিয়ে ফসল বৃদ্ধির কামনায় ক্ষেত্রদেবীকে লক্ষ্মীদেবী রূপে কুমারীরা পূজা করে। তবে এ জেলায় এ-ব্রতের বিশেষ চল নাই। অবশ্য এই ব্রতে ক্ষেত্রপাল দেব নয়, ক্ষেত্রদেবী।

ক্ষেত্রপাল পূজায় শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছে। ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে সংস্কৃত ধ্যানে ক্ষেত্রপাল পূজিত হন। আবার আদিম যুগের মেষ, ছাগ, শূকর বলি ও বৃক্ষদেবতার পূজা অনার্য-সংস্কৃতি ধারার পরিচায়ক।

ঘন্টাকর্ণ (ঘেঁটু) পূজা :

ঘন্টাকর্ণ (ঘেঁটু) পূজা ও কাঁদড়ার ঘন্টাকর্ণ মহাভৈরব ঘন্টাকর্ণ বা ঘেঁটু অপ্রধান লৌকিক দেবতা। লৌকিক দেবগোষ্ঠীতে অনেকটা অপাঙক্তেয়। এই পূজা একমাত্র পল্লীতে ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তিতে ভোরবেলায় অনুষ্ঠিত হয়। পূজা করেন বয়স্কা মহিলারা। তবে কোথাও কোথাও ঘন্টাকর্ণ দেবগোষ্ঠীর জাতিভুক্ত হয়েছেন। সেখানে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরাই পূজা করেন। ঘন্টাকর্ণ নামটির মধ্যেই এঁর জন্মবৃত্তান্ত ও কর্ণে ঘন্টা বাঁধার রহস্য লুকিয়ে আছে।

ঘন্টাকর্ণ আদিতে ছিলেন স্বর্গরাজ্যের দেবকুমার। কিন্তু গুরুতর অপরাধের জন্য বিষ্ণু তাঁকে অভিশাপ দেন, আর সেই অভিশাপেই ঘন্টাকর্ণকে পিশাচকুলে জন্মাতে হয়েছিল—

শোন শোন সর্বজন ঘাঁটুর জন্মবিবরণ
পিশাচকুলে জন্মিলেন শাস্ত্রের লিখন।
বিষ্ণুনাম কোনমতে করবে না শ্রবণ
তাই দুই ঘন্টা দুই কর্ণে করেছে বন্ধন।

হরিবংশে আছে ঘন্টাকর্ণ এক বিষ্ণুবিদ্বেষী পিশাচ। হরিনাম শোনার ভয়ে এর কর্ণে সর্বদা ঘন্টা বাঁধা থাকতো এবং তা আন্দোলন করে সর্বদা বাজাত।

কারণ, পাছে কোনক্রমে বিষ্ণুর নাম তার কর্ণে প্রবেশ করে। এর জন্য এর নাম ঘন্টাকর্ণ। বিষ্ণু বিদ্বেষী হলেও ঘন্টাকর্ণ শিবভক্ত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশীয়দের উপর দ্বারাবতীর ভার অর্পণ করে ও হরপার্বতীর কাছে পুত্রলাভের বর আকাঙ্ক্ষা করে বদ্রিকাশ্রমে উপস্থিত হলে ঘন্টাকর্ণও সেখানে উপস্থিত হয়।

ঘন্টাকর্ণ মহাদেবের কাছে মুক্তি প্রার্থনা করলে মহাদেব তাকে বদরিকাশ্রমে গিয়ে নারায়ণের আশ্রমে বিষ্ণুর আরাধনা করতে পরামর্শ দেন। বদরিকাশ্রমে কৃষ্ণরূপী বিষ্ণুর দর্শনলাভ করে ও তাকে স্তবে তুষ্ট করে ঘন্টাকর্ণ মুক্তি লাভ করে।

ঘন্টাকর্ণের মূর্তি ও পূজাপদ্ধতিও অভিনব—ভোরবেলায় উঠানে আলপনা দিয়ে উঠোনের মাঝখানে মুড়িভাজার খাপুড়ি কিংবা আধখানা ভাঙা কালো হাঁড়ি একটা ভাঙ্গা কুলোর ওপর উপুড় করে বসান হয়; অর্থাৎ ভাঙা কুলো হলো বেদী আর ভাঙা হাঁড়ি বা খাপুড়ি হলো দেবতার চালি। এরপর খাপুড়ি বা হাঁড়ির ওপর গোময় দিয়ে ঘন্টাকর্ণের মুখ বা পূর্ণবয়ব তৈরী করে সেই খাপুড়ি বা হাঁড়ি-র ওপর ভাল করে সেঁটে দেওয়া হয়; এই মূর্তির মুখের ওপর দুটি ঘেঁচে (ছোট) কড়ি দিয়ে হয় ঘন্টাকর্ণের চোখ, এর কপালে সিঁদুরের তিলক। মূর্তির ওপরে দূর্বা আর ঘেঁটুফুল, আর এই ফুল দিয়েই ঘন্টাকর্ণের পূজা—নৈবেদ্য হয় সিদ্ধ চাউল আর গোটা মুসুরি কলাই; খাপুড়ি ভাঙা অংশে ভিতরে প্রদীপ জ্বেলে বসিয়ে দেয়। আবার কোন কোন স্থানে হলুদে ছোপানো কাপড়ের টুকরো ঘন্টাকর্ণকে পরিয়ে দেওয়া হয়। ভোরবেলায় গৃহকর্ত্রী এলোচুলে বাঁ-হাতে ঘেঁটুফুল আর দূর্বা দিয়ে ঘন্টাকর্ণের পূজা করেন। মন্ত্র বিশেষ কিছু নাই—প্রথমে ওঁ ঘন্টাকর্ণ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ বলে আবাহন করে ওঁ ঘন্টাকর্ণায় নমঃ মন্ত্রে পূজা করা হয়।

তারপর জোড় হাতে প্রণাম—

ঘন্টাকর্ণ মহাবীর সর্বব্যাধি বিনাশন
বিস্ফোটক ভয়ে প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ মহাবল॥

পূজা অন্তে ব্রতিনী ছড়া বলে—

আজ আনন্দে, ঘেঁটুলয়ে সঙ্গে
নাচিয়া গাহিয়া চল সবে যাই,
মনের আনন্দে দাও গো পূজা,
এমন দিন তো হবে নাই।
খোস চুলকনা ঘেঁটু দিয়েছিস গায়,

সতী নারী বীর পতির গায়
বামে দাঁড়িয়ে সতী নারী
পতি বিনা সতীর গতি নাই।

এরপর অনেক জায়গায় ঘেঁটু-র বিয়ে দেওয়া হয়—উলুধ্বনি দিয়ে হাততালি দিয়ে বিয়ের পালা শেষ হয়।

পূজা অন্তে ঘেঁটুর প্রতীক গোবর ও কড়ি বাড়ীর সামনের দরজায় লাগিয়ে রাখা হয়, হলুদ ছোপানো বস্ত্রখণ্ড বাড়ীর সবার চোখে বুলিয়ে দেওয়া হয়। খাপুড়ির কালি চেঁচে কাজল তৈরী করে পরিবারের সবাই-কাজল রূপে ব্যবহার করে। বিশ্বাস এইসব তুকতাক আচার অনুষ্ঠানের ফলে চর্মরোগ হয় না, চোখ ওঠে না, চোখে ছানি পড়ে না। এরপর খাপুড়ি বা হাঁড়ি ভেঙে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। ঘন্টাকর্ণ চর্মরোগের দেবতা—ঘন্টাকর্ণ বিষ্ণুদ্বেষী, তাই বোধহয় ঘন্টাকর্ণের পূজায় এত অবহেলা, ভাঙা কুলো তার বেদী, ভাঙা খাপুড়ি তার চালি, গোবর তার মূর্তির উপকরণ—পূজা করবেন গৃহকর্ত্রী এলোচুলে বাঁ হাতে। তবু পূজা করা হয়, ব্রত পালন করা হয়—কতকটা ভয়ে কতকটা চর্মরোগের যন্ত্রণা উপশম হওয়ার বিশ্বাসে আর গ্রামের ছেলেদের কিছুদিন ধরে আনন্দের খোরাক যোগাতে। ঘন্টাকর্ণের পূজার পর গ্রামের ছোট ছোট ছেলেরা একটা কলার পেটকো ভাঁজ করে ত্রিভুজাকৃতি করে, আর ভেতরে প্রদীপ জ্বেলে সেইটা নিয়ে দল বেঁধে বাড়ী বাড়ী ঘেঁটুর গান গেয়ে বেড়ায় ও চাল ডাল সংগ্রহ করে। গানগুলিও বেশ মজার, গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির এবং গান রচনায় গ্রামের ছেলেদের প্রতিভার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

(১) ঘাঁটু ঘোর, ঘোর, ঘোর।
ঘাঁটু বিয়ে দোব তোর।
হাতে হাতে সরবৎ দিল খেয়েছে সবাই
ও ভাই খাওয়ার যখন সময় হলো
পাতা দিয়ে নুন দিয়ে গেলো।
আবার বেগুন লুচি এলো,
আনন্দেতে খাই
খাওয়ার শেষে বলি ভালো।
হাতে হাতে পান দিয়ে গেলো
কে বলেছে বরের বরণ মিশকালো
যেমন দেবা তেমনি দেবী

মিলন হবে ভালো।
রঙ্‌টি দেখো ফর্সা হবে
বিয়ের জল পেলে
এ বর আর হয় না সাদা
ধোপা বাড়ী গেলে।

(২) সহে না সহে না দিদি খোসের যন্ত্রণা
খোসের জ্বালা বিষম জ্বালা, জ্বালা থামে না।
আমি একটু আছি ভালো
আমার ছেলে কেঁদে মলো,
আবার বুড়ো মিনসে পচে ঘরে
উপায় বলো না।

(৩) ভাল ঘেঁটু আমরা খাইতে এলাম
বাবুদের বাড়ীতে
আবার পয়সা কড়ি পাই যে কিছু গো
এই ঘেঁটুর সাক্ষাতে
এই ঘেঁটুর সাক্ষাতে।
এদের উত্তম কোথায় গেল,
একে পয়সা কড়ি দিতে বলো।
আবার নইলে ঘেঁটু চলে যাবে
মনের দুঃখেতে;
ওগো মনের দুঃখেতে।

আবার অন্যরকম গান গাওয়া হয়—

প্রথম দল : পরথম এলো ঘর গেরস্থের বাড়ী
গেরস্থরা রেঁধে রেখেছে সজনের খাড়ি
বোল রাম বোল রাম

দ্বিতীয় দল : আলোর মালা চাল ডাল দাও
নয় খোসপাঁচড়া নাও।
যে দেবে ধামা ধামা
তারে ঘেঁটু দেবে জরির জামা।
যে দেবে শুধু বুকুনি,
যে দেবে মরাই মরাই

তার ঘরে সোনা ছড়াই।
ঘেঁটু দেবে তাকে খোস চুলকানি।
দাও গেরস্থ মনভরে

এই ভাবে ছেলেরা সারা চৈত্রমাস ধরে সন্ধ্যার সময় পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে গান গেয়ে চাল-ডাল পয়সা-কড়ি সংগ্রহ করে। চৈত্র সংক্রান্তিতে এইসব সংগৃহীত জিনিসপত্র দিয়ে বেশ বড় রকমের বনভোজনের ব্যবস্থা হয়।

ঘেঁটু খোসপাঁচড়ার দেবতা, তাই ঘেঁটুর গানের মধ্যে খোসপাঁচড়ার, চুলকানির যন্ত্রণার কথা যেমন আছে আবার পয়সাকড়ি না দিলে খোসপাঁচড়ার অভিশাপ দেওয়ার কথাও তেমনি আছে।

পল্লী অঞ্চলে পাঁচু ঠাকুর, বাবা ঠাকুর, শীতলা, মনসা—এরাও আর্যেতর সমাজ উদ্ভূত। পরে তুর্কীশাসনের সময় সাধারণ মানুষ যখন আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে তখন আত্মরক্ষার তাগিদে মনসা, শীতলা, পাঁচু ঠাকুর, ঘেঁটু এইসব অপদেবতাকে আর্য দেবভুক্ত করে নেয়। তাই কোন কোন স্থানে ব্রাহ্মণরা ঘন্টাকর্ণের শাস্ত্রীয় মতে পূজার আয়োজন করে। মঙ্গলকাব্যেও এই ঘেঁটুর উল্লেখ পাওয়া যায়—

আমতায় মেলাই বন্দো পুরাসের ঘেঁটু,
ঘুরালেন মাখাল বন্দো হাসনানের বটু ॥

পড়াস খুব সম্ভবত একটি গ্রামের নাম, বাঁকুড়ায় অবস্থিত বলেই ধারণা। কারণ বর্ধমান জেলার দামোদরের দক্ষিণ অঞ্চলে যেমন ঘেঁটুর পূজার প্রচলন আছে বাঁকুড়ার অনেক গ্রামাঞ্চলেও এই পূজার প্রচলন দেখা যায়।

প্রাচীনকালে অনার্যদের মধ্যে এদেশীয় রোগ নিরাময়ের নানা ওষুধ বা ওষধি জানা ছিল—আর্যরা তাদের কাছ থেকে শিখে তাদের এই সমস্ত লৌকিক দেবতাদের প্রাধান্য মেনে নেয়। মুড়িভাজার খোলা, গোময়, ভাঙাকুলো, ঘেঁচে কড়ি, তেমাথায় পূজা এসমস্তই অনার্য সংস্কৃতির যাদুবিদ্যার প্রতীক।

এইসমস্ত লৌকিক দেবদেবী অনার্যদের বলয় থেকে আর্যদের বলয়ে স্থান করে নিয়েছে, এর পরিচয় পাওয়া যায় কাঁদড়া গ্রামে শিব, শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নানা দেব-দেবীর সহাবস্থানে। এই সকল দেবদেবীকে কেন্দ্র করে এই গ্রামে সারা বছরই চলে উৎসব পার্বণ। গ্রামের ঈশান কোণে বহুলক্ষ্মী দেবী, বায়ু কোণে কালিকা দেবী, মধ্যস্থলে দুর্গাচণ্ডী, দক্ষিণ কোণে ঘন্টাকর্ণ মহাভৈরব। এখানে ঘন্টাকর্ণ আর ব্রাত্য নাই—তিনি শিবত্বে উন্নীত।

চৈত্রমাসের মহাবিষুব সংক্রান্তির তিনদিন আগে থেকে ঘন্টাকর্ণ মহাভৈরবকে কেন্দ্র করে গাজন উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ঘন্টাকর্ণ এখানে সকল দেবদেবীর ভৈরবরূপে পরিচিত। গ্রামে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে ঘন্টাকর্ণ শিবের অধিষ্ঠান। গাজন উৎসবের প্রায় পনের দিন আগে থেকেই নিম্নশ্রেণীর মানুষ বাঁশের বাঁশি, মাদল, ঢোল, বাদ্য নিয়ে বোলান গানের আসর জমায়। সংক্রান্তির দুদিন আগে ঘন্টাকর্ণ ভৈরবকে নিয়ে বাদ্যভাণ্ডসহ উদ্ধারণপুর ঘাটে স্নান করাতে নিয়ে যায়। স্নান অভিষেক শেষ হলে আবার তেমনি ভাবে চতুর্দোলায় বসিয়ে মন্দিরে নিয়ে আসে। সংক্রান্তির দিন ভক্তরা ঘন্টাকর্ণ ভৈরবের মাথায় কলসী কলসী গঙ্গাজল ঢালে। ভক্তরা সঙ সেজে ঘরে ঘরে রঙ তামাসা প্রদর্শন করে। এখানে ঘন্টাকর্ণের ধ্যানমন্ত্র সংস্কৃতে রচিত

ওঁ সূর্য্যকোটী প্রতীকানাং চন্দ্রকোটী সুশীতলম্।
অষ্টাদশভুজং দেবং পঞ্চ-বক্ত্রাং ত্রিলোচনম্ ॥
অমৃতার্ণবমধ্যস্থং ব্রহ্মপদ্মোপরিস্থিতম্।
বৃষারূঢ়ং নীলকণ্ঠং সর্ব্বাভরণভূষিতম্ ॥
কপালখন্ট্বাঙ্গধরং ঘন্টাডমরু-বাদিনম্।
খড়্গাখেটক-পট্টিশমুদ্‌গরং শূলদণ্ডধৃক্।
বিচিত্র খেটকং মণ্ডং বরদাভয়পাণিনম্।
লোহিতং দেবদেবেশং ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ।
ওঁ হুং ক্ষ্রৌং যাং বাং লাং বাং ক্রোং
ঘন্টাকর্ণ মহাভৈরব সর্ববিঘ্নান্ নাশয় ॥
হ্রীং শ্রীং ফট্ স্বাহা।

এখানে ঘন্টাকর্ণ আর বিষ্ণুবিদ্বেষী পিশাচ নাই পুরোপুরি ভৈরবত্বে উন্নীত। এই প্রসঙ্গে পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর 'পূজাপার্বণের উৎসকথা' গ্রন্থে ঘন্টাকর্ণ প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন তার উল্লেখ করে ঘন্টাকর্ণ প্রসঙ্গের সমাপ্তি করব। 'খোসপাঁচড়া ঠেকানো এবং ভূত ঠেকানো এখানে মিশে গেছে। সুতরাং ঘেঁটু তথা ঘাঁটু প্রকৃতপক্ষে তাহলে দেবতা নন অপদেবতা বা প্রেতই। পিশাচ বংশে তাঁর জন্ম এবং শিবের অনুচর তিনি—ইত্যাদি বিবরণই আসলে তাঁর পূর্বতন প্রেতপরিচিতিরই দ্যোতক। আর্যীকরণের সূত্রে ওপরে দেবত্বের বর্ণলেপ ঘটেছে। কিন্তু সেই চটাও উঠে গেছে আদিম উপচার ও অভিচারগুলির নিঃসপত্ন অস্তিত্ব বজায় থেকে যাওয়ায়। ঘেঁটুর এইখানেই একটি অনিবার্য অনন্যতা।

কাঁকোড়ার কর্কটনাগ :

বর্ধমান-কাটোয়া রেলপথের কৈচর স্টেশন বা বর্ধমান-কাটোয়া বাস সার্ভিসের কৈচর স্টপে নেমে সোজা পশ্চিমে পাঁচ মাইল গেলেই মাজিগ্রামের পশ্চিমে জেলার সীমানা অজয়ের দক্ষিণতীরে মঙ্গলকোট থানার ৪নং কাঁকোড়া গ্রাম। অতীতের কঙ্কননগর বা কর্কটনগরই বর্তমানের কাঁকোড়া। এই গাঁয়ের লৌকিক দেবী কর্কটনাগ। গ্রামের পূর্ব সীমান্তে একটা বটগাছ—এই বটগাছই কর্কটনাগের পীঠস্থান। অষ্টনাগের অন্যতম এই কর্কটনাগ—

অনন্তঃ বাসুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মশ্চ তক্ষকঃ।
কুমীরঃ কর্কটঃ শঙ্খোঃ হ্যষ্টনাগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

দশহরার পর যে নাগপঞ্চমী সেইদিন এখানে কর্কটনাগের বাৎসরিক পূজা ও উৎসব। পূজা আরম্ভ হয় বৈকাল ৩ ঘটিকায়; এর কারণ হিসেবে বলা হয় কর্কটনাগ পূর্বে অনার্য বা বাগ্‌দীদের পূজ্য ছিল। পুরোহিত শূদ্র যাজক। তাঁর বাস ইছাপুর গ্রামের প্রায় একমাইল পশ্চিমে। সেখানকার পুরুত ঠাকুর পাশের গ্রামের পূজা সেরে তবে কর্কটনাগের পূজা করতে আসতেন—তাঁর আসতে বেলা ৩টা হয়ে যেত। সেই ট্র্যাডিশন আজও বজায় আছে। পুজোর দিন পূজা দেবার জন্য অনেক বাগদীও উপোস করে। বেলা ১টা থেকে বাগ্‌দীদের স্ত্রী-পুরুষ মিলে বাদ্যসহ পূজাতলায় উপস্থিত হয়। প্রত্যেকের হাতে থাকে ভোগের থালা—তাতে থাকে কাঁঠাল, আম ও অন্যান্য ফল। পূজার নৈবেদ্য সবাই গাছতলার চারধারে আপন আপন নির্দিষ্ট স্থানে নামিয়ে রাখে সারিবদ্ধভাবে। নানাজনের নানারকম মানত থাকে; কারও প্রণাম খাটা, কারও ফলমূল নৈবেদ্য, কারও পাঁঠা, কারও ধুনো পোড়ানো—এ ধুনো পোড়ানোর একটু বিশেষত্ব হচ্ছে—মাথায় ধুনোর সরা নিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করা। বৃক্ষের ঈশান কোণে একটা হোমকুণ্ড সেখানে ব্রাহ্মণদের পূজা, হোমের অধিকার। তারপর উগ্রক্ষত্রিয়দের তারপর বাগ্‌দীদের। নাগপূজা সাধারণ শাস্ত্রীয় নিয়মেই অনুষ্ঠিত হয়। তবে সারাবছরে এদিনটি ছাড়া অন্য কোনদিন পূজা হয় না। এই কর্কটনাগ পূজার প্রচলন সম্বন্ধে এক কাহিনী প্রচলিত আছে।

অতি প্রাচীনকালে যখন পক্ষীরাজ গরুড় বর লাভ করে সর্পভক্ষণ করতে আরম্ভ করে তখন নাগরাজ বাসুকি গেলেন ক্ষেপে। বাসুকি নাগদের বাঁচানোর জন্য ঠিক করলেন সর্পের বিষজ্বালায় জর্জরিত করে পক্ষীরাজকে ধ্বংস করতে হবে। আদেশ হলো কর্কটনাগের ওপর গরুড়কে দমন করার জন্য—কর্কট রাজী হলো না। হাজার হলেও সে তো তার ভাই। অভিশাপ দিলেন বাসুকি

কর্কটনাগকে—'মর্তলোকে যাও'। কর্কট বেছে নিলেন মর্তের কর্কটনগরকে। কারণ এখানে উত্তরে মধুপুরের বিষহরি ও পশ্চিমে শাকম্ভরী তাঁর শক্তি বলে গণ্য হবে। পূর্বে ও দক্ষিণে জলাশয় থাকায় এই দুইদিক রক্ষা করার দরকার হলো না—কর্কটনগরে প্রচারিত হলো নাগপূজা—কর্কটনাগপূজা।

ঝাঁকলাই নাগ :

ভাতার থানার ৭৬নং পোষলা—এক প্রাচীন গ্রাম। আয়তন ৪৫২·৪২ হেক্টর। লোকসংখ্যা ১৬৩৬, এদের মধ্যে তপসিলী ও উপজাতির সংখ্যা যথাক্রমে ৭২৯ ও ১৪। গুসকরা বলগনা বাসে বলগনায় নেমে উত্তরে হাঁটাপথে মাইল দুই গেলেই এই গ্রাম। গ্রামটির খ্যাতি ঝাঁকলাই নাগের জন্য। ঝাঁকলাই এক অদ্ভুত নাগ—মানুষের সঙ্গে এর সহাবস্থান—কাউকে কামড়ায় না, কারো কোন ক্ষতি করে না। বরং এই নাগ যে গ্রামে আছে সেই গ্রামে বিষধরের দৌরাত্ম্য নাই। আষাঢ় মাসের নাগপঞ্চমীতে গাছতলায় ঝাঁকলাই নাগের পূজা হয়। তবে ঝাঁকলাই নাগ হলেও অষ্টনাগের কেউ নয়। আষাঢ় মাসে ঝাঁকলাই-এর পূজার আগে গ্রামের কোন বউ থাকতে পারে না আবার গ্রামের যারা মেয়ে তাদেরকে নিয়ে আসতে হয়। সে এক কাহিনী। অতীতে কোন একসময় পূজার আগে এক ঝাঁকলাই, এক গৃহস্থের উনানের ভিতর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিল—বাড়ীর নতুন বউ সেই উনানে আগুন ধরিয়ে দেয়, যন্ত্রণায় ছটপট করতে করতে ঝাঁকলাই উনান থেকে বেরিয়ে পড়ে। সেই সময় বাড়ীর এক মেয়ে দেখতে পেয়ে বৌদিকে ভর্ৎসনা করে ঠাণ্ডা দুধ ঝাঁকলাই-এর উপর ঢেলে দেয়। ঝাঁকলাই-এর জ্বালা জুড়িয়ে যায়। সেই রাতেই ঝাঁকলাই গৃহকর্ত্রীকে স্বপ্ন দেয়—বউদের বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিতে আর মেয়েদের গ্রামে নিয়ে আসতে। সেই থেকেই দীর্ঘদিন এই প্রথার মান্যতা ছিল। এখন আর কেউ মানে না।

পূজার দিন ঝাঁকলাই-তলায় গ্রামবাসী নৈবেদ্য নিয়ে হাজির হয়; নৈবেদ্য হয় দুধ, কলা, চিঁড়ে, ফল, মিষ্টান্ন আর দুধের সঙ্গে থাকে একটুকরো উচ্ছে। নিবেদনের পর এই দুধ-উচ্ছে এক ফোঁটা করে সকলের মুখে দেওয়াই রীতি। তবে নাগপঞ্চমীর দিন এই দুধ-উচ্ছে মুখে দেওয়া জেলার অন্যত্রও দেখা যায়। ঝাঁকলাই-এর পুজোর দিন শাক, বিশেষ করে পাটশাক বা লাল্‌তে শাক, কচু, ডিম, পুঁই, বিরিকলাই-এর ডাল—এসব খাওয়া নিষেধ। এ-প্রথা এখনও জেলার সব গ্রামেই মানা হয়। আগে ঝাঁকলাই-এর পুজো করতো বাগদী-সম্প্রদায়ের লোকেরা এখন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের ওপর এ-পূজার ভার পড়েছে। পূজা উপলক্ষে

গ্রামে ঝাঁপান হয়—সাপুড়েরা সাপ নিয়ে খেলা দেখায়। পোষলা ছাড়াও মুসুরি, পলসোনা, নিগন অঞ্চলে ঝাঁকলাই-এর পূজা ও সাপ খেলানো হয়। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করার মত—যেখানে ঝাঁকলাই-এর পূজা হয় সেখানে বিষধর সাপ সাধারণত দেখা যায় না। জানি না, ঝাঁকলাই-এর সঙ্গে বিষধর সাপের কোন সাপে-নেউলে সম্পর্ক আছে কিনা। ঝাঁকলাই-এর পুজো হয় শাস্ত্রীয় মতে, মনসার "দেবীমম্বাং অহীনাং শশধর বদান্যাম্..." এই মনসার ধ্যানে। পূজা উপলক্ষে হাঁস-পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। ঝাঁকলাইও এখন আর্যদের বলয়ে স্থান করে নিয়েছে। এই পূজায় গ্রামের ইতর-ভদ্র সকলেই অংশগ্রহণ করে।

উষাগ্রামের ঘাঘর চণ্ডী :

আসানসোল থানার ৩৭নং মহীশীলা মৌজার মধ্যে উষাগ্রাম। গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ঘাঘর চণ্ডী, স্থানীয় লোকের কাছে ঘাঘর বুড়ী। আসানসোল রেল স্টেশন থেকে মাইল চারেক দক্ষিণে নুনিয়া নদীর তীরে এক বিরাট বৃক্ষের নীচে ঘাঘর বুড়ীর অধিষ্ঠান। দেবীর মূর্তি বলতে তিনটি ৫/৬ ইঞ্চি ডিম্বাকৃতি শিলা—চোখ, মুখ বা মূর্তির কোন চিহ্ন ছিল কিনা বোঝা যায়নি। গোটা শিলাই সিঁদুর লিপ্ত। এই শিলাই ঘাঘর চণ্ডী বলে চণ্ডীর ধ্যানে পূজিতা হন। পূজারী গ্রামস্থ চক্রবর্তী ব্রাহ্মণরা। দেবীর নিত্যসেবার ব্যবস্থা আছে—তবে শনি/মঙ্গলবারে বিশেষ পূজা—সেইদিন ভক্তের সংখ্যাও বেশী। দেবী জাগ্রতা বলেই স্থানীয় লোকেদের দৃঢ় বিশ্বাস। স্থানীয় লোকেদের ধারণা পূজারী শনি/মঙ্গলবারে যে স্বপ্নাদ্য ওষুধ, মাদুলি, কবচ দেন, তাতে যে কোন রোগ নিরাময় হয়ে যায়। দেবীর কবচ ধারণ করলে বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হয়, মরুঞ্চে নারীর পুত্র বাঁচে, তাছাড়া ছেলেদের হাম মিলমিলে হলেও দেবীর স্বপ্নাদ্য ওযুধে সমস্ত সেরে যাবে বলে স্থানীয় লোকের ধারণা। পৌষসংক্রান্তিতে দেবীর মহাপূজা ও মেলা বসে। হাজার হাজার লোক মেলায় সমবেত হয়। বেশীর ভাগই তপসিলী ও উপজাতি সাঁওতাল। শতাধিক নারী তাদের মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ায় মানসিক দিতে আসে। আবার অনেক নারী আসে মায়ের নির্মাল্য ও কবচ নিয়ে নিজেদের মনোবাসনা পূরণের আশা নিয়ে। মহাপূজায় শতাধিক ছাগবলি হয়। দেবীর পূজা হয় শাস্ত্রীয় মতে চণ্ডীর ধ্যানে।

ঘাঘর চণ্ডীর কাছে আজও কিছু নারী আসে সন্তান লাভের আশায়— কিছু মরুঞ্চে নারী আসে নবজাতকের আয়ুষ্কামনায়; কিছু অভাবী মানুষ আসে তাদের অভাব প্রশমনের কামনা নিয়ে, কিছু নির্ধন আসে ধনী হবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে—যেমন এসেছিলেন এই অঞ্চলেরই কাঙাল চক্রবর্তী।

সে কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ঘাঘর চণ্ডীর আবির্ভাবের কাহিনী। কিংবদন্তীর কাঙাল চক্রবর্তী ছিলেন বর্তমান চক্রবর্তী বংশের পূর্বপুরুষ। কাঙাল চক্রবর্তী নামেও কাঙাল আবার অর্থেরও কাঙাল। অভাবের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ খুঁজতে এলেন নুনিয়া নদীর তীরে। নদীর তীরে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে নদীর তীরে এক বিশাল গাছের তলায় বিশ্রাম নিতে এসে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের মধ্যেই স্বপ্ন দেখেন এক ঘাঘরা পরা বুড়ি তাঁকে বন্ধ্যা নারীর বন্ধ্যাত্ব মোচনের আর হাম মিলমিলে নিরাময়ের ওষুধ বলে দিচ্ছেন। আর বললেন সেই গাছেই তাঁর অবস্থান; সেখানেই তিনি নিত্যপূজা করলে তাঁর অভাব দূর হবে। স্বপ্নের মধ্যেই দেখেন গাছের মধ্যেই দেবী অন্তর্হিত হলেন। হঠাৎ স্বপ্ন ভেঙে গেল—দেখলেন হাতের কাছেই তিনটি উজ্জ্বল ডিম্বাকৃতি শিলা। এ শিলা তো এখানে ছিল না। ভাবলেন ইনিই চণ্ডিকা। সঙ্গে সঙ্গে নদীতে স্নান করে চণ্ডীদেবীর ধ্যানে দেবীকে পূজা করলেন, পাশেই কিছু গুল্ম দেখলেন। এই গুল্ম দিয়ে মাদুলি তৈরী করে বন্ধ্যাত্ব মোচনের আর হাম মিলের ওষুধ দিতে লাগলেন। বন্ধ্যা নারী পুত্র পেল, হাম মিলমিলে রোগী নিরাময় হলো—ঘাঘরা পড়া চণ্ডীর মাহাত্ম্য চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। চক্রবর্তী মশাই দেবীর নামকরণ করলেন—ঘাঘর বুড়ী। আজও পৌষ সংক্রান্তিতে মহা ধুমধাম সহকারে মায়ের বার্ষিক পূজা হয়। ষোড়শোপচারে পূজা, শযে শয়ে পাঁঠা বলি হয়, হোম হয়, মেলা বসে। মেলার জন্যে তখন নির্দিষ্ট ছিল সতের বিঘা জমি। এখন আস্তে আস্তে মেলার পরিসর কমে আসছে—কিছু স্বার্থান্ধ মানুষের অর্থগৃধ্নুতা এই লোকসংস্কৃতির পীঠস্থানকে গ্রাস করছে।

ঘাঘরা বুড়ী জেলার লৌকিক দেবীবলয়ের ব্রাত্য পর্যায়ের—দেবীকৌলিন্য নাই কিন্তু জেলার লোকসংস্কৃতির অঙ্গনে ঘাঘরা বুড়ীর মধ্যে যে অতীতের কৃষ্টির স্মৃতি লুকিয়ে আছে—সে কথা অস্বীকার করা যায় না। তবে চক্রবর্তী পরিবারের কাহিনী যাই হোক আমার মনে হয়, ঘাঘর বুড়ী অতি প্রাচীন দেবী—আসানসোল অঞ্চল যখন জঙ্গলে পূর্ণ ছিল যখন জঙ্গলের মধ্যে ছিল আদিবাসীদের অবাধ সঞ্চরণ; সেই সময়ের এই বৃক্ষদেবতা ও অস্ট্রিক জাতির বৃক্ষপূজা ও প্রস্তর পূজার টোটেমের স্মৃতি বহন করছে ঘাঘরবুড়ী। এই উৎসবের মধ্যে আদিম ও আপাত অবোধ্য প্রথার অবশেষ এই ঘাঘরবুড়ী তার অস্তিত্বের পরিচয় বহন করছে। তাই পৌষ সংক্রান্তিতে ঘাঘর বুড়ী মহাপূজায় সাঁওতাল আদিবাসীর ভিড় আজও অব্যাহত আছে। আজও তারা মাদল বাজিয়ে মেলায় আসে, হেলে দুলে নাচে, গান গায়। পরে জঙ্গল পরিষ্কার হলো, বন কেটে বসত গড়ে উঠলো—

অনার্য সংস্কৃতির ধারাকে আর্য সংস্কৃতি গ্রাস করলো; কিন্তু ঘাঘর বুড়ী রইলো উপজাতি সংস্কৃতির স্মারক হিসেবে।

কালিপাহাড়ী মঞ্জুলার ব্রাহ্মণী :

ভাতার থানার ৭৪নং কালিপাহাড়ী-মঞ্জুলা দুই পাশাপাশি গ্রাম—গ্রামটি অখ্যাত, পূর্বে ভাল রাস্তা ছিল না; গ্রামের মধ্যে বর্ষাকালে ঢুকতে হলে 'ভক্তিমান' এঁটেল মাটির কাদা পায়ে লাগলে আর ছাড়তে চাইতো না। এখন অবশ্য কিছুটা উন্নত হয়েছে, রাস্তাঘাট অনেকটা ভাল হয়েছে। কালিপাহাড়ীর আয়তন ৪২৩.৪৮ হেক্টর, লোকসংখ্যা ২৫৩২, তপসিলী ৮৯৭, আদিবাসী ২৮৮। বলগনা বাসস্টপ থেকে মাইল দুই কাঁচা রাস্তায় হাঁটাপথে পশ্চিমে গেলে গ্রামে পৌঁছান যায়। তবে গ্রামে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দুই-এক ঘর আছেন। আর আছেন গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ব্রাহ্মণী। ১ ফুট উঁচু শিলাময়ী হংসারূঢ়া ব্রাহ্মণী দেবী। আষাঢ় মাসের কৃষ্ণনবমী তিথিতে দেবীর বাৎসরিক পূজা হয় ষোড়শোপচারে। বলিদান হয় আবার ছোটখাট মেলাও বসে।

ব্রাহ্মণী দেবী মনসারই অন্যরূপ—"ওঁ দেবীম্ অম্বাম অহীনাং শশধরবদনাং, চারুকান্তিবদান্যাং, হংসারুঢ়াম্"। মনসার মত ব্রাহ্মণীও হংসারূঢ়া শশধর বদনা। মনসার ধ্যানেই পূজা হয়। এই পূজাকে কেন্দ্র করে গোটা গ্রাম সরগরম হয়ে ওঠে। গ্রামের যে যেখানে থাকে সব এই পুজোর সময় জড় হয়। ব্রাহ্মণী অতি প্রাচীন দেবী। কালিপাহাড়ী মঞ্জুলা থেকে যে নালার মূলধারা মঙ্গলকোট ও কাটোয়া থানার সীমারেখা রচনা করে খড়ি নদীতে মিশেছে তার নাম ব্রাহ্মণী নদী। ব্রাহ্মণী দেবীর নাম অনুসারেই নদীর নাম। এই ব্রাহ্মণী নদী ১৯১০ সালে বর্ধমান গেজেটিয়ারে উল্লিখিত—The Bramhian atributary of the Bhagirathi rises in the ricefields to the south of Mangolkot PS. Thence it flows eastwards in a circuitous course and eventually enters the Bhagirathi at Dainhat. রেনেলের মানচিত্রেও এর উল্লেখ আছে। কাজেই ব্রাহ্মণীদেবীর প্রাচীনত্ব এই নদীর দ্বারাই প্রমাণিত।

এই প্রসঙ্গে আর এক ব্রাহ্মণীদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় "সেকালের কথায়" (১৪ই আগস্ট ১৮১৯ ও ২৭শে নভেম্বর ১৮১৯)। এই ব্রাহ্মণী অধিষ্ঠিতা পূর্বস্থলী থানার ব্রাহ্মণীতলায় (মৌজা জাহান্নগর ৯১)। নবদ্বীপের মাইল চারেক উত্তর পশ্চিমে ভাগীরথীর দক্ষিণতীরে। ভোলানাথ চন্দের Travels of a Hindu গ্রন্থে এই মূর্তিকে দুর্গামূর্তি বলা হয়েছে। 'সেকালের কথা' সংবাদ সংকলন গ্রন্থে এই মূর্তিকে চাঁদ সদাগরের প্রতিষ্ঠিত বলা হয়েছে—"চাঁদ সদাগরের ইতিহাস

অনেকে অবগত আছেন, সেই চাঁদ সদাগরের স্থাপিত ব্রাহ্মণী পূজা প্রতি বৎসর নবদ্বীপের পশ্চিমে জাননগর গ্রামে হইয়া থাকে তাহাতে অনুমান লক্ষ লক্ষ লোক জমা হয় ঐ দিনে''...

চাঁদ সদাগরের প্রতিষ্ঠিত দেবী মনসা না হওয়াই স্বাভাবিক; ভোলানাথ চন্দও এ মূর্তিকে দুর্গামূর্তি বলেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বর্তমানে ব্রাহ্মণীতলায় ব্রাহ্মণীর যে পূজা হয় সেটির বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয় শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে ও এই উপলক্ষে ঝাপান হয়। এর থেকে অনুমান হয় পূর্বে ব্রাহ্মণী তলার ব্রাহ্মণী দুর্গারূপে পূজিতা হলেও বর্তমানে মনসারূপেই পূজিত হচ্ছেন। ড. অশোক মিত্র সম্পাদিত 'পশ্চিম বাংলার পূজা-পার্বণ' গ্রন্থে জাহান্‌নগরের বিবরণে আছে—গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাটি প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়। জনশ্রুতির চাঁদ সদাগর নাকি এই গ্রামেই সর্বপ্রথম মনসা পূজা করেন। কিন্তু মনসামঙ্গলে যে বিবরণ তাতে দেখা যায় চাঁদ, বেহুলা ও সনকার বিশেষ অনুরোধে চম্পানগরে পশ্চিমমুখে বসে বাম হাতে ফুল নিয়ে 'জয় ভেবী বলো বান্যা দেই পুষ্পপানী।' কিন্তু দৈবের লিখন চাঁদ দেবী না বলে 'ভেবী' বলতে চাইলেও উচ্চারণকালে 'দেবী'ই উচ্চারিত হয়। মনসামঙ্গলের এই কাহিনী স্বীকার করলে জাহান্নগরে চাঁদ প্রথম মনসা পূজা করেন সে কাহিনী ধোপে টেকে না। যাই হোক ব্রাহ্মণী বর্তমানে মনসারূপেই পূজিত হচ্ছেন সে তথ্য ব্রাহ্মণীতলার ক্ষেত্রে যেমন সত্য কালিপাহাড়ী মঞ্জুলার ক্ষেত্রে তেমনই সত্য।

বোঁয়াই-এর বসন্তচণ্ডী :

খণ্ডঘোষ থানার ৩৫নং বোঁয়াই এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামের আয়তন ৫৫৫.১৪ হেক্টর। লোকসংখ্যা ৩২৫২, এদের মধ্যে তপসিলী ১৩৩৬, উপজাতি নাই বললেই হয় মাত্র ২২। গ্রামে আগে ২১টি পাড়া ছিল—ব্রাহ্মণপাড়া, আচার্যপাড়া, বাগ্‌দীপাড়া, দিকপতিপাড়া, ডোমপাড়া, কামারপাড়া প্রভৃতি। তবে বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে এবং জাতপাতের কঠোরতা ক্রমশ শিথিল হতে থাকায় এক পাড়ার মধ্যে অন্যান্য জাতিরও অনুপ্রবেশ ঘটছে, ফলে পাড়াওয়ারি বিভাগও ক্রমশ কমে আসছে। বোঁয়াই-এর অধিষ্ঠাত্রী দেবী বসন্তচণ্ডী গ্রামের লোকের কাছে মা বসনচণ্ডী—বড় জাগ্রতা দেবী। দেবী রুষ্টা হলে বা দেবীর কোন অপরাধ হলে গ্রামে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটবে; আবার দেবীকে পূজা বলি দ্বারা সন্তুষ্ট করলে বসন্ত রোগ নির্মূল হবে বলে গ্রামবাসীদের বিশ্বাস। গ্রামবাসীদের কথায় গ্রামে আমাদের মা বসনচণ্ডী আছেন—আমাদের বসন্তর ভয়ও গেছে। গ্রামের মধ্যে মায়ের মন্দির; সেখানে অষ্টভুজা শিলাময়ী মূর্তি অধিষ্ঠিত। তবে মূর্তিটি

মোমে সিঁদুরে ঢাকা সাধারণ্যে দেখা যায় না। মায়ের দৃষ্টি বড় খর, মায়ের দৃষ্টি পড়লে গ্রাম মহামারীতে ছারখার হয়ে যাবে তাই সিঁদুর লিপ্ত। জনশ্রুতি—গ্রামটি একসময় অরণ্যসঙ্কুল ছিল। বুদ্ধিমন্ত খাঁ নামে জনৈক ব্যক্তি বনজঙ্গল কেটে প্রথম বসতি স্থাপন করেন। তারপর আস্তে আস্তে গ্রামে বসতি গড়ে ওঠে। তিনি এক রাত্রে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে বোঁয়াই গ্রাম হতে তিন কি.মি. দূরে কুলেগ্রামের (জে.এল. ৩৯) পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত রায়কা দীঘির অগ্নিকোণে একটি শেওড়া গাছের নীচে বোঁয়াই চণ্ডীর শিলামূর্তি আবিষ্কার করেন। খাঁ মশাই স্বপ্নের নির্দেশ মত শিলামূর্তিকে কাঠের চতুর্দোলায় চাপিয়ে গ্রামের প্রান্তে মাঠের প্রতি আইলের মাথায় ছাগ বলি দিতে দিতে ১০৮ ছাগবলি দিয়ে গ্রামে এনে প্রতিষ্ঠা করেন ও দেবীর নিত্যসেবার ব্যবস্থা করেন। মন্দিরে যে চতুর্দোলা রাখা আছে সেটি সেই সময়কার বলে দাবী করা হয়। গ্রামের বুদ্ধিমন্ত খাঁর বংশধররাই সেবাইত। অম্বুবাচীর সময় তিন দিন দেবীর মহাপূজা ও বলিদান হয়। এছাড়া মহানবমীর দিন দেবীর বিশেষ পূজা ও বলিদান হয়, মেলাও বসে।

দেবী বসন্তচণ্ডী মহামারী প্রতিরোধের দেবী। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় বসন্ত রোগ প্রতিরোধের পূজার ব্যবস্থা হয় চৈত্রমাসে, কোন গ্রামে রক্ষাকালীর স্থানে কোথাও বা শীতলা বা দিদি ঠাকরুনের স্থানে এই পূজার প্রচলন আছে। রায়না থানার ছোট বৈনান গ্রামে বসন্ত কলেরা মহামারী প্রতিরোধে দিদি ঠাকরুনের পূজা হয় বৈশাখ মাসের বুদ্ধ পূর্ণিমায়। ভাতার থানার কামারপাড়ায় দিদি ঠাকরুন ও বসন্তচণ্ডীর পূজা হয় চৈত্র মাসে। কিন্তু বোঁয়াই-এর বসন্তচণ্ডীর পূজা হয় আষাঢ় মাসে অম্বুবাচীতে। অম্বুবাচী পালিত হয় তিন দিন আর বসন্তচণ্ডীর পূজাও হয় তিন দিন। অম্বুবাচী পর্ব শস্য উৎপাদনভিত্তিক পর্ব—উর্বরতাকেন্দ্রিক, ধর্মধারার সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রবাদ আছে, জ্যৈষ্ঠের আট আষাঢ়ের সাত/তবে ছাড়বে মিগের বাত। মিগের বাত অর্থাৎ মেঘের বায়ু বা মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয় জ্যৈষ্ঠের শেষ আট দিন থেকে। জ্যৈষ্ঠের শেষ আট দিন ও আষাঢ়ের প্রথম সাত দিনের মধ্যে বর্ষা শুরু হয়ে যায়। জমি জলসিক্ত হয়ে ওঠে। তখন ধরিত্রীকে ঋতুমতী নারীরূপে গণ্য করা হয়। সেই উপলক্ষেই তিন দিন অম্বুবাচী পালিত হয়—এসময় লাঙ্গল দেওয়া হয় না। উনান জ্বালিয়ে মাটিকে উত্তপ্ত করা হয় না—তাই বিধবা ও ব্রাহ্মণদের অনেকে গরম কোন খাদ্য খায় না। অম্বুবাচী fertility cult এর প্রতীক। বোঁয়াই চণ্ডীকেও হয়তো প্রথমে এই উর্বরতার প্রতীক হিসেবে পূজার প্রচলন ছিল পরে কোন একসময় গ্রামে বসন্তরোগ মহামারীরূপে দেখা দিলে দেবীর কাছে মানত করে পূজা দিলে মহামারী ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়—

সেটা প্রাকৃতিক নিয়মেও হতে পারে আবার বিশ্বাসের জোরে মায়ের কৃপাতেও হতে পারে। তখন থেকে দেবী বসন্তরোগের প্রতিরোধের দেবী বলে পূজিত হতে থাকেন। আজও ভক্তদের মন থেকে সে বিশ্বাসে ছেদ পড়ে নাই।

বোঁয়াই গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে মায়ের সুবৃহৎ মন্দির অবস্থিত। মায়ের মন্দিরের নির্মাণকালে সমতল থেকে ১৫ ফুট উচ্চস্থানে ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। সম্মুখে সিঁড়ি ঘরে প্রবেশ পথের একপার্শ্বে অবস্থিত রুধির ভৈরবের চত্বর। এই চত্বরে কালোপাথরের রুধির ভৈরব শিবলিঙ্গকে রক্তস্নাত অবস্থায় দেখা যায়। দুটি হাড়িকাঠ এই চত্বরে পরপর অবস্থিত। মানত করা ছাগ বলিদানের পর রক্তস্রোতে রুধির ভৈরবের দেহসিক্ত করাই রীতি। সিঁড়ি বেয়ে আরও উপরে উঠলে বারদুয়ারী নাটমন্দির। এরপর মাতা বসন্তচণ্ডীর গর্ভমন্দির। গর্ভমন্দিরের অভ্যন্তরে সুউচ্চ প্রায় ৫ ফুটের অধিক কালোপাথরের অষ্টভুজা সিংহবাহিনী মহিষমর্দিনী মাতৃমূর্তি। দেবীর অপূর্ব মুখমণ্ডলের উপর দিকে তাঁর তিনটি নয়ন এবং কপালে সিঁদুর প্রলেপের আবরণ। দেবীর সর্বাঙ্গে অলঙ্কার দিয়ে সুসজ্জিত। মূর্তির কটিদেশ থেকে জানু পর্যন্ত বেনারসী বস্ত্র দিয়ে আবৃত। গর্ভমন্দিরের উত্তরদিকে ভোগ মন্দির। মন্দিরটি গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে এক মহাশ্মশানভূমিতে পঞ্চমুণ্ডির উপর প্রতিষ্ঠিত।

সেই সুদূর অতীতকাল থেকে প্রতিদিন বেলা ১০টার মধ্যে মূর্তিকে স্নান করানো হয়—স্নানের পূর্বে সুগন্ধি তেল বা গব্যঘৃত মাখানো হয়। এরপর নিত্য অন্নভোগ বেলা ১২টার মধ্যে। সন্ধ্যায় প্রতিদিন দেবীর সন্ধ্যারতি ও দেবীর আরাধনা কাজ সম্পন্ন করা হয়।

প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষ থেকে শ্রাবণের শেষ পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার দেবীর বিশেষ পূজার ব্যবস্থা। তাছাড়া অম্বুবাচীর চারদিন এবং আশ্বিন-কার্তিক মাসে শারদীয়া দুর্গাপূজার সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর দিন মহাপূজা। পূর্বে মহিষ বলিদান হতো এবং এই বলিদান হতো মহারাজের অর্থানুকূল্যে। জমিদারী উচ্ছেদ আইন কার্যকরী হওয়ার পর মহারাজের রাজ্যপাট গেছে, মহিষবলিও বন্ধ হয়েছে।

রুধির ভৈরবের মূর্তি শিবলিঙ্গ—শিবলিঙ্গের নিকট বলিদানের নিয়ম নাই। কিন্তু রক্তস্নাত রুধির ভৈরব মনে হয় বামন ও কালিকা পুরাণোক্ত এক ভৈরব। পুরাণের মতে পুরাকালে অন্ধকাসুরের সঙ্গে যখন মহাদেবের যুদ্ধ হয় তখন অন্ধক মহাদেবের মস্তকে পদাঘাত করলে উহা চার ভাগে বিভক্ত হয় এবং রক্তধারা নির্গত হয়। পূর্বদিকের রক্তধারা থেকে বিদ্যারাজ ভৈরব, পশ্চিমধারা হতে নাগরাজ

ভৈরব, দক্ষিণধারা থেকে কামরাজ ভৈরব ও উত্তরধারা থেকে স্বাচ্ছন্দরাজ ভৈরবের জন্ম হয়। মহাদেবের ক্ষতস্থান থেকে লম্বিতরাজ ভৈরবের উদ্ভব হয়। বোঁয়াই চণ্ডীর চত্বরে রুধির ভৈরবও বলিদানে রক্তস্রোতে স্নাত। এই রুধির ভৈরব মনে হয় বামন পুরাণের উল্লিখিত কোন এক ভৈরবের ঐতিহ্যবাহী। নানা বৈচিত্র্যময় এই লৌকিক দেবদেবী জেলার লৌকিক দেবতার বৈচিত্র্যের অন্যতম রূপ।

বসন্তরোগের দেবী বসন্তচণ্ডী ছাড়াও রয়েছেন শীতলা, দিদি ঠাকরুন। রায়না থানার ছোট বৈনানের প্রান্তে বৃক্ষতলে রয়েছেন দিদি ঠাকরুন-এর প্রতীক পোড়ামাটির ঘোড়া—একটা ছোট বেদীর ওপর প্রতিষ্ঠিত—পাশে আছে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী দু'ফুট উঁচু দেড়ফুট চওড়া শিলামূর্তি—কানে কুণ্ডল, মাথায় মুকুট, কোঁচা দেওয়া হাঁটু পর্যন্ত কাপড় পরনে। ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যার মতে এটি বিষ্ণুমূর্তি—এর ডান ও বামদিকে যে দুটি নারীমূর্তি ক্ষোদিত আছে—সে দুটিকে লক্ষ্মী-সরস্বতী বলে ড. কামিল্যা সিদ্ধান্ত করেছেন। তবে ড. কামিল্যা যাই মনে করুন গ্রামবাসীদের কাছে ইনিই দিদি ঠাকরুন—ড. পঞ্চানন মণ্ডলও বিষ্ণুমূর্তিকে দিদি ঠাকরুন হিসেবে পূজা করতে দেখে দুঃখপ্রকাশ করে বলেছিলেন—'হায় নারায়ণ! শাড়ী পরিয়ে তোমার কি দুর্দশাই না হয়েছে!' বুদ্ধপূর্ণিমার দিন এই মূর্তিকে বসন্ত মহামারীর দেবী দিদি ঠাকরুন হিসেবে পূজা করা হয়। পূজা করে বাঁকুড়া থেকে আগত মুচিরা, পুজোর নৈবেদ্য যোগায় তিলি সম্প্রদায়ের এক পরিবার। বহু পাঁঠাবলিও হয়। সম্প্রতি এক বাগ্‌দীদের মেয়ে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে মায়ের নিত্যপূজার দাবী করে, তার আবার মাঝে মাঝে ভর হয়। তবে এই 'ভর' কতটা ইচ্ছাকৃত, কতটা দৈবনির্ভর আর কতটা স্বাভাবিক সেটার বিচার গ্রামবাসীরা করে না—তারা ভরের মধ্যে দেবীর বাণী শুনে মুগ্ধ হয়—দেবীর কাছ থেকে নিজেদের ভবিষ্যৎ শুনতে চায়। ভরের মধ্যে যে ওষুধ দেয়, যে কবচের কথা বলে তাই দেয়াসিনীর কাছ থেকে সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করে। তাদের ধারণা ভরের মধ্যে দেবী দেয়াসিনীর মধ্যে আবির্ভূত হন। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।

বনপাশ কামারপাড়াতেও চক্রবর্তী পাড়ায় শ্যামসুন্দরতলায় দিদি ঠাকরুনের বেদী আছে! বেদীর ওপর দেওয়ালের মধ্যে এক ফুট বাই দেড় ফুট এক কুলুঙ্গীর মধ্যে দেবীর মূর্তি আঁকা। প্রতি বৎসর দেবীর পূজার আগে নতুন করে আঁকা হয়। গ্রামবাসীদের কারোও কাছে ইনি দিদি ঠাকরুন কারও কাছে বসনচণ্ডী। চৈত্র মাসে দেবীর বাৎসরিক পূজা হয়, নিত্যসেবা হয় না। পূজা হয় শীতলার ধ্যানে—ওঁ শ্বেতাঙ্গীং রাসভস্থাং করযুগ বিলসম্মার্জ্জনী-পূর্ণকুম্ভাম্ মার্জ্জন্যা পূর্ণকুম্ভাদমৃতময়জলং তাপশান্ত্যৈ ক্ষিপন্তীম্। দিগ্‌বস্ত্রাং মূর্দ্ধিন-সূর্পাং

কনককমনিগনৈর্ভূষিতাঙ্গীং ত্রিনেত্রানাং। বিস্ফোটাদ্যুগ্রতাপ-প্রশনমনকরণীং, শীতলাং তাং ভজামি। দেবীর মূর্তিও আঁকা হয় প্রায় শীতলার ধ্যানানুযায়ী। "প্রায়" এই জন্য যে অঙ্কিতমূর্তি কৃষ্ণাঙ্গী ধ্যানানুযায়ী শ্বেতাঙ্গী নয়। পূজা হয় ষোড়শোপচারে, বলিদান হোম সবই হয়।

এই গ্রামের সরানধাবে বাগদীদের বাড়ীতে বসন্তচণ্ডীর পূজা হয়। সেখানেও পাকা রাস্তার ধারে মাটির ঘরে পোড়ামাটির ঘোড়াকে প্রতীক করে বসন্তচণ্ডীর পূজা হয়। শনি/মঙ্গল বারে বিশেষ পূজার ব্যবস্থা। জটাজুটধারিণী বাগদীদেরই এক মহিলা দেয়াসী, তিনিই পূজারী। বার্ষিক পূজা হয় চৈত্র মাসে কোন শনি বা মঙ্গলবারে। দেয়াসী গ্রামের সকলের কাছে পূজার জন্য অর্থ চাল সংগ্রহ করে পূজার খরচ চালান। জামালপুর থানার চক্ষানজাদিতে ফাল্গুনে, রায়না থানার মাছখাড়ায় মাঘ মাসে, নতু গ্রামে পৌষ সংক্রান্তিতে, শুকুর গ্রামে অগ্রহায়ণ মাসে, বর্ধমান থানার ভিটাগ্রামেও ওলাইচণ্ডী পূজা হয়। অধিকাংশ স্থানে পোড়ামাটির ঘোড়া হয় দেবীর প্রতীক। সাধারণত শনি বা মঙ্গলবারেই বিশেষ পূজা হয়ে থাকে। কলেরা মহামারী থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য জেলার অনেক স্থানে ওলাইচণ্ডীর থানের সংলগ্ন গাছে 'ঢেলা' বাঁধা মানত করা হয়। কোথাও কোথাও আবাব হরিনাম সংকীর্তনেরও ব্যবস্থা করা হয়। কলেরা না হোক আন্ত্রিক রোগের প্রকোপ দিন দিন বেড়েই চলেছে। কাজেই বসন্তচণ্ডীর প্রতাপ অনেকটা কমে গেলেও ওলাইচণ্ডী বা ওলাবিবির পূজার প্রচলন অব্যাহতই আছে। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর মতেও লৌকিক দেবকুলের মধ্যে ওলাইচণ্ডীর বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেখানে এককালে পল্লী ছিল, সেখানে শহর গড়ে উঠেছে, লোকের রুচির পরিবর্তন ঘটেছে, শাস্ত্রীয় দেবতাদের প্রভাবে অবৈদিক, অস্মার্ত্ত, অব্রাহ্মণ্য বহু লৌকিক দেবতা নগরসমাজে হীন হয়ে পড়েছে কিন্তু এই দেবী পল্লী অঞ্চল থেকে আরম্ভ করে বহু উন্নত জনপদে আজও স্বমহিমায় বিরাজমান।

ইন্দ্রপূজা (ভাঁজো) :

কেতুগ্রাম থানার কাঁদড়া গ্রামে ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে সন্ধ্যাকালে গ্রামের বড় মণ্ডপতলায় ইন্দ্রপূজার অনুষ্ঠান হয়। ইন্দ্র শস্য ও বৃষ্টির দেবতা— এরূপ মত প্রচলিত আছে। স্বর্গরাজ্যের যিনি অধিপতি হতেন তিনিই ইন্দ্র উপাধি লাভ করতেন। ইনি আদিত্যগণের অন্যতম। ইনি সংবর্ত পুষ্কর প্রভৃতি মেঘের অধীশ্বর বলে মর্তের রাজন্যবর্গ এবং ঋষিগণ শস্য ও অন্নের প্রাচুর্যকামনায় ইন্দ্রের অর্চনা করতেন। যদিও গ্রামে যে ইন্দ্রপূজা হয় তা দেবরাজ ইন্দ্রের ধ্যানেই শাস্ত্রীয়

মতে ঘট স্থাপনা করে হয়। তবু ইনি গ্রামের গৌণ লৌকিক দেবতা। পূজা করেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত—'ওঁ শক্রঃ সুরপতিশ্চৈব বজ্রহস্তমহাবলঃ / শচীপতিশ্চ ধ্যাতব্যো নানাভরণভূষিতঃ মন্ত্রে ধ্যান করে 'ওঁ নমঃ মহেন্দ্রায়' মন্ত্রে পূজা করেন। কোন কোন স্থানে শাল গাছ পুঁতে ধ্বজ তৈরী করে ইন্দ্রের প্রতীক হিসেবে এর পূজা হয়। পুরোহিতেরা একে ইন্দ্রধ্বজ বলে প্রচার করেন। পৌরাণিক অভিধানে ইন্দ্রধ্বজের বিবরণ আছে। কাহিনীটি এই রূপ—"দেবাসুরের যুদ্ধে পীড়িত দেবতারা ব্রহ্মার স্তব করেন। ব্রহ্মা তুষ্ট হয়ে বললেন—ক্ষীরোদ সাগরে গিয়ে নারায়ণের স্তব করলে দেবতারা একটা ধ্বজ পাবেন। এই ধ্বজ বংশদন্ডে যুক্ত ও ইন্দ্রের দ্বারা পূজিত হয়ে অসুর নাশে সাহায্য করবে। নারায়ণ দেবতাদের স্তবে তুষ্ট হয়ে সেই ধ্বজ দিলেন। তার সাহায্যে দেবতারা অসুরদের পরাস্ত করেন। নারায়ণ আরো বললেন যে, যে রাজা ইন্দ্রধ্বজের পূজা করবে তাঁর রাজ্য শস্যপূর্ণ হবে, সেখানে প্রজা বৃদ্ধি পাবে এবং প্রজারা নীরোগ হবে। ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে রাজ্যের বিঘ্নশান্তি ও প্রজাবৃদ্ধির কামনায় রাজারা পূর্বে ইন্দ্রের প্রীত্যর্থ এই ধ্বজ বিধিমত পূজা করে প্রোথিত করতেন। পরে বৈধানুষ্ঠান সহ ঐ ধ্বজ বিসর্জন দেওয়া হয়।"

এই তো গেল ইন্দ্রপূজার পৌরাণিক সূত্র। এই জেলায় এই ইন্দ্রকে নামিয়ে এখন লৌকিক দেবতায় পরিণত করা হয়েছে। এখন রাজাও নাই আর তাঁর রাজ্যও নাই। তাই গ্রামের মানুষ নিজেদের মঙ্গলের জন্য ইন্দ্রের পূজার আয়োজন করে। সন্ধ্যাবেলা ষোড়শোপচারে পূজা হয়, ছাগবলি হয়, হোম হয়। ছাগবলির পর সেই জায়গার মাটি নিয়ে গ্রামবাসীরা একটা মাটির পাত্রে শস্যবপন করে। এরপর সাত দিন শুদ্ধভাবে তাতে জল সিঞ্চন করতে থাকে। এই সাতদিনে ঐ মাটির পাত্রে বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম হলে অষ্টম দিনে ঐ সব মাটির পাত্রগুলি পূজামণ্ডপে রেখে আসা হয়। গ্রামের পাঁচ থেকে বার/তেরো বছরের মেয়েরা ঐ সব পাত্রের চারদিকে বাজনার তালে তালে গান করতে করতে নাচতে থাকে। এরপর দুপুরবেলা চিঁড়ে, খই, মিষ্টান্ন দিয়ে ভোগ সাজিয়ে ঐ সব অঙ্কুরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়। সেই প্রসাদ সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয়। গ্রামীণ ভাষায় এই উৎসবের নাম ভাঁজো।

এই পুজো আদিতে ছিল আদিবাসীদের পুজো। এই ইন্দ্রপুজোর দিন আজও মানভূম ও মেদিনীপুরের সাঁওতালরা চাষের জমিতে ইন্দ্রধ্বজের প্রতীক শালগাছ পুঁতে পুজো দেয়। ভাদ্র মাসে মল মাস হলে কখনও কখনও আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই পুজোর সঙ্গে সাঁওতালদের "ছত্তা বোঙার"

পুজো বা ছাতমপরবের সাদৃশ্য আছে। বর্তমানে এই ইন্দ্রপুজোর মধ্যে প্রাচীন কালের অস্ট্রিক সংস্কৃতির সঙ্গে ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির ঘটেছে সমন্বয়। প্রাচীন কালে খন্দ জাতিরা মাঠে শস্য রোপণের পূর্বে ভালো শস্যের আশায় মাঠে নরবলি দিত। সরকার আইন করে এই প্রথা বন্ধ করে দেয়। আজ গ্রামবাসীরা নরবলির ঐতিহ্য বজায় রাখতে ছাগবলি দেয় আর সেই রক্তমিশ্রিত মাটি মালসায় রেখে শস্যের অঙ্কুরোদ্‌গম ঘটায়। এই শস্যভিত্তিক উৎসব আজ ইন্দ্রপুজো নামে খ্যাত। সরায় রক্তমাখা মাটি নিয়ে তাতে বীজ পোঁতাকে ভাঁজো পাতা বলে। টুসুর উপলক্ষ যেমন আমন ধান, ভাঁজোর উপলক্ষ তেমনি আউস ধান। ভাঁজো আউস ধানের মরশুমের দেবী। ভাদ্র মাসে এই পুজোর মধ্যে অনেকে ঋতুবন্দনার একটা ধারা লক্ষ্য করেছেন। ভাদ্র থেকে শরৎকাল আরম্ভ, আউস ধান কাটার সময় আর ভাদ্র থেকে ভাজো। ভাজো নাসিক্যভবনের মাধ্যমে ভাঁজো হওয়াও বিচিত্র নয়। ভাঁজো ব্রতে ক্রিয়া দিয়ে এর সূচনা আর নৃত্যগীতে এর সমাপ্তি। এ সম্বন্ধে 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশদ আলোচনা করেছেন।

সে যে ক্রিয়াটা করছে তাতে সত্যিই ফসল ফলিয়ে যাচ্ছে এবং ফসল ফলার যে আনন্দ সেটা নাচগান এমনি নানা ক্রিয়া প্রকাশ করছে। বর্ধমান অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে এই শস্ পাতার ব্রত বা ভাঁজো ভাদ্র মাসের মন্থন-ষষ্ঠী থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী শুক্লা-দ্বাদশীতে শেষ হয়। মন্থন-ষষ্ঠীর পূর্বদিন পঞ্চমী তিথিতে পাঁচ রকমের শস্য (পাঁচ কলাই) মটর, মুগ, অড়হর, কলাই, ছোলা— একটা পাত্রে ভিজিয়ে রাখা হয়। পরদিন ষষ্ঠীপূজায় এইগুলি নৈবেদ্য দিয়ে বাকী শস্য সরষে এবং ইঁদুর মাটির সঙ্গে মেখে একটা নতুন সরাতে রাখা হয়। দ্বাদশী পর্যন্ত মেয়েরা স্নান করে প্রতিদিন এই সরাতে অল্প অল্প জল দিয়ে চলে, চার পাঁচ দিন পরে যখন শস্য সব অঙ্কুরিত হতে থাকে তখন জানা যায় এ বৎসর প্রচুর শস্য হবে এবং মেয়েরা তখন শস্য উৎসবের আয়োজন করে। ইন্দ্র দ্বাদশীতে এই উৎসব; চাঁদের আলোতে উঠোনের মাঝখানে এই অনুষ্ঠান। নিকানো বেদির উপর ইন্দ্রের বজ্র দেওয়া আলপনা, কোথাও মাটির ইন্দ্র মূর্তিও থাকে। এই বেদির চারদিকে পাড়ার মেয়েরা সকলে আপন আপন শস্ পাতার সরাগুলি সাজিয়ে দেয়, তারপর সাত-আট থেকে কুড়ি পঁচিশ বছরের মেয়েরা হাত ধরাধরি করে বেদির চারদিক ঘিরে নাচগান শুরু করে। উঠানের এ অংশে পর্দার আড়ালে বাদ্যকর তাল দিতে থাকে।

ভাঁজো লো কল্‌কলানি, মাটির লো সরা,
ভাঁজোর গলায় দেবো আমরা পঞ্চ ফুলের মালা।

এক কলসি গঙ্গাজল এক কলসি ঘি,
বছরান্তে একবার ভোঁজো নাচব না তো কি?

এরপর দুই দলে ভাগ হয়ে মুখে মুখে ছড়া কাটাকাটি করে। ...এরপরে রাত্রি শেষ; মেয়েরা আপন আপন শস্ পাতার সরা মাথায় নিয়ে পুকুরে কিংবা নদীতে বিসর্জন দিয়ে ঘরে আসে। এখানে শস্যের উদ্গমের কামনা সরাতে শস্যবপন ক্রিয়া থেকে আরম্ভ হলো এবং অনুষ্ঠান শেষ হলো উৎসবের নৃত্য গীতে।" মেয়েদের এই নাচের সঙ্গে সাঁওতালদের করম উৎসবের নৃত্যের অনেকটা মিল আছে। তাদের ইঁদ পূজা বা করম উৎসব আসলে শস্য উৎসব। কোথাও কোথাও গ্রামের ছেলেরা এই ইন্দ্র-দ্বাদশী তিথিতে বনভোজনের ব্যবস্থা করে, গৃহস্থের বাড়ী থেকে জিনিসপত্র চুরি করে। ডাব, নারিকেল, সব্জী, শাক, পুঁই এই সব চুরি করে, তাদের বিশ্বাস এই রাত্রে চুরি করলে চৌর্য অপরাধের পাপ হয় না।

এই প্রসঙ্গে ড. পল্লব সেনগুপ্তের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। "হিন্দুসমাজে প্রচলিত পরবগুলি বহুলাংশেই আদিবাসী পার্বণের সমধর্মী বা অনেক সময়েই এক বা অন্যরূপ উৎসজাত হলেও দুয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। হিন্দু পার্বণগুলোর মধ্যে লোকায়ত এবং শাস্ত্রীয় এ দ্বিবিধ সংস্কারেরই মিশ্রণ ঘটেছে, আদিবাসী উৎসবগুলির মধ্যে যা ঘটেনি এবং এর ফলে হিন্দুপার্বণগুলির মৌলিক রূপ অনেক বেশী জটিল হয়ে উঠেছে।"

জাদুতে ও লৌকিক ক্ষমতা বিষয়ে দেবীসত্তায় ও অন্যান্য অনুরূপ বিষয়ে বিশ্বাস হলো পূজা-পার্বণের অন্তর্নিহিত পরিচালিকা শক্তি। গাছ, ফুল, পাতা, অরণ্য, নদী, পাহাড়, পাথর, ঢেলা, আকাশ, বাতাস, জল, আগুন, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি নিসর্গের নানা বস্তুর মধ্যে দেবী বা অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করে তাদেরকে মাহাত্ম্যময় এবং ভাল মন্দ করার জাদুশক্তি সম্পন্ন বলে মনে করা হয়েছে; এরাই হয়েছে দেবতা। ইন্দ্র পূজা এই রকমই এক বৃক্ষ ও শস্য দেবতার পূজা। আত্মরক্ষা ও আত্মকল্যাণার্থেই মানুষের কল্পনা ও বিশ্বাসেই গ্রাম দেবতার উদ্ভব। আত্মরক্ষার তাগিদ যখন কমে যায় দেবীর প্রতি বিশ্বাসেও তখন ভাটা পড়তে শুরু করে। Laksmi Shastri Joshi বোধহয় ঠিকই বলেছেন—with the rise of science and rationalism in the modern age, religion has been relegated to a secondary position. Religion has in fact been superceeded by a newer conception of the world and life.

(Translated by S. R. Nene—Statesman 24.4.99)

বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে পল্লীর উন্নত সমাজ আদিবাসী সমাজ থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পল্লীর রক্ষণশীল সমাজে আদিম যুগের সেই শস্য ও বৃক্ষদেবতা বহাল তবিয়তে পূজা পেয়ে আসছে। এ সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায়ের তথ্য প্রণিধানযোগ্য। চব্বিশ পরগনার জেলা গেজেটে O'Malley এই বৃক্ষপূজার উল্লেখ করেছেন।

A curious form of survival of tree worship which is still practised in the district under the name of Dhelai Chandi was discovered a few years ago by Mahamahopadhyay Hara Prosad Shastri. এ জেলাতেও উষাগ্রামের ঘাঘর চণ্ডীর পূজা প্রকৃত প্রস্তাবে বৃক্ষদেবতার পূজা, মন্তেশ্বর থানার বাউল পাড়া, তেঁতুলিয়া, শুশুনী, পূর্বস্থলী থানার জাহান্নগর ও জেলার বহু স্থানে নিম্নশ্রেণীর মানুষ সিজু গাছকে প্রতীক করে যে মনসা পূজা করে সেও বৃক্ষপূজা। তাছাড়া জেলার অনেক স্থানে বৃক্ষকে প্রতীক করে ঢেলাইচণ্ডী, কলাইচণ্ডী রূপাইচন্ডীর পূজার প্রচলন আছে। সাঁওতালরা আজও করম পরবে করম বৃক্ষের শাখাকে পূজা করে। অনেক স্থানে বৃক্ষতলে মাটির স্তূপকে ঢেলাইচণ্ডী বলে পূজা করা হয়। এখানে মাটির ঢেলাই নৈবেদ্য রূপে ব্যবহৃত হয়।

দুর্গাপূজার ষষ্ঠীর বোধনে যে বিল্ববৃক্ষের পূজা হয় ও কলাগাছ, কচুগাছ, হলুদগাছ, জয়ন্তীগাছ, বিল্বডাল, ডালিমডাল, অশোকডাল, মানকচুগাছ, ধানগাছ, শ্বেত অপরাজিতার লতা, কলার পেটো দিয়ে নব পত্রিকা তৈরী করে যে পূজা হয় সেখানে অষ্ট্রিক বৃক্ষদেবতার শাস্ত্রীয়, বৃহন্নন্দিকেশ্বর পৌরাণিক দেবত্বের কৌলীন্য প্রাপ্তি ঘটেছে।

কুলনগরের কুলচণ্ডী :

ভাতার থানার কুলনগর (জে.এল. ৯৫) ও কুলচণ্ডা (৬৫) পাশাপাশি গ্রাম। কুলনগরের আয়তন ২৮৮.২৯ হেক্টর, আর কুলচণ্ডার আয়তন ৩১৩.৩৯ হেক্টর। লোকসংখ্যা যথাক্রমে ১৪২৫ ও ১৯০০। কুলনগরের খ্যাতি কুলচণ্ডী বা কুলাই চণ্ডী দেবীর মাহাত্ম্যের জন্য। দেবীমূর্তি অধিষ্ঠিতা কুলনগরে তবে কুলচণ্ডাতেও দেবীর নিত্যপূজা ও বাৎসরিক পূজা হয়, তবে ঘট স্থাপন করে। কুলনগরে দেবীর যে মূর্তি আছে সেটি দেবীর পূর্ণাঙ্গ মূর্তি নয়—উর্ধ্বাঙ্গ মাত্র। নিম্নাঙ্গ এ গ্রামে নাই। নিম্নাঙ্গের পূজা হচ্ছে কুলনগরের উত্তরে উষাগ্রামে। সে এক কাহিনী। কুলচণ্ডীর বর্তমান সেবাইত গিরিজা মুখোপাধ্যায়দের পূর্ব পুরুষদের আদি বাসস্থান ছিল ভাতার থানারই এরুয়ার গ্রামে। কুলচণ্ডী ছিলেন মুখার্জী পরিবারের আরাধ্যা

দেবী। তারপর ১৭৪০-'৪১ খ্রীষ্টাব্দে বর্গী আক্রমণের সময় দেবীকে বর্গীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য দেবীকে নিয়ে মুখার্জী পরিবারের আদি পুরুষ এরুয়ার ত্যাগ করে ভাতার গ্রামের সন্নিকট কাঁটা বিষ্ণুপুরে এসে বসতি করেন ও সেইখানেই দেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন। বর্গী আক্রমণের আতঙ্ক দূরীভূত হলে দেবীর সেবাইত বর্ধমান মহারাজের কাছে দেবীর সেবাপূজার জন্য ভূমিদানের প্রার্থনা জানায়। মহারাজ দেবীর সেবাপূজার উপযুক্ত কিছু জমি দান করেন। দেবীর নিত্যপূজা ছাড়া বাৎসরিক পূজা হয় আষাঢ় মাসের নবমী তিথিতে। চারপাশের গ্রাম থেকে অসংখ্য ভক্ত আসে ও পাঁঠা বলির মানসিক দেয়। সে সময় পাঁঠাবলির পর পাঁঠার মুণ্ড নিয়ে গ্রামে গ্রামে ভক্তদের "মুণ্ডকাড়ান" খেলা হতো আর তার সঙ্গে হতো বাজনার তালে তালে উদ্দাম নৃত্য। পরবর্তী কালে এই 'মুণ্ডকাড়ান' খেলা নিয়ে গ্রামে গ্রামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা রেষারেষি শুরু হয়। তার পরিণতি হয় মারামারিতে—যার ফলে পাঁঠামুণ্ড ছেড়ে দেবীমূর্তি বার করে মূর্তিকেই নিজ নিজ গ্রামের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পাশের কুলনগর ও ঊষাগ্রামের পূজার্থীদের মধ্যে জিদ চাপে। এইরকম মূর্তি কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে মূর্তি মাটিতে পড়ে যায় ও দ্বিখণ্ডিত হয়। কুলনগর গ্রামের পূজার্থীরা ঊর্ধ্বাঙ্গ নিয়ে চম্পট দেয় ও ঊষাগ্রামের পূজার্থীরা দেবীর নিম্নাঙ্গ নিয়ে পালায় ও নিজ গ্রামে প্রতিষ্ঠা করে। মূর্তি অপহৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাঁটা বিষ্ণুপুরের খ্যাতিও কমে যায়। ফলে সে গ্রামের মন্দিরও ভেঙে যায়। মুখার্জী পরিবারের বংশধরদের অনেকে কুলচণ্ডায় চলে আসেন ও সেখানেই তাঁদের কুলদেবীকে ঘট স্থাপনা করে পূজা করতে শুরু করেন। কুলনগরে দেবীর ঊর্ধ্বাঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। খাঁটি কষ্টিপাথরে নির্মিত দ্বিভুজা জয়দুর্গা মূর্তি—এক হস্তে গদা অন্য হস্তে ঢালের মত কোন অস্ত্র। পালযুগের শিল্পশৈলীতে গঠিত অপরূপ মূর্তি। নিত্যসেবার ব্যবস্থা আছে। দেবীর পূজা হয়—ওঁ যৈষা ললিতকান্তাখ্যা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা বরদা ভয়হস্তা চ দ্বিভূজা গৌরদেহিকা। রক্তপদ্মাসনস্থা মুকুটোজ্জ্বলমণ্ডিতা রক্তকৌষেয়-বসনা স্মিতবক্ত্রা শুভাননা। নবযৌবনসম্পন্না চার্ব্বাঙ্গী ললিতপ্রভা—এই মঙ্গলচণ্ডীর ধ্যানে। নিত্য পাঁচপোয়া চালের অন্নভোগ হয়। সন্ধ্যায় শীতলারতি। আষাঢ়ে নবমীতে মহাপূজা, অজস্র পাঁঠাবলি হয়। জাগ্রতা দেবী কুলচণ্ডী; দেবীর কাছে মানত করলে দেবীর নির্মাল্য ধারণ করলে বাত, হাঁপানির মত দুরারোগ্য রোগ নিরাময় হয় বলেই ভক্তদের ধারণা। কুলচণ্ডাতেও মুখার্জী পরিবারের কুলদেবতার ঘটকে প্রতীক করে পূজা হয় কুলনগরের দেবীর পূজার মত। এখানেও আষাঢ়ে নবমীতে মহাপূজা। বহু ভক্তের সমাগম হয়। ভক্তদের ভক্তির আতিশয্যে মা আজ ত্রিধা বিভক্ত হয়ে

ভক্তমনোবাঞ্ছা পূরণ করছেন। শিলাময়ী ত্রিধা কিন্তু ভক্তের হৃদয়ে মা "চিতিরূপেণ কৃৎস্নামতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ" বিরাজিতা—যিনি চিৎশক্তি রূপে এই সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিতা, শিলাময়ী মূর্তি ভেঙে তাঁকে কি ভাগ করা যায়?

উচালনের উচ্চৈশ্বরী

সত্যের গঙ্গা দামুদর তড়ে পার হঞা
উড়্যাগড় কামালপুর দক্ষিণে রাখিঞা
বন্দিল দরিয়ার পীর মস্তকে ইনাম।
বার ক্রোশ জুড়ো জাহাঁর মকাম।
বাম ভিতে নাউর গ্রাম দক্ষিণে আরি
আমিলার সবাই দিঞা পালা মঙ্গল মারি ॥
মুণ্ডমালা মহাস্থান পাঞ্চাত করিঞা
উচালন দীঘির পছিম পাড় দিঞা ॥

(বিশ্বভারতী পুঁথি ১৪৪৬; শারদীয় বর্ধমান—১৩৮৬)

একটি প্রাচীন পুঁথিতে বর্ধমান থেকে মান্দারণ যাবার যে পথনির্দেশ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় বর্ধমান থেকে বাঁকুড়া যাবার পথের ধারে উচালন গ্রাম ও উচালন দীঘি। মাধবডিহি থানার ১৩১নং মৌজা উচালন। রায়না ২ ব্লকের এই গ্রামটির আয়তন ৮৬১.৫৬ হেক্টর, লোকসংখ্যা ৫৫৪৯, তপসিলী ২০২৩, উপজাতি ৩০০, সাক্ষরের সংখ্যা—পুরুষ ১৭৯৮, স্ত্রী ১১১১। বর্ধমান-আরামবাগ বাসে যাওয়া যায়। নিকটবর্তী শহর আরামবাগ ১৭ কিমি। গ্রামে আছে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় তিনটি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়—প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও দৈনিক বাজার।

উচালন অতি প্রাচীন গ্রাম। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতম্-এ পালরাজ রামপালের কৈবর্তরাজ দিব্যেক-এর বিরুদ্ধে অভিযানের সময় তাঁকে যে সমস্ত সামন্তরাজা সাহায্য করেছিলেন তাতে উচ্ছলিয়া-রাজ ভাস্কর বা ময়াগল সিংহ এবং অপার মন্দাররাজ লক্ষ্মীশূরের উল্লেখ আছে। রামচরিতের এই উচ্ছলিয়াকে রায়না থানার (বর্তমানে মাধবডিহি) উচালন ও অপার মন্দারকে গড় মান্দারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে (R. C. Mazumdar History / of Ancient Bengal, Cal 1971, P. 188) প্রবাদ—রামপালের নির্দেশে ভাস্কর বা ময়াগল রাজধানী উচালনে একটি দুর্গপ্রাসাদ নির্মাণ করান ও চার কোণে চারটি দীঘি খনন

করান ও দীঘির কোণে প্রতিষ্ঠা করেন এক একটি মহাশক্তির মন্দির। ঈশান কোণে কানাদীঘি ও কোণে প্রতিষ্ঠিতা দেবী রক্ষাকালী; বায়ুকোণে উচালন দীঘি—দেবী ভদ্রকালী; নৈর্ঋতে শূরো দীঘি—দেবী শ্মশানকালী, আর অগ্নিকোণে বেলে দীঘি—দেবী জগদ্দে (জগন্মাতা যোগাদ্যা)।

ড. পঞ্চানন মণ্ডল রায়নার স্থান পরিচয় প্রবন্ধে উচালন প্রসঙ্গে বলেছেন—"পাল ও সেন যুগের পদচিহ্ন হুবহু পড়েছে উচালনে। কালাদীঘির পাড়ে 'পীরশাহমী' স্তূপ খুঁড়ে দেখলে তার হদিশ মিলবে।... রামপাল এসেছিলেন ময়ীগ্রামে ময়রাজার ঘরে, উচ্ছাল অর্থাৎ উচালন অঞ্চলে মগলমারি অর্থাৎ ময়গলের বাড়ী যাবার পথ 'মগলমারি' হয়ে।"

ডঃ মণ্ডল যে কালাদীঘির উল্লেখ করেছেন সেটি মনে হয় ময়গলের দুর্গপ্রাসাদের ঈশান কোণের কানাদীঘি। জানি না এই কানাদীঘি অর্থাৎ কালাদীঘিই সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরা উপন্যাসের ডাকাতে কালাদীঘি কিনা। ইন্দিরা উপন্যাসের ইন্দিরার কথায়—"আমার শ্বশুরবাড়ী মনোহরপুর আমার পিত্রালয় মহেশপুর উভয় গ্রামের মধ্যে দশ ক্রোশ পথ, সুতরাং প্রাতে আহার করিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম... পথে কালাদীঘি নামে এক বৃহৎ দীঘিকা আছে।"... রায়না থানায় মহেশবাটি (জে. এল. ১০৬) নামে একটি গ্রাম আছে। এই মহেশবাটিই সাহিত্য সম্রাটের কলমে হয়ত মহেশপুর হয়েছে।

দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসেও পরোক্ষভাবে উচালনের উল্লেখ অনুমান করা যায়—মানসিংহ মান্দারণে কতলু খাঁর বিদ্রোহ দমন করার জন্য বর্ধমান থেকে সসৈন্যে সম্ভবত এই উচালন দীঘির পাড় দিয়ে অগ্রসর হয়ে দারুকেশ্বরে শিবির সংস্থাপন করে সৈদ খাঁর জন্য অপেক্ষা করেছিলেন।

ময়গালের দুর্গপ্রাসাদের চারকোণে পুষ্করিণীর তীরে চার দেবীর উল্লেখ করা হয়েছে তাদের কিন্তু অস্তিত্ব নাই। প্রবাদ, কালাপাহাড় এই পথ দিয়ে পুরী যাবার পথে এই মূর্তির সবগুলি ধ্বংস করে জলে নিক্ষেপ করে দিয়েছিলেন।

তবে আজও গ্রামে বৈশাখ মাসে রক্ষাকালী পূজা ও বিশালাক্ষীর পূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় আব পূজিত হন গ্রাম্যদেবী উচ্চৈশ্বরী। উচ্চৈশ্বরীর এই মূর্তিকে উচালন দীঘির পঙ্কোদ্বারের সময় দীঘির গর্ভ থেকে উদ্ধার করা হয়।

বর্তমানে মূর্তিটি গ্রামে দক্ষিণ পাড়ায় বাগদে পুকুরের অগ্নিকোণে একটি নিমগাছের তলে বাঁধান বেদীতে অধিষ্ঠিতা। মূর্তি কালো কষ্টিপাথরে তৈরী। উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট, উর্ধ্বাংশ কিঞ্চিৎ ভগ্ন, মূলমূর্তি প্রায় আড়াই ফুট উচ্চ বীণাবাদনরতা কষ্টিপাথরের, মূর্তি দণ্ডায়মান। এই মূর্তির মাথার ওপর ও

পদতলে পদ্ম, পদতলে পদ্মের নীচে হনুমান মূর্তি। এই দুই মূর্তির দুপাশে দুটি ছোট ছোট মূর্তি—একটি ডান দিকে হেলান কিছুর ওপর ডান হাতের কনুই-এ ভর দিয়ে ও বাম হাত কোমরে দিয়ে দন্ডায়মান. আর বাঁদিকের ছোট মূর্তিটি সোজা দন্ডায়মান। তবে এহ্ বাহ্য। নিমগাছটিই উচৈচেশ্বরীর প্রতীক রূপে পূজিতা হন। নিমগাছটি প্রাচীন তবে কত প্রাচীন সেটা বলা শক্ত।

উচৈচেশ্বরীর পূজা হয় কালিকার ধ্যানে—যদিও কালীমূর্তির সঙ্গে এ মূর্তির কোন সাদৃশ্যই নাই। বৈশাখ কিংবা জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের মঙ্গলবার কিংবা শনিবার বার্ষিক পূজার দিন স্থির হয়। তবে মহাপূজার দিন পূর্বাহ্নে খণ্ডঘোষ থানার বোঁয়াই গ্রামে দেবী বোঁয়াইচণ্ডীর পূজার নৈবেদ্য ও পাঁঠা পাঠিয়ে দিতে হয়। অথবা পূজার আনুমানিক ক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

প্রাচীন ইতিহাসের বহু নিদর্শন বুকে নিয়ে বহু মহাপুরুষের চরণ স্পর্শে পূত উচালন আজও স্বমহিমায় বিরাজমান। আজও গ্রামের ব্রাহ্মণ, উগ্রক্ষত্রিয়, তিলি, নাপিত, বাগদী সকল সম্প্রদায় জাগ্রত দেবী উচৈচেশ্বরীর কাছে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কল্যাণ কামনায় মানত করে পাঁঠা বলি দেয়—বারব্রত করে। তবে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে কতটা ভক্তি-শ্রদ্ধা পাবেন সেটা ভবিষ্যৎই বলতে পারে।

ফুলবেরিয়ার মুক্তাইচন্ডী

আসানসোল মহকুমার সালানপুর থানার ফুলবেরিয়া মৌজা (জে. এল. নং ৫৯); আয়তন ৮৮.৪৮ হেক্টর, লোকসংখ্যা ১৬০৬, এদের মধ্যে তপসিলী জাতির লোকসংখ্যা ৪৬১, উপজাতি ৪, সাক্ষর পুরুষ ৬২৬, স্ত্রী ৩৬৮। সমগ্র অঞ্চলটি প্রাচীন কালে ছিল অস্ট্রিক ভাষাভাষী উপজাতি অধ্যুষিত যাদের মধ্যে ওঁরাও সাঁওতাল. ডোম, বাগ্‌দীই প্রধান—আর আজ সেই উপজাতির সংখ্যা চারে দাঁড়িয়েছে। গোটা এলাকা ছিল শাল, সেগুন, আসান, বনপলাশের জঙ্গলে পূর্ণ। এই অস্ট্রোলয়েড উপজাতিভুক্ত জাতি ছিল বৃক্ষদেবতা, প্রস্তর, পাহাড় নদীর পূজারী। প্রথমে ছিল শিকারী, পরে বন কেটে বসত তৈরী করে চাষবাস শুরু করে—কিন্তু শিকার ছাড়ে নাই। পরে হিন্দুদেবদেবীর আদলে চন্ডীপূজার সূচনা করে। গোলাকৃতি প্রস্তর খণ্ডকে চান্ডী নামেই পূজা করতো। চান্ডী ছিল শিকার ও যুদ্ধের দেবতা। এর আরাধনা করেই এরা শিকারে যেত ভাল শিকারের আশায়। আবার গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সময় এই শিলাখণ্ডকে সঙ্গে নিয়ে যেত যুদ্ধজয়ের বাসনা নিয়ে।

মাঘী পূর্ণিমার দিন হতো চান্ডীর বাৎসরিক উৎসব। সেদিন সকাল থেকেই ওঁরাওরা দলে দলে স্থানীয় পাহাড়ের ওপরে উঠে যেত। এখানেই ছিল চান্ডীর

অধিষ্ঠান। বৃক্ষতলের অঙ্গনে দেবস্থানে গোবরের মারুলী দিয়ে পূজোর আয়োজন করতো। পূজারী ছিল এদেরই গোষ্ঠীভুক্ত যুবক, পূজককে বলতো 'পাহান'। পুরোহিত 'পাহান' চান্ডীর শিলাখণ্ডে তিনটি ফোঁটা এঁকে দিয়ে পূজা শুরু করতো। মন্ত্রও ছিল অস্ট্রিক ভাষায়। পূজার অন্যতম অঙ্গ ছিল ছাগ বলিদান। বলিরও নিয়ম ছিল ছাগকে আতপ চাল খেতে দেওয়া হতো। ছাগটি যখন আতপ চাল খেতে থাকতো তখন এক কোপে তাকে বলিদান করতে হতো। বলির শেষে সেই মাংস দিয়ে পাহাড়ের ওপরেই সবার ভোজ সম্পন্ন হতো। সন্ধ্যা হতেই নীচে নেমে এসে হাঁড়িয়া নিয়ে বসতো—তারপর মধ্যরাত্রি পর্যন্ত মাদল বাজিয়ে নাচ গানে মত্ত হতো।

কালক্রমে সমগ্র অঞ্চল জুড়ে সম্পত্তি ও মালিকানার উদ্ভব হলো। ছোটনাগপুর, পঞ্চকোট অঞ্চলের কিছু ধনী এ অঞ্চলে জমিদারী কিনে রাজা সেজে বসলো। সৃষ্টি হলো নতুন এক শোষক শ্রেণীর। এরাও অনার্য গোষ্ঠীভুক্তই ছিল কিন্তু সম্পত্তি কিনে 'জাতে' উঠে গেল। এই সব অঞ্চলের ঠাকরুন রাজবংশ, বাবুসাহেব রাজবংশ আস্তে আস্তে সালানপুর, জামুরিয়া ও মুক্তাইচণ্ডী পাহাড়ের জমিদারী কিনে নিল। ইতিমধ্যে বাংলায় সেন বংশের পতন হয়েছে, তুর্কী শাসন কায়েম হয়েছে। বাংলার বুকে রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের সাথে সাথে শুরু হলো সামাজিক বিপর্যয়। মানুষ আত্মশক্তিতে আস্থাহীন হয়ে স্বধর্ম রক্ষায় অপারগ হলো। রাজশক্তিতে তারা ধনে প্রাণে ধর্মে কোন সুরক্ষার নিশ্চয়তা পেল না। আত্মরক্ষার জরুরী প্রয়োজনে উচ্চবর্ণের মানুষ আপনার বর্ণাভিমানকে সঙ্কুচিত করলো। বরাভয়ের প্রত্যাশায় নিজেদের সমাজের বাইরে অনভিজাত সাধারণ মানুষের অনার্য লৌকিক দেবদেবীর শরণ নিল। নতুন নতুন লৌকিক দেবতা সৃষ্টি হলো—কালিন্দী, কালুরায়, বাঘারায়, গড়োদেবতা, বাবাঠাকুর, মনসা, ওলাইচণ্ডী প্রভৃতি দেবদেবীর আর্যীকরণ ঘটলো। গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠলো অসংখ্য চণ্ডী; আমরা পেলাম গৌরচণ্ডী, ঘাঘরবুড়ীচণ্ডী, জাহিরবুড়ীচণ্ডী, পলাসচণ্ডী, কুলচণ্ডী, ভাতারচণ্ডী, কলাইচণ্ডী, ঢেলাইচণ্ডী, নাটাইচণ্ডী, উড়নচণ্ডী, এলাইচণ্ডী, রূপাইচণ্ডী, খাড়াচণ্ডী, সেনচণ্ডী, দুর্গাচণ্ডী, ওলাইচণ্ডী, শুভচণ্ডী, সনাইচণ্ডী, উদ্ধারচণ্ডী, অবাকচণ্ডী—আরও কত নামের চণ্ডী। এদের সঙ্গে যোগ দিল ফুলবেরিয়ার মুক্তাইচণ্ডী।

ফুলবেরিয়া অঞ্চলে যে ছোট পাহাড় ছিল তার নাম হলো মুক্তাইচণ্ডী পাহাড়—এখানেই মুক্তাইচণ্ডীর অধিষ্ঠান। পাহাড়ের 'মুক্তাইচণ্ডী' নামকরণের একটা মনগড়া কাহিনীরও সৃষ্টি হলো। অনার্য সংস্কৃতির সঙ্গে আর্য সংস্কৃতির

মেলবন্ধন ঘটলো। পাহাড় ও দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে মুক্তাইচণ্ডী পাহাড়কে পীঠস্থানে পরিণত করা হলো। দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগের পর সতীর দেহকে নিয়ে মহাদেবের শুরু হলো তান্ডব নৃত্য; পৃথিবী কেঁপে উঠলো। বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে সতীর দেহ হলো ছিন্নভিন্ন। দেহের এক এক অংশ পড়লো এক এক স্থানে—গড়ে উঠলো পীঠস্থান। ফুলবেরিয়ার পাহাড়ে পড়লো দেবীর নাকছাবির মুক্তা—পাহাড়ের নাম হলো মুক্তাইচণ্ডীপাহাড়—পাহাড়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মুক্তাইচণ্ডী—ভৈরব ছাড়াই।

এখানকার নতুন গড়ে ওঠা রাজবংশ মুক্তাই পাহাড় সমেত এ অঞ্চলের জমিদারী কিনে ওঁরাওদের চাণ্ডীদেবীর ওপর অধিকার কায়েম করলো। এত দিন ছিল গোলাকৃতি চাণ্ডীর শিলা, এখন সেখানে স্থাপিত হলো অশ্ববাহিত ধনুর্বাণ হাতে মুক্তাইচণ্ডী। এক ফুট উচু শিলাময়ী দেবী ধনুর্বাণ হাতে ছয়টি অশ্ববাহিত কারুকার্যখচিত রথে যেন দেবী যুদ্ধযাত্রা করছেন। ওঁরাওদের চাণ্ডীকে এই ভাবে আর্যীকরণ করা হোল। পাহানের স্থানে নতুন পুরোহিত নিযুক্ত হলো—ফুলবেরিয়ার চক্রবর্তী পরিবার। অস্ট্রিক ভাষায় মন্ত্রের পরিবর্তে সংস্কৃতে দেবীর ধ্যানমন্ত্র তৈরী হলো। পূজার তারিখ অবশ্য একই রইলো—মাঘী পূর্ণিমা অনার্য সংস্কৃতির শিলাময়ী চণ্ডীর উত্তরণ ঘটলো ছয়টি অশ্ববাহিত রথে উপবিষ্ট যুদ্ধবেশী ধনুর্বাণ হাতে আর্য সংস্কৃতির দেবী—মুক্তাইচণ্ডীতে। মাঘী পূর্ণিমার দিন সকাল থেকেই শুরু হয় দেবীর বাৎসরিক পূজার আড়ম্বর—পূজা, বলিদান সবই হয়—আর বসে সপ্তাহব্যাপী মেলা—যে মেলায় হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে। কোলিয়ারী অঞ্চল, চিত্তরঞ্জন, জে. কে. নগর থেকে আদিবাসী শ্রমিকও আসে—যেমন আসে উষাগ্রামের ঘাঘরবুড়ী চন্ডীরমেলায়। তবে মেলায় বর্ণ হিন্দুদেরই প্রাধান্য বেশী। মেলাকমিটির যারা সদস্য সবই বর্ণ হিন্দু—মেলা পরিচালনা করে। মেলাতে আধুনিকতার ছাপ—যাত্রাকীর্তন, কবিগান, নাগরদোলা, সারি সারি মিষ্টির দোকান, নানা রকম জিনিসের পসরা সাজিয়ে বসে বিভিন্ন জায়গার দোকানীরা। প্রাচীনকালের অনার্য সংস্কৃতির চিহ্ন আজ আর নাই। এই ভাবে ওঁরাওদের চাণ্ডী আজ মুক্তাইচণ্ডীতে রূপান্তরিত হয়ে আর্য সংস্কৃতির পরিমণ্ডলের লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে আপন স্থান করে নিয়েছে।

তথ্য সূত্র :

বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব), ড. নীহাররঞ্জন রায়।

পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা (৫ম) ড. অশোক মিত্র

আজকের যোধন পত্রিকা (ক্রোড়পত্র-১৯৯১)

এড়ালের বুদ্ধ প্রভাবিত বুদ্ধেশ্বর শিব

গোপভূম অঞ্চলের আউসগ্রাম থানার এড়াল (জে. এল. ৯৩) একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। পাশেই বাহাদুরপুর (জে. এল. ৯৯)। জনসাধারণের কাছে গ্রামটি এড়াল বাহাদুরপুর বলেই প্রচলিত। গ্রামের আয়তন ৮১৩.৮৫ হেক্টর, লোকসংখ্যা ৩৮৪৯, তপসিলী জাতির লোকসংখ্যা ১৪৫৪ ও উপজাতির লোকসংখ্যা ৫২৯। গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে ১১৮৫ জন পুরুষ ও ৮০০ স্ত্রী সাক্ষর। এড়ালের খ্যাতি গ্রামদেবতা বুদ্ধেশ্বর শিব ও ১৫´ উচ্চ কালীমূর্তির জন্য। মাইল দুই দূরেই সুয়াতায় বহমন পীরের মাজার ও মসজিদ। সমগ্র গোপভূম অঞ্চল একসময়ে ছিল মহাযানী বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত।

"রাঢ়ভূমির ভূগোল ও মহাবীরের চারিকা" প্রবন্ধে ড. পঞ্চানন মণ্ডল এ অঞ্চলে শেতক ও দেশক নগরে ভগবান তথাগত বুদ্ধদেবের আগমনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই গ্রাম দুটিকে আউসগ্রাম থানার সুয়াতা ও দেয়াশা নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া শারদীয় বর্ধমান (১৩৮৪) পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পালিগ্রন্থের উল্লেখ করে বলেছেন—একটি অরণ্যের পাশে দেশক (দেয়াসা??) নগরের পার্শ্বস্থিত—সিংহারণ্যে ভগবান তথাগত বুদ্ধ জনপদ কল্যাণী সূত্র সম্বন্ধে একটি আখ্যান বলেছেন। বলরামবাবুর মতে সিংহারণ্যেই সরকারী রেকর্ডে উল্লিখিত বর্তমানের 'সিভেরবন' আমবাগান। বলরামবাবু বুদ্ধদেবের আগমনের পথের বর্ণনা প্রসঙ্গে সেকালের পার্থালিস-এর উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে পার্থালিস বর্তমান পারতালিত খড়ি নদীর উত্তর-পূর্ব কোণে বনপাশ। ভাতার থানার বনপাশ (জে.এল. ২১) আমার জন্মভূমি। কাজেই বুদ্ধদেবের পাদপূত সুপ্রাচীনকালের নিজ গ্রাম সম্বন্ধে গর্ববোধ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু পার্থালিস সম্পর্কে ঐতিহাসিক মন্তব্য আমার গর্বকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। The classical Accounts of India গ্রন্থে Plinyএর বিবরণে আছে The Royal city of the callngae is called Parthalis। তাঁর বিবরণে আরও পাওয়া যায় কলিঙ্গীরা সমুদ্রতীরে বসবাস করতো। Plinyএর এই বিবরণের পরিপ্রেক্ষিতে বলরামবাবুর পার্থালিসের বিবরণ নিছক কষ্টকল্পনা বলেই মনে হয়। সে যাই হোক এড়াল গ্রামের খ্যাতি গ্রামদেবতা বুদ্ধেশ্বর শিবের জন্য। গ্রামের অধিষ্ঠাতা দেবতা বুদ্ধেশ্বর। গ্রামবাসীদের মতে বুদ্ধেশ্বর অনাদিলিঙ্গ শিবলিঙ্গ। বুদ্ধেশ্বরের আবির্ভাব সম্পর্কে চিরাচরিত গোপ ও দুগ্ধবতী গাভীর লিঙ্গের মাথায় দুগ্ধক্ষরণের কাহিনী জড়িত। প্রাচীন মন্দিরে ক্ষুদ্রকক্ষে বুদ্ধেশ্বরের অবস্থান। বুদ্ধেশ্বরের সঙ্গে আরও তিনটি মূর্তি আছে। ছয় ইঞ্চি উচ্চ হরগৌরী,

গণেশ ও বুদ্ধদেবের মূর্তি। বুদ্ধেশ্বর নাম ও বুদ্ধমূর্তির অবস্থান নিশ্চিতভাবে এতদঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সূচিত করে। শিবের গাজনের মত বুদ্ধেশ্বরের গাজন হয় চৈত্র-সংক্রান্তিতে। সে সময় বুদ্ধেশ্বরের প্রতীক ত্রিশূল ও তিনটি ফলক সমন্বিত কাঠের বাণেশ্বরকে নিয়ে বাবার ভক্ত্যারা নিকটবর্তী তালপুকুরে স্নান করাতে নিয়ে যায়, কিন্তু স্নান করানোর পূর্বে বিশ্রামতলা নামে খ্যাত অশ্বথতলায় বাণেশ্বরকে নামিয়ে কিছু আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। রাত্রে খড়ি নদীর তীরে, ভুড়ভুড়ির ডাঙ্গায় হয় রাত গাজন। গাজন ছাড়া শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের সোমবারে অনুষ্ঠিত হয় বুদ্ধেশ্বরের বাৎসরিক উৎসব। এই উৎসবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো দু-মণ খাঁটি দুধের পরমান্ন দিয়ে বাবার মুনুই ভোগ। ভোগের পরে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে উপস্থিত সকলে বাবার প্রসাদ পান। প্রবাদ—বুদ্ধেশ্বর নাকি প্রতি রাত্রে প্রাচীরে চড়ে ২ মাইল দূরে মাজারে অবস্থিত বহমন পীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। এই ঘটনাকে প্রবাদ বললেও প্রবাদের অপলাপ করা হয়— কারণ, অধিকাংশ প্রবাদ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফসল। এ কল্পকাহিনীকে বাবার মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে স্থানীয় লোকের প্রচারিত গাল-গল্প বা myth বলাই যুক্তিযুক্ত। তবে বুদ্ধেশ্বরের সঙ্গে বহমান পীরের সাক্ষাৎকারের myth এ অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি প্রমাণ করে।

বুদ্ধেশ্বরের পূজা হয় শিবের ধ্যানে—ওঁ বুদ্ধেশ্বরায় শিবায় মন্ত্রে। পূজা করেন রায় উপাধিধারী ব্রাহ্মণ পুরোহিত। পূজার ব্যয় নির্বাহের জন্য বুদ্ধেশ্বরের নামে দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। মনে হয় বুদ্ধ-প্রভাবিত বুদ্ধেশ্বর বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রভাব হতে মুক্ত হয়ে হিন্দুদেবতা বৃদ্ধ শিবে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন হয়েছে—জৈন প্রতিষ্ঠিত স্বস্তিকা মঙ্গলামূর্তি বা মতান্তরে বর্তুলাকার বুদ্ধমূর্তি বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মূর্তিতে এবং মহাবীর তীর্থঙ্কর মূর্তি বাবলাডিহির ন্যাংটেশ্বর শিবমূর্তিতে।

বুদ্ধেশ্বরের সঙ্গে বহমান পীরের সম্পর্ক প্রসঙ্গে বহমান সাহেবের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করা যায় কিন্তু গোপভূম অঞ্চলে তথাগত ভগবান বুদ্ধের আগমন বা বলরামবাবুর উল্লিখিত নিকটবর্তী সভাবরণডাঙ্গায় স্থানীয় জনগণের দ্বারা বুদ্ধবরণ করার ঘটনা তর্কাতীত নয় বা এর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। আমার মতে এও এক ধরনের Myth। এই প্রসঙ্গে ড. নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) গ্রন্থে এ-অঞ্চলে মহাবীরের আগমনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করলে আমার বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। ড. রায়ের মতে মহাবীরের সময়ে এ অঞ্চল ছিল অষ্ট্রিক ভাষাভাষী কোল, ভীল, সাঁওতাল, ডোম, চোয়াড়, বাগদী জাতি দ্বারা অধ্যুষিত।

ড. রায় এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন "মহাবীর (খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক) যখন পথহীন লাঢ় (রাঢ় দেশ) বঙ্গজভূমি ও সূহ্মভূমিতে (মোটামুটি দক্ষিণ রাঢ়) প্রচারোদ্দেশ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিলেন তখন এইসব দেশের অধিবাসীরা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। কতকগুলি কুকুরও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে কামড়াইতে আরম্ভ করে কিন্তু কেহই এই কুকুরগুলিকে তাড়াইয়া দিতে অগ্রসর হন নাই। বরং লোকেরা সেই জৈন ভিক্ষুককে আঘাত করে ও ছুছু (থুক্‌ফু) বলিয়া চিৎকার করিয়া তাঁহাকে কামড়াইবার জন্য লেলাইয়া দেন।" ধর্মপ্রচারকদের প্রতি এখানকার সমকালীন অধিবাসীদের এই যখন মানসিকতা তখন সমসাময়িক কালের বুদ্ধদেবকে তৎকালীন জনগণ কর্তৃক সভাবরণডাঙ্গায় সাদরে বরণ করার কাহিনী নিছক myth ছাড়া কিছু নহে। এছাড়াও বলরামবাবুর প্রবন্ধে অন্য অসঙ্গতিও লক্ষ্য করা যায়। তিনি লিখেছেন—শিবাখ্যা দেবীর সঙ্গে অহিংসাবাদী বহমন সাহেবের যুদ্ধ হয় ও শিবাখ্যা দেবী পরাজিত হয়ে অমরারগড়ে আশ্রয় নেন। এই বিবরণেরও কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। ড. অশোক মিত্র তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন পূর্বে শিবাখ্যা মন্দিরে নরবলি হতো। বহমান সাহেব এই নরবলি বন্ধ করতে উদ্যোগী হতেন। স্থানীয় শাসনকর্তা ভল্লুপাদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বাধে ও যুদ্ধে বহমান সাহেব মৃত্যুবরণ করেন ও ভল্লুপাদ শিবাখ্যা মূর্তি নিয়ে অমরারগড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান ও রাজত্ব স্থাপন করেন।

তবে বুদ্ধপ্রভাবিত বুদ্ধেশ্বর ও বুদ্ধেশ্বর মন্দিরে বুদ্ধমূর্তি এবং বহমন পীরের মাজারে সকাল সন্ধ্যায় ডঙ্কাধ্বনি এতদঞ্চলে মহাযোগী বৌদ্ধ প্রভাব সমর্থন করে। বিশেষত গোপভূম পরগনার দক্ষিণ-পশ্চিম ও পূর্ব সীমান্তে পানাগড় থেকে ৭ মাইল দক্ষিণে ভরতপুরে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভরতপুরে খননকার্যের ফলে যে তূলাক্ষেত্র বলে কথিত বৌদ্ধস্তূপ ও ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় ধ্যানরত বুদ্ধমূর্তির আবিষ্কার হয় তা ৭ম--৯ম খ্রীষ্টাব্দে এ-অঞ্চলে মহাযানী বৌদ্ধ প্রভাব প্রমাণিত করে। ১৯৯৪ সালের বেঙ্গল গেজেটিয়ারেও এই স্তূপ খননের ও ৭ম-৯ম খ্রীষ্টাব্দে এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রসারের কথা উল্লিখিত আছে। আরও উল্লেখ আছে এই অঞ্চলে বৌদ্ধস্তূপ নির্মাণের পূর্বে Neolithic Chalchalothic সভ্যতা ও Early Iron ageএর অস্তিত্ব ছিল। ড. পঞ্চানন মণ্ডলের বুদ্ধদেবের শেতক (সুয়াতা) ও দেশক (দেয়াশা) নগরে আগমনের ইঙ্গিতের সমর্থনে ঐতিহাসিক তথ্য পাই নাই—জানি না তাঁর তথ্যসূত্র কি?

বুদ্ধেশ্বর ছাড়া এড়াল গ্রামের পনের ফুট উচ্চ কালীপূজা এড়ালের অন্যতম আকর্ষণ। এছাড়া আছে যাত্রাসিদ্ধি বাঁকুড়া রায় নামাঙ্কিত ধর্মরাজ ও ধর্মরাজের আবরণদেবী গোরক্ষচণ্ডী। ধর্মরাজের গাজন মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়।

বাবাঠাকুর, পঞ্চানন্দ, পঞ্চানন :

পঞ্চানন শিবের এক নামবিশেষ—"কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠে ভরা বিষ" (ভারতচন্দ্র)। কিন্তু শিবের প্রমথগণের মধ্যে একজনের নামও পঞ্চানন, ইহার অপর নাম পঞ্চানন্দ, কোথাও বা ইনিই বাবাঠাকুর। জেলার পল্লী অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে পঞ্চানন্দ, পঞ্চানন, বাবাঠাকুর, পাঁচুঠাকুর, ভোলা বিভিন্ন নামে একই দেবতা। মহাদেবের অন্যতম প্রমথ অথবা শিবপুত্র বটুক ভৈরব। পঞ্চানন্দ বালপীড়ক অপদেবতা বিশেষ। পৌরাণিক অভিধানে দেখা যায় প্রমথগণ নৃত্য-গীতবিশারদ ও নানারূপধারী। কালিকাপুরাণে বর্ণিত আছে—মহাদেবের মুখনির্গত ফেনা হতে প্রমথদের উৎপত্তি; এরা মহাদেবের পার্শ্বচর। ইনি তুষ্ট হলে বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয়, গর্ভস্থ ভ্রূণ রক্ষা পায়। মরুঞ্চে নারীর সন্তান রক্ষা পায়; নবজাতক-জাতিকা-র পেঁচোপাওয়া রোগ (রিকেট), খিঁচুনি (ধনুষ্টঙ্কার) নিরাময় হয়। মধ্যযুগীয় কাব্যে শিবতন্ত্রে উল্লিখিত আছে—

কোন স্থানে পঞ্চানন কোথায় স্বরূপ।
কোথায় ভৈরবী মূর্ত্তি দৃশ্য অপরূপ ॥
পঞ্চানন দেব প্রায় অশ্বত্থ তলায়।
মধ্য মাঠে সরোবর তীরে দেখা যায় ॥

পঞ্চানন্দের মঙ্গলকাব্যে পঞ্চানন্দের নৃত্যগীতে দক্ষতার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভল্লুকবাহন বন্দো-পঞ্চানন, নৃত্যগীতে দেহমন।
অজ্ঞানকিংকরে তোমারে স্মরে ত্যজ হে শ্যাওড়ার বন ॥

দ্বিজ দুর্গারামের পঞ্চাননমঙ্গলে পঞ্চানন্দের জন্ম সম্বন্ধে অন্য তথ্য পাওয়া যায়। কার্তিকের হাতে তারকাসুর নিহত হলে তারকাসুরের উদ্ধারের জন্য—

সভা করি বসিলেন যত দেবগণ।
হেন কালে ব্রহ্মা তবে বলেন বচন,
পঞ্চমুখে গান কর দেব ত্রিলোচন।
পঞ্চমুখে গান যদি তুমি সে করিবে,
তবে সে তারক বির উদ্ধার হইবে।
মহামন্ত্র মহাদেব কৈল উচ্চারণ,
দেব বংশে হইল জন্ম নাম পঞ্চানন।
... ...
হেনকালে ব্রহ্মাদেব কহে মহেশ্বরে,
ব্যাধিরাজ ভারদেহ এই ত কুমারে।

পঞ্চানন্দ প্রাচীন দেবতা—প্রথমে তিনি অস্ট্রিক জাতির মধ্যে বৃক্ষদেবতা রূপে কিংবা সমাজের ব্রাত্যদের মধ্যে রুদ্র অনার্য রূপে পূজিত হতেন। বৌদ্ধ মহাযানী নাথ যোগীরা পঞ্চানন্দকে নিরঞ্জন নৈরাকার ধর্মরূপে পূজা করতেন। আবার ১৮২৫ সালে ফোর্ট উইলিয়ামস কলেজ কর্তৃক সংগৃহীত বৃহদ্‌রুদ্র যামল নামে সংস্কৃত ভাষায় বঙ্গাক্ষরে রচিত তান্ত্রিক পুঁথিতে পঞ্চানন্দকে "শুভ্রবর্ণ পঞ্চমুখ বৃষবাহন" রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। রূপরামের ধর্মমঙ্গলেও পঞ্চানন্দের উল্লেখ আছে—

কামার হাটে পঞ্চানন্দ বন্দো জোড় হাতে।
ছেলেদের জন্য কত মেয়ে ওষুধ যায় খেতে।।

বিনয় ঘোষ তাঁর পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি গ্রন্থে আরামবাগ অঞ্চলের যে পঞ্চানন্দের বিবরণ দিয়েছেন তাতে পঞ্চানন্দকে ক্ষেত্রপালরূপে পূজা করার উল্লেখ আছে। এই পূজায় পঞ্চানন্দের পূজার অর্থহীন আদিম ভাষার ক্ষেত্রে সংস্কৃতের বীজ ছড়ানো যে ধ্যানমন্ত্রের উল্লেখ করেছেন তার থেকেও পঞ্চানন্দের আদিমত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

টং টং বিটং কপানি বিটেং
রং রং রক্তবর্ণং, রক্তজিহ্বা
রক্ত জিহ্বা করালং
ধূং ধূং ধূম্রবর্ণং শকট বিকট নয়নং
পঞ্চাননং ক্ষেত্রপালং নমঃ।

বর্ধমান শহর থেকে ১৩ কিমি উত্তর-পূর্বে সোনাপলাশী গ্রামের ঊনবিংশ শতাব্দীর লেখক, শিক্ষাব্রতীযাজক রেভারেন্ড লালবিহারী দে তাঁর রচিত ঊনবিংশ শতাব্দীর গ্রাম্য জীবনের প্রামাণ্য দলিল "Govinda Samanta" (Bengal Peasant Life) গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে নিম্নবঙ্গের লৌকিক দেবতা পঞ্চানন্দের যে বিবরণ দিয়েছেন তা তাঁর নিজ জন্মভূমি সোনাপলাশীর পার্শ্ববর্তী ভিটা, মির্জাপুর ও কলিগ্রামে অধিষ্ঠিত পঞ্চানন্দের মূর্তির প্রতিফলন বলে অনুমান হয়। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর "বাংলার লৌকিক দেবতা" গ্রন্থে রেভারেন্ড দে-এর Bengal Peasant Life এর এই উদ্ধৃতি আছে।

THE FIVE FACED DEMON

Panchu is a colloquial abbreviation of Panchanan, literally the five faced, one of the Gods of the Hindu Pantheon, a form of all destroying Siva, when properly respected, is a master in the

shape of a man with five faces and fifteen eyes (each face containing three eyes) ...Though the God has good points, since he is pleased sometimes to make women profile, he is in general regarded as exceedingly irritable and malignant and so fiery is he in temperament if any children playing under the tree where the painted stone is placed, happened accidently to touch it, the Demon immediately possess them, and throw into convulsion.

গ্রামবাসীদের কাছে পঞ্চানন্দ পাঁচুঠাকুর বলেই পরিচিত। তিনি অপদেবতা, তাঁর পাঁচটি মুখ—প্রতি মুখে তিনটি করে মোট পনেরটি চোখ। তিনি তুষ্ট হলে বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয়, মরুঞ্চে নারীর সন্তান রক্ষা পায়। গর্ভস্থ ভ্রূণ পূর্ণাবয়ব সুস্থ শিশুতে পরিণত হয়ে প্রসূতির সুখপ্রসব হয়। আবার তিনি রুষ্ট হলে, খেলার ছলে কোন শিশু তাঁর মূর্তি—তা সে মাটির ঘোড়াই হোক, পাথরের ওপর অঙ্কিত বীভৎস মূর্তিই হোক, শ্যাওড়ার ঝোঁপ ও অশ্বত্থ বৃক্ষই হোক—স্পর্শ করলে সঙ্গে সঙ্গে পাঁচুঠাকুর তার ওপর ভর করেন, সেই শিশুকে পেঁচোয় পায়, তার খিঁচুনি আরম্ভ হয়, পাঁচুঠাকুরের পার্শ্বচর ধনুষ্টংকার তাকে আক্রমণ করে; না হয় সেই শিশু দিন দিন শুকোতে থাকে, দড়ির মত পাকাতে থাকে, আধুনিক চিকিৎসা—শাস্ত্রের মতে রিকেটগ্রস্ত হয়। আবার বাবাঠাকুরের কাছে মানত করলে দেয়াসীর দেওয়া মন্ত্রপূত তেল মাখালে শিশুর রিকেট সেরে যায়, পেঁচো-ঘেঁচো সেই শিশুর স্কন্ধ ছেড়ে যায়।

পঞ্চানন্দের মূর্তি অনেকটা মহাদেবের অনুরূপ, তবে কিছুটা বীভৎস ও উগ্র, মাথায় জটা কাঁধে ও পিঠে ছড়ানো। একটি মুখ, তিনটি চোখ, চোখের দৃষ্টি উগ্র, চোখগুলি রক্তাভ ও গোলাকার। গলায় যজ্ঞোপবীত, কান পর্যন্ত বিস্তৃত গোঁফ, মহাদেবের মত দাড়ি নাই। পরনে নেংটীর মত ব্যাঘ্রচর্ম—হাতে রুদ্রাক্ষের বালা ও তাগা, তাতে ত্রিশূল, কোথাও কোথাও অশ্বারূঢ় বা ভল্লুকবাহন। অনেক স্থানে মন্দিরে অধিষ্ঠিত, তবে বেশীর ভাগ জায়গায় অশ্বত্থতলে বা শ্যাওড়া ঝোঁপের নীচে উঁচু বাঁধানো বেদীতে অধিষ্ঠিত। কাটোয়া থানার পঞ্চাননতলায় ও মূলগ্রাম মৌজায় অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে বাঁধান বেদীতে পোড়ামাটির ঘোড়া পাথরের প্রতীক পঞ্চানন্দ রূপে পূজিত। ভাতার থানায় চাঁন্দাই গ্রামে বাঁধানো বেদীতে পোড়ামাটি ঘোড়ার প্রতীকে পঞ্চানন্দের ষোড়শোপচারে পূজা ও বলিদান দেওয়া হত। পূর্বে বিরাট মেলা বসত। মেলায় পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন করে বড় বড় মাটির মূর্তি গড়ে প্রদর্শনী হত। যাত্রা, কীর্তন, কবিগান হত। কয়েক বছর হল পূজা ও

মেলা বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে এ-জেলায় পঞ্চানন্দ, পঞ্চানন বা বাবাঠাকুর বিভিন্ন নামে পূজিত হলেও মূর্তি বিশেষ কোথাও হয় না। বৃক্ষতলে বা গ্রামের প্রান্তে বাঁধানো বেদীতে পোড়ামাটির ঘোড়া বা প্রস্তরশিলাকে প্রতীক করে পূজা করা হয়। নিত্যপূজা বিশেষ কোথাও হয় না। তবে শনি ও মঙ্গলবারে বিশেষ পূজা হয়। পূজার দেয়াসী থাকে, তারা সাধারণত নিম্নশ্রেণীর মহিলা বা পুরুষ হয়। পূজাকালে তাদের ভর হয়। পঞ্চানন্দ দেয়াসীর ওপর ভর করে। ভরের মধ্যেই ভক্তদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেয়। ওষুধ, কবচের নির্দেশ দেয়। গলসী থানার ইরকোনায় পঞ্চানন্দ ভোলা রায় নামে পরিচিত। এখানে বন্ধ্যানারী সন্তান বাসনায় ধর্না দেয়, দেয়াসীর পূজাকালে ভোলাবাবা তার উপস্থিতি জানাতে দেয়াসীর সামনে ঢিল বর্ষণ করে। দেয়াসী বন্ধ্যা-নারীকে মন্ত্রপূত তেল, কবচ দেয়। সন্তান হলে নাম রাখতে হয় ভোলানাথ বা ভুলি। ছেলেদের ডান পায়ে ও মেয়েদের বাম পায়ে লোহার বালা পরিয়ে দিতে হয়। মানসিক শোধ না করা পর্যন্ত চুল কাটা নিষেধ। লোহার বালা ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে উপনয়নের সময় খোলা হয়। অন্যদের ক্ষেত্রে ১২ বৎসরে খোলা হয়। এই বালা পুত্রের ক্ষেত্রে ও মেয়ের ক্ষেত্রে বিয়ের পর নববধূকে বাঁধিয়ে বাম হাতে পরতে হয়। নিম্নশ্রেণী যেখানে পূজারী সেখানে সংস্কৃতখচিত অবোধ্য অর্থহীন আদিম ভাষায় টং টং বিটং কপালি বিটেং ধ্যানে পূজা হয়, আর যেখানে ব্রাহ্মণের দ্বারা শাস্ত্রীর মতে পূজা সেখানে সংস্কৃত ধ্যানে ষোড়শোপচারে পূজা করা হয়। ধ্যানমন্ত্র নিত্যকর্মপদ্ধতি ও পুরোহিত দর্পণে যে মন্ত্র নির্দিষ্ট আছে সে মন্ত্রেই পূজা হয় যেমন—

দ্বিভুজং জটিলং শান্তং করুণাসাগরম্ বিভুম্।
ব্যাঘ্রচর্ম পরিধানং যজ্ঞসূত্র সমান্বিতম্ ॥
লোচন ত্রয় সংযুক্তং ভক্তাভীষ্ট ফলপ্রদম্।
ব্যাধীনামীশ্বরং দেবং পঞ্চাননমহং ভজে ॥

ওঁ ঐং পঞ্চানন্দায় নমঃ। পূজায় ছাগবলি হয়। তবে বর্তমানে অনেক জায়গায় বলিদান প্রথা উঠে যাচ্ছে।

জেলার বিভিন্ন স্থানে পঞ্চানন আজও পূজিত হচ্ছেন। নিম্নশ্রেণীর কাছে বাবাঠাকুর হিসেবে, ব্রাহ্মণ ও উন্নত শ্রেণীর জাতির মধ্যে পঞ্চানন্দ হিসেবে। অনেক গ্রামে একাধিক বাবাঠাকুর ও পঞ্চানন্দ আছে ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায়। কেতুগ্রাম থানার শ্রীপুর, কাটোয়া থানার আলমপুর, কারনিয়া, পঞ্চাননতলা, ও মুলকাটি গ্রামে, মঙ্গলকোট থানার ভারুচা, মেমারীর সাতগেছিঁয়া, মুটরা, শ্রীধরপুর, নিঃশঙ্ক

ও মেমারী গ্রামে, জামালপুর থানার সাদিপুর, নন্দনপুর, নান্দাল, ভীমপুর, শুকুর, কোটা, পল্‌হানপুরে, খণ্ডঘোষ থানার খেজুরহাটি, খণ্ডঘোষ, বোঁয়াই, বাদুলিয়া, তোড়কোনায়, বর্ধমান থানার ভিটা, মির্জাপুর, কলিগ্রামে, ভাতার থানার মহাতা, চাঁদাই, অমরপুর, আউসগ্রামের ছোট রামচন্দ্রপুর, পাণ্ডুক ও সুয়াতায় এখনও পঞ্চানন্দ পূজিত হচ্ছেন—কোথাও বৃক্ষদেবতা ক্ষেত্রপাল রূপে, কোথাও শিবপুত্র বটুক ভৈরব রূপে, কোথাও বা অপদেবতা ভোলানাথ রূপে।

পূর্বে গ্রামে প্রসূতিদের প্রসব করাতো হাড়ি সম্প্রদায়ের অনুন্নত শ্রেণীর মহিলারা। তারা বাঁশের ছাল চেঁচে তাই দিয়ে নবজাতকের নাড়ি কাটতো। ডেটল বা টিটেনাস্ প্রতিরোধের কোন বালাই ছিল না। কাজেই অনেক নবজাতক ধনুষ্টঙ্কার বা টিটেনাস রোগে আক্রান্ত হত। তাছাড়া অপুষ্টির জন্য উপযুক্ত পরিমাণে 'ডি' ভিটামিনের অভাবে রিকেট রোগে আক্রান্ত হত। হাড় বেঁকে যেত। শরীর শুকিয়ে যেত। চামড়া দড়ি পাকানোর মত হয়ে যেতো। অস্থিকঙ্কাল সার হত। অজ্ঞ গ্রামবাসীরা ভাবতো বাবা পঞ্চানন্দের অপরাধ হয়েছে। তাঁর বাহন পেঁচো, ঘেঁচো ও ধনুষ্টঙ্কার শিশুর ওপর ভর করেছে, শিশুকে পেঁচোয় পেয়েছে। ছুটতো বাবাঠাকুরের বা পঞ্চানন্দের থানে হত্যে দিতে বা মানত করতে। কাজেই আগে পাঁচুঠাকুরের পূজার রমরমা ছিল। এখন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা হাসপাতালে স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে প্রসূতির প্রসব করানো হচ্ছে। পোলিও ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে। কাজেই পেঁচোয় পাওয়া অনেকটা ঘুচেছে। কিন্তু বলা তো যায় না। দেবতাদের রুষ্ট হতে কতক্ষণ, কাজেই সেই আশঙ্কায় বাবাঠাকুরও পূজা পাচ্ছেন।

পঞ্চানন্দ বা বাবাঠাকুর আদিতে ছিলেন অষ্ট্রিক সম্প্রদায়ের দেবতা, পাল শাসনের সময় থেকে অনেক লৌকিক দেবদেবীর সঙ্গে পঞ্চানন্দও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মধ্যে আপন স্থান করে নেয়। এ সম্পর্কে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁর বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখযোগ্য।

"পাল যুগে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ দেবদেবীদের মধ্যেও একটা বৃহৎ সমন্বয় ও স্বাঙ্গীকরণ চলিতেছিল; বৌদ্ধ ও শৈবতন্ত্র, ধর্ম ও চিন্তা, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীদের একটি বৃহৎ সমন্বয় সূত্রে গাঁথিয়া তুলিতেছিল; বৌদ্ধরা অসংখ্য ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীকে স্বীকার করিয়া লইতেছিল, আর্যেতর ব্রাহ্মণেতর সংস্কৃতির দেবদেবীদের পঙ্‌ক্তিভুক্ত করিতেছিলেন। অন্যদিকে ব্রাহ্মণেরাও বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণেতর, আর্যেতর দেবদেবীদের কিছু কিছু মানিয়া লইতেছিলেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই সমন্বয় ও স্বাঙ্গীকরণ সমভাবেই চলিতেছিল।" এই পঞ্চানন্দও আর্যেতর সংস্কৃতি থেকে উন্নীত হয়ে বৌদ্ধনাথযোগীদের "আদিত্য নিরঞ্জন

নৈরাকার নগ্রস্ত পঞ্চানন্দ ধর্মে ও পরে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর সারণীতে শিবের অন্যতম প্রমথরূপে পূজিত হতে থাকেন।

এ সম্বন্ধে গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু তাঁর 'বাংলার লৌকিক দেবতা' গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন তার উল্লেখ করে পঞ্চানন্দ, বাবাঠাকুরের আলোচনা শেষ করবো।

"শিব আদিতে অনার্যদের উপাস্য ছিলেন, পরে আর্য দেবকুলস্থ হয়েছেন, আরও পরে বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্যকালে তিনি মহাযোগীরূপে কল্পিত হয়েছেন, বৌদ্ধপ্রভাবে রূপান্তরিত শিবমূর্তিই আমরা বর্তমানে দেখি, আদি মূর্তি কি ছিল তা জানবার উপায় নেই, তবে ইনি যখন ব্রাত্যদের কল্পিত দেবতা, সেদিক দিয়ে অনুমান করা যায় এঁর আদিরূপ নিশ্চয়ই এত সুন্দর ও সৌম্য ছিল না, আর্যপূর্ব যুগের আদিবাসীরা দেবতাকে মঙ্গলদাতা, করুণাময়, মহাযোগী বলে কল্পনা করতো না, দেবতা বলতে তারা প্রতিহিংসাপরায়ণ, সদাক্রুদ্ধ, অশরীরী শক্তিই মনে করতো, যখন তারা কিছু উন্নত হয়ে সেই অশরীরী আত্মার নিজেদের মত মনুষ্যরূপ দিতে থাকে সেগুলির আকৃতি অতি ভয়াবহ, উগ্রভাব ব্যঞ্জক ছিল। পরে উন্নত স্থানে শিবই শান্তরূপ ধরলেন। আদি শিব সমাজে পূর্বরূপ নিয়েই থাকলেন, 'বাবাঠাকুর' হয়ত এর আদিনাম ছিল, পরে পঞ্চানন্দ লাভ করলেন, কিন্তু শিবের সঙ্গে এর সম্পর্কের কথা ব্রাত্যরা ভুললেন না। ব্রাত্য সমাজ উন্নত হলে ব্রাহ্মণরা তাদের দেবতাকে স্বীকার করার পর লৌকিক শিব ও শাস্ত্রীয় শিবের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করলেন; বাবাঠাকুর বা পঞ্চানন্দকে শিবের আকৃতিভেদ শিবপুত্র বটুক-ভৈরব ইত্যাদি প্রচার করে উন্নত ও অনুন্নত সমাজের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করলেন যাতে উভয় শ্রেণীই পূজা করে তাদের মন্দিরে বা থানে, পঞ্চানন্দের বা বাবাঠাকুরের ভক্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।" এইভাবেই বাবাঠাকুর ও পঞ্চানন্দের মধ্যে আর্যেতর ব্রাহ্মণ্যেতর সংস্কৃতির সঙ্গে আর্য ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ঘটেছে সমন্বয় ও স্বাঙ্গীকরণ। সেই Tradition আজও অব্যাহত আছে। যতদিন গ্রামের সর্বশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার বিস্তার না ঘটছে, যতদিন গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে না উঠছে, যতদিন মানুষের কুসংস্কার মাদুলি কবচের অন্ধবিশ্বাস দূর না হচ্ছে, ততদিন বাবাঠাকুর ও পঞ্চানন্দ পূজা পেতে থাকবেন।

নয় অধ্যায়

জেলার ব্রত়পার্বণ

জেলার লোকসংস্কৃতির একটি ধারা ব্রতপার্বণ। এই ধারা প্রাক্‌বৈদিক কাল থেকে জেলার লোকসংস্কৃতিতে বিশেষ অবদান জুগিয়ে আসছে। ক্রমে লোকের বিজ্ঞানচেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ ধারা যেন দিন দিন শুকিয়ে আসছে। আমরা আমাদের ছোটবেলাতেও আমার বোনেদের, পাড়ার মেয়েদের যে সব ব্রত-পার্বণের অনুষ্ঠান করতে দেখেছি আজকাল উচ্চকোটি পরিবারে সে সব প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। হয়ত এ ধারা একদিন শুকিয়ে যাবে। অথচ জেলার লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ ধারার অবদান কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লোকসংস্কৃতির এই ধারাকে শ্রদ্ধা করেছেন, মমতা করেছেন, এই ধারা যাতে শুকিয়ে না যায় বরং পল্লীর প্রাণকেন্দ্রের সঙ্গে আমাদের যোগ নিবিড় হয়ে একটি বিশ্বচেতনার ঔদার্য্য সৃষ্টি হয়, তার জন্য নিজেও পরিশ্রম করেছেন। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত ১৩০১ সালে প্রকাশিত "মেয়েলি ব্রত" গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ যে ভূমিকা লিখেছেন তাতে ব্রত সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ও ব্রতকথা সংগ্রহে তাঁর নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

"সাধনা পত্রিকা সম্পাদনাকালে আমি ছেলে ভুলাইবার ছড়া এবং মেয়েলি ব্রত সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ব্রতকথা সংগ্রহে অঘোরবাবু আমার প্রধান সহায় ছিলেন। সেজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি। অনেকের নিকট এই সকল ব্রতকথা ও ছড়া নিতান্ত তুচ্ছ ও হাস্যকর বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা গম্ভীর প্রকৃতির লোক এবং এরূপ দুঃসহ গাম্ভীর্য বর্তমানকালে বঙ্গ সমাজে অতিশয় সুলভ হইয়াছে।...

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসে যথেষ্ট মনোযোগ করিয়া থাকেন এবং ছড়া রূপকথা প্রভৃতি সংগ্রহেও সংকোচবোধ করেন না। প্রথমত, তাঁহারা জানেন যে, যে সকল কথা ও গাথা সমাজের অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকাল

স্থান পাইয়া আসিয়াছে, তাহারা দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ না হইয়া যায় না—দ্বিতীয়ত যাহারা স্বদেশকে অন্তরের সহিত ভালবাসে তাহারা স্বদেশের সহিত সর্বতোভাবে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হইতে চাহে এবং ছড়া, রূপকথা, ব্রতকথা প্রভৃতি ব্যতিরেকে সেই পরিচয় কখনও সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

সাধনায় যখন আমি এগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তখন আমার কোনপ্রকার মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না। সমাজের সুধীভাণ্ডার যে অন্তঃপুর তাহারই প্রতি স্বাভাবিক মমত্ববশত আকৃষ্ট হইয়া আমাদের মাতা, মাতামহী, আমাদের স্ত্রীকন্যা সহোদরাদের কোমল হৃদয়পালিত মধুরকণ্ঠলালিত চিরন্তন কথাগুলিকে স্থায়ীভাবে একত্র করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং অঘোরবাবুকে এই সমস্ত মেয়েলি ব্রত গ্রন্থাকারে রক্ষা করিতে উৎসাহী করিয়াছি, সে জন্য গম্ভীর প্রকৃতি পাঠকদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।" রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যের এই শাখা-প্রশাখাগুলিকে ক্রমশ শুকিয়ে যেতে দেখে আক্ষেপ করেছিলেন। 'কেবল সম্প্রতি অতি অল্পদিন হইল আধুনিককাল, দূরদেশাগত নবীন জামাতার মতো নতুন চালচলন লইয়া পল্লীর অন্তঃপুরেও প্রবেশ করিয়াছে। গ্রামের মধ্যেও পরিবর্তনের হাত পড়িয়াছে।" এখন দেখা যাক এই ব্রত কি? এর উদ্দেশ্যই ও স্বরূপই বা কি? আর আমাদের সমাজের লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যে এর অবদানই বা কি?

√বৃ + অতক্ অর্থাৎ বৃ ধাতুর উত্তর অতক্ প্রত্যয়ান্ত পদ ব্রত; যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—শাস্ত্রবিহিত নিয়মপূর্বক ধর্মকর্ম, মনের অন্তর্নিহিত কামনা পূরণের জন্য বিশেষ বিশেষ দেবতার নিকট প্রার্থনা জানিয়ে আচার-অনুষ্ঠান পালন। ব্রতের মধ্যে যিনি ব্রত পালন করেন সেই ব্রতীর কামনাই প্রবল। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে ব্রতের সংজ্ঞায় বলেছেন—'কিছু কামনা করে যে অনুষ্ঠান সমাজে চলে আসছে তাকেই বলি ব্রত।'

এই ব্রতের সূচনা সম্বন্ধে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব' গ্রন্থে বলেছেন—ব্রতোৎসবের ইতিহাস অতি জটিল ও সুপ্রাচীন; তবে এই ধরনের ধর্মোৎসব যে প্রাক্-বৈদিক আদিবাসী কোমদের সময় হইতে সুপ্রচলিত ছিল এ-সম্বন্ধে সংশয় বোধহয় নাই। আর্য-ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি যাঁহাদের বলিয়াছেন 'ব্রাত্য' বা পতিত তাঁহারা কি ব্রত-ধর্ম পালন করিতেন বলিয়াই ব্রাত্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন এবং এই জন্যই কি আর্যরা তাঁহাদের পতিত বলিয়া গণ্য করিতেন? বোধহয় তাহাই। ব্রতের সঙ্গে ব্রাত্যদের সম্বন্ধ কোন অকাট্য

প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। তবে এই অনুমান একেবারেই অযৌক্তিক ও অনৈতিহাসিক নাও হইতে পারে। ঋগবেদীয় আর্যরা ছিলেন যজ্ঞধর্মী। যজ্ঞধর্মী আর্যদের বাহিরে যাঁহারা ব্রাত্যধর্ম পালন করিতেন, ব্রতের গুহ্য জাদুশক্তি বা ম্যাজিকে বিশ্বাস করিতেন তাঁহারাই হয়তো ব্রাত্য।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রতের উৎপত্তির ইতিহাস প্রসঙ্গে বলেছেন—"নানা ঋতুর মধ্য দিয়ে নানা সব ঘটনা মানুষের চিন্তাকে আকর্ষণ করেছে এবং এই সকল ঘটনার মূলে দেবতা, অপদেবতা নানারকম কল্পনা করে নিয়ে তারা শস্য কামনায়, সৌভাগ্য কামনায়—এমনি নানা কামনা চরিতার্থ করবার জন্য ব্রত করেছে। কি আর্য কি 'অন্যব্রত' সব দলেই কামনা কোথায় নাই?"

শাস্ত্রীয় মতে যে পূজা তাতেও এই কামনা—

"বন্দিতাঙ্ঘ্রি যুগে দেবি সর্বসৌভাগ্য দায়িনি।
রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি ॥
ওঁ আয়ুর্দেহি যশো দেহি, ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে
পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে।"

"বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমস্তুতে।"

আবার অশাস্ত্রীয় মতে মেয়েলি ব্রতেও এই 'দেহি দেহি' প্রার্থনা—

"গৌরী গো মা তোমার কাছে মাগি বর
স্বামীপুত্র নিয়ে যেন সুখে করি ঘর।" (তুষতুষলি)
স্বামীর কোলে পুত্র দোলে
মরণ হয় গো একগলা জলে। (পুণ্যিপুকুর)
আমি দেই পিটুলি গয়না
আমার হোক সোনার গয়না। (সাঁজপুজুনি)

ব্রত প্রাচীনকালের উৎসব বলেই অনেকে মত প্রকাশ করেছেন—আদিতে ব্রত ছিল গোষ্ঠীর উৎসব—গোষ্ঠীবদ্ধভাবে প্রকৃতির কাছে মানুষের কামনা জানানোর মধ্যে ব্রতের আদিমরূপ নিহিত। তারপর গোষ্ঠীর বন্ধন ছেড়ে মানুষ ক্রমশ ব্যক্তিকেন্দ্রিক হলো—নারীদের প্রাত্যহিক জীবনে জুড়ে দিল ধর্ম—ধর্মকে ভিত্তি করেই নারীর সংসার গড়ে উঠেছিল—এই ধর্মের মূলে ছিল ভয়, শাপ, পাপ, তাপ—এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য নিরক্ষর মেয়েরা স্বামী-সন্তানের মঙ্গল কামনায় ধনেজনে-ভরা সুখের সংসার গড়ে তোলার কামনায়, সতীনের কাঁটা উপড়ে ফেলার প্রার্থনা করে প্রকৃতির কাছে যে প্রার্থনা জানাতো, তাই ব্রত। অবনীন্দ্রনাথের কথায়—"খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলি ঠিক দেবতার পুজো নয়, এর

মধ্যে ধর্মাচরণ কতক, কতক উৎসব। ব্রতের মধ্যে আমরা পাই কিছু ছবি, কিছু গান, কিছু নাটক, কিছু কাব্য। সত্যিই একে শুধু ধর্মপালন বলা ঠিক হবে না কারণ এ তো ঋতুরও উৎসব। মানুষ, গাছপালা, সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতিকে মিলিয়ে উৎসব। তাই তো দেখি বৈশাখে জল কামনায় পুণ্যিপুকুর, ভাদ্রে শস্ পাতা বা শস্যপাতা (ভাঁজো), পৌষে তোষলা—তুষ ইত্যাদি সারমাটি, সরষে, মূলো, শিমের ফুল দিয়ে; আবার চৈত্র মাসে অশ্বত্থ পাতার ব্রত—যখন তার শেষ শুকনো পাতাটি খসিয়ে নতুন কচি পাতার নবকলেবর ধারণ করে, গাছে কিশলয়টির সঙ্গে পড়ে থাকা ঝুরো পাতাটির যে সম্পর্ক এই ব্রতে যেন তারই ইঙ্গিত।"

ব্রতকথাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—কোন দেবতা পূজা প্রচারকল্পে হয়ত নরনারীর রূপ ধরে মর্তে আসবেন, সমাজে কোন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির সেই দেবতাকে অবজ্ঞা; তখন সেই রুষ্ট দেবতার রোষে তিনি চরম দারিদ্র্য ও বিপদগ্রস্ত হবেন; পরে দারিদ্র্য ও কষ্ট সহ্য করতে না পেরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই দেবতাকে সন্তুষ্ট করবে—দেবতা সন্তুষ্ট হলে ধনেজনে ঘর ভরে উঠবে। দেবতার পূজা, ব্রত-সমাজে প্রচলিত হবে। এই ভাবেই ব্রতের উদ্ভব। 'ব্রতের কথাগুলি অতীতযুগের দেশের সুখ-সমৃদ্ধির অলিখিত ইতিহাস। প্রাচীন ধর্মচিত্রের সহিত সমাজ ও পরিবার চিত্র একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়া এক অভিনব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে। এই অনাবিল ছবি মাতৃভক্তিতে পবিত্র, গুরুভক্তিতে স্বর্গীয় এবং বঙ্গগৃহশ্রী বধূগণের লক্ষ্মীভাবে কোমল।' (গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য)

বাংলার অন্যান্য জেলার মত এ-জেলাতেও দু-ধরনের ব্রত প্রচলিত আছে—শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় বা লৌকিক। শাস্ত্রীয় ব্রতের মধ্যে আছে সত্যনারায়ণ ব্রত, অন্নদান জলদান ব্রত, শিবচতুর্দশী ব্রত, সাবিত্রী ব্রত, অনন্ত ব্রত, মঙ্গলচণ্ডী ব্রত ইত্যাদি। এইসব ব্রতে পুরোহিতের দরকার হয়, পুরোহিতের ফর্দ মত জিনিসপত্র যেমন আলপনা, নৈবেদ্য, ঘট, শাড়ী, লোহা, সোনা, রূপা সবই যোগাড় করতে হয়, সংস্কৃতে মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে ব্রতের সূচনা—কোন কোন ক্ষেত্রে হোমযজ্ঞও করতে হয়। আবার ব্রতকথাও শুনতে হয়। এগুলিও সংস্কৃতে রচিত। পুরোহিতের মুখে অশুদ্ধ, অবোধ্য মন্ত্রগুলি নীরবে ব্রতীকে শুনে যেতে হবে—শোনার পর পুরোহিতকে পৃথকভাবে দক্ষিণা দিতেও হবে। এইসব ব্রতকথা না শুনলে বিপদ আসে আর শুনলে শৃণোতি চ কথাং পুণ্যাং ভুক্তিমুক্তি-ফলপ্রদাম্। ধনধান্যাদিকং তস্য ভবেৎ সত্যপ্রসাদিতঃ।

আর লৌকিক ব্রতে যেমন পুণ্যিপুকুর, দশপুত্তুল, সাঁঝ্‌পূজনি, তুষতুষুলি মেয়েলি মতে জিনিসপত্র যোগাড় করে মেয়েলি মন্ত্রে পুজো করলেই চলে—

পূজোও করবে ব্রতী নিজে—মা, ঠাকুর মা মন্ত্র বা ছড়া বলিয়ে দেবেন। এইসব ব্রতে কামনার প্রতিচ্ছবি আলপনাও আঁকতে হবে—যেমন সাঁঝপূজনি ব্রতে—এই আসছে গমের ছালা/তা তুলতে গেল বেলা। এই ছড়া বলেই গমের মরাই-এর আলপনার ওপর ফুল দিতে হবে। পুণ্যিপুকুর ব্রতে উঠোনের ধারে ছোট্টপুকুর কাটতে হবে। বেলডাল, তুলসীর চারা, ফুল যোগাড় করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করে সধবাদের ব্রতের ক্ষেত্রে ব্রতকথাও শুনতে হবে। পাড়ারই কোন বর্ষিয়সী মহিলার কাছে এক সের চাল একটা সুপুরি নিয়ে গিয়ে পাড়ার পাঁচজন ব্রতী বসবে আর সেই মহিলা বাংলায় ব্রতকথা বলে যাবেন। চালগুলি তাঁর দক্ষিণা।

'বার মাসে তেরো পার্বণে'র মত বারো মাসে শতাধিক ব্রতের বিধান আছে। ড. শীলা বসাক বারো মাসে ১২২টি ব্রতের উল্লেখ করেছেন। আমাদের জেলাতে এতগুলি ব্রত না থাকলেও কম করে চল্লিশ বিয়াল্লিশ রকমের ব্রত তো অনুষ্ঠিত হয়ই। বছরের কোন মাসে কি কি ব্রতের বিধান তার একটা তালিকা দেওয়া গেল—এর থেকেই বোঝা যাবে কত রকমের ব্রত এ জেলাতেই আছে—

বৈশাখ : পুণ্যিপুকুর, দশপুত্তুল, গোকাল, অক্ষয়তৃতীয়া, অক্ষয়ফল, অক্ষয় সিঁদুর, হরিষমঙ্গলবার, হরির চরণ. জলসংক্রান্তি, অন্নদান-জলদান, সুবচনী। তবে সুবচনী ব্রতটি বছরের যে কোন সময়েই পালন করা যায়—বিশেষ করে বাড়ীতে বিবাহ, উপনয়ন এইসব অনুষ্ঠানের শেষে সুবচনী ও সত্যনারায়ণের কথা দেবার রেওয়াজ আছে।

জ্যৈষ্ঠ : জয়মঙ্গলবার, অরণ্যষষ্ঠী, সাবিত্রী চতুর্দশী।

আষাঢ় : বিপত্তারিণী, অম্বুবাচী।

শ্রাবণ : নাগপঞ্চমী, লোটন বা লুণ্ঠনষষ্ঠী।

ভাদ্র : জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, অনন্ত চতুর্দশী, মন্থন বা চাপড়াষষ্ঠী, ভাঁজো, ভাদ্রের লক্ষ্মী।

আশ্বিন : জিতাষ্টমী, গাড়শী ষষ্ঠী, কোজাগরী লক্ষ্মী।

কার্তিক : ইতু, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

অগ্রহায়ণ : নাটাই চণ্ডী, ইতু।

পৌষ : তুষতুষুলি, লক্ষ্মীপূজা ও পৌষ-পার্বণ।

মাঘ : শীতলাষষ্ঠী, ভৈমী একাদশী।

ফাল্গুন : শিবরাত্রি।

চৈত্র : নীলষষ্ঠী, অশোকষষ্ঠী, রামনবমী, ঘেঁটু, চৈত্র লক্ষ্মী, ছাতু সংক্রান্তি।

এছাড়া আছে প্রতি বৃহস্পতিবার বারমেসে লক্ষ্মী, প্রতি শুক্রবার সন্তোষী মায়ের ব্রত, বারমেসে সত্যনারায়ণ ব্রত, প্রতি শনিবার শনির পাঁচালী। অধিকাংশ ব্রতেই মেয়েদের অধিকার। ব্রতগুলি হলো নারী কামনার প্রতীক। এই সব ব্রতের মধ্যে কুমারী, সধবা, বিধবাদের মধ্যে ভাগ আছে। কতকগুলি ব্রত কুমারী ও কতকগুলি বিধবা, আবার কতকগুলি সধবা ও বিধবা উভয়েই পালন করে থাকেন। কুমারীদের ব্রতের মধ্যে আছে—পুণ্যিপুকুর, হরির চরণ, দশপুত্তুল, গোকাল, শিবব্রত, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, তুষতুষুলি, সন্তোষী মা। সধবাদের ব্রত হচ্ছে—হরিষমঙ্গলবার, জয়মঙ্গলবার, অক্ষয়তৃতীয়া, অক্ষয়ফল, অক্ষয় সিঁদুর, অন্নদান-জলদান, নাটাইচণ্ডী, অরণ্যষষ্ঠী, লোটনষষ্ঠী, অশোকষষ্ঠী, নীলষষ্ঠী, চাপড়াষষ্ঠী, শীতলাষষ্ঠী, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, জিতাষ্টমী, সত্যনারায়ণ ব্রত, শিবরাত্রি ব্রত, সন্তোষী মা। এগুলির মধ্যে অধিকাংশ ব্রত বিধবারাও করতে পারেন। তবে বিশেষ ভাবে বিধবাদের পালনীয় অম্বুবাচী, একাদশী ব্রত, শিবরাত্রি ব্রত, নীলষষ্ঠী, অশোকষষ্ঠী।

ব্রতে পুরুষদের বিশেষ ভূমিকা নাই তবে একবারে ব্রাত্যও নন। পুরুষরা সত্যনারায়ণ ব্রত, শিবরাত্রি ব্রত, জন্মাষ্টমী ব্রত পালন করতে পারেন। নিম্নশ্রেণী-দের ব্রত—তুষতুষুলি, ভাদু, ভাঁজো, নাগপঞ্চমী। মুসলিমদের মধ্যে সত্যপীর ব্রত খুব সাধারণ, হিন্দুরাও এতে যোগ দিতে পারেন। সাঁওতালদের ব্রত—করম। এই সব ব্রত নিয়ে জেলায় গড়ে উঠেছে তেরো পার্বণের পাঁচালি।

তেরো পার্বণের পাঁচালি

চৈত্র মাসে চড়কপূজা গাজনে বাণ ফোঁড়া
বৈশাখ মাসে দেয় সকলে তুলসী গাছে ঝারা।
জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠীবাটা জামাই আনাআনি,
আষাঢ় মাসে রথযাত্রা দড়া টানাটানি।
শ্রাবণ মাসে ঢেলা ফেলা হয় চড়চড়ি,
ভাদ্র মাসে টক পান্তা খান মনসা বুড়ি।
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা কাটে মোষ পাঁঠা,
কার্তিকে কালিকা পূজা ভাইদ্বিতীয়ার ফোঁটা।
অঘ্রাণে নবান্ন নূতন ধান কেটে
পৌষ মাসে বাঁউনি বাঁধা ঘরে ঘরে পিঠে।
মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী ছেলের হাতেখড়ি
ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা ফাগ ছড়াছড়ি।।

ঋতু অনুযায়ী কয়েকটি ব্রতের বিবরণ

বৈশাখ মাসের ব্রত :

শিবব্রত : সাধারণত কুমারী মেয়েরা শিবের মত স্বামী ও সুখী-দাম্পত্য জীবন কামনা করে এই ব্রত পালন করে। সধবাদের অনেকে পুত্রের মঙ্গল কামনা করে এই ব্রত করেন—তবে এঁদের সংখ্যা নগণ্য।

এই ব্রতে লাগে গঙ্গামৃত্তিকা, গঙ্গাজল, আতপ চাল, ধুতুরা, আকন্দ ও কলকে ফুল, বেলপাতা, শ্বেতচন্দন।

সারা বৈশাখ মাসে পূর্বাহ্ণেই এই ব্রত করতে হয়।

প্রথমে, ওঁ শিবায় নমঃ বলে গঙ্গা অভাবে সাধারণ মাটি ১ তোলা বা দুই তোলার মত নিতে হয়। এরপর মহেশ্বরায় নমঃ বলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ শিবলিঙ্গ তৈরী করতে হবে। কাঁসা বা তাম্রপাত্রে একটি ত্রিপত্র বেলপাতা দিয়ে তার উপর লিঙ্গটি এমনভাবে বসাতে হবে যাতে গৌরীপট্টটি উত্তরমুখী হয়। শিবলিঙ্গটি-র মাথাটি একটু টিপে তার ওপর বজ্র অর্থাৎ একটি ছোট্ট মাটির গুলি স্থাপন করতে হবে। শ্বেতচন্দন অর্ধচন্দ্রাকৃতি আকারে ললাটে দিতে হবে। এরপর গঙ্গাজল অভাবে পুষ্করিণী বা নদীর জলে স্নান করাতে হবে। স্নানের মন্ত্র—আকন্দ শ্রীবিল্বপত্র তোলা গঙ্গা জলে/এই পেয়ে তুষ্ট হলো ভোলা মহেশ্বর। এরপর বিল্বপত্র, আকন্দ, ধুতুরা ফুল দিয়ে পূজা করতে হবে। পূজার মন্ত্র :

শিল শিলাটন শিলে বাটন শিল অঝঝর করে।
স্বর্গ হতে মহাদেব বলেন গৌরী কি বত্ত করে।
আশ নড়ে, পাশ নড়ে, নড়ে সিংহাসন।
হরগৌরী কোলে করে গৌরী আরাধন ॥
কাল পুষ্প তুলতে গেলাম সেখানে লতাপাতা
শিবের চরণ দেখা হলো, শিবের মাথায় জটা।
অখণ্ড বিল্বপত্র তোলা গঙ্গাজল
এই পেয়ে তুষ্ট হলেন ভোলা মহেশ্বর ॥

প্রণাম মন্ত্র : নমঃ শিবায় নমঃ, শিবায় নমঃ, নমঃ হরায়, নমঃ বজ্রায়, নমঃ শিবায়।

চৈত্র সংক্রান্তিতে শুরু করে বৈশাখী সংক্রান্তি পর্যন্ত এই ব্রত করতে হয়। চারবছর এই ব্রত করার নিয়ম। ব্রতের শেষ বৎসরে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিতে হবে। এ ব্রতের আবাহনও নাই বিসর্জনও নাই। তবে প্রতিদিন শিবলিঙ্গ গড়ে পূজান্তে জলে দিতে হয়।

পুণ্যিপুকুর : বৈশাখ মাসের ব্রত। এই ব্রত সাধারণত কুমারী মেয়েরাই করে থাকে। এই ব্রত করলে দেবতার মত স্বামী, কার্তিকের মত পুত্র ও কুবেরের মত ধনের অধিকারী হওয়া যায়। এই ব্রতের সূচনা হয় চৈত্র সংক্রান্তি থেকে, সমাপ্তি ঘটে বৈশাখী সংক্রান্তিতে।

ব্রতের উপকরণ হলো উঠানের একপাশে কিংবা তুলসীতলায় মোটামুটি এক ফুট লম্বা এক ফুট চওড়া ও ছয় ইঞ্চির মত গভীর পুকুর কাটতে হবে। এর চারি পাড়ে চারটি ঘাট করতে হবে। প্রতি ঘাটের দুপাশে একটি করে কড়ি বসিয়ে দিতে হয়। গর্তের মধ্যে কাঁটাসমেত বেলডাল ও একটি তুলসী চারা বসাতে হয়। পূজার সময় চারটি ঘাটের একটি ঘাটে চন্দন কাঠ, একটি ঘাটে সুপারি আর অন্য দুটি ঘাটে শাঁখ ও সিঁদুর কৌটো রেখে পুজোয় বসতে হবে।

প্রথমেই বেলডালের কাঁটায় কলকে ফুল গেঁথে গর্তের মধ্যে সাদা ফুল, তুলসী, দূর্বা ও একঘটি জল ঢেলে দিয়ে একটি মালা বেলডালে পরিয়ে দিতে হয়। পুকুরের চারপাড়ে ফুল সাজিয়ে ব্রতিনী হাত জোড় করে ছড়া বলবে—এই ছড়াই মন্ত্র :

পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা,
কে পূজেরে দুপুরবেলা?
আমি সতী লীলাবতী,
সাত ভায়ের বোন ভাগ্যবতী।
হয়ে পুত্র মরবে না,
পৃথিবীতে ধরবে না।
ঢালি জল তুলসী বিল্বদলে
স্বামী সোহাগিনী হবে ফলে ফুলে।
পুণ্যিপুকুর ঢালি জল।
শ্বশুরকুলের হোক মঙ্গল।
এ পূজনে কি হয়? নির্ধনের ধন হয়,
সাবিত্রী সমান হয়, স্বামী আদরিণী হয়।
পুত্র হয়ে মরবে না, যমের জ্বালা পাবে না
বাজিয়ে শাঁখের ধ্বনি, ব্রত করে দুয়োরাণী।
পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে মরণ হবে গঙ্গার জলে॥

এরপর ব্রতিনী পুকুরে তিনবার জল ঢালবে।

চারবছর এই ব্রত করতে হয়, চতুর্থ বৎসরে বৈশাখী সংক্রান্তিতে হয় ব্রতের উদ্‌যাপন। উদ্‌যাপনের পুজো শেষ করে কড়ি, রূপা ও সোনার টুকরোর অভাবে মূল্যস্বরূপ একটি তামার মুদ্রা ও গঙ্গা মাটি দিয়ে গর্ত বুজিয়ে দিতে হবে। গর্তের মধ্যেই বেলডাল ও তুলসীচারা থেকে যাবে। এরপর ব্রতিনী বাড়ীর বর্ষিয়সী মহিলার কাছে ব্রতকথা শুনবে। ব্রতকথার মূল বিষয় হলো—এক গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের স্ত্রী, দু'ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে ছোট সংসার। কোনমতে ভিক্ষে-টিক্ষে করে দিন চলে—বাস এক কুটিরে। কিন্তু অত্যাচারী জমিদার বাকি খাজনার দায়ে তা-ও কেড়ে নেয়। ব্রাহ্মণ ঘর ছেড়ে দিয়ে এক পুকুর পাড়ে এসে কুঁড়ে করে বাস করতে থাকে। ব্রাহ্মণী ঘরে সামান্য যে চালডাল ছিল তাই দিয়ে রান্না চড়ায়। মেয়ে গেছে পুকুরে স্নান সেরে পুণ্যিপুকুর ব্রত সারতে। ছড়া বলতে বলতে বাবার দুঃখের কথা মনে পড়ায় কেঁদে আকুল। তার আকুল ক্রন্দনে নারায়ণ সাড়া না দিয়ে পারলেন না। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে এসে বালিকাকে আশীর্বাদ করে ও খাবার চায়। কিন্তু কি খেতে দেবে? যা চালডাল চড়ানো হয়েছে তাতে সবার পেট ভরবে না। তখন মায়ের অবস্থা বুঝে মেয়েটি তার নিজের খাবারের অংশ ব্রাহ্মণকে দিতে বলল। খাওয়ার পর একটি কড়ি দিয়ে দক্ষিণাও দিয়ে প্রণাম করে। প্রণাম সেরে উঠেই ব্রতিনী দেখে ব্রাহ্মণ নাই। সে বুঝল, দেবতা ছল করে তার খাবার খেয়ে নিয়ে গেছে। নিজেকে সে ধন্য মনে করলো। সেই রাত্রেই নারায়ণ জমিদারকে স্বপ্ন দেন—ব্রাহ্মণের ভিটেতে বাড়ী করে ওকে ফিরিয়ে দাও; আর ধনদৌলত দিয়ে ওকে প্রতিষ্ঠিত করো। আর তোমার ছেলের সঙ্গে ব্রাহ্মণ-কন্যার বিয়ে দিয়ে ওকে প্রতিষ্ঠিত করো আর তা না-হলে তোমার রাজ্য ছারখার হয়ে যাবে। সকালেই ব্রাহ্মণের ডাক পড়লো। ব্রাহ্মণ তো বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে রাজার কাছে যায়। রাজা সে দিন দিনক্ষণ দেখে নিজের ছেলের সঙ্গে ব্রাহ্মণ-কন্যার বিবাহ দেন ও বহু ধনরত্ন দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ব্রাহ্মণ-কন্যা রাজরানী হয়। সেই দিন থেকে পুণ্যিপুকুর ব্রত প্রচলিত হলো।

এখন এই পুণ্যিপুকুর ব্রতের উপকরণ ও ব্রতকথা বিশ্লেষণ করলে পল্লী অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক একটা চিত্র ফুটে ওঠে। কাঁটাযুক্ত বিল্বডাল যদি পুং-জননেন্দ্রিয়ের প্রতীক, তার পাশে তুলসীচারা নারীর প্রতীক হয়, কড়ি হচ্ছে ধনের প্রতীক, পুণ্যিপুকুর ব্রতের জলাশয়ের প্রতীক বলে মনে হয়। এই উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করলে পুণ্যিপুকুর ব্রতের আদিম উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। ব্রত পালনের মাধ্যমে প্রচণ্ড গ্রীষ্মে কুমারী বালিকার মনোমধ্যে ধনী স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে তৃষিত জনগণের জলকষ্ট নিবারণের জন্য পুষ্করিণী খননের

আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন অনুমান করা যায়। তাছাড়া মন্ত্রের যাদু দ্বারা অলৌকিক উপায়ে বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে ধরণীকে শস্যশ্যামলা করার আকাঙ্ক্ষাও অনুমিত হয়। ব্রতকথার মধ্যে জমিদারের অত্যাচারে ব্রাহ্মণকে তার ভিটে থেকে উৎখাত করার মধ্যে প্রাচীনকালে জমিদারের প্রজাদের ওপর অত্যাচারের চিত্রও ফুটে ওঠে। ব্রতকথায় বালিকা নিজে না খেয়ে অতিথি ব্রাহ্মণকে ভোজন করানোর মধ্যে গ্রাম্য-বালিকার অতিথিবাৎসল্যের-ও পরিচয় মেলে। আবার কুমারী মেয়ের মনোমধ্যে রাজরানী হওয়ার সুপ্ত বাসনারও পরিচয় পাওয়া যায়।

যাই হোক, পল্লীর এই ব্রতগুলি মাতৃতান্ত্রিক গ্রামসমাজের ধর্মচিন্তা, আর্থসামাজিক অবস্থা ও fertility cult বা উর্বরতা তত্ত্বের ঐতিহ্যবাহী।

দশপুত্তুল ব্রত : চৈত্রসংক্রান্তি থেকে শুরু করে গোটা বৈশাখ মাস ধরে এই ব্রত পালন করা হয়। এই ব্রতও কুমারীদের পালনীয়। পাঁচ বছর বয়স থেকে এই ব্রত পালন করা যায়। চার বছর এই ব্রত পালন করতে হয়। চতুর্থ বৎসরে বৈশাখী সংক্রান্তিতে এই ব্রতের উদ্‌যাপন।

বাড়ীর উঠানে পিটুলি গোলা (আতপ চাল বাটা) দিয়ে দশটি পুতুল আঁকতে হবে। তারপর বিকালে মালা, ফুল, শ্বেতচন্দন, তুলসীপাতা, দূর্বা দিয়ে এই দশটি পুতুলকে পূজা করতে হয়। ব্রতিনীকে মন্ত্র উচ্চারণের সময় প্রতিবারই মন্ত্রের ধুয়ো দিয়ে আরম্ভ করতে হয়। যেমন—

এবার পূজিব বর নেবো—রামের মত পতি পাব
এবার পূজিব বর নেবো—সীতার মত সতী হবো'
লক্ষ্মণের মত দেওর পাব,
দশরথের মত শ্বশুর পাব
কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাব।
কুন্তীর মতো পুত্রবতী হবো,
দ্রৌপদীর মত রাঁধুনি হবো,
দুর্গার মত সোহাগী হবো,
পৃথিবীর মত ভার সবো,
আর ষষ্ঠীর মত জেঁওজ হবো।

(জেঁওজ অর্থাৎ জীব বহু > জীবহু > জেঁওজ—যে নারী মৃত বৎসা নয়। অখণ্ড পোয়াতিকে জেঁওজ বলে।)

এই ব্রতের মধ্যে ফুটে উঠেছে শ্বশুর শাশুড়ী দেবর স্বামী পুত্র সমন্বিত একটি আদর্শ একান্নবর্তী পরিবারের চিত্র আর এরূপ পরিবারের আদর্শ বধূ হবার জন্য যে চারিত্রিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য কাম্য তারই প্রতিফলন ঘটেছে এই দশপুত্তুলব্রত যাপনের মন্ত্রে। এই চারিত্রিক গুণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—পৃথিবীর মত সহনশীলতা ও দ্রৌপদীর মত রন্ধন কুশলতা, যেটা বাঙালী পুত্রবধূর কাছে একান্ত ভাবেই কাম্য। এ আকাঙ্ক্ষা—"ধন নয়, মান নয় এতটুকু বাসায়" স্বামী স্ত্রীর একটি ছোট পরিবারের আকাঙ্ক্ষা নয়, এ আকাঙ্ক্ষা শ্বশুর শাশুড়ী দেবর স্বামী পুত্রের কল্যাণ কামনা ও এক বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের গৃহকর্ত্রীর আকাঙ্ক্ষা। তাছাড়া দশপুত্তুলের আলপনার মধ্যে একদিকে কুমারীমনের লোকশিল্প চেতনার আভাস আছে, আবার অন্য দিকে—বাংলার লোকশিল্পের মধ্যে রূপকল্পের নান্দনিক দিকও উপেক্ষণীয় নয়।

হরিরচরণ ব্রত : কুমারী ও সধবা উভয়েই এই ব্রত পালন করতে পারে। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে আরম্ভ করে বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতিদিন এই ব্রত পালন করতে হয়। পর পর চার বছর এই ব্রতের অনুশীলন করে চতুর্থ বৎসরে বৈশাখী সংক্রান্তিতে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিয়ে এই ব্রত উদ্‌যাপন করতে হবে। প্রতিদিন ভোরে উঠে তুলসীপাতা যোগাড় করে শ্বেতচন্দন মাখিয়ে একটি তামার পাত্রে রাখতে হয়। আর একটি তামার পাত্রে শ্রীশ্রীহরিচরণের প্রতীক দুটি চরণ আঁকতে হবে। এরপর মল্লিকাফুল ও তুলসীপাতা দিয়ে সেই চরণে পুজো করতে হবে। পূজার মন্ত্র—

হরির চরণ হরির পা, হরি বলে ওগো মা
আজ কেন মা শীতল পা, কোন যুবতী পূজে পা
সে যুবতী কি বর চায়? রাজ্যেশ্বর বাপ চায়,
দরবার জোড়া ছেলে চায়, সভা আলো ভাই চায়,
লক্ষ্মণের মত দেবর চায়, রামের মত পতি চায়।
বেহুলার মত কন্যা চায়, সাবিত্রীর মত বউ চায়,
ঘরের আসন ঝকঝক করে, আলনার কাপড় ঝলমল করে
গোয়ালে গরু মরাই-এ ধান, বছর অন্তর পুত্র চান।
নাহি দেখি স্বামী-পুত্র মরণ, নাহি দেখি বন্ধুবান্ধব মরণ,
দিয়ে ছেলে স্বামীর কোলে মরণ হয় যেন গঙ্গার জলে।

এর পর হরির চরণে প্রণাম করতে হবে—

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে
প্রণত ক্লেশ নাশায় গোবিন্দায় নমঃ নমঃ।

দশপুত্তুল ব্রতের মত হরিরচরণ ব্রতেও ধনে-জনে পরিপূর্ণ এক নিটোল সংসারের ছবি ফুটে উঠেছে। এই ছড়ায় বর্ণিত সংসার শুধু রামের মত পতি বা লক্ষ্মণের মত দেবর নিয়ে নয়, শ্বশুর-শাশুড়ী, গোয়াল ভরা গরু, মরাই ভরা ধান নিয়ে এক স্বচ্ছল আদর্শ একান্নবর্তী পরিবারের সংসার। তাছাড়া কুমারীমন চায় বছর বছর পুত্রবতী হতে, পুত্র রাজদরবার আলো করে থাকবে, বেহুলার মত পতিব্রতা কন্যা, সবিত্রীর মত পুত্রবধূ যে পুত্রবধূ যমের মুখ থেকে মৃত স্বামীকে ফিরিয়ে আনবে। কুমারীমনের কাছে "বাপের ঘর শ্বশুরঘর একই চলন্ত"। রাজ্যেশ্বর পিতা, সভা আলো ভাই নিয়ে তার পিতার সংসারও হবে গৌরবে উজ্জ্বল। বর্তমানের স্বামী-স্ত্রী বড় জোর একটি পুত্র নিয়ে দিয়াশিলাই-এর খোপের মত ফ্ল্যাট বাড়ীর সংসারের সঙ্গে এ সংসারের কত না পার্থক্য!

গোকাল ব্রত : গোকাল ব্রত কুমারী মেয়েদেরই ব্রত। এই ব্রতের মাধ্যমে বালিকাদের গোভক্তির দীক্ষা দেওয়া হয়। চৈত্র সংক্রান্তি থেকে বৈশাখের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতিদিন সকালে এই ব্রত পালন করতে হয়। এই ব্রতে কুমারীরা সকালে উঠে স্নান করে গাভীর পায়ের খুরে ও শিং-এ তেল এবং শিং ও কপালে সিঁদুর দিয়ে পায়ে জল ঢেলে দেবে। এরপর আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে হবে—গোরুর খুর। এরপর একগুচ্ছ দূর্বাঘাস গরুর মুখে ধরে মন্ত্র বলতে হয়।

গোকাল গোকুলে বাস
গরুর মুখে দিয়ে ঘাস
আমার যেন হয় স্বর্গ বাস।

পরে পাখার বাতাস করতে করতে বলতে হবে--

রোগশোক দূর হোক
কীটপতঙ্গ দূর হোক
মশামাছি দূর হোক।
তোমাকে ঘুরিয়ে পাখা
আমার হোক সোনার শাঁখা।
তোমাকে বাতাস করি
সতীন মেরে ঘর করি।

এই মন্ত্র পড়ে গোমাতাকে প্রণাম করতে হবে।

গাভী সংসারের পরম উপকারী জীব। তাই গাভীকে দেবীরূপে সেবা করার দীক্ষা দেওয়া হয় মেয়েদের এই ব্রতের মাধ্যমে, যাতে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ী গিয়ে গোয়ালে গরুর সেবাযত্ন করতে ঘৃণাবোধ না করে। তবে বর্তমানে পল্লীর কোন

কোন সংসারে গোয়াল-গরুর ব্যবস্থা থাকলেও তার জন্য ঝি বা বাগাল রাখতে হবে—বৌ-ঝিদের কাছে গোয়াল-গরু নৈব নৈব চ।

হরিষমঙ্গলবার ব্রত : এই ব্রত সধবা ও বিধবা উভয়েই পালন করেন। সংসারে অভাব দুঃখজ্বালা থেকে মুক্ত এক আনন্দোচ্ছল সংসারের কামনায় এই ব্রত পালন করা হয়। বৈশাখ মাসের প্রতি মঙ্গলবার মঙ্গলচণ্ডীর পুজো দিয়ে ব্রতিনী প্রসাদ গ্রহণ করবেন। এদিন ব্রতিনী অন্নগ্রহণ করবেন না। মুড়কি, দই, কাঁঠালি কলা, যবের ছাতু (মিষ্টান্ন সহ) দুপরে খাবেন। রাত্রে দুধ ও ফল খেতে পারেন। এ ব্রত একবার আরম্ভ করলে সারাজীবন তো করতে হবেই। ব্রতিনীর মৃত্যুর আগে বা ব্রতিনী অক্ষম হলে যাকে ব্রতিনী এই ব্রত পালনের দায়িত্ব দিয়ে যাবে তিনিই এই ব্রত করবেন। মুকুন্দরামের কথায়—পূজিতে চণ্ডিকা প্রতি মঙ্গলবাসর / বিপদ সাগরে দুর্গা হবে কর্ণধার।

অক্ষয়ফল ব্রত : অক্ষয়ফল, অক্ষয়সিঁদুর, অক্ষয়তৃতীয়া এই সমস্ত ব্রত বৈশাখে পালনীয়। অক্ষয়ফল ব্রতে চৈত্র সংক্রান্তি থেকে বৈশাখী সংক্রান্তি পর্যন্ত জলগ্রহণের পূর্বে ব্রতিনীকে প্রতিদিন স্নান করে কোন ব্রাহ্মণকে একটি করে ফল দিতে হয়। চার বছর এই ব্রত পালন করার নিয়ম। চতুর্থ বৎসরে উদ্যাপন। প্রথম বৎসর পান সুপারি বা হরিতকী ও পৈতা, দ্বিতীয় বৎসরে পান, কলা ও পৈতা, তৃতীয় বৎসরে আম, পান, সুপারি, পৈতে এবং চতুর্থ বৎসরে পান, সুপারি, পৈতা ও ডাব ব্রাহ্মণকে দিয়ে প্রণাম করতে হয়। চতুর্থ বৎসরে বৈশাখী সংক্রান্তিব দিন উদ্যাপন। ঐ দিন ৩১ জন ব্রাহ্মণকে ভোজন করিয়ে ভোজন দক্ষিণা হিসেবে একটি টাকা ও সঙ্গে পান সুপারি পৈতে ও ডাব দিয়ে প্রণাম করতে হয়।

অক্ষয়তৃতীয়া ব্রত : এই ব্রত সধবা ও বিধবা উভয়ে করতে পারেন। বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া তিথিই অক্ষয়তৃতীয়া; অতি শুভ দিন। এই দিন ব্রতিনী সকালে স্নান সেরে কোন ব্রাহ্মণকে যব, ভোজ্য, তালপাতার পাখা, ধুতি, একটি সশীষ ডাব সহ জলপূর্ণ কলসী দান করে প্রণাম করবেন। আট বছর এই ব্রত পালন করতে হয়। অষ্টম বছরে উদ্যাপন। উদ্যাপনের বছরে ব্রাহ্মণকে দানের সামগ্রীর প্রত্যেকটি আটটি করে সংগ্রহ করে আট জন ব্রাহ্মণকে দান করতে হবে। তাছাড়া প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে সাধ্যমত দক্ষিণা দিতে হবে। ঐ দিন ব্রতিনী অন্ন গ্রহণ করবেন না। যবের ছাতু ও আখের গুড়, দুধ এই সব একবার মধ্যাহ্নে খেতে পারেন। রাত্রে দুধ ও ফলমূল আহার।

অক্ষয়সিঁদুর ব্রত : বৈশাখ মাসে অক্ষয়তৃতীয়ার দিন কোন সধবা ব্রাহ্মণীকে শাঁখা, সিঁদুর ও শাড়ি দিয়ে প্রণাম করতে হয়। পর পর আট বছর এই ব্রত পালনীয়। অষ্টম বৎসরে উদ্‌যাপন। এই দিন আটজন সধবা ব্রাহ্মণীর প্রত্যেককে শাড়ি, এক থান সিঁদুর, এক জোড়া শাঁখা দিয়ে কপালে সিঁদুর পরিয়ে প্রণাম করতে হয়। এই ব্রত পালন করলে কোনদিন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না বলে বিশ্বাস।

জ্যৈষ্ঠ মাসের ব্রত :

জয়মঙ্গলবার : জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবার—যে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত তা সধবা, বিধবা উভয়েই করতে পারে। তবে এই ব্রত একবার শুরু করলে সারা জীবন এমন কি বংশপরম্পরায় করতে হয়। পিত্রালয়ে কোন ব্রতিনী এই ব্রতের অনুষ্ঠান না থাকলেও শ্বশুরবাড়ীতে যদি শাশুড়ির এই ব্রত থাকে তাহলে শাশুরীর মৃত্যুর পর পুত্রবধূকে এই ব্রত পালন করতে হয়। আবার পিত্রালয়ে এই ব্রতের অনুষ্ঠান থাকলেও শ্বশুরবাড়ীতে যদি এর অনুষ্ঠান না থাকে তাহলে বধূকে এ-ব্রত করতে হবে না।

ব্রতের উপকরণ হচ্ছে। ১৬টি কাঁঠাল পাতা, ১৬টি সুপারি, ১৬টি আতপ চাল দিয়ে কার্পাস তুলোর মধ্যে রেখে ১৬টি দূর্বা দিয়ে দূর্বাশীষ অর্ঘ্য ও ১৬টি ফল ফুল সংগ্রহ করে নৈবেদ্য সাজিয়ে মঙ্গলচণ্ডীর পুজো দিতে হবে। যেখানে সর্বমঙ্গলা কালী, দুর্গার মন্দিরে নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে সেখানে কিংবা অভাবে ঘরে মঙ্গলচণ্ডীর ঘট পেতে পুরোহিত বা কোন ব্রাহ্মণকে দিয়ে মঙ্গলচণ্ডীর ধ্যানে পূজা করাতে হবে। যথারীতি স্বস্তি বাচন, সংকল্প করে "ষৈষা ললিত-কান্তাখ্যা দেবী-মঙ্গল-চণ্ডিকা। বরদা ভয় হস্তা চ দ্বিভুজা গৌর দেহিকা..." এরূপ মঙ্গলচণ্ডীর ধ্যানে পূজা করে নৈবেদ্য নিবেদন করতে হবে।

এরপর গুহ্যাতি গুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং মন্ত্রে পূজা সমাপন করে ললিতকান্তা ও দিবাকরবাসিনীকে পূজা করতে হয়। শেষে মঙ্গলচণ্ডীর স্তব পাঠ করে মঙ্গলচণ্ডীর কথা শুনতে হয়।

এ-ব্রত পালন করলে সংসারে জলে ডোবা, আগুনে পোড়া, অস্ত্রের আঘাত—এ তিনের ভয় থাকে না। হারানিধি কোলে ফিরে পায়। সংসার প্রাচুর্যে ভরে ওঠে।

হারালে পায়, মনে পায়
যা মনে মনে করে,

তাই জয় যুক্ত হয়।
তাই তো জয়মঙ্গলবার।

মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই ব্রতের ফললাভ সম্বন্ধে বলেছেন—

কলিকালে চণ্ডিকার হইল প্রকাশ।
যার যেবা মনোরথ পুরে তার আশ॥
ব্রাহ্মণে শুনিলে ধর্মশাস্ত্রেতে ভাজন।
যুদ্ধেতে পারগ যে শুনিবে খত্রিগণ।
বৈশ্যেতে শুনিলে হয় বাণিজ্যের মতি।
শূদ্রেতে শুনিলে সুখ মোক্ষ পায় গতি॥

দ্বিজ মাধবকৃত চণ্ডিকার ব্রত কথাতে আছে।

দেবী বলে কারাগারে বন্ধন সহিত।
আছেন জনক তব হইয়া দুঃখিত॥
ব্রত নিন্দা অপরাধ করিছে আমার।
তার ফল ফলিয়াছে শুনহ কুমার॥
বাতরোগ পীড়িত কুবেশ অতিশয়।
ধনজন হীন হয়্যা আছে এ সময়॥
অখন আমার এহি প্রসাদ পাইয়া।
সর্ব্বমতে শুভযুক্ত নিজ দেশে গিয়া॥
করিবে আমার ব্রত তোমার মন্দিরে।
তবে তাহার বাতরোগ যাবে দূরে॥
ধনধান্য যুক্ত হয়্যা নানা ভোগ করি।
রাজত্ব করিয়া অন্তে আপনার পুরী।
বিশেষ মঙ্গলবারে করিয়া পূজন।
শুনিলে পড়িলে কথা করিলে স্মরণ॥
অভীষ্ট ফলদাতার সত্যে সত্যে আমি।
হইব সতত পুত্র জানিবে তুমি॥

অরণ্যষষ্ঠী বা জামাইষষ্ঠী ব্রত :

জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠী পূজা
ছেলের হাতে দড়ি
আষাঢ় মাসে রথযাত্রা
লোকের হুড়োহুড়ি॥

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে এই ব্রত পালিত হয়। একে জামাইষষ্ঠীও বলে। ব্রতের নিয়ম হচ্ছে আতপ চাল বেটে পিটুলি গোলা দিয়ে একটি কালো বিড়াল ও একটি কঙ্কণ আঁকতে হবে। বিভিন্ন ফলে বাটা সাজিয়ে তাতে ৬টি পান, ৬টি সুপুরী, হলুদ ছোপানো মার্কিন কাপড়ের টুকরোয় ২১টি বাঁশপাতা মুড়ে রাখতে হবে। বাটার এক প্রান্তে একটি ছোট বাটীতে তেল-হলুদ বাটায় ৬টি এলো সুতো রাখতে হবে। এবপর তেল হলুদ দই খই দিয়ে ষষ্ঠীর পূজা করতে হয়।

ষষ্ঠীর ধ্যান :

ওঁ দ্বিভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কারভূষিতাম্।
বরদাভয় হস্তাঞ্চ শরচ্চন্দ্র নিভাননাম্।
পট্টবস্ত্র পরিধানাং পীনোন্নত পয়োধরাম্
অঙ্কার্পিত-সুতাং ষষ্ঠীমম্বুজস্থাং
বিচিন্তয়েৎ।
ওঁ ষং ষষ্ঠীদৈব্যৈ নমঃ।

অনেক স্থলে মেয়েরাও ঘরে পূজা করেন। প্রায় সমস্ত পল্লী অঞ্চলেই ষষ্ঠীর থান আছে। মূর্তি অবশ্য খুব কম জায়গাতেই আছে। অনেক স্থলে মনসার মূর্তি বৃক্ষতলে ষষ্ঠীরূপে পূজিতা হন। ভাতার থানার বনপাশ কামারপাড়ায় সরান-ধার নামক স্থানে এক বটবৃক্ষতলে এক অপূর্ব দ্বিভুজা শ্বেত প্রস্তরের মূর্তির হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে প্রোথিত আছে। মূর্তিটির দুই স্কন্ধ থেকে অর্ধচন্দ্রাকৃতি প্রায় ৫/৬ ইঞ্চি পরিধি বিশিষ্ট শ্বেতপাথরেরই বলয় আছে। এই মূর্তিই ষষ্ঠীরূপে পূজিতা হন। স্থানের নামই হয়েছে ষষ্ঠীতলা। বর্ধমান শহরে তেলমারুই রাস্তা থেকে উত্তর দিকে রাধানগর পল্লী যাবার পথে ষষ্ঠীতলা আছে সেখানে বড় বড় শিলা ষষ্ঠী-রূপে পূজিতা হন। এছাড়া বধমান শহরে ভাতশালা, খোসবাগান, কাঞ্চননগর, রথতলা, নতুনগঞ্জ ও পুরাতনচকেও ষষ্ঠীর থান আছে। পল্লী অঞ্চলেও বিশেষ কোন মূর্তি দেখা যায় না। শিলাখণ্ড বা কোন পুকুরের ঘাটে ষষ্ঠীপূজা হয়ে থাকে।

পুরাণ বা ধর্মগ্রন্থে ষষ্ঠীব উল্লেখ পাওযা যায় না। তবে দেবী ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে ষষ্ঠী দেবীর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। অতীত কালে যখন শিশুমৃত্যুর আধিক্য ছিল তখন ষষ্ঠীপূজার রমরমা ছিল; ষষ্ঠীদেবী শিশুর রক্ষয়িত্রীরূপে পূজিতা হন। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার খননকার্যেব ফলে কতকগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি মাতৃকামূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। E. Mackey তাঁর The Indus Civilisation গ্রন্থে এগুলিকে শিশু-রক্ষয়িত্রী রূপে বর্ণনা করেছেন। তা যদি হয়

তা হলে পাণ্ডুরাজার ঢিবির খননকার্যের ফলে তৃতীয় স্তরে প্রাপ্ত পোড়ামাটির যে ভগ্ন মাতৃকামূর্তি পাওয়া গেছে সেগুলিকে শিশুর রক্ষয়িত্রী কোন মাতৃকামূর্তি বলে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না।

বাংলায় বৎসরের বারো মাসে বারো নামের ষষ্ঠীপূজার প্রচলন আছে। যেমন, বৈশাখে ধূলাষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠে অরণ্যষষ্ঠী, আষাঢ়ে কোয়াষষ্ঠী, শ্রাবণে লোটনষষ্ঠী, ভাদ্রে মন্থনষষ্ঠী, আশ্বিনে দুর্গাষষ্ঠী, কার্তিকে গোষ্টষষ্ঠী, অগ্রাণে মূলাষষ্ঠী, পৌষে পাটাইষষ্ঠী, মাঘে শীতলাষষ্ঠী, ফাল্গুনে অশোকষষ্ঠী ও চৈত্রে নীলষষ্ঠী। এছাড়াও আছে সূতিকাষষ্ঠী বা আঁতুড়ষষ্ঠী, সেটেরা বা ষাট্‌ষষ্ঠী, একুশেষষ্ঠী। তবে এ জেলায় সাধারণত জ্যৈষ্ঠে জামাইষষ্ঠী, শ্রাবণে লোটনষষ্ঠী, ভাদ্রে চাপড়া বা মন্থনষষ্ঠী, মাঘে শীতলাষষ্ঠী, ফাল্গুনে অশোকষষ্ঠী ও চৈত্রে নীলষষ্ঠী পালিত হয়। আর এক ষষ্ঠী আছে সেটি নবজাতকের জন্মের ষষ্ঠ দিনে সেটেরা বা ষাটষষ্ঠী পালিত হয়।

সেদিন আঁতুড় ঘরে সন্তানের শোবার জায়গায় লেখাপড়ার সাজসরঞ্জাম রাখা হয়। প্রচলিত বিশ্বাস ঐ দিন সন্তানের কপালে ভাগ্যদেবতা ভাগ্যলিপি লিখে যান। তাই সেদিন রাত্রে প্রসূতি ও ধাত্রী ছাড়া অন্যের আঁতুড় ঘরে প্রবেশ নিষেধ। কেতকাদাস তাঁর মনসামঙ্গলে এর উল্লেখ করেছেন :

সনকা সুন্দরী ষষ্ঠী পূজা করি
যাহার যে নীত আছে
হাতে খড়্গ লৈয়া রহিল জাগিয়া
মসীপত্র থুয়্যা কাছে।

কৃষ্ণরাম ষষ্ঠীপূজার কিছু কিছু বিধিনিষেধ-এর উল্লেখ করেছেন। সোমবার ও শনিবার ষষ্ঠীপূজা করার নিয়ম নাই। যদি ঐ দিন ষষ্ঠীর পূজার তারিখ পড়ে তা হলে কেবলমাত্র আচার নিয়ম পালন করে ব্রতকথা শুনতে হয়।

কৃষ্ণরাম দাস এর উল্লেখ করেছেন—

সোমবারে ষষ্ঠী তিথি যেই মাসে মাসে।
সেদিন কেবল পূজা হবে স্বর্গ বাসে।
পৃথিবী পাতালে পূজা নহে সেই দিন।
কেহ যদি করে পূজা হবে পুত্রহীন॥
যেই মাসে শনিবারে ষষ্ঠী তিথি হবে।
কেবল পাতালে পূজা, অন্য ঠাঁই নবে। (না হবে)
রবি শুক্র পূজ পূজ বুধবার বৃহস্পতি।
পৃথিবীতে পূজিবে যতেক পুত্রবতী॥ (কৃষ্ণরামদাস—ষষ্ঠীমঙ্গল)

অরণ্যষষ্ঠী ব্রতে কেবলমাত্র পুত্রকন্যা, নাতিনাতনী বা জামাতার মঙ্গল ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয় না, ঝি, চাকর, গরু, বাছুর, পশুপক্ষীর মঙ্গল ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়।

জ্যৈষ্ঠ মাসে অরণ্য ষাট।
ফিরে ঘুরে এলো ষাট্॥
বার মাসে তের ষাট।
ষাট, ষাট্, ষাট॥
ঝি-চাকরের ষাট।
গরু বাছুরের ষাট॥
কর্তার ষাট, ছেলেমেয়ের ষাট।
বউ ঝিয়ের ষাট, নাতি-নাতনীর ষাট
ষাট ষাট ষাট॥

জামাইষষ্ঠী পালনের কিছু বিধিনিষেধ আছে—

অদ্য যে অরণ্যষষ্ঠী বিদিত সংসার।
আমিষ ভোজন কর দেখি কদাকার। (ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্য)

ষষ্ঠীকে পূজা দেওয়ার পর ব্রতকথা শুনতে হয়। ব্রতী এই দিন অন্নগ্রহণ করেন না—চিঁড়া, ফল, দই, দুধ এইসব খাওয়ার বিধান আছে। অবশ্য যার দীর্ঘায়ু বা মঙ্গল কামনা করে এই ব্রত পালন করা হয়, সেই জামাই-এর জন্য চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়—কালিয়া কোপ্তা কাবাব-এর ব্যবস্থা করতে হয়।

পূজা ও ব্রতকথা শেষ হলে বাড়ী এসে গৃহিণী ছেলেদের কপালে তেল, হলুদ, দই-এর ফোঁটা দেয়, হাতে তেল হলুদ মাখা সুতো বেঁধে দেয়। জামাইকে অবশ্য সৌখিন আসনে বসিয়ে ধুতি পাঞ্জাবী বা প্যান্ট-শার্ট নানা প্রসাধন দ্রব্যের তত্ত্ব উপহার দেওয়া হয় ও শাশুড়ী ঠাকরুন কপালে ছোট্ট করে তেল হলুদ দই-এর ফোঁটা দেয়। উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনিতে ঘর মুখর হয়ে ওঠে। নানা জাতির মিষ্টান্ন, আম, জাম, খেজুর, মেওয়া ফল দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। অবশ্য জামাই নতুন থাকতে থাকতেই এত আড়ম্বর। দু-একটা ছেলেপিলে হলে—ফল মিষ্টিতেই জামাইষষ্ঠী সারা হয়।

ষষ্ঠীর ব্রতকথায় আছে লোলা দোষে দুষ্ট এক কনিষ্ঠা বধূ ষষ্ঠীদেবীর নৈবেদ্য ভোজ্য সমস্ত নিজে খেয়ে নিয়ে কালো বিড়ালের নামে দোষ দিত। এর ফলে ষষ্ঠীদেবী তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে একে একে তার ৬টি ছেলেকে খেয়ে ফেলে। বধূ ষষ্ঠীপূজা করলে ষষ্ঠীদেবী তার ৭টি সন্তানকেই ফিরিয়ে দেয়। অরণ্যষষ্ঠী বা

জামাইষষ্ঠীর কাহিনী নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলে সপ্তদশ শতাব্দীতে ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছিল এতে বর্ধমানের উল্লেখ আছে—

এই ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীটি এইরূপ :

সপ্তগ্রামে শত্রুজিৎ নামে এক রাজা ছিলেন। ষষ্ঠীদেবী নিজের প্রচার করতে গিয়ে ভাবলেন যদি শত্রুজিৎ তাঁর পূজা করে, তবেই উচ্চতর সমাজে তাঁর পূজা প্রচলিত হবে। এই কথা ভেবে ষষ্ঠীদেবী এক ব্রাহ্মণীর বেশ ধারণ করে শত্রুজিতের রানীর কাছে গিয়ে বললেন, 'গঙ্গাস্নান করার জন্য আমি বর্ধমান থেকে এসেছি, আজ অরণ্যষষ্ঠীর পূজার দিন। তোমাকে আমি আজ ষষ্ঠীপূজা করাব।' রানী ষষ্ঠীপূজার কি ফল হয় জানতে চাইলে ব্রাহ্মণী বললেন—"তুমি রানী, সংসারে দুঃখ-কষ্টের কিছুই ধার ধারো না। তাই ষষ্ঠীর মাহাত্ম্য কিছুই জান না। ষষ্ঠী মাহাত্ম্যের কথা বলছি শোন—

সায়বেনে নামে এক বণিক ছিল—ষষ্ঠীর দয়ায় তিনি সাতটি সন্তানের পিতা। বণিকের স্ত্রী তার পুত্রবধূদের নিয়ে ষষ্ঠীব্রত করতো। একদিন শাশুড়ী ষষ্ঠীপুজোর সমস্ত আয়োজন শেষ করে ছোট বউকে পুজোর জায়গায় রেখে অন্য কাজে গেল। ছোট বউ লোলাখোর। সে নৈবেদ্য থেকে ক্ষীর, দুধ সব খেয়ে নিয়ে শাশুড়ী এলে জানালো, একটা কালো বিড়াল এসে সব খেয়ে গেছে। ষষ্ঠী দেবী তো খুব রেগে গেল। প্রতিশোধ নেবার জন্য—ছোট বউ এক একটি পুত্র প্রসব করে আর কালো বিড়ালকে দিয়ে দেবী তার সব ছেলেকেই খাইয়ে দেয়। শ্বশুর রেগে এমন অলুক্ষণে বউকে বনবাসে পাঠালেন। বনেও ছোট বউ তার সপ্তম সন্তান প্রসব করলো। এবারেও কালো বেড়াল শিশুকে মুখে করে নিয়ে যাচ্ছে এমন সময় ছোট বউ-এর নজর পড়লো। সে প্রাণপণে ছুটে গেল। কিছু দূর গিয়েই হুমড়ি খেয়ে পড়লো। তখন ষষ্ঠীদেবীর দয়া হলো। ষষ্ঠীদেবী তার কাছে গিয়ে তার অপরাধের কথা বললেন ও তাকে ষষ্ঠীপূজা করতে পরামর্শ দিলেন। বউ ক্ষমা চাইল ও পূজা করতে প্রতিশ্রুতি দিল। ছোট বউ ৭টি সন্তানই ফিরে পেল। শত্রুজিতের রানী ব্রাহ্মণীর মুখে এই কাহিনী শুনে ষষ্ঠীপূজা করলেন। মর্ত্যে দেবীর পূজা প্রচারিত হলো।

শীতলাষষ্ঠী : মাঘ মাসের সরস্বতী পূজার পরদিন শীতলাষষ্ঠী। শীতকালে এই ব্রতের বিধান বলে মনে হয় এই ষষ্ঠীর নাম শীতলাষষ্ঠী। তবে বসন্তরোগ প্রতিরোধের দেবী শীতলার সঙ্গে ষষ্ঠীর শীতলার কিছুটা মিল আছে বলেও শীতলাষষ্ঠী নাম হতে পারে। কারণ এই ষষ্ঠীর প্রধান উপকরণ গোটা সিদ্ধ, যেটা অনেকের মতে বসন্তরোগের প্রতিষেধক। পুত্রবতী নারীরা এই ব্রত পালন

করেন। এই দেবীর কোন মূর্তি নাই। বাটনা-বাটা শিল ও নোড়া পরিষ্কার করে ধুয়ে তার ওপর পিটুলি গোলা দিয়ে ষষ্ঠীর প্রতীক এঁকে একটা হলুদে ছোপানো নতুন গামছা বা নতুন কাপড়ের টুকরো ঢাকা দিতে হয়। এর ওপর ৬টি সিঁদুর, ৬টি কাজল ও ৬টি চন্দনের টিপ দিতে হয়। এর কোলে সন্তানের প্রতীক নোড়া দিতে হয়। কারণ ষষ্ঠীর ধ্যানেও আছে "অঙ্কার্পিত সুতাম্"। শিলের সামনে ২১টি বাঁশপাতা তাড়া করে বেঁধে, ৬ জোড়া কুল, ৬ জোড়া মটর শুঁটি, জোড়া কলা প্রভৃতি রেখে পঞ্চমীর দিন রাত্রে ষষ্ঠী পাততে হয়। পরদিন গৃহিণী "ওঁ ষষ্ঠী দৈব্যৈ নমঃ" মন্ত্রে নৈবেদ্য মিষ্টান্ন দিয়ে পূজা করবেন। পঞ্চমীর দিন শুদ্ধাচারে ভাত, তরিতরকারী, মাছ-এর ঝাল বা অম্বল ও গোটা সিদ্ধ রেঁধে রাখতে হবে। গোটা সিদ্ধের মধ্যে গোটা বিড়ি কলাই, গোটা বেগুন, গোটা জোড়া সিম, গোটা জোড়া কুল, গোটা জোড়া মটরশুঁটি, সজিনার ফুল ও ডাঁটা, গোটা আলু, গোটা লাল আলু, গোটা বেগুন, পুঁই-এর টুকরো, পালং শাক, নুন, তেল হলুদ না দিয়ে সিদ্ধ করে রেঁধে রাখতে হবে। ষষ্ঠীর দিন অরন্ধন। সেদিন কোন কিছুই গরম খাওয়ার বিধান নাই। এই পর্য্যুসিত গোটা সিদ্ধ বসন্ত রোগের Preventive বলে মনে করা হয়। যদিও এই গরম কিছু খাওয়ার নিয়ম নেই তবে আজকাল একমাত্র পুত্রবতী গৃহিণী ছাড়া এসব কেউ মানে না। ষষ্ঠীর দিন ষষ্ঠীপূজা করে ব্রতকথা শুনতে হয়।

ব্রতকথা : রাজনগরে বাস করতো এক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী। তাদের সাত ছেলে, সাত বউ কিন্তু সবাই নিঃসন্তান, ব্রাহ্মণীর দুঃখের সীমা নাই। ব্রাহ্মণী দুঃখে কেঁদে আকুল; তাদের বংশ রক্ষা হল না। একদিন ষষ্ঠীদেবী ভিক্ষুকের বেশে ব্রাহ্মণীর কাছে এল। ব্রাহ্মণী তাকে ভিক্ষে দিতে গেল। ভিক্ষুণী তাদের নাতি-নাতনীদের খোঁজ করলে ব্রাহ্মণী তার মনের দুঃখের কথা জানালো। ব্রাহ্মণীর দুঃখের কথা শুনে ভিক্ষুণী তাঁকে শীতলাষষ্ঠী ব্রত করতে ও ব্রতকথা শুনতে বলল। ভিক্ষুণীর কথা শুনে ব্রাহ্মণী সে বছর সাত বউকে নিয়ে শীতলাষষ্ঠী ব্রত করলো ও ব্রতকথা শুনলো। সব বউ-ই হলো গর্ভবতী। নাতিনাতনীতে ব্রাহ্মণীর ঘর ভরে গেল। শীতলাষষ্ঠীর পূজা প্রচারিত হলো।

অশোকষষ্ঠী : ফাল্গুন বা কোন কোন বছর চৈত্র মাসে বাসন্তী পূজার যে ষষ্ঠী সেই বাসন্তীষষ্ঠীকেই অশোকষষ্ঠী বলে। এ ষষ্ঠীর ব্রত যে করে, সে জীবনে শোক পায় না। এই ষষ্ঠীতে ব্রতিনী ষষ্ঠীর কাছে পূজা দেবেন। আবার মঙ্গলা বাড়ী বা কোন শক্তিদেবীর মন্দিরেও পূজা দিতে পারেন। কারণ কৃষ্ণরামের কথায়——

দুর্গা নামে ষষ্ঠী পূজি আশ্বিনে আনন্দ।
যেই বর মাগে পায় তার নাই সন্দ।
... ...
বার মাসে বার ষষ্ঠী যেবা নারী করে।
রোগ শোক দুঃখ কভু নাই ক্ষিতি তলে॥

তবে এই ব্রতে ফলমূল ও পাঁচকলাই-এর নৈবেদ্য ও অশোক ফুল অপরিহার্য। পূজার পর ব্রতিনী বা বাড়ীর মেয়েদের কলার ভিতর অশোক ফুলের কুঁড়ি পুরে খেতে হয়। এর কারণও আছে—অশোক ফুল অশোক গাছের ছালের রস স্ত্রীলোকের ঋতু বিষয়ক গোলযোগ বা বাধক জাতীয় রোগের মহৌষধ—কবিরাজী মতে অশোকারিষ্ট এই অশোকের ছাল থেকেই তৈরী হয়। ব্রতিনী এদিন অন্নগ্রহণ করবেন না। পূজা দেওয়ার পর লুচি মিষ্টি ফলমূল দুধ খেতে পাবেন।

নীলষষ্ঠী : চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন নীলকণ্ঠ ভৈরবের পূজা উপলক্ষে সমস্ত পুত্রবতী নারীকে এই ব্রত পালন করতে হয়। "নীলের ঘরে দিয়ে বাতি / জল খাও গে পুত্রবতী।" এই দিন ব্রতিনী সারাদিন উপবাসী থেকে সন্ধ্যায় গব্যঘৃতের প্রদীপ জ্বালিয়ে শিবমন্দিরে বাতি দেন ও পূজা করেন। এর পর জলগ্রহণ করেন। রাত্রে অন্নগ্রহণ নিষেধ, লুচি, মিষ্টি খেতে পারেন। নীলকণ্ঠ মহাদেব, কাজেই মহাদেবের গাজন উপলক্ষে তাঁর পূজা, তাঁর কাছে বাতিদান নারীদের পালনীয়।

একটা জিনিষ এখানে লক্ষ্য করবার মত, সমস্ত ব্রতেই নারীর ভূমিকাই প্রধান। পুরুষশাসিত সমাজে পুরোহিত যখন গোষ্ঠী বা ব্যক্তির হিতার্থে পূজা পার্বণের বিধান দেন তখন অন্তঃপুরে নারী নিজেরাই ব্রতের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামী-পুত্র সংসারের মঙ্গল কামনা করেন। বেশীর ভাগ লৌকিক ব্রতে পুরোহিত বা পুরুষদের বিশেষ ভূমিকা নাই। আর একটা বিষয় লক্ষ্যণীয়, এইসব ব্রত অনুষ্ঠানে নারীদের ভূমিকা প্রধান হলেও তাদের নিজেদের জন্য কোন প্রার্থনা নাই। স্বামী-পুত্র, সংসার এমন কি ঝি চাকর, প্রতিবেশীদের মঙ্গল কামনা তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। একমাত্র কুমারী ব্রতিনীদের ব্রতের মধ্যে নিজের জন্য স্বামী, পুত্র, সতীনের জ্বালা থেকে মুক্তি প্রভৃতি কিছু আত্মকেন্দ্রিক কামনার কথা আছে। ব্রতগুলি নারীদের সংসারে একঘেয়ে মরুজীবনের মধ্যে মরূদ্যান।

আষাঢ় মাসের ব্রত :

বিপত্তারিণী ব্রত : এই ব্রত আষাঢ় মাসে রথের পরে ও উল্টো রথের আগের যে কোন মঙ্গল বা শনিবারে পালন করতে হয়। এই ব্রতের উপকরণ

হলো, ১৩ রকমের ফল, ১৩ রকমের ফুল। ফলগুলিকে অর্ধেক করে কেটে দিতে হয়, ১৩টি চালের পিঠা, ১৩ গাছি লাল কস্তা সুতা, ১৩টি পান, সুপারি, খয়ের চুন, কিছু ময়দা, ঘি-সহ ১টি ভোজ্য ও নৈবেদ্য। ব্রতের আগের দিন ব্রতিনীকে নিরামিষ খেয়ে কঠোর সংযমের মধ্যে থাকতে হয়। ব্রতের দিন ব্রতিনী সকালে স্নান করে শুচি বস্ত্র পরিধান করে বিপত্তারিণী মায়ের দুর্গার ধ্যানে পূজা করবেন ও ১৩ ফলফুলের নৈবেদ্য ও ভোজ্য নিবেদন করবেন। তবে আজকাল ব্যক্তিগত ভাবে ১৩ রকমের ফলফুলের হাঙ্গামা বড় কেউ করে না। দুর্গা বা কালীমন্দিরে যেখানে দেবীর নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে সেখানে মন্দির প্রাঙ্গণে দোকান থেকে ১৩ রকম ফল কুচানো ও ১৩ রকম ফুলের প্যাকেট কিনতে পাওয়া যায়। দোকান থেকে গোটা ফল কেনার হাঙ্গামাও আছে, আবার ব্যয়-বহুলও বটে। তার চেয়ে গোটা পাঁচেক টাকা দিয়ে তের ফল তের ফুলের ডালা কিনে মায়ের কাছে নিবেদন করেই বিপত্তারিণী ব্রত সাঙ্গ করা যায়। সেই ডালাতে ১৩ রকমের ফল আছে না তের রকমের ফুল আছে কিনা সেটা বড় কথা নয়। ১৩ ফলের ডালা দিয়েছি, এই বিশ্বাসটাই বড় কথা।

যেখানে বাড়ীতে ঘট পেতে পূজারীকে দিয়ে বিপত্তারিণী মায়ের পূজা করাতে হয়, সেখানে প্রথমে গন্ধাদির অর্চনা, স্বস্তিবাচন পরে ব্রতিনীর নামে সংকল্প করে পূজার অন্যান্য অনুষ্ঠান সেরে দেবীর ধ্যানমন্ত্রে আবাহন ও ষোড়শোপচারে পূজা করতে হবে। ধ্যানের মন্ত্র—ওঁ করালবদনাং ঘোরাং নানালঙ্কার ভূষিতাং মুকুটাগ্র-লসচ্চন্দ্রলেখাং দিগ্বসনান্বিতাম্ খড়্গ-খর্পরযুক্তাঞ্চ মুণ্ডচর্ম্মবরান্বিতাম্ মুক্তাহারলতারাজৎপীনোন্নতঘটস্তনীম্। এরূপে ধ্যান করে ওঁ ক্রীং বিপত্তারিণ্যৈ স্বাহা মন্ত্রে পূজা করতে হবে। পূজা শেষে "ওঁ সঙ্কটে ত্বং মহামায়ে ব্রতসূত্রমিদং তব। বধ্নামি বাহুমূলে অহং বরং দেহি যথেপ্সিতম্।" —এই মন্ত্রে পূজারী ব্রতিনীর দক্ষিণ হস্তে তেরটি গ্রন্থি দেওয়া রক্তবর্ণ ডোর পরিয়ে দেবেন। এবং ভোজ্য উৎসর্গের পর ব্রতকথা শুনতে হবে।

ব্রতকথার মূল বক্তব্য এইরূপ—নারদ হরপার্বতীর কাছে এসে যে-ব্রত করলে বাঞ্ছিত ফল লাভ হয় তার কথা জানতে চাইলে মহাদেব বিপত্তারিণী ব্রতের কথা বলেন। এই ব্রত যে করে সে সবরকম বিপদ থেকে মুক্ত হয়। কোনদিন সে বিধবা হয় না। বিদর্ভ রাজ্যের রানীর সঙ্গে এক চর্মকারের স্ত্রীর সখ্যতা হয়। একদিন রানী চর্মকারের স্ত্রীর কাছে মাংস চাইল। চর্মকার-পত্নী খুব ভয়ে ভয়ে গোপনে কাপড়ে ঢেকে মাংস এনে দিল। রাজা দূর থেকে সব লক্ষ্য করে রানীর কাছে এসে চর্মকারের স্ত্রী তাকে কি এনে দিয়েছে জানতে চাইলে

রানী প্রাণপণে বিপত্তারিণীকে ডাকতে ডাকতে বলল—নানারকম ফল এনে দিয়েছে। বিপত্তারিণী রানীর স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে সমস্ত মাংসকে ১৩ রকম ফলে পরিণত করে দিলেন। এই বিপত্তারিণী ব্রতের ফলে রানী বাকি জীবন সুখে যাপন করে মৃত্যুর পর স্বর্গে গেলেন। মর্তে বিপত্তারিণী ব্রত প্রচারিত হলো।

ব্রতকথা শোনার পর ১৩ ফলের নৈবেদ্য দিয়ে ব্রাহ্মণভোজন করাতে হয়, দক্ষিণা দিতে হয়। সেদিন ব্রতিনী অন্নগ্রহণ করবেন না। ১৩ খানি লুচি, ১৩ রকমের মিষ্টি দিয়ে একবার মাত্র দিনে আহার সারতে হবে। এই ব্রতের তারিখ পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্ত হলে অধিক ফল হয়।

শ্রাবণ মাসের ব্রত :

জন্মাষ্টমী ব্রত : এই ব্রত শাস্ত্রীয় ব্রত। নারী-পুরুষ উভয়েই এই ব্রত পালন করতে পারে। শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণপক্ষে রোহিণীযুক্ত অষ্টমী তিথিতে এই ব্রত পালন করতে হয়। ব্রতের আগের দিন ব্রতীকে নিরামিষ আহার করে সংযম পালন করতে হয়। অষ্টমীর দিন অর্ধরাত্রে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম উপলক্ষ করে পূজা শুরু করতে হয়। গন্ধাদির অর্চনা, স্বস্তিবাচন, সংকল্প শেষ করে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করে আহ্বান করতে হয়। প্রথমে মানসোপচারে, পরে ষোড়শোপচারে পূজা করতে হবে। মানসোপচারে পূজার সময় শ্রীকৃষ্ণের কংসের কারাগারে জন্ম, নাড়ীচ্ছেদন, নন্দগোপের গৃহে কৃষ্ণকে অর্পণ, এই সমস্ত কল্পনা করে পূজা করতে হয়। এরপর সুনন্দ, উপনন্দ, বসুদেব, দেবকী, উদ্ধব, অক্রূর, ষষ্ঠী, মার্কণ্ডেয়, নন্দ, যশোদা, রোহিণী, বলদেব, শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতি দেবতার পূজা করতে হয়। এরপর শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাহিনীর ব্রতকথা শুনতে হয়। পরদিন নন্দোৎসব ও পারণ—ওঁ সর্ব্বায় সর্ব্বেশ্বরায় সর্ব্বপতয়ে সর্ব্বাসম্ভবায় গোবিন্দায় নমঃ নমঃ।

লক্ষ্মীব্রত : ঋক্‌বেদে লক্ষ্মী ও শ্রী ঐশ্বর্যের দেবী। তৈত্তিরীয় সংহিতায় লক্ষ্মী ও শ্রীকে আদিত্যের দুই স্ত্রী-রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বাৎসায়ন অনুসারে সমুদ্রমন্থনকালে লক্ষ্মী পদ্মহস্তে সমুদ্র থেকে উত্থিতা হন। পুরাণের মতে মহর্ষি ভৃগুর ঔরসে ও স্ত্রী দক্ষকন্যা খ্যাতির গর্ভে লক্ষ্মীর জন্ম, ইনি নারায়ণের স্ত্রীরূপে অঙ্কশায়িনী হন।

লক্ষ্মী সর্বসম্পদদায়িনী ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। শাস্ত্রমতে এ অঞ্চলে গৃহস্থের বাড়ীতে পৌষমাসে তিনদিন, চৈত্রমাসে দুদিন ও ভাদ্রমাসে একদিন পূজার বিধান আছে। তাছাড়া আছে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা, দীপান্বিতায় লক্ষ্মী-অলক্ষ্মী পূজা ও প্রতি বৃহস্পতিবার বারমেসে লক্ষ্মীপূজা পালিত হয়।

<u>আশ্বিন মাসের ব্রত</u> :

কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা : সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ ও আড়ম্বরপূর্ণ পূজা। দুর্গাপূজার পর পূর্ণিমায় কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা শাস্ত্রীয় মতে অনুষ্ঠিত হয়। পূজার সময় লক্ষ্মীদেবীর মৃন্ময় মূর্তি, ছাঁচে ঢালা মূর্তি, লক্ষ্মীর সরা, লক্ষ্মীর কুলা, লক্ষ্মীর প্রতীকরূপে পূজা করা হয়। তবে যে সমস্ত পরিবারে দুর্গাপূজা হয় সেই পরিবারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষ্মীর মৃন্ময়ী মূর্তির পূজা বিধেয়। এই ব্রত যিনি পালন করেন তাঁকে সারাদিন উপবাসী থাকতে হয়। রাত্রে পূজা শাস্ত্রীয় মতেই হয়। পূজার পর ব্রতকথা শুনতে হয়।

কোজাগরী পূজার বৈশিষ্ট্য আলপনা। ব্রতিনী সারা বিকাল ধরে ঘর, উঠান সর্বত্র আলপনায় ভরিয়ে দেয়—আলপনায় লক্ষ্মীর পদচিহ্ন গৃহাভিমুখী করে আঁকতে হয়। পদ্মফুল, ধানের শীষ, ঘট এসবও এই আলপনার বৈশিষ্ট্য। বিবাহ, অন্নপ্রাশন বা কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে আলপনার মূল্য শুধু আলঙ্কারিক নয়। আলপনার বাহারী আঁকাজোকার অর্থপূর্ণ ছবির মূল্যও খুব গুরুত্বপূর্ণ। ব্রত অর্থে মনের কোন কামনা পুরণের জন্য একটা অনুষ্ঠান। ধর্মানুষ্ঠানের ছাঁচে ব্রতের আলপনা সেই সমস্ত কামনার প্রতিচ্ছবি। লক্ষ্মীপূজায় যে আলপনা দেওয়া হয় তাতে ব্রতিনীর মনের কামনা—'এসো মা লক্ষ্মী, বস মা লক্ষ্মী, থাক মা লক্ষ্মী ঘরে' পরিস্ফুট হয়েছে। ভারতবর্ষ পত্রিকার ১৩৪৬ সালের ভাদ্র সংখ্যায় জিতেন্দ্রকুমার নাগ-এর 'আলপনা ও পিঁড়িচিত্র' প্রবন্ধে নাগমহাশয় কোজাগরী পূর্ণিমায় অঙ্কিত আলপনা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন সেটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

"আশ্বিন মাসের কোজাগরী পূর্ণিমায় বাংলাদেশে যে লক্ষ্মীপূজার অনুষ্ঠান হয় সেটি শস্যশ্যামলা পৃথিবীকে নমস্কার জানানো। সাধারণভাবে হৈমন্তিক উৎসব (harvest festival) বললেও অন্যায় হবে না। এই দিনে কুমারী ও বিবাহিতা মেয়েরা শাস্ত্রীয় ব্রত উদ্‌যাপন করে। এই লক্ষ্মীপূজায় আলপনা একটি প্রধান অঙ্গ। সন্ধ্যার সময় লক্ষ্মীপূজা, সকাল হতে মেয়েরা ঘরগুলি আলপনায় বিচিত্র পদ্ম, লতাপাতা এঁকে সাজিয়ে তোলে—লক্ষ্মীর পাঁড়া বা পদচিহ্ন, লক্ষ্মীপ্যাঁচা এবং ধান-ছড়া হল আলপনার প্রধান বস্তু।

লক্ষ্মীদেবী আসবেন তাই তাঁর আগমনের পথে ধানছড়া, লক্ষ্মীর চরণ, পদ্ম, কল্মি লতা, শঙ্খ লতা, দোপাটি লতা, খুন্তি লতা বা খইয়ে লতা, কদলীপত্র প্রভৃতি শিল্পীর খুশিমত আঁকা দেখতে পাই। আমাদের শহরে এটি শুধু চৌকাঠের উপর দুটি করে লতা বা ঢেউ খেলানো সরলরৈখিক অঙ্কনে এসে ঠেকেছে।"

কোজাগরী কথার উৎপত্তি 'কোজাগর্তী' থেকে অর্থাৎ কে জেগে আছে। পুরাণের মতে ঐ দিন রাত্রে লক্ষ্মীদেবী এসে বলেন—'কে জেগে আছো আজ আমি তোমাকে ধন দেব।' এজন্য কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার ব্রতীরা সারারাত জেগে লক্ষ্মী-পাঁচালীর গান করেন। অনেক গৃহস্থে ব্রতিনী সারারাত লক্ষ্মীর মূর্তির দিকে চেয়ে লক্ষ্মীর ধ্যান করেন—মায়ের কাছে প্রার্থনা, ধনং দেহি রূপং দেহি যশো দেহি। সারারাতই লক্ষ্মীর মন্দিরে মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখা হয়। পাঁচটি এয়ো-স্ত্রীকে পাঁচটি মোকাম প্রসাদ ও সিঁদুর দেওয়া হয়। ব্রতীরা এদিন অন্নগ্রহণ করবেন না। পূজার পর লক্ষ্মীর প্রসাদ, লুচি, মিষ্টি এইসব খেতে পারেন। বাড়ীর সকলকেই নারিকেল চিঁড়া মিষ্টি এইসব বিতরণ করতে হয়।

ব্রতকথা : এক রাজা রাজ্যে হাট বসালেন ও ঘোষণা করলেন যে তাঁর বাজারে যার যে জিনিস বিক্রয় হবে না—তিনি সমস্ত কিনে নেবেন। লক্ষ্মীদেবী মর্ত্যে পূজা প্রচার করার জন্য বিশ্বকর্মাকে দিয়ে লোহার অলক্ষ্মী মূর্তি গড়ে ধর্মকে দিয়ে সেই মূর্তি বাজারে বিক্রয় করতে পাঠিয়ে দিলেন। অলক্ষ্মীর নাম শুনেই কেউ আর সে মূর্তি কিনল না। বাজারে সোহরৎ মত রাজাই শেষে সে মূর্তি কিনে নিলেন। সেই রাত্রেই রাজা এক নারীর ক্রন্দনধ্বনি শুনে প্রাসাদের বাইরে এসে এক নারীকে দেখলেন। তাঁর কাছ থেকে জানতে পারলেন তিনি রাজ্যের কুললক্ষ্মী; অলক্ষ্মী আসায় তিনি বিদায় নিচ্ছেন। এমন করেই একে একে রাজলক্ষ্মী, যশোলক্ষ্মী সব চলে গেলেন। শেষে ধর্ম যখন বিদায় নিচ্ছেন তখন রাজা বাধা দিলেন—তিনি ধর্মকে বললেন ধর্মরক্ষার জন্যই তিনি সমস্ত ত্যাগ করেছেন—কাজেই ধর্মকে তো তিনি যেতে দিতে পারেন না। তখন ধর্ম সন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা করতে বলে অদৃশ্য হলেন। রাজা কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার অনুষ্ঠান করলে একে একে সব ফিরে এলো। পৃথিবীতে কোজাগরী লক্ষ্মীব্রত প্রচারিত হল।

কার্তিক মাসের ব্রত :

অলক্ষ্মীব্রত : লক্ষ্মীব্রতের সঙ্গে এই ব্রত পালিত হয় কার্তিক মাসের অমাবস্যার দিন। পৌরাণিক অভিধানে অলক্ষ্মীর যে বিবরণ আছে তা থেকে জানা যায়—সমুদ্রমন্থনকালে লক্ষ্মীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী অলক্ষ্মী রক্তমাল্য ও রক্তকমলে ভূষিতা হয়ে সমুদ্র হতে আবির্ভূতা হন। দেবাসুরের মধ্যে কেউই তাঁকে বিবাহ করতে রাজী না হওয়ায় দুঃসহ নামে এক মহাতপা মুনি তাঁকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন এবং পরে তাঁকে পরিত্যাগ করতেও বাধ্য হন। এঁর বস্ত্র কৃষ্ণবর্ণ, ইনি

দ্বিভুজা, হাতে ঝাঁটা, লৌহ অলঙ্কারে ভূষিতা ও গর্দভারূঢ়া। ইনি দুর্ভাগ্যের দেবী এবং এঁর সর্বাঙ্গে কাঁকরের চন্দনলিপ্ত।

অলক্ষ্মীব্রতের পূজা হয় অমাবস্যার রাত্রে বাড়ীর বাইরে উঠানে। বাড়ীর গৃহিণী গোবর দিয়ে বাম হাতে এর মূর্তি তৈরী করেন—দুটি কড়ি দিয়ে চোখ বানানো হয়, পুরাণে যে অলক্ষ্মীর কথা বলা হয়েছে তার সর্বাঙ্গে কাঁকরের চন্দন-লিপ্ত কিন্তু যে অলক্ষ্মীর মূর্তি পূজা হয় তার সর্বাঙ্গে তুলোর বীজ বসিয়ে দিতে হবে। ঘরের বাইরে একটা কাঠের পিঁড়িতে এই গোবরের মূর্তি বসিয়ে পুরোহিত দিয়ে পূজা করানো হয়। পূজার রীতিও অদ্ভুত—পুরোহিত অলক্ষ্মীর দিকে না তাকিয়ে বাঁহাতে কয়েকটি ফুল 'অলক্ষ্যৈ দেব্যৈ নমঃ' বলে মূর্তির দিকে ছুঁড়ে দেবেন। পূজা শেষে একটা ভাঙা ধামা বা ঝুড়ি চাপা দিয়ে দেবেন। এরপর বাড়ীর মেয়েরা মাথায় চুল খুলে অলক্ষ্মীর কাছে প্রার্থনা জানায়, "মা তোমার দয়ায় মাঠের শস্য যেন চুলের গোছার মত লকলকিয়ে ওঠে।" গভীর রাতে ঝুড়িশুদ্ধ মূর্তি রাস্তার তেমাথার মোড়ে নিয়ে যাওয়া হয়; সেখানে বাঁ-হাতে করে মূর্তি মোড়ের মাথায় বসিয়ে বাঁ-হাত দিয়ে কাটারির এককোপ বসিয়ে মূর্তিকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়।

ছেলেমেয়েরা তখন সমস্বরে বলে ওঠে :

অলক্ষ্মী কেউট্যে আলাম
মা লক্ষ্মী মাথায় থাকুন।

অলক্ষ্মীপূজা লক্ষ্মীপূজার বিকৃত রূপ—অনার্য সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী। ইনি আদিম জাতির শস্যদেবী। অলক্ষ্মীর পূজা করলে অমঙ্গল দূর হয়, মাঠের শস্য লকলক করে বলে মেয়েদের বিশ্বাস।

অলক্ষ্মী পূজার আগে ঘরের ভিতর ধানের ওপর কড়ি, পিতলের লক্ষ্মীমূর্তি বসিয়ে বা ঘটে পটে ও শাস্ত্রীয় মতে লক্ষ্মীপূজা করতে হয়। অলক্ষ্মী পূজার শেষে অলক্ষ্মীর ব্রতকথা শুনতে হয়।

ব্রতকথার সারমর্ম : কৌণ্ডিন্য নগরের মদমত্ত রাজা ভাগ্যধর দেবতা অপেক্ষা নিজের পুরুষকারে অধিক বিশ্বাসী। তিনি একদিন স্ত্রী ও চারকন্যাকে ডেকে জিগ্যেস করলেন—তোমরা কার ভাগ্যে খাও। একমাত্র কনিষ্ঠা কন্যা ছাড়া বাকি সকলেই সমস্বরে বলল—রাজার ভাগ্যই আমাদের ভাগ্য, তিনিই আমাদের ভাগ্যবিধাতা। একমাত্র কনিষ্ঠা কন্যাই বলল যে সে নিজের ভাগ্যেই খায়। ক্রুদ্ধ রাজা সকালে উঠেই প্রথমে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণপুত্রকে ডেকে তার সঙ্গেই কনিষ্ঠা

কন্যার বিয়ে দিয়ে দিলেন। সেদিন থেকেই রাজা ভাগ্যহীন হয়—একে একে সব হারাতে বসলেন। আর কনিষ্ঠা কন্যার শ্বশুরবাড়ীতে দিন দিন শ্রী ফিরতে লাগল। সে বাড়ীর সকলকে বলে দেয় সকলে যখন বাইরে থেকে ঘরে ফিরবে যেন একটা কিছু সঙ্গে নিয়ে আসে। একদিন স্বামী কিছুই পায় না, একটা মরা সাপ দেখে সেটাই নিয়ে আসে।

এদিকে দৈববশে রাজা এক কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হলো—কিছুতেই কিছু হল না। শেষে বৈদ্য পরামর্শ দেয় যদি মরা সাপের মাথা এনে দিতে পারে তাহলে তার থেকে ওষুধ তৈরি করে রাজাকে দিলে রাজা সুস্থ হবেন। রাজ্যে ঢেঁড়া পড়ে গেল যে মরা সাপের মাথা দিতে পারবে তাকে তার ইচ্ছামত যা চাইবে তাই দেওয়া হবে। ঢ্যাঁড়া শুনে রাজার কনিষ্ঠা কন্যা পুষ্পবতী তাঁর স্বামীকে সেই মরা সাপ নিয়ে যেতে বলে ও রাজার কাছে প্রার্থনা জানাতে বলে—অমাবস্যার রাতে তাঁর রাজ্যে যেন কেউ না বাতি জ্বালায়। ব্রাহ্মণ মরা সাপ নিয়ে রাজার কাছে গেল—রাজা ত মহাখুশী। সে কি চায় জানতে চাইলে বলে সে কিছু চায় না। তার একমাত্র প্রার্থনা কার্তিকের অমাবস্যা রাতে রাজ্যে কেউ যেন বাতি না জ্বালায়। রাজ্যে সঙ্গে সঙ্গে সেই মর্মে ঢেঁড়া পড়ে গেল। সেদিন রাজ্যে বাড়ীতে বাড়ীতে লক্ষ্মী-অলক্ষ্মীর পূজা। গোটা রাজ্য নিষ্প্রদীপ—একমাত্র পুষ্পবতীর বাড়ীতে আলো জ্বলছে। লক্ষ্মীদেবী রাজ্যে কারও বাড়ীতে আলো না দেখে পুষ্পবতীর সম্মুখে আবির্ভূত হলে পুষ্পবতী তার দুঃখের কথা লক্ষ্মীদেবীকে জানাল। লক্ষ্মীদেবী তাকে একটি নূপুর দিয়ে আশীর্বাদ করলেন—

চরণ নূপুর রাখো করিয়া যতন
ইহা হইতে পাবে তুমি কুবেরের ধন।

সেদিন থেকে পুষ্পবতীর ভাগ্যে ব্রাহ্মণের ভাগ্য ফিরে গেল। এদিকে রাজা দিন দিন সব কিছু হারাতে লাগলেন—ধন যায়, মান যায়, শেষে রাজ্যও বুঝি যায়।

রাজ্য যায় ধন যায় আর যায় সুখ।
নানা দেশ ঘুরি ফিরি পায় মহাদুঃখ।

শেষে রাজা গেলেন পুষ্পবতীর বাড়ী। পুষ্পবতী পরম যত্নে রাজাকে চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় ভোজন করালেন—পুষ্পবতীকে দেখে রাজার নিজের কন্যার কথা মনে পড়ে গেল। তখন পুষ্পবতী নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন—

নিজ নিজ ভাগ্যে পিতা সকলেই খায়
এ জগতে লক্ষ্মী বিনা নাহিক উপায়॥

এই বলে পুষ্পবতী রাজাকে বহুধন দিল। সেদিন থেকে রাজা নিজেও কার্তিক মাসের অমাবস্যায় লক্ষ্মী-অলক্ষ্মীর পূজা করেন। রাজ্যেও এই পূজার প্রচলন হয়।

অগ্রহায়ণ মাসের ব্রত :

ইতুব্রত :

আদিম জাতির শস্য ও বৃক্ষপূজাব বর্তমান রূপ ইতুব্রত।

ইতু ইতু ব্রাহ্মণ
তুমি ইতু নারায়ণ
তোমার শিরে ঢালি জল
অন্তিমকালে দিয়া বল।
ইতু দেন বর।
ধনধান্যে পুত্র পৌত্রে বাড়ুক তাদের ঘর ॥
কাঠিমুটি কুড়াতে গেলাম, ইতুর কথা শুনে এলাম।
একথা শুনলে কি হয়, নির্ধনের ধন হয়,
অপুত্রের পুত্র হয়, অশরণের শরণ হয়;
অন্ধের চোখ হয়, আইবুড়োর বিয়ে হয়,
অন্তিমকালে স্বর্গে যায় ॥

ইতুপূজা সূর্যের পূজা। কারণ ইতু কথার উৎস মিত্র > মিতু > ইতু।

ঋগবেদের বহু সূক্তে মিত্রের স্তুতি লিখিত আছে। সূর্য এঁর চক্ষু, সূর্যকিরণ রূপ অস্ত্রে ইনি তাড়না করেন। মিত্র আলোকের দেবতা। যেমন বরুণ আবরণের দেবতা। মিত্র সূর্যোদয়ের আগে আলোকের বিকাশ—এই আলোক পাপ, অসত্য ও অন্ধকার দূর করে। ইনিই বৈদিক মিত্র। মিত্রবরুণ দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। শস্য, বৃক্ষের প্রাণদায়িনী শক্তি মিত্র ও বরুণ আলোক ও বৃষ্টির দেবতা। লৌকিকরূপ মিত্র আজ ইতু। শস্যের দেবতারূপে পূজা পাচ্ছেন।

কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে ইতুপূজার সূচনা, তাবপর অঘ্রানের প্রথম দিন ও প্রতি রবিবার ইতুপূজা হয়। অঘ্রানের সংক্রান্তিতে পরিসমাপ্তি। ইতু আনার বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন রকম রীতি। কোন কোন গ্রামে কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে ভোরে পুকুর থেকে কলমী শাকের লতা দিয়ে ঘট এনে তুলসীতলায় বসাতে হয়। এরপর এতে গোটা কলা বা সুপুরি ও ফুল দিয়ে সিঁদুরের স্বস্তিকা চিহ্ন বা পুতুল এঁকে দিতে হয়। দুপুরে এই ঘটের হয় বিসর্জন। এইরকমভাবে ১লা অঘ্রান এবং

প্রতি রবিবার ও সংক্রান্তিতে এনে উদ্‌যাপন। আবার কোন কোন গ্রামে ইতু পাতা হয়। মাটির একটি বড় সরা বা হোলা জাতীয় পাত্রে মাটি ভরে তাতে পাঁচকলাই ও পঞ্চশস্য ছড়িয়ে ইতু পাততে হবে। এই পাতা ইতুর সরায় প্রতিদিন ব্রতিনী ফুল-জল দিয়ে পূজা করবেন। অঘ্রানের সংক্রান্তিতে উদ্‌যাপন ও বিসর্জন। উদ্‌যাপনের দিন চালগুড়োর আস্‌কে, সরু চাক্‌লি ও পরমান্ন দিয়ে ইতুলক্ষ্মীর ভোগ দিতে হয়। বিসর্জনের সময় ব্রতিনী বা গৃহকর্ত্রী বলে—ইতু তুমি লক্ষ্মী-ইতু তুমি নারায়ণ, বছরান্তে ঘরে এসো পূজিব মা রাঙা চরণ। প্রবাদও আছে—

এ সংক্রান্তি গুঁড়ি হাত
পরের সংক্রান্তিতে পিঠে ভাত।

ব্রতকথা—উমনো-ঝুমনোর কাহিনী :

এক ব্রাহ্মণের স্ত্রী আর উমনো-ঝুমনো দুই মেয়ে নিয়ে সংসার। ব্রাহ্মণের একদিন পিঠে খাওয়ার খুব সখ হলো। ভিখ্যেসিখ্যে করে চাল নারকেল খেজুরের গুড় নিয়ে এলো—ব্রাহ্মণী পিঠে ভাজতে আরম্ভ করলো। ব্রাহ্মণ লুকিয়ে লুকিয়ে ছ্যাঁক ছোঁক শব্দ শুনে কয়টা পিঠে ভাজা হলো গুনতে লাগলো। সে সব পিঠেই একা খেতে চায়, কাউকে ভাগ দেবে না। খাবার সময় গুনে দেখল দুটো পিঠে কম হচ্ছে। ব্রাহ্মণীর কাছে জিগ্যেস করে জানতে পারল উমনো-ঝুমনো দুটো পিঠে খেয়েছে। সেইদিনই গভীর রাত্রে ব্রাহ্মণ উমনো-ঝুমনোকে গভীর বনে রেখে এলো। বটগাছ রাত্রের মত উমনো-ঝুমনোকে আশ্রয় দিল। সকালে উঠেই উমনো-ঝুমনো ঘুরতে ঘুরতে পুকুর পাড়ে এসে দেখলো চার পাঁচজন দেবকন্যা পুকুরপাড়ে ঘট পেতে ইতুপূজা করছে। তাদের উপদেশে উমনো-ঝুমনোও স্নান করে, এলো চুলে ইতুপূজা করলে, ইতু সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলে উমনো-ঝুমনো বাপমায়ের কষ্ট দূর করার বর চাইল। ইতু বর দিয়ে চলে গেল। উমনো-ঝুমনো বাড়ী ফিরলো—বাপমায়ের দুঃখ দূর হলো। মর্তে ইতুব্রত প্রচলিত হলো।

নতুন ফসল ওঠার প্রাক্কালে শস্যভিত্তিক উৎসব ইতু। বর্ধমান জেলাতে ত বটেই, পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছু অঞ্চলে ইতুপূজার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য কার্তিকের সংক্রান্তিতে ইতুপূজার সূচনা আর পরদিনই ১লা অঘ্রান আর এক শস্যভিত্তিক অনুষ্ঠান মুট উৎসব—আনুষ্ঠানিকভাবে মাঠ থেকে নতুন ফসলের একমুষ্টি এনে ফসল ঘরে আনার সূচনা। মুট আনার দিন মাঠের এক কোণে পুরোহিতকে দিয়ে ধান্যলক্ষ্মীর পূজা করিয়ে একমুষ্ঠি শস্য কেটে শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনি সহকারে বাড়ীতে আনার এই অনুষ্ঠান। ইতুপূজাও এই শস্যপূজার অনুষ্ঠান। ইতু যদিও অন্যতম দ্বাদশ আদিত্য মিত্রের পূজা, সূর্যের ধ্যানেই পূজা

হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইতু মাতৃকারূপেই গণ্য। সরায় শস্যের চারা কলমী সুষনি কচুগাছ বসিয়ে পূজা—শস্যদেবীর পূজাকেই সূচিত করে। যাকে জেমস ফ্রেজার 'গার্ডেন অব্ এ্যাডোনিস' আখ্যা দিয়েছেন। অবশ্য সূর্যপূজার সঙ্গে fertility cultএর সংযোগ নিবিড়। ইতু, ভাঁজো, তুষতুষুলি, আদিবাসীদের করম—সবই শস্য উৎসব। এইসব শস্যভিত্তিক উৎসবের সঙ্গে জেমস ফ্রেজারের The Golden Bough গ্রন্থে উল্লিখিত Garden of Adonisএর সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়।

Adonis was a deity of vegetarian and especially of the corn; It is furnished by the Garden of Adonis, as they are called. These were baskets of pots filled with earth, in which wheat, barley, lettuces, fennel and various kinds of flowers were sown and tended for eight days, chiefly and exclusively by women. Fostered by the Sun's heat, the plants shot up rapidly but having no root they withered and at the end of eight days were carried out with the images of dead Adonis and flung with them into the sea or into springs. (বাংলার ব্রত পার্বণ—ডঃ বসাক, পৃ: ২১৮)

সাঁঝপুজুনি ব্রত :

ইতুপূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাঁঝপুজুনি ব্রত। কার্তিক মাসের সংক্রান্তি থেকে শুরু করে অঘ্রান মাসের পয়লা ও প্রতি রবিবার এবং অঘ্রানের সংক্রান্তিতে প্রতি সন্ধ্যায় কুমারী মেয়েরা এই ব্রত পালন করে। এ ব্রতের মাধ্যমে কুমারীদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কিত আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা ফুটে ওঠে। পরপর চারবছর এই ব্রত পালন করতে হয়। চতুর্থ বৎসরে অঘ্রানের সংক্রান্তিতে এই ব্রতের উদ্‌যাপন।

কোজাগরী লক্ষ্মীপূজাব মত সাঁঝপুজুনি সেঁজুতি ব্রতে আলপনা হলো অন্যতম প্রধান অঙ্গ। সেঁজুতি আলপনায় ত্রিশ-চল্লিশ রকমের জিনিস রূপায়িত হয়। এইসব আলপনায় ব্রতের ছড়ার সঙ্গে সংযুক্তভাবে ব্রতীর মনস্কামনা মূর্ত হয়ে ওঠে। এই আলপনার মধ্যে আছে—সূর্য, চন্দ্র, গঙ্গা, যমুনা, অশ্বত্থবৃক্ষ, সোনার থালে ক্ষীরের নাড়ু, ধানের গোলা, পাখী, ময়না, মাকড়সা, আরশি, হাতা, উৎবেরালী, গয়না, শাঁখা প্রভৃতি। সাধারণত যে-সমস্ত কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী, যে সমস্ত সম্পদের সঙ্গে ব্রতিনীর পরিচয় আছে—আতপ চাল বাটা পিটুলির গোলা দিয়ে তাদেরই প্রতীক আলপনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়। ছড়াগুলি অনেক ক্ষেত্রে অর্থহীন ভাব প্রকাশ করে। যেমন বাঁশের কোড়া চিহ্নিত আলপনার ওপর হাত রেখে ব্রতিনী বলে—

বাঁশের কোড়া
রূপের ঝোরা
বাপ রাজা
ভাই প্রজা।

'বাপ রাজা, ভাই প্রজা'—এর অর্থ খানিকটা বোধগম্য কিন্তু 'বাঁশের কোড়ার সঙ্গে রূপের ঝোরা'র যে কি সম্বন্ধ কোনমতেই বোধগম্য হয় না। মনে হয় 'কোড়া' ও 'ঝোরা'-র মিল খুঁজতে গিয়ে ছড়া-রচয়িতা এই অর্থহীন ছড়ার উদ্ভাবন করেছেন। এমনি ভাবে ছন্দ মেলাতে বহু বাছাই অর্থহীন বস্তু, পক্ষীর আবির্ভাব হয়ে থাকে যেমন—

মাকড়সা মাকড়সা চিত্রের ফোঁটা
মা যেন বিয়োয় চাঁদ পানা বেটা।

সন্ধ্যা হলেই পুকুরঘাট থেকে ঘটিতে আম্রপল্লব ও একটি কলা দিয়ে ঘট এনে আলপনার মাঝে বসাতে হয় ও ঘটে সিঁদুরের পুতুল এঁকে দিতে হবে। নৈবেদ্যের জন্য দিন থেকে আতপ চাল ছটাক পাঁচেক ভিজিয়ে রেখে সন্ধ্যার আগে সেগুলি আধ বাটা করে তাতে দুধ, কলা, খেজুর গুড়, সম্ভব হলে কিসমিস দিয়ে ঘটের পাশে সাজিয়ে রাখতে হবে। এরপর বাড়ির গৃহিণী একটি করে ছড়া বলবে আর ব্রতিনী তাঁতে একটি ফুল ফেলে দিয়ে হাত রেখে তার পুনরাবৃত্তি করে যাবে।

ছড়াগুলি নিম্নরূপ :

সাঁঝ পূজনি সেঁজুতি
বুড়োর ঘরে ঘিএর বাতি,
কেন রে বুড়ো এত রাতি,
কাঁটায় পড়িল ছাতি,
তা তুলতে গেল রাতি॥
ব্রতী হয়ে মাগি বর
ধনে পুত্রে বাড়ুক বাপ মার ঘর॥
হর হর দিনকর সাথ
কখন না পড়ি মূর্খের হাত।
দোলায় আসি দোলায় যাই
সোনার দর্পণে মুখ চাই

বাপের বাড়ীর দোলাখানি
শ্বশুর বাড়ী যায়
আসতে যেতে দুই জনে
ঘৃত মধু খায়।

এরপর গঙ্গাযমুনা আঁকা আলপনার প্রতীকে হাত দিয়ে বলবে—

গঙ্গা যমুনা পূজ্জন
সোনার থালে ভোজ্জন
সোনার থালে ক্ষীরের নাড়ু
শাঁখার আগে সুবর্ণের খাড়ু ॥

এমনি ভাবেই—

চন্দ্র সূর্য্য পূজ্জন
সোনার থালে ভোজ্জন
রুপোর ঘট রুপোর খাড়ু
আমার যেন হয় সোনার খাড়ু
ঢেঁকি পড়ন্ত গাই বিয়ন্ত
উনুন জ্বলন্ত
সরু ধানে কালো পুতে
জন্ম যায় যেন এয়োতে।
আমি পূজি পিটুলির রান্নাঘর
আমার যেন হয় কোঠার রান্নাঘর।

সেকালে সতীনের কাঁটা ছিল প্রায় সব সংসারেই—কুলীন ব্রাহ্মণ হলে তো কথাই নেই, নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে এবং অনেক উচ্চবর্গের মধ্যেও বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। তাই ব্রতিনীর প্রার্থনা—

ময়না ময়না ময়না
সতীন যেন হয় না।
আয়না আয়না আয়না
সতীন যেন হয় না
অশ্বথ কেটে বসত করি
সতীন কেটে আলতা পরি

বঁটী, বঁটী, বঁটী
সতীনের শ্রাদ্ধে কুটনো কুটি।
অশ্বথ তলায় বাস করি
সতীন কেটে নির্মূল করি ৷৷
সাত সতীনের সাত কৌটা।
তার মাঝে আমার এক অব্‌ভরের কৌটা
অবভরের কৌটা নাড়ি চাড়ি
সাত সতীনকে পুড়িয়ে মারি।
উৎবেরালী উৎখা
স্বামী রেখে সতীন খা।

সতীনকে না হয় পুড়িয়ে মারা হবে—কিন্তু স্বামীটি হবে কেমন—

পাকা পান মত্তমান
আমার স্বামী নারায়ণ।
যখন যাবেন রণে
নিরাপদে ফিরে আসেন যেন ঘরে।
আতা পাতা কুল দেবতা।
সিঁতের সিঁদুর পায়ে আলতা।
খাটপালঙ্ক লেপ তোষক
গির্দ্দে আশেপাশে
রূপযৌবন, সদাই সুখী
স্বামী ভালোবাসে।
পাড়াপড়শী প্রতিবেশী
মৌ বর্ষে মুখে।
জন্ম এয়োস্ত্রী পুত্রবতী
জন্ম যায় সুখে।

শুধু রামের মত পতি হলেই হবে না—শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর সবকেই আদর্শ পুরুষ হতে হবে।

রামের মত পতি পাব।
সীতার মত সতী হব ৷৷
লক্ষ্মণের মত দেবর পাবো।
কুন্তীর মত পুত্রবতী হব ৷৷

দুর্গার মত সোহাগী হব॥
দূর্বার মত নত হব।
ষষ্ঠীর মত জেঁওজ হব।

দশ পুত্তুল ব্রতেও এই রকম ছড়া আছে।

ধান, গম, সরষে, মুসুরি, টাকায় ঘর ভরে যেতে হবে—

মোহর এল ছালা ছালা
তা তুলতে গেল বেলা।
টাকা এল ছালা ছালা
তা তুলতে গেল বেলা।
ধান এলো ছালা ছালা
তা তুলতে গেল বেলা
ডাল এলো ছালা ছালা
তা তুলতে গেল বেলা।

এককথায় পরিবারের সকলের ও নিজের সুখসমৃদ্ধি ধনে-জনে এক নিটোল পরিপূর্ণ সংসারই ব্রতিনীর কাম্য। এরপর শিব ও সূর্যকে প্রণাম জানিয়ে ব্রত সাঙ্গ হয়। পূজা শেষে ঘট পুকুরে ভাসিয়ে দিয়ে ব্রতিনী ছড়া বলতে বলতে আসে—

ঘট যাচ্ছে ভেসে
ভাই আসছে হেসে।

এখানেও সেই কামনা বোন নয় আরও ভাই চাই।

চার বছর পর উদ্‌যাপন। সেদিন মুড়ির মোয়া তৈরী করতে হয়, একটি নতুন ছাতা কিনতে হবে। ভাই বা ভ্রাতৃস্থানীয় কেউ নতুন ছাতা খুলে ঘুরাবে আর ব্রতিনী তাতে ছোট ঝুড়ি করে মোয়া নিয়ে ঢেলে দেবে। উপস্থিত সকলে কুড়িয়ে নেবে, আনন্দের হুল্লোড় হবে।

নারীমনের চিরন্তন কামনা—শুধু নিজের সুখসমৃদ্ধি মঙ্গল কামনা নয়। পিতৃকুল, শ্বশুরকুল, আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবেশীর সকলের জন্য মঙ্গল কামনার প্রকাশ ঘটে এই সাঁঝসুজুনি ব্রতের মাধ্যমে। When a girl observes a rite for the growth of paddy or for rain, she observes it not for herself alone but the common desire of the community find expression in the rites she observes.

(Man in India. Oct.-Dec. 1952)

ড: বিনয় ঘোষও তাঁর লোকসংস্কৃতি সমাজতত্ত্বে একই কথা বলেছেন... প্রকৃত ব্রত অনুষ্ঠান হলো শ্রেণীপূর্ব (Pre-class) বা শ্রেণীহীন (classless) সমাজের বিশেষ গোষ্ঠী উৎসব—যে উৎসবের ব্যক্তি-কামনার ঊর্ধ্বে গোষ্ঠী কামনার চরিতার্থতা।

পৌষ মাসের ব্রত :

পৌষ-পার্বণ বা পিঠে-পরব : বর্ধমান জেলা বিশেষ করে জেলার পূর্বাংশ তো শস্যভাণ্ডার। শস্যের মধ্যে ধানই প্রধান। আর সেইজন্য অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন ও ইতু পরব, পৌষ মাসে পৌষপার্বণ বা পিঠে-পরব আলাদা মাত্রা পেয়েছে। এ পরব শুধুমাত্র বর্ণ হিন্দুদেরই পরব নয়—হিন্দু, মুসলমান, তপসিলী আদিবাসী সবার পরব। বর্ণহিন্দুদের এই পিঠে-পরবের সঙ্গে অতিরিক্ত আছে লক্ষ্মীপূজা ও পৌষ-সংক্রান্তিতে ও উত্তরায়ণে মকর স্নান। অঘ্রান মাসের সংক্রান্তিতে ইতুপূজা উপলক্ষে চালের গুঁড়িতে হাত পড়ে। প্রবাদই আছে—'এ সংক্রান্তিতে গুঁড়ি (চালের গুঁড়ি) হাত / আসছে সংক্রান্তিতে পিঠে ভাত।' পৌষ মাসের শেষ দুই দিন ও মাঘ মাসের পয়লা অনেক বাড়ীতে পাতালক্ষ্মীর পূজার ব্যবস্থা আছে। আবার অনেক বাড়ীতে পৌষমাসের শুক্লপক্ষের বৃহস্পতিবারে এই পাতালক্ষ্মী পূজার আয়োজন হয়। তবে পৌষ মাসের শেষের দুই দিন পিঠে-পরব সব বাড়ীতেই হয়। পৌষ মাস ২৯ দিনের হলে ২৭শে চাঁউলি বা চাঁউড়ি, ২৮শে বাউলি বা বাঁউড়ি, পরের দিন সংক্রান্তি ও ১লা মাঘ উত্তরায়ণ এই চারদিন ধরে পৌষ-পার্বণ চলে।

যাদের ঘরে লক্ষ্মীপূজা হয় তাতে কোন মূর্তি পূজা হয় না। একটা বড় পরাত বা গামলায় তিনসের বা পাঁচসের, অপার্য্য—মানে পাঁচ পোয়া নতুন ধান ঢেলে তাতে বড় বড় কড়ি, কাঠের পেঁচা, ডোকরা শিল্পীদের তৈরী পিতলের ছোট লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্তি ও সিঁদুর কৌটা বসিয়ে চাঁউলির দিন লক্ষ্মীপাতা হয়। এরপর বাঁউড়ির দিন লক্ষ্মীর সামনে ঘট বসিয়ে পঞ্চোপচারে পূজা হয় উত্তরায়ণ পর্যন্ত। প্রথম দিন পিঠা ও পায়সান্ন ভোগ, দ্বিতীয় দিন পারিবারিক প্রথা অনুসারে খিঁচুড়ি ভোগ ও উত্তরায়ণের দিন শাকেকলাই-এর ডাল ও পঞ্চব্যঞ্জনসহ অন্নভোগ হয়। তবে যাদের শুক্লপক্ষের বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপূজা হয়ে যায়, তাদের বাঁউড়ি সংক্রান্তির দিন নারায়ণ ও লক্ষ্মীর পিঠে পরমান্নের ভোগ দেওয়ার রীতি আছে।

তবে পৌষ-সংক্রান্তিতে লক্ষ্মীপূজা হোক বা না হোক প্রতিটি হিন্দুর ঘরে চাঁউড়ি, বাঁউড়ি, সংক্রান্তি ও উত্তরায়ণ সাড়ম্বরে পালিত হয়। চাঁউড়ির দিন হচ্ছে প্রস্তুতি-পর্ব। এর আগের রাতে নতুন ধানের চাল অল্প জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। তারপর সারাদিন এমন কি রাত পর্যন্ত সেই চাল ঢেঁকিতে কোটার ব্যবস্থা। ঈশ্বরগুপ্তের পৌষপার্বণের মত রঙ্গভরা এই ভঙ্গ বঙ্গদেশে চল্লিশ সের বা একমন চাল গুঁড়ান হয় না। তবে এখনও অনেক বাড়ীতে পরিবারের আয়তন অনুযায়ী বিশ সের, পনেব সের, দশ সের বা নিদেন পক্ষে পাঁচ সের চাল গুঁড়ানো হয়-ই। পূর্বে প্রতিটি পল্লীতে সকাল থেকে ঢেঁকিতে 'পাড়' পড়তে শুরু করতো—অধিক রাত্রি পর্যন্ত চলতো। সব বাড়ীতে তো ঢেঁকি ছিল না—কাজেই যাদের বাড়ীতে ঢেঁকি থাকতো, সেখানে গৃহস্থের 'চাল কোটা' শেষ হলে পাড়া-প্রতিবেশীরা একের পর একে পালা করে চাল কুটে নিয়ে যেতো। সন্ধ্যা থেকে চলতো আলপনা দেওয়ার পরব। গোটা ঘর সাদা পিটুলি গোলার আলপনায় ভরিয়ে দেওয়া হতো। তবে এখন অনেক গ্রামের হাস্‌কিং মেশিন বা গম ভাঙানোর কল হয়ে গেছে—কাজেই ঢেঁকির রেওয়াজ অনেক কমে গেছে—নাই বললেই হয়। ফলে গমকলেই হয় তবে বেশীর ভাগ ঘরে কেনা গুঁড়ি-ই ভরসা।

পরদিন বাউলি বা বাঁউড়ি। বাউলি কথার উৎস সম্বন্ধে বঙ্গীয় শব্দকোষে বলা হয়েছে—"বিউনি > বেণী > বাউলি বা বাঁউড়ি (বীরভূম)। পৌষ-সংক্রান্তির পূর্ব দিনে খড়ের (বিচালির) বেণী করিয়া গৃহের দ্রব্য ও চাষের উপকরণ লাঙ্গলাদি বেড় দিয়া বাঁধার উৎসব বিশেষ। কোথাও নতুন আতপ চাউল হাঁড়িতে পুরে হাঁড়ি ও গৃহদ্রব্য খড় দিয়া বাঁধার প্রথা আছে। কোথাও সংক্ষেপে দেওয়ালের বাইরে চারদিকে পিঠালি গোলার বেড় বা চাউলের গুঁড়া ছড়াইয়া দেওয়ার পদ্ধতি আছে। ধান, চাউল লক্ষ্মীর দ্রব্য। সুতরাং 'লক্ষ্মী বাঁধিয়া রাখাই'—এই সকল প্রথার উদ্দেশ্য বোধ হয়। এই উৎসবে প্রত্যেক গৃহস্থ নানা প্রকার পিঠা প্রস্তুত করে। ইহা পিঠার পার্বণ বা পৌষ-পার্বণ। এই পার্বণের অন্যতম অঙ্গ বাউলি বাঁধা বা খড়ের বেণী দিয়া বা পূর্বোক্ত প্রকারে পিঠালির বেড় দিয়া লক্ষ্মী বাঁধা। "পৌষ মাসে বাউনি বাঁধা / ঘরে ঘরে পিঠে।" ঈশ্বর গুপ্তও বলেছেন—"উনুনে আউনি করি বাউনি বাঁধিয়া।"

এ জেলার বাউলি উৎসব শুরু হয় ভোর রাত থেকে। ভোরবেলায় গৃহস্থের গিন্নীরা নিকটবর্তী নদীতে বা পুকুরে স্নান সেরে এসে জল গরম করে পিঠের লেচি মাখতে বসে। চালের গুঁড়োতে অল্প অল্প জল দিয়ে শক্ত করে লেচি তৈরী করে ভাল করে ঠেসে বিরাট আকারের লেচির একাধিক তাল করে ও তার

মাথায় মাঙ্গলিক নতুন ধানের খড়ের শিরোভূষণ করে দেয়। এরপর বিরি কলাই ও বরবটি কলাই-এর সঙ্গে আদা বাটা, মৌরি বাটা, সামান্য হলুদ দিয়ে কলাইয়ের পুর তৈরী করে প্রথমে কলাইয়ের পুর দিয়ে মাঙ্গলিক পিঠে তৈরী হয়। লেচি থেকে অল্প অল্প কেটে নিয়ে গোল করে ঠুলির মত করে ও তাতে পুর ভরে দিয়ে দু-হাতে পাকিয়ে দুই প্রান্ত সূচলো ও পেটটি মোটা রেখে পিঠে তৈরী হলে ফুটন্ত জলে ছেড়ে দিয়ে ভাপিয়ে নেয়। কিছুক্ষণ ভাঁপানো হলে ছানতা দিয়ে তুলে অন্য ঠাণ্ডা জলের পাত্রে রেখে দেয়। মধ্যে মধ্যে এই গরম জল পাল্টানো দরকার হয়। কলাই পিঠের সাইজ একটু বড়মাপের হয়। এরপর নারকেল কোরা ও ক্ষীরের পুর দিয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের পিঠে তৈরী হয়। এগুলি ভাপিয়ে নিলে সিদ্ধ পিঠে তৈরী হয়। আবার পানিফলের আকারেও পিঠে তৈরী হয়। এরপর হয় ভাজা পিঠে। এর লেচি তৈরীর একটু বৈশিষ্ট্য আছে—চালের গুঁড়োর সঙ্গে সামান্য ময়দা, লাল আলু সিদ্ধ ও সামান্য হলুদ দিয়ে ভাল করে মেখে শক্ত লেচি তৈরী হয়। তারপর অল্প অল্প কেটে নিয়ে তাতে ক্ষীর, নারিকেল কোরা প্রভৃতি পুর দিয়ে পিঠে পাকিয়ে তেলে ভাজতে হয়। তৈরী হয় মুচমুচে ভাজা পিঠে। এই ভাজা পিঠেকে আবার চিনির রসে ডোবালে তৈরী হয় রসপিঠে।

এই পিঠের সঙ্গে সরু চাকলি ও আস্কে পিঠের এবং পাটিসাপটা তৈরী করার রীতি আছে। সরু চাকলি বা আস্কে করতে হলে চাল গুঁড়ির সঙ্গে জল দিয়ে গোলা তৈরী হয়। এই গোলার সঙ্গে বিরিকলাই বাটা, মৌরী, তেজপাতা, আদাবাটা মিশিয়ে দিয়ে ভালো করে ফেটে নিয়ে হাতা দিয়ে গোলা তাওয়া বা চাটুতে দিয়ে তালপাতা বা বাঁশের চাঁচালির টুকরো দিয়ে বড় রুটির আকারে ছড়িয়ে দিতে হয়—বেশ ভাল করে ভেজে ভাঁজ করে তুলে নিতে হয়। আস্কে পিঠে গড়তে অনুরূপভাবে গোলা তৈরী করে আস্কের ছাঁচযুক্ত সরায় হাতা দিয়ে ছাঁচে ঢেলে জোর আঁচে সরা বসাতে হয় ও সরার ওপর ঢাকা দিতে হয়, প্রয়োজন হলে ঢাকনা সরার চারদিকে ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে সমস্ত ফাঁক বন্ধ করে দেওয়া হয় যাতে বাইরের বাতাস কোন মতে না ঢোকে। ভাপ উঠলেই আস্কে তুলে নিতে হয়। আবার বড় আস্কে তৈরীর বড় সরা ও তার ঢাকনা ব্যবহৃত হয়।

পাটিসাপটা গড়তে সরু চাকলির ওপর ক্ষীর ছড়িয়ে দিয়ে ত্রিকোণাকৃতি পুর দেওয়া সরু চাক্‌লি ঘিয়ে ভেজে নিয়ে চিনির রসে ডোবাতে হয়।

পিঠে খাওয়ার প্রধান উপকরণ ঝোলা খেজুর গুড় ও পায়েস। অঞ্চল বিশেষে আতপ চাল বা পিঠে পায়েস তৈরী হয়। পিঠের পায়েস করতে খুব ছোট সাইজের ক্ষীরের পুর দিয়ে পিঠে করে দু/তিন সের বা আরো বেশী পরিমাণ

দুধে সেই পিঠে দিয়ে খেজুড় গুড়, সামান্য চাল গুড়ি কিশমিশ প্রভৃতি দিয়ে ক্ষীর তৈরী করতে হয়। অতি উপাদেয় রসনা তৃপ্তিকর এইসব পিঠাপুলি পায়স।

তাই তো গুপ্তকবি বলেছেন—এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা। বাউনির দিনে রাত্রের পরব বাউলি বাঁধা ও পৌষ ডাকা। লক্ষ্মীকে নিবেদিত খড়ের (বিচালির) এক একটি নিয়ে পাতা লক্ষ্মী, গৃহের অন্যান্য দেবদেবীকে জড়িয়ে দিতে হয়। রাত্রে শোবার আগে বাড়ীর গৃহিণী শুদ্ধবস্ত্র পরে খড়ের আঁটি নিয়ে বাড়ীর বাক্স-তোরঙ্গ, আলমারি, তুলসীগাছ, গোয়ালঘর, সারকুড় এমন কি রান্না ঘরের হেঁসেলে খাদ্যদ্রব্য সেই খড়ের বেণী দিয়ে বেঁধে দেন। উদ্দেশ্য লক্ষ্মীকে ও বাড়ীর সম্পদকে বেঁধে রাখা।

এর পর হয় পৌষ-ডাকার পরব। এর প্রস্তুতি হিসেবে বিকাল থেকে গোবরের নাড়ু পাকিয়ে সরষের ফুল, মূলার ফুল যোগাড় করে রাখা হয়। পারিবারিক রীতি অনুযায়ী কেউ মধ্যরাত্রে কেউ বা ভোর রাত্রে মাঝ উঠানে, বাইরের দরজায়, গোয়ালের দরজায়, সারকুড়ে, মরাই তলায় পাঁচটি করে গোবরের নাড়ু বসিয়ে তাতে সিঁদুরের টিপ, চাল গুঁড়ো, আতপ চাল. সরষে ও মূলার ফুল দিয়ে গৃহিণী পৌষ-ডাকতে আরম্ভ করেন। সঙ্গে বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরা উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি দেয় আর গৃহিণী ছড়া বলে যান—

এসো পৌষ যেও না
জন্ম জন্ম ছেড়ো না।
পৌষ আসছে গুড়ি গুঁড়ি,
পৌষের মাথায় টাকার ঝুড়ি।
আন্দারে পান্দারে পৌষ
বড় ঘরের মেঝেয় বোস।

অনেক জায়গায় আবার এই ছড়াও বলে পৌষ ডাকা হয়। যেমন—

পৌষ মাসে লক্ষ্মী মাস না যাইও ছাড়িয়ে।
ছেলেপিলেকে ভাত দেব বান্দা ভরিয়ে ॥
পৌষ রে ভাই তোর দৌলে সকরি পিঠে খাই।
হাতে কোলে ছেলে নিয়ে গঙ্গাস্নানে যাই। ইত্যাদি—

এই পৌষ-ডাকার মধ্যে ফুটে ওঠে পল্লীনারীব ধনধান্য ভরা, সন্তান-সন্ততি নিয়ে এক নিটোল সংসারের আকাঙ্ক্ষা।

অনেক পরিবারে পৌষ-ডাকার অন্য রীতি পালিত হয়। দামোদর পাড়ের গ্রামে দেখেছি সন্ধ্যে থেকে ফুলশুদ্ধ গোটা মূলো, সরষে ফুল, মটর ফুল, যোগাড় করে রেখে, বাড়ীর দরজার বাইরে কিংবা উঠোনে আলপনা দেওয়া হয়। কাকভোরে উঠে গৃহিণী শুদ্ধ কাপড় পরে পুকুর থেকে উলুধ্বনি দিতে দিতে ঘট নিয়ে এসে সেই আলপনার মাঝখানে চালের গুঁড়ি ছড়িয়ে দিয়ে তার ওপর ঘট বসিয়ে নৈবেদ্য দিয়ে পৌষ-লক্ষ্মীর পূজা করে যথারীতি পৌষ-ডাকার ছড়া বলে। পরদিন ঘট বিসর্জন। সংক্রান্তির দিন কাকভোরে মকর স্নান। ১লা উত্তরায়ণ। যাদের ঘরে বাঁউড়ি ও সংক্রান্তিতে পাতা-লক্ষ্মীর পূজা হয় তারা সেখানেই উত্তরায়ণের দিন ও উত্তরায়ণ-লক্ষ্মীর পুজো করে। আর যাদের বাঁউড়ি সংক্রান্তিতে লক্ষ্মীপূজা হয় না—আগেই হয়ে যায় তারা উত্তরায়ণের দিন সন্ধ্যাবেলায় বাড়ীর উঠোনে আলপনা দিয়ে লক্ষ্মীর হাঁড়ি নিয়ে এসে ধানের ওপর লক্ষ্মী পাতে। সন্ধ্যার সময় যথারীতি পঞ্চোপচারে পুরোহিত দিয়ে লক্ষ্মী পুজো হয়। এই লক্ষ্মীকে উত্তরায়ণ-লক্ষ্মী বা চলিতে উঠোন-লক্ষ্মীও বলে। এরপর ঘরের মেয়েরা লক্ষ্মীকে ঘিরে বসে থাকে—শিয়াল ডাকার অপেক্ষায়। রাত নয়টা-দশটা-এগারটায় যখনই শিয়াল ডাকবে, তখনই উলূধ্বনি দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে লক্ষ্মী তোলা হবে। নানান গ্রামের নানান রীতি।

বাঁউড়ির রাতে জাতিধর্মনির্বিশেষে গ্রামের যুবকদের খোলা আকাশের নীচে সারারাত ধরে চলে আগুন পোহানর পরব। আগে থাকতে তালপাতা কাটিয়ে শুকিয়ে রাখা হয়। এর ওপর গৃহস্থের বাড়ীর কাঠ, খড় তো আছেই। এ চুরিতে দোষ নাই।

প্রজ্জ্বলিত আগুনের চারপাশে বসে ঢোলক বাজিয়ে গান, মুহুর্মুহু চা ও ক্ষেত্রবিশেষে নিষিদ্ধ পানীয়ও চলে। সকালে গোরুর গাড়ীতে ময়ূরপঙ্খী সাজিয়ে ঢোলক বাজিয়ে যুবকের দল গান করতে করতে যায় নদীতে স্নানে। বর্তমানে অবশ্য ঢোলকের পরিবর্তে মাইকের চলছে একছার ব্যবহার। গাড়ীতে থাকে অজস্র ঘুড়ি, নাটাই প্রভৃতি। নদীর তীরে এই উপলক্ষে মেলাও বসে। সারা দিন-ভোর চলে বনভোজনের সঙ্গে ঘুড়ি ওড়ানোর পর্ব। কলকাতায় যেমন বিশ্বকর্মা পূজায় ঘুড়ি ওড়ানোর পর্ব চলে এ জেলাতে তেমনি পৌষ-সংক্রান্তিতে হয় ঘুড়ি ওড়ানোর পর্ব। এর জন্য কাঁচের গুঁড়ি, বাবলা আঁঠা, কাঁচা ডিম, গঁদ প্রভৃতি দিয়ে সুতোর মাঞ্জা করা হয়। ঘুড়িতে ঘুড়িতে চলে লড়াই। যে দল প্রতিপক্ষের ঘুড়ি কাটতে পারে, তাদের বিজয়ের চিৎকার আর সঙ্গে সঙ্গে কাঁসর ঘণ্টার বাদ্য। উত্তরায়ণে মকরস্নানের পর ঘুড়ি ওড়ানোর হয় আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি।

মকরস্নানে আবালবৃদ্ধবনিতারাও অংশ নেয়। অনেক জায়গায় কিশোর কিশোরী স্নানের শেষে ছড়া বলে—

মাঘ মাসেতে কালাপানি
স্নান করে গো এসো রানী।
এয়োরানী হবো,
সিঁথের সিঁদুর দেবো।
সাত ভাইয়ের ভগ্নী হবো,
টানা পাখায় বাতাস খাবো।
পতি কোলে পুত্র দিয়ে
ফুল ভাসাবো নদীর কূলে।

এই ছড়ার মধ্যে নারীর চিরন্তন সেই পতিপুত্র নিয়ে সিঁথের সিঁদুর নিয়ে নিটোল সুখের সংসার গড়ে তুলে অন্তিম কালে পতিপুত্র রেখে মোক্ষের কামনা। এই পৌষ-সংক্রান্তিতে হয় তুষুলি বিসর্জনের পালা। এই ব্রত সম্পর্কে বিশদ আলোচনা এই অধ্যায়েই করা হয়েছে। সারা পৌষ ধরে কুমারী মেয়েরা শস্যের দেবী এই তুষ-তুষুলির ব্রত পালন করে। গোবরের নাড়ু করে তাতে সিঁদুর দিয়ে সরষের ফুল দিয়ে কুমারীরা পূজা করে। পৌষ-সংক্রান্তির ভোরে সরাসমেত নাড়ুগুলি মাথায় করে নিয়ে যেতে যেতে কুমারীরা বলে—

তুষুলি গেল ভেসে
আমার বাপ ভাই এলো হেসে।
তুষুলি গেল ভেসে
আমার শ্বশুর-শাশুড়ি-স্বামী-পুত্র এলো হেসে।
তুষুলি গেল ভেসে
ধনদৌলত টাকা কড়ি এলো হেসে।

এর মধ্যেও সেই বাপ-ভাই শ্বশুর-শাশুড়ি স্বামী-পুত্র নিয়ে এক সম্পন্ন সংসারের কামনা।

তবে আজকাল পৌষ-পার্বণের জৌলুষ আর তেমন নাই। লোকের সময়ও কম আবার খাবার ক্ষমতাও কমে গিয়েছে। আগে দেখেছি পল্লীগ্রামে এক একজন দশ গণ্ডা, বিশ গণ্ডা পিঠে খেয়ে হজম করতো—এখন অধিকাংশই পেটের রোগী। গ্রামে পিঠে-পরবের যেটুকু রেশ এখনও আছে—পরের প্রজন্মে আর থাকবে বলে মনে হয় না।

আধুনিক প্রজন্মের কাছে এ এক 'ভালগার' উৎসব। এখন পিঠের বদলে কেকের চলন যেন বেশী বেড়েছে। শহরে তো বটেই পল্লীতেও এর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। পল্লীগ্রাম থেকে শহরে এসে যারা বাস করছে তাদের মধ্যে শহরে এই পার্বণ এখনও নমো নমো করে পালিত হচ্ছে তবে পরের প্রজন্মের কাছে এই সব ব্রত-পার্বণ গবেষকের গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে যাবে।

তুষতুষুলি ব্রত : তুষতুষুলি ব্রত সাধারণত এ জেলার নিম্নবর্গের মানুষ যেমন বাউড়ি, কোঁড়া জাতীয়দের কুমারী মেয়েরাই পালন করে। অঘ্রানের সংক্রান্তি থেকে পৌষসংক্রান্তি পর্যন্ত এই ব্রত পালন করতে হয়। শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীপূজার ব্যবস্থা আছে। যেমন সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষের মধ্যে পৌষ সংক্রান্তিতে লক্ষ্মীপূজা, তেমন সমাজে অবহেলিত সমাজের মেয়েরা অন্য এক শস্যদেবী তুষতুষুলি ব্রত পালন করে।

এই ব্রতের নিয়ম হচ্ছে—গোবরের সঙ্গে আতপ চালের তুষ মিশিয়ে ২১টি নাড়ুর মত পাকাতে হবে। তাতে সিঁদুরের টিপ ও ৫টি করে দূর্বা বসিয়ে দিয়ে একটা সরায় রাখতে হবে। এর ওপর ২১টি অশ্বত্থ ও বেগুনপাতা ঢাকা দিতে হবে। এর ওপর গোবরের বা মাটির তৈরী বুড়োবুড়ি বা লক্ষ্মীমূর্তির প্রতীক গড়ে বসিয়ে সন্ধ্যার সময় সরষের ফুল দিয়ে পুজো করতে হয়। পুজোর মন্ত্র—

তুষতুষুলি কাঁধে ছাতি।
বাপ মার ধন যাচাযাচি॥
স্বামীর ধন নিজপতি
বাপের ধন কান্নাকাটি।
পুত্রের ধন পরিপাটী।
তুষুলি গো রাই   তুষুলি গো মাই
তোমায় পূজিয়া আমি কি বর চাই?
অমর গুরু বাপ চাই   ধন সাগরে মা চাই
রাজেশ্বর স্বামী চাই   সভা আলো জামাই চাই
সভাপণ্ডিত ভাই চাই   সভাশোভা বেটা চাই
সিঁথের সিঁদুর দপদপ করে
হাতের নোয়া ঝকঝক করে।
আলনার কাপড়   ঝলমল করে
ঘটি বাটি   মকমক করে
সিঁথের সিঁদুর   মরাইএর ধান
সেই যুবতী এই বর চান।

পৌষ সংক্রান্তির রাত্রে পাড়াশুদ্ধ সব মেয়ে জড় হয়ে তুষের নাড়ুগুলি মাথায় করে নিয়ে জলে ভাসিয়ে দিতে দিতে বলে—

আমার বাবা ভাই এলো হেসে
তুষুলি গেল ভেসে।
আমার শ্বশুর শাশুড়ী স্বামীপুত্র এল হেসে
তুষুলি গেল ভেসে।
ধনদৌলত টাকাকড়ি এলো হেসে
তুষুলি গেল ভেসে।
গৌরী গো মা তোমার কাছে মাগি বর
স্বামীপুত্র নিয়ে যেন সুখে করি ঘর।

তুষুলি ব্রতে যেমন গোবরের নাড়ুকে সরষের ফুল দিয়ে পুজো করা হয়—পৌষ-পার্বণে লক্ষ্মীপূজার বাউনির রাত্রে পৌষ ডাকার সময়ও বাড়ীর উঠোন, বার দরজা, মরাইতলা, সারকুড়েও গোটা পাঁচেক করে গোবরের নাড়ুতে সিঁদুরের টিপ দিয়ে সরষে ও মুলোর ফুল দিয়ে পৌষ ডাকারও রেওয়াজ আছে—

এসো পৌষ যেও না
জন্ম জন্ম ছেড়ো না।
পৌষ আসছে গুড়িগুড়ি
পৌষের মাথায় টাকার ঝুড়ি
আন্দারে পান্দারে পৌষ
বড় ঘরের মেঝেয় বোস।

উচ্চবর্ণের পৌষপার্বণ-এর ব্রত নিম্নবর্গের মেযেদের তুষতুষুলিব রাজ সংস্করণ। রাত্রে তুষুলি ভাসানোর সময় পুতুলের সঙ্গে গোবরের নাড়ুগুলি একটা বাঁশের ধুচুনির মধ্যে বসিয়ে তাতে একটি বা তিনটি বিজোড় সংখ্যক প্রদীপ বসিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এই বিজোড় সংখ্যাটিও আদিম সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী। ভাসানোর সময় আবার একই গ্রামের বিভিন্ন পাড়ার তুষুলি ব্রতিনী ও পড়শীদের অন্য পাড়ার ব্রতিনী ও পড়শীদের মধ্যে তর্জা গানের মত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। জেলার পশ্চিম অঞ্চলে টুসু পরব পালিত হয় সাধারণত আদিবাসীদের মধ্যে। এইসব অঞ্চলে পুতুল প্রচলিত আছে। আদিম জাতির ভাষায় 'টুসু'র অর্থ পুতুল। একটা থালায় করে ঐ পুতুল সরা ঘট রেখে ধান, চাল, ফুল, ফল, দূর্বা, প্রদীপ জ্বালিয়ে, ধূপ-ধুনো সাজিয়ে টুসুর আপ্যায়ন হয় মকর সংক্রান্তির দুদিন আগে থেকে, বিশেষ করে বাউনি থেকে (অর্থাৎ

সংক্রান্তির আগের দিন)। ঘরবাড়ী, কাপড়-চোপড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, নদীতে বা পুকুরে কিছু জ্যান্ত মাছ ধরা, পিঠেপুলি দিয়ে টুসুর ভোগ দেওয়া—এই বিশেষ পূজার অঙ্গ। মকর সংক্রান্তির দিন টুসুকে চৌদলে বসিয়ে টুসুর গান গাইতে গাইতে টুসুকে নদীতে বা পুকুরে বিসর্জন দেওয়া হয়।

কৃষিনির্ভর জীবন-জীবিকায় লক্ষ্মীর আরাধনা চলে টুসুপূজার মাধ্যমে। টুসুর শব্দগত অর্থ কুড়ি; কোড়াদের কাছে টুসু বা বাহা কথার অর্থ একগোছা ফুল। জেলার পশ্চিম সীমান্তে সাঁওতাল মেয়েরা মাথায় একগুচ্ছ ফুল গুঁজে নাচতে থাকে। ফসল তোলার উৎসব এই টুসু। শিকার থেকে কৃষিজীবনের প্রাক্কালে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবে টুসু থেকে তুষতুষুলিতে উত্তরণ বলেই মনে হয়। কোন কোন অঞ্চলে টুসু পূজা উপলক্ষে 'সরা জাগানো' অনুষ্ঠান হয়। সাধারণত মকর সংক্রান্তির ১৫ দিন আগে থেকে 'সরা জাগানো' অনুষ্ঠান শুরু হয়। নতুন সরা এনে তার মধ্যে বালি আর ধান দেওয়া হয় এরপর প্রতিদিন ভোরে এতে জল, পান, সুপুরি, ফল, ফুল দিয়ে পুজো করা হয়। ধানগুলি কয়েক দিনের মধ্যেই অঙ্কুরিত হয়। সরা পাতবে মেয়েরা—গান ও ছড়ার মাধ্যমে চলে সরা জাগানো। মকর সংক্রান্তির দিন চৌদলা করে মেয়েরা শাঁখ বাজাতে বাজাতে, উলুধ্বনি দিতে দিতে ও টুসুর গান গাইতে গাইতে টুসুকে ঘরে নিয়ে আসে—

শাঁখ দিলাম, শলতা দিলাম, দিলাম মোমের বাতি,
একা একা বাতি দিলাম লক্ষ্মী সরস্বতীর।
আতপ চালের পান ঘেঁটেছি বেলতলায় পুজো গো।
বৎস বৎস লক্ষ্মী আনবো এই কাঙালের বাড়ী গো।

এদের টুসু গানের মাধ্যমে ফুটে ওঠে সারাদিনের কঠোর জীবনযাত্রার কাহিনী।

হামরা হলাম আদিবাসী
জঙ্গলে মাটি কাটি।
সারাদিন খাঁটে খুটে।
এমন কোন সরকার নাই
সে হামাদের দেখে—
দেখলই নাই।

এই টুসু গানের মধ্যে আদিবাসী ও নিম্নবর্গের মানুষদের সমাজের হাসিকান্না, দুঃখবেদনা, অভাব-অনটন, সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি ও তাদের প্রতি সরকারের অবহেলার চিত্র ফুটে ওঠে। এদের লেখাপড়ার বিশেষ প্রচলন নাই কিন্তু এদের

গানের মাধ্যমে তাদেরও লেখাপড়ার বাসনা প্রকাশ পায়; —গানগুলি কতকটা ভাদুর মত।

একশ টাকা দুইশ টাকা
তিনশ টাকার বই হাতে
আমাদের টুসু লিখতে যাবে
ইংরেজী কলোম হাতে।

আবার কোন কোন গানে মেয়েজামাই-এর আদর, ননদের সঙ্গে মেয়ের ঝগড়া এইসব প্রাত্যহিক জীবনের বিবরণও স্থান পায়।

চিঠি পাঠাই, ঘোড়া পাঠাই তবু জামাই আসে না
জামাই আদর বড় আদর তিন বেলা বই থাকে না।
আর দুদিন থাক জামাই খেতে দিব পাকা পান
বসতে দিব শীতল পাটি নীলমণিকে করম দান।
চল তুষু চল সারদা কুলিতে বাঁধ বাঁধাব
কুলির জলে সিনান করে রোদেতে চুল শুকাবো।
এক কিল সইলাম, দু কিল সইলাম
তিন কিল বই আর সইব না
যা লো ননদ বলে দিবি
তোর ঘর আর করব না।

আবার ছোট ছোট ছেলেদের মনের বাসনাও ফুটে উঠেছে—

চল তুষু চল খেলতে যাবো রানীগঞ্জের
বটতলা
খেলতে খেলতে দেখে আসবো
কয়লাখাদের জল তোলা।

কিন্তু বর্তমানে এইসব কৃষিভিত্তিক পরবের মধ্যে খানিকটা ভাটা পড়েছে—পূর্বের সেই আনন্দের হুল্লোড় আর নাই। তুষু গানের প্রতিযোগিতা প্রায় হয়ই না। তাছাড়া এক জমিতে বছরে ২। ৩ বার ধান ফলান হচ্ছে—'নতুন ধান্যে হবে নবান্ন'-এর দিন ফুরিয়ে এসেছে। এই জেলার সংস্কৃতির ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে যাচ্ছে। তবু এখনও যেটুকু আছে আদিবাসী জীবনে। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনিব "জাঁতাকলের মধ্যে টুসু পরব নিয়ে আসে ক্ষণিকের ছুটি। মানুষগুলো ভুলে যায় দুঃখের বারমাস্যা। ঘরে ঘরে তৈরি হয়েছে পিঠেপুলি। নতুন চালের কত কি। হাঁড়িয়ার গন্ধে মিশে যায় উৎসবের আমেজ। জীবন সংগ্রামে প্রান্তিক

সীমায় পৌঁছে যাওয়া মানুষগুলি আনন্দে মাতোয়ারা। চতুর্দিকে খুশির জোয়ার।"
(দেশ—৩০।৩।৯১, পৃ: ৬৭)

যমপুকুর ব্রত : কুমারীরা কার্তিক মাস ব্যাপী যমপুকুর ব্রত পালন করে। এটি একটি আদিম সমাজের জাদুক্রিয়াজাত জলঢালার অনুষ্ঠান। সকলের মঙ্গল ও ঐশ্বর্য কামনায় কুমারী মেয়েরা এই ব্রত পালন করে।

বাড়ীর উঠোনে এক হাত চৌকো পুকুরের মত কাটা হয়—তার চারপাশে হবে চারটে ঘাট। এই পুকুরের মাঝখানে সবুজ ধানগাছের চারা, হিঞ্চে, শুষণি, সাদা ও কালো কচু গাছ ও হলুদ গাছ বসাতে হয়।

পুকুরঘাটে দক্ষিণ পাড়ে বসাতে হবে যমরাজা, যমরানী ও যমের মাসীর পুতুল, উত্তরঘাটে বসাতে হবে—মেছোমেছুনীর পুতুল, পূর্বঘাটে ধোপাধোপানীর, শেকো শেকোনী ও পশ্চিমঘাটে কাক, বক, চিল এবং পরে পুকুরের মধ্যে কুমির, হাঙর ও কচ্ছপের পুতুল গড়ে রাখতে হবে। আর একটি জ্যান্ত চ্যাঙ্ মাছ জলে ছেড়ে দিতে হবে। পুকুরে জল ঢেলে দিয়ে চারকোণে ৪টি হলুদ ও কড়ি পুঁতে দিতে হবে। সারা কার্তিক মাস ধরে কাক কোকিল ডাকার আগে শুচিবস্ত্রে সচন্দন ফুল দিয়ে নিম্নলিখিত মন্ত্রে পূজা করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে কাকে যেন এই মন্ত্র না শোনে। শুনলেই মন্ত্র পচে যাবে, ব্রতের ফল নষ্ট হবে। মন্ত্র অনেকটা সাঁঝপুজুনি ব্রতের ছড়ার মত—

যমপুকুরটি পূজ্জন সোনার থালে ভোজ্জন
সোনার থালে ক্ষীরের নাড়ু
শঙ্খের ওপর সোনার খাড়ু।
কালো কচু ধলো কচু কচু লকলক করে
যমের দুয়োরে অর্গল পড়ে।

কচুগাছ পুজোর পর জল ঢালতে হবে—

চার কোণা পুকুরটি টাবুটাবু করে
চ্যাঙ মাছটি এদিক ওদিক লাফালাফি করে।
কলমী শুশুনী দম্‌দম্ করে
রাজার বেটা পক্ষী মারে।
মারণ পক্ষীর শুকোয় বিল
সোনার কপাট রুপোর খিল।
খিল খসাতে হাতে ছড়
আমার বাপ ভাই লক্ষেশ্বর।
লক্ষ লক্ষ দিলে বর, ধনে পুত্রে বাড়ুক ঘর।

শেষে যমরাজাকে সাক্ষী রেখে প্রণাম করতে হয়—

যমরাজা সাক্ষী থেকো
যমপুকুরটি পূজি
যমরানী সাক্ষী থেকো
যমপুকুরটি পূজি।
যমপুকুর করে যে
যমের জ্বালা পায় না সে।

এই ব্রত চারবছর পালন করতে হয়। চতুর্থ বৎসর কার্তিকের সংক্রান্তিতে উদ্‌যাপন। এইদিন ব্রতকথা শুনতে হয়—

এক বুড়ীর এক ছেলে শুকরাজ আর এক মেয়ে দুগরাজ। শুকরাজের বিয়ে হলো এক গেরস্থ বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে আর দুগরাজের বিয়ে হলো যমরাজার সঙ্গে। শুকরাজের বউ এসে উঠোনে পুকুর কেটে যমপুকুর ব্রত করছে। শাশুড়ী বউ-এর বিড়বিড়িনি শুনে রেগে লাথি মেরে যমপুকুর ভেঙে বুজিয়ে দিল। বউ যমরাজাকে সাক্ষী করে বলল সে যমপুকুর ব্রত করেছে। এমনি করে পরপর চারবছর কখনও ছাইয়ের গাদায়, কখনও উনুনের ধারে, কখনও তুলসীতলায় যখনই পুকুর কেটে যমপুকুর ব্রত করে তখনই শাশুড়ী বউয়ের বিড়বিড়িনি শুনে এসে লাথি মেরে ভেঙে দেয়। যমরাজাকে সাক্ষী রেখে বউ ব্রত সাঙ্গ করে। এরপর শাশুড়ীর এক কঠিন রোগে মৃত্যু হলো। শাশুড়ীর মৃত্যুর পরই যমদূতরা তাকে নিয়ে গিয়ে বিষ্ঠা পুকুরে ডুবিয়ে দিলে। যমরাজার প্রাসাদের দক্ষিণ দিকে ছিল এই পুকুর। যমরাজা দুগরাজকে সর্বত্র ভ্রমণ করতে অনুমতি দিল কিন্তু দক্ষিণ দিকে যেতে নিষেধ করল। হঠাৎ একদিন কৌতূহলবশত দুগরাজ দক্ষিণ দিকে গিয়ে মায়ের নরকযন্ত্রণা দেখে। দুগরাজ যমরাজকে বললে সে খুব অন্যায় করে ফেলেছে তার কথা না শুনে দক্ষিণ দিকে গিয়ে। কিন্তু সে যমরাজার কাছে কাকুতি-মিনতি করে মাকে উদ্ধার করে দিতে বলল। যমরাজ বলল শুকরাজের বউ যদি চারবছর তার শাশুড়ীর নামে যমপুকুর ব্রত করে তবেই তার মায়ের উদ্ধার হবে। দুগরাজ বাপের বাড়ী এসে শুকরাজের বউকে চারবছর যমপুকুর ব্রত করতে বলল। সে তো কিছুতেই রাজী হয় না। সে বছর শুকবাজের বউ ছিল পোয়াতি। দুগরাজের অনুরোধে যমরাজ তার প্রসবের সময় চরম যন্ত্রণা দিল। তখন দুগরাজ বলল—বউ তুই যমপুকুর ব্রত করলেই এখনই প্রসব হয়ে যাবে। শুকরাজের বউ কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তাই মানত করল। তখন সুপ্রসব হলো। রাজপুত্রের মত ছেলে হলো। শাশুড়ী মুক্তি পেল—যমপুকুর ব্রত মর্তে প্রচলিত হলো।

ভাদুব্রত : (ভাদ্র মাসের ব্রত) বর্ধমান জেলার পশ্চিম সীমান্তের আদিবাসীদের করম উৎসবের লৌকিক সংস্করণ এ জেলায় ভাদু উৎসব। করম উৎসব থেকে পুরুলিয়া জেলার নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে ভাদু উৎসবের চলন হয়েছে। তবে মূলত ভাদু উৎসব পুরুলিয়া, মানভূম জেলার নিম্নশ্রেণীর উৎসব হলেও বর্তমানে বাঁকুড়া ও বর্ধমানের ব্যাপক অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে এই উৎসব ছড়িয়ে পড়েছে। শ্রমজীবী মানুষের কৃষিভিত্তিক উৎসব ভাদু উৎসব। বর্ষায় চাষবাসের শেষে ভাদ্র মাসে নতুন ফসল ওঠার সম্ভাবনায় আনন্দে মেতে ওঠে শ্রমজীবীর দল, তারই প্রতিফলন ঘটে ভাদু উৎসবের মাধ্যমে।

এখন প্রশ্ন ভাদু কে? ইনি কি শাস্ত্রীয় দেবী না লৌকিক দেবী কিংবা সাধারণ রাজকন্যা বা মানবী?

কিংবদন্তীতে আছে—মানভূমের রাজার সুন্দরী কন্যা ভদ্রাবতী। ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে তার অকালমৃত্যু হয়—তাই তার স্মৃতি চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য রাজার আদেশে রাজ্যে সারা ভাদ্র মাস ব্যাপী এই ব্রত পালিত হয়। Imperial coronation Durbar Delhi (1911—Khosla Vol.I) থেকে জানা যায় The Great Grand Father of the Present Raja (Jyoti Prosad) removed to Kashipur in the district of Manbhum জ্যোতিপ্রসাদ সিংহদেও ছিলেন পুরুলিয়া পঞ্চকোটের রাজা। জ্যোতিপ্রসাদ পঞ্চকোট থেকে পুরুলিয়া জেলার কাশীপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। জ্যোতিপ্রসাদের পিতামহ নীলমণি সিংহদেও-এর কন্যা ভদ্রাবতী। এই ভদ্রাবতীর আকস্মিক মৃত্যু হয় ভাদ্রের সংক্রান্তিতে। এরই স্মৃতিতে ভাদু উৎসব। প্রচলিত ধারণা ভদ্রাবতীর এক ভগিনী ছিলেন চন্দ্রাবতী। কিন্তু ভাদুর গানে চন্দ্রাবতীকে জননী বলা হয়েছে।

এলে গো এলে গো আমার ভাদুজননী
আমি সন্ধ্যার পরে পেলাম রাতুল চরণ দুখানি।

কাজেই মনে হয় ভদ্রাবতী চন্দ্রাবতীর পূর্বের কোন রাজকন্যা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য কবি মধুসূদন দত্ত পুরুলিয়ায় এই কাশীপুর পঞ্চকোটরাজের কিছুদিন অতিথিরূপে অবস্থান করেছিলেন। ১১।১১।৭৮ তারিখে দেশ পত্রিকায় শান্তি সিংহের "মধুসূদন কেন নীরবে পুরুলিয়া ছেড়েছিলেন" প্রবন্ধে দেখা যায়, রাজকুমারী চন্দ্রাবতী বা চন্দ্রকুমারী কবিত্ব শক্তির অধিকারিণী ছিলেন। তাঁর দু'খানি ভাদু সংগীতও পাওয়া গেছে। প্রথিতযশা মহাকবির উপর তরুণী কবির শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালবাসা জাগতে পারে—যার ফলে কবিকে পুরুলিয়া ছাড়তে হয়।

কাজেই ভাদু দেবীও নয়, দানবীও নয়—ভাদু রাজকন্যা এবং ভাদুর জন্মমৃত্যু সম্পর্কিত বিবরণের ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকাই সম্ভব।

কিন্তু পুরুলিয়া অঞ্চলে ভাদু সম্পর্কে যে সব কিংবদন্তী প্রচলিত আছে সেগুলির কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। সেগুলি নিছক কিংবদন্তী। আমার কন্যা ডঃ কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় যখন সুইসা নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকার পদে নিযুক্ত হয়ে যান সে সময় এক ভাদ্র মাসে আমি কিছুদিন ওখানে ছিলাম। সে সময় পুরুলিয়া রঘুনাথপুর অঞ্চল থেকে ভাদু সম্পর্কিত কিছু কিংবদন্তী সংগ্রহ করি। পরবর্তীকালে পল্লব সেনগুপ্তের 'পূজা পার্বণের উৎস কথা' পুস্তকেও সেই-রূপ কাহিনীর বিবরণ দেখি। কাহিনীগুলি এরূপ : ভাদু পঞ্চকোট সিংহদেও রাজপরিবারের রাজকন্যা। কিন্তু তিনি স্থানীয় বাইরী, কুরী ও আদিবাসীদের দরিদ্র পরিবারের প্রতি অত্যন্ত দানশীলা ছিলেন। সেকারণে স্থানীয় নিম্নবর্গের মানুষজন ভদ্রাবতী বা ভদ্রেশ্বরীকে দেবী জ্ঞানে ভক্তি করতেন। এই ভদ্রাবতীর আকস্মিক মৃত্যু হয় ভাদ্র মাসে। এঁর জন্মও হয়েছিল ভাদ্র মাসে। সে কারণে এই সমস্ত নিম্নবর্গের মানুষ তাঁদের আদরের ভাদুলীকে দেবী জ্ঞানে সারা ভাদ্র মাস পূজা করে। পরবর্তী কালে ভাদুকে জননী বা কন্যা রূপে কল্পনা করে তাঁর সম্পর্কে নানা গানও বাঁধে এবং সারা ভাদ্র মাস বাড়ীতে বাড়ীতে সেই গান গেয়ে বেড়ায়।

অন্য কাহিনীতে দেখা যায় ভদ্রাবতী রাজকন্যা কিন্তু জন্ম থেকে মীরার মত কৃষ্ণভক্তিপরায়ণা। দিনের অধিকাংশ সময়েই কৃষ্ণ আরাধনায় মগ্ন থাকে। মন্দিরে বসে কৃষ্ণকে আপনজন রূপে তাঁর উদ্দেশ্যে গান করে। তাঁর সঙ্গে আপন মনে কথা বলতেন। ভাদু যখন বিবাহযোগ্যা হন তখন রাজা ভদ্রাবতীর জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করতে থাকেন। কিন্তু একদিন রাত্রে ঘটল অঘটন। রাত্রে ভাদু মন্দিরের দরজা বন্ধ করে কৃষ্ণ আরাধনায় রত। আপন মনে তাঁর প্রাণের ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে বিড় বিড় করে কথা বলে যাচ্ছেন। কৃষ্ণের গলায় মালা দিচ্ছেন, কৃষ্ণকে খাওয়াচ্ছেন। এমন সময় রাজা সেই দিক দিয়ে যাচ্ছিলেন; হঠাৎ তিনি শুনলেন তাঁর মেয়ে কারো সঙ্গে গোপনে প্রেম করছেন। রাজা কান পেতে শুনতে লাগলেন। এ-তো প্রেমিকের কাছে প্রেমিকার প্রেম নিবেদনের আলাপচারিতা। তিনি ধৈর্য ধরতে পারলেন না। জোর করে মন্দিরের দরজা খুলে ফেললেন। হায়! কি দেখলেন তিনি? কৃষ্ণের মূর্তির পায়ের কাছে তাঁর আদরের ভদ্রাবতীর মৃতদেহ লুটিয়ে পড়েছে। তখন রাজার অনুতাপই সম্বল। তাঁর কন্যার স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য তিনি সারা ভাদ্র মাস জুড়ে ভাদু উৎসব পালনের আদেশ দেন। প্রচলিত হল জেলার পশ্চিমপ্রান্তসহ বাঁকুড়া ও বর্ধমানের

বিভিন্ন গ্রামের ভাদু উৎসব। সব কটি উপাখ্যানেই ভাদুকে রাজকন্যা রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। তবে কিংবদন্তী দুটির মধ্যে প্রথমটির কিছু বিশ্বাসযোগ্যতা রয়েছে বলে মনে হয়। ডঃ সুকুমার সেনের মতে "ভাদ্র মাসের উৎসবের মধ্যে ইন্দ্রপূজা (ভাঁজো) ও বাস্তুপূজার সঙ্গে মিলিয়া গিয়া পশ্চিম অঞ্চলের ভাদু পরব হয়েছে।" ভাদ্র মাসের প্রথম দিন থেকে ভাদুর একটি মৃন্ময়ী মূর্তি গড়ে মূর্তির সামনে কুমারী মেয়ে ভাদুর আগমনী গান গায়—

ভাদুর আগমনে কি আনন্দ,
এলো ঘরে গো এলো গো শুভ দিনে
মোরা সাজি ভর্তি ফুল তুলেছি গো
যত সব সখীগণে।

ভাদু গানের মাধ্যমে কুমারী হৃদয়ের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা ফুটে ওঠে। বর্তমানে এ জেলার পূর্বাঞ্চলের গ্রামে গ্রামে ভাদু উৎসব ছড়িয়ে পড়েছে। সমাজের অবহেলিত নিম্নবর্গের মানুষেরা একটি কুমারীকে শাড়ী-ঘাঘরা পরিয়ে ভাদু সাজায়। ভাদুর একটি মূর্তি নিয়ে গ্রামের ঘরে ঘরে ভাদুগান গাইতে বের হয়। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু তাঁর "বাংলার লৌকিক দেবতা" গ্রন্থে ভাদুর এই মূর্তির উল্লেখ করেছেন—ভাদু উৎসব সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন—'ভাদু পূজা নৃত্য-গীতের উৎসব, মন্ত্র অর্চনা বিশেষ নেই। ভাদ্র মাসের প্রথম দিন ঐ উৎসব আরম্ভ হয়। সমাপ্তি ঘটে সংক্রান্তির দিন। ভাদুর আকৃতি অতি সুশ্রী, বর্ণ ঘন হরিদ্রা। টানা টানা দুটি চোখ, কপালে লাল টিপ, মাথায় শোলা বা রাংতার তৈরী বেশ বড় মুকুট। রঙীন শাড়ী (বা ঘাগরা) ফুলকাটা বক্ষবন্ধনী পরা। দুটি হাত, এক হাতে মন্ডা বা সন্দেশ, অন্য হাতে ধানের শিষ কিংবা একটি পান। মূর্তি সাধারণত দু ফুটের বেশী উচ্চ হয় না। সর্বদা উচ্চ আসনে উপবিষ্ট দেখা যায়।"

এরূপ একটি মূর্তি দলের একজন মাথায় করে নিয়ে যায় ঘরে ঘরে; সঙ্গে থাকে মাদল বা ঢোলক, আর একজন বাজায় কাঁসি বা খঞ্জনী, একজনের হাতে থাকে ধামা। ভাদু সাজে যে মেয়ে বা ছেলে সে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে আগে আগে যায়। গৃহস্থের বাড়ীর উঠোনে ভাদুর মূর্তি নামিয়ে ঢোলক বাজিয়ে ভাদুর গান শুরু হয় আর বাজনার তালে তালে সেই ভাদুর সাজে মেয়েটি ঘুরে ফিরে নাচতে থাকে। গৃহস্থের বাড়ীর ছেলেমেয়েরা এই গানগুলি খুব উপভোগ করে। গান শেষে থালাভর্তি চাল, টাকাপয়সা ধামায় ঢেলে দেয়।

তুষুর গানের মত ভাদুগানও ব্রতের গান—

আমার ভাদু ঘরকে এলেন
কুথায় বসাবো?
পিয়াল গাছের তলায় বেদী
আসন সাজাবো।
না—না—না—না—
আমার সোনার ভাদু
কোলে তুলে লাচাবো।

এই সব ভাদুগানের মধ্যে সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট সুখদুঃখ, অভাব-অভিযোগের বিষয় যেমন থাকে তেমনি থাকে সমাজ ও রাষ্ট্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি, শাসন-শোষণের কথা। সমাজের নানা অনাচারের প্রতিও কটাক্ষ করা হয় এই সব গানের মাধ্যমে। গান বাঁধে এই নিম্নবর্গের মধ্যে কোন পল্লী কবিয়াল। তাই এদের গানে এই অবহেলিত সমাজের দুঃখ, বেদনা, অভাব-অভিযোগের ঘটে মূর্ত প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ, তাহা তো প্রয়োজনের প্রকাশ নহে। চিরদিনই লোকসাহিত্য লোক আপনি সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। দয়ালু বাবুদের উপর বরাত দিয়া সে কলেজের দোতলার দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া বসিয়া নাই।"

আনবো সন্দেশ থালা থালা
খাওয়াবো ভাদু ধনে
ভাদু পুজো নেই যেথায় গো
কি কাজ তাদের জীবনে?
ওগো ভাদু দুঃখেতে যাই মরে
ওরা দিনে রেতে মানুষ খুন করে।
ভাদু পরবি তুই লাইলনের শাড়ী?
ও লো তোর রুচিতে রকমারি।

সমাজের এই রুচিহীনতার প্রতি যেমন কটাক্ষ আছে তেমনি চোখজ্বলা শাশুড়ি ননদের প্রতিও কটাক্ষ আছে।

হলুদ বনের ভাদু তুমি হলুদ কেন
মাখো না?
শাশুড়ি ননদের ঘরে হলুদ মাখা
সাজে না।
ভাদু হলুদ মেখো না।
ভাদু, হলুদ মেখো না।

আবার স্বামীর মন পাবার জন্য স্ত্রী—নিশিপাড় শাড়ী পরে স্বামীর মন ভোলাতে চায়—

হাসি খুশী, নিশি পেড়ে আমি কাপড় পড়েছি।
মন ভুলো ফুলনের পাছা; ডাকে চিঠি ছেড়েছি।

বর্তমানে চলছে সর্বত্র ঘুষের কারবার। তারও প্রতি কটাক্ষ আছে ভাদু-গানে—

ঘুষে ঘুষে দেশের একি হলো হাল
ওরে দ্যাখ ঘুষে সবাই নাজেহাল।

পঞ্চায়েত নির্বাচন, সাক্ষরতা অভিযান, এ সব নিয়েও গান বাঁধা হয়।

আমার ভাদুর রূপের ছটা গো
লেখাপড়া জানে না,
সাক্ষরতার কেন্দ্রে দিব
শিখবে কত, ঠকবে না।
লেখাপড়া শিখবে ভাদু
এম.এ. বি.এ. পাশ দিবে
ইলেকশনে লড়বে ভাদু
পঞ্চায়েতে ভোট হবে।
দুর্গাপুরে যাবে ভাদু
ইস্টিলে কাজ করবে গো
আনবে টাকা পয়সা ভাদু
অভাব মোদের থাকবে না।

সাক্ষরতা, পঞ্চায়েতে নির্বাচন সম্পর্কে অন্যরকম গানও শোনা যায়।

আমার ভাদু লিখতে যাবে গো
সাক্ষরতা ইস্কুলে
জজ ম্যাজেস্টর হবে ভাদু
জজ ম্যাজেস্টর হবে ভাদু
এম.এ. বি.এ. পাশ দিলে।
এবার যখন হবে হিথা গো
পঞ্চায়েতে ইলেকশন
আমার ভাদু লড়বে ভোটে
আমার ভাদু লড়বে ভোটে

(আমাদের) পার্টি দেবে নমিশন (নমিনেশন)
তোমরা সবাই ভোট দিও গো
আমার ভাদু হবে মেম্বর
ঘরে ঘরে আলো দিবে গো
হাঁসপাতালে ডাক্‌তার।

এই ভাবে সারা ভাদ্র মাস ধরে গ্রামের এক ঘর থেকে অন্য ঘরে ভাদুর মূর্তিকে নিয়ে নৃত্য-গীতের দ্বারা গৃহস্থের মনোরঞ্জন করে চাল পয়সা সংগ্রহ করে। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে ভাদুর ব্রতের উদ্‌যাপন। ভাদুর মূর্তিকে বিসর্জন দিয়ে, নিম্নবর্গের পাড়ার সকলে মিলে সংগৃহীত চাল টাকাপয়সা দিয়ে সারারাত্রি-ব্যাপী হই-হুল্লোড় করে; খাওয়া-দাওয়া হয়—এমনি ভাবে ঘটে ভাদুর উৎসবের পরিসমাপ্তি। তবে পশ্চিম প্রান্তের বাউড়ীরা বিসর্জনের দিন মূর্তি নিয়ে শবযাত্রা করে, করুণ সুরে গান করে।

এখন প্রশ্ন ভাদুব্রত কি সত্যিই ব্রত না পূজা, না নিছকই উৎসব? মানুষের কামনা-বাসনা পূরণের জন্য যে অনুষ্ঠান হয় তাই ব্রত। "ব্রত হলো ধর্মের গার্হস্থ্য রূপ"। ভাদুর উৎসব যে ভাবে বর্তমানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে একে ঠিক ব্রত বলা যায় না। যে ভাবে শাস্ত্রীয় পূজা অনুষ্ঠিত হয় সেই অনুসারে ভাদুকে পূজা বলা যায় না। চাষবাসের কঠোর পরিশ্রমের পর নতুন ফসল ওঠার সম্ভাবনায় ভাদু নিম্নবর্গের মানুষদের নৃত্যগীতের উৎসব। কিন্তু জেলার পশ্চিম প্রান্তের বাউড়ীদের মধ্যে পূর্বে ভাদুর বিসর্জনের দিন শোকের মিছিল হয় তাতে মনে হয় ভাদু উৎসব বাউড়ীদেরই প্রাচীন উৎসব—ভাদু এদেরই উপাস্য ছিলেন। তবে বর্তমানে এটি নিছক নৃত্যগীতের উৎসব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভাদু উৎসব পালিত হয় ভাদ্র মাসে—যখন নতুন আউস ধান ওঠার সময় হয় আর টুসু উৎসব পালিত হয় পৌষ মাসে যখন আমন ধান ওঠার সময় হয়।

সেই দিক দিয়ে বিচার করলে ভাদু ও টুসু উৎসবই শস্যদেবীর উৎসব। ভাদ্র মাসে শস্যের দেবী লক্ষ্মীর একদিন পূজার শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা আছে। আবার পৌষ মাসে লক্ষ্মীপূজা তিন দিন ধরে হয়। সে দিক দিয়ে ভাদু ও টুসু সমগোত্রীয়। তবে আজকাল এই সব উৎসবে নৃত্য-গীতের প্রাধান্য হওয়ায় শস্যদেবীর উৎসব হিসেবে ভাদু-টুসুর গুরুত্ব লোপ পাচ্ছে।

এ সম্বন্ধে পল্লব সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁর "পূজা পার্বণের উৎস কথা" গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "স্থানীয় আদিবাসী সমাজে ঐ একই সময়কালে জাওয়া, করম ইত্যাদি যে সব উৎসব স্মরণপূর্বকাল থেকে চলে আসছে, তাঁদের সঙ্গে সামাজিক

আর্থনীতিকভাবে প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত এই বাউড়ী বাগ্‌দী প্রমুখ গোষ্ঠীর মধ্যেও অনুরূপ একটি উৎসব প্রচলিত থাকা খুবই স্বাভাবিক। এটিই ভাদু পরবের রূপ ধরেছে পরে : কিংবদন্তীগুলি তৈরী হয়েছে ঐ রূপান্তরের উপাদান হিসেবে।"

ড. শীলা বসাক ভাদ্র মাসের ভাদু উৎসবের সঙ্গে আর এক ব্রতের উল্লেখ করেছেন। এটি উচ্চবর্গের মেয়েদের ভাদুলী ব্রত, বাণিজ্য-যাত্রী প্রবাসী প্রিয়জনের নিরাপদে ফিরে আসার কামনায় এই ব্রত পালিত হয়। সারা মাস ধরে মেয়েরা এই ব্রত পালন করে। বর্ষার পর প্রিয়জনের বিদেশ থেকে সমুদ্রযাত্রা শেষে জলপথে বা স্থলপথে নিরাপদে ফিরে আসার কামনায় মেয়েরা আল্পনা দিয়ে ছড়া কেটে ভাদুলী ঠাকুরানীর আরাধনা করে।

এ নদী সে নদী এক খানে মুখ
ভাদুলী ঠাকুরানী ঘোচাবেন দুখ।
এ নদী সে নদী এক খানে মুখ
দিবে ভাদুলী তিন কুলে সুখ।
ভেলা ভেলা সমুদ্রে থেকো।
আমার বাপ ভাইরে মনে রেখো।
জোড় জোড় জোড় সোনা দত্তর জোড় নৌকায় পা।
আসতে যেতে কুশল করবেন ভাদুলী মা ॥
নদী নদী কোথা যাও?
বাপ ভায়ের বার্তা দাও।
নদী নদী কোথা যাও?
সোয়ামী শ্বশুরের বার্তা দাও।

ব্রতী আলপনাতে মাথায় জোড়া ছত্রসহ ভাদুলীর মূর্তি, জোড়া নৌকা, নদী, সমুদ্র আঁকে—ভাদুলী ঠাকুরানীকে আঁকা হয় যেন জোড়া নৌকায় পা দিয়ে বসে আছেন। ভাদ্র ঋতুকে এই ভাবে quasi-religions duty হিসেবে পূজা করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে আলপনাতে বনের ছবি, গাছপালা, কাক, চিল, বন্য মহিষ, বাঘ, ভালুক এই সব Zoomorphic নক্সাও থাকে।

বাঘ বাঘ বনের বাঘ
তোমরা নিও না বাপ-ভায়ের দোষ।

মনে হয় সমুদ্রযাত্রা শেষে সুন্দরবনের বাদা অঞ্চল দিয়ে ফিরে আসবার সময় বাপ ভাই শ্বশুর দেবর যাতে বাঘের বা বন্য মহিষের কবলে না পড়ে তার জন্যেই ছড়ার মন্ত্রে তাদের পূজা করা হয়। (ভারতবর্ষ-ভাদ্র ১৩৪৬)। বর্তমানে আর

ভাদুলী ব্রতের প্রচলন প্রায় নেই। রসিকসাধু, ধুসদত্ত, গুণদত্ত, চাঁদ সদাগরের যুগও শেষ হয়েছে। জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের রমরমা চলে গেছে। আর ভাদুলী ব্রতের প্রয়োজনীয়তাও ফুরিয়ে গেছে। বর্ধমান জেলায় ভাদুলী ব্রতের দিন ফুরিয়েছে তবে সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলে এর প্রচলন থাকলেও থাকতে পারে।

সুবচনী ব্রত : বছরের যে কোন সময় আচরণীয় ব্রত। অন্নপ্রাশন, বিবাহ, প্রভৃতি যে-কোন শুভ কাজ করার আগে মানত করে শুভকার্য সম্পন্ন হলে এই ব্রত পালন করা হয়। এই ব্রত মানতের বা অনুষ্ঠানের কোন নির্দিষ্ট ঋতু বা মাস নাই। যে কোন মাসে শুভকার্যের অনুষ্ঠান উপলক্ষে এই ব্রত পালন করার রীতি জেলার সর্বত্র প্রচলিত আছে। এই ব্রতের উপকরণ—ঘট, আম্রপল্লব, আমসরা, পদ্মফুল, নাড়ু, পান, কলা, খই সুপুরি, তিল, সিঁদুর ও পিটুলি গোলা। উঠোনের মধ্যে চতুষ্কোণ ঘর কেটে তার চারপাশে পিটুলি গোলা দিয়ে আলপনা আঁকতে হবে। আলপনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো চার জোড়া হাঁস ও একটি খোঁড়া হাঁস। একটা মাটি বা তামার ঘটে আম্রপল্লব দিয়ে পুকুর থেকে জল ভরে আনতে হবে। ঘট বসিয়ে তার ওপর আমসরা ও পদ্মফুল; অভাবে অন্য ফুল রাখতে হয়। একটা গর্ত খুঁড়ে সেটিকে দুধ দিয়ে ভর্তি করতে হবে। খই-নাড়ুর নৈবেদ্য, অন্য পাত্রে তিল ও তার ওপর মুস্কারি দিয়ে সাজাতে হবে। আর পান, কলা ও সুপুরি দিয়ে মোকাম সাজিয়ে সুবচনীর পূজা করতে হয়। শাস্ত্রীয় মতে পুরোহিত বা পূজারী দিয়ে স্বস্তিবাচন, ব্রতিনীর নামে সংকল্প করে সুবচনীর ধ্যানে আবাহন ও ষোড়শোপচারে পূজা করতে হয়। সুবচনীর ধ্যান।

ওঁ রক্তাঙ্গী চ চতুর্মুখী ত্রিনয়না রক্তাম্বরালঙ্কৃতা
পীনোত্তুঙ্গকুচা দুকুলবসনা হংসাধিরূঢ়া পরা।
ব্রহ্মানন্দময়ী কমণ্ডুলকরাভীতি প্রাদানোৎসুকা
ধ্যেয়া সা শুভকারিণী ত্রিজগতাং সর্ব্বাপদুদ্ধারিণী।

পূজামন্ত্র : ওঁ শুভবচনী দৈব্যৈ নমঃ।

এরপর হংস প্রভৃতি পূজা করে ব্রতকথা শুনতে হয়।

সংক্ষেপিত ব্রতকথা : বন্দমাতা সুবচনী, পুরাণে মহিমা শুনি, পতিত পাবনী পুরাতনী। বলি আমি করপুটে, অধিষ্ঠান হও ঘটে, শুন আমার ব্রতবাণী। কলিঙ্গ রাজ্যে ছিল এক অনাথা ব্রাহ্মণী—তার একটি মাত্র ছেলে—ভিক্ষে-সিক্ষে করে দিনপাত করে। ভিক্ষে করে ছেলের পৈতে দিল। ছেলেটি পাঠশালায় যায়। সেখানে কত বড়লোকের ছেলে মাংস-লুচি এনে খায়। ছেলেটি জুলজুলিয়ে

তাকিয়ে দেখে। তারও মাংস খেতে সাধ যায়। ভাত জোটে না তো পাখীর মাংস। ছেলেটি মাংস না পেয়ে রেগেমেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পথে যেতে যেতে গোটা নয় হাঁস দেখতে পেল। তার মধ্যে একটি আবার খোঁড়া। ছেলেটি সুযোগ বুঝে খোঁড়া হাঁসটিকে ধরে নিয়ে এলো। মা তো ভয়েই অস্থির। তাড়াতাড়ি পালক ছাড়িয়ে ছেলেকে রেঁধে দিল।

এখন হাঁসগুলো ছিল রাজার হাঁস। রাজা সাহেবের সকালে উঠেই হাঁসগুলোকে দেখে আসার অভ্যাস ছিল। কাজেই পরদিন সকালে হাঁস দেখতে গিয়ে দেখলেন খোঁড়া হাঁস নাই। রাজা তো রেগে অগ্নিশর্মা, সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন যেখান থেকে পারে হাঁস খুঁজে আনতে। সৈন্যরা খুঁজতে খুঁজতে ব্রাহ্মণীর বাড়ীর পাশে হাঁসের পালক দেখে ব্রাহ্মণীর ছেলেকে বেঁধে এনে রাজার কাছে হাজির করলো। মা তো কেঁদে সারা—ছেলেকে চারদিকে খুঁজতে বের হলো। খুঁজতে খুঁজতে এক বাড়ীতে দেখলো মেয়েরা সুবচনীর ব্রত করছে। ব্রাহ্মণী সুবচনীর কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে মানত করল ছেলেকে অক্ষত অবস্থায় পেলে সেও সুবচনীর ব্রত দেবে।

সেই রাতেই সুবচনীদেবী রাজাকে স্বপ্ন দিলেন। এক্ষুনি ছেলেকে ছেড়ে দাও, না হলে রাজ্য ছারখার হবে। আর তোমার মেয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণ বালকের বিয়ে দাও। রাজা সকালে উঠেই ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে জামাই আদরে ঘরে আনল। আর হাঁসের ঘরে গিয়ে দেখলো খোঁড়া হাঁস ঠিকই আছে। এরপর রাজা মহাধুমধাম করে মেয়ের বিয়ে দিল ও অনেক ধনদৌলত দিয়ে ব্রাহ্মণীর ছেলেকে ঘরে পাঠালো। ব্রাহ্মণী ছেলে বউকে বরণ করে ঘরে তুলল। সে দিনই ব্রাহ্মণী "তবে জলধারা দিয়ে, বরকন্যা গৃহে লয়ে আঙ্গিনায় পূজে সুবচনী।" রাজ্যে সুবচনী ব্রত প্রচারিত হলো। সুবচনীর (শুভচুনী) পাঁচালীকারের মধ্যে মুরলীধর দাস, দ্বিজ রামপ্রসাদ ও মাধবীলতার নাম উল্লেখযোগ্য। "সুবচনী পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ / রচিল মাধবীলতা অপূর্ব কথন।"

সত্যপীর—সত্যনারায়ণ :

সত্যপীর সত্যনারাণ সত্য যাহার নাম
দেখো পীর পাথারে ভাসাইও না।

সেনবংশের রাজত্বের শেষ দিকে দেশের রাষ্ট্রীয় সংগঠনেও যেমন সমাজ-জীবনেও তেমনি ভাঙন শুরু হয়ে যায়। জনসাধারণের দেহমন, বৌদ্ধ বজ্রযান,

সহজযান প্রভৃতি এবং তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য ডাকিনী-যোগিনীদের অলৌকিক ক্রিয়া-কাণ্ড তুকতাকে পঙ্গু। উচ্চতর বর্ণসমাজ, ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্র ও ব্রাহ্মণ্য রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বে আড়ষ্ট। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধোগতির চিত্র সম্পূর্ণ। বখ্‌তিয়ারের নবদ্বীপ জয় এবং একশত বৎসরের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়িয়া মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা কিছু আকস্মিক ঘটনা নয়, ভাগ্যের পরিহাসও নয়। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধোগতির অনিবার্য পরিণাম (বাঙালীর ইতিহাস—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়)

তুর্কী বিজয়ের পর ধীরে ধীরে মুসলমানরা বাংলার মাটিতে জন্মগ্রহণ করে, এই মাটিতেই কবর নেয়। এই সমাজ ও মাটিকে আপন করে নিল। নিম্নবর্গের বাঙালী হিন্দুরা দীর্ঘদিন ধরে অর্থহীন, প্রাণহীন ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনে অবহেলিত, অপমানিত ছিল। ইসলামের মধ্যে তারা মুক্তির স্বাদ পেল—অনুশাসন থেকে মুক্তি। ইসলাম বাংলার সমাজ ও ধর্মজীবনে একটি নতুন মাত্রা সংযোজিত করল। লৌকিক ধর্মে পীর ও গুরু কাছাকাছি চলে এলেন। উভয়েই পূজা পেতে লাগলেন উভয় সম্প্রদায়ের। এই ভাবে সত্যপীর ও সত্যনারায়ণ, ওলাবিবি ও ওলাইচণ্ডী, বনবিবি হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত ধর্ম জীবনের ঐক্যসূত্রের ধারক হয়ে বাংলার লোকবৃত্তে প্রতিষ্ঠিত হলেন। ধর্মমঙ্গলের একটি অংশ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম মনেতে পাইয়া মর্ম
মায়ারূপে হইল খোন্দকার।
ধর্ম হইল যবনরূপী শিরে পরে লাল টুপি
হাতে ধরে ত্রিকচ কামান
ব্রহ্মা হইল মোহাম্মদ বিষ্ণু হইল পেগম্বর
মহেশ হইল আদম।
গণেশ হইল গাজী কার্তিক হইল কাজি
ফকির হইল মুনিগণ।

এমনি ভাবেই হিন্দুদের সত্যনারায়ণ মুসলমানদের সত্যপীরে পরিণত হলেন। উভয়েই উভয়ের পূজা পেতে লাগলেন। হিন্দুসংস্কৃতি ও ইসলাম-সংস্কৃতির ঘটলো সমন্বয়।

যিনি বিষ্ণু তিনিই নারায়ণ—শাস্ত্রীয় দেবতা। কিন্তু সত্যনারায়ণ? মহাভারতে সত্য বিনায়কের উল্লেখ আছে। স্কন্দপুরাণে সত্যনারায়ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে যে সত্যনারায়ণের পূজাপদ্ধতি প্রচলিত আছে তিনি শাস্ত্রীয় দেবতা

নাও হতে পারেন। শাস্ত্রীয় দেবতা নারায়ণের সঙ্গে লোকায়ত দেবতা সত্যনারায়ণের সমন্বয় ঘটেছে। মুসলমানদের সত্যপীরের ক্ষেত্রে একই রূপ ঘটেছে বলেই অনুমান হয়। তুর্কী বিজয়ের পর যখন হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটতে থাকে তখনই মুসলমানদের মধ্যে সত্যনারায়ণের আপত্তি থাকায় তখন সত্যকে ঠিক রেখে মুসলমানগণ নারায়ণকে 'পীরে' রূপান্তরিত করেন। লৌকিক দেবদেবীর সারণীতে আর এক লৌকিক দেবতার সংযোজন ঘটলো—সত্যপীর।

সত্যনারায়ণ ব্রত :

প্রতি পূর্ণিমায় কিংবা মাসের সংক্রান্তিতে হিন্দুদের স্ত্রী-পুরুষ এই ব্রত পালন করেন। সত্যনারায়ণকে যে সব নারী ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন তাঁকে অন্তত এক বৎসর এই ব্রত পালন করতে হয়। তাছাড়া কোন বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে বা মনের কোন বাসনা পূর্ণ হলেও সত্যনারায়ণ পূজার বিশেষ অনুষ্ঠান করার রীতি আছে।

এই ব্রতে ব্রতিনী সারাদিন উপবাসী থেকে পূজার আয়োজন করেন। সন্ধ্যাকালে পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ-পূজারী দিয়ে পূজা করাতে হয়। সত্যনারায়ণ পূজার শালগ্রামশিলা অভাবে শিলার প্রতীক পূর্ণঘট অপরিহার্য। কোন মূর্তি নাই। একটি পিঁড়ি বা চৌকির ওপর নামাবলী বা নতুন গামছা বিছিয়ে তার চারকোণে ও মধ্যস্থলে পাঁচটি মোকাম দিতে হয়। মোকামে থাকবে গোটা পান, গোটা কলা, হরিতকী বা সুপুরি, পৈতে ও কিছু পয়সা। মাঝখানে মোকামের ওপর দিকে একটি ছুরিকা দিতে হয়। এর পর চৌকির সামনে ঘট স্থাপন করে তার ওপর আর একটি মোকাম দিতে হয়। চৌকির চার কোণে গোবরের বা মাটির আধারের ওপর একটি শরকাঠি বসিয়ে দিতে হয়। শরকাঠির মাথাটি সামান্য চিরে তার মাঝখানে ভূমিহীন উল্টো ত্রিভুজাকৃতি তালপাতা দিয়ে নাটাই-এর সুতো দিয়ে শরকাঠি কয়টি ঘিরে দিতে হয়। নৈবেদ্যের মধ্যে পঞ্চদেবতা পূজার জন্য কুচো ফলের নৈবেদ্য, সত্যনারায়ণের একটি নৈবেদ্য ও পাঁচ-পোয়া অভাবে পাঁচ-ছটাক পাটালি বা বাতাসা ও সোয়া সের আটার সঙ্গে সোয়া সের দুধ, সোয়া গন্ডা কলা, নারিকেল কোরা, সোয়া সের আখের গুড়, কর্পূর এক টুকরো, মেওয়া ফল—যেমন কিসমিস, খেজুরও দেওয়া যেতে পারে। এই সমস্ত দিয়ে কাঁচা শিরনি ভোগ অপরিহার্য।

এছাড়া তুলসীপত্র, ফল, শ্বেতচন্দন এসব তো আছেই। অনেকে চৌকির উত্তর দিকে সত্যনারায়ণের ছবিও রাখেন।

পূজারী শাস্ত্রীয় মতে স্বস্তিবাচন, সংকল্প করে গণেশাদি পঞ্চদেবতা পূজা সেরে সত্যনারায়ণের ধ্যান করে আবাহন করবেন। 'ওঁ ধ্যায়েৎ সত্যং গুণাতীতং গুণত্রয় সমন্বিতং লোকনাথং ত্রিলোকেশং পীতাম্বর ধরং হরিম্। ইন্দীবর-দলশ্যামং শঙ্খচক্র গদাধরম্ নারায়ণং, চতুর্বাহুং শ্রীবৎসপদভূষিতম্, গোবিন্দং গোকুলানন্দং জগতঃ পিতরং গুরুম্।' পঞ্চোপচারে পূজা করে ব্রতকথা পড়তে হয়—ব্রতকথার চিরাচরিত রূপ—সত্যপীরের দরিদ্র ভিক্ষুককে দর্শন ও তার সামনে নারায়ণের রূপধারণ ও সত্যনারায়ণের ব্রত করার নির্দেশ। ফলে ব্রাহ্মণের অবস্থা অচিরেই স্বচ্ছল হলো—তার কাছে সমস্ত জেনে কাঠুরিয়ারাও সত্যপীরের পূজা করে ও অনেক কাঠ পায়, তাদেরও দারিদ্র্য-দশা ঘোচে। এক বণিক কন্যা-সন্তান কামনায় সত্যপীরের পূজা করে রূপ-লাবণ্যময়ী কন্যা লাভ করে। জামাতাকে নিয়ে সদাগর বাণিজ্যে যায়। কিন্তু সত্যনারায়ণের পূজা না দিয়ে বিপাকে পড়ে। সত্যনারায়ণের কৌশলে বিদেশে রাজকোষ হতে চুরির অপরাধে শ্বশুর-জামাই কারাগারে আবদ্ধ থাকে। সদাগর-গৃহিণী সত্যনারায়ণের পূজা দেওয়ায় বণিক জামাতা কারাগার থেকে মুক্তি পান ও রাজার কাছ থেকে প্রচুর ধনদৌলত নিয়ে বাড়ী ফেরে। পথে এক ফকিরের প্রশ্নে জানায় যে তার নৌকায় লতাপাতা আছে। সত্য সত্যই ধনদৌলত লতাপাতায় পরিণত হয়। আবার ফকিরের কাছে ক্ষমা চেয়ে সব ফিরে পায়।

বাড়ী আসার মুখে আবার নৌকাডুবি হয়। কারণ সদাগরের কন্যা সত্যনারায়ণের শিরনি অবহেলাভাবে মাটিতে ফেলে স্বামীর কাছে ছোটে। আবার পীর ফকিরের নির্দেশে সেই শিরনি মাটি থেকে চেটে খেলে, সদাগর ও ধনদৌলতসহ নৌকা ভেসে ওঠে। সত্যনারায়ণের পূজা প্রচলিত হয়।

সত্যপীর : সত্যপীরের কাহিনীতে হিন্দুমুসলিম পুরাণের সমন্বয় ঘটেছে। তাহির মাহ্মুদের সত্যপীরের ব্রতকথায় সত্যপীরের যে জন্মবৃত্তান্ত আছে সেটি যেমন অলৌকিক তেমনি অবিশ্বাস্য। সত্যপীর ময়দানবের কন্যা সন্ধ্যাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সন্ধ্যাবতী একটি অলৌকিক ফুলের ঘ্রাণ নেওয়ায় দয়াময়ের ইঙ্গিতে সন্ধ্যাবতী গর্ভবতী হয়। কন্যা অনূঢ়া অথচ গর্ভবতী—কাজেই সমাজে স্থান হয় না। সত্যপীরের জননী বিতাড়িত হন গ্রাম থেকে। প্রচার হলো সন্ধ্যাবতী মৃত। যথাসময়ে সন্ধ্যাবতী একটি ফুলবনে একটি রক্তপিণ্ড প্রসব করে। সন্ধ্যাবতী পিণ্ডকে সাগরে ভাসিয়ে দেয়। একটি সামুদ্রিক কচ্ছপ সেটি ভক্ষণ করে ও একটি শিশু উদ্গীরণ করে। তখন শিশুর বয়স পাঁচ। বালক কৃষ্ণের মত বালক সত্যপীর ময়দানবকে শাস্তি দেয়। (ত্রৈমাসিক বাংলা একাডেমী পত্রিকা শ্রাবণ-

আশ্বিন ১৩৬৯ সংখ্যা) এই ভাবে সত্যপীর ধরায় অবতীর্ণ হন ও সত্যপীরের পূজা প্রচলিত হয়।

অনেক গ্রাম্যকবি সত্যনারায়ণ ও সত্যপীরের ব্রতকথা নিয়ে পাঁচালী রচনা করেছেন। এগুলি লোকসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই সমস্ত ব্রতকথার মধ্যে মুসলমান পীর বা ফকিরের উল্লেখ যেমন আছে—সত্যনারায়ণ ও সত্যপীর যে এক ও অভিন্ন সে কথার উল্লেখ তেমনি আছে।

এ বিষয়ে সাহিত্যাচার্য সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন—পীরমাহাত্ম্য রচনার মধ্যে প্রধান হইল সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের পাঁচালী। ...স্কন্দপুরাণে রেখাখণ্ডে যে কাহিনী আছে তাতে ফকিরের স্থান লইয়াছে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। বঙ্গে মুসলমান শাসনের শেষের দিকে সত্যপীর সত্যনারায়ণ কাহিনীর মধ্য দিয়া হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের একটা মিলন প্রচেষ্টা হইতেছিল এবং সে প্রচেষ্টা দুই তরফেই। হিন্দুরা পীরগাথার লেখক, মুসলমানেরা পীরগাথার গায়ক।

সবচেয়ে পুরানো পাঁচালীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভৈরব ঘটকের, ঘনরাম চক্রবর্তীর ও রামেশ্বর (ভট্টাচার্য্য) চক্রবর্তীর ও ফকির রাম দাসের। বর্ধমান জেলার সাহাবাদ পরগনার ভারুহা গ্রামের দ্বিজ গিরিধরের পাঁচালীটি মনে হয় প্রাচীনতম (১০৭০ সাল)।

বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুঁথির রচয়িতা কৃষ্ণহরি দাস—মহম্মদী লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত।

হরনারায়ণ লেখে রচে কৃষ্ণ হরি,
শিরে যার সত্যপীর কণ্ঠে বাকেশ্বরী।

... ...

এক ব্রহ্ম বিনে আর দুই ব্রহ্ম নাই
সকলের কর্তা এক নিরঞ্জন গোঁসাই।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যার নাম জপে
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার এক লোম কূপে।
হস্ত নাহি পদ নাহি ধরেছে সংসার।
মুখ নাই আছে তার করিতে আহার।
কর্ণ নাহি কথা শোনে চক্ষু নাহি দেখে
চিনিতে না পারে কেহ সর্বঘটে থাকে।
সেই নিরঞ্জনের নাম বিসমিল্লা কয়।
বিষ্ণু আর বিসমিল্লা কিছু ভিন্ন নয়॥

সত্যপীরের দরগায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তি পূজা ও শিরনি দেয়। হিন্দুমুসলিম সংস্কৃতি সমন্বয়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সত্যনারায়ণ সত্যপীরের পূজা। সত্যনারায়ণের শিরনি মুসলমানগণও গ্রহণ করে।

সন্তোষীমা-র ব্রত : মনের যে কোন কামনা-বাসনা পূরণের মানত করে সন্তোষীমা-র ব্রত পালন করা হয়। ব্রতের তিনটি ভাগ—প্রতিষ্ঠা, পালন ও উদ্‌যাপন। ব্রতের প্রতিষ্ঠা দিয়েই ব্রতের সূচনা। এই অনুষ্ঠানে দেবীর বার শুক্রবারে। শুদ্ধাচারে গৃহকোণে দেবীর ঘট পাততে হয়। ব্রতিনী প্রদীপ জ্বেলে মায়ের পূজা করে। এর পর ব্রতকথা পড়তে হয়। প্রতি শুক্রবারে একটি করে প্রদীপ বাড়াতে হয়। এই ভাবে ষোলটি শুক্রবার এই ব্রত পালন করার পর উদ্‌যাপন। ভিজে ছোলা ও গুড় এই ব্রতের একমাত্র উপকরণ। ব্রতিনীকে প্রতি শুক্রবার নিরামিষ আহার গ্রহণ করতে হয়। টক খাওয়া একেবারেই নিষেধ; এমন কি ছানার জল বা ক্যালসিয়াম পাউডার দিয়ে যে ছানা কাটান হয় সেই ছানার সন্দেশও খাওয়া নিষেধ। ঐদিন অনেকে নুনও খায় না। উদ্‌যাপনের দিন পূজা করে ব্রতকথা শুনতে হয়। ঐদিন বিজোড় সংখ্যক সাধ্যমত শিশুভোজন করাতে হয়। নিষ্ঠার সঙ্গে এই ব্রত পালন করলে সধবা বৈধব্যের যন্ত্রণা ভোগ করেন না। কুমারীরা মনোমত পতিলাভ করে, সবার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, স্বামী-পুত্র পরিজন নিয়ে ব্রতিনী সুখের সংসার গড়ে তোলে। পূজাশেষে ভিজে ছোলা ও গুড় হাতে নিয়ে ব্রতকথা শুনতে হয়। এর পর এয়োতীদের সিঁথি ও কপালে সিঁদুর পরিয়ে দিতে হয়। উপস্থিত সকলের মধ্যে ছোলাগুড় প্রসাদ বিতরণ করতে হয়।

ব্রতকথা :

এক যে বণিক ছিল ভদ্রেশ্বর গ্রামে।
সপ্ত পুত্র পত্নী রাখি যায় স্বর্গধামে।
ছয় ভাই কর্ম করে আনন্দিত হয়ে,
যাহা অর্থ পায় সব দেয় আনি মায়ে।
ছোট ছেলে রাম, তার বেকার জীবন,
না পারে করিতে কিছু অর্থ উপার্জন।
সাবিত্রী নামে ছিল রামুর রমণী,
সতী সাধ্বী পতিব্রতা স্বামী সোহাগিনী।

ছয় পুত্র অর্থ উপার্জন করে, কাজেই তাদের আদর বেশী। নানা রকম সুখাদ্য রেঁধে মা ছয় পুত্রকে দেয় আর তাদের উচ্ছিষ্ট পড়ে রামুর পাতে। সাবিত্রীর

ভাগ্যেও সেই বধূদের উচ্ছিষ্ট। রামু সব জানতে পেরে গৃহত্যাগ করল, দেশবিদেশ ঘুরতে ঘুরতে এক সদাগরের সাক্ষাৎ পেল। সদাগর তাকে একটা কাজ দিল। রামুর একনিষ্ঠ কর্মে সদাগর খুব খুশী, রামুর কাজের ফলে ব্যবসারও বাড়বাড়ন্ত। সদাগর রামুকে ব্যবসার অংশীদার করে নিল। রামু দেশে সাবিত্রীর কাছে টাকা পাঠায়—ছয় ভাই সব টাকা আত্মসাৎ করে। ফলে সাবিত্রীর ওপর জায়েদের ও শাশুড়ীর অত্যাচার বেড়ে যায়। সবদিন তার আহারও জোটে না। শাশুড়ীর অত্যাচার আর সহ্য করতে না পেরে বনে পালিয়ে গিয়ে কাঠ কুড়িয়ে কোনমতে গ্রাসাচ্ছাদনের যোগাড় করতে থাকে। একদিন কাঠও পায় না—বনে ঘুরতে ঘুরতে সাবিত্রী এক গাছের নীচে ঘুমিয়ে পড়ে। স্বপ্নের মধ্যে দেখে জ্যোতির্ময়ী দেবী। বলে 'আমি মা সন্তোষী, পূজা কর মোরে, আমি দুঃখ নাশ করে থাকি। গৃহে যাও পাবে পতি, না হবে বিলম্ব অতি, বন মাঝে দেখদেখি খুঁজে। সম্মুখেতে পাবে পথ, কত নারী করে ব্রত, আমার মন্দির এর মাঝে।' সাবিত্রীর ঘুমভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে বনপথে মন্দির খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে। শেষে মন্দিরের মধ্যে দেখে অনেক ব্রতিনী ছোলা ও গুড় হাতে নিয়ে সন্তোষীমার ব্রতকথা শুনছে। সেখানে সাবিত্রী ব্রতিনীদের সঙ্গে যোগ দেয়। দেবী সাবিত্রীর ব্রতে সন্তুষ্ট হলেন। এদিকে রামুকে দেবী স্বপ্নে ঘরে ফিরে যেতে বলেন। সেদিন রামুর চারগুণ লাভ হলো। রামু ঘরে ফিরে এলো। পতিপত্নীর মিলন হলো। উভয়ে সন্তোষীমার ভজনা করতে আরম্ভ করলো। দিন দিন ধনে পুত্রে রামুর সংসারে সুখের জোয়ার বইল। সন্তোষীমার কোপে ছয় জা বিপাকে পড়ল। সন্তোষীমার পূজা প্রচারিত হলো। 'সন্তোষীমার ব্রত যেইজন করে। ধন পুত্র যশ তার দিন দিন বাড়ে।'

ফাল্গুন মাসের ব্রত :

শিবরাত্রি ব্রত ও শিবপূজার আদিমতা : ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে এই ব্রত পালন করা হয়। এই ব্রত কুমারী, সধবা, পুরুষ সকলেই পালন করতে পারে। এই ব্রত পালন করলে নারীর সব কামনাই পূর্ণ হয়। সধবা সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে মরতে পারে। কুমারীরা এই ব্রত পালন করলে শিবের মত পতি পায়। বিধবাদের আর পরজন্মে বৈধব্য ভোগ করতে হয় না।

শিব চতুর্দশীর পূর্বদিন মাথা ঘষে পুকুরে বা গঙ্গায় স্নান করে নিরামিষ বা হবিষ্যান্ন করে সংযম পালন করতে হয়। শিবরাত্রির দিন নিরম্বু উপবাস। দিনে বেলপাতা, আকন্দ ফুল, কলকে ফুল, ডাব এইসব সংগ্রহ করতে হয়। শিবমন্দিরে চার প্রহরে চারবাব শিবের মাথায় ডাবের জল, গঙ্গাজল, দুধ, মধু, ঘৃত ঢালতে

হয়। অনেকে গঙ্গামৃত্তিকা বা এঁটেল মাটি দিয়ে শিবলিঙ্গ নির্মাণ করে তামার পাত্রে ত্রিপত্র বিল্বপত্রের ওপর বসিয়ে চারপ্রহরে চারবার পূজা করে। চার প্রহরের মধ্যে প্রথম প্রহরে দুধ, দ্বিতীয় প্রহরে দধি, তৃতীয় প্রহরে গব্যঘৃত ও চতুর্থ প্রহরে মধু দিয়ে স্নান করিয়ে পূজা করে সারারাত জেগে কাটাতে হয়। পূজা শেষে ব্রতকথা শুনতে হবে।

পরদিন পারণ—সকালে স্নান করে শিবের পূজা দিয়ে চতুর্দশী ছাড়লে ব্রাহ্মণকে জলযোগ করিয়ে ব্রতী বা ব্রতিনী জলগ্রহণ করবেন। বড় কঠিন ব্রত; পারণের দিনও নিরামিষ আহার। তবে আজকাল এত নিয়ম আর কেউ মানছে না। পূর্বদিন নিরামিষ খেয়ে সংযম করার বদলে সূর্যোদয়ের পূর্বে স্নান করে সংযমের কাজ শেষ করছে। ব্রতের দিন দুপুরে বা সন্ধ্যায় শিবের পূজা দিয়ে ও শিবের মাথায় জল ঢেলে ব্রতিনী জলগ্রহণ করছে। পারণের দিন চতুর্দশী ছাড়া পর্যন্ত আর অপেক্ষা করার ধৈর্য অনেকের থাকে না। তবে প্রাচীনাদের মধ্যে এখনও অনেকেই নিষ্ঠার সঙ্গে শিবরাত্রির সমস্ত নিয়ম পালন করে যাচ্ছেন। আধুনিকা ও কুমারীদের মধ্যেই সংক্ষেপিত পদ্ধতির প্রচলন বেশী আর ব্রতিনীর সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে।

শিবরাত্রির ব্রতকথা : হরপার্বতীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ব্রতকথা আরম্ভ। পার্বতী মহাদেবের কাছে জানতে চাইলেন—কিভাবে কলিযুগে মানুষ সহজে পাপমুক্ত হতে পারবে। মহাদেব শিবরাত্রি ব্রত পালনের নির্দেশ দিয়ে এক ব্যাধের কাহিনী দিয়ে শিবরাত্রি ব্রতের মাহাত্ম্যের কথা বলতে লাগলেন।

এক বনে এক ব্যাধ সারাদিন ঘুরে ঘুরে কোন শিকার না পেয়ে হতাশ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমন সময় কিছু শিকাব জুটে গেল। তখন রাত্রি নেমে এসেছে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথি। ব্যাধের পেটে সারাদিন এক গণ্ডুষ জল পর্যন্ত যায় নাই। বনের মধ্যে আশ্রয়ই বা কোথায় পায়? শেষে এক বেলগাছ পেয়ে তার ওপর উঠে শিকারকে ডালে বেঁধে রাত জেগেই কাটিয়ে দিল। গাছের নীচে ছিল একটি শিবলিঙ্গ। গাছে উঠে শিকার বাঁধার সময় বেলপাতা সেই শিবলিঙ্গের মাথায় পড়লো। পরদিন সকালে উঠে ক্ষুধাতৃষ্ণায় ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফিরল। ব্যাধনীকে তাড়াতাড়ি খাবার জোগাড় করতে বলে স্নান করতে গেল। খেতে যাবে এমন সময় ব্যাধের বাড়ীতে এলো এক অতিথি। কি ভেবে নিজের খাবারটাই অতিথিকে খেতে দিল। এই যে শিবরাত্রির দিন সারাদিন উপবাসী থেকে শিবলিঙ্গের ওপর রাত্রে বেলপাতা ফেলেছিল তাতেই তার শিবরাত্রি ব্রত পালনের ফল হলো—তার ওপর পারণের দিন অতিথি ভোজন করিয়ে পারণের

ফলও পেয়ে গেল। ব্যাধের মৃত্যুর পর যমদূত এলো তার আত্মাকে যমালয়ে নিয়ে যেতে। কারণ পশুবধ করে সে অনেক পাপ করেছে, আবার শিবদূতরা এসে হাজির ব্যাধ শিবরাত্রি করায়। সে তো পাপমুক্ত হয়ে পুণ্য অর্জন করেছে। শিবদূত ও যমদূতে যুদ্ধ বাধলো—শিবদূতেরই জয় হলো। ব্যাধের অজান্তে একরাতের শিবরাত্রি করার ফলে তার ঘটলো অন্তিমে শিবালয়ে বাস।

এ জেলায় এমন গ্রাম খুব কমই আছে যেখানে এক বা একাধিক শিবলিঙ্গ বা শিবমূর্তি নাই। শৈবতন্ত্রের মূলে আছে প্রাকবৈদিক বা বৈদিক ধ্যানধারণা। শক্তি সমন্বিত রূপ গৌরীপট্ট সমন্বিত লিঙ্গমূর্তি পূজার প্রচলন খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ বছর আগে মহেঞ্জোদারো যুগের সূচনায়। এর পরে হিন্দুধর্মে ঘটলো এর প্রতিষ্ঠা। শিবরাত্রি উপলক্ষে শিবলিঙ্গের ওপর জল, দুধ ঢালা তাই আদিম যুগের যৌনপ্রতীক ও শিশ্নপ্রতীক পূজার অবিচ্ছিন্ন রূপ। বেদে এর সমর্থন নেই তবু এই ধারা সেই মহেঞ্জোদরো ও পাণ্ডুরাজার যুগ থেকে সমানভাবে প্রবহমান। পরবর্তীকালে এর মধ্যে শাস্ত্রীয় আবরণের প্রলেপ ঘটেছে—উপবাস, সংস্কৃত মন্ত্রে চারপ্রহর পূজা ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

ব্রতকথার মধ্যে যে ব্যাধের শিকার ও শিকার শেষে দিনান্তে উপবাসী ব্যাধের বেলগাছে আরোহণ, শিশিরসিক্ত বিল্বপত্র শিবলিঙ্গের ওপর পড়ে যাওয়া ও এর ফলে ব্যাধের শিবরাত্রি ব্রতের ফলপ্রাপ্তি ও মৃত্যুর পর আত্মার কৈলাসে প্রতিষ্ঠার মধ্যে আদিম সমাজের শিকারনির্ভর জীবনের বৃক্ষপূজা ও টোটেম পূজার প্রচলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

পৌরাণিক যুগের সূচনা থেকে টোটেম পূজার আদিমতার ওপর শাস্ত্রীয় পূজার পড়ল আবরণ। আদিম মিথোলজি তথা লোকপুরাণের কাহিনীর সমন্বয় ঘটেছে শিবরাত্রির ব্রতকথার মধ্যে। পল্লব সেনগুপ্তের কথায়—'বৃক্ষপূজা, প্রস্তরপূজা অচেতন বস্তুর মধ্যে চেতনাময় সত্তাকে কল্পনা করা, পশুপূজা ইত্যাদি সব প্রাগৈতিহাসিক সংস্কার আমাদের মধ্যে এখনও সক্রিয়। এর সঙ্গে যৌন প্রতীকের আরাধনা—যার হদিশ সারা পৃথিবীতে প্রত্ননির্দেশেই মেলে। পরবর্তীকালে যা কেবল শুধু আরো সংকেতায়িত হয়েছে মাত্র—তাও এতে দেখি। শিব অতএব পশুপতি, ভূতনাথ, জন্মশক্তি প্রদাতা এবং আরো নানারকম বিশ্বাসে কল্পিত এখানে। লিঙ্গপূজা Fertility cultএর প্রতীক। তাই মেয়েদের মধ্যেই এই অনুষ্ঠানের প্রচলন বেশি। জেলার মঙ্গলকাব্যে যে শিবকে কৃষকরূপে দেখা যায় সেটাও এই উর্বরতা ধর্মধারার প্রতীক লাঙ্গলের সঙ্গে লিঙ্গের উৎসজাত কিছুটা মিল থাকা অসম্ভব নয়। অষ্টাদশ শতকে রচিত শিবায়ন কাব্যে চাষের কাজে

নিয়োজিত শিবরূপী চাষীকে নানাজনের দ্বারে দ্বারে যেতে হয়—

কাত্যায়নী কন কান্ত কিছু নাঞি কেন।
কুবেরের বাটি বীজ বাড়ি করা আন ॥
তুমি চাষ চষিলে কিসের অসম্ভাব।
শক্রের সাক্ষাৎ হলে সদ্যভূমিলাভ ॥
ঘরে আছে বুড়া আড্যা ধরে মহাবল।
যমের মহিষ আন বলারি লাঙ্গল ॥

বিজয়গুপ্তের শিব একজন শিথিল চরিত্র গ্রামীণ বাঙালীর প্রতিচ্ছবি। অভাবে অশান্তিতে দিশেহারা এক মানুষ যেন জীবন-যন্ত্রণায় ছটফট করছে। স্বভাবতই শিব এক সাধারণ দেবতা, বাঙালীর ঘরের কাছের মানুষ—তাকেই তাই বর হিসেবে কুমারী মেয়েরা শিবের মত স্বামী পাবার চেষ্টায় সারা দিনরাত উপবাস করে, শিবের মাথায় জল, দুধ ঢালে। তাই শিবরাত্রি ব্রত পালনের এত ব্যাপকতা দেখা যায় বাঙালীর ঘরে ঘরে। তাই নারীপুরুষ নির্বিশেষে পালন করে শিবরাত্রি ব্রত।

ব্রত অনুষ্ঠানের মূল্যায়ন :

জেলার লোকসংস্কৃতির একটি শাখা ব্রতপার্বণ—লোকসাহিত্যের অঙ্গ ব্রতকথা। সংস্কৃতি বলতে বোঝায় Intellectual side of civilisation। কাজেই লোকসংস্কৃতি হচ্ছে সাধারণ জনগণের সৃষ্ট এক পরিশীলিত ঐতিহ্য—গ্রামীণ সভ্যতা-সংস্কৃতির লৌকিক প্রতিভার পরিশীলিত রূপ।

ব্রতের অনুষ্ঠানের মধ্যে লোকচিত্রকলা, লোকসাহিত্য ও লোকগীতির বিচিত্র সমাবেশ দেখা যায়। জেলার ব্রত অনুষ্ঠানগুলি কৃষিজীবী সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। লৌকিক ব্রতে ঘটস্থাপন, ব্রতগীতি, দেবতাবন্দনা ও সেই সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় দেবার নিয়মের ঐতিহ্য মঙ্গলকাব্যেও অনুসৃত। ভাদুগানের মধ্যে আছে সংস্কারে মুক্তির আহ্বান—

একই মায়ের ছেলে মোরা
হিন্দু কি মুসলমান
বৃথা সে বিচার করা।
ওরে জাত বড় না মানুষ বড়
সেটাই বুঝে নে তোরা।

এ যেন মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্মদেবের কথা—

ন মনুষ্যাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ।

কিংবা নজরুল কাব্যের প্রতিধ্বনি—

গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহীয়ান

কিংবা

হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন
কাণ্ডারী? বলো ডুবিছে মানুষ। সন্তান মোর মার।

ভাদু এখানে ধর্মনেতা হয়েও মানুষের সমস্ত গোঁড়ামির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করছে। এতবড় দার্শনিক তত্ত্ব, মহৎ এই সর্বধর্ম সমন্বয় শিক্ষা ভাদু বা ভাদুগানের গীতিকার কোথায় পেল সেটা গবেষকের গবেষণার বিষয়।

ব্রতের মধ্যে আদিম সমাজের গোষ্ঠীচেতনার যেমন প্রতিফলন ঘটেছে তেমনি ঘটেছে জেলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের একটা আভাস। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক বিনয় ঘোষ তাঁর 'লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্বে' মন্তব্য করেছেন—মানুষের কামনা-বাসনা পরিপূরণের জন্য ব্রতের অনুষ্ঠান, কিন্তু কামনা-বাসনা বা তার অনুষ্ঠান কোনটাই ব্যক্তির জন্য নয়, জনগোষ্ঠীর জন্য, সমাজের জন্য। শাস্ত্রীয় ব্রত তো বটেই; নারীব্রতেরও অধিকাংশ ব্যক্তিগতভাবে অনুষ্ঠিত হয় না। তার কারণ শাস্ত্রীয় ব্রত ও নারীব্রত সমাজের ক্রমবিকাশের এমন একস্তরে রূপগ্রহণ করেছে যেখানে সমাজের গোষ্ঠীবোধ ও সমাজচেতনা বিদীর্ণ করে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের (class society) ব্যক্তিস্বার্থ চিন্তা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। কাজেই একথা আমরা বলতে পারি যে শাস্ত্রধর্ম ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমাজের দান, সেই সমাজ হলো শ্রেণীসমাজ ও প্রকৃত ব্রত অনুষ্ঠান হলো শ্রেণীপূর্ব (Pre-class) বা শ্রেণীহীন (classless) সমাজের বিশেষ গোষ্ঠী উৎসব, যে উৎসবের ব্যক্তিকামনার উর্ধ্বে গোষ্ঠীকামনার চরিতার্থতা।"

আদিম মানুষ যখন বৈজ্ঞানিক চিন্তা করতে শেখেনি তখন ম্যাজিক বা জাদুবিদ্যার বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করেছে। বৈজ্ঞানিক চিন্তা যেখানে অপারগ ম্যাজিক্যাল চিন্তা সেখানে সক্রিয়।

ব্রতের আলপনার মধ্য দিয়ে চিত্রকল্পের পরিচয় যেমন পাওয়া যায় তেমনি এর নান্দনিক দিকও উপেক্ষণীয় নয়। ব্রত অর্থে মনের কোন কামনা পূরণের জন্য একটি অনুষ্ঠান—ধর্মানুষ্ঠানের ছাঁচে ব্রতের আলপনা সেই সমস্ত কামনার প্রতিচ্ছবি। ব্রতের মধ্যে জেলার গ্রামীণ সংস্কৃতির লোকনৃত্য, লোকসংগীত ও লোকচিত্রকল্পের পরিচয় মেলে।

ব্রতকথার মধ্যে লোককাহিনী বা লোককথা রূপকথার আভাস মেলে। ঠাকুরমা, দিদিমা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার কাছে সন্ধ্যার পরে রাজাবাদশা, রাজপুত্র, রাজকন্যা, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্পের স্মৃতি মানুষ জীবনেও ভুলতে পারে না। ব্রতকথার মধ্যে অলৌকিক যে-সব কল্পনার ছবি চিত্রিত হয় তার রেশ সারা জীবনে থাকে। 'পুরাণের বা কথাসরিৎসাগরের গল্পের ভিতর জানোয়ার, মানুষ, অতিমানুষ, দেবতা ও উপদেবতা অবলম্বন করে লৌকিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, পারলৌকিক কতকগুলো সত্যের মুখোশ পরা প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।' ব্রতকথার মধ্যেও এইরকম জন্তু-জানোয়ার, দেবতা-উপদেবতা নিয়ে যে আধ্যাত্মিক সত্য প্রকাশ করা হয়েছে তাতে এগুলি একেবারে রূপকথার সামিল হয়ে উঠেছে।

তবে জীবনের জটিলতা বাড়ছে, শিক্ষার প্রসার ঘটছে, গ্রামেগঞ্জে রেডিও টি.ভি.-র প্রসারের ফলে ব্রতগুলি তার প্রাসঙ্গিকতাও দিনদিন হারিয়ে ফেলছে। ব্রতের এই অনুষ্ঠানের ফল্গুধারা হয়ত একদিন শুকিয়ে যাবে; কিন্তু ব্রত অনুষ্ঠানের মধ্যে নারীমনের যে কামনাবাসনা মূর্ত হয়ে ওঠে সেটা কোনদিন শুকোবে না। কারণ এধারা আমাদের রক্তে, আমাদের মজ্জায় আজও বয়ে চলেছে। কারণ মেয়েরা যতই শিক্ষিত হোন, যতই আধুনিকা হোন, তাঁরা কোনদিন স্বামীপুত্র নিয়ে সুখের নীড় গড়ার কামনা বা মাতৃত্বের আহ্বান কখনই উপেক্ষা করতে পারবেন না।

দশ অধ্যায়

লোকসাহিত্যের বিভিন্ন ধারা

লোকসাহিত্য

আমাদের লোকসংস্কৃতি যুগযুগান্তের লালিত ধারা। সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কালচার নতুন জিনিস, সংস্কৃতি কিন্তু বহু দিনের সুনির্দিষ্ট জীবন-চর্চার আদিম ও অকৃত্রিম প্রতিচ্ছবি।

'Culture is the arts and other manifestations of human intellectual achievements recorded collectively. সংক্ষেপে culture is the intellectual side of civilisation. ইংরাজী culture-এর সঙ্গে Lore-এর পার্থক্য আছে। 'Lore' কথার আভিধানিক অর্থ body of traditions and knowledge on a subject or held by a particular group. এখন প্রশ্ন, আমরা সংস্কৃতি বলতে কি বুঝবো।

সাহিত্যিক গোপাল হালদার সাহিত্যের একজন রসজ্ঞ অধ্যাপকের উদ্ধৃতি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন—"বাংলার কালচার? একটা কড়া পাকের সন্দেশ ও একটা ভালো পাকের পেয়ারা দাও দিকিনি কোন তামিলকে, খেয়ে বলবেন, 'বোথা আর ইকুয়েলি সুইট্টা'—দুই-ই সমান মিষ্টি; ঠিক কথাই—অনেক কালের কালচার থাকিলে বোঝা যায় সব মিষ্টিই সমান নয়।" তেমনি culture আর Lore সংস্কৃতি আর কৃষ্টির মধ্যেও পার্থক্য রসজ্ঞ পণ্ডিতের কাছেই ধরা পড়ে। গোপালবাবুর ভাষায় "বাংলার কালচার নতুন জিনিস, বাংলার সংস্কৃতি কিন্তু বহু দিনের। আমাদের যে সাহিত্য, যে সংগীত, যে নৃত্যকলা ও শিল্পকলা লইয়া আমাদের এই যুগের গর্ব—এমনকি যে ভদ্রলোক শ্রেণী লইয়া আমাদের সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও সমস্যা—তাহার জন্ম বেশী দিন হয় নাই। সে জন্মিয়াছে ইংরাজের বাংলা জয়ের পরে সাম্রাজ্যবাদের আওতায়। কিন্তু বাংলার সংস্কৃতি—বাংলার

মাটি বাংলার জল ও বাংলার জনজীবনের সঙ্গে জড়াইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল হাজার বছর হইতে ভারতীয় সংস্কৃতির কোলে।”

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর “জাতি, সংস্কৃতি, সাহিত্য” প্রবন্ধে বাংলার সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন আমাদের বর্ধমান জেলার সংস্কৃতি সম্বন্ধে তা সমানভাবে প্রযোজ্য।

জেলার খড়ের চাল, চালের বাতা, বেতের কাজ, চাল কাঠের খোদাই কার্য, পটুয়ার পট, পুঁথির পাটা, দেওয়ালে আঁকা চিত্র, মাটির পুতুল, ঠাকুরের চালচিত্র, কাঠের পুতুল, স্বর্ণকারের সোনার গহনা, পিতল কাঁসার বাসন, আমাদের খাদ্য-সুক্তুনি, মোচার ঘন্ট, নারকেলের সন্দেশ, সীতাভোগ, মিহিদানা, পাটের জোড়, গ্রামের পূজা, ব্রতকথা, ঠাকুমার রূপকথা, আলপনা, কাঁথা, জেলার পাঠশালা, চতুষ্পাঠী, মনসার ভাসান, ছড়া, খনার ও ডাকের বচন, মেয়েদের লোকনৃত্য, রায়বেশে নাচের সম্মিলিত রূপই জেলার সংস্কৃতি।

“ইতিহাসের দুই মহল—সদর আর অন্দর। সদরে আছে রাজদরবার, রাজা, বাদশা, মন্ত্রী, যন্ত্রী, পাত্র, মিত্র, সেপাই, সান্ত্রী। ইতিহাস নামে বাজারে যে জিনিসটা চলতি সেটা ঐ সদরের ইতিকথা। সেখানে আলোচ্য কে রাজা হলো, কে বা মন্ত্রীবর, কোন রাজ্য জয় হলো, কত রাজস্ব আদায় হলো। আর অন্দরমহলে আছে সাধারণ মানুষ...তারা থাকে পর্দার আড়ালে অর্থাৎ ইতিহাসের দৃষ্টির বাইরে। এরা কি খায়, কি পরে, কি বলে, কি শোনে, কি করে, কি ভাবে, সরকারী ইতিহাস সে খবর রাখে না। সে ইতিহাস আকাশচারী, উপর থেকে উপরলোক দেখে নীচেকার মানুষকে দেখে না। গোনাগুণতি মানুষকে চেনে, অগুণতি মানুষকে চেনে না। সরকারী ইতিহাস লেখেন পণ্ডিত ব্যক্তিরা আর বেসরকারী ইতিহাস লেখেন রসজ্ঞ ব্যক্তিরা।” (দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭২)

এই রসজ্ঞ ব্যক্তিদের লেখা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ইতিহাস—এই ইতিহাসই সত্যিকারের ইতিহাস। এই ইতিহাসই দেশের কৃষ্টি, দেশের সংস্কৃতি। এই ইতিহাস ছড়িয়ে আছে জেলার লোককথা, রূপকথা, উপকথার মধ্যে ও মেয়েলী ব্রতকথার মধ্যে, লোকধর্ম, লোকউৎসব, লোকসংগীত, লোকনৃত্য, লোকশিল্প, ছড়া-প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যে।

লোকসংস্কৃতির আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ রিচার্ড ডরসন লোকসংস্কৃতি ও লোকজীবনকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন—

(১) বাক্‌সাহিত্য, যেমন গালগল্প, ছড়া, ধাঁধা, লোকগীতি, ঠাট্টা, টিট্‌কিরি।

(২) আয়তনিক লোকজীবন বা material culture, হরেকরকম শিল্প—বাসন-কোসন, ঘরবাড়ি।

(৩) লোকপ্রথা, আচার-ব্যবহার, ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

(৪) লোকশিল্প, গান, নৃত্য, অভিনয়।

জনজীবনের বিভিন্ন উপাদান জাতীয় কৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করেছে, এখনও করছে, ভবিষ্যতেও করবে। তা তবে স্থান, কাল ও পাত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির চরিত্রও বদলাতে থাকে। কাজেই প্রতি জেলার সংস্কৃতির একটা বৈশিষ্ট্য, স্বকীয়তা আছে—বর্ধমানের সংস্কৃতিও এই ঐতিহ্যবাহী। এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্ধমানের লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার আলোচনার চেষ্টা করা হচ্ছে। লোকসাহিত্য বাকসাহিত্যের মধ্যে আছে রূপকথা বা উপকথা, ব্রতকথা, ধর্মকথা, লোকের মুখে মুখে যে গান চলে আসছে সেই গান, এক কথায় যে "সাহিত্য লোক আপনিই সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে, বাবুদের উপর বরাত দিয়া কলেজের দোতলার ঘরের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া বসিয়া নাই"—সেই সাহিত্য।

রূপকথা-উপকথা

সাহিত্যাচার্য সুকুমার সেনের মতে রূপকথার বুৎপত্তিগত অর্থ হলো অপূর্ব কথা। অপূর্ব কথা লোকমুখে হয়েছে অবরূপ > অপরূপ কথা, শেষে অপরূপের 'অপ' খসে গিয়ে রূপকথায় দাঁড়িয়েছে। সাধারণভাবে রূপকথা ও উপকথায় সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র একই অর্থে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখলে রূপকথা ও উপকথার মধ্যে একট সূক্ষ্ম পর্দার আড়াল আছে যেটা সহজে চোখে পড়ে না। "রূপকথায় যা পাই সবই আকস্মিক এবং এমন ঘটনা ঘটেছিল বলে জানি না—রূপকথায় সেই আকস্মিক ঘটনাই ঘটে।" এই রূপকথার ঐতিহ্য বহু প্রাচীন; গুণাঢ্যের বৃহৎ কথা, জৈন সদাশিবের বেতাল পঞ্চবিংশতি, দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকার কাহিনী, পঞ্চতন্ত্র, জাতকের গল্প রূপকথার পর্যায়ে পড়ে। আবার দিদিমা ঠাকুরমার মুখ থেকে শিশু যে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, পুষ্পমালা, রাজপুত্র কোটালপুত্র, কাঞ্চনমালা, জিয়নকাঠি-মরণকাঠির গল্প শোনে সেগুলি তো নির্ভেজাল রূপকথা।

এই সব রূপকথার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এদের মৌখিকতা—মুখে মুখেই এগুলি চলে আসতো। বংশ পরম্পরায় এদের ধারা থাকতো অব্যাহত। এদিক দিয়ে বিচার করলে এগুলিকে 'শ্রুতি'ও আখ্যা দেওয়া যায়। তবে মুখে মুখে চলে আসতে আসতে এর খোলনলচের বদল হতে থাকে।

ঈশানচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত জাতকমঞ্জরীতে বলা হয়েছে, "জাতক নামে অভিহিত আখ্যানগুলির কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই। যিনি যখন সুবিধা পাইয়াছেন

তিনি তখন অপ্রচলিত কোন কোন আখ্যানকে বৌদ্ধবেশে সজ্জিত করিয়া এবং বোধিসত্ত্বকে তাহার নায়কের পাশে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জাতক নামে চালাইয়া দিয়াছেন। এই অর্থে জাতকের লোককথার লক্ষণ সুস্পষ্ট। আবার কুড়মুন-পলাশীর রেভারেন্ড লালবিহারী দে তাঁর Folk Tales of Bengal-এর ২২টি রূপকথা সম্বন্ধে প্রায় একই মন্তব্য করেছেন—I had myself when a little boy heard hundreds—it would be no exaggeration to say thousands of fairy tales, from that same old woman Shambhu's mother—for she was no fictitious person, she actually lived in the flesh and bore that name—but nearly forgotten these stories, at any rate they had all got confused in my head, the tail of one story being joined to the head of another and the head of the third to the tail of the fourth. কাজেই রেভারেন্ড সাহেবের নিজের শোনা গল্পেই যখন একটার ল্যাজার সঙ্গে আর একটার মুড়ো মিশে গিয়ে তার আদিমতা হারিয়েছে তখন একই গল্প যখন বংশ পরম্পরায় একাধিক কথকের মুখ দিয়ে প্রকাশিত হয় তখন ল্যাজা-মুড়ো কেন খোলনলচের আমূল পরিবর্তনও অসম্ভব নয়। এরপর যখন আবার বিভিন্ন সংকলকের কলমে তাঁদের নিজের ভাষায় লেখা হয় তখন সাত নকলে আসল খাস্তা হবার সম্ভাবনা থেকেই যায়। এই ভাবে রূপকথা উপকথা তাদের আদিমতা হারিয়ে ফেলছে।

রূপকথা ও উপকথার মধ্যে যে সূক্ষ্ম একটা পর্দার আড়াল আছে সেটা বিশ্লেষণ করার আগে রূপকথা সম্পর্কে Joseph Jacob-এর বক্তব্য উল্লেখ করলে এদের সূক্ষ্ম পার্থক্যটা কিছুটা বোধগম্য হবে। With the fairy tale strictly so called i.e. the serious Folk Tale of romantic adventure—I am more doubtful, it is a modern product in India as in Europe—so far as literary evidence goes.

যে সমস্ত গল্পে মুহুর্মুহু রোমাঞ্চকর দৃশ্যের অবতারণা দ্বারা শ্রোতার কৌতূহলকে উদ্রিক্ত করে শ্বাসরোধকারী পরিবেশে নিয়ে গিয়ে তারপর মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলবার সুযোগ ঘটে, এই সব গল্পই রূপকথা।

আর উপকথার মধ্যে এই রোমাঞ্চকর দুঃসাহসিকতার বদলে নরনারীর সুখদুঃখপূর্ণ জীবনের স্বাদ আছে, অন্তরের উত্তেজনা আছে, আবেগ আছে, দুঃসাহসিকতার ছোঁয়াচ যা কিছু আছে তা আবেগ ও উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য। কৌতুকও নয়, বুদ্ধিকে উদ্দীপিত উৎখাত জাত কৌশলও নয়, কিন্তু অধিকাংশ গল্প-সংকলনে রূপকথা-উপকথার সীমারেখা মুছে একাকার হয়ে গেছে। জাতক

ও পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীর বেশীর ভাগই উপকথা শ্রেণীভুক্ত, দু-চারটা যে রাক্ষস-খোক্কস বা দুঃসাহসিক অভিযানের প্রসঙ্গ আছে তা গল্পের টানে এসে গেছে।

রেভারেন্ড লালবিহারী দে-র Folk Tales of Bengal-এ যে বাইশটি গল্প আছে সেগুলিকে মোটামুটি রূপকথার পর্যায়ে ফেলা যায়।

লালবিহারী দে-র গল্পগুলিকে কিছু পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত করে এবং এগুলির সঙ্গে কিছু পঞ্চতন্ত্র ও জাতকের গল্প মিশিয়ে বহু সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এতে অবশ্য সংকলকের প্রকাশভঙ্গী ও কৃতিত্ব প্রশংসনীয় হলেও এক রূপকথার ল্যাজার সঙ্গে অপর গল্পের মুড়োর গোঁজামিলের সম্ভাবনা থেকেই যায়।

বর্তমানে আমরা যে সব গল্প-সংকলন পাই সে-গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দক্ষিণারঞ্জন মিত্রের 'ঠাকুরদাদার ঝুলি', 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'দাদামশায়ের থলে', 'ঠানদিদির থলে' প্রভৃতি সংকলন, সীতাদেবী শান্তাদেবীর হিন্দুস্তানী উপকথা, দীনেশচন্দ্র সেনের Folk Literature of Bengal উল্লেখযোগ্য। দীনেশচন্দ্র সেনের গল্পগুলি মোটামুটিভাবে পূর্ববঙ্গ থেকে সংগৃহীত হলেও এ জেলাতে এগুলির প্রচলন আছে। তবে এ জেলায় লালবিহারী দে-র রূপকথা, ভীতু ভূতের গল্পের মত গল্প এগুলিও—আমাদের মা-মাসী, দিদিমাদের মুখে মুখে ফিরতো। তাঁরা যে কোথা থেকে পেয়েছিলেন সে কাহিনী আজও অজ্ঞাত। তবে মনে হয় তাঁরাও লালবিহারী দে-র শম্ভুর মায়ের মত কারও কাছ থেকে শুনে কিংবা তাঁদেরও দিদিমা ঠাকুরমার কাছ থেকে পেয়ে স্মৃতির মণিকোঠায় সঞ্চয় করে রেখেছিলেন। তবে তাদেরও গল্প লালবিহারীর গল্পের মত এক গল্পের ল্যাজার সঙ্গে অন্য রূপকথার মুড়োর মনে হয় সংমিশ্রণ ঘটেছে। গল্পের উৎসমূল, আদিমতা আজও অজ্ঞাত।

তবে এই সব রূপকথা-উপকথার কথকদের বলার ভঙ্গী, সুর ও মেজাজ-এর তুলনা হয় না। বড়মা, মাসীমা, দিদিমাদের কাছ থেকে যে রূপকথাগুলিতে শুনতাম যে সুর, যে মেজাজ—সে সুর যেন আজও কানে বাজে। এই যে বলার ভঙ্গী সেটাই কিন্তু রূপকথার প্রাণ। বাবার কাছ থেকে ভোরবেলায় পঞ্চতন্ত্র, জাতক, মহাভারত, রামায়ণের গল্প শুনতাম সে বলার মধ্যেও কিন্তু দিদিমা মাসীমাদের বলার সুর পেতাম না।

এই যে বলার ভাষা এটাই রূপকথার বারো আনা—এই সুর যেখানে নাই সেখানে রূপকথার বারো আনাই বরবাদ।

এই সব গল্পের লিখিত সংকলনে শুধু রূপকথার সে অপূর্ব সুরটাই হারিয়ে যায় তাই নয়—রূপকথার আদিম রূপটাও বিকৃত হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর লোকসাহিত্যে ছড়া সম্বন্ধে ঠিক এই রকম কথাই বলেছেন—'এই ছড়াগুলির সঙ্গে চিরকাল যে স্নেহার্দ্র সরল কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া আসিয়াছে আমার মত মর্যাদাভীরু গম্ভীর-স্বভাব বয়স্ক পুরুষের লেখনী হইতে সে ধ্বনি কেমন করিয়া ক্ষরিত হইবে। ইহার সহিত যে স্নেহটি যে সন্ধ্যা-প্রদীপালোকিত সৌন্দর্য ছবিটি চিরদিন একান্তভাবে মিশ্রিত হইয়া আছে, সে আমি কোন মোহমন্ত্রে পাঠকদের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিব।' তবুও বলব এই সমস্ত রূপকথাব লিখিত রূপ না থাকলে এর অনেকগুলিই হারিয়ে যাবে চিরকালের জন্যে; কারণ আজকালকার atomic family-এর যুগে শিশু আর তার ঠাকুমা দিদিমার কাছে স্নেহছায়ায় মানুষ হচ্ছে না—চাকরীর সুবাদে বা জীবিকা অর্জনের তাগিদে শিশুর মা-বাবা যৌথ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় শিশু যেমন ঠাকুমা-দিদিমার স্নেহের পরশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে; তেমনি তাদের মুখে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্প, রাজপুত্র মন্ত্রী-পুত্রের কাহিনী, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় রাজপুত্রের রূপলোক থেকে অরূপলোকে উত্তরণ এই সব অসম্ভব গল্প শুনে তার মনের কল্পনার জগতকে রাঙিয়ে নেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ যাদেরকে 'ছড়া' সংগ্রহের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের অভিজ্ঞতাও প্রায় একই রকম। এই অভিজ্ঞতা আজ থেকে ১০০ বছর আগেকার (১৩০১ আশ্বিন-কার্তিক)। "প্রাচীনা ভিন্ন আজকালকার মেয়েদের কাছে এরূপ কবিতা শুনিবার প্রত্যাশা নাই। তাহারা ইহা জানে না এবং জানিবার কৌতূহলও রাখে না, বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকের সংখ্যা খুব কম, তাহাদের মধ্যেও অনেকে জানেন না। দুই-এক জন জানিলেও সকলে জানেন না।"

একশ বছর আগের যদি এই চিত্র হয়, আজ তো যুগের দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। কিছুদিন পর লোককথা লোকসংগীত বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে।

জাতক ও পঞ্চতন্ত্রের গল্প প্রধানত গদ্যে রচিত তবে পঞ্চতন্ত্রের মধ্যে যেমন দুই একটা শ্লোক আছে জাতকের গল্পেও তেমনি দুই একটা কবিতাংশের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এইসব শ্লোক, পদ্যাংশ নীতিবাচক। কিন্তু ঠাকুরদা-ঠাকুরমার ঝুলির গল্পের ছড়াগান নান্দনিক—এগুলি গল্পেরই অংশ হয়ে উঠেছে। পড়তে পড়তে মনেই হবে না যে কবিতাংশ বা শ্লোক পড়ছি। এদের পৃথক কোন সত্তা নেই, গল্পের অঙ্গীভূত। যেমন মালঞ্চমালা গল্পে—

বসিতেই ভোম্‌রার ডাকে মালঞ্চ ভরিয়া উঠে, বনবিহঙ্গ ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে, গাছে গাছে পাতা, গাছে গাছে লতা, ফুলের গন্ধে মালিনী পাগল হইয়া বাহিরে আসে—আঁ্যা। বারো বছর যে মালঞ্চে ফুল নাই, যে সরোবরে জল নাই, আজ

ফুলে বাগান ভরা! পদ্মে সরোবর 'বিকশিত'! আহা, কপাল আজ ফিরিল! কিসে বাগান ফুটিল? মালিনী দেখে,—

কোকিল ডাকে বকুল ডালে, সেই গাছেরই তলে
কোন্ বা দেবী আছেন বসে, চাঁদ লইয়া কোলে।

মালিনী কয়, মা! কোন স্বর্গের দেবতা, স্পর্শে তোমার মালঞ্চ ফোটে, মা তুমি কে?

কিংবা কলাবতী রাজকন্যা গল্পে—

কলাবতী রাজকন্যাকে ডাকছে—কুচবরণ কন্যা মেঘবরণ চুল / দিয়া যাও কন্যা মোতির ফুল।

কন্যার উত্তরও ছন্দে—

মোতির ফুল, মোতির ফুল তো বড় দূর / তোমার পুত্র কঙ্কাবতীর পুর।

রূপকথার মধ্যে আছে দুঃসাহসিকতা, রোমান্স, রাজপুরীতে কুবেরের ভাণ্ডার—সবেরই বাড়াবাড়ি।

কলাবতী রাজকন্যার রাজপুরীর বর্ণনা :

এক যে ছিল রাজা—তার ছিল সাত রানী। বড় রানী, মেজ রানী, সেজ রানী, ন-রানী, শুয়ো রানী, দুয়োরানী আর ছোট রানী। রাজার মস্ত বড় রাজ্য; প্রকাণ্ড রাজবাড়ী। হাতিশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, ভাণ্ডারে মানিক, কুঠরী ভরা মোহর। রাজার সবই ছিল। এ ছাড়া মন্ত্রী, অমাত্য, সিপাই, লস্কর—রাজপুরী গমগম...।

আমরা ছোটবেলায় দিদিমা-মাসীমার কাছে যে সব গল্প শুনতাম তাদের মধ্যে কিন্তু আজকালকার এই সব লীলাবতী কলাবতী ছিল না। সে সব গল্পের মধ্যে ছিল সুয়োরানী, দুয়োরানী, সোনারকাঠি, রুপোরকাঠি—জীয়নকাঠি, মরণকাঠি, স্ফটিক স্তম্ভে রাক্ষস-রাক্ষসীর প্রাণভ্রমরা, পাতালপুরীর পুকুরের গভীরে বাক্সের মধ্যে রাক্ষস-রাক্ষসীর প্রাণ। রাজপুত্রের পাতালপুরীতে গমন ও রাজকন্যেকে উদ্ধার, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্প, ধূর্ত-নাপিত আর রাক্ষসের কথা—মধুসূদন দাদার গল্প। বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীজের কথা। আরও কত গল্প। যেটুকু মনে আছে তাই বোধ হয় এক কাহন—বাকি সব কোথায় তলিয়ে গেছে মাথা খুঁড়লেও আর পাবো না।

এসব রূপকথায় বিচিত্র যেমন কাহিনী বিচিত্রতর তার পরিবেশ, তেমনি গল্পবলার ভঙ্গী। এই অপরূপ কাহিনীর জন্যই তো রূপকথা। প্রদীপের

স্বপ্নালোকে মাসীমার কোলে শুয়ে সেই মনোমোহিনী সুরে গল্প শুনতে শুনতে কখন যে রূপকথার দেশে চলে যেতাম টেরই পেতাম না। দেবদত্ত শক্তি না থাকলে এমন করে অসম্ভব কথা এমন অদ্ভুত করে বলা যায় না। আজকাল সে গল্প বলা সেই মোহিনী শক্তি যেন কোথায় হারিয়ে গেছে।

অবনীন্দ্রনাথের কথায় "কামনার তীব্র আবেগ ও তার চরিতার্থতা—এ দুয়ের মাঝে যে একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ—সেই বিচ্ছেদের শূন্য ভরে উঠছে নানা কল্পনায়, নানা ক্রিয়ায়, নানা রসে মনের আবেগ সেখানে ঘনীভূত হয়ে প্রতীক্ষা করছে প্রকাশকে।"

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগের উৎপীড়নমূলক নিরোধই রূপকথার সূতিকাগার।"

রূপকথাগুলি মূলত শিশুমনের উপযুক্ত হলেও কিছু কিছু গল্প আছে যে-গুলিকে ঠিক শিশু সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করার অসুবিধা আছে। রূপকথার মধ্যে এমন সব ঘটনা থাকে—যেমন নারীর সতীত্ব, নারীর ব্যভিচার, রাজপুত্র-রাজকন্যার প্রেম এগুলি ঠিক কিন্তু শিশুমনের উপযুক্ত নয়।

রূপকথার আর একটা বৈশিষ্ট্য এর সর্বজনীনতা। পঞ্চতন্ত্র বহু ভাষায় অনূদিত হয়ে, Grim-এর Fairy Tales-ও বাংলায় অনূদিত হয়ে শিশুমনের খোরাক যোগাচ্ছে। আরব্য রজনীর গল্প বাংলায় অনূদিত হওয়ার ফলে শিশুরা এগুলিকে পেলে আর ছাড়ে না। রূপকথার এই সর্বজনীনতার কারণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই। দেশ-কাল-প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানুষের কত পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে। সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারংবার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে। অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন, যেমন সুকুমার, যেমন মূঢ়, যেমন মধুর ছিল, আজও ঠিক তেমনি আছে। এই নবীন চিরত্বের কারণ শিশু প্রকৃতির সৃজন।"

এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে রূপকথা, উপকথা ইহারা আজও রচিত হইলেও পুরাতন ও সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হইলেও নূতন! রূপকথার চিত্রকল্প 'ঘটনা, সংলাপ, গল্প বলার ভঙ্গী সর্বোপরি এর ঘন গভীর সুসংবদ্ধ রূপের জন্য এর আকর্ষণ পূর্বেও যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে, ভবিষ্যতেও এমনই থাকবে।' তা সে রূপকথার রূপের যত পরিবর্তনই হোক না কেন এ রূপকথা যখন আগের মতই শেষ হবে, দিদিমার কথায় :

আমার কথাটি ফুরলো
নটে গাছটি মুড়োল।

শিশু তখন আবার আবদার ধরবে আর একটা বল—সেই ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর গল্পটা।

রূপকথার বিশ্বজনীনতা অস্বীকার করা যায় না, তা সত্ত্বেও জেলায় যে রূপকথা প্রচলিত আছে বিদেশের রূপকথার সঙ্গে তুলনা করলে আমাদের রূপকথার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে। প্রথম আমাদের জেলার রূপকথায় পরীর ব্যবহার প্রায়ই নাই। তার বদলে পক্ষীরাজ ঘোড়া পরীর অভাব পূরণ করেছে। এখানকার রূপকথার রাজারানী, পাত্রমিত্রদের মাটির সঙ্গে যোগাযোগটা বেশী। রানীরা অতুল বৈভবের অধিকারী হলেও নিজেরা বাটনা বাটেন, কুটনো কোটেন, রান্নাবান্নাও করেন, স্বামী-পুত্রকে খেতেও দেন। সাধারণের সঙ্গে তাদের সংযোগ এদেশের রূপকথার জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করার মত। রাজদম্পতি প্রায়ই নিঃসন্তান হন। মনের দুঃখে দিন কাটান, সে ক্ষেত্রে সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণ পরিত্রাতার ভূমিকা নেন। রূপকথার মধ্যে একাধিক রাজকুমারীর অপহরণের ঘটনা আছে কিন্তু যৌন ব্যভিচার নাই। সুকুমারমতি শিশুদের কথা মনে রেখেই মনে হয় রূপকথার রূপকারগণ এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। কাজেই আমাদের রূপকথা বিশ্বজনীন হয়েও আপন স্বকীয়তা বজায় রেখেছে।

ব্রতকথা : আমাদের দেশের মেয়েলি ব্রতের ছড়া এবং ব্রতগুলিও লোককথার পর্যায়ে পড়ে। ব্রতকথা সম্বন্ধে পূর্বেই বিশদ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে লোকসাহিত্যে ব্রতকথার স্থান আলোচিত হচ্ছে।

বিশদভাবে বলতে গেলে রূপকথার জগৎ, কল্পনার জগৎ, স্বপ্নের জগৎ, অলৌকিকতার জগৎ—গল্পে রাজারানী, দুয়োরানী, সুয়োরানী, রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র, মানুষও যেমন আছে আবার ভূতপ্রেত দত্যি-দানা রাক্ষস, খোক্কস, পরী-ডাইনীও আছে। আবার ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, শুকসারী, পক্ষীরাজ ঘোড়ার মত অলৌকিকতাও আছে।

এ দেশের রূপকথা যেমন বিদেশে পরিবর্তিত আকারে স্থান পেয়েছে বিদেশী রূপকথাও বিকৃত বা অবিকৃতভাবে এ দেশে শিশুর কল্পলোকে আসন করে নিয়েছে।

কিন্তু ব্রতকথার শিকড় সম্পূর্ণ ভাবে এদেশের মাটিতে। ব্রতকথার গল্পের সঙ্গে আরও যোগ হয়েছে, ব্রতীর মনের কামনা-বাসনা, পুণ্য অর্জনের আশ্বাস, একটা ভক্তিভাবের আস্তরণ। এই অনুসারে ব্রতকথা এদেশের নিজস্ব সম্পদ।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায়—"আমাদের একটা ভুল ধারণা ব্রত সম্বন্ধে আছে। আমরা মনে করি যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা ধর্ম ও নীতি শেখাতে মেয়েদের জন্যে আধুনিক কিন্ডার গার্টেন প্রণালীর মতো ব্রত অনুষ্ঠানগুলি আবিষ্কার করে গেছেন। শাস্ত্রীর ব্রতগুলি কতকটা তাই বটে, কিন্তু আসল মেয়েলি ব্রত মোটেই তা নয়। এগুলি আমাদের পূর্বপুরুষেরও পূর্বেকার পুরুষদের। তখনকার, যখন শাস্ত্র হয়নি, হিন্দুধর্ম বলে একটা ধর্মও ছিল না এবং যখন ছিল লোকেদের মধ্যে কতকগুলি অনুষ্ঠান, যেগুলির নাম ব্রত।"

এই অর্থেই ব্রতকথা ও তার মন্ত্রগুলি নির্ভেজাল লোককথা বা উপকথা। অধিকাংশ ব্রতকথার মন্ত্রের বা ছড়ার মধ্যে তার অন্তর্নিহিত মূল সুরটি ধরা পড়ে। যেমন "অশ্বত্থ পাতার ব্রত"।

চাকুন্দে সুন্দরী ছিল শ্যাম পণ্ডিতের ঝি
খেতে তার সাধ হলো পান্তা ভাতে ঘি।
কর্তা বলে, গিন্নী ওগো একি তব আশা
অশ্বত্থ পাতা ব্রতে তব মিটিবে পিপাসা
সাত বোন যায় সাত ঘোড়াতে চড়ে
সাত বউ যায় সাত দোলাতে মনের সাধ ভরে
কর্তা যান হাসিমুখে হাতির উপরে
গিন্নী যান রত্ন সিংহাসনে হর্ষ ভরে।
পাকা পাতাটি মাথায় দিলে
পাকা চুলে সিন্দূর পরে
কাঁচা পাতাটি মাথায় দিলে কাঞ্চন মূর্তি হয়
কচি পাতাটি মাথায় দিলে নবকুমার কোলে হয়।

অবন ঠাকুরের কথায় "এই তো একটুখানি ব্রত, কিন্তু তবু এর মধ্যে বসন্তের দিনে নতুন এবং পুরানোর, মানুষের এবং বনের নিশ্বাসটুকু যখন এক তালে উঠছে পড়ছে দেখি তখন এটিকে ছোটো বলতে ইচ্ছা হয় না, এইটুকুর মধ্যে কতখানির ইঙ্গিত, কতখানি রসনা পাচ্ছি। খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলি ঠিক কোন দেবতার পুজো নয়; এর মধ্যে ধর্মাচরণ কতক, কতক উৎসব, কতক চিত্রকলা, নাট্যকলা, গীতকলা ইত্যাদিতে মিলে একটুখানি কামনার প্রতিচ্ছবি, কামনার প্রতিক্রিয়া।"

পুণ্যিপুকুর ব্রতের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া হলো, পুকুরকাটা পুকুরটি জলে পরিপূর্ণ করা, তাতে বেলের ডাল ও তুলসী গাছ পোঁতা। এরপর কুমারী ও সধবা নারীরা কামনা প্রকাশ করে বলে তারা যেন পুত্রবতী হয়। সতীত্ব যেন অক্ষুণ্ণ

থাকে। তবে এই ব্রতের মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে আত্মরক্ষা ও প্রাকৃতিক বৈপরীত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। বৈশাখের প্রচণ্ড দাবদাহে যাতে পুকুরের জল শুকিয়ে না যায়, অত্যধিক গরমে গাছপালা যাতে মরে না যায় এই আদিম কামনাই এই ব্রতের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

শীতলা-ষষ্ঠীর ব্রতেও দেখেছি সকালবেলায় আমার জ্যেঠাইমা উঠোনে আসন পেতে বসতো। একে একে পাড়ার সধবা মেয়েরা এক থালা চাল ও ডালের সিধে আর হাতে একটা সুপুরি নিয়ে বড়মাকে ঘিরে বসতো। বড় মা শীতলার ব্রতকথা বলে যেত আর মেয়েরা সুপুরি হাতে নিয়ে তাই শুনতো ও মাঝে মাঝে উলুধ্বনি দিত। এক গাঁয়ে ছিল এক বামুন আর বামনী। তার সাত ছেলে আর সাত বউ; কিন্তু কারও ছেলে পুলে নাই। বামনীর মনে খুব দুঃখ। দিনরাত মা ষষ্ঠীর কাছে মাথা ঠোকে। মা কির্পা কর—নাতিনাতনী দাও। মাঘ মাসের প্রথমেই এলো এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ভিক্ষে করতে—বামনী তাকে থালায় ভরে চাল দিল। ব্রাহ্মণী খুব খুশী। আশীর্বাদ করলে তোমার নাতি-নাতিনীরা বেঁচে থাকুক।

বামনী বললে—আর নাতি-নাতনী? সাত বেটা সাত বউ—একটার কোঁক ফলল না—আমার যে কী দুঃখ। ব্রাহ্মণী ভিক্ষুণী বললে—সে কী মা! তুমি এক কাজ কর। শ্রীপঞ্চমীর দিন রাত্রে শীতলা-ষষ্ঠী পেতে রাখো।

সেই বছরেই বউদের পেটে ছেলে এলো। বছর না ঘুরতেই বামনীর ঘর নাতি-নাতনীতে ভরে গেল।

ব্রতকথা তাই লোকসাহিত্যের একটা অঙ্গ :

Journal of American Folk Literature-এ লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা দেওয়া আছে। Folk literature is the single Literature transmitted orally—এই সংজ্ঞা অনুসারে ব্রতকথা Folk literature। রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে বলতে হয়—গাছের শিকড় যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত তেমনি ব্রতকথা-র মত সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে ঢাকা থাকে। কে যে এর স্রষ্টা, কখনই যে এদের সৃষ্টি হয়েছিল দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। মেয়েলি ব্রতকথার ক্ষেত্রে মেয়েরাই নিজ নিজ রাজ্যে স্বরাট। এরাই স্রষ্টা, এরাই কথক বা এরাই শ্রোতা। একজনের কাছ থেকে অন্যজন শুনছে, সে আবার আবার একজনকে শোনাচ্ছে। এমনি করেই ব্রতকথাগুলি যুগ যুগ ধরে চলে আসছে বংশ পরম্পরায়।

কবিগান

কবিওয়ালাদের গানও লোকসাহিত্যের একটা অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "বাংলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য এবং আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালাদের গান। ইহা এক নতুন সামগ্রী এবং অধিকাংশ নতুন সামগ্রীর ন্যায় ইহার পরমায়ু অতিশয় স্বল্প। ...ইংরাজদের নূতন সৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না। পুরাতন আদর্শও ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক স্থূলায়ন ব্যক্তি। এবং সেই হঠাৎ রাজার সভার উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। ...তাহারা পূর্ববর্তী গুণীদের গানে অনেক পরিমাণে জল এবং কিঞ্চিৎ চটক মিশাইয়া তাদের ছন্দোবদ্ধ সৌন্দর্য সমস্ত ভাঙিয়া নিতান্ত সুলভ করিয়া দিয়া, অত্যন্ত লঘু সুরে উচ্চৈঃস্বরে চার জোড়া ঢোল ও চারিখানি কাঁসি সহযোগে সদলে সবলে চিৎকার করিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল।" ড. সুশীল কুমার দে তাঁর History of Bengali Literature in the 19th Cent. গ্রন্থে ঠিক এই কথা বলেছেন—Between the death of Bharat Chandra in 1760 and the first appearance of Iswar Chandra there was an interregnum. The only pretenders were the Kabiwaller." দাশরথি রায় ও তাঁর সমসাময়িক নিধিরাম শুঁড়ি এই রকম কবিওয়ালা।

পূর্বে জেলার অনেক গ্রামে কবিদলের গান হতো। ভিড়িঙ্গির মহানন্দ মণ্ডল, দক্ষিণ দামোদরের কানাই মান্না, খুরুলের জগবন্ধু ঘোষ (গোলাম ঘোষ) কবিগান গাইতেন। নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও অনেক কবিওয়ালা ছিল। তাদের গানের মধ্যে খিস্তি খেউড়ের প্রাধান্য থাকতো বেশী। বাঁশের কাঠামোর ওপর একটা ত্রিপল বা চট টাঙ্গিয়ে হ্যাজাগ জেলে কবিগানের আসর বসানো হতো। আসরে দুই দল কবিওয়ালার মধ্যে তর্জার লড়াই হতো। দুই কবিওয়ালার পরনে সোডায় কাচা ধুতি, কোমরে জড়ানো চাদর, কপালে চন্দনের ফোঁটা, গলায় ফুলের মালা দিয়ে কবিয়াল আসরে নামতেন। দু দলেরই একজন করে ঢুলি ও একটি করে কাঁসি। প্রত্যেক কবিয়ালের সঙ্গে জনা চার করে দোহার প্রথমে কে গান ধরবে সেটা টস করে হতো না উদ্যোক্তাদের নির্দেশে হতো সেটা মনে নাই। মনে হয় উদ্যোক্তাদের নির্দেশ মতই একজন কবিয়াল উঠতেন—প্রথমেই ঢোলের ঢোম্বল। তারপর কবিয়াল সমস্ত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে বন্দনা গান দিয়ে শুরু করতেন।

প্রথমে বন্দিলাম আমি দেবী সরস্বতী
তারপরে বন্দিলাম আমি দেবী ভগবতী।

এরপর কবিয়ালের আত্মপরিচয় :

নামটি আমার জগবন্ধু
খুরুল গাঁয়ে বাড়ী
বাবা ডাকতেন গোলাম বলে
করতেন দোকানদারী।

পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনী কবিয়ালের নখ-দর্পণে, শাস্ত্র থেকে বাছাই ঘটনাকে কূট প্রশ্নের আকারে উপস্থাপিত করে বিপক্ষের দিকে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করে তাঁকে নাজেহাল করার প্রাণপণ চেষ্টা চলতো। বিপক্ষেরও অনুরূপ প্রচেষ্টা। "নিজের গৌরব ঘোষণা ও অপরের নিন্দা—এই হলো কবির লড়াইয়ের মূলকথা।" অন্যের দোষের কথা বলতে গিয়ে শাস্ত্রের বচন তুলে বিপক্ষের চরিত্রগত নানা কলঙ্কের কথা যখন কবিতার ছন্দে এক নাগাড়ে বলে যান তখন শিক্ষিত বাঙালীর কাছে সেগুলি অশ্লীল বা Vulgar মনে হলেও গ্রামবাসীরা খুবই উপভোগ করতো।

বিপক্ষকে প্রশ্ন করে প্রশ্নের কাঠিন্য সম্পর্কে সতর্ক করে দিতেও ভোলেন না এবং বিপক্ষ এই প্রশ্নে তীক্ষ্ণ বাণে জর্জরিত হয়ে কিরূপ অসহায় অবস্থার সম্মুখীন হবেন সেটা কল্পনা করে গাইতে থাকেন।

এবার জগা পড়েছে কলে
আমি পেতেছি ফাঁদ গাছের তলে
ব্যাঙের ছানার টোপ গিলতে গেয়ে
ফাঁস পড়ে জগার গলে
ওরে গয়লা জগা দুধ বেচগে
যত খুশি জল ঢেলে
কবির গানে জল ঢাললে
ঘুঁটের মেডেল পরবি গলে॥

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কবিয়াল আসরে নামার আগে চাঁদোয়ার নীচে একটা ঘুঁটে আর একটা রুপোর মেডেল ঝোলান থাকতো। উদ্দেশ্য পরাজিতের জন্য ঘুঁটে আর বিজয়ীর গলায় ঝুলবে রুপোর মেডেল। তবে কবিয়ালদের গান যতই Grotesque or Vulgar হোক এঁদের উপস্থিত-বুদ্ধির প্রশংসা করতেই হবে। একপক্ষ যখন পুরাণ, ভাগবত, মহাকাব্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রতিপক্ষের প্রতি কূট প্রশ্নের বাণ নিক্ষেপ করেন তখন শ্রোতাদেরও মনে হয় এবার সত্যি "জগা পড়েছে কলে।"

আবার প্রতিপক্ষ যখন তাঁর বিপক্ষকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেন তখন শ্রোতাদেরও মনে হবে সত্যি এ প্রশ্ন তো খুবই সোজা—আমাদেরও জানা ছিল।

কবিয়াল যখন এক একটি ছড়া বলবেন তখন দোহারের দল তার গানের শেষের কথাগুলি দিয়ে ধুয়ো গাইতে আরম্ভ করবে। সব সময় ঢোলের ডান দিকে কাঠির উল্টো পিঠ দিয়ে আর বাঁ হাতের কারসাজির দ্বারা একই ছন্দে ডুগ্ ডুগ্ করে ঢোল বাজিয়ে যাবে। কবির গান শেষ হলে ঢোল উত্তাল হয়ে উঠবে। যে কোন এক কবিয়াল উত্তর দিতে ব্যর্থ হলেই জয়-পরাজয়ের হবে নিষ্পত্তি।

আর দু-পক্ষই সমান হলে দুপক্ষের মধ্যে খিস্তি-খেউড় আরম্ভ হবে ও গলাবাজির দ্বারা জেতবার অপচেষ্টা চলবে।

তবে পরবর্তীকালে বিংশ শতকের পঞ্চাশের দশকে একবার ভাতার থানার এরুয়ার-এ ও আউসগ্রাম থানার নওদায় লম্বোদর ও গুমানির কবিগান শুনেছিলাম। অতি মার্জিত রুচির কবিগান। তাঁর প্রশ্নবাণ ও কবিগান রামায়ণ, সামাজিক এমনকি সদ্য দিনের সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোন উল্লেখযোগ্য সংবাদ-সম্পর্কিত। তাঁদের যেমনি ক্ষুরধার উপস্থিত বুদ্ধি, তেমনি প্রশ্ন ও গান উভয়েই Wit ও Satire-এ সমৃদ্ধ। আড়াই ঘন্টা থেকে তিন ঘন্টা দু'কবিয়ালের চাপান-উতোর শ্রোতৃবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতো—অবশেষে উভয়েই উভয়ের কৃতিত্ব স্বীকার করে মধুরেন সমাপয়েৎ করতেন। তবে এই সমস্ত গানের পূর্ব থেকে খানিকটা অনুশীলন ও চর্চা থাকেই, এঁদের পড়াশোনা করতে হয় অনেক, সাম্প্রতিক কালের দেশে বিদেশের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী নখদর্পণে রাখতে হয়। ১৯৪৬ সালে আমি একবার এক গ্রাম্য কবিয়ালের extempore ছড়া শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

আমাদের গ্রামের বনপাশ শিক্ষানিকেতন উচ্চবিদ্যালয়ের ভাঙা ঘর মেরামতের জন্য গ্রামে গ্রামে ধান ভিক্ষে করতে গিয়ে একদিন ধর্মমঙ্গলের হৃদয় সাউ-খ্যাত খুরুল গ্রামে যাই। সেখানে সঙ্গতিসম্পন্ন চাষী জগবন্ধু ঘোষের কাছে যেতেই তিনি এক মন ধান দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। জগবন্ধু ওরফে গোলাম ছিলেন গ্রাম্য কবিয়াল। তাঁর পাশের বাড়ী অনুকূল ঘোষের বাড়ীতে গিয়ে জগবন্ধু ঘোষের প্রতিশ্রুতি উল্লেখ করে তাঁকে আরও বেশী দেবার অনুরোধ করাতে সঙ্গে সঙ্গে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জগবন্ধু বলে উঠলেন।

জাত গয়লা রঙ ময়লা
আশি বছরে সাবালক

লেখাপড়া শিখলে কি বাবু
হয়ে যাবে ভদ্দরলোক?
মুখ্যু গোলাম জানে নাক
কত সেরে হয় মণ
দুমনামনি নেইকো আমার
যা দেবো তায় একমন।

তাঁর এই ভণিতাযুক্ত অনুপ্রাস যমকের ঔজ্জ্বল্যে দীপ্ত কবিগান পেশাদারী শাস্ত্রজ্ঞ কবিয়ালের কবিগানের চেয়ে অনেক বেশী মৌলিক। বর্ধমানের নটবর ঘোষ বিখ্যাত কবিয়াল ও কবিগান-রচয়িতা ছিলেন। জামড়ার কবিয়াল এক সময় দাশরথি রায়ের প্রতিযোগী গায়ক ছিলেন।

এই সব কবিয়ালের কবিতা, ছড়া ছাড়াও ঘরে ঘরে যে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, মুসলমান ফকির ভিক্ষে করতে এসে গান গায় সেগুলিও লোকসাহিত্যের পর্যায়-ভুক্ত। এদিকে ব্যক্তিগতভাবে জিগ্যেস করে জেনেছি তারা এই সব গান কোন বই থেকে সংগ্রহ করে পায় নাই। গুরুর কাছে শিখে গুরুর দেওয়া সুরেই গেয়ে গেয়ে জীবিকা অর্জন করে। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী গায় শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম, জগন্নাথের বার মাসের লীলা, মুসলমান ফকির হিন্দুর ঘরে গায় লক্ষ্মীর পাঁচালী, মুসলমানদের ঘরে সত্যপীরের গান। এই সব গানের নমুনা থেকেই বোঝা যাবে এগুলি হয় কোন অনামী ভক্ত রচনা করে গেছে। আর নয় গুরু পরম্পরায় আজও চলে আসছে।

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম :

হরেকৃষ্ণ নাম রাখে প্রিয়বলরাম।
ললিতা রাখিল নাম দূর্বাদল শ্যাম।
বিশাখা রাখিল নাম অনঙ্গ মোহন।
সুচিত্রা রাখিল নাম শ্রীবংশীবদন।
আয়ান রাখিল নাম ক্রোধনিবারণ।
চণ্ডকৌশী নাম রাখে কৃতান্ত শাসন।
দুর্বাশা রাখে নাম অনাথের নাথ।
ভক্তগণ রাখে নাম দেব জগন্নাথ ॥—ইত্যাদি

জগন্নাথের বারো মাসের লীলা—

বৈশাখে চন্দন লাগি নীলাদ্রি মহোদয়
নরেন্দ্রতে জগন্নাথের বাচ্ খেলা হয়।

জ্যৈষ্ঠ মাসে স্নান যাত্রায় গণেশ বেশ হয়।
গণেশ সেজে খেতে বসেন শ্বশুর মহাশয়।
অসম্ভব ভোগ হয় নাহি তার সীমা।
মিষ্টান্ন পাকান্ন ভোগ কি দিব তুলনা।
আষাঢ় মাসে দেখ রথ পেয়েছ মানব দেহ
পুনর্জন্ম হবে না আর নাই তো সন্দেহ

*** *** *** ***

চৈত্র মাসে রামনবমী হবে রাম-লীলা
হনুমান সেজে নাটো করে সাই পিলা। —ইত্যাদি

মুসলমান ফকিরের লক্ষ্মীর পাঁচালী :

কৃষ্ণবর্ণ কেশ আর সত্য কথা কয়
তার গৃহে মোর সদা মন রয়॥
সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা দেয় শুচি বস্ত্র হৈয়া
সেই নারী গৃহে আমি থাকি যে বসিয়া।
প্রতি গুরুবারে যেবা মোরে পূজা করে
তার গৃহ নাহি ছাড়ি তিলেকের তরে।

সত্যপীরের গান :

*মুসকিল আসান কর দয়াল মানিক পীর॥
সত্যপীর সত্যনারাণ সত্য যাহার নাম
দেখো পীর পাথারে ভাসাইও না।

*** *** *** ***

বিশ্বনাথ বিশ্বাসে বুঝায়ে বলে বাছা।
দুনিয়ামে এসা'ভি আদমি রহে সাঁচা।
ভালা বাওয়া কাহে তেরা মৃত্যুকাল কাছে।
রাত দিন যৈসা তৈসা সুখ দুঃখ হোয়ে।
জানা গেও বাত বাওয়া জানা গেল বাত।
কাপড়াত লেও আও মেরা সাথ।
জাঅওত সত্যপীর মেরা জাওত সত্যপীর
তেরা দুঃখ দূর করতয়া হাম ফকির॥"*

* চিহ্নিত অংশ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যগ্রন্থে "রামেশ্বরের সত্যপীর' রচনায় পাওয়া যায়।

জেলার ভাদুগান, তুষুগান, শিবের গাজনে গম্ভীরা গান, ভাঁজো গান রচনার মধ্যে রচয়িতাদের মৌলিকতা লক্ষ্য করা যায়। এই পুস্তকের ব্রতপার্বণ অধ্যায়ে এই গানগুলি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

লৌকিক মন্ত্র : লোকসাহিত্যের আর এক পর্যায় লৌকিক মন্ত্র—লৌকিক মন্ত্রগুলি অনেক ক্ষেত্রে অধিকাংশ ছড়ার মত অর্থহীন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংলগ্ন ছবির সমারোহ, ওঝার মুখের মন্ত্রের উচ্চারণ একে বিশিষ্টতা দান করেছে। ড. সুকুমার সেনের চর্যাপদাবলী গ্রন্থে সবরপাদ ভণিতায় মিত-কুরুকুল্লীসাধন পদে সাপের বিষ ঝাড়ার মন্ত্রের উল্লেখ আছে।

তং কুরু কুল্লারূপ করি-এহ্যগ্র।
অহনিসি বীঅ হন্তে দেহাগ্র॥
গুরুবঘণে দিঢ় করি মানহু
গুণঅ সবরপ বিসরা করে।

অর্থাৎ তুমি কুল্লারূপ ধরে এগিয়ে এসো। অহর্নিশ বীজ হতে অগ্র দাও। গুরু বাক্য দূর করে মান। সবরপ বলে বিষ চাপড়ে হাণ। মধ্যযুগীয় ষোড়শ শতকে রচিত "সেক শুভোদয়ার ভাটিয়ালী রাগেন জীয়তে" পরিচ্ছেদে 'ভাঙ্গে' ব্রতে বাণ মারার কাটান মন্ত্রের উল্লেখ আছে। চোরেরা চুরি করতে গিয়ে, নিদ্রাকরণ মন্ত্র, ইঁদুর-বিড়াল-মাছি হয়ে ঘরে ঢোকার ভেল্‌কি মন্ত্র ব্যবহার করে তুকতাক করে যাতে গৃহস্থরা অসতর্ক হয়ে পড়ে।

জাগ্ জাগ্ জাগ্ মাটি কাজে লাজা মোর
ময়না নগর জুড়ে লাগ নিদ্রা ঘোর
আগাম ডাইনী তন্ত্রে মন্ত্রে পড়ে সাটি
কালিকা দেবীর আজ্ঞা লাগরে নিন্দুটী।

(সূত্র : সাপ্তাহিক পশ্চিমবঙ্গ ১৭।৭।১৯৮৭)

ঘনরামের শ্রীধর্মমঙ্গলে লাউসেনের জন্মপালা অংশে একটি নিদালী মন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। রঞ্জাবতীর পুত্র লাউসেনকে চুরি করে নিয়ে যাবার সময় চোর নিদালী মন্ত্র দিয়ে সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। চোরেরা কালিকামায়ের বর পেয়ে ইঁদুর মাটি মন্ত্রপূত করে "জাগায়ে ছোঁয়াল সিঁদকাটি"।

মনসামঙ্গলে দেবসভায় মনসা কর্তৃক লখিন্দরের প্রাণদান অংশেও বিষ ঝাড়ন মন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

কিকর শিমুল ডালি ধুকরিয়া কঙ্ক।
মোর পুত্রে হইয়াছে সাপিনীর ডঙ্ক।

সাপিনী ধরিয়া লাভ বিষ হরি বলে।
কঙ্ক স্মরণে বিষ ধিকি ধিকি উলে ॥

এর পর মনসা মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে মৃত লখিন্দরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন। ভারতচন্দ্রেও রোজার ভূত ছাড়ানোর মন্ত্রের উল্লেখ আছে।

আরে রে ডরিস তোরে ডাকে ব্রহ্ম দূত।
ও তোর মাতারি তুই উহারি সে পুত ॥
কুপী ওরি গিলাইব হারামের হাড়।
ফতমা বিবির আজ্ঞা ছাড় ছাড় ছাড়।

গ্রামের ওঝাদের মুখে পেট কামড়ানি সারানোর মন্ত্র শুনেছিলাম :

পেট কামড়ানি পেটকামড়ানি
তুমি বড় বীর
তোমার কামড়ে নয় গরু মনুষ্য স্থির
পেটকামড়ানি নাও ভারে
ফেল সাত সমুদ্র পাড়ে
শীঘ্র ছাড় শীঘ্র ছাড়
কার আজ্ঞে? না কামরূপ কামাখ্যা
মায়ের আজ্ঞে
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে
শীঘ্র ছাড়।

এই মন্ত্র অপর কাউকে বলার নিয়ম নাই। ওঝা বা গুণীন্ মৃত্যুর পূর্বে যাকে মন্ত্র দিয়ে যাবেন তিনিই ব্যবহার করতে পারবেন। এমনিভাবে লৌকিক মন্ত্রগুলিও জেলার লোকসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে এসেছে।

ছড়া, প্রবাদ, প্রবচন

লোকসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছড়া, প্রবাদ ও প্রবচন। ছড়া শব্দের উৎস সংস্কৃত সরিৎ বা ক্ষুদ্র নদী। সরিৎ থেকে প্রাকৃত সরিআ থেকে বাংলায় ছড়া এসেছে। গোরক্ষবিজয়ে ক্ষুদ্র নদী অর্থে ছড়ার ব্যবহার দেখা যায়।

মুরার কিনারে ছড়াখানি বহেরে
তাহাতে উজাএ দাড়িপুটী।

নদী যেমন উৎস থেকে বিভিন্ন জনপদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সাগরে মিশে যাচ্ছে ছড়াও তেমনি বংশ পরম্পরায় ব্যবহৃত হতে হতে লোকসাহিত্যের

অঙ্গীভূত হয়েছে। ছড়া সাধারণত লৌকিক প্রবাদ অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমাদের লোকসাহিত্যের neucleated cell এই ছড়া। ছড়া ও প্রবাদ লোকসাহিত্যকে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে। অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত পল্লীবাসীর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফসল এই ছড়া ও প্রবাদ। ছড়ার প্রধান ধর্ম এর মৌখিতা। মুখেই এদের জন্ম, মুখেই এদের প্রচার। লেখনীর মরণকাঠির স্পর্শে এর প্রাণ হারায়—এর মূল-গত সৌন্দর্য ও মাধুর্যের বারো আনাই বাদ চলে যায়। কথা বলার মাঝখানে, ঠিক উপযুক্ত স্থানে ব্যবহার, গোটা সংলাপের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। সেই হিসেবে ইংরেজীতে যাকে বলে wit, ছড়াও সেই পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়। ছড়া ব্যবহার করতে যেমন wit এর দরকার, ছড়া যার কাছে বলা হবে তার বোঝবার জন্যেও শ্রোতার wit এর দরকার। সোনার হাতে সোনার কাঁকনের মত উপযুক্ত স্থানেই ব্যবহারে ছড়ার বাহার—তা না হলে ছড়ার ঘটে অপমৃত্যু। গ্রামবাসীদের বিশেষ করে প্রবীণ-প্রবীণাদের মুখে মুখে যে ছড়া উচ্চারিত হয় তাতে যেমন পল্লীর প্রাকৃতিক পরিবেশ ধরা পড়ে তেমনি পল্লীবাসীর জীবনধারা, তাদের রুচিবোধ, তাদের কবিত্ব-শক্তি প্রতিফলিত হয়। কাব্যসাহিত্যের যমক, অনুপ্রাস শ্লেষ, রূপক, অলঙ্কারের মত কথাসাহিত্যের ছড়া-প্রবাদ ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিমান।

লোকসাহিত্যের আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ লিনডা দেন যিনি বিশ্ববিখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ তিনি এ দেশের নিজস্ব সম্পদ ছড়ার মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে অসংখ্য ছড়া সংগ্রহ করে গবেষণা করেছেন। ডরসন সাহেব ছড়াকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করেছেন। (১) বাকসাহিত্য, (২) ধাঁধা, ছড়া, প্রবাদ, ঠাট্টা, টিট্‌কিরি (৩) আয়তনিক লোকজীবনের material culture, (৪) লোকগীতিকা or Ballad।

প্রবাদ-প্রবচনের প্রকৃতি একটু স্বতন্ত্র। প্রবাদ-প্রবচনকে অনেকে বাক্‌সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করতে দ্বিধা করেন। কিন্তু বাক্‌সাহিত্যের মধ্যে যদি ধাঁধা, ছড়া লৌকিক মন্ত্রকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় তাহলে প্রবাদ-প্রবচনের অন্তর্ভুক্তির বাধা থাকা উচিত নয় বলেই আমার ধারণা।

গ্রাম-বাংলার প্রবীণ-প্রবীণাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফসল প্রবাদ-প্রবচন ছড়ার মত প্রাচীন সুভাষিতাবলী—যার মধ্যে 'ধ্বনি সাম্য থেকে অর্থসাম্য কল্পনা করা হয়েছে।' সুভাষিতাবলীর এমনি গুণ যে এগুলি একবার শুনলে আবার শোনবার আকাঙ্ক্ষা জাগে। শুধু শোনা নয় মনের মণিকোঠায় গেঁথে রাখবার ইচ্ছা জাগে, আর বারবার শুনতে শুনতে মনে গেঁথে যায়।

নায়ং প্রয়াতি বিকৃতিং বিরসো ন যঃ স্যান্।
ন ক্ষীয়তে বহু জনৈ নির্তরাং নিপীতঃ

জাড্যং নিহন্তি রুচিম্ এতি করোতি তৃপ্তিং
নূনং সুভাষিত রসোন্যরসতিশায়ী।

সুভাষিতের এমনি রস যার না হয় বিকৃতি বা বহু লোকের নিয়ত ব্যবহারে রসের ক্ষয় হয় না বরং মনের জড়তা দূর করে পরিতৃপ্তি দান করে। অনেক কবির কবিতার পঙ্‌ক্তি চিরন্তন সত্যের রূপ নিয়ে প্রবাদ-প্রবচনে পরিণত হয়েছে।

রায় গুণাকরের কাব্যের অনেক পঙ্‌ক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনেক পঙ্‌ক্তি প্রবাদ-প্রবচনে পরিণত হয়েছে।

খনা ও ডাকের বচন গ্রামীণ কৃষকদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফসল।

আমার মাসীমা ছড়া ও ধাঁধার খনি ছিলেন। শিশু বয়স থেকে বারবার ছড়া শুনে এগুলি স্মৃতির মধ্যে গেঁথে গেছে। তাছাড়া ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজবাঁধে ত্রাণ ও পুনর্বাসন ক্যাম্পে চাকরীসূত্রে বিভিন্ন জেলার বহু শরণার্থীর কাছ থেকেও অনেক ছড়া সংগ্রহ করেছিলাম। এগুলি মূলত পূর্ববঙ্গের হলেও এই সমস্ত শরণার্থীদের অধিকাংশই আজ এই জেলার অধিবাসী হয়ে গেছেন। কাজেই ছড়াগুলিকে এই জেলারই ছড়া ধরতে কোন আপত্তি থাকতে পারে না। তাছাড়া খাদ্য-সংগ্রহ বিভাগের পরিদর্শক ও সেটেলমেন্ট অফিসের রাজস্বকর্মচারী হিসেবে জেলার বহু গ্রামে পর্যটন করতে হয়েছে। এই সমস্ত গ্রাম থেকে বহু ছড়া সংগ্রহ করেছিলাম। আজ তাদের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গেছে তাদেরই কতকগুলি নিয়ে ছড়ার আলোচনা শুরু করছি :

আমার সংগৃহীত ছড়াগুলিকে মোটামুটিভাবে নয় ভাগে ভাগ করা গেছে যেমন—১. শিশু সম্পর্কিত, ২. নারী সম্পর্কিত, ৩. পুরুষ, ৪. জেলা সম্পর্কিত, ৫. প্রকৃতি, ৬. সাপ, ৭. সমকালীন ছড়া, রাজনীতি ও নির্বাচন সম্পর্কিত, ৮. সাহিত্যিক প্রবাদ, ৯. খনা ও ডাকের বচন।

শিশু সম্পর্কিত ছড়া—

উলু উলু মাদারের ফুল
বর আসছে কতদূর
বর আসছে বাঘনাপাড়া
বড় বউ গো রান্না চড়া।
ছোট বউ লো জলকে যা
জলের মধ্যে ন্যাকা জোকা
ফুল ফুটেছে চাকা চাকা

ফুলের বরণ কড়ি
নটের শাকের বড়ি ॥

শিশুকন্যাকে নিয়ে মায়ের কত আশা, মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে কত স্বপ্ন—তার বিয়ে দেবে, বর আসবে, বরের আগমন উপলক্ষ করে বাড়ির সবাই ব্যস্ত, বরের যেন কোন ত্রুটি না হয়। বর বাঘনাপাড়া আসতেই বাড়ির সকলেই খুব চঞ্চল হয়ে উঠলো। কাজেই ধরে নিতে অসুবিধা হয় না যে কনের বাড়ী বাঘনাপাড়ারই সন্নিকট। বড় বউকে রান্না চড়াতে বলা হচ্ছে—ছোট বউ কাঁখে কলসী নিয়ে পুকুর ঘাট থেকে জল নিয়ে আসবে। এর সঙ্গে মিশে আছে—গ্রামবাংলার একটি ছবি; মৃদুমন্দ বায়ুর হিল্লোল, পুকুরের আলপনা এঁকে চলেছে। ফুলের বরণ কড়ির মত তাও খানিকটা আন্দাজ হয়—কিন্তু নটে শাকের বড়ি তো নিছক কল্পনা; মনে হয় 'কড়ি'র সঙ্গে মিলাবার খাতিরে 'বড়ি'কে আনতে হয়েছে। মনে রাখতে হবে কল্পনা যতই অসম্ভব হোক শিশুর জগতে কোনকিছুই অসম্ভব নয়—তার কাছে রাক্ষস-খোক্কস, পক্ষীরাজ ঘোড়া যতটা সত্যি নটের শাকের বড়িও ততটাই সত্যি।

২. খোকন যাবে বেড়ু করিতে
তেলী মাগীদের পাড়া
তেলী মাগীরা গাল দিয়েছে
কেন রে মাখন চোরা।
ভাঁড় ভেঙেছে ননি খেয়েছে আর কি দেখা পাব
কদমতলায় দেখা পেলে বাঁশি কেড়ে নেব।

মায়ের স্নেহরসে সিঞ্চিত হয়ে ক্ষুদ্র খোকা 'খোকনে' এবং 'বেড়াইতে' হয়ে গেছে 'বেড়ু করিতে'। তবে খোকন কেন হঠাৎ কৃষ্ণের বেশে বাঁশি বাজাতে ও তেলীপাড়ার মহিলাদের বাড়ীতে ননী খেতে আসবে ও ননী খেতে গিয়ে ভাঁড় ভেঙে ফেলবে তার কারণ রহস্যাবৃত—তবে তেলীপাড়ার মহিলারা কৃষ্ণবেশী খোকনকে গালি দেওয়ায় যে তারা মহিলা থেকে 'মাগী'তে পরিণত, তার কারণ বোঝা যায়। কিংবা ছড়াটির মধ্যে ২টি পৃথক ছবিও কল্পনা করা যায়—একটি আদরের খোকনের তেলীপাড়ায় 'বেড়ু' করতে যাওয়ার ও তেলীপাড়ার মহিলারা তাকে গালি দেওয়ায় তাদেরকে 'মাগী' বলে মায়ের গালি দেওয়া। দ্বিতীয় চিত্রটিতে কৃষ্ণের তেলীপাড়ায় ননী খেতে এসে ভাঁড় ভেঙে ফেলার শাস্তিস্বরূপ তাঁর 'বাঁশি' কেড়ে নেবার প্রতিশ্রুতি।

৩. ঘুম পাড়ানি মাসিপিসি
আমাদের বাড়ী যেও

বাটা ভরে পান দেব
গাল ভরে খেও।
শান বাঁধানো ঘাট দেবো
বেসম মেখে নেয়ো॥
উড়কি ধানের মুড়কি দেব বিন্নি ধানের খই
শালি ধানের চিঁড়ে দেব কাগ্‌মারার দই।

৪. ছেলে ঘুমুলো পাড়া জুড়লো
বর্গী এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে?

৫. আয় ঘুম যায় ঘুম বাগ্‌দী পাড়া দিয়ে
বাগ্‌দীদের ছেলে ঘুমায় জাল মুড়ি দিয়ে।

তিনটি ছড়াই ঘুমপাড়ানি গান। তিনটি ছড়া তিনটি পৃথক চিত্র। মায়ের সংসারের অনেক কাজ হয়তো পড়ে আছে তাই 'খোকনে'র ঘুমিয়ে পড়া খুবই দরকার। এর জন্যে 'ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি'কে ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে দেবার জন্য কতরকম প্রলোভন দেখানো হচ্ছে। খোকনের কল্পনা জগতের উপযুক্ত 'উড়কি ধান-এর মুড়কি', 'বিন্নি ধানের খই' বা 'কাগমারা' নামক এক অদ্ভুত জায়গা থেকে দইও এনে ফলার খাওয়ার প্রলোভনও দেখানো হচ্ছে।

কিন্তু ঘুম না আসায় বর্গীদের দেশে এনে ভয় দেখানোও হচ্ছে। কিন্তু ঘুম এসেও আসছে না, এসে আবার বাগ্‌দী পাড়া দিয়ে চলে যাচ্ছে। সেখানে বাগ্‌দীদের যে ছেলেটি জাল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে তার চোখে ঘুম অবস্থান করছে।

তিনটিই টুকরো টুকরো চিত্র শিশুর কল্পনাজগতের উপযুক্ত।

৬. আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে
ডাল কুত্তা ঘুঙুর বাজে।
বাজতে বাজতে চলল ডুলি
ডুলি গেল কমলা পুলি
কমলাপুলির টিয়েটা
খা শুয়োরের মাথাটা।

এই ছড়াটির একাধিক পাঠান্তর পাওয়া যায়। মনে হয় অঞ্চল ভেদে মানুষ নিজের রুচি অনুযায়ী সংযোজন বিয়োজন করেছে। কোনটি আসল আর

কোনটিতে ভেজালের অনুপ্রবেশ ঘটেছে সে ধরা অসম্ভব। সাত নকলে আসল খাস্তা হয়ে গেছে।

ছড়াটির সুর বীরত্বব্যঞ্জক, বর্ণনা শুনলে মনে হয় বিবাহযাত্রা সম্পর্কিত ছড়া।

আগডুম বাগডুম কথাগুলির অর্থ ঠিক বোধগম্য হয় না। ডুম মনে হয় ডোম জাতি বিশেষের অপভ্রংশ। বঙ্গীয় শব্দকোষেও বলা হয়েছে 'মনে হয় মূল পাঠ ছিল অঘা ডোম বাঘা ডোম ঘোড়া ডোম সাজে—ধর্মমঙ্গলে কানাড়ার বিবাহে কালু ডোমের যে সজ্জার বর্ণনা আছে তার সঙ্গে কিছুটা সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নয়।'

অঘা ডোম, বাঘা ডোম যদি কোন ডোম জাতীয় বাদ্যকর হয় তা হলেও কিন্তু ঘোড়া ডোমের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। হতে পারে অশ্বারোহী কোন ডোম। কিন্তু ডাল কুত্তার গলায় কেন ঘুঙুর বেঁধে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। খোকনের বিবাহবাসর মনে হয় কমলাপুলি বা কমলাপুর। তবে সেখানে হঠাৎ "টিয়া পাখীর আগমন ও শূয়োরের মাথা খাওয়ানর প্রসঙ্গ অবান্তর।" ছড়াটির পাঠান্তরে "সূয্যি মামার বিয়েটা" পাওয়া যায়। এই সূর্য যদি আকাশের সূর্য হয় তা হলেও সেটা অসম্ভব কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। তবে শিশুর জগতে সব অসম্ভবই সম্ভব হতে পারে। শিশু সম্পর্কিত কিছু ছড়ার উল্লেখ করে শিশু সম্পর্কিত ছড়া প্রসঙ্গ শেষ করি।

১. আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি
যদু মাষ্টার শ্বশুর বাড়ি
রেলগাড়ী ঝমাঝম্
পা পিছলে আলুর দম।

সত্যজিৎ রায়ের মতে এ জাতীয় ননসেন্স ছড়ার প্রধান উদ্দেশ্য আলঙ্কারিক অর্থাৎ হাসির চেয়ে ছন্দ ও শব্দ ঝঙ্কারের দিকেই এর লক্ষ্য বেশী। যদু মাষ্টার প্রসঙ্গে দেশ পত্রিকার ১৯৭৩ সালের ২৫শে আগষ্ট সংখ্যায় রতন দাশগুপ্ত নামক জনৈক পত্রলেখক জানিয়েছেন এই যদু মাষ্টার ছিলেন ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের শিক্ষক যদুনাথ দে।

২. ইকির মিকির চাম চিকির
চাম কৌটো মজুমদার
ধেয়ে এলো দামোদর
দামোদরের হাঁড়ি কুঁড়ি
দুয়োরে বসে চাল কাঁড়ি

চাল কাঁড়তে গেল বেলা
ভাত খেসে রে জামাই শালা
ভাতে পড়লো মাছি
কোদাল ধরে চাঁছি
কোদাল হলো ভোঁতা
খা শুয়োরের মাথা ॥

৩. আয় রে আয় টিয়ে
নায়ে ভরা দিয়ে
না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে
তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচে
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা
খোকার নাচন দেখে যা ॥

এমনি শিশু-সম্পর্কিত বহু ছড়াই আছে।

নারী সম্পর্কিত ছড়া :

নারী সম্পর্কিত বহু ছড়া মেয়েলি ব্রতের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে যেখানে ফুটে ওঠে মেয়েদের ভবিষ্যৎ, বহু জীবনের স্বপ্ন, কুমারী বয়সে বাপের বাড়ীর, বিবাহের পর শ্বশুর বাড়ীর ঐহিক সুখসমৃদ্ধির আশা-আকাঙ্ক্ষার এক বাস্তব চিত্র। ব্রতের ছড়াগুলি "ব্রত-পার্বণ" অধ্যায়ে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

নারী সম্পর্কিত অন্য কয়েকটি ছড়া :

১. মেয়ে যদি পড়ে সৎ পাত্রে
কি করবে সাত পুত্রে।

২. আহ্লাদি যায় মরতে
তিন কুল যায় ধরতে
ও আহ্লাদি মরিসনি
লোক হাসানি করিস নি।

৩. লাউ কুটতে পারে না গৌরী
কুমড়ো কুটতে দৌড়াদৌড়ি

৪. অন্ন দেখে দেবে ঘি
পাত্র দেখে দেবে ঝি

৫. আক্কেলে সকল বন্দী জালে বন্দী মাছ
স্ত্রীর কাছে পুরুষ বন্দী ছালে বন্দী গাছ।

৬. বউ গিন্নি হলে তার বড় ফরফরানি।
মেঘভাঙ্গা রোদ্দুর হলে তার বড় চড়চড়ানি।

৭. বউ বিয়লো বেটা গাই বিয়লো নই (বক্‌নাবাছুর)
প্রাণ ধরে এ কথা কি কারেও বলে সই?

৮. পুড়লো নারী উড়লো ছাই
তবে নারীর গুণ গাই।

৯. উট কপালী সিঁদুর চায়
খড়ম্ ঠেঙী ভাতার খায়।

১০. নদী নারী সরকার
এ তিনে বিশ্বাস কার?

[তুলনীয় : বিশ্বাসঃ নেব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।]

১১. পুতের মুতে কুড়ি
মেয়ের গলায় দড়ি।

১২. মিষ্টি করে সইত্যি কথা
বললে বউ এর ঝাল হয়।
চুন সুপুরি দিলে পরে
সবজে পানও লাল হয়।

১৩. মায়ের রান্না যেমন তেমন
বোনের রান্না ছাই
গিন্নী যেদিন রাঁধেন সেদিন
অমৃতের স্বাদ পাই।

১৪. কে রেঁধেছে মুলো?
না—মা রেঁধেছে মুলো।
তাই তো মুলো শূলো॥
কে রেঁধেছে মুলো?
না—বউ রেঁধেছে মুলো।
তাই তো মুলো তুলো?

১৫. বউ জব্দ শিলে জামাই জব্দ কিলে
পাড়াপড়শী জব্দ হয় চোখে আঙুল দিলে।

১৬. শুতে গেল সোনামণি
সঙ্গে গেল কান ফুসুনি।

১৭. কোন কালে বউ রূপসী
জার কালে জার কাঁটা
গরম কালে ঘামাচি।

১৮. ও নন্দাই 'লোত্' গড়ায়ে দাও
আমি লোতের ভরে চলতে লারি
কাঁধে তুলে লাও।

ছড়াটিতে নারীর অলঙ্কারপ্রিয়তা ফুটে উঠেছে।

উপরের ছড়াগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েরা কত অবাঞ্ছিত, আবার শ্বশুরবাড়ীতে বউ-এর প্রতিপত্তিও শাশুড়ীর অসহ্য; স্বামী-স্ত্রীর রান্নার প্রশংসা করলে বা স্বামী-স্ত্রী একত্রে রাত্রে কোন কথাবার্তা বললেও ছেলেকে স্ত্রৈন বলে অপবাদ পেতে হয়। অথচ শাশুড়ী বোঝে না তার অবর্তমানে বউ-এর হাতে সংসারের কর্তৃত্ব পড়বে বা সেও একদিন বউ হয়ে এসেছিল। শাশুড়ীর অত্যাচারের আর এক নিদর্শন নিচের ছড়াটিতে স্পষ্ট।

ছোট সরাটি ভেঙ্গেছে
বড় সরাটি আছে
নাচ কোঁদ কেন বউ
হাতের আট কাল আছে।

এই ছড়াটির একটা ভূমিকা আছে—নতুন বউ ঘরে এসেছে। কিন্তু শাশুড়ী দেখছে বউ-এর ক্ষিধে খুবই বেশী। কাজেই শাশুড়ী একটি ছোট সরাতে মেপে প্রতিদিন বউকে খেতে দেয়। হঠাৎ সেই সরা ভেঙ্গে যাওয়ায় বউ-এর কি আনন্দ; বড় সরা আছে। এবার শাশুড়ীকে বড় সরায় ভাত দিতে হবে। তাতে হয় তো বউ-এর পেট ভরবে! কিন্তু বউ-এর এই আনন্দ দেখে শাশুড়ী তাকে সতর্ক করে দিল। এতে আনন্দ করার কিছু নাই। তার হাতের মাপ ঠিকই আছে, সেটা ভাঙ্গবার কোন সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু শাশুড়ীর জানা উচিত যে সেও অমর নয়, তার অবর্তমানে বউরাই হবে সংসারে কর্ত্রী—নীচের ছড়ায় তারই আভাষ।

জা জাউলি আপন আউলি
শাশুড়ী মাগী পর
শাশুড়ী মাগী মরে গেলে
তোমাতে আমাতেই ঘর।

এই ছড়ার সঙ্গে তুলনীয় :

Happy is she who marries the son of a dead mother (English)
The husbands' mother is the wife's devil (German)

নীচের ছড়াটিতে একটি গ্রামীণ সমাজের ছবি ফুটে উঠেছে :

কাঁথ খান কাঁথ খান
বট ঠাকুর কি পাঁকাল মাছ খান?
খান খান খান
খান পাঁচছয় খান॥

ছড়াটির পিছনে একটা কাহিনী জড়িত। পল্লীসমাজে স্বামীর জ্যেষ্ঠ সহোদর ভাসুরের সঙ্গে কথা বলা, ভাদ্রবধূর ঘোমটা খোলা, এমন কি তাঁর ছায়া স্পর্শ করা সামাজিক অপরাধ। এক সংসারে ভাসুর আর ভাদ্রবধূ আছে বাকি সকলে বাইরে গেছেন। ভাদ্রবধূ পাকাঁল মাছ রেঁধেছেন, কিন্তু জানেন না ভাসুর ঠাকুর পাঁকাল মাছ খান কিনা অথচ কথা বলা নিষেধ; তাই বাড়ীর কাঁথকে উদ্দেশ্য করে ভাসুরকে জিগ্যেস করছেন, ভাসুরঠাকুর পাঁকাল মাছ খান কিনা। ভাসুর ঠাকুরও কাঁথকে উদ্দেশ্য করেই উত্তর দিচ্ছেন—খান ত বটেই বরং খেতে ভালই বাসেন, গোটা পাঁচ ছয় খান। তবে এখন আর ভাসুর ভাদর বৌ-এর এই সব বিধিনিষেধ বড় কেউ মানে না। ভাসুরের সঙ্গে এখন দাদার সম্পর্ক। নিভৃত পল্লীতে অবশ্য এই প্রথা এখনও আছে, তাই শহুরে মেয়ে পাড়াগাঁয়ে গিয়ে ভাসুরকে 'দাদা' সম্বোধন করলেই টিটকারী শুনতে হবে—

আজকাল বউগুলো কেউ ভাসুর মানে না
শাশুড়ী হয় বুড়ী ময়না ভাতার খানসামা।

বর্তমানে এই সব বউদেরও মুখ ফুটেছে—বউ এর সঙ্গে ঝগড়া করলে সেও আর শ্বশুর ভাসুর মানবে না। ঘোমটা তো দূরের কথা, গায়ে কাপড়ই রাখতে পারবে না। নীচের ছড়ায় তারই বিবরণ।

শোন শ্বশুর, শোন ভাসুর
বলি তোমাদের পায়

আর রণে মাততে গেলে
গামছা থাকে না গায়।

পুরুষ সম্পর্কিত ছড়া :

ক কড়ি দিয়ে কিনলাম
দড়ি দিয়ে বাঁধলাম
হাতে দিলাম মাকু
একবার ভ্যা করতো বাপু?
ভ্যা করবো কোন ছলে
ভ্যা করতে গা জ্বলে।

ছড়াটি পাত্রের বিবাহ সম্পর্কিত। পাত্রের হস্তবন্ধনী দিয়ে তাকে নববধূর কাছে ভেড়া অর্থাৎ স্ত্রৈন বানাবার কৌশল। সে রকম পুরুষ হলে তার পৌরুষ প্রতিহত হয়।

২. কালো বামুন কটা শূদ্র
বেঁটে মোছলমান
ঘর জামাই আর পোষ্যপুত্র
পাঁচ জনাই সমান।

ছড়াদারের ধারণা বিভিন্ন জাতির বিশেষ ধরনের ব্যক্তি কুটিল ও অনিষ্টকারী হয়। অনুরূপ আর ২টি ছড়া।

৩. কানা খোঁড়ার সহস্র দোষ
কুঁজোর নেই অন্ত
তাহার বাড়া অধিক দোষ
যাহার উঁচু দন্ত।

৪. মুখুজ্যে কুলীন বড়
বন্দ্যো বড় সাদা
তার মধ্যে বসে আছে
চট্টো হারাম-জাদা।

কৌলীন্য প্রথা সম্পর্কিত ছড়া—কুলীনদের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ, কারা ভঙ্গজ তারই বিবরণ আছে উপরের ছড়াটিতে।

৫. পুরুষের দশ দশা
কখনও হাতী কখনও মশা।

৬. হাতী ঘোড়া গেল তল
ভেড়া বলে কত জল।

অর্থাৎ যেখানে বহু দক্ষ ব্যক্তি হার মেনে যায় সেখানে অদক্ষ ব্যক্তি আস্ফালন দেখানোয় বিদ্রূপ করা হচ্ছে।

৭. ধানের তুল্য ধন নাই
যদি না ধরে বেসে
ভাই-এর তুল্য বন্ধু নাই
যদি না করে হিসে।

'বেসে' একরূপ ধানের পোকা।

৮. অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে ভেঙে যাবে
অতি ছোট হয়ো না ছাগলে মুড়াবে।

তুলনীয় হিন্দী ছড়া :

বহুৎ ভাল্‌না বল্‌না চল্‌না
বহুৎ ভাল্ না ধূপ
বহুৎ ভাল না বর্ষা বাদল
বহুৎ ভালনা চুপ।

৯. তিন মাথা যার, বুদ্ধি নেবে তার।

বৃদ্ধ বয়সে বয়সের ভারে বৃদ্ধের মাথা নত হয়ে দুই হাঁটুতে আশ্রয় করে। এই সব অতি বৃদ্ধের অভিজ্ঞতার দাম অনেক বেশী। তাই তাদের কাছে বুদ্ধি নেবার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

'দেশ' সম্পর্কিত ছড়া :

১. মশা মাছি—মুসলমান
তবে জানবে বর্ধমান।

২. কোঁচা লম্বা কেছা টান
তবে জেনো বর্ধমান

৩. বর্ধমানের রাঙা মাটি
বুড়ীকে ধরে কচ্ করে কাটি।

জেলার পশ্চিমাংশে লাল ল্যাটেরাইট মাটি দেখা যায়।

৪. দিনাজপুরের নগদ দান
বর্ধমানের বৃত্তি

কৃষ্ণচন্দ্রের ব্রহ্মোত্তর
রানী ভবানীর কীর্তি।

৫. আগুড়ি বাগুড়ী মুসলমান
এ তিনে বর্ধমান।

৬. যাবেন যদি বর্ধমান
খাবেন সুখে গুয়া পান ॥

৭. শক্তিগড়ের ল্যাংচা খাবেন
রস গড়াবে বুকে।
বর্ধমানের মিহিদানা
লেগে থাকবে মুখে।

৮. হাত পা লম্বা পেটে পিলা
তবে জানবে পাঁচ কুলা।

বর্ধমান থানার জগদাবাদ মৌজার একটি ছোট গ্রাম পাঁচকুলা। এই অঞ্চলে পূর্বে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল খুব বেশী। ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগে-ভুগে লোকের পেটে প্লীহার বৃদ্ধি ঘটতো। হাত পা সরু হয়ে যেত, হাত পায়ের তুলনায় পেটটি বড় দেখাতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে এ অঞ্চল থেকেও ম্যালেরিয়া তিরোহিত হয়।

জল পড়লে ঢাকের সাড়া
তবে জানবে কামার পাড়া ॥

পূর্বে ভাতার থানার বনপাশ কামারপাড়া (জে.এল. ২১) গ্রামের অধিকাংশ বাড়ীই ছিল মাটির। আর ছাওনি ছিল করগেট টিনের। ফলে বৃষ্টি পড়লেই প্রচণ্ড শব্দ হতো। এর থেকেই এই ছড়ার উৎপত্তি। বর্তমানে অনেকেই পাকা দালান বাড়ী করছেন।

১০. তরকারীর ওঁচা ঝিঙ্গে।
পাখীর ওঁচা ফিঙ্গে ॥
শাকের ওঁচা পুঁইখাড়া।
গাঁয়ের ওঁচা দে-পাড়া ॥

বর্ধমান থানার কাশিয়াড়া মৌজার একটি গ্রাম দে-পাড়া, পূর্বে অনুন্নত থাকলেও বর্তমানে খুবই উন্নত।

১১. খুরুলে বেগুন পাবেন
পারহাটে মুলো।

মা-রাঁধলে যেমন তেমন
বউ রাঁধলে তুলো॥

খুরুলের বেগুনের এখনও বেশ নাম আছে তবে পারহাটের আর সে মুলো নাই, বছরে ২/৩ বার ধান চাষে সব চাষীই মত্ত।

১২. পাল ভট্টাচার্য খাঁ
এ নিয়ে মানকর গাঁ।

১৩. বদ্যিপুরের নন্দী বুড়ো
রথ দিয়েছে তের চুড়ো।
হনুমান ধরলো ধ্বজা
বুড়ো তুই তবলা বাজা।

১৪. বান গান ধান
তিন নিয়ে বর্ধমান।

১৫. মানকরের কদমা যেমন
হরিবাটীর বড়ি
জগদাবাদের পাটের জোড়
নেইকো এদের জুড়ি।

বিশেষ ধরনের পাকের জন্য মানকরের কদমার ভিতর একেবারে ফাঁপা হয়। জগদাবাদের বিয়ের পাত্রের পাটের জোড় খুবই বিখ্যাত ছিল। বিশ শতকের চল্লিশের দশকেও এর দাম ছিল আট (৮) টাকা। এখন এসব বন্ধ হয়ে গেছে।

১৬. অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ
ঘোষ ঠাকুরের পট
মানিক পীর দেওয়ান আছেন
নগরী হাট।

১৭. উলোর মেয়ের কুলুজী
অগ্রদ্বীপের খোঁপা
শান্তিপুরের হাত নাড়া
গুপ্তিপাড়ার চোপা। (মুখের ওপর উত্তর করা)

১৮. মেমারীর 'মাখা' খাবেন
মিলিয়ে যাবে মুখে

মানকরের কদমা খাবেন
চিটবে দাঁতের ফাঁকে॥

১৯. যদি যাবি চান্না
ঘরে উঠবে কান্না।

২০. যদি পেরুলি নর্জা
নেয়ে ধুয়ে ঘর যা

২১. যদি পেরুলি কর্জনা
নেয়ে ধুয়ে ঘর যা না।

এক কালে ভাতার থানার কর্জনা, নর্জা অঞ্চলে ঠ্যাঙাড়ের খুবই উৎপাত ছিল। পথিকদের একা পেলে তাকে আর ঘর ফিরতে হত না। এর থেকেই এই ছড়ার উৎপত্তি। লর্ড বেন্টিঙ্কের হস্তক্ষেপে ঠ্যাঙাড়েরা নিশ্চিহ্ন। সাধক কমলাকান্তের জন্মভূমি ও সাধনাস্থল চান্না। একবার সাধক-প্রবর চান্না যাবার পথে ওড়গাঁয়ের ডাঙায় ঠ্যাঙাড়ের হাতে পড়েন। শেষে তিনি ঠ্যাঙাড়েদের শ্যামা-মায়ের নাম শুনিয়ে মুগ্ধ করে মুক্তি পান। সেই থেকেই মনে হয় এই ছড়ার উৎপত্তি।

২১. বর্ধমানে শোলের ঢেঁকি
দাদু ভানুনি
দাদু গো, ভাল করে ভানবে ধান
দিদিমা রাঁধুনি॥

খাদ্যবস্তুর কোনটি ভাল সে সম্পর্কিত ছড়া :

২৩ উচ্ছে কচি পটল বীচি
শাকের ছা মাছের মা
কচি পাঁঠা পাকা মেষ
দই- এর অগ্র ঘোলের শেষ॥

এই ছড়াটির অনুরূপ অন্য একটি ছড়া

২৪ উচ্ছে খাবে ইচ্ছে করে
পটল খাবে চেকে।
দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করবে
নিজের চোখে দেখে॥

২৫ সাহেবগঞ্জের খইচুর
দুর্গাপুরের খাজা

বেলাড়ির মন্ডা আর
বর্ধমানের গজা॥

২৬. পল্লী কবি কুমুদরঞ্জনের একটি কবিতায় বিবাহ উৎসবে কোথা থেকে কোন কোন জিনিসের বায়না দিলে উৎসব সর্বাঙ্গসুন্দর হবে তার বিবরণ পাওয়া যায়।

সিউড়ি হতে রায় বেঁশে দল
নারানপুরের দগড় বাঁশী
নিগন তাহার ঢোল পাঠালো
আতসবাজী বনকাপাশী।
ভারে ভারে ক্ষীর ছানা আর
ধেনোর গোয়ালে দই পাঠালে
উজল বাতি পালিশ গাঁয়ের
ফুলঝুরি আর রঙ মশালে॥
বালুচরের রঙীন চেলী গায়ে যেন জ্বলছে হীরা
ময়ূরপঙ্খী ডাক সাইটা, বুনেই দিল বাঘডিগিরা॥
বর্ধমানের রাজার এবং অগ্রদ্বীপের দুইটি হাতী
এঁকে দিল সিঁদুর ভালে, হয়েছিল বিয়ের সাথী॥

অনুরূপভাবে বনপাশ অঞ্চলের একটি প্রচলিত ছড়া :

২৭. মোহনপুরের ঢুলি ভালো ঢ্যাম কুরাকুর বোল
ঢাকের বাদ্যি থামলে ভালো, বোল হরি বোল॥

২৮. গান বাজনা সুজন
তিনে মিলে সিঙ্গের কোণ

২৯. লাঠালাঠি ফাটাফাটি
এই নিয়ে হাসন হাটি॥

৩০. বোড়ো বেড় গাঁ যখন জলে ভাসে
চৌবেড়া পাঁচড়া তখন দাঁড়িয়ে হাসে॥

৩১. গঙ্গা, গৌড়, বটুয়া
এ নির্ঘাৎ কাটোয়া

৩২. কোক-ওভেন, খই চুর
এ নিশ্চয় দুর্গাপুর।

ডাক ও খনার বচন

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়ের বঙ্গ অভিধানে খনাকে চব্বিশ পরগনার বারাসতের দেউলি গ্রামের অটনাচার্যের কন্যা ও বরাহ (বররুচি)-এর পুত্র মিহিরের স্ত্রী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 'কৃষিকাজ, ফসলের ফলন, আবহাওয়া প্রভৃতি নানা বিষয়ে মানুষের অভিজ্ঞতাই খনার বচন।'

কিন্তু বিশ্বভারতী পত্রিকায় (মাঘ-চৈত্র ১৩৭১) দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় বলেছেন "কিংবদন্তীতে ডাককে পুরুষ ও খনাকে নারী বলিয়া প্রচার করায় আসল কথা চাপা পড়িয়াছে। আমাদের বিবেচনায় খনা শব্দে সংস্কৃত ক্ষণদ প্রাকৃত খনঅ অর্থাৎ গনৎকার থেকে উদ্ভুত। 'ডাক' শব্দটিকে আমরা ঘোষিত বাণী এবং ডাক পুরুষকে 'বাণী ঘোষণাকারী' অর্থে গ্রহণের পক্ষপাতী। আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ও বলিয়াছেন ডাক কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে। তবে তিনি মনে করেন এক শ্রেণীর বৌদ্ধ তান্ত্রিককে 'ডাক' বলা হইত।"

দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, খনা ও ডাকের বচন দুই রূপ সামগ্রী। খনা কৃষক ও গ্রহাচার্যের নজির। ডাকের বচনে জ্যোতিষ ও ক্ষেত্রতত্ত্বের কথা আছে সত্য, কিন্তু তাহাতে মানব চরিত্রের ব্যাখ্যাই বেশী।

ডাকের বচন :

১. ঘরে আখা বাইরে রাঁধে
অল্প কেশ ফুলাইয়া বাঁধে,
ঘন ঘন চায় উলটি ঘাড়
ডাক বলে এ-নারী ঘর উজার॥

২. নিয়র পোখরি দূরে যায়।
পথিক দেখিয়ে আউড়ে চায়॥
পর সম্ভাষে বাটে বিকে
ডাক বলে এ নারী ঘরে না টিকে॥

৩. কাঁখে কলসী পানীকে যায়
হেট মুণ্ডে কাকহো না চায়।
যেন যায় তেন আইসে
ডাক বলে গৃহিণী সেই সে॥

৪. খাটে খাটায় লাভের গাঁতি
তার অর্ধেক কাঁধে ছাতি

ঘরে বসে পুছে বাত
তার ভাগ্যে হা ভাত॥ (খনা)

Peterson-এর বর্ধমান গেজেটে (১৯১০) খনার বচনের উল্লেখ আছে।

The distribution of rainfall suitable for paddy by far the most important crop of Bengal may be gathered from the following rural doggerels :

১. যদি বর্ষে অঘানে রাজা যান মাগনে।
২. যদি বর্ষে পৌষে কড়ি হয় তুষে
৩. যদি বর্ষে মাঘের শেষ ধন্য রাজা পুণ্য দেশ॥
৪. যদি বর্ষে ফাগুনে চীনা কাওন দ্বিগুণে।

ছড়াটির পাঠান্তর।

ফাগুন মাসে জল আম আমড়া নির্মূল॥
৫. চৈত্রে মাথা মাথার বৈশাখে ঝড় পাথার
জ্যৈষ্ঠে রে না উঠে আষাঢ়ে বর্ষা বটে
কর্কট ছরকট সিংহ শুক্‌নো
কন্যা কানে কান বিনা বায়ে তূলা বর্ষে
কোথা রাখ ধান।

ধান ওঠার সময় অঘ্রানে বর্ষা হলে চরম দুর্ভিক্ষের অবস্থা ঘটে, ফলে রাজাকেও মাগনে যেতে হয়। পৌষ মাসেও বৃষ্টি হলে ধান সব নষ্ট হয়ে যায় ও চাহিদা অনুপাতে সরবরাহ কম হওয়ায় ধানের দর খুবই বৃদ্ধি পায়। মাঘ মাসের শেষ দিকে ধান উঠে যায়। এ সময় বৃষ্টি হলে মাঠে লাঙল দেওয়ার সুবিধা হয়। ফলে মাঠের মধ্যে কর্ষিত জমিতে প্রখর রৌদ্রে পোকামাকড় মরে যায় ও ভালো ফসল হবার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ফাল্গুন মাসে বৃষ্টি হলে চীনা, কাওন প্রভৃতি শ্রেণীর ধানের ফলন দ্বিগুণ হয়। যদি চৈত্র মাসে স্বল্প বৃষ্টি, বৈশাখে ঝড় বৃষ্টি, জ্যৈষ্ঠ মাসে যদি জমিতে আগাছা জন্মাতে না দেওয়া হয়, আষাঢ়ে প্রবল বৃষ্টি, শ্রাবণ মাসে বৃষ্টির ধারা, ভাদ্র মাসে অনাবৃষ্টি, আশ্বিনে বৃষ্টির ফলে আইলের কানায় কানায় জল ও কার্তিক মাসে বিনা ঝড়ে বৃষ্টি হয়, তা হলে ধান রাখার জায়গা থাকবে না অর্থাৎ প্রচুর ফসল হবে।

খনার বচনের আরও কিছু নমুনা :

পশ্চিমে ধনু নিত্য খরা
পূর্বে ধনু বর্ষা ঝরা।

আছে গরু না বয় হাল
তার দুঃখ চিরটা কাল॥
আমে বান তেঁতুলে ধান
আষাঢ়ে পান চাষায় খান।
কোল পাতলা ডাগর গুছি
লক্ষ্মী বলেন ঐখানে আছি।
গাছ গাছালি ঘন সবে না
গাছ হবে তার ফল হবে না॥
চৈত্রে কুয়ো ভাদ্রে বান
নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান॥
দাতার নারকোল বখিলের বাঁশ
কাট না কাট বাড়ে বারমাস।
দূর শোভা নিকট জল
নিকট শোভা রসাতল।

দীর্ঘকালীন পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা-প্রসূত ছড়াগুলি কৃষিপদ্ধতি সম্পর্কিত। অতি প্রাচীনকাল থেকে ডাক ও খনার বচন বংশ-পরম্পরায় চলে এসেছে ও জেলার লোকসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

সাহিত্যিক প্রবাদ :

১. বর্ধমান দেশ ভাই সভাকার নাভি।
২. হা ভাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়।
৩. ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।
৪. নীচ যদি উচ্চ ভাসে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।
৫. বড়র পীরিতি বালির বাঁধ
ক্ষণেকে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।
৬. সিঁচা জল মিছা কথা কতক্ষণ রয়।
৭. সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।
৮. ভবিষ্যৎ ভাবি কেবা বর্তমানে মরে।
প্রসবের ভয় তবু পতি সঙ্গ করে।

হিন্দী প্রবাদ :

১. গোরস (দুধ) গলি গলি ফিরি
সুরা বৈঠল বিক্‌তা হ্যায়।

ছড়াটির মমার্থ ভাল জিনিসের কদর নাই, তাই দুধ নিয়ে গোয়ালা গলিতে গলিতে ফেরী করে আর মদ কেমন এক স্থানে বিক্রীত হয়।

২. কাম কীয়ে যা রাম ভজে যা
না কাহুকা ডর হ্যায়
ইস নগরীমে সভি মুসাফির
না কাহুকা ঘর হ্যায়।

ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে নিজের কর্তব্য কর্ম করে গেলে কাকেই বা ভয়? এই জগতে সকলেই পথিক কারও স্থায়ী আবাস নাই।

৩. বৃন্দাবন আর বৈকুণ্ঠকো তৌলে তুলসী দাস
ভারী যেঠো ভূতল বৈঠো হালুক চড়াও আকাশ।

বৃন্দাবন আর বৈকুণ্ঠের কোনটি শ্রেষ্ঠ? তুলসীদাসের মতে পৃথিবীর বুকে যার অবস্থান সেই বৃন্দাবনই শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রজ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে সহজে লাভ করা যায়।

সংস্কৃত প্রবাদ :

১. মহাজনঃ যেন গত স পন্থাঃ
২. অহনি অহনি লোকাঃ গচ্ছন্তি যম মন্দিরম্
শেষাঃ স্থিরত্বম্ ইচ্ছন্তি কিম আশ্চর্য্যম্ অতঃপরম্।
৩. চিতা চিন্তা দ্বয়োর্মধ্যে চিন্তা এব গরীয়সী
চিতা দহতি নির্জীবং চিন্তা সজীবমেব॥
৪. যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥
৫ বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া॥
৬. অঙ্গার শত ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।
৭. গতস্য শোচনা নাস্তি।
৮. বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা।
৯. চক্রবৎপরিবর্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ।
১০. আতুরে নিয়মো নাস্তি।

ইংরাজী প্রবাদ :

১. A little learning is a dangerours thing.
গণ্ডুষ জলমাত্রেন শফরী ফরফরায়তে।

২. To rob Peter to pay pad
গরু মেরে জুতো দান

৩. Grapes are sour
পান না তাই খান না।

৪. Physician heal thyself
চাচা আপন প্রাণ বাঁচা

৫. Good wine needs no bush
চেনা বামুনের পৈতের দরকার হয় না।

৬. No pains no gains
কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না।

কতকগুলি মজার ছড়া :

আহাম্মকের দশ : প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে বনপাশ কামারপাড়ার গোপাল চন্দ্র দাস তাঁর ছবির দোকানে কাঁচের ওপর রঙ দিয়ে এই ছড়াগুলি লিখে ছবি বাঁধিয়ে বিক্রি করতেন। আজও গ্রামের অনেকের ঘরে এই ছড়া অবিকৃত অবস্থায় দেখা যায়।

আহাম্মকের এক. পরের ধনে করে ট্যাঁক।
দুই. পরের চালে তোলে পুঁই।
তিন. ঋণ করে দেয় ঋণ।
চার. বন্ধুকে দেয় টাকা ধার।
পাঁচ. পরের পুকুরে ফেলে মাছ।
ছয়. ঘর থাকতে পরের ঘরে শোয়।
সাত. পরের ঘরে পাড়ে পাত।
আট. বউকে পাঠায় হাট।
নয়. এর কথা ওর কাছে কয়।
দশ. মাগের কথায় বশ।

পরিশেষে দাদাঠাকুরের ভুলেভরা কলকাতার অনুকরণে 'ভুলে ভরা বর্ধমানের' ছড়া দিয়ে 'মধুরেণ' সমাপন করা যাক।

নবাব হাটে নাইকো নবাব
রানীগঞ্জে রানী
তেলমারুই এ মারে না তেল
নেইকো কোন ঘানি।

আদ্যি কালের নতুন গঞ্জ
নতুন তবু আছে
খোক্কর সাহেবের অধিষ্ঠান
পুরনো চকের কাছে।
ময়ূরমহলে নেইকো ময়ূর
পীর বাহারাম পাশে
সুড়ঙ্গ পথে সুন্দর যায়
বৃথা বিদ্যা আশে।
কাঞ্চন নাই নগর নাই
কাঞ্চননগর নাম
শ্যামসায়রের ঈশানকোণে
নেইকো কোন শ্যাম।
রাসবিহারী রোডের পাশে
যত বদ্যির ডেরা
একবার সেথায় পড়লে ঢুকে
পকেট হবে ঝাড়া
গোলাপ নাই বাগও নাই
সরস্বতীর ধাম
বঙ্কিমের সেই 'বাবু' কোথায়?
বাবুরবাগ নাম।
কুমীরকোলায় নেইকো কুমীর
বাঘনা পাড়ায় বাঘ।
যাগডিহিতে কোন কালে
দেখেছ কি যাগ?
কামারপাড়ায় কামার কোথায়?
সেকরার ঠুক্ ঠাক
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
চালে বাজে ঢাক॥
দুর্গাপুরে নেই দুর্গা
বিশ্বকর্মার পুরী
কলকাতার মত কিন্তু

ওড়ে না কোন ঘুড়ি।
হাত ঘুরুলে নাড়ু দেব
নইলে নাড়ু কোথা?
নাড়ু গ্রামে নেইকো নাড়ু
যতই খোঁড় মাথা।
সাহেবগঞ্জে নেইকো সাহেব
মেমারীতে মেম
ভুলে ভরা বর্ধমান
বল "সেম" "সেম"।

এই প্রবাদ, ছড়া সংগ্রহ করে লোকসংস্কৃতির এই শাখাকে সমৃদ্ধ করেছেন পাদরী লঙ সাহেব থেকে আরম্ভ করে মর্টন সাহেব, ডরসন সাহেব, আন্তর্জাতিক লোকসাহিত্যের বিশেষজ্ঞ লিন্ডা, অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ, সুশীলকুমার দে, বাংলাদেশের মযহারুল ইসলাম, ড. আশরফ সিদ্দিকী এবং বর্তমানে জেলার ছড়া নিয়ে আলোচনা করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

সাহিত্যিক বিজন ভট্টাচার্যের কথায়—"এমনি ভাবে প্রবাদ আসিয়া সাহিত্যে সংস্থান পাইয়াছে এবং সাহিত্য হইতে তাহা আবার রসিক পাঠকের মাধ্যমে নতুন কৌলীন্য লইযা লোকমুখে ফিরিয়া গিয়াছে। প্রাকৃতজনের মুখচারী কত লৌকিক প্রবাদ যে এই রূপে সংস্কৃত, একটু মার্জিত হইয়া শিষ্টজনের সদুক্তিকর্ণামৃতে পরিণত হইয়াছে, তাহার হিসাব লইবার সময় বোধ হয় এখনও পার হইয়া যায় নাই।"

আমার মনে হয় কোনদিনই পার হবে না। প্রবাদ, প্রবচন, ছড়ার Tradition, এই ভাবে সমানে চলে যাচ্ছে, ভবিষ্যতেও চলে যাবে।

এগারো অধ্যায়

সঙ্গীত-চর্চায় বর্ধমান

শাস্ত্রীয় সঙ্গীত

আমাদের বাগধারায় একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে—যার কাজ তারে সাজে, আনাড়ির লাঠি বাজে। বর্ধমানে সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আমার ক্ষেত্রে এ প্রবাদ সর্বতোভাবে প্রযোজ্য, কারণ এ বিষয়ে আমি একেবারেই আনাড়ি। তবে "আনাড়িব মস্ত সুবিধা এই যে সানাড়ির চেয়ে তার অভিজ্ঞতার সুযোগ বেশী কারণ পথ একটা বই নয় কিন্তু অপথের সীমা কোথায়। সে দিক দিয়ে যে চলে সে-ই বেশি দেখে বেশি ঠেকে। আমি পথ জানিনে বলেই হোক, কিংবা আমার মন লক্ষ্মীছাড়া স্বভাবের বলেই হোক এতদিন গানের ঐ অপথ এবং আঘাতটা দিয়েই চলেছি। কাজেই আমার অভিজ্ঞতায় যা মিলেছে তা শাস্ত্রের সঙ্গে মেলে না। এটা নিশ্চয়ই অপরাধের বিষয় কিন্তু সেই জন্যেই হয় তো মনোরম হতে পারে।" সঙ্গীতের মুক্তি রবীন্দ্র রচনাবলীর দশম খণ্ড—পৃ. ৯১৩ প্রবন্ধে সঙ্গীত সম্বন্ধে সঙ্গীতে নতুন ধারার প্রবর্তক, সঙ্গীত ও সুরস্রষ্টা কবিগুরুর এই উক্তি তাঁর বৈষ্ণবী বিনয় ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু আমার মত আনাড়ির পক্ষে অক্ষরে অক্ষরে প্রযোজ্য।

আমার সঙ্গীত সম্পর্কে যেটুকু জ্ঞান সেটুকু দেশ পত্রিকায় সঙ্গীত সম্পর্কিত বিভিন্ন সঙ্গীত শিল্পী ও সুরস্রষ্টার প্রবন্ধ—যেমন শান্তিদেব ঘোষের "সঙ্গীত সাধক আলাউদ্দিন", সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর "সুধা সাগরতীরে" কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের "কুদরত্ রঙ্গীবিরঙ্গী", জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের "তহজীব এ মৌসিকী" প্রবন্ধ কিংবা অর্ধেন্দু গাঙ্গুলীর "The Story of Music" এমনি কিছু বই পড়ে। আর প্রয়াত দেবীদার (দেবীপ্রসাদ মজুমদার) সৌজন্যে দু-চারটি সঙ্গীত সম্মেলনে যোগ দিয়ে বা দেবীদার বাড়ীতে রাধিকামোহন মৈত্র, ধ্রুবতারা যোশী প্রমুখ তাবড় তাবড় সঙ্গীত বিশেষজ্ঞের সঙ্গীত সম্পর্কিত আলোচনা শুনে।

এই সব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি সঙ্গীতের ক্ষেত্র বিশাল। প্রথমত একে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়—শাস্ত্রীয়, মার্গ বা কালায়াতী সঙ্গীত আর অশাস্ত্রীয় সঙ্গীত। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মধ্যে যেমন পড়ে খেয়াল, ঠুংরি, ধ্রুপদ, ধামার, পূরবী প্রভৃতি আর অশাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মধ্যে বাকি সব ভক্তিমূলক, পল্লীগীতি, লোকসঙ্গীত যেমন ভাটিয়ালী, বাউল, সত্যপীরের গান, মানিক পীরের গান, টুসু, ভাদু ও ধান কাটার গান, ছাদ পিটানোর গান প্রভৃতি কর্মসঙ্গীত। এছাড়া আছে গজল, গীত, ভজন, কীর্তন রাগপ্রধান কত কি?

কালোয়াতী সঙ্গীত—যেটা এসেছে সুফী করবাল মুসলমান গায়কদের সহায়তায় তাঁর 'রাগ'-ই বা কত! মিঞা মহলার, হিন্দোল, বসন্ত, জয়জয়ন্তী, পঞ্চম খট্‌রাগ, মারুসারঙ্গ, সাওনী আর এদের একত্রে মালকোষ। কোন কোন বন্দেশের আবার ছায়া নট, সারঙ্গ নট, বিলাবল, মিঞা মল্লার মারু, বেহাগ, হাম্বীর, এই রকম কত রাগ।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ঘরানাই বা কত? কিরানা, আগ্রার গায়কি, গোয়ালিয়র, জয়পুর, সহসওয়াল, পাতিয়ালা, বেতিয়া আর আমাদের ঘরের কাছের বিষ্ণুপুর ঘরানা। কিন্তু কালোয়াতী গানের যে একটা সম্মোহনী শক্তি আছে—সেটা তো অস্বীকার করার উপায় নাই। প্রকৃত ওস্তাদের কণ্ঠ হতে যখন ভৈরবী ঠুংরির "যমুনা কি তীরে" বা "বুঁদেরিয়া"... কিংবা পূরবীর "লইরে শ্যাম এঁদোরিয়া"... এমন কি ইমন রাগের আ...আ...আ...এ...রে...গা...মা..." রাগ নিঃসৃত হয় তখন গানের তুচ্ছ কথা কয়টা ছাপিয়ে ওস্তাদের কণ্ঠ-নিঃসৃত সুরের লহরী যে কোন শ্রোতাকে ঘণ্টা খানেক মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখে দেয়। তাই তো রবীন্দ্রনাথ এই গান সম্পর্কে বলেছেন—"আমাদের কালোয়াতী গানটা ঠিক যেন মানুষের গান নয়; সে যেন সমস্ত জগতের। ভৈঁরো যেন ভোরবেলায় আকাশেরই প্রথম জাগরণ, পরজ যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রাবিহ্বলতা, কানাড়া যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশীথিনীর পথ বিস্মৃতি; ভৈরবী যেন সঙ্গবিহীন অসীমের চিরবেদনা, মূলতান যেন রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্তি নিঃশ্বাস।" তবে সব ঘরানার সব রাগের মধ্যে মূলগত কোন পার্থক্য নাই, পার্থক্য আছে শব্দতত্ত্ব, ব্যক্তিত্ব বা স্টাইলে। শিশির ভাদুড়ীর চাণক্য আ'র অহীন্দ্র চৌধুরীর চাণক্যে পার্থক্য থাকবেই। শম্ভু মিত্রের ছেঁড়া তারে অভিনয় অন্য কারও কাছ থেকে আশা করা বৃথা। বড়ে গোলাম আলির, কালোয়াতীর স্টাইল, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে পৃথক হবেই। ধ্রুবতারা যোশীজীর যে ব্যক্তিত্ব, যে স্টাইল সেটা কি বর্তমান প্রজন্মে আশা করা যায়?

যাক সে কথা—সঙ্গীতচর্চায় বর্ধমানের অবদান ও ভূমিকার আলোচনায় আসা যাক। বর্ধমান পরগনায় মোগল শাসনের সূচনা হয় ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে শের

আফগানের হত্যার পর থেকে এবং বর্ধমান রাজবংশের উত্থান কৃষ্ণরাম রায়ের (১৬৭৫–১৬৯৬) সময় থেকে কিন্তু সে সময় গোটা পরগনা জুড়ে, যে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছিল সে অবস্থায় সঙ্গীত চর্চার পরিবেশ আশা করা যায় না।

বর্ধমান রাজপরিবার এ-জেলায় সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর বর্ধমান রাজের আশ্রয়ে অনেক কবি ও গীতিকার নিশ্চিন্তে সঙ্গীতচর্চা করতে থাকেন। মহারাজ ত্রিলোকচাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় দেওয়ান বংশের ব্রজকিশোর রায়, দেওয়ান নন্দকুমার রায় ও দেওয়ান রঘুনাথ রায় অনেক শাক্তগীতি রচনা করেন। সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্য তেজচন্দ্রের সভায় রাজসভাপণ্ডিত রূপে ব্রত হয়েছিলেন। তিনি শ্যামাসঙ্গীতে মাতোয়ারা ছিলেন।

কীর্তিচাঁদের আমলে (১৭০২–১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁর প্রতিষ্ঠিত হাট কীর্তিনগরের বাঁধানো পুকুরের মধ্যস্থলে চাঁদনিতে পূর্ণিমার রাতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর বসতো। পুকুরের চারপাশে শ্রোতারা সঙ্গীত উপভোগ করতেন।

কথিত আছে মহারাজ তেজচন্দ্র দেওয়ান পরিবারের কাব্যগুণ ও সঙ্গীত প্রতিভার পরিচয় পেয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তালিম দেবার জন্য পশ্চিম থেকে একাধিক কালোয়াত আনিয়েছিলেন, এঁদের মদ্যে দিল্লীর প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিদ ও গায়ক আতা হোসেনের নাম উল্লেখযোগ্য। রঘুনাথের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষার জন্য আতা হোসেন নিযুক্ত হন। আতা হোসেন ও অন্যান্য পশ্চিমী কালোয়াতের মাধ্যমে উত্তর-পশ্চিম ভারতের সঙ্গীতের ঐশ্বর্য্য আহরণ করে রঘুনাথ বাংলার সঙ্গীতকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করে গেছেন। ইনি ছিলেন বাংলার ধ্রুবপদ গানের অন্যতম পথিকৃৎ, তাঁর প্রতিটি রাগ-রাগিণী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত। রঘুনাথ বহু অধ্যাত্ম সঙ্গীতও রচনা করেছিলেন।

তৎকালীন সঙ্গীত রচনায় ও কণ্ঠ সঙ্গীতে সাধক-প্রবর কমলাকান্ত ভট্টাচার্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

বাঁধমুড়ার দাশরথি রায় (১৮০৬–৫৭) পাঁচালী গানের আখড়া স্থাপন করেন। তিনি কবিগানের ঝাঁঝালো ছড়া ও চাপান-উতোরের ভঙ্গী সহযোগে পাঁচালী গানের নব বিন্যাস করেন।

পূর্বস্থলীর চুপী গ্রামের মতিলাল রায় যাত্রাদলের গান বাঁধতেন, সুর দিতেন ও আসরে গাইতেন।

ধবনীর নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (১৮৪১–১৯১২) কৃষ্ণযাত্রায় তাঁর অভিনয় ও ভক্তি উচ্ছ্বসিত পাঁচালী গানের দ্বারা জনগণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেছিলেন। নান্দালের নবীন শ্যামাসঙ্গীতে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতক থেকে যে সব সঙ্গীত-সাধকের আবির্ভাব হয় তাদের গোষ্ঠী হিসেবে ভাগ করা চলে। এই সব গোষ্ঠীর কোনটির নিবদ্ধ ছিল ধর্মসঙ্গীত, কোনটির ভাবসঙ্গীত বা রাগরাগিণীর সঙ্গীত। এরই মধ্যে টপ্পার বিপুল সমাদর। আখড়াই থেকে হাফ আখড়াই তৈরী হয়েছে। এছাড়া ছোট ছোট গান বহুল পরিমাণে জনসমাজে ছড়িয়ে পড়ল। লিরিক বা কাব্যসঙ্গীত সম্বন্ধে নতুন চেতনা এলো।

বিংশ শতাব্দী থেকে পুরাতন ঐতিহ্যের বিলোপ ঘটতে লাগলো। কবি, পাঁচালী উঠেই গেল। এই শতকের তিরিশের দশকে লোকসঙ্গীতের সমাদর বাড়তে লাগল; বাউল, ভাটিয়ালী জনপ্রিয়তা অর্জন করতে লাগল। লোকসঙ্গীতের যে একটা সর্বজনীন আবেদন আছে সেটা জনসমাজে স্বীকৃতি পেল।

নজরুল বাংলায় গজল গান রচনা করলেন। যে গজল হিন্দুস্থানে ফারসী ও উর্দুভাষায় রচিত, নজরুল তাকে বাংলায় রচনা করেন। টপ্পার রাগিণীতেও কেবল পোস্তা তালে গীত এই গজল জেলার সঙ্গীত ধারায় সংযোজিত হলো। কিছুদিন জনসমাজ গজলকে খুবই উপলব্ধি করল। এরপর হিন্দুস্থানী টপ্পার চেয়ে জ্ঞান গোঁসাই ও ভীষ্মদেবের রাগসঙ্গীতের প্রতি লোকের আকর্ষণ বৃদ্ধি পেল। যুদ্ধোত্তর যুগে সঙ্গীতের জগতে বিভিন্ন গোষ্ঠী দানা বাঁধতে লাগল। এখন থেকে সঙ্গীত দুই প্রধান ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে একটি শাস্ত্রীয় বা মার্গ সঙ্গীত আর একটি লোকসঙ্গীত। জেলার সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য একটা সুসংবদ্ধ চেহারা নিল।

কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে ভারতের অন্যান্য স্থানে যখন বাজ বাইয়ো, কৃষ্ণ রাও, শঙ্কর পণ্ডিতের গোয়ালিয়র ঘরানা, ফৈয়জ খাঁর আগ্রা ঘরানা, আবদুল করিম খাঁ, ভীমসেন যোশীর কিরানা ঘরানা, এনায়েৎ খাঁ, বিলায়েৎ খাঁ, আলাউদ্দিন ও রবিশঙ্করের আলাদিয়া ঘরানা, গিরিজা দেবীর বেনারস ঘরানা অজয় চক্রবর্তীর পাতিয়ালা ঘরানা, ইস্তিয়ক হোসেন খাঁর রামপুর ঘরানা এমন কি জেলার পাশেই যদু ভট্টর বিষ্ণুপুর ঘরানা গড়ে উঠেছিল, তখন সারা বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ জমিদার বর্ধমানাধিপতির পৃষ্ঠপোষকতার কোন 'বর্ধমান ঘরানা' গড়ে উঠল না; এ এক আশ্চর্য ব্যাপার।

মনে হয় এর কারণ গুরুর অভাব—শাস্ত্রীয় সঙ্গীত মূলত গুরুমুখী সঙ্গীত। সেই সময় বর্ধমানে শঙ্কর পণ্ডিত, রবিশঙ্কর, বিয়ালেৎ খাঁ, করিম খাঁ সাহেবের মত ঘরানা সৃষ্টি করার কোন গুরু ছিলেন না। আর থাকলেও আমার জানা নেই।

পরে বিংশ শতকের চারের দশকে বর্ধমানের প্রখ্যাত সঙ্গীত প্রেমী এড্‌ভোকেট প্রয়াত দেবীপ্রসাদ মজুমদার বিষ্ণুপুর ঘরানার গোপেশ্বর

বন্দ্যোপাধ্যায় ও জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর কাছে খেয়াল, সেতারের তালিম নিয়ে বর্ধমানে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে দেবীবাবু ছাড়াও আর কয়েকজনের অবদান উল্লেখযোগ্য। দেবীবাবুর সমসাময়িক কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতে তালিমপ্রাপ্ত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে ছিলেন কণ্ঠসঙ্গীতে কামাখ্যা চক্রবর্তী ও সুধাংশু মুখোপাধ্যায়; বোরহাটের বোতল বাড়ীর বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারের কংগ্রেসকর্মী জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরীর ভাই রমেন্দ্র চৌধুরী। ইনিও দেবীবাবুর মত বিষ্ণুপুর ঘরানার গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্য ছিলেন। আর ছিলেন বেহালাবাদক সরোজ দে ও গুরুশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। গুরুশঙ্কর ছিলেন অকিঞ্চন দত্তের শিষ্য। ১৯৪২-৪৩ সালে আমি তখন সি.এম.এস স্কুলের (তখন মাইনর স্কুল) সামনে কিঙ্কর দাস মশায়ের বাড়ীতে থাকতাম—কাছেই গুরুশঙ্কর বাবুর ছিল “বাজনা ঘর”। সঙ্গীতের প্রয়োজনীয় বাদ্যযন্ত্রের দোকান। কিঙ্করবাবুর মুহুরী আশু হাটী এস্রাজের রেওয়াজ করতো—ও মাঝে মাঝে গুরুশঙ্কর বাবুর কাছে যেতো। আশু হাটীর সঙ্গে আমিও যেতাম তাঁর দোকানে, দেখতাম যন্ত্র নির্মাণের অবসর পেলেই গুরুশঙ্কর বেহালায় রেওয়াজ করছেন। ওনার বাড়ী বর্তমানে ইছলাবাদে আমার বাড়ীর কাছেই। আর ছিলেন তবলা শিল্পী জ্যোতিষ পাল। গুরুশঙ্কর বাবুর কাছেই শুনতাম জ্যোতিষ নাক দিয়ে সানাই-এর সুর তুলে তার সঙ্গে তাল রেখে তবলা বাজাতেন। বিষ্ণুপুর ঘরানার শিবপদ ভট্টাচার্য ভাল এস্রাজ বাজাতেন। আশুদা তাঁর কাছেও মাঝে মাঝে যেতেন। নেপাল আঢ্য কণ্ঠসঙ্গীতে ও স্বাত্মানন্দ পাখোয়াজে ওস্তাদ ছিলেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে বিংশ শতকে স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই বর্ধমানে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল। পাঁচের দশকের শেষ দিকে আমি তখন চাকরীর সূত্রে বর্ধমানে এসে গেছি। তখন বহিলাপাড়ায় দেবীবাবুর বাড়ীর কাছাকাছি রানীসায়রের পূর্ব পাড়ের এক বাড়ীতে ভাড়া থাকতাম। সে সময় দেখতাম প্রখ্যাত সরোদ ও সেতার শিল্পী রাধিকামোহন মৈত্র ও বিষ্ণুপুর ঘরানার জ্ঞান ঘোষ ও গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায়ই দেবীবাবুর বহিলাপাড়ার বাড়ীতে আসতেন। বর্ধমানের প্রখ্যাত শল্যচিকিৎসক শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও সঙ্গীতপ্রেমী ছিলেন।

ইতিমধ্যে ২নং ইছলাবাদে দেবীবাবুর নতুন বাড়ীর নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয়ে গেছে। তিনি শীঘ্রই বহিলাপাড়ার বাড়ী ছেড়ে দিয়ে ইছলাবাদে নতুন বাড়ীতে উঠে যাবেন। এমন সময় রাধিকাবাবুর পরামর্শ মত ডাক্তার শৈলেন মুখার্জী, জ্ঞান মুখার্জী ও দেবী মজুমদার মিলে বর্ধমানে একটা মিউজিক একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন। যেহেতু দেবীবাবুর বহিলাপাড়ার বাড়ীটা ফাঁকা থাকছে, সেই হেতু আপাতত ঐ বাড়ীতেই

বর্ধমান মিউজিক একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হলো ১৯৬১ সালের ১লা এপ্রিল। নব প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত একাডেমীর শিক্ষক নিযুক্ত হন রাধিকামোহন মৈত্র (সরোদ ও সেতার), রবীন্দ্রমোহন মৈত্র (গান ও গীত), অধ্যাপক শ্যামল বোস (তবলা), দেবব্রত বিশ্বাস (রবীন্দ্রসঙ্গীত), ও আনন্দম্ (নাচ)। এছাড়া সঙ্গীতপ্রেমী জাস্টিস অরুণ মুখার্জী একাডেমীকে নানাভাবে সাহায্য করেন।

এই সময় সঙ্গীত জগতের শিরোনামে ছিলেন ধ্রুবতারা যোশী। তিনি তখন মধ্যপ্রদেশের খয়রাগড় সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত ও চারুকলা বিভাগের অধ্যক্ষ। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তরের ফলে তিনি অধ্যক্ষপদে ইস্তফা দেন। এই সুযোগে মিউজিক একাডেমীর উদ্যোক্তাগণ তাঁর প্রতিভাকে একাডেমীর সেবায় নিয়োজিত করার জন্য তাঁকে বর্ধমানে আমন্ত্রণ জানান। যোশীজিও সঙ্গে সঙ্গে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বর্ধমানে চলে এলেন। বর্ধমানে সঙ্গীতের ইতিহাসে বিশেষ করে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এ এক স্মরণীয় ঘটনা। বর্ধমানে এসে তিনি মিউজিক একাডেমীর অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন। প্রথমে দেবীবাবুর বহিলাপাড়ার বাড়ীতেই তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়। দেবীবাবুর বাড়ী থেকে প্রতিদিন তাঁর খাবার আসতো। যোশীজি মিউজিক একাডেমীতে যোগ দেওয়ায় একাডেমী কৌলীন্য লাভ করে। প্রথম দফায় যোশীজি বর্ধমানে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ছিলেন। ১৯৬৭ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে সঙ্গীত বিভাগের অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন। সেখান থেকে অবসর নেবার পর তিনি বর্ধমানে এসে স্থায়ী ভাবেই থেকে যান।

১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মিউজিক একাডেমির পরিচালনায় বর্ধমান রেলওয়ে ইনস্‌টিটিউটে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রথম সম্মেলন হয়। একদিনের এই অনুষ্ঠানে ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ (সেতার), কেরামত খাঁ (তবলা), সাগিরুদ্দিন খাঁ (সারেঙ্গী বাদন) এক আলাদা মাত্রা এনে দেয় ও গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। এছাড়া যোশীজি, রাধিকামোহন মৈত্র, রবীন্দ্র মৈত্র, জ্ঞান মুখার্জী, দেবীবাবু এঁরা তো ছিলেনই।

১৯৬৭ সালে যোশীজি শান্তিনিকেতনে অধ্যক্ষ পদে যোগ দিতে চলে গেলে রাধিকামোহন মৈত্রকে অধ্যক্ষপদে বরণ করা হয়।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি দীর্ঘ ৬০ বছরের ব্যবধানে তৎকালীন মার্গসঙ্গীতের ইতিহাস ও সঙ্গীতজ্ঞদের নাম প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম; অতি সম্প্রতি বর্ধমানে অনুষ্ঠিত "বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসব"-এর স্মরণিকা পুস্তিকায় অধ্যাপক কল্যাণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ (বর্ধমানের সঙ্গীতচর্চা— ধ্রুবতারা যোশী) পড়ে আবার পূর্ব স্মৃতি জ্বলজ্বল করে উঠলো। এর জন্য

কল্যাণবাবুর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই। বর্ধমানে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে ও বর্ধমান-রাজের বদান্যতায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সুযোগে দেবীবাবু ডাক্তার শৈলেন মুখার্জী, রাধিকাবাবু ও যোশীজি মিলিতভাবে ডা. বিধানচন্দ্র রায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ধীরেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বর্ধমানে একটি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন জানান। তাঁরা রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডুর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। ড. রায় তাঁদের আবেদনের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেন ও বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবেদন মঞ্জুর করেন। প্রথমে এর নাম ছিল Institute of Music—এর উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডু। সেই অনুসারে Institute of Music-এর নতুন নাম হয় Padmaja Naidu Institute of Music; ধ্রুবতারা যোশী হন এর প্রথম অধ্যক্ষ। তিনি একই সঙ্গে বর্ধমান মিউজিক একাডেমিরও সাম্মানিক অধ্যক্ষপদ অলংকৃত করেন। জেলায় এই প্রথম সরকারী অনুদানে সরকারী স্বীকৃতিতে সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো।

বর্ধমানে এখন হলো দুটি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়—Music Academy ও পদ্মজা নাইডু সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত পদ্মজা নাইডু সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় হলেও বর্ধমান মিউজিক একাডেমীর গুরুত্ব একটুও কমে নাই, বরং বেড়ে গিয়েছিল। এর কারণ মনে হয় মিউজিক একাডেমী ছিল সরকারী নিয়ন্ত্রণের আওতায় বাইরে একটা খোলামেলা পরিবেশে। রবীন্দ্রনাথের কথায় যেখানেই হেতু আসিয়া মুরুব্বি হইয়া বসে সেখানেই সৃষ্টি মাটি হয় এবং যেখানেই অনুগ্রহ আসিয়া সকলের চেয়ে বড় আসনটা লয়, সেখান হইতেই কল্যাণ বিদায় গ্রহণ করে। মিউজিক একাডেমী গড়ে উঠেছিল স্বাধীন সত্তা নিয়ে, কারও অনুগ্রহের জোরে নয়। আর পদ্মজা নাইডু ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছিল সরকারী অনুগ্রহে, নিয়মকানুনের বেড়াজালের মধ্যে। তাই মনে হয় মিউজিক একাডেমীর রমরমা অব্যাহত থাকে। কল্যাণবাবুর প্রতিবেদন থেকে জানা যায় শ্রীলঙ্কা থেকেও শিক্ষার্থী এসেছিলেন মিউজিক একাডেমীতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিম নিতে এবং আফগানিস্তানের শিক্ষার্থীর আসার কথা হয়েছিল। এসেছিল কিনা সঠিক জানা নেই। তবুও শ্রীলঙ্কা থেকে শিক্ষার্থী আসায় মিউজিক একাডেমী সরকারী স্বীকৃতি না পেলেও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছিল। মিউজিক একাডেমীর পক্ষে এটা কম গৌরবের কথা নয়। তবে এই গৌরবের সিংহভাগ প্রাপ্য ধ্রুবতারা যোশীর।

এই সময় থেকে একাডেমী বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীদের আগমনে এক তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। রাধিকামোহন মৈত্র ও তাঁর পুত্র রবীন্দ্রমোহন মৈত্র, এ. কানন, মালবিকা কানন, জ্ঞানেন্দ্রপ্রকাশ ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রপ্রকাশ গোস্বামী, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল বসু, সেতার শিল্পী হিমাদ্রী বাগ্চী, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুস্তাক আলি খান, ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ, ইমরাৎ খাঁ, বিলায়েৎ খাঁর পুত্র নিশাদ খাঁ, অনিন্দ্যসুন্দর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ তাবড় তাবড় সঙ্গীত শিল্পীদের আগমনে মিউজিক একাডেমীর গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেবীবাবুর বাড়ীতে এদের ভুরিভোজের ব্যবস্থা হতো।

১৯৭৪ সালে রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে একাডেমীর উদ্যোগে দ্বিতীয় সঙ্গীত সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে একাডেমীর সঙ্গে যুক্ত সমস্ত সঙ্গীত শিল্পী ছাড়াও বোম্বের লতাফৎ হোসেন খাঁ (খেয়াল) আমজাদ আলি খাঁ (সরোদ), আল্লারাখার পুত্র জাকির হোসেন (তবলা) এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।

এরপর ১৯৭৬ সালে দু'রাত্রি ব্যাপী তৃতীয় সম্মেলন হয় ঐ রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে। এই সম্মেলনে একাডেমীর নিয়মিত শিল্পী ছাড়াও যোগ দিয়েছিলেন বিলায়েৎ খাঁ ও তাঁর ভাই ইমরাৎ খাঁ, সুজাত খাঁ, নিশাদ খাঁ, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় (খেয়াল), এম. আর. গৌতম (খেয়াল), মহম্মদ ইউসুফ খাঁ (খেয়াল), বিমল মুখোপাধ্যায় (সেতার) ও নবাগতদের মধ্যে সঞ্জয় মুখার্জী, বিশ্বপতি মজুমদার (সরোদ), মোহন সিং, শঙ্কর ঘোষ, শ্যামল সেন ও রবীন্দ্রমোহন মৈত্র সম্মেলনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এই সব সম্মেলনের আয়োজন হয় অনেকটা Status symbol হিসেবে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এইরূপ সম্মেলনের ব্যবস্থাপনার পিছনে কাজ করে বাণিজ্যিক প্রবণতা। তবে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে শিল্পীদের মধ্যে কদর্য লড়াইও প্রশ্রয় পায়। বর্ধমানে ১৯৭৬ সালের এই সম্মেলনে ঠিক এই রকম একটা কান্ড ঘটেছিল যার ফলে দেবীবাবুকে পর্যন্ত চরম অপমানিত হতে হয়। দেবীবাবু ক্ষোভে ফেটে পড়েন ও বহিলাপাড়া থেকে একাডেমী তুলে দেন।

এরপর একাডেমী নানাস্থান হয়ে কয়েক বছর ছিল। শেষ পর্যন্ত যোশীজির পরামর্শ মত একাডেমী বন্ধ করে দেওয়া হলো। অন্তর্কলহের ফলে একটা সম্ভাবনাময় নান্দনিক প্রতিষ্ঠানের এইভাবে অপমৃত্যু ঘটল।

যোশীজি রয়ে গেলেন পদ্মজা নাইডু মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষরূপে রাজবাড়ীতে। কল্যাণবাবুর প্রতিবেদন থেকে জানতে পারি এরপরেও ১৯৮৯ সালে রবীন্দ্র ভবনে যোশীজির ৭৬ তম জন্মদিন উপলক্ষে বর্ধমানে এক

মহাসঙ্গীত সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অনেক তাবড়-তাবড় সঙ্গীতশিল্পী। যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত ভি. জি. যোগ, পণ্ডিত বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, গিরিজাদেবী, মালবিকা কানন, অজয় চক্রবর্তী প্রমুখ।

এরপরেও যোশীজির টানে অনেক প্রখ্যাত শিল্পী বর্ধমানে এসেছেন। কেউ কেউ এসেছেন একাধিক বার—কেউ কেউ যোশীজির কাছে তালিম নিতেও আসতেন। যোশীজির ভক্ত ও গুণগ্রাহীদের মধ্যে যাঁরা এখানে আসতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিজয় কিচলু, অরুণ ভাদুড়ি, এম. আর. গৌতম, ইমরাৎ খাঁ, নিশাদ্ খাঁ, বাহাদুর খাঁ, দেবু চৌধুরী প্রমুখ।

যোশীজি চেয়েছিলেন বর্ধমানে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের একটা ঘরানা গড়ে তুলতে, একটা পাক্কা গানা সংস্থা, বর্ধমান সঙ্গীত সমাজ, সঙ্গীত ভারতী গড়ে তুলতে। ১৯৯৩ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর এই বিরাট সঙ্গীত প্রতিভার মৃত্যুতে সব পরিকল্পনা পরিকল্পনাই রয়ে গেল। আর বর্তমানে একাঙ্ক নাটিকা, ওয়ান ডে ক্রিকেটের যুগে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রতি লোকের দরদ কমে যাচ্ছে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সম্মেলন হলে দর্শকদের আসনের তিন চতুর্থাংশই ফাঁকা থাকে। লোকের সামর্থও নাই, সময়ও নাই। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে গেলে দিনে ১২ থেকে ১৪ ঘন্টা রেওয়াজ করা দরকার। একটি প্রতিবেদনে পড়েছিলাম জাকির হোসেনের বয়স যখন ৬ বৎসর তখন থেকেই তিনি দিনে ১২/১৪ ঘন্টা রেওয়াজ করতেন। খাবার সময় তাঁর মা খাবার জুগিয়ে যেতেন। তবেই তিনি জাকির হোসেন হতে পেরেছিলেন। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অপর নাম মার্গসঙ্গীত—মার্গ অর্থাৎ পথ—রাজপথ, মার্গসঙ্গীত শেখার কোন রাজকীয় মার্গ বা Royal road নাই। লোকে এখন শিক্ষাদীক্ষা, প্রাত্যহিক কাজকর্ম, যাতায়াত সর্বক্ষেত্রেই Short cut খুঁজছে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কোন Short cut পন্থা নাই। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শোনার, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সমঝদার লোকও কমে গেছে। কে আর ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে খেয়াল, ঠুংরি, ধ্রুপদ, ধামার, টপ্পা, গজলের অস্থায়ী, সঞ্চারী, আভোগ, চৌতাল, সুরফাঁক, যমক এই সব ধৈর্য ধরে শুনবে। রেডিও, দূরদর্শনের ফিল্মি গান, পপ সঙ্গীতের বাজারে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ব্রাত্য হয়ে পড়েছে।

তাছাড়া আজীবন তপস্যা, দিনে ১২/১৪ ঘন্টা ধরে রেওয়াজ এ সবের মূল্য কেউ দেয় না। সরকারও দেয় না। স্মার্ট ধান্দাবাজ, চটপট যারা হিন্দী ইংরাজী বাত ঝাড়তে পারে, যাদের মামার জোর আছে তারাই সরকারী খেতাব পায়, তারাই সম্মানে ভূষিত হচ্ছে। আর যারা নিজদিগকে প্রকাশ করতে পারে না,

তারা নীরবে আপন ঘরের কোণে আজীবন সাধনা করে যাচ্ছেন। এই ভাবেই একদিন হয়ত এই সব দেবসঙ্গীত লোপ পেয়ে যাবে। ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়ে গবেষকদের গবেষণার বিষয় হবে।

Padmaja Naidu Music Academy, সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে এখন মার্গসঙ্গীত সিলেবাসের মধ্যে আবদ্ধ। সঙ্গীত বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গীত শিক্ষা দেবে, ডিগ্রি দেবে, ডক্টরেট দেবে ঠিকই কিন্তু আলাউদ্দিন খাঁ, রবিশঙ্কর, ধ্রুবতারা যোশী, রাধিকামোহন মৈত্র তৈরী করতে পারবে কি? ভবিষ্যৎই এর সাক্ষ্য দেবে।

বর্ধমানে এখন পদ্মজা নাইডু মিউজিক কলেজ ছাড়া ব্যাঙের ছাতার মত আনাচে-কানাচে সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী তন্ময় চট্টোপাধ্যায় ও যুগল মিত্রের পরিচালনায় যে শিক্ষাকেন্দ্র আছে সেগুলির বেশ নাম আছে। এই কেন্দ্র থেকে অনেক উদীয়মান রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী বেরিয়ে আসছে। পারবীরহাটা, বড় নীলপুর, শ্রীপল্লী, খোসবাগান, বোরহাট, নতুন গঞ্জ অঞ্চলেও সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র তৈরী হয়েছে বলেই শুনেছি। আলমগঞ্জে মৃদুল সেনের পরিচালনায় সঙ্গীত শিক্ষা ও নাট্যচর্চার ক্লাস হয়।

বর্ধমানে এখন উদীয়মান শিল্পীদের মধ্যে সবার নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি। সত্যি কথা বলতে সকলের নাম জানিও না।

রাধাকিষেণ পোদ্দাব (সেতার), শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য (এস্‌রাজ ও তবলা) সরোজ দে (বেহালা) অর্ধেন্দুশেখর রায় (সেতার), জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়-অধ্যক্ষা পদ্মজা নাইডু কলেজ (সেতার), বিশ্বপতি মজুমদার (সরোদ), নেপাল আঢ্য (খেয়াল)। বিমল মিত্র (পুরাতনী গান), মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় (টপ্পা), তন্ময় চট্টোপাধ্যায় (রবীন্দ্রসঙ্গীত), রমেন সরকার, তৃপ্তি চট্টোপাধ্যায় (নজরুলগীতি), কুমকুম বিশ্বাস (ঝুমুর / ভাটিয়ালী), জিয়াউর রহমান, পুর্ণেন্দু দাস (আউল-বাউল), বিশ্বরূপ চক্রবর্তী (লোকগীতি), উজ্জ্বল নন্দী, মণিকা ঠাকুর, মানসী মুখোপাধ্যায়, স্বাতী তেওয়ারী, উজ্জ্বল ঘোষ, অজয় দে (আধুনিক)।

দুর্গাপুরে আঢ়াগ্রামের লক্ষ্মণ দাস, গোপাল বাগচী (লেটো ও পৌরাণিক গান), বুদ্ধদেব সেনগুপ্ত, সোনালী দত্ত, লীনা কোনার, শাশ্বতী বসু, সুনন্দা মুখোপাধ্যায় (আধুনিক ও রবীন্দ্রসঙ্গীত) স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বেশ নাম করেছেন।

আসানসোল অঞ্চলে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্তের গান, শ্যামাসঙ্গীত প্রভৃতি গান নিয়ে রীতিমত চর্চা হয়। দিলীপ মণ্ডল, দিলীপ দাস পৃথ্বীশ চক্রবর্তী, শম্ভু চক্রবর্তী সঙ্গীতে ভাল নাম করেছেন।

শিল্পাঞ্চলের গানের সম্রাট ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। যদিও তাঁর ক্ষেত্র ছিল কলকাতা, কিন্তু তিনি তো চুরুলিয়ারই সন্তান, কাজেই শিল্পাঞ্চল তাঁকে তাঁদের সঙ্গীত-সম্রাট বলে দাবী করতেই পারে। তাঁর গানের সংখ্যা তিন হাজার ছাড়িয়ে যাবে। এখন পর্যন্ত ২৮৭২ গানের সন্ধান পাওয়া গেছে। নজরুল তাঁর সঙ্গীত জীবনের শেষ পর্বে সতেরোটি নতুন রাগ সৃষ্টি করেছিলেন। নতুন রাগ সৃষ্টির পশ্চাতে হয়তো তাঁর অভিপ্রায় ছিল—প্রচলিত রাগের প্রভাব এড়িয়ে বাংলা গানের সুর বিন্যাসে মৌলিক ছাঁদ নির্মাণ করা। এই সমস্ত নতুন রাগের মধ্যে বেণুকা, সন্ধ্যামালতী উল্লেখযোগ্য। কোন কোন গানে মধুমন্তী, মূলতানি ও খাম্বাজ গানের আভাস পাওয়া যায়। "যেহেতু রাগসঙ্গীতে সুরের সামঞ্জস্য সর্বাধিক সাধিত হয়, একটি নির্দিষ্ট প্রকরণ মেলে, সেই হেতু তিনি সুর সামঞ্জস্যের পরাকাষ্ঠা হিসেবে রাগসঙ্গীতকে আদর্শ গণ্য করেছেন।" (দেশ, ১২.৬.৯৯)

লোকসঙ্গীত : বর্তমানে লোকসঙ্গীতের বেশ জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত আর লোকসঙ্গীতের মধ্যে একটা মৌখিক পার্থক্য আছে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত মূলত গুরুমুখী বিদ্যা, শুধু শাস্ত্রীয় সঙ্গীত কেন, আধুনিক গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত, রাগসঙ্গীত এই সমস্ত সঙ্গীত শিখতে গুরুর প্রয়োজন হয় কিন্তু লোকসঙ্গীত আপনা থেকেই আসে গোষ্ঠীয় প্রথায়, লৌকিক আচারের মধ্য দিয়ে। তবে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতের মধ্যে বিরোধ নেই। দুটোর ক্ষেত্রই আলাদা। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সমাজের উঁচু তলার লোক উপভোগ করে। অন্য দিকে লোকসঙ্গীতের রসও তাঁরা আস্বাদন করতে থাকেন। লোকসঙ্গীত লোক আপনি সৃষ্টি করে চলেছেন, নৌকার হাল বাইতে বাইতে, শ্রমিকরা ছাদ পেটাতে পেটাতে। এর জন্যে কোন গুরুর দরকার হয় না। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন বিচিত্র, মানুষজনও তেমনি বিচিত্র। কোথাও রুক্ষ পাথুরে ল্যাটেরাইট মাটি, আবার কোথাও শুকনো ডাঙা, কোথাও নরম থুসথুসে পলিমাটি, কোথাও নদী উদ্দাম গতিতে ছুটে চলেছে আপন মনে। আবার কোথাও হাঁটুজল, কোথাও শ্রাবণের ধারা, আবার কোথাও রুদ্র বৈশাখের প্রচণ্ড খরা। বিচিত্র পরিবেশে মেহনতী মানুষের রুজি-রোজগারের পদ্ধতিও বিচিত্র; কোথাও কামারশালার "ঠকা ঠাঁই ঠাঁই কাঁদিছে নেহাই, আগুন ঢুলিছে ঘুমে", আবার কোথাও "টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল, ওরা মাঠে মাঠে বীজ বোনে পাকা ধান কাটে। ওরা কাজ করে নগরে প্রান্তরে।"

এক এক জেলার এক এক বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য যেমন আহারে-বিহারে, পোশাকে-আশাকে, তেমনি বৈশিষ্ট্য কথার টানে, গানের সুরে। কিন্তু নিত্যদিনের

দুঃখের মধ্যে আছে মাটির গান। এই গানের স্রষ্টাও লোকসাধারণ—তৃণমূল সমাজ—সুরকার তারাই, গায়ক-গায়িকাও তারা। শত দুঃখের, শত অভাব অভিযোগের মধ্যেও এই মাটির গান—"এদের দুঃখের সান্ত্বনা, আনন্দের উচ্ছ্বাস, বঞ্চনার মধ্যে আবার বুক বেঁধে দাঁড়াবার প্রেরণা"।

অঞ্চল ভেদে গানের আলাদা রূপ, আলাদা সুর, আলাদা ছন্দ গ্রাম-বাংলার উৎসবে প্রাঙ্গণে, মেলার অঙ্গন, হরিসভার আসরে, চণ্ডীমণ্ডপের চত্বরে, শিবঠাকুরের দেউলে ও সত্যপীরের দরগায় বসে এই গানের আসর। এ গানের শক্তিই আলাদা। এ গান প্রাণশক্তিতে ভরপুর; তাই এই গান আজকের ভিডিও, টিভির যুগে টিকে আছে, ভবিষ্যতেও টিকে থাকবে।

মাটির গানের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে অঞ্চল ভেদে কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতা, মাটির রুক্ষতা ও সরসতার ওপর। সেই অনুসারে এক এক অঞ্চলে এক এক রকম গানের প্রাধান্য। যেমন কুচবিহার, দার্জিলিং, দিনাজপুর অঞ্চলে, ভাওয়াইয়া গান বা মহিষ বাথানের গান, মালদহের গম্ভীরা গান, লেটো গান, বীরভূমের বাউল, নদীয়া মুর্শিদাবাদের বোলান গান, আলকাপ।

সেই হিসেবে বর্ধমানের নিজস্ব কোন মাটির গান না থাকলেও রাঢ় ভূমির আঞ্চলিকতা বিশেষে তুষু, ভাদু, ভাঁজো, ঘেটু, কবিগান, পটুয়ার গান, ময়ূরপঙ্খী গান, বোলান, পাঁচালী ও কৃষ্ণযাত্রা, কীর্তন সব রকম গানের সমাবেশ ঘটেছে এখানে।

পাঁচালী গান : বর্ধমান জেলার লোকসংস্কৃতির একটি অপ্রধান ধারা জেলার পাঁচালী গান। পৌরাণিক ও অপৌরাণিক ঘটনাবলীর কাব্যরূপ পাঁচালী। পাঁচালীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দাশু রায়ের পাঁচালী, সত্যনারায়ণ পাঁচালী, সত্যপীরের পাঁচালী। সত্যনারায়ণের পাঁচালী পূজা শেষে পুরোহিত ঠাকুর সুর করে পড়েন; সত্যপীরের গানের মত বাড়ী বাড়ী এ গান গেয়ে বেড়ানো হয় না।

কিন্তু সত্যপীরের গানের প্রচলন জেলায় আছে প্রায় সর্বত্র। মুসলমান ফকির এক হাতে তসবীর, মালা আর এক হাতে চামর নিয়ে বাড়ী বাড়ী সত্যপীরের পাঁচালী গান গেয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায়। এ চামর কিন্তু চমরী গাই-এর লেজের চুল দিয়ে তৈরী নয়। এ চামর আগের কোন মুসলমান পীর বা সাধু-সন্তের মাথার চুল নিয়ে তৈরী।

সত্যপীর সত্যনারাণ সত্য যাহার নাম
দেখো পীর পাথারে ভাসাইও না।
কিংবা হিন্দুর দেবতা তুমি মুসলমানের পীর
দুই কুলেতে পূজা লও, দুই কুলে জাহির॥

সত্যপীরের পালাগানও হয়। কীর্তনের মত একজন মূল গায়েন যেই হাতে চামর নিয়ে গান শুরু করে, আর চার-পাঁচজন দোহার ধুয়ো ধরে। বাজ্না ঢোলক ও জুড়ি। বর্তমানে হারমোনিয়াম ও ফুলুটের চলও হয়েছে। মূল গায়েন পীরের গান গেয়ে যান, মাঝে মাঝে গদ্যে ব্যাখ্যা করেন; শ্রোতাদের মধ্যে কেউ পয়সা ছুঁড়ে দেয়। গায়েন তার মাথায় চামর ঠেকিয়ে 'পীরের দোয়া' কামনা করেন। কীর্তনের গৌরচন্দ্রিকার মত প্রথমে পীরের বন্দনা গান, তারপর পালাগান ও মাঝে মাঝে গদ্যে ব্যাখ্যা। নৃত্যের ভঙ্গিমায় গানের আসর মাত্ হয় আর মাঝে মাঝে ঢোলকের বাজ্না।

সত্যপীরের গান সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র সেন মন্তব্য করেছেন, বহুদিন একত্র বাস নিবন্ধন হিন্দু ও মুসলমানগণ পরস্পরের ধর্ম সম্বন্ধে কতকটা উদারভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। সত্যপীর নামক মিশ্র দেবতার পূজা সেই উদারতার ফল। হরিঠাকুর এই উপলক্ষে ফকিরি আলখাল্লা গায় ও উর্দু জবানে বক্তৃতা দিতেছেন "বিশ্বনাথ বিশ্বাসে বুঝিয়ে বলে বাছা। দু'নিয়ামে এসাভি আদমি রহে সাঁচা॥ ভালা বাত্তয়া কাছে তেরা মৃত্যুকাল কাছে। রাত দিন যৈসা তৈসা সুখ দুঃখ হোয়ে। জানা গেও বাত বাওয়া জানা গেল বাত। কাপড়াত লেও আও মেরা সাথ॥ জীঅ ওত সত্যপীর, মেরা জাওত সত্যপীর। তেরা দুঃখ দূর করত ওই হাম ফকির॥"

ভট্টনারায়ণ বংশোদ্ভুত রামেশ্বর ভট্টাচার্য যদুপুরে বাস করার সময় 'সত্যপীরের কথা' রচনা করেন। "সত্যপীর বন্দী কহে কবি রাম। সাকীন বরদাবাটী যদুপুর গ্রাম।"

ফয়জুল্লা রচিত সত্যপীরের পাঁচালীর নমুনা :

এবে কহি সত্যপীর অপূর্ব কখন।
মুনি-রস-বেদ-শশী শাকে কহি সন।
কহিলাম সভ কথা শুনিলাম যত।
গাজীর বিজএ সেই মোক হইল রাজি॥
ধন বাড়ে শুনিলে পাতক খণ্ডন।
সেখ ফয়জুল্লা ভনে ভাবি দেখ মন॥

সুকুমার সেনের মতে—"মুনি-রস-বেদ-শশী" পাঠ ভ্রান্ত, হবে—'মুনি-বেদ-রস-শশী''। তাহলেই রচনাকাল দাঁড়ায় ১৬৪৭ শক (১৭২৫–২৬ খ্রীষ্টাব্দ)। বর্ধমানের পশ্চিম প্রান্তে গোদার মহম্মদ মতিনের "ইসলাম-নবী-কিস্‌সা"—নামক নবীর গান আছে।

মতিনে রচিল কেচ্ছা আশা নবীর পা এ।
চড়িনু সবুরের নাএ কাণ্ডারী খোদা এ॥

তবে এ সব গান ফকিররা—যারা ভিক্ষে করতে আসে তাদের গানে শোনা যায় না। রফিকুল ইসলাম সাহেব সত্যপীরের পালাগানের দু-একটি উল্লেখ করেছেন।

বন্দনা গান :

আমার দয়াল সাগরের পীর জানে কত ছল গো
সত্যপীরের বর্ণনা ভাই ডালিমের ফুল গো।
মুশকিল আসান করো দয়াল মানিকপীর ॥

এক সময় গৃহপালিত পশুপক্ষীর রোগ নিরাময়ের জন্য মানিকপীরের দরগায় পুজো দেওয়া হতো, তবে মানিকপীরের গানের প্রচলন এখন আর বিশেষ নাই।

মুর্শিদা গান : মুর্শিদা গানকে অনেকে ফকিরি গানও বলে। 'মুর্শিদা' শব্দের অর্থ হলো 'গুরু'। সুতরাং মুর্শিদা গান হলো গুরুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত গান। পল্লী বাংলার ফকির দরবেশরা গুরু বন্দনায় এই আধ্যাত্মিক রসের গান পেয়ে থাকেন। এই গান কতকটা বাউল গানের মত। বাউল আর ফকিরে বিশেষ ভেদ নাই। শরীয়তে সন্দিহান মুসলমানরা যখন মারফতী পথ বেছে নেয় তখন তাদের ফকির বলে। বাউলদের মতে আসল ফকিরি তত্ত্ব চারটি।

আউলে ফকির আল্লাহ্ বাউলে মোহাম্মদ।
দরবেশে আদম ছফি এই তক হদ।
তিন মত এক সাত করিয়া যে আলি
প্রকাশ করিয়া দি সাঁই মত বলি।

(উচিত কথা—কেবামতুল্ল্যা ও গোলাম কিবরিয়া)

মুর্শিদা গান বা ফকিরি গানে হিন্দু-মুসলিম মিলনের কথাও আছে।

মুশকিল আসান করো দয়াল মানিকপীর।
হিন্দু যদি ফুল হয় মুসলমান হয় ফল।
হিন্দু যদি মেঘ হয় মুসলমান জল ॥

রফিকুল ইসলাম সাহেব জেলার বিভিন্ন অংশ থেকে বিশেষ করে দামোদর অঞ্চলের ফকির কাদের সাঁই ও মাজেহার ফকিরের কিছু গান সংগ্রহ করেছেন। রফিকুল সাহেবের মতে এগুলি নির্ভেজাল ফকিরি গান :

সংসার এসে
কেন রইলি বসে

কাটল না তোর দিশে
ওরে খ্যাপা মন।
*** *** ***
সংসারের যে সার তারে নাহি চিনি,
অসারকে জেনে সার বসে আছি আমি,
এখন কোন কুলে যাবি মন
তাই বলি শোন।
কুলের মুখে দিয়ে ছাই,
চল না মন, সাধ বাজারে যাই,
আর কি তোর আছে রে ভয়
ভয়ের নাই কারণ।
কাদের সাঁই বসে ভাবে,
সেদিন আমার কবে হবে,
গুরু আমায় চেতন দেবে
লাথি মেরে কখন।

মাজেহার ফকিরের একশ বছর আগেকার গান :

মন আপন আপন বল কারে
এসে এই সংসারে
পড়লি মায়ার ফেরে,
রেখো দু'জন চোরে খুব হুঁশিয়ারে॥
অতি যত্নের পালি, খাওয়াই দুধ ছানা,
পালাই পালাই করে ঘরেতে টেকে না,
এমনি তার পোষ মানা ডাকিলে সে জনা
এক দন্ড থাকে না হৃদয় পিঞ্জরে।

ফকিরি গানের মধ্যে বাউল গানের তত্ত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। সুরও অনেকটা বাউল গানের মত। সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ এই গানগুলি লোকসংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ।

বাউল গান : বাতুল, ব্যাকুল, আউল প্রভৃতি বিভিন্ন শব্দকে 'বাউল' শব্দের উৎস বলে মনে করা হয়।

দশম শতকের কাছাকাছি দেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে। তারই একটি শাখা সহজযান। সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে বৈষ্ণব সহজিয়া মতের

উদ্ভব। এই ধর্মমতের সঙ্গে যুক্ত হয় সুফী মতবাদ যা চৈতন্যের ধর্মমতের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এরই পরিণামে সপ্তদশ শতক নাগাদ বাউল নামে একটি স্বতন্ত্র ধর্মমত ও ধর্ম-সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। বাউল সঙ্গীত বাউল সম্প্রদায়ের অধ্যাত্ম সাধনার কথা। গীতিকার দুদ্দু শাহ-এর মতে "যে খোঁজে মানুষে খোদা, সে-ই তো বাউল।" আরবীতে 'বা' মানে 'আত্ম' আর 'উল'-এর অর্থ 'সন্ধানী' অর্থাৎ বাউল-এর অর্থ আত্মসন্ধানী।

গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী উভয় রূপেই বাউলদের দেখা যায়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে বাউল রূপে সাধন-ভজনে আকৃষ্ট হতে দেখা যায়। এদের কাছে বেদবিধি, পুরাণ, কোরান সব কিছুই অর্থহীন, বাউলের ঈশ্বর প্রেমের ঠাকুর, মনের মানুষ। জীবনের কোন বন্ধনই বাউলদের বাঁধতে পারে না। বাউল ঘর ছাড়া, প্রেমের ঠাকুরের খোঁজে দিশেহারা।

বাউল গানের বাদ্যযন্ত্র বাউলের সঙ্গেই থাকে। একতারা, খঞ্জনি, ঝুনুক, ডুগি, খমক। বাউলের পোশাক গৈরিক বা ফিকে লাল আলখাল্লা, ধুতি, কোমরে চাদর জড়ানো, মাথায় পাগড়ি, কপালে তিলক। ডুগি কোমরে জড়ানো চাদরে পেটের কাছে বাঁধা, হাতে একতারা, কিংবা বাম বগলে গুপিযন্ত্র, পায়ে ঘুঙুর, ডুগির সঙ্গে খঞ্জনি যুক্ত থাকে, ডুগি বাজাবার তালে তালে খঞ্জনির ধ্বনি ওঠে। ঘুরেফিরে নেচে নেচে বাউল গেয়ে যায় আত্মহারা হয়ে।

গানের ভাষা দ্ব্যর্থক। সহজ অর্থ হৃদয় গ্রাহ্য। গভীর অর্থটি বাউলই বোঝে। "এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে; কোরানে পুরাণে ঝগড়া বাধে নি।" (রবীন্দ্রনাথ)

বাংলার বাউলের ক্ষেত্র বীরভূম জেলা। কিন্তু বীরভূম যদি উত্তর রাঢ় হয়, বর্ধমান দক্ষিণ রাঢ়। এ জেলাতেও গৃহী বাউল, ঘরছাড়া বাউল, আখড়াই বাউল, সাধক বাউল দেখা যায় অগ্রদ্বীপ, কালনা, কাটোয়া, রায়না, জামালপুর অঞ্চলে।

বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়ায় প্রতি বছর নির্দিষ্ট দিনে বাউল সমাবেশ ঘটে। এই সমাবেশের মূলে সহজিয়া বৈষ্ণবদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বর্ধমানের অগ্রদ্বীপের ঘোষ ঠাকুরের শ্রাদ্ধে কৃষ্ণমূর্তি গোপীনাথ চৈত্র একাদশীতে শ্রাদ্ধ করেন কাছা পরে। আদিত্য মুখোপাধ্যায় বাউলদের নিয়ে কাজ করে দেখেছেন— বেশীর ভাগ বাউল নিজেদের বৈষ্ণব বলে প্রচার করেন। রূপ-রাগ হয়ে বাউল পৌঁছায় ভাবে।

পূর্বে বোধ হয় বাউলদিগকে উচ্চবর্ণের মানুষ নিজেদের সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখত। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর Hindu castes

and sects গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন। The Bowls are low class men and make it a point to appear as dirty as possible, (The Hindus) can only punish them by keeping excluded from the pale of humanity.

গীতিকার দুদ্দুর কিন্তু বাউল আর বৈষ্ণব বাউল এক নয় বলে মন্তব্য করেছেন :

বাউল বৈষ্ণব ধর্ম—এক নহে তো ভাই
বাউল ধর্মের সাথে বৈষ্ণব যোগ নাই।
বিশেষ সম্প্রদায় বৈষ্ণব
পঞ্চতত্ত্বে করে জপতপ
তুলসী মালা, অনুষ্ঠান সদাই।
বাউল মানুষ ভজে
যেখানে নিত্য বিরাজে
বস্তুর অমৃতে মজে
নারী সঙ্গী তাই।

অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে আগেকার বাউলের পরিচয় দিয়েছেন।

"এই সম্প্রদায়ীরা তিলক ও মালা ধারণ করে এবং এই মালার মধ্যে স্ফটিক, প্রবাল, পদ্মবীজ, রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি থাকে। ডোর কৌপিন ও বহির্বাস ধারণ করে এবং গায়ে খেলকা পিরাণ অথবা আলখাল্লা দিয়া, ঝুলি, লাঠি, কিস্তি লইয়া ভিক্ষা করিতে যায়। ক্ষৌরী হয় না, শ্মশ্রু ও ওষ্ঠ লোম প্রভৃতি সমুদায় বাঁধিয়া রাখে। এর সঙ্গে একতারা, ডুগী, খমক সারিণা বা দোতারা এদের নিত্য সঙ্গী। গলায় কণ্ঠী, কপালে তিলক আর সাধন-সঙ্গী নারী তবে সব বাউলের এই পোশাক থাকে না। মেলায় খেলায় যে সব বাউল আসে তাদের অধিকাংশেরই গায়ে হলদে বা লাল আলখাল্লা। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তালিমারা। তালি কিন্তু ছেঁড়া আল্লাখাল্লায় পটী দেওয়া নয়। এর মধ্যে তত্ত্ব আছে এবং এদের সংখ্যাটিও রহস্যময়। কেউ কেউ কালো পোশাক পরে, তবে এদের সংখ্যা কম। এরা ফকিরি সম্প্রদায়। এদের কারও কারও আবার সাদা পোশাকও থাকে। অগ্রদ্বীপের বারুণী মেলায় সুফী, ইসলামী ও বাউল মতের সমন্বয়ের ধারার ঐতিহ্যবাহী সাহেবধনী সম্প্রদায়ের সমাবেশ ও মহোৎসব হয়।"

বাউলদের সাধন-সঙ্গী থাকে; কারও একটা, আবার কারও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সাধন-সঙ্গী। তবে এদের ছেলেপিলে বিশেষ হয় না। এর কারণ

অনেকে মনে করেন, চারি চন্দ্র ভেদ পালন অর্থাৎ এরা মল, মূত্র, রজঃ, বীর্য পান করে। যার ফলে শরীরে একটা antibody তৈরী হয়। তবে এ জেলায় এসব উন্নত সাধক পর্যায়ের বাউল—এরকম "মুত খেকো" বাউল নাই বললেই হয়। অগ্রদ্বীপের বাউল, গলসীর বেতাল-বনদ্বার-নড়ীর নিতাই ক্ষেপা বাউল, পাঁচলখির যদুবিন্দু বাউল জেলার বাউল-সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে।

বাউল গানের নমুনা :

১ আমার বাবা দেখছে মজা
মা ঘুমালো অঘোরে
মদনা, চোর ঢুকেছে ঘরের ভিতরে,
চোরের এমনি কাণ্ড কারখানা
চোর কোন দ্রব্য যে নেবে না
সে সদাই করে আনা গোনা।
শুদ্ধমতি আছে যার
তার সাথে করে পীরিতি।
চোরের সাথে করে পীরিতি
জ্বলছে অনল ধিকি ধিকি
মোদের অন্তরে।

২. সহজ ভজন কঠিন করণ
যে পারে এই সহজের ঘরে
সহজ ভজন না যায় লিখন
আছে বেদবিধি পরে॥
বেদবিধি পার সৃষ্টি ছাড়া
সহজের করণ নিহারা।
হতে হয় জীয়ন্তে মরা
আগুন পারা সে ধারা।
(যদুবিন্দুর গান)

৩. আমার এই কাদামাখা
সার হলো
ধর্মমাছ ধরব বলে
নামলাম জলে,
ভক্তিজাল ছিঁড়ে গেল।

কেবল হিংসে-নিন্দে গুগলি
ঘোঙা পেয়েছি কতকগুলো ॥
(যদুবিন্দুর গান)

৪. মনের মানুষ পেলাম কই
আমি মন খুলে কথা কই
আমায় আশার গাছে তুলে দিয়ে
হায়রে কেড়ে নেয় মই।
আমি যারে ভালবাসি
সে আমারে জানায় দোষী
মনে মনে কষাকষি
মনের মানুষ পেলাম নাই।
ছিলাম রাজা, হলাম গোলাম
স্বর্গ থেকে মর্তে এলাম
মানুষ কোথায় পেলাম সই।
ভবা পাগলা মানুষ খোঁজে
সদাই থাকে চোখটি বুজে
মনের মানুষ মনে আছে
তারও নাগাল পেলাম কই

এর সঙ্গে তুলনীয় লালন ফকিরের গান :

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে
আমি হারায়ে সেই মানুষে।
ঘুরে মরি দেশে বিদেশে।

৫. মন যেদিন যাবি দেহ ছেড়ে
সবাই কথা যাবে ভুলে,
থাকবে যারা পুত্র কন্যা
দেখবে কি আছে ঝুলি খুলে।
যাবে থেকে দোকান দারি
জমাইনি তো টাকাকড়ি
বানাইনি দালান বাড়ি
কাঁচা বাঁশে দড়ি বেঁধে

চার জনেতে কাঁধে তুলে
নিয়ে যাবে হরিবোলে ॥
দয়াময় তাই দেখে শুনে
ভাবছি বসে আপন মনে
কি হবে ভাই পরিণামে—

৬. বেতালবনের নিতাই ক্ষেপার গান :—

আছে মানুষ মানুষেতে
যে পারে মানুষ দেখিতে চিনিতে
সবার হুঁস হয়ে মানুষ লয়ে
ফিরছেন সদা তিনি হুঁসেতে।
যদি মানুষ হতে খোঁজ
তবে মানুষে, মানুষ ভজ;
ক্ষ্যাপা নিত্য বলে নিত্য পূজ
এই মানুষের চরণেতে।

চক্ষনজাদী হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক বিভূতি ভট্টাচার্যের কাছে শুনেছি রায়না থানার জামদোয় (জামুদহ) নরেশপন্থী বাউলের আবির্ভাব ঘটেছিল।

বর্ধমান জেলার এক অখ্যাত গ্রাম কিশোরীগঞ্জে (সমুদ্রগড় থেকে যেতে হয়) মহিলা বাউলের আখড়া আছে। আখড়া গড়ে তোলেন ননীবালা বাউল। ননী ক্ষেপী নামেই তাঁর পরিচয়। ননীবালা এসেছিলেন ফরিদপুর থেকে। তাঁর সাধনসঙ্গী রাধেশ্যাম। ননীবালা বাউল গান ছাড়াও মুর্শিদা গান, ফকিরি গানও গাইতে পারেন। ইনি তাঁর গানের মধ্যে খুঁজে ভাবোন্মাদ বাউল মনকে, বাউল গানই দরিদ্র ননীবালার জীবনের সব—জীবনের সাধনা। ইনি গান করেন হাউড়ে গোঁসাই, অগ্রদ্বীপের মীরা মোহন্ত, নীলকণ্ঠ, যদুবিন্দু, লালন ফকির বাউলদের রচিত গান। মহিলা বাউলদের মধ্যে ফুলমালা দাসী, ছায়া, অনিমা, মা গোঁসাই, নির্মলা গোঁসাই-এর নাম পাওয়া যায়। এঁরা সব জড় হয় প্রতি বছর জয়দেবের কেঁদুলি, ঘোষপাড়া, অগ্রদ্বীপ, সোনামুখীর মেলায়। বাউলনীর গানের নমুনা :

১. সেই পদ্মের আশে চণ্ডীদাস
বারো বছর রইলো বসে বিনা আহারে
শেষে রজকিনী কৃপা করে
তারে দেখিয়ে দিল পদ্মবন
ক্ষ্যাপা পদ্মমধু খাবি যদি মন।

২.   নারীর কাম সাগরে যে জন মজে
                    তার বাড়ে নাইকো বুদ্ধি বল
          নারী হলো ভাই, নারী হলো ভাই
                    পুরুষ মারার কল॥

বাউলরা কেবল বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়ার সম্পদ নয়; বাংলার বাউল এখন পৃথিবীর সম্পদ।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় এর কথায়—The Bowl of course having been granted cultural benediction in the twentieth century by its elevation to the status of an export item in the Festival of India circuit.

এই রপ্তানি যোগ্যতার কার বাউলের বহু বর্ণিল পোশাক, গুপি যন্ত্র, মাথায় ধর্ম্মিল্ল ও নাচের চমৎকার ভঙ্গী—একেবারে শো-পিস। অনুষ্ঠান জমাতে অদ্বিতীয় গঞ্জিকাপ্রিয় এই বাউল সমাজ বিদেশে মুক্ত সমাজেও যৌন স্বাধীন যুবমানসে সাড়া তুলেছে। কিন্তু সুফি পোশাকে সজ্জিত পূর্ণ দাসদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। জেলার অধিকাংশ বাউলই ভিক্ষাজীবী, আখড়াবাসী বা গৃহী। "আপন সাধন কথা / না কহিব যথা তথা।।—এই অন্তর্বাণী মেনে বাউলরা বরাবর নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে থেকে কায়া সাধনা ও গান গেয়ে এসেছেন।" (দেশ, ১৮।১।৯২)

বিয়ের গান : হিন্দু, মুসলমান, এমনকি আদিবাসী সমাজের বিয়ের গান, লোকসংস্কৃতির একটা অঙ্গ। বিয়েতে পান, সুপুরি, সিঁদুর দিয়ে হিন্দু সমাজে ঢেঁকি মঙ্গলা, তাছাড়া নিশিজল আনা, গায়ে হলুদ দেওয়া, হস্তবন্ধনী, বাসর জাগানো, সুতো খোলা, ঘাটে থালা হারানো প্রভৃতি নানা স্ত্রী-আচারের অনুষ্ঠানের রীতি এখনও পল্লীসমাজে কিছু কিছু বজায় আছে। স্ত্রী-আচারের অনুষ্ঠানে মেয়েরা মাঙ্গলিক অঙ্গ হিসাবে নানারকম গান করে, বাসরঘরে নতুন জামাইকে ঘিরে পাড়াপড়শী, শালীরা নানারকম গানের আসর জমায়। ছাদনাতলায় নাপিত গানের সুরে এক রকম ছড়া বলে। তবে বাসর ঘরে যে গান এখনও হয় সে সব বেশীর ভাগ সিনেমার রোমান্টিক গান। সেগুলি লোকসংগীতের পর্যায়ে পড়ে না।

মুসলমান সমাজেও মেয়েরা এক জোট হয়ে ঢোলক নিয়ে বিয়ের গান করে। এই সব গানের মধ্যে কনের বাপের বাড়ী ছেড়ে যাবার দুঃখ ফুটে ওঠে।

১.   জামাই যেন মোর যমের মুখ
                    বেটির কান্নায় ভেসে যায় বুক।

***   ***   ***

তার-ই-তসম মেয়ে আমার
জামাই কেন মোর কালো গো।
হোক না মা তোর কালো জামাই
আঁধার ঘরে আলো গো।

২. ছোট কালে পড়তে দিলেন
আব্বাজান,
কালো ময়নার সাথে গো,
এখন কেনে কাঁদছেন
আব্বাজান
গাড়ির মওড়া মুড়ো ধরে
ছাড়েন ছাড়েন গাড়ির গো মওড়া
দূরে শ্বশুর বাড়ী গো।

হিন্দুদের বিয়ের গান :

এলাম সই তোদের বাড়ী মালা দিতে
মালা দিতে গো সজনী বর দেখিতে।
রসের মালিনী আমি,
রসের খেলা কতই জানি,
প্রেম বিরহে বিরহিণী
পারি লো সব ভুলাতে।
এ মালা পরলে গলে
থাকবে লো তোর পতি ভুলে
রাঁড়ের গলায় লাথি মেরে
নাচবে লো তোর সাথেতে।

(কিছু গান রফিকুল ইসলামের জামালপুর অঞ্চল থেকে সংগ্রহ)

তবে বর্তমানে পল্লীর মুসলমান সমাজে নগনধরা, বিয়ের অন্দরে ঢোলকের বাদ্যসহ এরকম গান শোনা যায় কিন্তু হিন্দুদের বিশেষত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বিবাহে এখন আর এ সব গানের রেওয়াজ নাই। আদিবাসীদের মধ্যে বিয়ের গানের প্রচলন এখনও আছে।

এদের বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে মাদল, ঢাকের আকারে বিরাট ঢোল আর নিজেদের তৈরী আদিবাসী ব্রাণ্ডের বেহালা। এ বেহালার সাউণ্ড বক্স তৈরী হয় একটা নারকেলের মালার ওপর পাতলা চামড়ার আস্তরণ দিয়ে। ছাতার বাঁটকে আশ্রয়

করে থাকে এই নারকেলের মালা, এই ছাতার বাঁটের বাঁকা দিকটায় গোটা দুই ছিদ্র করে একটা তারকে টান টান করে বাঁধা হয় ওপরের একটা বড় পুঁতির সঙ্গে। ধনুকাকৃতি ছড়ের সাহায্যে বাজানো হয়।

এদের বিয়ের গানের মধ্যে কনের স্বামী ঘরে যাবার সময় বাপের বাড়ী ছেড়ে যাবার বেদনা সুর সুস্পষ্ট ফুটে ওঠে।

(১) বারো বছরের বর
তের বছরের কনে
বলি অহে দেখোরে বর কন্যে
হাতে নিয়ে তেলের মালি সকালে চাল বিটি গো
কাকে দিলে গো মা হলুদ রাঙা সরু কাপড়
শাশুড়ি মা দিলে আভরণ।
ছোট থেকে বিয়ে হলো
ছোট বড় গেরাম দেখে পরাণ উড়ে যায়।
গুড় বিকায় শালে
মেয়ে বিকায় কোলে
ধান চাল বিকায় বার মাসে।

(গানটি সাহিত্যিক চিত্ত ভট্টাচার্য্যের সংগ্রহ "রাঙামাটি"—
১ম বর্ষ ২য় সংকলন ১৩৬৯-তে প্রকাশিত)

সাঁওতালদের ব্যর্থ প্রেমের গান :

(২) প্রথম যুবক
শালুক ঝরণ রিলা মেলা
দাদাবাবু জাম বাগি কদম
ঝটা লাটার তুমবা দারে
জিদো রেবে কেডো।

(অর্থ : নায়ক–শালুক ফুল ঝরনা জলকে মলিন করেছে। তুমি অন্য কোন মেয়েকে ভালবেসেছ। তাই আর আমার তোমার প্রতি আর কোন আসক্তি নাই।)

২য় স্তবক :
আসবোকো ইদিয়েত্তাম ইনঘোকো
বহু আইকম
উমে রেগেটাং রাপিলি নদা মিলওয়া
ওনদে গেটাং রবা শপাদে।

(অর্থ : তোমার বিয়ে ঠিক হয়েছে, আমিও তাই বউ আনতে যাচ্ছি। শালুক ঝরনার ধারে আমাদের প্রতিশ্রুতি ভুলে যাও, যদি কোনদিন কোন খানে দেখা হয় তবে আগের কথা মনে করো)

সূত্র : দেশ পত্রিকা, ১.৭.৭২
(তুষাররঞ্জন পত্রনবিশ)

ময়ূরপঙ্খীর গান : খণ্ডঘোষ থানার নাড়ুগ্রামে নাড়েশ্বর শিবের গাজনে ময়ূরপঙ্খী গান এখনও শুনতে পাওয়া যায়। গরুর গাড়ীর ওপর বাঁশ বাখারির কাঠামো করে নানা রঙে রঙীন কাগজ ও রঙীন কাগজের শিকল তৈরী করে ময়ূরপঙ্খীর রূপ দেওয়া হয়, তার ভেতরে গায়করা ঢোল কাঁসি সানাই নিয়ে বসে হর-গৌরীর গান গাইতে গাইতে গ্রাম পরিক্রমা করে। কখনও কখনও কৃষ্ণ গোপীর গানও গাওয়া হয়। সামাজিক উল্লেখযোগ্য সাময়িক সমস্যাও কখনও কখনও এই সব গানের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। কখনও কখনও দু / তিনটি দলের মধ্যে চাপান উতোরও চলে।

কৃষ্ণ গোপীর গান : দুটি দলের ময়ূরপঙ্খী থাকলে এক দল কৃষ্ণের পক্ষ ও অন্য দল গোপীর পক্ষ নেয় ও তরজা গানের মত উভয় দলে চাপান উতোর চলে। গানের প্রতি কলি গাইবার আগে "আরে ঐ" ধুয়ো ধরতে হয়।

(১) কৃষ্ণ ॥ আরে ঐ গোপী শোন আমার বর্ণনা
গানের জবাব করবো আমি শুনবে দশজনা
আরে ঐ, সেহতরী হয় কাণ্ডারী শোন বর্ণনা।

গোপী ॥ মাঝি, পারবে কি পার করিতে,
প'ড়েছে বান ভীষণ তুফান
কু-বাতাস তাতে।
আরে ঐ রাধার পানে চেয়ে আছো
আড়নয়নেতে...

(২) *বন্দনা গান :*

"একবার এসো জগৎ জননী
মকর চানে বেরিয়ে মা রক্ষে কর তুমি।
আরে ঐ, মকর চানে মাগো যেন ঘটে নাকো জ্বালা,
আরে ঐ মনের আনন্দে হেসে খেলে করি যেন খেলা।"

(পশ্চিমবঙ্গ ১৪০৩)

(৩) বল কে গো তোমরা
এই তরীতে
ভুলালে আমার মন রঙ্গীতে
আর ভঙ্গীতে।
যাত্রীরে দেবতা গন্ধর্ব
কিবা নারি চিনিতে
আকার দেখে। (শারদীয়া, বর্ধমান ১৪৮৬)

লেটো গান : আচার্য সুকুমার সেনের মতে লেটো একটি প্রত্যুৎপন্ন নাট্যাভিনয়। ইহা এখনও রাঢ় অঞ্চলের সীমান্তে অনবলুপ্ত। ইহার নাম লেটো। শব্দটি আসিয়াছে নাটক (অভিনয়) ও নাটুক (অভিনয়কারী) হইতে। লেটোই এদেশের নিজস্ব ও বিশুদ্ধ নাট্য পদ্ধতি। নাট্যের অপভ্রংশ > লাট্য > লেটো।

খ্রীষ্টপূর্ব কাল থেকে আমাদের দেশে যে ধরনের নাট্যকর্ম পণ্ডিতদের অগোচরে চলে এসেছে বলা যায় তার জের এখন পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমান ও হুগলী জেলা, দামোদর উপত্যকা ও কাছাকাছি অঞ্চলে মুসলমান গুণীদের মধ্যে সেদিন পর্যন্ত চলে এসেছে। এ হলো নেটো অর্থাৎ নাটুয়া বৃত্তি, নাট্যকর্ম। ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত লেটো সর্বসাধারণ্যে প্রচলিত ছিল। তারপর হিন্দু গুণীজনদের নজর পড়ে যায় কীর্তন গানে, পাঁচালী, কথকতা ও যাত্রায়। তাই এই সুপ্রাচীন ধারাটি মুসলমানদের মধ্যে তলানি রূপে রয়ে যায়। তবে লেটোর রসাস্বাদ হিন্দুমুসলিম সকল সম্প্রদায়ের মানুষ সমান ভাবে ভোগ করতো। "লেটো আর সঙ সব রকমের শ্রোতাদের আগ্রহ বহুক্ষণ জমাইয়া রাখিতে পারিত না; তাই লেটো ও সঙ (ক্রমশ যাত্রার উপসর্গে পরিণত) রুচিহীনতার সোপান বাহিয়া নীচে নামিতে থাকে। তাই অনুন্নত জনগণের মধ্যে লেটো ও সঙের অনুশীলন সীমাবদ্ধ হইয়া যায়।" (নট-নাট্য-নাটক—সুকুমার সেন)

নজরুল ইসলাম কিশোর বয়সে লোকনাট্য লেটোর দলে যোগ দেন। এই লেটোর দলে যোগ দেওয়ার তাগিদ ছিল দৈন্য। লোকনাট্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল দরিদ্র পিতার সংসার প্রতিপালন। কিন্তু সত্যিই কি তিনি দরিদ্র পিতার সংসারে কিছু সাহায্য করতে পেরেছিলেন?

নজরুল এ সম্বন্ধে পরবর্তীকালে লিখেছেন, "চুরুলিয়ায় লেটো দলের গান লিখিয়ে নজরুলকে কে-ই বা এক কানা কড়ি দাম দিয়েছে?" তবে একটা লাভ হয়েছিল—কবি ও সঙ্গীতকার নজরুলের জন্ম হয়েছে তথাকথিত অমার্জিত লেটোর দলেই। নজরুল রচিত একটি লেটো গান :—

বিড়াল বলে মাছ খাবো না,
আঁশ ছোব না কাশী যাবো ॥
তাই দেখে এক বুড়ো বাঁদর,
গলাতে সে জড়িয়ে চাদর,
বাঁদর বেটা বলছে হেসে,
(কি বলছে?)
বলছে : আমি পৈতে নেবো বামুন হবো ॥
তাই শুনে এক ধেড়ে ইঁদুর,
কপালে সে দিয়ে সিঁদুর,
ইঁদুর বিটি বলছে হেসে,
বলছে : আমি বামুণ্ডী ক্লাবের বৌ হবো।

লেটো আসলে কবিতা, ছড়া-গান ও নৃত্যের সমন্বয়। কাজেই পরবর্তীকালে কবি, নাট্যকার, অভিনেতা, গীতিকার নজরুলের শিক্ষানবিশি ঘটেছে এই লেটো দলে।

লেটোর কাহিনী লোককথা : কবিগানের মত সাময়িক ঘটনা, সামাজিক, রাজনৈতিক ঘটনাকে অবলম্বন করে লেটোর পাত্র-পাত্রীরা নিজেদের ধারণা অনুযায়ী তাৎক্ষণিক সংলাপ বলে যাবেন। অবশ্য গানের কথা ও সুর আগে থাকতে রিহার্সাল দিয়ে ঠিক করা থাকে। কথা ও সংলাপে ব্যক্তিগত আক্রমণও বাদ যায় না। আবার শেষ পর্যন্ত অনেক সংলাপ অশ্লীলতার পর্যায়ে নেমে যায়। তাই ভদ্র সমাজের কাছে ব্রাত্য হয়ে পড়েছে। তবে দলের গীতিকার যে গান রচনা করেন সেটাই লেটোকে লোকসংস্কৃতির পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

কবিগানের মত লেটো গানেও দুই দলের সংগীত-যুদ্ধ পরিবেশিত হয়। লেটো গানের নমুনা :

ওহে দানা করি মানা গৈরব করো না
আমার সাথে উচিত মত হয় না তুলনা।
সাতখানা খাবো না, কাপড় খুলে দাও না
কেমনে ইজ্জত রবে আমায় বলে দাও না।

পীরিতি বড় দায় গো
পীরিতি করে চলে গেছে কালা
গলেতে বেল ফুলের মালা

মোহন চূড়া বামে হেলা
গোপীর মন ভোলায় গো।

কিংবা

বিরস রমণী তুমি
মিছে কেনে আঁখি ঠারো
আমি না মজিলে পরে
তুমি কি মজাতে পারো?
মাকড়সার জাল পেতে তুমি
আকাশের চাঁদ ধরতে পার?

ছোটবেলায় গ্রামের মুসলমানপাড়ায় মাঝে মাঝে লেটোর গান হতো শুনেছি। কিছুকাল আগেও মাঘ মাসে সদর থানার আলমপুর গ্রামে সিউড়ি রোডের ধারে প্রাইমারী স্কুলের কাছে একটা মেলা হতো। সেখানে দু-রাত্রি লেটোর আসর বসতো। আজকাল আর লেটো গানের তেমন খবর পাওয়া যায় না।

মনে হয় অশ্লীলতা দোষের জন্য বর্তমানের অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত জনসমাজ আর লেটো গান পছন্দ করছে না। এখনও সুদূর পল্লী অঞ্চলে যেটুকু এর রেশ আছে অচিরাৎ লোকসংস্কৃতির ধারাটি হয়ত শুকিয়ে যাবে।

ঝুমুর : ঝুমুর অতি প্রাচীন লোকসংস্কৃতির একটা ধারা। আইন-ই-আকবরীতে আবুল ফজল ঝুমুর সঙ্গীতের উল্লেখ করেছেন। বিদ্যাপতির গানেও আছে, "গাবই সহি লোরি ঝুমুর সঅন আরাধনে যাঞু।" গোবিন্দদাসের পদে— "মদনমোহন হরি মণ্ডল মাতল মনসিজ যুবতী যূথ গায়ত ঝুমরি"—উল্লেখ পাই। প্রবাসী পত্রিকার ১৩৪২ আশ্বিন সংখ্যায় 'চণ্ডীদাস চরিত সংসার' প্রবন্ধে বসন্তরঞ্জন রায় লিখেছেন—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আদৌ কীর্তন নহে, ঝুমুর। পণ্ডিত-গণের মতে কিন্তু এই ঝুমুর ধামালী দেশী সঙ্গীতের পরিণতিতেই উৎকৃষ্টতর কীর্তনের উৎপত্তি। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার ১৩২১ প্রথম সংখ্যায় ২১ ভাগে আছে—ঝুমরি গাইছে শ্যাম বাঁশরি বাজা আ।

বৃহৎ হিন্দীকোষ গ্রন্থে ঝুমুরীর সংজ্ঞা আছে, "হোলিমে নাচকে সাথ গায়া জানেবালা এক গীত।"

ঝুমুরি বা ঝুমুর শৃঙ্গারবহুল রাগিণীবিশেষ : শৃঙ্গার বহুলা মাধ্বীক মধুরা মৃদুঃ। একৈব ঝুমুরি লোকে বর্ণাদি নিয়মোজ্মিতা। (সঙ্গীত দামোদর)

বঙ্গীয় শব্দকোষে বলা হয়েছে, "অশ্লীল ইতর জাতীয় স্ত্রীলোকেরা এই গান করে।"

এই সমস্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে নিশ্চিতভাবে বলা যায় গীত, বাদ্য, নৃত্য এই তিন অঙ্গ মিলিয়ে ঝুমুর হলো পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীত। ঝুমুর গানে নাচ হলো কৌম নৃত্য বা দাঁড় নাচ; বাদ্য হলো ঢোল, ধামসা, মাদল, বাঁশি। গানের লক্ষণ হলো "চড়ায় ধরে খাদে নেমে আসে গলা। 'নি'-তে শুরু করে 'সা'-এ অবতরণ। ফাঁক থেকে ফাঁকে চলন।"

মীড়ের সাহায্য না নিয়েই হঠাৎ গলা ভেঙে দূরের স্বরের ঝাঁপিয়ে পড়াই এর ঝোঁক।।

ঝুমুর দু'রকমের : লৌকিক ও উচ্চাঙ্গ। লৌকিক ঝুমুর অশ্লীলতায় ভরা। কাঁচা বয়সের মেয়ে দেখলে রাখাল বালকেরা এই গীত গেয়ে ওঠে, "শ্যাম আইসব বলে কই আলি হে / ভুরকা (ভোরের) তারা দুয়ারে আইল হে।" লৌকিক ঝুমুরের মধ্যে আছে ছাত পেটানো ঝিঙ্গেফুলি ঝুমুর।

ছাত পেটানো ঝুমুর : আষাঢ় মাসে রথ চলে ল
রথ চলে ল
ছুঁরির মন চলে ল।

ঝিঙ্গেফুলী ঝুমুর : ঝিঙ্গেফুল লিলেক জাতি
কুলগো
এমন জানলে কালার সঙ্গে কে পাতাত
ফুল গো।

শ্যামনগরের দুর্যোধন দাসের রাধা বিরহ বর্ণনার একটি ঝুমুর গান :

কে না যায় যমুনার জলে
কে না চায় কালার বদন তলে গো।
তবে কেনে মন্দ বলে আমায় সবে পরস্পর গো
বৃন্দে ব্রজ মণ্ডলে।
আমি হয়েছি সবার পর গো।

এই গানের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদধ্বনি শোনা যায় :

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি
কালিনী নই কুলে
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি
এই গোঠে গোকুলে॥

আবার অন্য একটি গানে চর্যার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়।

একটি তরুর তিনটি শাখা
পঞ্চ বন্ধে পত্র আছে অলেখা
তিনপুর ছায়া বাপিয়ে

তুলনীয় চর্যাপদ : কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।

নীচের ঝুমুরটিতে চণ্ডীদাসের পদাবলীর সুর শোনা যায় :

পর পিরিতি এমনি ল্যাঠা
য্যামন সঞ্র ফুলের কাঁটা
ছাড়ালে না ছাড়ে সেটা
বিঁধেছে হিয়ায়।
বরং জাতি ছাড়া যায় গো
পিরিতি ছাড়া নাহি যায়।

তুলনীয় গুরুজন জ্বালা জলের সিহালা
পড়শী জিঅল মাছে। (পদাবলী)

ঝুমুর গানের প্রাধান্য পুরুলিয়া ছোটনাগপুর অঞ্চলে। কিন্তু সেখান থেকে এই ঝুমুর গানের ঢেউ এ জেলার পশ্চিমাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তবে বর্তমানে এই ঝুমুর গানের ধারা খুবই ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। ৫০ বছর আগেও ঝুমুর গান জেলার পশ্চিমাঞ্চল থেকে জেলায় অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। বর্তমানে এই গান অবলুপ্তির পথে। এর কারণ মনে হয় এ গানের অশ্লীলতা।

ঝুমুর গানের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন, সাঁওতাল গানের অস্ট্রিক প্রভাব যেমন আছে তেমনি চর্যাগীত. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পদাবলী সাহিত্যেও এর ক্ষীণ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কে কার কাছে ঋণী সেটা পণ্ডিতদের গবেষণার বিষয়। তবে ঝুমুরের লোকসংস্কৃতির একটা অঙ্গের সঙ্গে এর সাহিত্যিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

বোলান : বোলান উত্তর ও পূর্ব রাঢ় অঞ্চলের অবসরের গান। এ জেলার কাটোয়া, কেতুগ্রাম, কুড়মুন ও বীরভূমের কিছু অংশ এবং নদীয়ার কিছু অঞ্চল চৈত্র মাসে গাজনের সময় বোলানের সুরে উত্তাল হয়ে ওঠে। এই গান ধর্মরাজ, শিব, ও বুদ্ধের গাজনের সময় চৈত্র থেকে বুদ্ধ পূর্ণিমা পর্যন্ত গাওয়া হয়। জেলায় যে সময়ে শিব ও ধর্মরাজের গাজন অনুষ্ঠিত হয়, সেই সময় সেখানে বোলান গানের আসর বসে। বোলান গানের উৎস সম্বন্ধে ড. সুকুমার সেন বলেছেন, ভ্রমণ অর্থে বুলা ধাতু থেকে বোলানের অর্থ 'চলমান'। বোলানের দলও চলমান।

বোলানের গায়কদের পরনে খাটো হাফপ্যান্ট, গায়ে নীল গেঞ্জি, মাথায় ফেটি আর বাজনার মধ্যে হারমোনিয়াম আর পাখোয়াজ, ডগর, বাঁশি, ঝাঁপ করতাল আর ঘুঙুর। গায়কদের মধ্যে বর্ধমান জেলার সুদপুর ও শ্রীবাটী অঞ্চলের শিল্পীদের মধ্যে মধুসূদন প্রধান, সুধানন্দ বৈরাগ্য, সুকুমার প্রধান উল্লেখযোগ্য নাম। বোলান গানের শুরুতেই বন্দনাগান।

প্রণমি গণরায় আমারে দেয় অভয়
তোমারি করুণায় বেদনা দূরে যায়।
দয়াময়ী দীন তারিণী সেজো না আর পাষাণী
ভবানী ভৈরবী তুমি পাষাণের নন্দিনী।

এরপর পালাবন্দী গান : হরিশচন্দ্র পালা, দাতাকর্ণ, অভিমন্যু বধ, নৌকা-বিলাস, লক্ষ্মণের শক্তিশেল—এই জাতীয় গান। এক ঘন্টার পালাগান। এরপর সাময়িক রাজনৈতিক-সামাজিক বিষয়ক গান বাঁধেন বোলানের গীতিকাররা। এই সব গানের নাম রং-পাঁচালী। রং-পাঁচালী গানের আকর্ষণই সবথেকে বেশী।

পালাগানে ছেলেরাই মেয়ে সাজে। নাকি সুরে মেয়ের ভূমিকায় গান করে। কেউ সাজে রাধিকা, কেউ উত্তরা, কেউ বা শৈব্যার ভূমিকায় গান গায়। রং-পাঁচালী গানে মেয়েরাও অংশ নেয়।

যে ছেলেটি নাকি সুরে রাধিকার ভূমিকায় গান করে, পালাগান শেষ হলে সে-ই আবার রং-পাঁচালীতে গাইতে আরম্ভ করে :

কলির পুরুষ ভাই এখন চেনা বড় দায়
ঘাড়ের নীচে রাখছে চুল
লাজে মরে যাই।
ছাপা ছিটের জামা পরে
তাদের পুরুষ বলা চলে না।

সেই যুবকই আবার যুবকদের দারিদ্র্য, বেকারত্ব সত্ত্বেও পোশাকের পারিপাট্যকে ব্যঙ্গ করতে ছাড়ে না :

বাংলা দেশের ছেলে গুলো
কি যে তারা বুঝলো
চোঙা প্যান্টে পোঙা ভরে
আধা সাহেব সাজলো।
বাবা থাকে টেনা পরে
মা খেতে পায় না

তার বেটারা করছে এখন
টেরিকটের বায়না।

আবার জন্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে যখন সরকার থেকে খুবই বাড়াবাড়ি চলছিল তাকে ব্যঙ্গ করে পুরুষ গায়ক গাইতে থাকে—

গিন্নী বলে এখন তুমি কর অপার্সন (ভাসেক্টমি অপারেশন)
সরকার থেকে দিচ্ছে নিরোধ শুনুন সর্বজন।
বাবু যারা করল অপার্সন তাদের দুঃখে যায় জীবন
গিন্নী তাদের কয় না কথা সয় কত বেদন।
উঠতে বসতে মারে ঝাঁটা
দেখুন বাবু পিঠখান।

রং-পাঁচালী গানে পাই ব্যঙ্গ বিদ্রূপপূর্ণ বর্তমান সমাজ ও রাজনীতির এক বাস্তব চিত্র :

এ কালের মুখে ছাই সত্যের সম্বন্ধ নাই
মিথ্যা পথে চলে সদা সত্যে দিয়ে জলাঞ্জলি।
পাচ্ছে তার প্রতিফল বৃক্ষে আর ধরে না ফল।
দুগ্ধবতী গাভী সকল হচ্ছে দুগ্ধহীন।
অতি বৃষ্টি অনাবৃষ্টি হচ্ছে যত কীটের সৃষ্টি
শস্যবিহীন ক্ষেত্র তাই হচ্ছে দিন দিন।
শাকসব্জী ফলমুল বিস্বাদে তার সমতুল
তার মধ্যে আছে যত বিদেশী সারের গুণ।

গানের মধ্যে অশ্লীলতার অনুপ্রবেশ বোলান গানের অবলুপ্তির অন্যতম কারণ। রং-পাঁচালীতে এমন সব গান গায় 'ছনকেশী বুড়ো তার ছেলের সঙ্গে', সে গান শুনলে কানে আঙ্গুল দেয়। অবশ্য এ সব গান ছেলে ছোকরারা বেশ উপভোগ করে :

শালী : জামাইবাবু গো আমার ফোটা ফুল তো
রাখা গেল না কাছে এসো
পাশে বোসো, মিলন করি দুজনা।
জামাইবাবু : শোন বলি ওহে শালী এত বাড় বেড়ো না।
তুমি এখন অনেক ছোট উতলা হয়ো না।
সে আসবে বাড়ি, তাড়াতাড়ি—চিন্তা করো না।

(ছড়াদার ত্রিফল হাজরা / দেশ, আশ্বিন ১৩৮৫)

গানের আসর এখানে climax-এ ওঠে, চারদিক থেকে হাততালিতে কান ফেটে যাবার উপক্রম, মেয়েরাও পরস্পর গা টেপাটেপি করতে আরম্ভ করে।

বোলান গানের ঐতিহ্য দুই শত বছরের অধিক। রূপরামের (সপ্তদশ শতাব্দী) ধর্মমঙ্গলে পুরু দত্ত বাবুইয়ের মানসিক ব্রত গাজনে যখন রামাই পণ্ডিত "বোলান বুলিতে গেল ময়না বসতি," তখনই রঞ্জাবতী ধর্মঠাকুরের কথা শোনে। আবার 'বোল' অর্থে বাক্য হলে বোলান বা বোলানে-র অর্থ কথা বলানো—সেই অর্থে পোড়ো বোলান মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করার জাদুতে বিশ্বাস বোঝায়। পোড়ো বোলানের গবেষক ড. বাগচী দেখিয়েছেন পোড়ো বা শ্মশানে দলের লোকেরা গাজনের অনেক আগে থেকে মৃত শিশু বা সদ্য মৃতের অক্ষত মুণ্ড বা সংস্কার করা হয়নি এমনি নরকপাল সংগ্রহ করে। কাঁচা ছেলে (সদ্যোজাত শিশু) বা কাঁচা মাথা, যে দল আগে সংগ্রহ করতে পারবে তাদেরই 'পয়' ও কৃতিত্ব বেশী। বিলাপের সুরে ও করুণা মাখানো দুঃখের ভাষায় মুণ্ড বা শিশুকে জাগানো হয় মৃত শিশুকে ডাকের গান দ্বারা :

ও সাঁইরে—তুকেরে বুকে কে আনলে ইখানে
তোর পিতা মাতা গুরু সবাই কানছে সিখানে
কাল বাছা খেয়েছিলি টুকুই ভরা মুড়ি
আজ বাছার মুণ্ডু গেছে ধুলোয় গড়াগড়ি ॥

এই রকম কাঁচা ছেলে বা কাঁচা মুণ্ড নিয়ে গাজনের নাচ হয় কুড়মুনের ঈশানেশ্বরের গাজনে। তবে বছর তিনেক আগে মুসলমানদের কবর থেকে মৃতদেহ তোলার গুজব ছড়িয়ে পড়ায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার উপক্রম হয়েছিল। ফলে জেলা শাসকের নির্দেশে মড়ার মাথা নিয়ে গাজনে খেলা কিছুদিন বন্ধ আছে।

ড. সুকুমার সেনের ব্যাখ্যা মতো বোলান সত্যি এক চলমান লোকনাট্য। কারণ বোলানের এক পালা এ গাঁয়ে গাওয়া শেষ হলে বোলানের দল পাশের গাঁয়ে গাইতে চলে যায়।

বর্তমানে বোলান গানের অশ্লীলতা এই গানকে অবলুপ্তির পথে ঠেলে দিয়েছে, শুধু বোলান নয় এর সঙ্গে অন্যান্য লোকসঙ্গীত যেমন কৃষ্ণযাত্রার গান, কবিগান, ময়ূরপঙ্খীর গান, ঝুমুর সবই একে একে বোলান গানের পথ অনুসরণ করছে।

আলকাপ : প্রচলিত কাহিনী অনুসারে বনমালী দাস নামে এক কানা নাপিত এই গানের স্রষ্টা। আলকাপ খুব প্রাচীন লোকসঙ্গীত নয়। গানের ভাষা ও বিষয় বস্তুতে চলমান জীবনের প্রভাব। কিছু গান আদি রসাত্মক। ছয়-সাতজন থেকে

দশ-বারো জনকে নিয়ে আলকাপ গানের দল তৈরী হয়, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের আনন্দ বিধানের জন্য। তবে এ গান মূলত মুসলমান সমাজের ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বেশী প্রচলিত; বর্ধমান জেলায় কাটোয়া কেতুগ্রাম অঞ্চলে মুর্শিদাবাদের দল এসে কার্তিক পূজা বা অন্য উপলক্ষে গাইতো। বর্তমানে এ গানের আর চলন নেই।

পটুয়ার গান : লোকসাহিত্যের লিখিত রূপের পাশাপাশি লোকচিত্র-কলার নিদর্শন পট। আমাদের লোকচিত্র-কলার ঐতিহ্য সুদূর অতীত থেকে আজও সমানে বয়ে চলেছে। পট কথাটির উৎস সংস্কৃত শব্দ 'পট্ট'। পট্ট কথার অর্থ কাপড়। পূর্বে ছেঁড়া শাড়ী বা ধুতির ওপর পট আঁকা হতো। পদ্ধতিটি অদ্ভুত। প্রথমে মাটি জলে গুলে সেই গোলা-মাটি কাপড় দিয়ে ছেঁকে নেওয়া হতো। তারপর বেশ মসৃণ জায়গায় কাপড়কে টান করে বিছিয়ে তার ওপর গোলার প্রলেপ দেওয়া হতো। এই মাটির প্রলেপ শুকিয়ে গেলে তার ওপর ছবি আঁকা হতো। এই ভাবেই আঁকা হতো চালচিত্র, আলপনা, নকশা তাস, দশাবতার তাস, পৌরাণিক বা মহাকাব্যের কাহিনী নিয়ে ছবি। কিন্তু কাপড়ের ওপর এই পট আঁকা ছিল খুবই পরিশ্রম সাপেক্ষ; সময়ও লাগে অনেক কিন্তু পটুয়া এই পট বিক্রি করে যে পয়সা পায় তাতে পরিশ্রমের মর্যাদা পেত না। পরে সস্তা চাম কাগজে পট আঁকা হয়। কিন্তু এর জন্যও প্রস্তুতি দরকার। কাগজের ওপর আতপ চালের আঠার প্রলেপ দেওয়া হয়। আঠা দিলে কুঁচকে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তাই ২/৩ রাত শিশিরে আঠার প্রলেপ দেওয়া কাগজ বিছিয়ে রাখলেই মসৃণ হয়ে যায়। এর ওপর পট আঁকা হয়। বড় বড় পালাগানের পট বারবার খোলা ও গোটানোর জন্য কাগজ ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে তাই এর পেছনে শাড়ির পাড় বা পুরানো কাপড় চিটিয়ে দেওয়া হয়।

পট আঁকার আগে শিল্পী প্রথমে স্থির করে পটের বিষয়বস্তু অনুসারে কি কি পট আঁকা হবে, কটি পট হবে ও পটের মাপজোক কি হবে—এক একটা কাহিনীর পারম্পর্য রক্ষা করে পূর্ণ রূপায়ণের জন্য ১৪/১৫টি পট আঁকার প্রয়োজন হতে পারে। প্রতি ছবির পাশে বেশ খানিকটা মার্জিন রাখা হয়। সেই মার্জিন লতাপাতা বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি দিয়ে পরিবেশ তৈরী হয়। ছাগলের ঘাড়ের লোম দিয়ে তুলি তৈরী হয়। রঙ তৈরী হয় সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে। সবুজ রঙের জন্য সীম পাতার রস, হরতেল রঙের জন্য হলুদ, লাল রঙের জন্য তিন ভাগ ভূরি সিঁদুর, এক ভাগ ফুল আঙুলের ডগা দিয়ে গুলে লাল রঙ তৈরী হয়। নীল রঙের জন্য কাপড় কাচার পর কাপড় ছোপানোর জন্য যে নীলের

ব্যবহার হয় সেই নীল নেওয়া হয়। আর কালো রঙের জন্য মুড়ি ভাজার খোলা চাঁচা ভুষো কালি ব্যবহার করা হয়। এই সব রঙের সঙ্গে পরিমাণ মত শিরীষ আঠা মেশানো হয়।

পট তৈরী হলে ভাল করে ছায়ায় রেখে শুকিয়ে গেলে দুধারে রুলকাঠ দিয়ে জড়িয়ে নেওয়া হয়। জড়ানো পট দৈর্ঘে অনেক বড়—এগুলিকে খুলে খুলে জনসমক্ষে প্রদর্শন করতে হয়। সমগ্র পট এক ধারাবাহিক চিত্রকলা। কোন পুরাণ, মহাকাব্য, ইতিহাস, লোকগাথা বা সমসাময়িক কোন ঘটনার সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক আখ্যান তুলে ধরা হয় এই চিত্রকলায়; এক হিসেবে একে গ্রামীণ চলচ্চিত্রও বলা যেতে পারে। এক সূত্রে গাঁথা কাহিনীর সূচনা থেকে ধীরে ধীরে শেষ পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া হয় ধারাবাহিক চিত্রের মাধ্যমে। পটিদার গানের সাহায্যে দর্শকদের কাছে পটের কাহিনী ও ভাববস্তু ব্যাখ্যা করে। গানগুলির মধ্যে বিশেষ সুরের বৈচিত্র্য থাকে না। কতকটা বিবৃতিমূলক তবু এই পটুয়ার বলার গুণে এই বিবৃতিমূলক গানই এক সম্মোহনী শক্তি লাভ করে। দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে উপলব্ধি করে।

পটের এই চালচিত্র ও গান কিন্তু লোকনাট্যের পর্যায়ে পড়ে না। এগুলি প্রাচীন পালাগান, গ্রাম যাত্রা, লেটো, বোলান, গম্ভীরা আলকাপ কোন সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে না। আবার লোকসঙ্গীতের ধারা হিসেবেও পট-সঙ্গীতকে চিহ্নিত করা যায় না। লোকসঙ্গীতের কবিত্ব, সুর, ছন্দ, বাদ্যযন্ত্র পটুয়ার গানে নাই। পটুয়ার জীবন বিশেষ করে বর্ধমান জেলার অধিকাংশ পটুয়ার জীবন ও ধর্ম যেমন বিচিত্র, এই পটুয়ার গানও তেমনি বিচিত্র এবং অন্য গান থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জেলার নিগন, কৈচর ও মশাগ্রাম অঞ্চলে যে সব পটুয়া বাস করে তাদের জীবনধারাও স্বতন্ত্র, বিচিত্র।

সাপ্তাহিক পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকায় ১৯৭২ সালের ৩রা নভেম্বর সংখ্যায় আমারই "বর্ধমানের ইতিহাস ও সংস্কৃতির ভূমিকা" প্রবন্ধে এই পটুয়াদের কথা উল্লেখ করেছিলাম। এরা না হিন্দু না মুসলমান। ২৪ পরগনার আখড়াপঞ্জীর পটুয়াদের মত কিংবা উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের মত এরা বলাই, কানাই, রাম, লক্ষ্মণ প্রভৃতি হিন্দু নাম যেমন গ্রহণ করে তেমনি রহিম, মজিদ প্রভৃতি মুসলমান নামও নেয়। মুসলমানদের মত এরা দিনে বিবাহ করে, ৪১ দিনে এদের অশৌচান্ত হয়, তালাকও দেয়। আবার মেয়েরা হিন্দুদের মত শাঁখা, সিঁদুর ব্যবহার করে। শীতলা, মনসার মানত করে, তুলসী মঞ্চে প্রদীপ দেয়। আবার মৃতদেহ কবর দেয়। হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি সমন্বয়ের এক বিরল ও বিচিত্র দৃষ্টান্ত এই পটুয়ারা।

মশাগ্রামের পটুয়াদের মধ্যে অস্ট্রিক সংস্কৃতির পরিচয় মেলে। পটুয়াদের এই অদ্ভুত জীবনধারার মত তাদের পটের গানও বিচিত্র।

এই সব পটুয়ারা নিজেদের বিশ্বকর্মার সন্তান বলে দাবী করে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতে বিশ্বকর্মা ও ঘৃতাচী অপ্সরার সন্তান এই পটুয়ারা। চিত্রকরেরা ব্রাহ্মণ নির্দিষ্ট চিত্র পদ্ধতির ব্যতিক্রম করায় ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন। তার ফলে তারা জাতিচ্যুত হয়ে আজও আধা হিন্দু, আধা মুসলমানদের জীবনধারা বয়ে চলেছে। কিন্তু মনে হয়, এরা ছিল প্রথম অস্ট্রিক জাতিভুক্ত পরে ইসলামী শাসনের সময় ওদের জোর করে মুসলমান করা হয়। ইসলামী শাসন শেষে হয়ত আর্যসমাজ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ এদের হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত করে। তাই বর্তমানে মধ্য পথ অবলম্বন করেছে।

যাই হোক, পট ও পটুয়ার গানের কথায় ফিরে আসি। চিত্রিত পটের সম্ভারই পটের গানের অবলম্বন। পট ও গানকে পৃথক করে দেখলে পটুয়া গানের বার আনা রসমাধুর্যই বাদ চলে যাবে।

পটের গানের ব্যবহার কাহিনীর অংশ হিসেবে নয় কাহিনীর ভাষ্য হিসেবে। এদের গান কতকটা কথকতার পর্যায়ে পড়ে। পটুয়ার পটে নাটকের গতিময়তা আছে, নাটকের বিষয়বস্তু আছে। নাটকের দৃশ্য বিভাগ আছে কিন্তু তবুও পট ও গান নাটক বা লোকনাট্য নয়। "বাংলার সামাজিক ইতিহাসের প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক দলিল হিসেবে এই গানের মূল্য অনস্বীকার্য।"

যমপুরীর চিত্র :

রবির পুত্র যম রাজা যম নাম ধরে।
বিনা অপরাধে কারও দণ্ড নাহি করে।
দেবতার ফল যে জন চুরি করে যায়।
তপ্ত সাঁড়াশি করে তার জিহ্বা কেড়ে খায় ॥
গোমাংসের ঝুড়ি তার মস্তকেতে দেয় ॥
হরিমতি বেশ্যা ছিল মহাপাপের পাপী।
অন্নদান, বস্ত্রদান-দান-ধ্যান করেছিল।
তিনি স্বর্গলাভ ক—রি—লে—ন।

যমপুরীর চিত্রগুলির মধ্যে মানুষের পাপবোধ, তার পরিণতি, যমপুরীতে পাপের গুরুত্ব অনুযায়ী শাস্তি, মহাপাপ করলেও কিভাবে পাপী স্বর্গলাভ করে তার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। গানের মধ্যে একটা বিষয় লক্ষ্যণীয়—সব পঙ্‌ক্তিতে ছন্দ নাই—সুর করেও সব পঙ্‌ক্তি গাওয়া হয় না। এক এক চিত্রকল্প অনুসরণ করে পঙ্‌ক্তিগুলি রচিত।

সিন্ধুবধ পালা :

অজ রাজার পুত্র রাজা নামে দশরথ।
সভা করে বসে আছেন লয়ে প্রজাগণ ॥
গিন্নীর পাপে গৃহস্থালী-নষ্ট, লক্ষ্মী ছেড়ে যায়।
শনির চিন্তায় মহারাজা রথ সাজাইল।
ধনুকে টঙ্কার দিয়ে শনিকে জাগাইল।
শনির নিঃশ্বাসে রথ উড়িতে লাগিল।
কোথা ছিল জটায়ু রথ ধরে নামাইল ॥

আবার সীতাহরণ চিত্রে মহাকাব্যের এক করুণ দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে :

দেখো দেখো ... বৃক্ষ তলে রাম লক্ষ্মণ করিছে শয়ন
আবার দেখো ... হেনকালে জটায়ু পাখী দিল দরশন
আঁখি মেলে চেয়ে দেখো রাম রঘুমণি
আমায় বধিয়া গেল তোমার ঘরনী
দেশে রইলো মাতা রে ভাই দেশে রইলো পিতা
শিউর নিযোগ্য বামে চুরি হল সীতা।

সীতাহরণের এ কাহিনী কিছুটা রামায়ণ কিছু পটুয়ার কল্পনা। এখানে পটের বিষয়ের থেকে গানের বিষয় বেশী। পটে যা নাই পটুয়ার গানে তারই পাদপূরণ।

আবার সাহেব পটে পরাধীন ভারতে বিচারের প্রহসনের চিত্র।

দেখো দেখো বাবুরা : বার জন সাহেব সাতজন মেমকে নিয়ে বিচার করতেছেন—

কি কি বিচার? কাকে মারবে, কাকে তোপে উড়াবে, কাকে নজরবন্দী রাখবে।
মুহুরিরা সব কাগজ যোগাছেন
উপরে চিক ফেলে বিবিরা তামাশা দেখছেন।

পটুয়ার গানের বলার সুর, বলার ছন্দ, বলার যে ভঙ্গিমা, সেটাই কিন্তু পটুয়া গানের আসল রূপ। এ সুর এ ছন্দ এ ভঙ্গী বাদ গেলে পটুয়া গানের আসলটা বাদ চলে গেল। এই ভঙ্গী এই সুর তো কলমে প্রকাশ করা যাবে না। এটা পাঠককে মনে মনে কল্পনা করে নিতে হবে। তবেই পটুয়া গানের রসমাধুর্য উপলব্ধি হবে। ছোটবেলায় মেলায় খেলা দেখতাম। এক স্ট্যান্ডের ওপর একটা টিনের বড় সাইজের বাক্সের মধ্যে গোটানো থাকতো একাধিক পালাগানের পট; বাক্সের সামনে ৪"/৫" ইঞ্চি ব্যাসের আতস কাচ লাগানো থাকে। বাক্সের বাঁদিকে পট খোলা ও গোটানোর হ্যাণ্ডেল। আতস কাচে চোখ রেখে এক একজন

পৃথকভাবে পট দেখতো আর পটুয়া হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এক একটা পট দর্শকের চোখের সামনে হাজির করাতো এবং মুখে অনর্গল কাহিনী বলে যেত, রামের হাতে তরণীসেন বধ কিংবা কালীঘাটের পট দেখিয়ে গান :

জয় রাম জয় রাম বলে মুণ্ড ডাক ছাড়ে
কাটা মুণ্ড তরণীর ধড়ে এসে জোড়ে
দেখো দেখো হনুমানের লঙ্কার দহন
দেখো দেখো লক্ষ্মণের শক্তিশেলে মরণ
কালিদহের কূলে ছিল কেলি কদম্বের গাছ
তাতে চড়ে কৃষ্ণচন্দ্র দিয়েছিলেন ঝাঁপ
নাগের মাথায় পদ দিয়ে দেখুন
ঠাকুর নাচিতে লাগিল
নাগ বলে আমার যশোভাগ্য ভালো
কৃষ্ণের পাদপদ্ম বুঝি মাথায় উঠিলো।

এমনি করে রাম-রাবণের যুদ্ধ, রাবণের মৃত্যু, কালিয়াদমন এই সব ঘটনা দেখানো হতো। আর আতস কাচের মধ্য দিয়ে পল্লীবালকরা গ্রামীণ সিনেমা দেখার সখ মেটাতো।

তবে আজকাল আর পটুয়াদের গান করে, পট এঁকে, পেট চলে না। তাই এই বিশ্বকর্মার সন্তানদের রুজি রোজকারের নানা ধান্দায় বের হতে হয়। না হিন্দু-না-মুসলমান হওয়ায় সমাজে এরা ব্রাত্য। তাই কেউ সাপ ধরে, সাপের খেলা দেখিয়ে, মনসার গান গেয়ে ও জুড়িবুটি দিয়ে রুজি রোজগারের চেষ্টা করে। কেউ বা রাজমিস্ত্রীর কাজ করে, কেউ আবার বর্গা চাষও করে। এই ভাবে এরা পটুয়া বৃত্তি ছেড়ে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসার চেষ্টা করছে। সরকার থেকে মাঝে মাঝে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পটুয়াদের নিয়ে সেমিনার করা হয়। এদের পটের প্রদর্শনী করা হয়। শহরের কোন সৌখীন ব্যক্তি হয়ত ২/১টি পট কিনে নিয়ে বৈঠকখানা ঘরে টাঙিয়ে রাখে। বিদেশীরাও হুজুগে পড়ে কেনে। কিন্তু এ ভাবেও পটশিল্পকে বাঁচানো যাচ্ছে না। হয়ত একদিন কালীঘাটের পটের মত জেলার পটুয়াদের জীবন ও পটুয়াদের গান এবং ছবি গবেষকদের গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

কীর্তনগান : গৌরাঙ্গ-পার্ষদ বৃন্দাবন, লোচনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, জয়ানন্দ প্রমুখ চৈতন্যচরিত রচয়িতাদের সমাবেশ ঘটেছিল বর্ধমান জেলায়। কড়চা রচয়িতা গোবিন্দ কর্মকারের আবির্ভাব হয়েছিল কাঞ্চননগরে। ভগবদ্ভক্তি বিষয়ক লীলাকীর্তনের একটা ঘরানা গড়ে উঠেছিল শ্রীখণ্ডে।

শ্রীখণ্ডের উত্তরে মনোহরশাহী পরগনাতে (বর্তমান কেতুগ্রাম থানা) কিছুটা হালকা ধরনের মনোহরশাহী লীলাকীর্তন প্রচলিত ছিল। ঐতিহাসিক যজ্ঞেশ্বর চৌধুরীর মতে বর্তমানে কাটোয়া কেতুগ্রাম ও বীরভূমের পূর্বাংশে এই কীর্তনের ধারা আজও বলবৎ আছে। কুলীনগ্রামের সেন ও বসু পরিবারে লীলা-কীর্তনের চর্চা ছিল যা 'রেনিটি ঘরানা' নামে পরিচিত।

কাটোয়াতে এখনও কীর্তনগানের কিছু আখড়া আছে। শ্রীখণ্ডে গৌরগুণানন্দ ঠাকুর ভাল কীর্তনীয়া ছিলেন। এখনও শ্রীখণ্ডে কিছু কীর্তনীয়ার সন্ধান পাওয়া যায়। তবে খেতুড়ী, গরানহাটা, মান্দারনী, মনোহরশাহীতে এসব ঘরানা এখন অবলুপ্তির পথে।

তবে জেলার সবত্র অষ্টপ্রহর, চব্বিশপ্রহর, হরিনাম সংকীর্তন উপলক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তন হিসাবে লীলাকীর্তনের আসর বসে।

কীর্তির বর্ণনা হলো কীর্তনের মূল কথা। বাংলার কীর্তনগানের সৃষ্টি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামলীলা কীর্তনের উদ্দেশ্যে। খোল করতাল বাজিয়ে একক ভাবে কিংবা দলবদ্ধভাবে কীর্তন গানসহ নগর পরিক্রমাকে বলে নগর সংকীর্তন। কীর্তনের বিষয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, গোষ্ঠলীলা, রাসলীলা, মাথুরলীলা। মাথুরগানের বিষয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় গমন। গোষ্ঠলীলায়—বালক শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে যাবার আগে মাকে গোষ্ঠের সাজে সজ্জিত করে দিতে অনুরোধ জানাচ্ছেন। মার মনে অনেক ভয়—অনেক দ্বিধার পর তিনি কানুকে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে সখাদের সঙ্গে গোষ্ঠে পাঠিয়ে দিলেন। গোষ্ঠলীলার শেষে রাধাগোবিন্দের মিলনে পালার পরিসমাপ্তি। গভীর বেদনা ও আর্তির জন্য মানুষ বেশীর ভাগ পালাগানকেই পছন্দ করে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, বলরাম দাস, জ্ঞানদাস—এই সব বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী থেকে কীর্তন গাওয়া হয়। অনেকে অবশ্য কীর্তনগানকে লোকসঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত করতে নারাজ। এ সম্বন্ধে ভারতবর্ষ পত্রিকার ১৩৪৬ সালের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুরের কীর্তন সম্পর্কিত প্রতিবেদন থেকে অংশবিশেষ উল্লেখ করা যেতে পারে।

"মাতৃভাষারই মত বাংলার এই সঙ্গীত-কলা। এত মিষ্ট, এত সমৃদ্ধ ও এত বৈচিত্র্যশালী সঙ্গীত পৃথিবীতে খুব কমই আছে। সমস্ত শিল্পকলার প্রাণ হইতেছে বৈচিত্র্য। বাংলাদেশ সঙ্গীত জগতে কি অদ্ভুত বৈচিত্র্য, কি অভাবনীয় অভিনবত্ব আনয়ন করিয়াছিল তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রথমতঃ কীর্তনে সঙ্গীত মুক্তির স্বাদ পাইল। বৈঠকী সঙ্গীতের ঠাট ছাড়াইয়া সে এক নূতন পন্থা দেখাইল। শুধু তাহাই নহে, সঙ্গীতের আভিজাত্যের হিমালয় ত্যাগ করিয়া জাহ্নবীধারার মত

সে জনসাধারণের বিশাল সমতলে নামিয়া আসিল। আমরা যাহাকে mass music বলি, তাহা কীর্তনেই দেখিতে পাওয়া যায়। কীর্তনের মধ্যে নামকীর্তন বলিয়া যে বিভাগটি আছে তাহাতে শত সহস্র লোক যোগদান করিতে পারে। Parlour music বা বৈঠকী সঙ্গীতে এই প্রাণ মাতানো দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। যা mass music তাই তো গণসঙ্গীত বা লোকসঙ্গীত।"

কীর্তনগান গৌরচন্দ্রিকা দিয়ে শুরু হয়। তারপর কথা, দোঁহা, আখর। তুক বা তুক্ক ও ছুট এই অঙ্গের মধ্য দিয়ে পালা পরিবেশিত হয়। কীর্তনীয়ার পরিধানে ধোপদুরস্ত ধুতি পরিপাটী করে পরা, কাঁধে বা কোমরে সাদা চাদর, গলায় কণ্ঠী ও ফুলের মালা, কপালে তিলক, হাতে চামর প্রথমেই শ্রীখোল ও কত্তালের বাজনাসহ গৌরচন্দ্রিকা গান। তারপর পালাগান আরম্ভ। আসরে থাকেন ৪/৫ জন দোহার, তাঁরা ধুয়া গেয়ে যান। আজকাল কীর্তনের আসরে হারমোনিয়ামেরও আমদানী হয়েছে। 'আখর' মূলপদের ভাবের পরিপোষক রূপে শ্রোতৃবর্গকে ভাবগ্রহণ আস্বাদন ও অনুভব করতে সাহায্য করে। তুক্ক গানের ক্রিয়া প্রায়ই একই রূপ। আখর গদ্যে আর তুক্ক ছন্দোবদ্ধ গাথায় বা ছোট ছোট শ্লোকে গাওয়া হয়।

গোষ্ঠলীলায় শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সঙ্গে গোষ্ঠে যাচ্ছেন। নন্দ-যশোদা শ্রীকৃষ্ণের এই গোষ্ঠযাত্রা দেখে নিজ মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করছেন।

মূল মহাজন পদ :

ব্রজপতি-দম্পতি সকরুণ সম্প্রতি
মন্দিরে করল প্রয়াণ
গোধন গোপ সখাগণ সংহতি
কাননে চলল বর কান॥

তুক্ক বা গানের কলি :

ঐ পদ যায় রহিয়ে রহিয়ে গো
উহার মা ডাকে ঘর পানে,
ব্রজের রাখাল ডাকে বন পানে,
গোপী ডাকে নয়নে—নয়নে—নয়নে গো ॥

শ্রীযমুনার তীরে 'গোষ্ঠ' হাজির হলো। কালিন্দ-নন্দিনী যমুনা সখাসহ শ্রীকৃষ্ণের যমুনায় স্নান আকাঙ্ক্ষা করে সূর্যের কাছে আর্তি জানালে সূর্য যমুনাতীরে প্রখর তাপ বিকিরণ করেন যাতে শ্রীকৃষ্ণ সখাসহ ক্লান্ত হয়ে যমুনার জলে অবগাহন করতে বাধ্য হয়।

নীচের পদটিতে প্রখর তপন তাপে শ্রীকৃষ্ণের যে অবস্থা হলো তার বর্ণনা আছে।

তপনক তাপে তপন ভেল মহীতল
বালুকা দহন সমান।
গোধন গোপ সখাগণ সংগতি
'ধীর সমীরে' চলু বনে।
তুক্ক : যমুনাক তীরে রে যমুনাক তীরে
দেখ তপন তাত, বহ্নী বাত
না চলে গোধন রাখাল সাথ
তীরেতে রাখিয়া পিন্ধন বাস
(শিশুগণ) ঝাঁপ দিয়া পড়ে
নীরে রে—নীরে রে—নীরে রে—
·যমুনাকতীরে রে—যমুনাক তীরে রে।

এমনি ভাবেই পালাগান সাঙ্গ হয়। তারপর রাধাগোবিন্দের মিলনে পালা সমাপন—কুঞ্জভঙ্গ গান দিয়ে।

ষোড়শ শতকের পদাবলী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা গোবিন্দদাস। বর্ধমানের কাটোয়ার নিকট শ্রীখণ্ডে গোবিন্দদাসের জন্ম। গোবিন্দদাসের ভনিতায় ৭০০ এর বেশী পদ পাওয়া গেছে। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অভিসারে পর্যায়ের পদে ও গৌরচন্দ্রিকায়।

কীর্তনগানের চরম উৎকর্ষ হলো দিব্যপ্রেমের জন্য মানব আত্মার অভিসার—অসীমের পায়ে আত্মসমর্পণ।

মঙ্গলকোট থানার আউসগ্রাম, কোগ্রাম, সুখ পুকুরিয়া গ্রামের গোস্বামীরা ভাল কীর্তনীয়া। এক সময়ে এঁরা জেলার বিভিন্ন গ্রামে কীর্তন গাইতেন। আউসগ্রাম থানাতেও কিছু কীর্তনীয়া আছেন। ভাতার থানার হরিবাটী গ্রামে দ্বিজপদ বৈরাগ্য ও তাঁর মেয়ে শুক্লা কীর্তনগানে বেশ নাম করেছেন। পল্লীগ্রামে অষ্টপ্রহর, চব্বিশ-প্রহর, নবরাত্রি প্রভৃতি হরিনাম সংকীর্তনে কীর্তন গাইবার জন্য এদের ডাক পড়ে। এঁরাও পেশাদারী। তবে শহরে যেখানে কোন আশ্রমে বা সর্বজনীন হরিনাম সংকীর্তন-এর অনুষ্ঠান হয়, তখন কলকাতার নাম করা কীর্তন-শিল্পীদের ডাক পড়ে। নামকরা কীর্তনীয়াদের মধ্যে ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, রথীন্দ্র ঘোষ, নন্দকিশোর দাস, নবকুমার পাল-এর গান শুনে মনে হয় 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মন প্রাণ।' তবে কীর্তন গানের কদর বৈষ্ণব-মনোভাবাপন্ন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কাছেই বেশী। আজকালকার পপ ও সিনেমা সঙ্গীতের যুগে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে যুবক-যুবতীদের কাছে এর আবেদন সামান্যই।

আদিবাসীদের গান : আদিবাসীদের বিবাহ অনুষ্ঠানে বর বিয়ে করতে যাবার আগে মায়ের স্তন শেষবারের মত খেয়ে বর চৌড়লে / পাল্কীতে চেপে বিয়ে করতে যায়। এই অনুষ্ঠানটিকে বলে দুধের ধার অনুষ্ঠান—কিন্তু মায়ের দুধের ধার কি কেউ শোধ করতে পারে? মা-পিসীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে এই 'দুধের ধার' অনুষ্ঠানটির জন্য। এই উপলক্ষে গান :

দশমাস দশদিন পুতা উদরে ধরিলি
পুতারে রোদকে করল এত ছাহির।
যেহ দিনে রে পুতা তহর জনমরে
পুতারে বড়ি দুঃখে ক্ষেপলঁ এ র্যাত।
পুতারে হাঁটু মারি ক্ষেপলঁ এ র্যাত ॥
বৈঠা জ্বলাঁঞে অঁগঠি লাগাঁঞেরে
পুতারে ধাই-মায়ে করল উদ্ধার।
তঁহি যে যাবে পুতা আপনা শ্বশুরা-ঘরে,
পুতারে দিঞে রাখ দুধেকেরি ধার।
কিয়া যে দেবঁঞ মায় গো. দুধে কেরি ধারগো.
ম্যায়গো হামি দেবঁঞ জনমেক কামিনী।
সেহ কামিনী পুতা রুথা কথা নেঁহি মানেরে
পুতারে এড়ি ধমসাঁঞ চলি যাঁঞে
পুতারে বাঁহি মলক্যাঁঞ চলি
যাঁঞ।
যাহুক যাহুক মাইগো, বাহুক দিনা চারিগো
ম্যাইগো ধূলা গ্যইড়ে
আনবোঁ ঘুরাঁঞ।
সেহ কামিনী মাইগো বিরি্য
পিসিবেকগো,
ম্যাইগো পিঁড়ে বসি করবে উদ্ধার।

বিয়ের পর কনে বিদায়ের আগে তার মা-বাবার ঘর ভরবে উল্টো মুখে ধান ছুঁড়ে। 'ঘরভরা' অনুষ্ঠানের সময় কনে বিদায়ের গান গাওয়া হয়। এই মর্মস্পর্শী গানের পর বিদায়ের বাজনা বেজে ওঠে। কনের বাপের বাড়ীতে ওঠে কান্নার রোল।

'ঘরভরা' অনুষ্ঠানের পর বিদায়ের গান :

লাল টুপাই গুড় মুড়ি
আর কি মা খাবো
তর ঘরে আর কিগো ম্যাঁঞ
বিটি জনম লিব।

কনে পালকীতে উঠতে যাচ্ছে। তখন মেয়েরা বিদায় জানাতে গান ধরে :

মা কান্দেন মাঝ ঘরে ম্যাঁঞ গো
ফঁফাঞে ফঁফাঞে
দাঁড়ান রে বাজনদ্যারা ভাইরা
ম্যাঁঞকে ম'র বোধ দিয়ে রাখি।

অতীতে উচ্চবর্ণের বিবাহে যখন ৮ বছর ৯ বছর মেয়েদের গৌরীদান প্রথা ছিল তখনও কনে এমনি করেই 'ফঁফাঞে ফঁফাঞে' কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিত। এ দৃশ্য চিরন্তন। তবে আজকাল গৌরীদানও নাই মেয়েবা স্বামীর হাত ধরে হাসতে হাসতে শ্বশুর বাড়ী চলে যাচ্ছে। অবশ্য আদিবাসীদের মধ্যে বিদায়ের এই করুণ দৃশ্য এখনও দেখা যাচ্ছে। তবে বর্তমান আদিবাসীদের কেউ কেউ উচ্চশিক্ষিত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিও লাভ করছে, তাদের বিবাহে সৃষ্টি হয় আনন্দ-উল্লাসের বাতাবরণ—

ত'কে যে দেখে ছিলি টুটুল শুয়র বাগালি।
শুয়র-টুয়র ছ্যাড়ে টুটুল বর সাজে আলি।

(তথ্য সূত্র : দেশ ৬। ৮। ৮৮)

লোকসঙ্গীতের একটি ধারা হাপুগান

আজ ৬০/৭০ বছর আগেকার কথা। গ্রাম-গঞ্জে এক রকম বাগ্‌ধারা প্রচলিত ছিল। যেমন 'মুখে যেন হাপুরি ফুটছে'। কেউ তার দুঃখের কাহিনী একনাগাড়ে বলে গেলে শ্রোতাকে বিরক্ত হয়েই বলতে শুনেছি, আর ''হাবু গাইতে'' হবে না। কি চাই বল। কাউকে অনেকক্ষণ দুশ্চিন্তায় কাটাতে হলে বলতে শুনেছি, একা বসে বসে ''হাপু'' শুনছিলাম। এই বাগধারা 'হাপুরি ফোটা', 'হাবু গাওয়া' বা হাপুগোনা থেকে হাপুগান বা পীনায়নজনিত পরিবর্তিত ধ্বনি-রূপ হাবুগান সম্বন্ধে একটা ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

বঙ্গীয় শব্দকোষে 'হাপু' শব্দের উৎস 'হাঁক' দেখা যায়। সেই হিসেবে 'হাপু'র অর্থ হয় হাঁকিয়ে যাওয়া। দীর্ঘশ্বাসজনক দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ বা উদ্বেগের ফলে প্রমাদ গোনা। রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দরে আছে—'বুড়া কহে বাপু, কেন হাপু গোণ, যুক্তি আছে।' ভারতচন্দ্রে পাই—'মালিনী কহিছে বাপু, কেন এত ভাবা হাপু, আমি হাটবাজার করিব।' আবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিচয়ে দেখি—"পেট নিয়ে দ্বারে দ্বারে যদি গুণো হাপু। এমন সন্ন্যাসে তোর কাম কিরে বাবু।"

এই সমস্ত উদাহরণ ও বাগ্‌ধারা বিশ্লেষণ করে আমার ধারণা হয়েছে—কোন বিষয়ের ওপর ছোট ছোট গান বেঁধে যে গান একনাগাড়ে গাইতে গাইতে গায়ক বা গায়িকা হাঁপিয়ে উঠে ও মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে তাকেই বলে হাপুগান। লোকসঙ্গীতের একটি ধারা এই হাপু সঙ্গীত। যদিও এই হাপুগানের বা হাবু গানের উৎসস্থল বীরভূম জেলার লাভপুর অঞ্চল বলে দাবী করা হয়, তা সত্ত্বেও এই গান মুর্শিদাবাদ বর্ধমান ও বাঁকুড়া অঞ্চলে কিছুদিন আগে পর্যন্ত বেশ প্রচলিত ছিল। তবে এখন আর হাপুগান গেয়ে গায়কের পেট ভরে না; আর কৌতুককর, কিছুটা আদিরসাত্মক, কিছু কিছু অর্থহীন শব্দের ফুলঝুরি ফুটিয়ে একনাগাড়ে গাওয়া এই গান কিছু কিছু কিশোর-কিশোরীকে আকর্ষণ করলেও সাধারণ মানুষ একে ভিক্ষাবৃত্তির একটা পন্থা বলেই মনে করে। তাই ধীরে ধীরে লোকসঙ্গীতের এই ধারাটি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে প্রায় শুকিয়ে এসেছে। তবে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ গান এখনও কিছু কিছু প্রচলিত আছে। বর্ধমান জেলায় এখনও কিছু কিছু স্থানে ছোট ছোট ছেলেরা হাপুগান গেয়ে ভিক্ষা করে। লুপ লাইনের ট্রেনের কামরাতেও মাঝে মাঝে হাপুগান গেয়ে ভিক্ষা করতে দেখা যায়।

গ্রামের বাজিকর হাড়ি, ডোম, বাগদী ও কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের মোদক, মুদি জাতির অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত যুবক গ্রামের কিছু কিশোরী-কিশোরদের নিয়ে হাপুগানের দল বাঁধে ও গ্রামের মনসার ঝাঁপান, শিবের গাজন উপলক্ষে ও মেলাখেলায় হাপুগান গেয়ে বেড়ায়।

তবে এ গানের সাধারণ ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট উৎসব অনুষ্ঠান বা উপলক্ষ নাই। কোন নির্দিষ্ট পালাগানও নাই আবার কোন নির্দিষ্ট স্থানে আসর বেঁধে গাওয়াও হয় না। যেখানে গ্রামের দু'চার জন নিম্নশ্রেণীর যুবক কিশোর-কিশোরী নিয়ে হাপুগানের দল বেঁধে গ্রামে গ্রামে হাপুগান গাইতে বের হয়। সেখানে ছোট ঢোলক, খোল, নূপুর এইসব যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এদের গানের বিষয়বস্তু সাধারণত

সামাজিক ব্যাভিচার, ন্যায়-অন্যায় আবার সাঁওতাল বিদ্রোহের মতো কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়েও গান রচিত হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষত আমাদের এই বর্ধমান জেলার গ্রামেগঞ্জে যা দেখেছি সেখানে গোটা দুই নিম্ন শ্রেণীর কিশোর-কিশোরী আদুর গায়ে বা একটা ময়লা ছেঁড়া জামাপ্যান্ট পরে হাতে বেতের ছড়ি ও দু-টুকরো খোলাম কুচি (ভাঙ্গা হাঁড়ি কলসীর টুকরো) নিয়ে গৃহস্থ বাড়ী বাড়ী গান করে বেড়ায়। এই সব গান ছাড়া কিছু কৌতুককর বা আদি রসাত্মক ঘটনা নিয়ে রচিত। গানের ধুয়ো হিসেবে অর্থহীন কৌতুককর কিছু কিছু শব্দের সংমিশ্রণ থাকে যার মধ্যে রায়বেশে নাচের যে 'বোল' যেমন "তিলিতা তিলিতা" "জাগ্ জাগ্ জাগ্‌রে ঘিনা"—তার কিছু সংমিশ্রণ থাকে। এরা বাম বগলে ডান হাতের চেটো ঢুকিয়ে বাঁ হাতের চাপ দিয়ে এক রকম 'প্যাঁক, প্যাঁক' শব্দ করতে করতে গান করে আবার মধ্যে মধ্যে দুটো 'খোলাম কুচি' দিয়ে খট, খটাখট্ শব্দ করতে করতে বা গানের তালে তালে নিজের পিঠে বেত দিয়ে 'কট্ কটাকট্' শব্দ করতে করতে একনাগাড়ে গেয়ে যায় আর মাঝে মাঝে দুই ঠোঁটের সাহায্যে উর্-র্-র্ ঝঙ্কার তুলে গানের 'ধুয়ো' গায়। এক একবার দু হাতের আঙুল দিয়ে তুড়ি দিতে দিতেও গান করে।

তাদের হাপু বা হাবুগানের নমুনা—

(১) নারকোল ত্যাল শিশেয় ভরা রইলো গুঁজিতে।
ঝোকেন আমার চালন গেছে তিনটের গাড়ীতে,
ধুয়া উর্-র্-র্ তিনটের গাড়ীতে।
উর্-র্-র্ জাগ্-জাগ্ জাগরে জাগ্
জাঘিনা ঘিনা জারে ঘিনি জাগ।

(২) হাবু শুনে কাবু হয়ে যাবে গো
কাগজী লেবু টিপে দিয়ে ঝোল সাবু খাবে গো—
খ্যাসাক দোম্ খ্যাসাক দোম্
কম্বল ছেঁড়া ভেড়ার লোম,
খ্যাসাক দোম।

(৩) তিলক ঝাঁই তিলক ঝাঁই
দিয়ে থুয়ে কিছুই নাই।
খিঁচাক দোল, খিঁচাক দোল
এক পো চালে ন পো গোল।

দ্বিতীয় ও চতুর্থ পঙ্ক্তির অর্থ তবুও বোধগম্য হয় কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় পঙ্ক্তি একান্তই অর্থহীন বলেই মনে হয়।

(৪) ঝোকন আমার রাঁধে ভালো
কুলে বেগুনে
ফুক দিতে মুখ পুড়ে গেল
ঘুঁটের আগুনে।
উর্-র্-র্ ঘুঁটের আগুনে
জাগ্ জাগ্ জাগিনা ঘিনা।

সমীরকুমার অধিকারী সংগৃহীত উপরের গানগুলি মূলত বীরভূম জেলাতে প্রচলিত থাকলেও বর্ধমান জেলাতেও অনুরূপ গান প্রচলিত আছে। তবে এর সঙ্গে কিছু সংযোজনও হয়েছে। যেমন—

খিচাক দোম খিচাক দোম
এক পো চালে তিন পো গম্
উর্-র্-র্ জাগ্ জাগ্ জাগিনা ঘিনা
পরণে ছেঁড়া টেনা
একটা কিছু কাপড় দেনা।
হেঁই মায়ে তোর পায়ে পড়ি
দে-না দুটো টাকাকড়ি
হেঁই হাফু হেঁই হাফু...

আবার সমীরবাবু কিছু আদি রসাত্মক হাপু গানের উল্লেখ করেছেন—যেগুলি এ অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত নাই।

জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে প্রচলিত থাকলেও থাকতে পারে। সে কারণে এর দু একটির উল্লেখ করছি—

১। দাঁড় কেয়ো বসেছিল বড় ঘরের চালে
সেই ফাঁকে একটা ছোঁড়া কাজ সেরে নিলে।
উর্-র্-র্ কাজ সেরে নিলে
ও কাকিমা কি হোল?
আইবুড়োতে জাত গেল
পেট ফুলেছে হাসপাতালে
যাই চলো।

জাগ্-জাগ্...

২। কালো জোলো দেখতে ভালো
মাথায় বাঁকা টেরি
আমার মনে, মনে হয়, মুখে বলতে নারি।
উর্-র্-র্ মুখে বলতে নারি...
আজকাল তো চলছে ওসব দোষ কি
তাতে হয়।
কি করবে পাড়ার লোকে জাগ্-জাগ্
জাঘিনা ঘিনা—
কেবল সেই ভাতারটাকেই ভয়।

সমীরবাবুর কথায়—"কতো বিচিত্র বিষয় নিয়েই না হাপুগান রচিত হয়েছে। এমন কোন সামাজিক সমস্যা নেই, এমন কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিষয় নেই যাকে নিয়ে হাপুকবি গান না বেঁধেছেন? মানবজীবনসহ সমস্ত জগৎ ব্যাপারকেই হাপুগান স্পর্শ করেছে।" (লোকসংস্কৃতি গবেষণা—৯ম বর্ষ) বর্ধমান শহরে কিংবা সুদূর পল্লীতে দু একজন হাপুগান গাইতে এলেও এ গান এ জেলা থেকে প্রায় অবলুপ্ত। এর কারণ এ গান গেয়ে গায়কের পেট ভরে না। কিশোর-কিশোরী ও নিম্নশ্রেণীর ছেলেরা কৌতুককর এই গানে খানিকটা মজা পেলেও সাধারণ গৃহস্থ এ গানকে ভিক্ষাবৃত্তির একটা কৌশলই মনে করে।

বারো অধ্যায়

লোকশিল্প

লোকশিল্প লোকসাধারণেরই সৃষ্ট শিল্পকর্ম। লোকসাহিত্য যেমন লোকেরা আপনাআপনি সৃষ্টি করে চলে লোকশিল্পও তেমনি লোকসাধারণ আপন খেয়ালে সৃষ্টি করে যায়।

বৌদ্ধধর্মের পতনোন্মুখ কালে ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুদয়ে জাতিভেদ প্রথা যখন কঠোর ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, পুরোহিত শ্রেণীর মধ্যে তখন অহংকার ও প্রাধান্যের মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে, ফলে শিল্পকলার অনুশীলন নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায় ও জীবিকা-বৃত্তি হয়ে ওঠে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ভাষায় :

The caste system was established de novo in a more rigid form. The drift of Manu and the later Puranas is in the direction of glorifying the priestly class which set up most arrogant and outragious pretensions.

The arts thus being relegated to the low castes and the professions made hereditary...

এই ভাবেই সেই আদ্যিকাল থেকে সাধারণ লোকের হাতে গড়ে উঠতে থাকে এই লোকশিল্প—এই শিল্পকর্মে যেমন সমাজ, ধর্ম ও অর্থনৈতিক চিত্র ফুটে উঠেছে তেমনি শিল্পীর নিজস্ব ভাবনাও ছাপ রেখেছে। এই শিল্প-চেতনাই লোকশিল্পের বড় উপাদান। নানা সাংকেতিক চিহ্নের মধ্যে যেমন ধর্মীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তেমনি চিত্রকল্পের মধ্যে ফুটে ওঠে শিল্পীর নিজস্ব অভিব্যক্তি, যে অভিব্যক্তি সে আত্মীকরণ করেছে প্রকৃতির রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ থেকে। মানব সভ্যতার উষাকাল থেকে বর্তমান যান্ত্রিক যুগেও এই লোকশিল্প গড়ে ওঠে কতকগুলি জ্যামিতিক ফর্মের সমন্বয়ে, যে ফর্ম সে আয়ত্ত করেছে প্রকৃতি থেকেই—বৃত্তাকার সূর্যচন্দ্র, ত্রিকোণাকৃতি বৃক্ষপত্র, দিগন্তস্পর্শী অর্ধবৃত্ত রামধনু, সমুদ্রের তরঙ্গায়িত রূপ; এই সমস্ত সাধারণ মানুষের মনে জ্যামিতিক নক্শার প্রেরণা যুগিয়েছে। লোকশিল্পের

প্রধান প্রেরণা এসেছে যেমন একদিকে প্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ ও বর্ণ থেকে তেমনি এসেছে ধর্মীয় ও সামাজিক উৎস থেকে। মেয়েরাও থেমে থাকেনি, তারাও বংশপরম্পরায় বয়োবৃদ্ধাদের কাছ থেকে এই জ্যামিতিক নক্‌শার তালিম নিয়ে লোকশিল্পের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে। এই লোকশিল্পের মধ্যে আছে ডোকরা-শিল্প, শোলা-শিল্প, খড়-শিল্প, কাষ্ঠ-শিল্প, পট-শিল্প, কাঁথা-শিল্প, পুতুল-শিল্প, বাঁশ ও বেতের শিল্প, রাখি-শিল্প, বড়ি-শিল্প প্রভৃতি।

ডোকরা-শিল্প : জেলার পশ্চিমাঞ্চলে যেমন ভারী শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে, পূর্বাঞ্চলে তেমনি হস্ত ও কারুশিল্পের প্রসার ঘটেছে। এই সমস্ত লোকশিল্পের অধিকাংশই পরিবারভিত্তিক। "এই সমান্তর সংস্কৃতির ঐতিহাসিক নিদর্শন কৃষিকাজ, লিখনপ্রণালী, ব্রোঞ্জ ইত্যাদির মতো মোম-ছাঁচ গলানর ঢালাই রীতির cire perdue metal casting অন্যতম নিদর্শন। এই ধাতুশিল্পই ডোকরা-শিল্প। এই বিশিষ্ট রীতির শিল্প ভারতীয় জনকৃতির ধারা, কোন বিদেশাগত ধারা নয়।"

"এই শিল্পের প্রাচীনতার প্রমাণ পাওয়া যায় শিল্পশাস্ত্র ও পুরাণাদি থেকে। মানসার, অগ্নিপুরাণ ও মৎস্যপুরাণে এই ধাতুশিল্প-রীতির বিস্তৃত বিবরণ আছে। পদ্ধতি হলো স্থাপক ও স্থপতি অর্থাৎ শিল্পী প্রার্থনাদি ধর্মীয় ক্রিয়ানুষ্ঠান শেষ করে, ঢালাই-এর চুল্লী ও মূর্তির জন্য মোম-ছাঁচ তৈরীর কাজ শুরু করবেন। মোমের সঙ্গে ধুনো ও তেলের আনুপাতিক মিশ্রণের কাজ খুব সাবধানে করতে হবে। তারপর যে মূর্তি গড়া হবে সেটি শিল্পী বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে মোম-ধুনো-তেলের মিশ্রিত পিণ্ড দিয়ে তৈরী করবেন। ধ্যান করে নিখুঁতভাবে মূর্তি রূপায়িত করার কথা বলা হয়েছে শিল্পশাস্ত্রে। মোম-ছাঁচের ওপর মাটির প্রলেপ দিয়ে তাতে গলিত ধাতু ঢেলে দেওয়ার জন্য ছিদ্র রাখা হবে। তারপর চুল্লী থেকে বার করে জলে ঠাণ্ডা করে ছাঁচটিকে ভেঙে ফেললে ধাতুমূর্তিটি বেরিয়ে আসবে, বাকি থাকবে মেজে ঘষে ঠুকে পরিষ্কার করার কাজ।" (বিনয় ঘোষ) এই শিল্পীরাই ডোকরা-শিল্পী। ডোকরা কথার আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধ, নীচকুলোদ্ভব—চলিত কথাতেও প্রচলিত আছে 'বুড়ো ডোকরা' বলে গালি দেওয়ার রীতি। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে আছে :

কোথা হতে বুড়া এক ডোকরা ব্রাহ্মণ
প্রণাম করিল মোরে এ কি অলক্ষণ।

এই অর্থে ডোকরা অতি নীচ জাতীয় ধাতুশিল্পী কর্মকার। এ জেলায় যে সমস্ত মিস্ত্রী লোহা নিয়ে কাজ করে তাদের বলা হয় কর্মকার। কিন্তু যারা অন্য ধাতু নিয়ে কাজ করে তাদের বলা হয় স্যাকরা। এ দিক দিয়ে বিচার করলে ডোকরা-শিল্পীদের কর্মকার বলা অপেক্ষা স্যাকরা বলাই যুক্তিযুক্ত।

বর্ধমান মেলার আউসগ্রাম থানায় গুসকরা-মানকর রোডের ধারে দরিয়াপুরে এই ডোকরা-শিল্পীদের বাস। এই ডোকরা-শিল্পীরা মোম-ছাঁচ গলানো cire perdue (শিরে পারদ্যু) পদ্ধতিতে তাদের শিল্পকর্ম তৈরী করে। আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত এই ফরাসী নামের পরিভাষা মোম গলানো পদ্ধতি।

কিন্তু দরিয়াপুর আর শুধু দরিয়াপুর কেন ডোকরা-শিল্পের প্রাধান্য যেখানে সেই বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়াতে ঠিক এই মোম গলানো পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় না। মোমের পরিবর্তে অন্য উপকরণ ব্যবহৃত হয়। এখানে যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় সেটি হলো—প্রথমে বালিমাটির মূর্তির একটি মডেল তৈরী করা হয়। তারপর রজন অথবা ধুনো সরষের তেলে ফুটিয়ে এমন এক কাথ বানানো হয় যা রবারের মত স্থিতিস্থাপক অর্থাৎ টানলে বেড়ে যায়। (কতকটা পুডিং-এর মত) আবার গরম করলে মোমের মত গলেও যায়। তারপর মাটির মডেল মূর্তিটির গায়ে লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি কাথের ফিতে বা লেত্তি সাজিয়ে প্রয়োজনমত কাদার প্রলেপ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় জমাট ভাবে। কাথের প্রলেপ ও মাটির প্রলেপসহ মডেলটি রোদে শুকানো হয়। বাইরের মাটির আবরণের স্থানে স্থানে ফুটো রাখা হয় যাতে সমস্ত পিণ্ডটিকে গরম করলে সমস্ত কাথ গলে গিয়ে সেই ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। এই ভাবে ভিতরের কাথ বের করে অন্য সব ছিদ্র বন্ধ করে দিয়ে একটি মাত্র ছিদ্র রাখা হয়। সেই ছিদ্রপথে চুল্লীতে গলানো পিতল ভিতরে ঢেলে দেওয়া হয়। ছাঁচের মধ্যে গলিত ধাতু জমে যাবার পর বাইরের মাটির আবরণ ভেঙে ভিতরের মডেলটি বের করে আনা হয়। প্রাথমিক মডেলটি কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানচ্যুত করা হয় না, মূর্তির গায়ে জাফরিকাটা অংশ যেখানে কম বা একেবারেই নাই সে-সবক্ষেত্রে এই রীতি প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু জাফরিকাটা অংশ যেখানে বেশী বালিমাটির মডেলটির ঢাকাটি খুঁচিয়ে বের করে দেওয়া হয় যার ফলে ভিতরটা ফাঁপা থেকে যায়। এরপর উকো প্রভৃতি যন্ত্র দিয়ে নক্‌শার কাজ ও পালিশ সম্পন্ন করলে শিল্পকর্মটি পূর্ণ রূপ পায়।

এই পদ্ধতিতে অভিষ্ট মূর্তিটি ফাঁপা হয়। নিরেট মূর্তি করতে হলে অভিষ্ট মডেলটি মোম দিয়ে তৈরী করতে হবে। খুব নরম মোম দিয়ে তৈরী বলে এগুলিকে কারুকার্য শোভিত করা যায়, এরপর তাপ প্রয়োগ করে ফাঁপা করে নিয়ে সেই ফাঁপা অংশে গলিত ধাতু ঢেলে দেওয়া হয়। এরপর আচ্ছাদনটি ভেঙে নিরেট মূর্তি বের করে আনা হয়।

তবে এ জেলার ডোকরা-শিল্পীরা হতদরিদ্র—পরনে নেংটী, মেয়েরা মূর্তি বিক্রি করে যে পুরানো শাড়ী পায় সেই শাড়ী অথবা অভাবে গামছা পরে লজ্জা

নিবারণ করে। আস্তানা বলতে তালপাতার ছাউনি দেওয়া ঝুপড়ি। তাদের পক্ষে এই মোমের মডেল করে নিরেট মূর্তি করা সম্ভব হয় না।

১৯৫২ সালে আমি যখন খাদ্য বিভাগে কর্মসূত্রে গুসকরায় ছিলাম তখন স্বচক্ষে তাদের এই অবস্থা দেখেছিলাম। তখন দরিয়াপুরে এরা ঘর ১৫/১৬ ছিল। এরা তৈরী করত ধান, চাল, চিঁড়ে মাপার পিতলের সেরী, আধসেরী ও পোয়া মাপের পাই, ঘুঙুর, কাজললতা, ছোট ছোট লক্ষ্মীনারায়ণ, পেঁচা ইত্যাদি। পরে শুনেছিলাম আঞ্চলিক ডিজাইন সেন্টার থেকে এদের ২/১ জনকে কলকাতায় ডিজাইন সেন্টারে নিয়ে গিয়ে তাদের সাবেক পদ্ধতির মান উন্নততর করার জন্য ট্রেনিং দেওয়া হয়। সরকার থেকে সমবায় গঠন করে ঋণ দেবার ব্যবস্থা করা হয় ও এদের শিল্পকর্মের বিপণনের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে এদের অবস্থা কিছুটা ফিরেছে। অন্তত খেয়ে পরে বাঁচছে।

ডোকরাদের এই মোমছাঁচ গলানো পদ্ধতি এক প্রাচীন পদ্ধতির ঐতিহ্যবাহী। বিনয় ঘোষের মতে—"নবোপলীয় যুগের মৃৎশিল্প থেকে chalcalithic বা তাম্রপ্রস্তর যুগের ধাতুশিল্পে উত্তরণ কালে এই মোমছাঁচ লোপী ধাতুশিল্পেব বিকাশ হয়। ...বাংলার ডোকরা-শিল্প একটি অতি প্রাচীন ধাতুশিল্প—প্রত্নবিজ্ঞানের বিচারে প্রায় পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষেও এই সুপ্রাচীন লোকায়ত শিল্পধারা আজ পর্যন্ত বহমান রয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন বাংলাদেশে।"

এদের আদি বাস ছিল নাগপুর বা ছোটনাগপুর অঞ্চলে, সেখান থেকে তারা ছড়িয়ে পড়ে পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বর্ধমানের দরিয়াপুর অঞ্চলে। এর কারণ এদের যাযাবর বৃত্তি। এরা কোথাও এক জায়গায় থাকে না। তার অবশ্য একটা পেশাগত কারণও আছে। এদের তৈরী শিল্পকর্ম ধাতুশিল্প—ধাতুমূর্তি একবার কেউ কিনলে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়, ফলে কোন অঞ্চলে দীর্ঘদিন থাকলে তাদের শিল্পকর্মের চাহিদা থাকে না। ফলে এদের জিনিসও বিক্রি হয় না; এদের পেটও চলে না। তাই তাদের নতুন নতুন জায়গায় গিয়ে চাহিদা সৃষ্টি করতে হয় রুজি-রোজগারের খাতিরে।

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের দিক দিয়ে ডোকরা কামারদের অনেকেই পটুয়াদের মত না-হিন্দু না-মুসলমান। তবে কোথাও কোথাও এরা নিজেদিগকে মুসলমান বলেই পরিচয় দেয়। আবার কোথাও এরা হিন্দুর পালনীয় রীতিনীতি মেনে চলে। বাঁকুড়ায় যখন এরা প্রথম বসতি স্থাপন করে, এদের উপাধি ছিল মাল। বাঁকুড়ায় মালডাঙ্গা নামে গ্রামের নাম থেকে মনে হয় এখানে এদেব প্রথম বসতি ছিল।

তারপর এরা নিজেদের বৃত্তি অনুসারে নিজদিগকে স্যাকরা বলে পরিচয় দিতে আরম্ভ করে। এদের পিতামহের নাম যদি হয় রহিম স্যাকরা। পিতার নাম মতিলাল স্যাকরা। মেয়েদের নাম কমলাবিবি, লক্ষ্মীবিবি। এরা বিবাহে ও ধর্মকর্মে মুসলমানী আচার-পালন করে। এদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় মসজিদে। বিবাহিত মেয়েরা কপালে ও সিঁথিতে সিঁদুর দেয়, হাতে নোয়া পরে কিন্তু শাঁখা ব্যবহার করে না। সমাধি, ছুন্নৎ, তালাক প্রথাও পালন করে। পুরুলিয়ার ডোকরারা হিন্দু আচারই পালন করে। আমার মনে হয় এরা ছিল অস্ট্রিক জাতি সম্ভূত, পরে ইসলামী শাসনের সময় জোর করে এদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করা হয়। পরবর্তীকালে ভারত সেবাশ্রম, বিশ্বহিন্দু পরিষদের বা আর্য সমাজের মত কোন প্রতিষ্ঠান এদের শুদ্ধি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। তবু হয়ত মুসলমানদের হাতে অত্যাচারিত হবার ভয় না যাওয়ায় মধ্যপথ বেছে নিয়ে তারা আধা-হিন্দু আধা-মুসলমান।

ডোকরাদের মধ্যেও আবার জাতিভেদ, গোত্রভেদ আছে। কারও গোত্র নাগ (নাগপুরিয়া) জাতি ডোমার, কারও বা গোত্র বাঘ, কেউবা কর্কট গোত্রীর বান্‌থা জাতি। গোত্র থেকে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে এই সব বাঘ, কর্কট, নাগ, কচ্ছপ অস্ট্রিক জাতির টোটেম।

সে যাই হোক আজ এরা অনেকেই হিন্দুধর্মের মূল স্রোতে ফিরে এসেছে। আর সরকারও এদের উন্নয়নে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সরকারের ডিজাইন সেন্টারে ও ক্ষুদ্রশিল্প নিগমের উদ্যোগে এদের কিছু কিছু শিল্পকর্ম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করছে। তবুও অধিকাংশ ডোকরারা এখনও অন্ধকারে দারিদ্র্য জীবনযাপন করছে। তাই বিনয় ঘোষের কথায়—"মনে রাখতে হবে যে শিল্পীদের সামাজিক জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ছাড়া তাদের প্রাপ্য সম্মান মর্যাদা দেওয়া ছাড়া, আর এই শিল্পকর্মের প্রেরণা দিতে পারে এক রকম নতুন সামাজিক চাহিদা (social demand)। এই চাহিদা সৃষ্টি করা ছাড়া, কেবল বাইরের পোষকতায় ও লোকসংস্কৃতি-সভায় সহানুভূতিশীল বাহবায় ডোকরা-শিল্প ও শিল্পীর পুনরুজ্জীবন সম্ভব হতে পারে কিনা।"

আশার কথা All India Handicrafts Board-এর অনুমোদিত কলকাতার Regional Design Centre-এর প্রাক্তন ডিরেক্টার প্রভাস সেনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ডোকরাশিল্পীদের অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। আজ ডোকরাশিল্পীরা রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাচ্ছেন। তাদের শিল্পকর্ম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করছে। বর্তমানে অশীতিপর-বৃদ্ধ শিল্পী শম্ভুনাথ কর্মকার প্রথম ১৯৬৬ অব্দে 'রথ'

শিল্পকর্মের জন্য রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ-এর কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পান। এরপর বৈকুণ্ঠ কর্মকার ডোকরা-ঘোড়া শিল্পকর্মের জন্য ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরির কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করেন। হারাধন কর্মকার জ্ঞানী জৈল সিং-এর কাছ থেকে ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে "লক্ষ্মীসাজ" শিল্পকর্মের জন্য রাষ্ট্রপতির পুরস্কার লাভ করেন। কলকাতার আঞ্চলিক ডিজাইন কেন্দ্রে কর্মরত মাতর কর্মকার ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দে রাষ্ট্রপতি ভেঙ্কটরমনের কাছ থেকে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার একটি তাম্রফলক ও দশ হাজার টাকা নগদ লাভ করেন। ১৯৯০ সালে হারাধন কর্মকার ও মহামায়া কর্মকারকে লণ্ডন ক্ষুদ্রশিল্প কেন্দ্রে তাঁদের ডোকরা শিল্পকর্মের প্রদর্শনী দেখাতে পাঠানো হয়।

মধ্যপ্রদেশের বাস্তার জেলা থেকে উড়িষ্যার ঢেনকানল অঞ্চল হয়ে এই শিল্পী সম্প্রদায় মেদিনীপুর বাঁকুড়া ও বর্ধমানের দরিয়াপুরে ছড়িয়ে পড়েছে। অতি প্রাচীনকাল থেকে এই শিল্পীদের শিল্পকর্ম বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। মহামায়া কর্মকারের ১২ বছরের সন্তান লকাই-এর 'মা ও শিশু' এক অপূর্ব শিল্পকর্মের স্বাক্ষর। তবে কেবল কোন শিল্পী আন্তজার্তিক স্বীকৃতি পেয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলেও দরিয়াপুরের বর্তমানে ৩৬ পরিবার আদিবাসী এই শিল্পীদের অনেকেরই শিল্পকর্মদ্বারা পেট চলে না। অনেককে দিন মজুর বা রিক্সাচালনা বৃত্তিও গ্রহণ করতে হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত না এদের শিল্পকর্মের জন্য নতুন সামাজিক চাহিদা সৃষ্টি করা যাবে, ততদিন এই শিল্পকর্মীদের অবস্থার পূর্ণাঙ্গ উন্নতি সম্ভব নয়।

সোলা-শিল্প : সোলা-শিল্প জেলার লোকশিল্পসংস্কৃতির এক উল্লেখযোগ্য অঙ্গ। বর্ধমান জেলার বনকাপাশী, কেতুগ্রাম ও পালিটা গ্রামে এবং ভাতার থানার মোহনপুর, কামারপাড়া, পারহাট এবং বর্ধমান শহরের লাকুড়ডি অঞ্চলে কিছু সোলাশিল্পী আছে।

সোলা হলো বর্ষায় জলজাত ক্ষুপ বিশেষ (Aeschynomene, the sponge wood)। এই জলগাছ অত্যন্ত হালকা। খুবই নরম কাঠ; এর কোন চাষ করতে হয় না, নিজে নিজেই আগাছার মত পুকুর, জলা ও খালের ধারে অজস্র জন্মায়। কিছুদিন আগেও জেলে কৈবর্তরা জলা জায়গা থেকে সোলা কেটে এনে তাড়ি বেঁধে পুকুরে ভাসিয়ে তাতে দাঁড়িয়ে মাঝ-পুকুরে মাছ ধরতো। এখন মটর, ট্রাকের টিউব ব্যবহার করছে। সাহেব সুবো ও সরকারী ফিল্ড অফিসারদের মাথায় থাকতো সোলা হ্যাট। ঐ হ্যাটেও সোলা ব্যবহার করা হতো। আর দেবদেবীর পুজোর চাঁদ মালায়, ডাকের সাজে, সোলা ব্যবহৃত হতো। দেবী মূর্তি সাজাতে বিদেশী সলমা-চুমকি দিয়ে প্রতিমার ডাকসাজ হতো। এই সলমা-চুমকি আসতো

বেলজিয়াম থেকে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় এই জিনিসের বিদেশ থেকে আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। শ্রাদ্ধের সময় সোলার কদমফুল দেওয়া ছোট ছোট সোলার রথ শ্রাদ্ধের পর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। সোলা-শিল্পের প্রধান উপাদান শুকনো সোলা-গাছ, দু'একটি তীক্ষ্ণ ধারালো ছুরি আর কাঁচি, জুড়বার জন্য তেঁতুল বীচির বা তুঁতে মেশানো ময়দার আঠা। প্রথমে সোলাকে খুব পাতলা কাগজের মত অথবা গোল বা খুব সরু করে কেটে নিতে হয়। এর নাম কাপ ও পাতুরি। এরপর শিল্পী কৃৎ-কৌশলের অভিজ্ঞতায় আঠা দিয়ে জুড়ে মনোমত মূর্তি তৈরী করে। এছাড়া ছোট ছোট পিনও ব্যবহার করা হয়।

কেতুগ্রাম থানার পালিটা গ্রামের অনন্ত মালাকার ১৯৬৬ সালে কলকাতার গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জী রোডে সপ্তর্ষি ক্লাবের বরাত দেওয়া সাত ফুট উঁচু সরস্বতী-মূর্তি সম্পূর্ণ সোলা দিয়ে তৈরী করলেন। এই অভিনব শিল্পকর্ম কলকাতায় গিয়ে প্রতিমাশিল্পের ক্ষেত্রে এক আলোড়ন সৃষ্টি করলো। এরপর থেকেই সোলা-শিল্প জাতে উঠলো। ১৯৬৮ সালে অনন্ত সোলার লক্ষ্মীমূর্তি গড়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাষ্ট্রীয় পুরষ্কার পেলেন। কাটোয়ার ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক থেকে লোনেরও ব্যবস্থা হলো। এরপর থেকেই সোলাশিল্পের অগ্রগতি তরতর করে এগিয়ে চললো।

এরপর অনন্ত ১৯৭০ সালে ২ ফুট ৩ ইঞ্চি সোলার দুর্গা তৈরী করলেন। প্রতিমাটি দিল্লীর সর্বভারতীয় হস্তশিল্প প্রতিযোগিতায় প্রদর্শিত হয় ও অনন্ত জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। সম্পূর্ণ দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পীরীতিতে নির্মিত অনন্তর ১২ ফুট সোলার দুর্গা কলকাতা সঙ্ঘমিত্র ক্লাবে পূজিত হয়। অনন্তর দুর্গা এরোপ্লেনে চড়ে আমেরিকাও পাড়ি দিয়েছে। অনন্তর শিল্পকৃতি নিয়ে তথ্যচিত্রও তৈরী হয়েছে। পিতার মৃত্যুর পর অনন্ত পালিটা ছেড়ে কীর্ণাহারে চলে যান ও সেখানে বাড়ী ভাড়া করে বাস করতে থাকেন। বর্তমানে ভাতার থানার মোহনপুরে মালাকাররা সোলার চাঁদমালা, ঠাকুরের সাজ এই সব তৈরী করে। কামারপাড়ার কিছু আদিবাসীও এই কাজে লিপ্ত আছে। তবে মঙ্গলকোট থানার বনকাপাশী গ্রামে ১৭ ঘর সোলা-শিল্পী আছে। এদের মধ্যে আছে সাহা, ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, মালাকার। যদিও মালাকারদের বৃত্তি এই সোলা-শিল্প তবে মনে হয় মালাকারদের এই কাজে সাফল্য দেখে সব রকমের জাতি এই শিল্পের প্রতি আগ্রহী হচ্ছে। এই শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এটা আশার কথা। গ্রামের কাত্যায়নী মালাকারের ছেলে আদিত্য মালাকার রাষ্ট্রীয় পুরষ্কার পেয়েছেন। আদিত্যের ছেলে আশিসও এই শিল্পকর্মের জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছে। এখানকার শিল্পীরা

মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, পূর্বস্থলী এমন কি যশোর থেকে সোলা আমদানী করে। এক একটা সোলার দাম সাইজ অনুসারে ২ টাকা থেকে ১০ টাকা পড়ে। সরকারী সাহায্যে এদের শিল্পকর্মের সুষ্ঠু বিপণনের ব্যবস্থা হলে এই অপূর্ব শিল্পকর্ম বিদেশী মুদ্রা অর্জন করতে পারবে।

মৃৎশিল্প : এ জেলায় মৃৎশিল্পের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। জেলায় যে সমস্ত শিখর দেউল, জোড়বাংলা মন্দিরে টেরাকোটা অলংকরণ আছে সেই সমস্ত টেরাকোটার ফুল, লতাপাতা, দুর্গা, শিব, হনুমান, রাবণ, হনুমানের গন্ধমাদন পর্বত আনয়ন, পুতনাবধ, কালীয় দমন, এমন কি পুরীর জগন্নাথ মন্দির বা খাজুরাহোর মত মৈথুনরত নরনারীর মাটির মূর্তি ছাঁচে তৈরী করে 'পণে' পুড়িয়ে মন্দিরে লাগানো হতো। এই সমস্ত টেরাকোটার মূর্তি সমকালীন মৃৎশিল্পীদের মৃৎশিল্পে দক্ষতার পরিচয় দান করে।

বর্ধমান জেলায় নতুনগ্রাম, কামারপাড়া, কাঞ্চননগর, বড়নীলপুর এবং প্রায় প্রতি গ্রামে যেখানে সূত্রধরের বাস, সেখানেই মৃৎশিল্পকর্ম গড়ে উঠেছে, দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণকে কেন্দ্র করে। দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণের যখন সিজন থাকে না তখন এরা মাটির টিয়াপাখী, শালিকপাখী, ঘোড়া, হাতি, বউ, পুতুল, ছাঁচে দুর্গা-কালীর মুখ তৈরী করেও রথ, আষাঢ় ও পৌষ-মেলায় বিক্রি করে। এই পুতুল জেলার প্রাচীন মৃৎশিল্পের ঐতিহ্যবাহী। এই সব পুতুল তৈরীতে মাটির কাজটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মাটি ঠিক মত তৈরী হলে তবে ঠিক মত পুতুল হবে। আর পুতুল তৈরী হবে ছাঁচে মাটি বসিয়ে কিংবা ছাঁচ ছাড়াই হাতের কায়দায়। এসব পুতুলের পা থাকে না। পা ঢাকা থাকে। হাত যেটা থাকে সেটা জগন্নাথের মূর্তির মত। পাখী-পুখরীর পায়ের জন্য ঝাঁটার কাঠি ব্যবহার করা হয়। পাখীকে বসাবার জন্য পায়ের নীচে একটা বরফির মত মাটির ষ্ট্যান্ড করে দেওয়া হয়। পুতুল তৈরী হলে রোদে ভাল করে শুকিয়ে খড়ি মাখানো হয়। খড়ির আস্তরণের ওপর রঙ পড়ে। সবুজ, লাল, নীল, হলুদ, কালো বিভিন্ন রঙের সুষম ব্যবহারের দ্বারা পুতুলগুলি শিশুদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

যারা দেবীমূর্তি তৈরী করে তারা প্রথমে খড় ও সুতলী দিয়ে দেবদেবীর মূর্তি অনুযায়ী কাঠামো করে নেয়। তারপর এঁটেল মাটির সঙ্গে তুঁষ মিশিয়ে এক মেটে করা হয়। মেটেল বা দোআঁশ মাটিকে ভাল করে পাট করে ছাঁচে দেবদেবীর মুখ তৈরী করে রাখা হয়। মূর্তির এক মাটি শুকোলে পর মেটেল বা দোঁয়াশ মাটি ভাল করে পাট করে পাতলা করে এক মাটির ওপর লাগিয়ে দেওয়া হয়। এর ওপর ভাল করে পালিশ করে মূর্তির অবয়ব মসৃণ করা হয়। এরপর মুখ ও আঙুল

বসিয়ে মাঝে মাঝে এঁটেল মাটির গোলায় ন্যাকড়া ডুবিয়ে এগুলি মসৃণভাবে বসিয়ে দেওয়া হয়, যাতে চুল ফাটলও না ধরা পড়ে। এরপর মুকুট, কাপড়, ছাঁচে তৈরী অলঙ্কার বসিয়ে সম্পূর্ণ করা হয়। মূর্তি ভাল করে শুকিয়ে গেলে খড়ি-গোলা দিয়ে রঙের বেস তৈরী করা হয়। এর ওপর শিল্পীর মনোমত রঙ সামঞ্জস্য করে দেওয়া হয়। আজকাল নানা রকম কেমিক্যাল রঙ পাওয়া যায়, যেগুলি এমনি চকচক করে। তা না হলে রঙের ওপর এরারুট ফুটিয়ে মাখিয়ে দিয়ে বার্নিশ রঙ দেওয়া হয়। বর্ধমান শহরের সর্বমঙ্গলা পাড়ায় শিল্পী হরিহর দে'র মাটির মূর্তি আঙ্গিকে, গড়নে, সৌন্দর্য-সুষমায় কুমোরটুলি ও কৃষ্ণনগরের মৃৎ-শিল্পীদের শিল্পকর্মের চেয়ে কোন অংশে কম তো নয়ই বরং শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে। ড. শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের পুষ্প প্রদর্শনীতে হরিহর যে মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন সেটিকে আলো আঁধারির সময় অনেকের জীবন্ত মূর্তি বলে ভ্রম হয়েছিল। সেই থেকেই হরিহরের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বর্তমানে লোকায়ত ফর্মে ব্রোঞ্জ টেরাকোটা, সিমেন্ট, ফাইবার গ্লাস-এর মাধ্যমে কর্মরত। বর্ধমানে দামোদর সেতুর ওপর নৃত্যরত বাউল ও কৃষক-দম্পতি, বর্ধমান রবীন্দ্রভবনের বহির্রঙ্গ সজ্জা ও বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বিধান রায়ের মূর্তি হরিহরের শিল্পকৃতির অনন্য নিদর্শন।

জার্মানীর আন্তর্জাতিক ট্রাডিশনাল আর্ট প্রদর্শনীতে হরিহর ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

বনপাশ কামারপাড়ার প্রখ্যাত শিল্পী ত্রিভঙ্গ রায়ের শিল্পকৃতি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পধর্মী। তবে হরিহর দে বা ত্রিভঙ্গ রায়ের শিল্পকর্মকে ঠিক লোকশিল্পের পর্যায়ে ফেলা যায় না। লোকশিল্পের গবেষক তপন করের মতে "এ-গুলোকে (কৃষ্ণনগরের পুতুল) লোকশিল্প বলা যায় না। এগুলো পশ্চিমের বাস্তব রীতির ভাস্কর্যের অনুসারী ক্ষুদ্রাকার অনুকৃতি মাত্র। তাছাড়া লোক অন্তর্নিহিত ভাবরূপটি কৃষ্ণনগরের পুতুল বহন করে না।" কৃষ্ণনগরের পুতুলের ক্ষেত্রে যদি এ মন্তব্য প্রযোজ্য হয় তবে হরিহর দে ও ত্রিভঙ্গ রায়ের শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবেই।

মৃৎশিল্পের আর এক পর্যায় পোড়ামাটির শিল্প। পোড়ামাটির এই শিল্পকর্মের মধ্যে যেমন আছে রানীপুতুল, ঘোড়া, হরিণ, পেঁচা তেমনি আছে সুদৃশ্য কুঁজো, কলসী, হাঁড়ি ইত্যাদি। এ জিনিস তৈরী করতে কোন ছাঁচ বা যন্ত্রের বালাই নাই। ছোট একতাল মাটি কুমোরের চাকে দিয়ে দুই হাতের আঙুলে টিপে টিপে আঙুলের কারসাজিতে ২/৩ মিনিটের মধ্যে রানী, ঘোড়া, হাতি বেরিয়ে আসবে। তারপর মাটি দিয়ে লম্বা ডাঁটি পাকিয়ে হাতি ঘোড়া হরিণের পা, হরিণের শিং

তৈরী হবে। আবার চাকাও লাগান যায়। মাটি দিয়ে রিঙ্-এর মত করে তলায়, সামনে ও পিছনের দুই পায়ের মাঝ বরাবর আড়াআড়ি সরু লোহার তার লাগিয়ে দিয়ে সেই কাঠির দুই প্রান্তে চাকা ফিট করলেই হাতি ঘোড়ার মুখে দড়ি বেঁধে টানলেই গড় গড় করে চলবে। অবশ্য তার আগে ভাল করে শুকিয়ে কাঠ কয়লায় পুড়িয়ে নিতে হবে। হাঁড়ি, কলসী, ডাবা, কুঁজো তৈরী করতে এক ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন পিটুনির কাজ চালিয়ে যেতে হয়। পণে পোড়াবার আগে পণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শিবের পুজো করে পুতুল, হাঁড়ি, কলসী থরে থরে সাজিয়ে কাঠকয়লা দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। যে সব হাতি, ঘোড়া, ধর্মরাজ, রক্ষাকালী, মনসার কাছে মানত থাকে তাতে রঙ দিতে হয় না।

পুতুলগুলিকে শিশুদের কাছে আকর্ষণীয় করতে রঙ দেবার প্রয়োজন হয়। যেহেতু পোড়ামাটির পুতুল সেই হেতু রঙ দেবার টেকনিকও স্বতন্ত্র। প্রথমে গরম জলে চুন ভিজিয়ে রেখে সেই চুন একাধিক বার কাপড়ে ছেঁকে নিতে হবে। আর সেই চুনের দ্রবণে পুতুলগুলিকে বারবার ডুবিয়ে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। চুন শুকিয়ে গেলে এরারুটের আঠার মিডিয়াম দেওয়া লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, কালো রঙের সুষম টান পোঁচের মাধ্যমে ঘাগরা, জামা, মুখ, চোখ, আঁকা হয়। তবে রানী পুতুল রঙ করতে চুন চলবে না। তেঁতুল বীচির আঠা অভ্রের রঙে চুবিয়ে দেওয়া হয়, একটু শুকিয়ে গেলে অন্য ম্যাচলায় আলতা গোলা জলে আর একবার চোবাতে হবে। ফুটে উঠবে ঝিকমিকি লালের বর্ণ সুষমা। কালো রঙ দিয়ে চুল, চোখ হবে; চোখ দুটি হবে আকর্ণ বিস্তৃত। ঘাগরার ওপরে সবুজ রঙ তার নীচে হলুদ কালোর পটি, তার নীচে চার-পাঁচটি রঙের তুলির টানে ঘাগরা।

বর্তমান যুগে অজস্র দেশী-বিদেশী কলকারখানায় তৈরী টিনের প্লাস্টিকের রবারের পুতুলের পাশাপাশি আমাদের জেলার কুম্ভকার, সূত্রধরদের নিজ হাতে গড়া মাটির পুতুল চিরন্তন সৌন্দর্যের বাহক—বাংলার মাটির পুতুলের ঐতিহ্যকে আজও ধরে রেখেছে। এ বড় কম গৌরবের কথা নয়। তবে কলের তৈরী চটকদার সস্তা পুতুলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লোকশিল্পের ঐতিহ্যবাহী এই মাটির পুতুল কতদিন পাল্লা দিতে পারবে সেটা ভবিষ্যৎই বলতে পারবে।

কাঠের পুতুল : মাটির পুতুলের পাশাপাশি এই কাঠের পুতুল জেলার তথা বাংলার লোকশিল্পের এক বৈদুর্য্যমণি। বর্ধমান জেলার ভাতার থানার হরিবাটী ও কাটোয়া মহকুমার কাটোয়া, দাঁইহাট, কেতুগ্রাম, পাটুলি, কাষ্ঠশালী ও নতুনগ্রাম অঞ্চলে এই কাঠের পুতুলশিল্পের ধারা একটা বিরাট জায়গা জুড়ে রয়েছে। কালীঘাটের পুতুলের ঐতিহ্যবাহী মিশরের মমির আকারের এই মমি পুতুলগুলির

প্রতি শিশুদের আকর্ষণ সেই প্রাচীন যুগ থেকে আজও সমান ভাবে বর্তমান। বর্তমানের চটকদার প্লাস্টিক পুতুলের জ্যোতি এই আকর্ষণকে স্তিমিত করতে পারে নাই। এর কারণ মনে হয় শিশুর মন। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—"ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মত পুরাতন আর কিছুই নাই।" বয়স্ক মানুষের মন আধুনিক চটকদার শিল্পজাত পণ্যের প্রচারজনিত চাপে বিকৃত হচ্ছে; দেশকাল শিক্ষার প্রথা অনুসারেও নিত্যনতুন রূপ পরিগ্রহ করছে কিন্তু প্রকৃতির সৃজন শিশুর মনে কোন বিকৃতি নাই। সে চির নতুন, তাই মাটির তৈরী রঙীন পাখপুখুরি, মোম-পুতুল, বাঘ, হাতি ও পোড়ামাটির পালকি, নৌকো, ঘোড়া, পেঁচার পাশে কাঠের জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরাম, গৌর-নিতাই, দারু, তক্ষণশিল্পীরা অতি প্রাচীনকাল থেকে গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় জানালা, দরজা, কারুকার্য-শোভিত খাট, আলমারির পাশাপাশি কাঠের রথ ও নানারকম মূর্তি তৈরী করে আসছেন।

এর পাশাপাশি তারা অবসর সময়ে কম দামী কাঠ দিয়ে পাঁচ-ছয় ইঞ্চি থেকে আট-নয় ইঞ্চি উঁচু মমিপুতুল তৈরী করে রথ, ঝাঁপান, পৌষপার্বণের মেলায় বিক্রি করে দু পয়সা বাড়তি উপার্জন করে। তাই মূল্যবান আড়ম্বরপূর্ণ কারুকার্য-শোভিত জাতীয় সংস্কৃতির সংগ্রহে সযত্নে রক্ষিত ভাস্কর্যের পাশাপাশি তুচ্ছ কাঠের অবহেলা ভরে নির্মিত হস্তপদবিহীন মমি-পুতুলের ঐতিহ্য আজও সমান ভাবে প্রবাহমান।

এই সব পুতুলের চাহিদা সাধারণত শিল্পীর বাসস্থানের আশেপাশের গ্রামের মানুষের কাছে যাদের 'নুন আনতে পান্তা ফুরোয়' অবস্থা অথচ তাদের ঘরের ছেলেরা তো অবুঝ, তাদের চাহিদা মেটাবার জন্য এই তুচ্ছ কাঠের তৈরী এক টাকা আট আনা দামের বউ-পুতুল মমি-পুতুলই যথেষ্ট। বউ-পুতুল ছাড়া জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরাম, ঊর্ধ্ববাহু নৃত্যরত গৌর-নিতাই, লক্ষ্মীপেঁচা-র চাহিদাও যথেষ্ট। বেশী দামের কাশ্মীরি বা আজমীরী কাঠের সূক্ষ্ম কারুকার্য সমন্বিত ঘর সাজানোর উপযোগী শিল্পসম্ভার এদের কাছে আকাশকুসুম কল্পনা।

এই পুতুল তৈরী হয় সস্তা দরের বা ফেলে দেওয়া আমড়া, শিমুল, শ্যাওড়া, ছাতিম প্রভৃতি কাঠের। এগুলি সস্তাও বটে আবার স্বল্পায়ু এবং নরমও বটে। শিশুর পক্ষে এই পুতুলই উপযোগী। তারা নতুন পুতুল নিয়ে দুদিন খেলবে তারপরই বায়না ধরবে নতুন পুতুলের। এই সব পুতুলের পিছন দিকটা ফাঁকা, কোন রঙ দেওয়া হয় না। সরল ও সমতল থাকে। তবে ঘোড়া হাতির ক্ষেত্র আলাদা; এদের গোটা পুতুলটা রঙ না করলে এর আকর্ষণ কমে যাবে। বউ-পুতুলের ক্ষেত্রে পিছন ফাঁকা যত কারুকার্য সামনের দিকটায়। এই পুতুলের সামনের দিকটা হয় অর্ধ

গোলাকার, না হয় ত্রিকোণাকৃতি রাখা হয়। মুখও ত্রিকোণাকৃতি; হাতের পৃথক অস্তিত্ব নাই দেহের সঙ্গেই হাত আঁকা হয়। পায়ের পাতা থাকলে সম্পূর্ণ পা থাকে না। রঙের ঘাগরায় পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢাকা থাকে। চোখ, হাত, চুল, পোশাক তৈরী হয় তুলির টানে। গৌরনিতাই-এর ক্ষেত্রে উর্ধ্ব বাহুর আকারে ছোট ছোট কাঠের টুকরো দিয়ে হাত নির্মাণ করে কাঁধের কাছে, ফুটো করে জুড়ে দেওয়া হয়। এর ফলে গৌরনিতাই-এর নৃত্যরত উর্ধ্ববাহু রূপটি ধরা পড়ে। তবে নতুন গ্রামের কাষ্ঠশিল্পীদের তৈরী পুতুল ও লক্ষ্মীপেঁচা আজ সাগর পেরিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে স্থান করে নিয়েছে। কাজেই বিদেশের চাহিদার কথা মনে রেখে আর আমড়া, শিমুল কাঠের পুতুল করলে চলছে না। আন্তর্জাতিক বাজারের মান অনুযায়ী গামার বা সেগুন কাঠের ঐ সমস্ত পুতুল তৈরী হচ্ছে। এতে রঙ আরও রঙদার হচ্ছে, ঔজ্জ্বল্যও বাড়ছে, বিদেশীদের নজর কাড়ছে। বিদেশী মুদ্রার কিছু সাশ্রয় হচ্ছে। কাঠকে বাঁটালি দিয়ে চেঁছে বউ, রাজারাণী, পেঁচা সব তৈরী করা হয়। প্রথমে সাদা রঙ মাখানো হয়, তারপর হলুদ, কালো, লাল, সবুজ, নীল রঙ তৈরী করে বিভিন্ন রকম পুতুলের বিভিন্ন রূপ দেবার জন্য প্রয়োজনীয় রঙের ব্যবহার করা হয়। মমি পুতুলের মুখ ও পেটের কাছে হলুদ রঙ, বুক থেকে কোমর পর্যন্ত লাল, কোমরে সওয়া ইঞ্চি চওড়া সবুজের টান ও তার ওপর নীচে সরু করে কালো রঙের বর্ডার, সবুজ রঙের ঘাগরার ওপর লাল, হলুদ কালোর ওপর নীচে নরুণের আকারে তুলির টান। কালো রঙের চুল আর লম্বাটানা আকর্ণ বিস্তৃত চোখ ঠোঁটে লাল রেখা। লালের সিঁথির সিঁদুর, কপালে টিপ। কালো রেখার সাহায্যে হাত ও পায়ের আঙুল এঁকে দেওয়া হয়। জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রার মূর্তির সঙ্গেই হাত তৈরী হয়। তবে এই হাত অর্ধবাহু অর্থাৎ ঠুঁটো। রঙের ক্ষেত্রে জগন্নাথের মুখ হয় কালো রঙের চোখের ভিতরে অংশ সাদা রাখা হয়। চোখ আঁকতে সাদার ওপর লাল ও কালো রঙ সরু তুলি দিয়ে গোলাকৃতি চোখ এঁকে দেওয়া হয়। বলরাম ও সুভদ্রার ঘাগরা হলুদের ওপর লাল-সবুজের রেখা। রঙ তৈরী করতে তেঁতুল বীজের আঠার মাধ্যম ব্যবহার করা হয়। গৌরনিতাই-এর হলুদ রঙের ওপর লাল ও কালো রঙের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার করে কাপড় তৈরী হয়। গলায় তুলসীর মালা। তেঁতুলের বীচির আঠা দেওয়া রঙ আঙুল দিয়ে ঘষলেও উঠবে না। এর ওপর বার্নিশ দিয়ে চকচকে করা হয়।

একবিংশ শতাব্দীর সূচনাতেও আদিম যুগের ঐতিহ্যপূর্ণ এই বিমূর্ত শিল্পকর্ম যে এখনও টিকে আছে, সেটা শিল্পীদের হাতের গুণে। তাঁরা পাশ্চাত্য রীতির স্পর্শ থেকে এই নিখাদ লোকশিল্পকে আজও রক্ষা করে রেখেছেন। তবে

প্লাস্টিকের চটকদারী পুতুল, টিনের তৈরী দম দেওয়া মোটর গাড়ী ও রেলগাড়ীর যুগে এই লোকায়ত শিল্পকে কতদিন বাঁচাতে পারবেন সেটা ভবিষ্যৎই প্রমাণ দেবে। লোকশিল্পের সবচেয়ে বড় সমস্যা বিপণন।

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামোদ্যোগ, মঞ্জুষা, ডিজাইন সেন্টার যদি বিপণনের ব্যাপারে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় তবেই এই দুর্লভ শিল্প বাঁচবে।

কাঠখোদাই-শিল্প : বর্ধমান জেলার নতুনগ্রামের কাঠখোদাই শিল্প স্বকীয়তায় মৌলিকত্বে সৃজনধর্মিতায় ও সূক্ষ্মতার সুষমায় অনন্য; শুধু অনন্য বললে কম করে বলা হবে। এ কাষ্ঠশিল্পের এক নতুন ঘরানা। শুধু কাঠখোদাই-শিল্পই নয় মৃৎশিল্প এমন কি প্রস্তরশিল্পেও এ গ্রামের শিল্পীরা প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

কাষ্ঠশিল্পের এই নতুন ঘরানা সৃষ্টির কৃতিত্ব অভয়পদ ভাস্কর, শম্ভু ভাস্কর, জীবনানন্দ ভাস্কর ও তপন ভাস্করদের। বর্ধমান শহরে ৩নং ইছলাবাদেও কাষ্ঠ-শিল্পের আর এক ঘরানা সৃষ্টি করে চলেছেন ধ্রুব শীল ও তাঁর সহযোগীরা। কাটোয়াতে আছেন আর এক কাষ্ঠখোদাই শিল্পী রাধেশ্যাম দাস। কিন্তু নতুন-গ্রামের ভাস্কর ঘরানার সঙ্গে বর্ধমানের শীল ঘরানার এক মৌলিক পার্থক্য আছে। নতুনগ্রামের ভাস্করদের ঘরানা এই দেশের মাটিতেই গড়ে উঠেছে আর ধ্রুব শীলের ঘরানা পূর্ববঙ্গ থেকে আমদানী করা। নতুনগ্রামের ভাস্করদের শিল্প তাঁদের বংশধারার ঐতিহ্যবাহী। এদের মূর্তির মধ্যে আছে সনাতনী রূপ। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে মূর্তির গড়নের মৌলিকতার কোন বদল হয় নাই। নতুনগ্রামের ভাস্কর্যে লাগে নাই কোন নতুনত্বের ছোঁয়া। এটা এই গ্রামের ভাস্করদের জিদ; জানি না যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যুগের দাবীর সঙ্গে সঙ্গতি রাখার তাগিদে ভাস্করদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই ঘরানার মৌলিকতা বজায় রাখতে পারবে কিনা। বর্ধমানের শীলদের শিল্পকর্মের মধ্যে কিছুটা দক্ষিণ ভারতীয় ও কিছুটা পশ্চিমী বাস্তবরীতির ভাস্কর্যের ছোঁয়া লেগেছে।

নতুনগ্রামের ভাস্করদের উপাধি বর্তমানে ভাস্কর হলেও আদিতে কিন্তু ভাস্কর ছিল না। এরা জাতিতে সূত্রধর। আদিতে কি উপাধি ছিল কেউ বলতেই পারে না। পিতামহ, পিতা সকলেই ছিলেন ভাস্কর। এটাই এখানকার শিল্পের প্রাচীনতার ও মৌলিকতার অকাট্য প্রমাণ।

এদের বাড়ীর ছেলেমেয়েরাও এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এদের পুতুল গড়া দিয়ে শুরু করে ঠাকুর গড়া, তারপর মাটির পুতুল, মাটির মূর্তি গড়ে হাত পাকিয়ে কাষ্ঠশিল্পে ঘটেছে উত্তরণ। এই ভাবেই চলে অভয় ভাস্করদের বংশগতির ধারা।

নতুনগ্রামের ভাস্করদের কাঠের পুতুল ও পেঁচা নতুনগ্রাম ঘরানার সূক্ষ্মতার প্রথম ধাপ।

মূর্তিগুলি উচ্চতায় এক ফুট থেকে ছয় ফুট, চওড়ায় ৬ ইঞ্চি থেকে দুই বা তিন ফুট পর্যন্ত হয়। বরাত অনুযায়ী মূর্তির উচ্চতা ও বিস্তার নির্ধারিত হয়। সমতল কাঠের ভূমি মাপ মত কেটে তাতে পেন্সিল দিয়ে আকাঙ্ক্ষিত মূর্তির স্কেচ এঁকে নেওয়া হয়। পেন্সিল ড্রয়িংএর পর ছোট ছেনি ও বাটালি দিয়ে চলে হাতুড়ির ঠুক ঠাক কাজ—পেঁচা তৈরীর ক্ষেত্রে সমতল কাঠে হবে না—মূর্তি যে মাপে হবে তার চেয়ে কিছু বেশী মাপের ত্রিকোণাকৃতি কাঠের টুকরোর ওপর কাজ করা হয়।

উপকরণ লাগে গামার কাঠের ছোট ছোট তক্তা, ছেনি, বাটালি, র‍্যাঁদা, হাতুড়ি, মাটাম আর প্রথমে ৬০, ৮০ নং শেষে ১২০ নম্বরের শিরীষ কাগজ। মূর্তি তৈরী হয়ে যাবার পর বিভিন্ন নম্বরের শিরীষ কাগজ দিয়ে ঘষে ঘষে মসৃণ করা হয়। একমাত্র পেঁচা আর পুতুল ছাড়া অন্য কোন মূর্তিতে রঙ ব্যবহার করা হয় না। বড় বড় পেঁচাতেও সাধারণত রঙ ব্যবহার হয় না। নতুনগ্রাম ঘরানার কাঠখোদাই-শিল্পে রঙের প্রলেপের চেয়ে রঙবিহীন মূল সৃষ্টিকর্মের ওপরই বেশী জোর দেওয়া হয়। এক ফুটের মূর্তি গড়তে খরচ পড়ে ৭০ টাকা; আশির দশকের শেষ দিকে বিক্রি দাম ছিল পেঁচা ৮৫ টাকা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ৭০ থেকে ১০০ টাকা, পুতুল ৫০ টাকা; ছ ফুটের মূর্তি সাত হাজার টাকা। ছয় ফুটের এই মূর্তি তৈরী করতে একমাস লাগে। কাঠ বা অন্যান্য জিনিসপত্রের খরচ-খরচা বাদ দিয়ে ভাস্করের দৈনিক মজুরী দাঁড়ায় গড়ে ২০/২৫ টাকা। অথচ এই মূর্তি হাত ফের হয়ে বিদেশে বিক্রি হয় এক লাখ টাকায়। লাভের গুড় middle man রূপী পিঁপড়েতেই মেরে দেয়। তবুও ভাস্কররা শত কষ্টের মধ্যে দিনরাত কাজ করে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত লোকশিল্পকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন। কাজ যখন থাকে তখন মাসে হাজার খানেক টাকা জমে আর কাজ না থাকলে স্থানীয় মেলায়, খেলায় পুতুল বিক্রি করে যে টুকু পাওয়া যায় তাতেই দিন গুজরান করতে হয়।

সত্তর দশকে বর্ধমানের ধ্রুব শীলকে তাঁর শিল্পকর্ম নিয়ে দরজায় দরজায় ঘুরতে দেখেছি; ছেলেদিগকে বেশী দূর পড়াতেও পারেন নাই। তারপর সরকারের সহযোগিতায় জাতীয় পুরস্কার ও রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পাওয়ায় পর তিনি খানিকটা গুছিয়ে বসেছেন; আজ নিজের কারখানা খুলেছেন সেখানে তাঁর কাছে তাঁর ছেলেমেয়ে ছাড়াও ৬/৭ জন শিক্ষানবিস কাজ করছে। কতজন ধৈর্য ধরে এই শিল্পকে আয়ত্ত করতে পারবে সেটাই দেখার, কারণ, বাঁটালি সোজা করে ধরতেই একবছর লেগে যায়। হ্যান্ডিক্র্যাফট বোর্ড এবং পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র ও

কুটীরশিল্প নিগম আজ এদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। তাই এই দুর্লভ শিল্পকর্মের ধারা আজও অব্যাহত আছে।

প্রস্তরশিল্প : দাঁইহাট ও পাতুনের প্রস্তরশিল্প এক কালে খুবই খ্যাতি লাভ করেছিল। ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা দেবীর আদি মূর্তি ভেঙে যাওয়ায় বর্ধমান মহারাজার ব্যয়ে দাঁইহাটের নবীন ভাস্কর অবিকল আদিমূর্তির অনুরূপ কষ্টিপাথরের বর্তমান মূর্তি নির্মাণ করে দেন। মন্তেশ্বর থানার পাতুন গ্রামে প্রস্তরশিল্পের খ্যাতি এক সময় দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিক বিনয় ঘোষ পাতুন সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন "এই গ্রামে শত শত প্রস্তর নির্মিত মূর্তি পাত্রেশ্বর মন্দিরের ভিতরে ও বাহিরে স্তূপাকার করে জড়ো করা আছে।" তাঁর মতে এই গ্রামে এক কালে ছিল ভাস্করদের বাস। ভাতার থানার কামারপাড়ার প্রখ্যাত শিল্পী ত্রিভঙ্গ রায়ের মৃৎশিল্প, চিত্রশিল্প ও প্রস্তর-শিল্পে খ্যাতি বাংলাদেশের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল। সদর থানার কয়রাপুরের জলতলবাসিনী "দেবীমূর্তি" চুরি হয়ে গেলে ত্রিভঙ্গ রায় কষ্টিপাথরের অপূর্ব মূর্তি তৈরী করে দেন। সেই মূর্তির আজও পুজো হচ্ছে। কাটোয়ার সরোজ নারায়ণ ভাস্কর অপরূপ শৈলীর প্রস্তর মূর্তি নির্মাণের জন্য জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা পাড়ার হরিহর দে'র ভাস্কর্য সর্বভারতীয় ললিত কলা একাডেমির বাৎসরিক প্রদর্শনীতে (১৯৯৬) বিশেষ খ্যাতি লাভ করে, তাঁর ব্রোঞ্জের স্তনদানরত শূকর জননী "বসুন্ধরা" ভাস্কর্য, হিন্দুস্তান টাইমসেও প্রশংসিত হয়। জার্মানীর আন্তর্জার্তিক পরম্পরা শিল্প প্রদর্শনীতে (শিল্পমেলায়) হরিহর ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি এখন ব্রোঞ্জ, ফাইবার গ্লাস, সিমেন্ট নিয়ে কাজ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের বিধান রায়ের মূর্তি, বর্ধমানের দামোদর সেতুতে নৃত্যরত বাউল ও কৃষক-দম্পতি শিল্প রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিছুদিন আগে দাঁইহাটের কাছে গোঁফখালি গ্রামে শক্তিপদ অধিকারীর বাড়ী গিয়ে দাঁইহাটে কাঁসারী পাড়ায় নবীন ভাস্করের খোঁজ করি। জানলাম নবীন মারা গেছে। তার দুই পুত্র আনন্দগোপাল ও যোগেন্দ্র ভাস্কর। যোগেন্দ্রের পুত্র বিশ্বনাথ ও বিশ্বনাথের পুত্র শৈলেন্দ্রের ছেলের খোঁজ করেছিলাম পাই নাই। শুনলাম এখন এখানকার কারখানা বন্ধ। কলকাতায় এরা ভাস্কর্যের দোকান খুলেছে। গ্রামের কারখানা আর খুলবে কিনা ঠিক নাই।

বাঁশ ও বেতের কাজ : পূর্বস্থলী থানার নতুনগ্রামের কয়েকজন শিল্পী বেতের নানা রকম আসবাবপত্র, টেবিল, চেয়ার, সুদৃশ্য পালঙ্ক, ফুলের সাজি, ফুলদানি তৈরী করে। আউসগ্রাম থানার ২নং ব্লকে সুয়াতা, ভালকী, দিগনগর অঞ্চলে

বাঁশের ও বেতের কুলো, ডালা, ধুচুনি, ফুলের সাজি, মোড়া এই সব তৈরী হয়। ভাতার থানার মোহনপুর গ্রামের ডোম জাতীয় কিছু শিল্পী বাঁশ ও তালপাতায় নানা রকম গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরী করে। বর্ধমান শহরের গোলাপবাগে ও বড় নীলপুর অঞ্চলে কিছু শিল্পী কুচবিহার থেকে বেতের কাজে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে বেতের নানা আসবাবপত্র ও সৌখিন জিনিসপত্র তৈরী করছেন। বর্ধমানে বৈদ্যনাথ কাটরায় "মঞ্জুষা"তে বেত, বাঁশ, সোলার নানারূপ সৌখিন জিনিস বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।

কাঁথাশিল্প : বাংলার কাঁথাশিল্প লোকশিল্পের প্রাচীন শিল্পকর্মের ধারা বহন করে চলেছে। "নকশীকাঁথা বাংলার নারী-প্রতিভার এমন এক সৃষ্টি বৈচিত্র্যপূর্ণ নান্দনিক মূল্যায়নে পৃথিবীর আর কোন মহিলা-লোকশিল্পের সঙ্গে এর তুলনা হয় না। এর সৃষ্টির পশ্চাতে কোন বাণিজ্যিক লেনদেনের স্থান নাই, আছে কেবল প্রিয়জনকে উপহার দেবার বাসনা, ব্যবহারিক প্রয়োজন।" (লোকসংস্কৃতি গবেষণা-১২ বর্ষ, ১ম সংখ্যা) নবজাতক শিশুদের প্রয়োজনেই কাঁথার বেশী ব্যবহার। তবে বর্তমানে নানারকমের কাঁথা হচ্ছে। শিশুদের কাঁথা তো আছেই। তাছাড়া আছে অল্প শীতে গায়ে দেবার জন্য মোটা কাঁথা, বালিশের ঢাকনা কাঁথা, বিছানায় চাদর হিসেবে ব্যবহারের জন্য সুদৃশ্য নকশীকাঁথা, আয়নার ওপর ঢাকা দেবার জন্য আরশিলতা কাঁথা। কাঁথা তৈরীতে লাগে পুরানো ধুতি বা শাড়ী, কাঁথা সেলাই-এর সুতো, কাঁথা সেলাই-এর বড় সূচ, পুরানো সাদা শাড়ির লাল, সবুজ, হলদে, নীল প্রভৃতি নানা রঙের পাড়। কাঁথা তৈরী কিন্তু মেয়েদেরই কাজ। এই কাজ মেয়েরা বাড়ীর বর্ষীয়সী দিদিমা, ঠাকুমা এমনকি দিদিমা স্থানীয় পাড়া-পড়শী বয়স্কা মহিলাদের কাছে শিখে নেয়। তারপর আপন আপন শিল্পচেতনা অনুযায়ী কাঁথার ওপর নকশা অঙ্কন করে যায়। পুরনো কাপড়কে ৩/৪ ভাঁজ করে কাঁথা সেলাই-এর সুতো দিয়ে কাঠামোটা করে নেয়। তারপর শাড়ীর নানা রঙের পাড় ছিঁড়ে পায়ের বুড়ো আঙুলে এক প্রান্ত বেঁধে আস্তে আস্তে পাড় থেকে ২/৩ খি সুতো বের করে জড়িয়ে রাখে। এই ভাবে নানা রঙের সুতো সংগ্রহ বলে কাঁথার নকশা আঁকার কাজ শুরু হয়। প্রথমে কাঁথার কাঠামোর ওপর পেন্সিল দিয়ে মনোমত লতাপাতা ফুল এঁকে নেয়। নবজাতকের কাঁথার, শিশু সম্পর্কিত দু চার লাইন ছড়াও লিখে নেয়। তারপর ধৈর্য ধরে এই নকশার ওপর রঙিন সুতো বুনে বুনে শিল্পকর্ম ফুটিয়ে তোলে। বড় বড় কাঁথার নক্‌শা এত সুন্দর; জোড়া শালের মত "বোঝাই যায় না কোন পিঠটা উল্টো আর কোন পিঠটা সোজা, আর এই রকম নকশীকাঁথা তৈরী করতে সময় লাগে অনেকদিন, পরিশ্রম সাধ্যও বটে।

ছোটবেলায় দেখেছি বাড়ীর বউদের মধ্যে কেউ আসন্নপ্রসবা থাকলে প্রসবের সম্ভাব্য সময়ের ২/৩ মাস আগে থাকতে মা-মাসীরা কাঁথা সেলাই করতে লেগে যেতেন। সে কাঁথার কত পরিপাটী, চারদিকে সবুজ রঙের পাতা ও লাল্ ফুলের লতার কারুকার্য মাঝখানে শিশু সম্পর্কিত ছড়া—

আয়রে আয় টিয়ে
নায়ে ভরা দিয়ে
না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে
তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচে
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা
খোকার নাচন দেখে যা॥

অথবা,

ধনকে নিয়ে বনকে যাবো
সেখানে খাবো কি
নিরালায় বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি।

বালিশের ঢাকনা কাঁথায় বোনা হয় চারদিকে ফুল, লতাপাতার বর্ডার ও মাঝখানে পদ্মফুল আর বড় বড় কাঁথায় থাকে ফুল, পাখি, শাঁখ, শতদল পদ্ম ও নানা জ্যামিতিক কর্ম।

আবার আরশিলতা কাঁথায় দেখেছি চিরাচরিত কাঁথার মত না করে ক্রচ্-এর সুতো দিয়ে জাল গেঞ্জি বোনার মত বুনে তার চারিধারে ফুল লতাপাতার বর্ডার ও মাঝখানে শাঁখ পদ্ম-এর নক্শা তোলা হয়। অনেক পুরানো কাঁথায় চিত্রকল্প অক্ষর বা হাইরোগ্লাফিক অক্ষরও দেখতে পাওয়া যায়। এই সব কাঁথা লোকশিক্ষার অঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

যে মূল আকৃতিগুলিকে ভেঙে গড়ে শিল্প ও ললিতকলার নানা রকম পরীক্ষানিরীক্ষা চলে আসছে সেই ভাবেই বিভিন্ন শিল্পকর্মের আকৃতিগুলিকে ভেঙে অক্ষর গঠনের এক নতুন প্রণালী হাইরোগ্লাফিক অক্ষরের মূল উৎস বের করা হয়। "নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে এই শিক্ষা দেশে শিল্পের উন্নতি ও একই সাথে নিরক্ষরতা দূরীকরণের সহায়ক হবে। এর জন্য জনসাধারণের সহজাত ও স্বাভাবিক শিল্পচেতনাকে একটু উসকে দিতে হবে, প্রদীপের আলো বাড়াবার জন্যে সল্‌তে যেমন আমরা উস্‌কে দেই।" (দেশ—১৫ ভাদ্র ১৩৮৬)

অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়—এই কাঁথাগুলিকে "সেকালের পল্লীবাসীদের নির্মল চিত্তাকাশের এক অপরূপ দর্পণ বললে অত্যুক্তি হয় না।" তবে বর্তমানে

বোম্বে ডাইং-এর সুদৃশ্য তোয়ালের আমদানি কাঁথাশিল্পকে সুদূর পল্লীতে কোণঠাসা করে দিয়েছে।

রাখীশিল্প : শ্রীকৃষ্ণ জন্মের পর রাক্ষসের অত্যাচার থেকে রক্ষার নিমিত্ত মা যশোদা ব্রাহ্মণ দ্বারা রক্ষা-বন্ধন করেছিলেন। শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন ডান মণিবন্ধে রাখীবন্ধন করা হয়। মন্ত্র :

যেন বদ্ধো বলী রাজা দানবেন্দ্র মহাবলঃ
তেন ত্বাং অনুবধ্নামি রক্ষো মা চল মা চল।
(শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ)

যে বন্ধন দ্বারা রাজা বলীকে রক্ষা-বন্ধন দেওয়া হয়েছিল, আমিও সেই বন্ধন দ্বারা আপনার রক্ষা-বন্ধন করিলাম। সেই আদিকাল থেকে ইতিহাসের নানা উত্থানপতনের সাক্ষী এই রাখী। ১৫৩৪ সালে গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ্ চিতোর আক্রমণ করলে রানী কর্ণাবতী আত্মাহুতির আগে মোগল সম্রাট হুমায়ুনের কাছে 'রাখী' পাঠিয়ে চিতোরের সেই বিপদে রাখী-ভাই হুমায়ুনের সাহায্য চেয়ে পাঠান। দিল্লী থেকে সাহায্য এসে পৌঁছানর আগেই কর্ণাবতী আত্মাহুতি দিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু তাঁর রাখীভাই-এর সাহায্যে সেদিন চিতোর রক্ষা পায়। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ রক্ষাবন্ধনকে জাতীয় উৎসবের মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে রবীন্দ্রনাথ গঙ্গাতীরে রাখীবন্ধন অনুষ্ঠান পালন করেন। সেদিন তাঁর :

"বাংলার মাটি বাংলার জল
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক এক হউক এক হউক
হে ভগবান।"

গানের মধ্য দিয়ে রাখীবন্ধন অনুষ্ঠান এক নতুন মাত্রা পেয়েছিল। রাখী-বন্ধন অনুষ্ঠান 'বি-মা-রু' অর্থাৎ বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশসহ প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে হিন্দুদের মধ্যে এক ধর্মীয় ও নান্দনিক অনুষ্ঠান।

রাখী হচ্ছে শ্রাবণী পূর্ণিমায় দক্ষিণ হস্তের মানবন্ধে বন্ধনীয় রঞ্জিত মঙ্গল-সূত্র। এই রঞ্জিত সূত্র এখন সলমা, চুমকি সজ্জিত নানা রঙের প্লাস্টিকের পত্র-পুষ্প শোভিত হয়ে আভিজাত্য লাভ করেছে ও জেলার লোকশিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এই রাখী শিল্পের প্রধান ঘাঁটি গড়ে উঠেছে, কালনা শহরের বারুই পাড়াকে কেন্দ্র করে গুপ্তিপাড়া, জিরাট, বলাগড়, শান্তিপুর ও রানাঘাট অঞ্চলে। এ জেলায় তো বটেই, সমগ্র পশ্চিমবাংলা ও উত্তর ভারতে যত রাখী যায় তার

সিংহভাগই বর্ধমান জেলার কালনার বারুইপাড়া কারখানায় তৈরী হয়। এইখানেই গড়ে উঠেছে শংকর মিত্র গয়রহের রক্ষাবন্ধনের প্রতিষ্ঠান। শুধু জেলার নয় পশ্চিম বাংলার একমাত্র বাঙালি প্রতিষ্ঠান। বছর পঁচিশেক আগে বরিশালের ছিন্নমূল মিত্রপরিবার উদ্বাস্তু হয়ে এসে কালনার বারুইপাড়ায় পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পান। কোন কিছু না পেয়ে 'রাখী' তৈরীর কাজে হাত লাগান। এই রাখীর দৌলতে আজ কালনার বারুইপাড়ায় কয়েক বিঘা জমির ওপর মিত্র পরিবারের বিরাট দোতলা বাড়ী, গাড়ী, কলকাতার কালীকৃষ্ণ স্ট্রীটে গদি। যুধিষ্ঠির মিত্রের ছেলেরা এখন নিত্য নতুন চটকদারী রাখীর নকশা তৈরী করে। আর সেই নকশা-মাফিক কারখানায় রাখী তৈরী হয়। শুধু কারখানা নয় মিত্র পরিবারের দৌলতে জিরাট, বলাগড়, গুপ্তিপাড়া, রাণাঘাট, শান্তিপুরের হাজার পাঁচেক মহিলা রাখী তৈরী করে দিন গুজরান করে। এঁরা কালনায় জমা দেয়। সেখান থেকে রাখী মিত্রদেরই গাড়ীতে চড়ে কলকাতার গদি ও সেখান থেকে সমগ্র উত্তর ভারতে চালান যায়। রঙীন সুতো বা রেশমের একটা ডুরি থেকে মিত্রদের হাতে 'রাখী' আজ অপূর্ব লোকশিল্পের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। রাখীশিল্প আজ জেলার লোকশিল্পের নতুন সংযোজন।

খড়-শিল্প : বর্ধমান শহরের গুড্ শেড রোডের সুধীর নাগ খড়-শিল্পের এক নতুন ধারা তৈরী করেছেন। আমন ধানের লম্বা লম্বা খড়কে পরিষ্কার করে ব্লেড জাতীয় ছুরি দিয়ে মাঝে মাঝে চিরে ছবির মসলা তৈরী হয়। তারপর পিচ বোর্ডে আকাঙ্ক্ষিত ছবি যেমন দুর্গা, কালী, সরস্বতী, লক্ষ্মী বা বরাত মত মূর্তির ছবি পেন্সিল দিয়ে এঁকে তার ওপর আঠা দিয়ে সেই চেরা খড় ছবির মাপ মত সাইজ করে বসিয়ে দেওয়া হয়। তারপর শুকোলে এর ওপর প্রথমে সাদা ও পরে পটের রঙ অনুযায়ী রঙ করে চোখ মুখ ও সজ্জা ঠিক ছবির মত করে আঁকা হয়। এরপর বাঁধিয়ে বিক্রয়ের জন্য তৈরী হয়। তবে বর্তমানে আমন খড়ের অপ্রতুলতা, বিপণনের অব্যবস্থা ও প্রচারের অভাবে এই এক নতুন ধরনের লোকশিল্প লোপ পেতে বসেছে।

পুতুলনাচ : কোন উৎসব উপলক্ষে পুতুলের নৃত্যরূপ তামাশাই পুতুল-নাচের আদিম রূপ। এতে মানুষ পুতুল নাচিয়ে পৌরাণিক বা সাংসারিক বিষয়ের অভিনয় দেখায়। সেই হিসাবে পুতুলনাচ শুধু লোকশিল্প নয় লোকনাট্যের মাধ্যমে লোকশিক্ষারও এক অঙ্গ।

বর্ধমান পাপেট থিয়েটার ও কালচার‍্যাল সেন্টার, পাপেটিয়ার্স নামে সংস্থা এ জেলার এই লুপ্তপ্রায় শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। Bardhaman Puppet

and Cultural Centre-এর ড. বিভাস দাস, ক্ষীরোদ বিহারী ঘোষ ও সন্দীপ চক্রবর্তীর প্রচেষ্টায় পুতুলনাচের নবরূপায়ণ সম্ভব হয়েছে।

পুতুল তৈরী এক নিপুণ শিল্পকর্মের পরিণতি। পালা অনুযায়ী প্রথমে একটা পুতুলনাট্যের Script তৈরী করা হয়। পালার দৃশ্য অনুযায়ী কুশীলবদের কল্পিত চেহারা অনুযায়ী কি কি পুতুল তৈরী করতে হবে তার একটা ছক করে নেওয়া হয়। সেই ছক অনুযায়ী পুতুলের মুখের মাটির মডেল তৈরী করা হয়।

এইভাবে রাম, লক্ষ্মণ, রাবণ, হনুমান, সীতা বিভিন্ন দেবদেবীর মুখের ও আদিবাসী নারী-পুরুষ বালক-বালিকার মুখের মডেল তৈরী করে পণে পুড়িয়ে নেওয়া হয়। এগুলিই ছাঁচ। এরপর পুরানো খবরের কাগজ ময়দার বা বর্তমানে কেমিক্যাল আঠা মাখিয়ে ৪/৫ ভাঁজ করে পুরু করা হয়। এরপর মডেলের ওপর ছাই মাখিয়ে দেওয়া হয় যাতে মডেল থেকে আঠা লাগানো ৪/৫ ভাজ পুরু কাগজ সহজে উঠে আসে। আঠা লাগানো কাগজ মডেলের রিলিফ অনুযায়ী মডেলের ওপর বসিয়ে আঙুল দিয়ে টিপে টিপে মসৃণ করে লাগানো হয়। কাগজের আবরণ সহ মডেলটি রোদে শুকোতে দেওয়া হয়। ভাল করে শুকোলে কাগজের আস্তরণ খুলে নেওয়া হয়। মডেলের মুখের ও পিছন দিকের অংশ পৃথক ভাবে টুকরো ও আঠা দিয়ে জোড়া দেওয়া হয়। এর ওপর মিহি কাদার প্রলেপ দিয়ে ভাল কাগজের টুকরো বা কাপড়ের টুকরো সাঁটানো হয়। কর্নিশ দিয়ে ভাল করে খাপি পালিশ করলে মুখ তৈরী হয়ে গেল। এরপর মুখটি সরু রডের ওপর এমন ভাবে বসানো হয় যাতে চালকের ইচ্ছা অনুযায়ী মুখটি নড়াচড়া করতে পারে। এরপর ছোট ছোট কাঠের টুকরো দিয়ে পুতুলের হাত-পা তৈরী করে সরু রডের সঙ্গে সঠিক অবস্থানে লাগাতে হবে। এমন ভাবে লাগাতে হবে যাতে চালকের ইচ্ছামত পুতুলটি হাত-পা নাড়াতে পারে। এরপর রঙ ও অলঙ্করণ। এটি খুব দক্ষতার কাজ। পুতুলনাচের পালার Script অনুযায়ী চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার উপযোগী রঙ তৈরী করা হয়। পুতুলের মুখের পিছন ও সম্মুখভাগ ভাল করে শুকোলে তার ওপর খড়িমাটির আস্তরণ দিয়ে তারপর চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার উপযুক্ত রঙ লাগানো হয়। চক্ষুদান হয়, হাত-পা-এর কাঠের ওপর কাগজ চিটিয়ে শুকোতে হয়; হাত পায়েও রঙ দেওয়া হয়। এরপর অলঙ্করণ, পোশাক পরানো, চুল দেওয়া, অলঙ্কারে সাজানো খুবই পরিশ্রমসাধ্য ও দক্ষতার কর্ম।

সব নাটকের পুতুলনাচ হয় না। যে সব পালার কাহিনীকে পুতুলে রূপ দেওয়া সম্ভব হয় বা যেগুলিকে নাচের মাধ্যমে নাটকের পূর্ণ রূপায়ণ দেখানো সম্ভব হয় সেই সব পালা যেমন লক্ষ্মণের শক্তিশেল, বুদ্ধু ভুতুম্, সাক্ষরতা সম্পর্কিত পালার পুতুল তৈরী হয়।

এরপর যেখানে পুতুলনাচ দেখানো হবে সেখানে পাপেট থিয়েটার বা পুতুল গোষ্ঠীর নির্দেশ অনুযায়ী মঞ্চ তৈরী করা হয়। স্টেজের সামনের দিকের ২/৩ ফুট জায়গা ছাড় রেখে আড়াই বা তিন ফুট উঁচু আড়াল তৈরী করতে হবে। এই আড়ালের পিছনে দৃশ্য অনুযায়ী পুতুলকে সাজিয়ে রেখে আড়ালের ভিতরে Showman পুতুলের সঙ্গে খুব সরু নাইলন সুতো বা তার বেঁধে দৃশ্য অনুযায়ী নাচাবে আর স্টেজের ভিতরে Script ও গানের ক্যাসেট বাজানো হবে। Concert-এর তালে তালে পুতুলগুলি নাচবে, দূর থেকে মনে হবে পুতুলগুলি আপনিই নাচছে, কথা বলছে। এমনি করে দৃশ্যের পর দৃশ্যের অভিনয় হয়ে যাবে।

পূর্বে ২৪ পরগনা, বিষ্ণুপুরে ও বর্ধমানে লোকশিল্প হিসেবে পুতুল নাচের রমরমা ছিল। আমরা ছোটবেলায় অর্থাৎ ৬০/৭০ বছর পূর্বে যে পুতুলনাচ দেখেছি সে নাচ এত উন্নত ছিল না। স্টেজটা মোটামুটি বর্তমানের মতই করা হতো তবে হ্যাজাক জ্বেলে show দেখানো হত। পুতুলে খুব সরু সুতো বেঁধে মঞ্চের আড়ালের পেছনে সো-ম্যান দাঁড়িয়ে দু হাতে দুটো পুতুলের সুতো ধরে হাতের কেরামতিতে নাচাতো আর মুখে পুতুলের সংলাপ বলে যেত। এখন টেপ রেকর্ডার হয়েছে। সূক্ষ্ম নাইলনের সুতো হয়েছে। স্টেজের ওপর আলোকসম্পাতের ব্যবস্থা হয়েছে। আলোকসম্পাতের কায়দায় রাজপ্রাসাদ, ঘর, বাড়ি বনজঙ্গল ফুটিয়ে তোলা হয়। আর সেই প্রেক্ষাপটে পুতুলকে নাচিয়ে দর্শকদের মোহিত করে রাখা হয়।

এই প্রসঙ্গে দাক্ষিণাত্যের ছায়াপুতুল-নাচের তুলনা প্রাসঙ্গিক হবে বলেই মনে করি। তবে এই ছায়াপুতুল-নাচও প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছে। দক্ষিণ ভারতের বাঙ্গালোর ও কয়েকটি স্থানে কয়েকটি কারিগর পরিবার এই লোকশিল্পকে আজও কোন রকমে টিকিয়ে রেখেছেন। হলেও সাদা পটের ওপর আলোক ফেলে তার ওপর ছবিগুলিকে ২/৩ টি কাঠি দিয়ে নাচানো হয়। এই ছায়াপুতুল-নাচেরও বিষয়বস্তু রামায়ণ ও মহাভারত থেকে নেওয়া। সাধারণত ছাগল বা হরিণের চামড়াই ব্যবহার করা হয়। দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে চামড়া খুব মুড়মুড়ে হয়ে গেলে নতুন চামড়ার ওপরে কারুকার্য করে পুতুল আঁকা হয়। রঙ হিসেবে গাছগাছড়া থেকে প্রস্তুত দেশজ রঙ বা কেমিক্যাল রঙ ব্যবহার করা হয়। এই পাপেটগুলি ৬ থেকে ৭ ফুট লম্বা হয়। লোকউৎসব উপলক্ষেই ছায়াপুতুল-নাচের শো দেখানো হয়। তবে অতিবৃষ্টি যা অনাবৃষ্টি হলে দেবতাদের তুষ্টির জন্যও এই ছায়াপুতুল-নাচের শো-এর ব্যবস্থা করা হয়। দক্ষিণ ভারতের এই লেদার পাপেটয়ার্সরা সমাজের নিম্নস্তর থেকে এসেছে। কিন্তু তাদের শিল্পচেতনা ও রূপ-

কল্পনা প্রশংসার দাবী রাখে। আমাদের জেলার পাপেটিয়ার্সগণও এ জেলাতেও এই ছায়া-পুতুলনাচ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

বড়ি শিল্প : ১. কামার পাড়ার বড়ি
হরিবাটীর মুড়ি
২. শুনতে রাজবাড়ী
মুসুরির ডাল আর খেসারির বড়ি।
৩. কলাই ডাল বড়ি পোস্ত কুমড়ো কচুর ঘ্যাঁট
পুঁটি মাছের অম্বল সহ বর্ধমানের খ্যাঁট।

সাহিত্যে বড়ি প্রসঙ্গ :

বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ড বড়ির ব্যঞ্জন অপার।
ফুল বড়ি ফল মূলে বিবিধ প্রকার ॥
নব নিম্বপত্রসহ ভাজা বার্তাকী
ফুল বড়ি পটোল ভাজা কুষ্মাণ্ড মান চাকী।

(কৃষ্ণদাস কবিরাজ)

এই জেলার বড়িশিল্পের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। এই বড়ি এ জেলার রন্ধন-শিল্পের লোকসংস্কৃতির একটি অঙ্গ। এই বড়িশিল্পের মধ্যে সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রন্ধনশিল্পের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। বড়ি আছে নানা রকমের—কলাই বড়ি, মুসুরির বড়ি, খেসারির বড়ি, মটর ডালের বড়ি, তারপর আছে মুলোর বড়ি, হিং-এর বড়ি, জিরের বড়ি, কুমড়োর বড়ি, ভাজা বড়ি, ফুলবড়ি ও গয়নাবড়ি। মৌসুমী বিদেয় নেবার পর বেশ কিছুদিন গেলে অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি এই বড়ি দেওয়ার season শুরু হয়। চলে চৈত্র পর্যন্ত যতদিন আবহাওয়া শুষ্ক থাকে ও সূর্যের স্নিগ্ধ কিরণ অব্যাহত থাকে। সাধারণত সংসারের বর্ষীয়সী মহিলারাই এই বড়ি দেবার কাজে দক্ষ। অল্প বয়স্ক মেয়েরাও বড়ি দেয় তবে অশুদ্ধাচারে বড়ি দেওয়া চলে না। কোন রজঃস্বলা নারী বড়ি দিতে পারে না। বড়ি দেবার আগে স্নান করে শুদ্ধ শাড়ী বা ধুতি পরে বড়ি দিতে হয়।

বড়ি দেবার আগের দিন কলাই জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। ভেজাবার আগে কলাই-এ এমন ভাবে জল দিতে হবে যেন পরদিন কলাই শুকিয়ে না যায় বা একেবারে জলে ডুবে না থাকে। তারপর শিল-নোড়া ভাল করে ধুয়ে সেই শিল-নোড়ায় খুব মোলায়েম করে কলাই বাটতে হবে। মোলায়েম করবার জন্য ২/৩ বার বাটার প্রয়োজন হতে পারে। আবার মিক্সিতে পেশাই করলেও শিলে বেটে মোলায়েম করে নিতে হয়। কলাই বাটায় এমন ভাবে জল দিতে হবে যাতে

বড়ি দিলে একেবারে চ্যাপ্টা হয়ে না যায় এবং সরু মুখ নিয়ে উঠে থাকে। এই লেইকে ভাল করে ফেটাতে হবে। খুব বেশী ফেটালে বড়ি তুলতে গেলে ভেঙে যাবে। আবার কম ফেটালে শক্ত হবে, দাঁতে কাটা যাবে না। ফেটাতে ফেটাতে মাঝে মাঝে এক বাটি জলে লেই এক ফোঁটা ফেলে দিয়ে দেখতে হবে লেই ভাসছে কিনা। জলে ভাসলে বুঝতে হবে ঠিকমত ফেটানো হয়েছে।

ফেটানোর পর একটা ট্রে বা চটের ছোট খাটিয়াতে কাপড় বিছিয়ে বেগুনের বা মুলোর বোঁটা দিয়ে সরষের তেল বুলিয়ে দিতে হবে, যাতে বড়ি শুকিয়ে গেলেই তাড়াতাড়ি উঠে আসে। গৃহস্থের প্রথা অনুযায়ী প্রথম বড়ি দেবার দিন গৃহ-দেবতা ও লক্ষ্মীকে প্রণাম করে গৃহিণী প্রথমে দুটি বড় বড়ি দেবেন। একটি বুড়ো আর একটি বুড়ি। এই বুড়ো-বুড়িকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সিঁদুর দিয়ে বিয়ে দিতে হয়। এরপর ধান-দূর্বা দিয়ে প্রণাম করে এদের কোলে ২১টি ছোট ছোট বড়ি দিতে হবে। এগুলি সন্তান-সন্ততির প্রতীক। বড়ি দেওয়ার মধ্যেও বংশবৃদ্ধির কামনা জড়িত। এখানেও প্রাচীন Ferlity cult-এর অনুপ্রবেশ। এরপর হাতের কৌশলে বড়ি এমন ভাবে দিতে হবে যাতে গম্বুজের মত নিম্নাংশ স্ফীত ও ঊর্ধ্বাংশ ক্রমশ সরু হয়ে শীর্ষে সূঁচলো হয়ে ওঠে। বড়িকে পাখীপুখুরির হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব বাড়ীর গৃহিণীর। ভালভাবে বড়ি শুকোলে খাটিয়া বা ট্রে থেকে তুলে ২/৩ দিন রোদে রেখে খট্‌খটে করে শুকিয়ে বায়ু নিরোধক জারে পুরে রাখতে হবে। এই বড়ি সারাবছর খাওয়া চলবে।

সাধারণত মাষকলাই বা বিরি কলাই-এর বড়িই প্রশস্ত। তবে বাড়ীর লোকের রুচি অনুযায়ী মুসুরি কলাই-এর বড়ি, খেসারির বড়ি ও মটর ডালের বড়িও দেওয়া হয়। মসুরির বড়ি বা খেসারির বড়ির ঝাল এবং মটর ডালের বড়ির ঝোল খুবই সুস্বাদু। শীতকালে মুলোর বড়ি দেওয়ার এক রীতি আছে। এই বড়ির জন্য "পাঁজির পাতার অতি বৃহৎ লাল মুলাই" প্রশস্ত। এই মুলোকে খোসা ছাড়িয়ে নিতে হয়। আজকাল তো মুলো কুরুনি কিনতে পাওয়া যায়। আগে দেখতাম এক ছোট করগেট পাতের টুকরোকে ছুতার ছেনি দিয়ে ঘন ঘন আধা ইঞ্চি মত করে কেটে দিলে তার উল্টো পিঠে মুলো ঘসলেই মুলো কোরা হয়ে যেতো। তারপর এই কোরা মুলো মোলায়েম করে বেটে নিয়ে কলাই বাটার সঙ্গে মিশিয়ে বড় বড় সাইজ করে বড়ি দিতে হয়। এই বড়ি মাছের ঝোল ও অম্বলে উপাদেয় হয়। কুমড়োর বড়িও হয়। এর জন্যে "বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ড" অর্থাৎ পাকা চাল-কুমড়ো প্রয়োজন। এই চাল-কুমড়োর খোসা ছাড়িয়ে ডুমো ডুমো করে কেটে বীচি ছাড়িয়ে মুলো কুরোনিতে কুরে নিতে হবে।

মাছের ঝোলে এই বড়ি উপাদেয় লাগে। শ্রীচৈতন্যের 'বৃদ্ধকুষ্মাণ্ড বড়ি' খুবই প্রিয় খাদ্য ছিল। এই পাকা ছাঁচি কুমড়োর বীচিগুলিও কলাই বাটার সঙ্গে মিশিয়ে বড়ি দেওয়া হয়। এই বড়ি খোলায় ভেজে শিলে গুঁড়িয়ে অনেকে পান্তা ভাত খায়। মটর ডালের ও কলাই-এর ডালের বাটার সঙ্গে হিং বা জিরে মিশিয়ে হিং বড়ি বা জিরে বড়ি হয়। আবার কলাই বাটার সঙ্গে সামান্য লবণ, জিরা পোস্ত দানা দিয়ে ভাল করে ফেনিয়ে খুব ছোট ছোট করে ভাজা বড়ি দেওয়া হয়। এই বড়ি গোটা গোটা তেলে ভেজে ভাতের সঙ্গে খেতে সুস্বাদু হয়।

বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের বিয়েতে বা কোন বড় পুজো বা উৎসবের আগে পল্লীগ্রামে বড়ি দেওয়ার রীতি আছে। কারণ বড়ি শুক্তো তরকারীর একটা প্রধান উপাদান। সুক্তো রেঁধে বড়ি তেলে ভেজে আধ-গুঁড়ো করে শুক্তোর ওপর ছড়িয়ে দিতে হয়। আবার কেউ কেউ গোটা বড়ি ভেজে শুক্তোতে দিয়ে শুক্তো রান্না করে। মোচার ঘন্টে বা লাউঘন্টে বড়ি ভেজে গুঁড়িয়ে ঘন্টের ওপর ছড়িয়ে দিলে ঘন্টর স্বাদই আলাদা হয়ে যায়। পল্লীগ্রামে দরিদ্রের সংসারে রাত্রে কাঁচা বড়ি তেল নুন দিয়ে জলে গুলে পান্তাভাতের তরকারী হিসেবে ব্যবহার করতে দেখেছি। বিয়েতে গয়না বড়ি দেওয়ার রীতি আছে কোথাও কোথাও। কলাই-ডাল বাটা ভাল করে ফেটিয়ে একটা ছিদ্রযুক্ত ন্যাকড়ায় নিয়ে জিলিপি ভাজার মত ট্রে-তে সরষের তেল মাখিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নেকলেস, কান-পাশা, বাজুর আকারে গয়না বড়ি করা হয়; এই গয়না বড়ি ভাজা দিয়ে নতুন জামাইকে আপ্যায়ন করা হয়। শাকের ঘন্টেও বড়ি ভেজে গুঁড়িয়ে সেই গুড়ো ছড়িয়ে দিলে শাকঘন্ট আলাদা মাত্রা পায়। অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন এ জেলায় একটি প্রধান উৎসব। এই উৎসবে নতুন চালের ভাতের সঙ্গে নয় রকম ভাজা, নয় রকম তরকারী করার একটা সংস্কার আছে। এই নয় রকম ভাজার মধ্যে বড়ি ভাজা অন্যতম উপাদান।

শুধু বর্ধমান জেলা বা পশ্চিমবাংলা নয়, পূর্ব বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান এমনকি কাশ্মীরেও বড়ির কদর সর্বত্র। কাশ্মীরি আহার্যে বড়ি অপরিহার্য। প্রতিবেশী বাংলাদেশ বড়িশিল্পে শীর্ষস্থান দখল করে আছে।

তবে আজকাল যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বড়ি কালচারেরও পরিবর্তন ঘটেছে। এখন খুব কম পরিবারেই বড়ি দেবার পাট আছে। মেয়েদের রুচিও বদলেছে আর সময়ও কম; তাই এখন বড়ি-শিল্প গৃহস্থের অঙ্গন থেকে ব্যবসায়ীর কারখানায় আশ্রয় নিয়েছে। যে বড়ি বাড়ীর দিদিমার হাতের স্নেহের পরশ নিয়ে জন্ম নিত; মুক্তাঙ্গনে সূর্যের তাপে তপ্ত হয়ে পূর্ণতা লাভ করত, আজ কারখানার যন্ত্রের যন্ত্রণায় পিষ্ট হয়ে উনানে অগ্নিতাপে তপ্ত হয়ে সেই বড়ি কি পূর্বের স্বাদ পেতে পারে?

তেরো অধ্যায়

রন্ধনশিল্প

জেলাবাসীর আহার্য : সেকাল ও একাল

বাঙালীদের একটা বদনাম আছে যে বাঙালীরা ভোজন-বিলাসী। বাংলাদেশ ছাড়া ভারতের অন্য কোথাও আহারের ব্যাপারে এত পারিপাট্য ও এত সময়ের অপব্যয় নাই। কোথাও কেবলমাত্র গেঁহু কা রুটী আর রহড় কা ডাল, আবার কোথাও নুন ও লঙ্কা সহযোগে ছোলার ছাতু কিংবা একটা সব্জীর ঘ্যাঁট ও রুটি দিয়ে মধ্যাহ্নভোজন সারা হয়। আবার দক্ষিণ ভারতে পাঁচ রকম সিদ্ধ, তেঁতুলের ঝোল বা লাউয়ের তরকারী, সম্বরম দিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন সারে। বাঙালীর সেখানে পঞ্চব্যঞ্জন, পাঁচ-রকম ভাজা, ডাল, ঝোল, চাটনি তো চাই—এ শুধু নিজের তৃপ্তির জন্য নয়, পাঁচজনকে খাইয়েও তার তৃপ্তি। আবার পঞ্চব্যঞ্জন হলেই হবে না। নানা রকম তেল মশলা দিয়ে দুষ্পাচ্য না করলে কোন খাদ্য বাঙালীর মুখেই রুচবে না। তবে সে ছিল একদিন যখন প্রাচীনকালে বাঙালীর অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল স্বচ্ছল—ছিল গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ। নিজেদের ঘরেই বা জমিতে প্রয়োজনীয় তরি-তরকারী উৎপন্ন হতো। জিনিসের দামও ছিল কম। লোকে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অপরের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করত। তাই মধ্যযুগের কাব্যে নানা রকম সুখাদ্য, ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নের তালিকা পড়লে আজও জিহ্বা রসসিক্ত হয়। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে আছে :

> সুকতা শীতের কালে বড়ই মধুর,
> কুমড়া বার্তাকু দিয়া রান্ধিবে প্রচুর।
> রাঁধিয়ে মুসুরির ডাল দিবে টাবা জল
> খণ্ড মিশাইয়া রাঁধ করঞ্জার ফল।
> ঘৃতে ভাজি দুগ্ধেতে ফেলিবে ফুলবড়ি
> চচ্চড়ি করিয়া রাঁধ পলতার কড়ি ॥

রান্ধিবে ছোলার ডাল তাহে দিবে খণ্ড
মানের বেসারি দিবে কুমড়ার বড়ি।
ঘৃত দিয়া সন্তর্পণে রাঁধিবে পোলাও...

টাবা = কমলালেবুর মত এক প্রকারের লেবুর রস, পাতিলেবু।
বেসরি = সরিষা বাঁটা।
খণ্ড = চাপ গুড়।

*** *** *** ***

আবার সদাগরের অনুরোধে খুল্লনা ভগবতীকে স্মরণ করে রাঁধেন—

সাফ সুপ রান্ধিতনা ওলায় ফুলবড়ি
ঘৃত দিআ ভাজিল উত্তম পলাকড়ি।
কটু তৈলে কই মৎস্য ভাজে পণ দশ
মুঠ নিঙ্গারিআ তাহে দিল আদার রস।
খন্তে-মুগের সুপে উভরে ডাবরে
আচ্ছাদন খালখানি দিলেন উপরে।
কটু তৈলে ভাজে রাখা চিতলের কোল
রোহিত কুমড়াবড়ি আলু দিআ ঝোল।
বকরি সকুল মীনে রসাল মুসুরি
পণ দুই ভাজে রামা সরল-শকরী।
কথা গুলা তোলে রামা চিঙ্গড়ার বড়া
কচি-কচি গোটা দশ ভাজিল কুমড়া।

বিদ্যাসাগর মহাশয় : সরস্বতী পূজায় যে খাদ্যের তালিকা দিয়েছেন সেই পাকা ফলারের তালিকা পড়তে পড়তে কার না জিহ্বা রসায়িত হয়।

লুচি কচুরি মতিচুর শোভিতং
জিলেপি সন্দেশ গজা বিরাজিতম্
যস্যাঃ প্রসাদেন ফলারমাপ্নুম
সরস্বতী জয়তাম নিরন্তরম্।

এ ফলার ছিল তিন প্রকার : উত্তম, মধ্যম ও অধম।

উত্তম ফলার : ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি
দু চারি আদার কুচি
কচুরি তাহাতে খান দুই।

মধ্যম ফলার : সরু চিড়ে শুনো দই
মর্তমান ফাঁপা খই।
অধম ফলার : শুমো চিঁড়ে টকো দই
বীচে কলা ধেনো খই।

সরস্বতীমঙ্গলে রাজা বিক্রমাদিত্যের কন্যা মহাকবি কালিদাসের স্ত্রী শাশুড়ী-ঠাকরুনকে নানা প্রকার ব্যঞ্জন রেঁধে খাওয়াচ্ছেন।

নিমে সিমে বেগুনেতে করিলেন ঝোল
সরিষা বাঁটনা দিয়া সিদ্ধ করি ওল।
পাকা মর্তমান রম্ভা সহ ঘৃত দধি
মুগের সুন্দর বড়া বুট সিদ্ধ আদি।
নারিকেল পাপুড়া নাড়ু বিচি চাঁপাকলা
চাঁছি ছেনা চিনি পানা দৈই নৃপবালা।
নানা মত কাসন্দি দিলেন শাশুড়ি রে।
পায়স পিষ্টক আদি দিলা তার পরে।

চাঁছি = খোয়া ক্ষীর।

রাধামাধব ঘোষের বৃহৎ সারাবলির গৌবাঙ্গলীলা প্রসঙ্গে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে মহাপ্রভু খাবেন বলে নানা রকম রান্নার বিবরণ পাই।

সদ্য পীত ঘৃত যুক্ত শালি অন্ন স্তূপ।
চৌদিকে ব্যঞ্জন ডোঙ্গা আর মুঙ্গ সুপ।
সামুদিক শাক আর বিবিধ প্রকার
পটৈল কুষ্মাণ্ড বড়ি মান কচু আর।
রাই মরিচ শুক্তা দিয়া কন্দ মূল ফলে
অমৃত নিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝোলে।
মুগ বড়া মাস বড়া রম্ভা বড়া মিষ্ট
ক্ষীর পুলি নারিকেল যত পুষ্প ইষ্ট।

জয়নারায়ণ ঘোষালের করুণানিধানবিলাস কাব্যে যশোদা ও রাধা-শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে যে সমস্ত পদ রান্না করেছেন তাহাও খুবই লোভনীয় :

শাকের পাকড়ি বিবিধ ভাজা
শাক চচ্চড়ি—অম্বল তাজা
কুলেতে মূলোতে রাঁধে অম্বল

অলাবু বার্তাকু আলু পটোলের ঝোল।
বেসম পেলাও মুগ কালিয়া
নানাবিধ ডালি খাটাই দিয়া।

* * * * * * * * *

কিসমিস তপ্ত ক্ষীরে দিল ভিজাইয়া
পোস্ত বীজ দুগ্ধসহ দিল পাকাইয়া।

* * * * * * * * *

চন্দ্রকান্ত পিঠা রচে কোরা নারিকেল।
মিঠা দুগ্ধ মধ্যে রাখে অতি কুতূহলে।
ছানাবড়া পানিতাওয়া মাখম মিছরি।
দুগ্ধ পুরি-ক্ষীর রুটি কটরাতে ভরি।

রঘুনন্দন গোস্বামীর শ্রীশ্রীমদ্রামরসায়ন উত্তরকাণ্ডে সীতা হনুমানকে রেঁধে খাওয়াছেন :

তণ্ডুলের স্থানে গোধূম মুত্র দিয়া
অপর পায়স কৈল যতন করিয়া।

* * * * * * * * *

নারিকেল চূর্ণ বার্তাকু অর্পিয়া
পালঙ শাকের ঘন্ট কৈল হিঙ্গু দিয়া।
এই রূপে কচু শাক রম্ভনীর শাক
অপূর্ব যতন করি করিলেন পাক।
মুঙ্গ বটী নারিকেল অলাবু মিশ্রিত।
শুক্তনীর শাকে গন্ধ দ্রব্যে আমোদিত।

দ্বিজ রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর রামায়ণে সীতার বিবাহে খাদ্যতালিকা :

সোনার পরাতে লুচি কচুরি পুড়িয়া।
লাখে লাখে পরিবেষ্টা চলিল ধরিয়া।
প্রত্যেক সভ্যের আগে রাখে স্বর্ণথাল।
তারপরে গেল অলাবুর ঝাল।
শাক ছোলা আদি-ভাজি দিচ্ছে জোগাইয়া।
সন্দেশের হাবা আনে হাতে মাথে লইয়্যা।
মোটা মোটা মণ্ডা মতিচুর মনোহরা।
অতি মিঠা ক্ষীর পিঠা ছাবা রস করা।

খাজা গজা জিলেপি নিকুতি খাসতলা।
গোলাবি বরফি দিচ্ছে দরে টাকা তোলা।

মহাপ্রভু ও তাঁর দশজন পার্ষদের আপ্যায়নের জন্য ষষ্ঠীর মাতা ও ভট্টাচার্য নিজে পাক করছেন :

বত্রিশ কলার আঙ্গটিয়া পাতে
উবারিল তিন মন তণ্ডুলের ভাতে।
পীত সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল।
চারিদিকে পাতে ঘৃত বহিয়া চলিল।
কেয়া পত্র কলার খোলা ডোঙ্গা সারি সারি
চারিদিকে ভরিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভরি।
দশ প্রকার শাক নিম্ব সুকুতার ঝোল
মরিচের ঝালা ছানা বড়া বড়ী ঘোল।
দুগ্ধ তুম্বী দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড বেলারি লাফরা
মোচা ঘন্ট মোচা ভাজা বিবিধ সাকরা ॥
বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ড বড়ীর ব্যঞ্জন অপার
ফুলবড়ী ফলমূলে বিবিধ প্রকার ॥
নবনিম্ব পত্র সহ ভাজা বার্তাকী
ফুলবড়ী পটোল ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী
ভ্রষ্ট মাষ মৃদ্‌গ সুপ অমৃত নিন্দয়
মধুরাম্ল বড়া অম্লাদি অম্ল পাঁচ-ছয়
মৃদ্‌গ বড়া মাষবড়া কলা বড়া মিষ্ট
ক্ষীরপুলী নারিকেলপুলী আর যত পিষ্ট।
কাঞ্জিবড়া দুগ্ধ চিঁড়া দুগ্ধ লকলকী
আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শাকি।
ঘৃত সিক্ত পরমান্ন মৃৎ কুণ্ডিকা ভরি
চাঁপা কলা ঘন দুগ্ধ আম্র তাঁহা ধরি।

মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্য ও চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত খাদ্যতালিকা বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় সেকালে শাকের বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ভোজনের প্রাথমিক উপকরণ ছিল। শাকের মধ্যে ছিল—সামুদ্রিক শাক, তন্ডুলীয় শাক, ঘৃত জিরা দিয়া পালং শাক, পলতার চচ্চড়ি, শাকের পাকড়ি, দশ প্রকার শাক, শাকের শুক্তো;—এছাড়া সরিষা বাটা সহ ওল সিদ্ধ।

ডালের মধ্যে ছিল মাষকলাই-এর ডাল, মুগডাল, ছোলার ডাল, ভাজার মধ্যে পটোল ভাজা, নিম-বেগুন ভাজা, কলাই-ডালের বড়া, মুগডালের বড়া, রম্ভাবড়া, ছানার বড়া ভেজে তরকারী, মোচাভাজা, তরকারীর মধ্যে ছিল কুমড়া-বেগুনসহ শুক্তানি, অলাবু, বার্তাকু, আলু, পটল, সিম-বেগুন-নিম-ঝোল, পঞ্চবিধ তিক্ত ঝোল, মোচা ঘন্ট ও পাকা চাল কুমড়োর বড়ির ঝোল মধ্যাহ্ন-ভোজের প্রধান উপাদান। অম্লই ছিল পাঁচ প্রকার।

মিষ্টান্নের মধ্যে মতিচুর, জিলেপি, গজা, সন্দেশ, পায়স, পিষ্টক, ক্ষীর পুলি, নারিকেল বেসম, পোলাও, কিসমিসসহ তপ্ত ক্ষীর, চাঁছি অর্থাৎ খুব ঘন ক্ষীর, চন্দ্রকান্ত পিঠা, মিঠা দুগ্ধ, ছানাবড়া, পাণিতাওয়া, মাখন মিছরি, মোটা মোটা মণ্ডা, মনোহরা, খাজা, গজা, নিখুতি, বরফি, দুগ্ধতুম্বী (তুম্বী =অলাবু বা লাউ), দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড, কাঞ্জিবড়া, ঘৃতসিক্ত পরমান্ন।

ফলার < ফলাহার অর্থাৎ ফল আদি নিরামিষ খাদ্যের ভোজ। অমূল্যরতন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত (১৩২২) "বাইশ কবি মনসায়" আছে, ক্ষীর ছানা খায় সাধু পিষ্টক পায়স। দধিদুগ্ধ গুড় চিনি রসাল পনস। দুগ্ধ কলা খায় সাধু সুবর্ণ পাত্রেতে। ফলাহার করিয়া বসিল হরষিতে। কিংবা চৈতন্য ভাগবতে ফলারের বর্ণনা—ইক্ষু, নারিকেল, বেল আর মিঠে কলা। "ফলাহার করিবারে বলিল বিপুলা।" এগুলি নিছক ফলই আহার। কিন্তু সাধারণত ফলার বলতে আমরা তিন প্রকার ফলারের বিবরণ পাই। উত্তম ফলার—ঘিয়ে ভাজা নরম লুচি, দুই-চারিখানি কচুরি। আদার কুচি সহ উত্তম ফলার।

মধ্যম ফলার : সরু চিঁড়ে ঘন দই, ফাঁপা খই ও মর্তমান কলা।

অধম ফলার নিশ্চয়ই অধমদের জন্য গুমো চিঁড়ে, ধানশুদ্ধ খই, টক দই ও বীচে কলা।

উপরের তালিকায় যে খাদ্যের বিবরণ পাই তা সম্পূর্ণ আমিষ বর্জিত। একমাত্র চণ্ডীমঙ্গলে খুল্লনার রন্ধনে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। একটি ক্ষেত্রে আলুর উল্লেখ পেলেও আলু-র তখন এদেশে প্রচলিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। তাছাড়া এই যে খাবার ফিরিস্তি সেটা এ জেলাতেও মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত এবং বিশিষ্ট অতিথির আতিথেয়তার জন্য প্রস্তুত করা হতো। কিন্তু এ জেলার আপামর জনসাধারণের ভাগ্যে এসব দুর্লভ বস্তু। জেলার আপামর জনসাধারণের প্রধান খাদ্য :

কলাই-এর ডাল, পোস্ত বড়ি, কচু কুমড়োর ঘ্যাঁট
পুঁটি মাছের অম্বলসহ বর্ধমানের খ্যাঁট ॥

জেলার বেশীর ভাগ লোক হত দরিদ্র ও তাদের প্রধান খাদ্য মোটা চালের ভাত, কলাইয়ের ডাল, আলু বা বড়ি পোস্ত আর কচু কুমড়োর একটা ঘ্যাঁট জাতীয়। যদি ভাগ্যে জোটে তো পুঁটি মাছের অম্বল। জেলার রুক্ষ আবহাওয়ার উপযোগী এই কলাই-এর ডাল ও অম্বল। প্রধান উৎপন্ন তরকারী কচু, কুমড়ো, লাউ, বেগুন, মূলা। কপি, পটোল দরিদ্র সাধারণের ভাগ্যে অল্পই জোটে। এই সমস্ত জনসাধারণের দু-বেলার প্রধান খাদ্য ভাত, রাত্রে অধিকাংশই দিনের ভাতই জলে ভিজিয়ে পোস্ত বা কুচো মাছ বা আলুর ঝাল দিয়ে নৈশ ভোজ সারে। জলযোগের প্রধান উপাদান গুড়-মুড়ি আর যাদের ঘরে গরু আছে তাদের অবশ্য দুধ জোটে। শহর ও গ্রামের উচ্চ মধ্যবিত্ত ও উচ্চ বিত্তদের অবশ্য জলযোগ টোষ্ট বা রুটি আর মুড়ি হলে বেগুনি, চপ প্রভৃতি বৈকালসহ মুখরোচক আহার। মধ্যাহ্নে শাক, শুক্তো, পটল, কপির বা ধোঁকার ডালনা, পোনা মাছ ও সপ্তাহে একদিন মাংস, চাটনী মুগের ডাল আর নৈশ ভোজের প্রধান উপাদান রুটি ডাল, তরকারী। পল্লীগ্রামে অবস্থাপন্ন কারও বাড়ীতে দুর্গাপূজা, কালীপূজা, বিবাহ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ উপলক্ষে গ্রামের জনসাধারণ উৎসবের সামিল হয়। এই সব উৎসবে সরু চালের ভাত, ছোলার ডাল, কলাই-এর ডাল, একটা ছ্যাঁচড়া, শুক্তো, আলু পটল, কপি, প্রভৃতির ঋতু অনুযায়ী তরকারী, মাছ বা মাংসের ঝোল ও নিরামিষ ও মাছের অম্বল, পায়েস। আজকাল উৎসব ও অনুষ্ঠানের সর্বজনীন রূপ আর নাই। সবই যান্ত্রিক, উচ্চ মধ্যবিত্ত ও উচ্চ বিত্তদের উৎসব অনুষ্ঠানে একেবারে টাইপ খাবার—ঘি-ভাত, রাধাবল্লভী, লুচি, ঘুগনি, আলুর দম, বাদাম, সহ শাক ভাজা, মুগের ডাল, পটলের দরমা, মাছের ও মাংসের কালিয়া বা কোর্মা, ছানা পনির, প্লাস্টিকের (পেঁপে কুচো) চাটনী। আইসক্রীম বা দই, নানা রকম সন্দেশ। কিছুদিন আগেও বাড়ীতেই প্যাণ্ডেল করে রান্নার ব্যবস্থা ছিল; গৃহকর্তার সাদর আহ্বানে উৎসব, অনুষ্ঠান মধুময় হয়ে উঠতো। আজকাল ভাড়া বাড়ীতে অনুষ্ঠান; ক্যাটারারের বরাদ্দ মত খাদ্য সরবরাহ, গৃহকর্তা সাধারণত দুর্লভ-দর্শন। আর অনুষ্ঠান সাধারণত রাত্রে। পল্লীগ্রামের অধিকাংশ ঘরে অবশ্য এখনও প্রাচীন প্রথায় মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থাই আছে। তবে উৎসবে যে 'অন্তরের প্রথম প্রতিষ্ঠা' প্রীতির সম্বন্ধ ছিল, তার রেশ এখনও যেটুকু আছে 'নব্যতন্ত্র রজতচক্রের' যুগে কত দিন বজায় থাকিবে ভবিষ্যৎই বলিতে পারে।

উৎসব-অনুষ্ঠানে প্রীতির সম্পর্কের সঙ্গে রাসায়নিক সার ও হাইব্রিডের উৎপাতে আহার্য দ্রব্যের স্বাদও তিরোহিত হচ্ছে। আগেকার নৈনীতাল, রেঙ্গুন, আমড়া ঝাঁটি, ঠিকরে আলুর স্বাদ আর এখনকার জ্যোতি, এস-১, এমনকি

চন্দ্রমুখীতেও পাওয়া যায় না। ঘরে ভাজান শালিধানের চালের মুড়ির স্বাদ মেসিনের মুড়িতে হারিয়ে গেছে। সব সবজির স্বাদ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। বর্তমান যন্ত্র-সভ্যতার এটাই অভিশাপ। এ বিধিলিপিকে মেনে নিতেই হবে।

জেলার মিষ্টান্ন সংস্কৃতি :

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে আমিষ, নিরামিষ, পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের উল্লেখ আছে। সে তুলনায় মিষ্টান্ন মনে হয় অপ্রতুল। কিন্তু বর্তমানে কোন অভিজাত মিষ্টান্নের দোকানের শো-কেসের দিকে তাকালে মিষ্টান্নের রকমফের দেখলে দর্শকের রসনা রসায়িত তো হবেই, চক্ষুও হবে চড়কগাছ।

পূর্বে মিষ্টান্ন তৈরীর বৃত্তি ছিল কেবলমাত্র মোদকদের। মোদক অর্থে মোদককার বা ময়রা জাতিই বোঝায়। সাধারণ্যে চলিত কথায়, হালুইকর। হালুই-কর এসেছে পশ্চিমা 'হালুয়া' থেকে। ঘরে অতিথি অভ্যাগত এলে শহরে যেমন এখন কচুরি সিঙ্গাড়া সন্দেশ দিয়ে আপ্যায়ন করা হয় পূর্বে পল্লীগ্রামে অতিথি আপ্যায়নের উপাদান ছিল হালুয়া বা মোহনভোগ। এই হালুয়া বা মোহনভোগ তৈরীর প্রধান উপাদান সুজি, ঘি ও চিনি। দু/একটা তেজপাতা বা লবঙ্গ ও কিশমিশ দিলে হালুয়ার স্বাদ অমৃততুল্য হয়। সুজিকে ভাল করে ঘিয়ে ভেজে তাতে তেজপাতা, লবঙ্গ, কিশমিশ দিয়ে চিনির রসে ফোটাতে হবে। বেশ ঝুরো ঝুরো হয়ে গেলেই উপাদেয় মিষ্টান্ন হালুয়া হয়ে যাবে।

বর্ধমান জেলার প্রধান প্রধান মিষ্টান্ন বলতে বুঝি বর্ধমানের সীতাভোগ ও মিহিদানা, শক্তিগড়ের ল্যাংচা, মেমারী ও জামালপুরের মাখা, সাহেবগঞ্জের (ভাতার থানা) খইচুর, বেলাড়ির মণ্ডা, মানকরের কদমা, দুর্গাপুরের নিখুতি ও কালাকাঁদ। এছাড়া কোন অভিজাত মিষ্টান্ন বিক্রেতার দোকানে হরেকরকম মিষ্টান্নের সম্ভার, পানতুয়া, রসগোল্লা, রাজভোগ, রসমালাই, রসকদম্ব, দানাদার, চমচম, লর্ড চমচম, ল্যাংচা. গোলাপজাম, কালোজাম, কমলাভোগ, চিত্তরঞ্জন, লাড্ডু, বোঁদে, মতিচুর, বিরি কলাই-এর রসভরা খাস্তা বোঁদে, জিলিপি, অমৃতি, ছানার পোলাও, ছানার গজা, বালুশাহী, কাঠি গজা, জিভে গজা, গুড়পিঠে, মালপোয়া, খাজা, নিমকি, কচুরি, সিঙ্গাড়া, রাধাবল্লভী, লুচি, পুরী, ডালমুট, বেগুনি, চপ, ফুলুরি, সেও ভাজা, ভেজিটেবল চপ।

অন্যান্য মিষ্টির মধ্যে প্রাণহরা, ছানার গজা, গুজিয়া, ক্ষীরমোহন, মৌচাক, ছানার মুড়কি, মণ্ডা, বাতাসা, পেঁড়া, ডিমসন্দেশ, দিলখোশ, গোলাপী পেঁড়া, সরপুরিয়া, নারকেল নাড়ু, নারকেলের রসকরা ও হরেক রকম পিঠাপুলি।

বর্ধমানের সীতাভোগ মিহিদানা দিয়েই শুরু করা যাক। সীতাভোগ কে আবিষ্কার করেছিলেন তা এখনও সঠিক ভাবে নির্ধারিত হয় নাই। জনক দুহিতা বৈদেহী সীতার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধের সূত্র মেলে না। যদি থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই রঘুনন্দন গোস্বামী রচিত শ্রীশ্রীমদ্রামরসায়ন উত্তর কাণ্ডে সীতা হনুমানের ভোজনের জন্য যে সব মিষ্টান্নের আয়োজন করেছিলেন তার মধ্যে নিশ্চয়ই এর উল্লেখ থাকতো বা দ্বিজ রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রামায়ণে সীতার বিবাহে খাদ্য-তালিকাতেও এর উল্লেখ থাকতো। কিন্তু সেখানে আছে—

সন্দেশের হারা আনে হাতে মাথে লয়্যা
মোটা মোটা মন্ডা মতিচুর মনোহরা।
অতি মিঠা ক্ষীর পিঠা ছানা রসকরা।
খাজা গজা জিলেপি নিখুতি খাসতলা
গোলাবি বরফি দিচ্ছে দরে টাকা তোলা!

এত সব মিষ্টি আছে কিন্তু সীতাভোগ নাই। আবিষ্কারের এক দাবীদার তেঁতুলতলার নাগ পরিবার। এঁদের আবিষ্কারের কাহিনী সম্বলিত সীতাভোগ সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় অনেকদিন আগে প্রকাশিত হয়েছিল। আর এক দাবীদারের হদিস সম্প্রতি পাওয়া গেছে। ইনি কাঞ্চননগরের সীতানাথ নন্দী। মিষ্টান্নের নাম যদি আবিষ্কর্তার নামের স্মারক হয় তাহলে সীতা-নাথের দাবীর একটা সমর্থন মেলে। প্রবাদ—বর্ধমান মহারাজের অনুরোধে সীতানাথ এই নতুন জাতীয় মিষ্টান্ন তৈরী করেন। যাই হোক, বিষয়টি বিতর্কমূলক। এই নতুন জাতীয় মিষ্টান্ন তৈরীর প্রধান উপকরণ ময়দা, সফেদা ও কিছু পরিমাণ খামি ছানা। এই উপাদানগুলিকে একত্রিত করে সামান্য জল দিয়ে ভাল করে ঠেসে একটা সরু ছিদ্র বিশিষ্ট কৌটায় নোড়ার আকৃতির একটি কাষ্ঠ দণ্ড দিয়ে চাপ দিলেই কৌটার তলা দিয়ে সিমুই বা সূত্রাকার সীতাভোগ ঘি-এর কড়াই-এ পড়বে। তারপর ভাল ভাজা হলে ঝাঁঝরি বা ছানতা দিয়ে তুলে ঘন রসে ডুবিয়ে রাখতে হবে। কিছুক্ষণ পরে ঝাঁঝরি দিয়ে তুলে নিলেই সীতাভোগ পাওয়া যাবে। এতে কোন বেসমের কারবার নাই। অনেকে ছিদ্রযুক্ত কৌটার বদলে সরু ছিদ্র বিশিষ্ট ঝাঁঝরিতে লেই রেখে হাতের চেটো দিয়ে দলে দলেও ঘিয়ের কড়াই-এ ফেলে। বর্ধমানের সীতাভোগের স্বাদই আলাদা। এ স্বাদ অন্যস্থানের সীতাভোগে পাওয়া যায় না। কারিগররা বলে এখানকার জলের গুণে সীতাভোগ স্বাদের বৈশিষ্ট্য তৈরী হয়। তবে ৪০/৫০ বছর আগে খুরজা ঘিয়ে ভাজা সীতাভোগের যে স্বাদ ছিল, আজ আর বাদাম তেলে সে স্বাদ মেলে না।

তবে কোন কোন অভিজাত দোকানে বেশী দাম দিলে খাঁটি ঘিয়ের সীতাভোগও পাওয়া যায়। তবে স্টেশনে যে সীতাভোগ পাওয়া যায় সে সীতাভোগ অখাদ্য। স্টেশন বাজারের অন্নপূর্ণা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার বনেদী দোকান। সেখানকার সীতাভোগ মোটামুটি ভালো। তবে রানীগঞ্জ বাজার, বড় বাজারের ও তেঁতুলতলা বাজারের কয়েকটি বড় বড় দোকানের যেমন নেতাজী, দেশবন্ধু, ইন্দ্রাণী, গণেশ, উদয়ন, নগেন্দ্রনাথ নাগ ও মাড়োয়ারীদের মিষ্টির দোকানের মিষ্টির স্বাদ আছে।

মিহিদানা : মিহিদানা নামেই এর আকার বোঝা যায়। সীতাভোগের আবিষ্কার নিয়ে তর্ক থাকলেও মিহিদানার আবিষ্কারক অবিসংবাদিত ভাবে তেঁতুলতলার নাগ পরিবারে ক্ষেত্রনাথ নাগ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে তিনি বোঁদের চেয়ে ছোট আকারের মিহিদানা তৈরী করতে শুরু করেন। পরে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জনের বর্ধমান আগমন উপলক্ষে মহারাজার ফরমাইস মত ভৈরবচন্দ্র নাগ একে পোস্তর দানার মত সূক্ষ্ম করে জাফরান পেস্তা, বাদাম দিয়ে এক অপূর্ব সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মিষ্টি তৈরী করেন। এ মিষ্টি খেয়ে কার্জন সাহেব, মহারাজা ও বিশিষ্ট অতিথিবর্গ পরম পরিতৃপ্ত হন ও লর্ড কার্জন ভৈরববাবুকে প্রশংসাপত্র দেন। এই আবিষ্কার সম্বন্ধে ভৈরববাবুর পুত্র নগেন্দ্রনাথ ১২ই নভেম্বর ১৯৭৬ সালে আকাশবাণী মারফত একটি কথিকা প্রচার করেন। এর উপাদান সফেদা ও বেসম ৬০: ৪০ অনুপাতে মিশিয়ে তাতে জাফরান দিয়ে রঙ করে ভাল করে ফেটিয়ে খুব সরু ছিদ্র বিশিষ্ট ছানতায় সেই গোলা নিয়ে কড়াই-এর কিনারায় ঠুকলেই মিহিদানার সরু সরু দানা ঘিয়ের কড়াই-এ পড়বে। তারপর ভাল করে ভাজা হলে মোটা রসে ফেলে একবার ফুটিয়ে নিতে হবে, যেন ঝুরো ঝুরো হয়। জাফরান দিলে ও বিশুদ্ধ ঘিয়ে ভাজলে এর স্বাদও যেমন অপূর্ব হয়, সুগন্ধও তেমনি সুরভিত হয়। তবে অধিকাংশ দোকানে জাফরানের বদলে মিহিদানার রঙ ব্যবহার করে আর বাদাম তেলে ভাজে। বোঁদে ও মতিচুরের উপাদান প্রায় এক তবে চাল গুঁড়ি ও বেসমের পরিমান ৮০ : ২০ করলেও চলে। আর বোঁদে একটু রসালো রাখতে হয়।

বিউলি ডাল বাঁটার সঙ্গে কিছু চাল গুঁড়ি দিয়ে বড় বড় রসে ভরপুর এক রকমের বোঁদে পাওয়া যায় বড় বাজারের মাড়োয়ারীদের দোকানে। এর স্বাদ অপূর্ব।

বোঁদেকে শুকনো করে নাড়ুর মত পাকিয়ে নিলেই লাড্ডু হয়ে গেল। আর মিহিদানাকে ঠেসে নাড়ু পাকালেই মতিচুর হয়।

গজা : গজার আদিরূপ ফারসী গজক। তিল আর চিনি দিয়ে কাঠির মত আকৃতি বিশিষ্ট মিষ্টি গজার আদিরূপ। যাইহোক, গজা বলতে এ জেলায় যা দেখা যায় সেটি ময়দার চৌকো আকারের ঘিয়ে ভাজা রসসিক্ত মিষ্টান্ন।

গজার উপকরণ বেসম নয়, ময়দা। ময়দায় বেশী করে ঘিয়ের ময়ান দিয়ে (অন্তত এক কেজি ময়দায় ২৫০ ঘি) তার ওপর কিছু কালো জিরে ও কালো তিল ছড়িয়ে খুব ভাল করে ঠেসে বারকোসে রেখে চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ইঞ্চি খানেক পুরু করে রাখতে হয়। তারপর ছুরি দিয়ে চৌকো করে বরফির মত কেটে ঘিয়ে ভেজে নামিয়ে রেখে উনানে চিনির রস চড়াতে হয়। রস ঘন হয়ে এলে ভাজা গজা তাতে ফেলে দিয়ে অল্প আঁচে ফুটাতে হবে। মাখো মাখো হয়ে গেলেই নামিয়ে নিতে হবে।

গজা কি এক রকম। হালুইকরের উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগে গজা হয় বহুরূপী। যেমন কাঠি গজা, জিভে গজা, খাস্তা গজা, এমপ্রেস গজা, আবার গজারই উন্নত সংস্করণ বালুসই!

জিভে গজা করতে ঠাসা ময়দাকে জিভের আকারে পাতলা করে ঠেসে ঘিয়ে ভেজে চিনি রসে ফুটিয়ে, শুকিয়ে এলে নামিয়ে নিতে হবে। একেবারে শুকিয়ে গেলে গজার ওপরে শুকনো রসের সাদা আস্তরণ পড়বে।

বালুসাইও ময়দার তৈরী। তবে বালুসই তৈরীতে একটু বৈশিষ্ট্য আছে, এই বৈশিষ্ট্য আকারে, প্রক্রিয়ায় ও স্বাদে। তৈরী করতে এক কেজি ময়দা বারকোসে ঢেলে মাঝখানে গর্ত করে ৪০০ গ্রামের মত ঘি-এর ময়ান ঢেলে দিতে হবে। এর ওপর একটা পরিষ্কার কাপড় আধ ঘন্টা চাপা দিয়ে রাখতে হবে। এরপর এতে দুধ দিয়ে ভাল করে ঠাসতে হবে। খুব সামান্য খাবার সোডা বা বেকিং পাউডার দিলে আরও মোলায়েম হয়। এরপর গোল গোল লেচি করে দু হাতে তালুতে চেপ্টে ঘিয়ে ভেজে রসে ফুটাতে হবে। খেলে মুখে মিলিয়ে যাবে।

গজার সঙ্গে খাজার ধ্বনিগত মিল থাকলেও আকৃতি, প্রকৃতি ও প্রক্রিয়ায় কিছু মাত্র মিল নাই। আর গজার মত খাজার অন্তত এ জেলায় এত চলও নাই। তবে গজার চেয়ে খাজা অতি পুরাতন খাবার। চৈতন্যচরিতামৃতে গজার উল্লেখ নাই কিন্তু খাজার উল্লেখ আছে। খাজাকে ঢাকাই পরোটার ক্ষুদ্র সংস্করণ বলতে পারা যায়। ময়দায় বেশী করে ময়ান দিয়ে খুব ভাল করে ঠেসে লুচির আকারে বেলতে হবে। এরপর একাধিক ভাঁজ করতে হবে আর বেলতে হবে। আর প্রতিবারে ভাঁজ করার আগে লুচির ওপর ঘি-এর প্রলেপ দিতে হবে। এই রকম ৪/৫ ভাঁজ করে শেষে লুচির মত বেলে ঘিয়ে ভাজতে হবে ও রসে ফুটিয়ে নিতে হবে। বারবার ভাঁজ করার জন্য বেশ থাক থাক হয়ে যাবে। এরপর থালায় থাক থাক করে সাজিয়ে রাখতে হয়। অনেকদিন রাখা যায়। সাধারণত মেলার সময় ও দুর্গাপূজার পর এর বিক্রয় বেশী, অন্য সময়ে বিশেষ চাহিদা নাই।

পানতুয়া : বহুরূপী গজার মত পানতুয়ারও কত রূপ। গোলাপজাম, কালোজাম, নোড়াজাম, ল্যাংচা, লেডিকিনি ইত্যাদি। জাত একই তবে কৌলীন্যের বিচারে কেউ নৈকষ্য, কেউ বা ভঙ্গ আর কেউ বা পিড়েলি।

পানতুয়া সম্বন্ধে বঙ্গীয় শব্দকোষে বর্ণনা দেওয়া আছে। ঘৃতপক্ক রসপূর্ণ ছানার মিষ্টান্ন বিশেষ। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঘোষের অভিধানে আর একটু বিশদ ব্যাখ্যা আছে, যা রসে ভিজিয়া খুলির তলায় পড়িয়া থাকে, ছানা ও সফেদা দ্বারা প্রস্তুত ও ঘিয়ে ভাজা এবং চিনির রসে ভেজানো মিষ্টান্ন বিশেষ।

পানিতুয়া উচ্চারণ বিকৃতিতে হয়েছে পানতুয়া। পানি অর্থে জল সকলের জানা কিন্তু 'তবা' বা তুয়া যদি ফারসী শব্দ তবা থেকে আসে তা হলে এর অর্থ যা তলায় পড়ে থাকে। সেক্ষেত্রে পানতুয়ার বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে যা জলের তলায় পড়ে থাকে। জল অর্থে এখানে বোঝা গেল চিনির রস। কিন্তু যা দেখেছি—তাতে তো পানতুয়া রসে ভাসে, ডুবে থাকে না তো? তাহলে মনে হয় পূর্বে পানিতুয়া ক্ষীরের তৈরী হতো। আর এটি এসেছে পশ্চিম থেকে। ছানার মিষ্টি হালকা আর ক্ষীরের মিষ্টি ভারী। বাংলা পার হলে উত্তর-ভারতে ছানা কাটানোর একটা taboo আছে, তাই পশ্চিমে বেশীর ভাগই পেঁড়া জাতীয় ক্ষীরের মিষ্টিরই চল। যাই হোক, ক্ষীরের পানতুয়া এ জেলায় এসে ছানার তৈরী ভাসমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। ছানার সঙ্গে ময়দা বা সুজি দিয়ে ভাল করে ঠেসে ভিতরে এলাচদানা দিয়ে ক্ষুদ্রাকৃতি নোড়ার মত পাকিয়ে ঘিয়ে ভেজে রসে ডুবিয়ে রাখতে হয়।

লেডিকেনি ও ল্যাংচা পানতুয়া প্রজাতির নৈকষ্য কুলীন। গোলাকৃতি এই মিষ্টান্নের ভিতরে চিনিমিশ্রিত ক্ষীরের পুর থাকে। তবে এখন আর কেউ ক্ষীরের পুর দেয় না—এলাচদানা দিয়েই সারে। এই এলাচদানাই ভিতরে রসে পরিণত হবে ও খাবার সময় কামড় দিলেই বুক দিয়ে রস গড়িয়ে যাবে। লেডিকেনি সম্বন্ধে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের অভিধানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। "ভারতের ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড ক্যানিং মহোদয়ের পত্নী লেডি ক্যানিং ১৮৬১ অব্দের নভেম্বর মাসে জ্বর রোগে কলিকাতায় প্রাণত্যাগ করেন; তাঁর নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য লেডি ক্যানি (লেডি কেনি) নামক মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইয়াছিল।" শক্তিগড়ের লেডিকেনি বা ল্যাংচার প্রচার এত বেশী যে গাড়ী করে যে সমস্ত পর্যটক কলকাতার পথে যান, শক্তিগড়ে গাড়ী থামিয়ে এক মালসা ল্যাংচা কিনে নিয়ে যাবেন। ছড়ায় প্রবাদেও ল্যাংচা নিজের স্থান করে নিয়েছে।

শক্তিগড়ের ল্যাংচা খাবেন
রস গড়াবে বুকে।
বর্ধমানের মিহিদানা
লেগে থাকবে মুখে।

কালোজামও গোলাকৃতি তবে খুব কড়া করে ভাজা ও এর রসটি শুকিয়ে রাখা হয়।

রসগোল্লা : রসগোল্লা আবিষ্কারের কৃতিত্ব নাকি কলকাতার নবীন ময়রার। রসগোল্লারই আবার কত প্রকার ভেদ। রসগোল্লা, রাজভোগ, কমলাভোগ, স্পঞ্জ রসগোল্লা, দানাদার, রসকদম্ব, রসোমালাই, ক্ষীরকদম্ব। সবই ছানার মিষ্টান্ন ও রসে ফোটানো উপাদান ও প্রক্রিয়ায় হেরফের ঘটিয়ে বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হয়। ভালো রসগোল্লার জন্যে চাই গরুর খাঁটি দুধ। অভিজাত মিষ্টান্ন বিক্রেতারা নিজেদের খাটাল থেকে এই দুধ সংগ্রহ করেন ও নিজেরাই কারখানায় ছানা কাটিয়ে নেন। তবে সাধারণত অধিকাংশ ময়রা গোয়ালাদের সরবরাহ করা ছানা দিয়েই রসগোল্লা তৈরী করেন। রসগোল্লা করতে ছানার সঙ্গে কিছু সুজি বা ময়দা দিয়ে ভালভাবে ঠেসে গোল করে পাকিয়ে চিনির পাতলা রসে নিয়ন্ত্রিত জ্বালে দীর্ঘক্ষণ ফোটাতে হবে। রসগোল্লা তৈরীর পাক-প্রক্রিয়াই কিন্তু আসল। ২/৪ দিন রাখতে গেলে রসগোল্লার রস অপেক্ষাকৃত মোটা করতে হয়। তবে পাতলা রসের রসগোল্লার স্বাদই আলাদা, স্পঞ্জ রসগোল্লার জন্য কিন্তু গরুর দুধ অপরিহার্য এবং সেটা যদি নিজেদের কারখানায় 'ডাবু ছানা' হয় তো সবচেয়ে উৎকৃষ্ট স্পঞ্জ তৈরী হবে। ক্ষীরের পুর দেওয়া বৃহত্তর রসগোল্লাই রাজভোগ আর কমলালেবুর খোসা মিহি করে বেটে ছানার সঙ্গে মিশিয়ে কিংবা ছানার সঙ্গে কমলালেবুর এসেন্স সামান্য দিয়ে হলদে রঙ করা রসগোল্লাই কমলাভোগ। ক্ষীরমোহনও রসগোল্লা গোত্রীয়; তবে আকারে বড়, চ্যাপ্টা ও ভিতরে ক্ষীরের পুর দেওয়া থাকে। দানাদার শুকনো মোটা রসে ফুটানো শুকনো রসগোল্লা তবে এর ওপরে চিনি ছড়ানো থাকে। আর ভিতরটি রসালো হয়, দানাদার থাকেও অনেকদিন।

চমচম, ছানার গজা, ছানার মুড়কি, ছানাবড়া সবই রসসিক্ত ছানার তৈরী বর্ধমানে চমচমের এক রাজ সংস্করণ পাওয়া যায়। নাম লর্ড চমচম—আকারে বেশ বড়। ওপরে খোয়াক্ষীরের গুঁড়ো ছড়ানো থাকে।

সন্দেশ : সন্দেশেরও নানা প্রকার ভেদ—কাঁচাগোল্লা, মাখা, তালশাঁস, জলভরা, চিত্তরঞ্জন, মনোহরা, কড়াপাক, নলেন গুড়ের সন্দেশ। কাঁচাগোল্লা ও 'মাখা'র জন্য গরুর খাঁটি দুধের হালুইকরের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে তৈরী ছানাই

প্রশস্ত—কাঁচাগোল্লা গোল করে পাকানো হয়। আর মাখা 'তাল' হিসেবে ওজনে বিক্রি হয়। এর স্বাদ অতি মনোরম আর জিভে দিলে মাখনের মত মিলিয়ে যায়। মেমারী ও জামালপুরের 'মাখা'র খুবই খ্যাতি আছে।

চিত্তরঞ্জনও সন্দেশ তবে পাকের বিশেষ বালাই নাই। মিষ্টির ভাগও কম। সন্দেশ তৈরী করতে যেমন ছানার সঙ্গে পরিমাণমত চিনি মাখিয়ে পিতলের পরাতে কাঠের টারু দিয়ে অল্প আঁচে অনবরত নাড়তে হয় আর পাকটা চিটচিটে হলেই নামিয়ে নিয়েও কিছুক্ষণ নাড়তে হয়, চিওরঞ্জনের পাক সেরকম নয়। ছানায় অল্প পরিমাণ চিনি দিয়ে ভাল করে ঠেসে অল্প আঁচে সামান্য নেড়ে নামিয়ে বারকোসে ঢেলে চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে সমতল করে ছুরি দিয়ে বরফির মত কেটে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখতে হয়।

'তালশাঁস' বা 'জল ভরা'য় ভিতরে এলাচদানা দিয়ে রসসিক্ত করা হয়। কড়াপাক সন্দেশ তার নামের মধ্যেই এর প্রক্রিয়ার পরিচয় বহন করে। কড়াপাক সন্দেশ বেশ কয়েকদিন থাকে সে কারণে অম্বুবাচীর সময় ব্রাহ্মণদের, বিধবাদের জন্য এর চাহিদা বেড়ে যায়।

ছানার বদলে ক্ষীরের সন্দেশ হলে তার নাম হয় কালাকাঁদ; দেখতে চিত্তরঞ্জনের মত চৌকো বরফির আকারের।

জিলিপিও গরম খেতে খুবই উপাদেয়। জিলিপিরও রকমফের হয়; এক সের সফেদার সঙ্গে এক পোয়া (আড়াই শো গ্রাম) সুজি ভাল করে বেটে মিশিয়ে খুব ভাল করে ফেটাতে হবে, সামান্য জিলিপির রঙ দেওয়া যেতে পারে। এরপর একটা ফ্ল্যাট কড়াই-এ ঘি (বাদাম তেল) চড়িয়ে একটা ফুটো মালাই-এর ফুটোয় আঙুল দিয়ে বন্ধ করে সফেদা-সুজির গোলা ঢেলে নিতে হবে, তারপর আঙুল ছেড়ে দিয়ে দ্রুত ঘুরিয়ে গোলাকার প্যাঁচ দেওয়ার মত করতে হয়। লালরঙ হয়ে এলে ঝাঁঝরিতে তুলে রসের কড়াই-এ কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রেখে তুলে নিতে হবে। সফেদার বদলে বিউলি ডাল বাটার গোলা করলে 'অমৃতি' হবে আর ছানার সঙ্গে সুজি বাটা দিয়ে গোলা করলে হবে ছানার জিলিপি। নিখুতি, ছানাবড়া-এর আকার ও প্রক্রিয়ার প্রকারভেদ মাত্র। ছানার সঙ্গে সুজি দিয়ে ঠেসে বড়া আকারে ভেজে রসে ডোবালেই ছানাবড়া আর কড়ে আঙুলের আকারে জিলিপির ছাঁচে বা ন্যাকড়ায় ফুঁটো করে তাতে ছানাব লেই দিয়ে টিপে টিপে আঙুলের সাইজে ভেজে নিয়ে রসে ডোবালে নিখুতি। তবে নিখুতিব রঙটা সোনার মত হয়। স্বাদও ভালো! আর ছানার ছোট ছোট বরফির আকারে ঘি-এ ভেজে রেখে সীতাভোগের যে লেই তৈরী হবে তাতে জাফরান বা রঙ দিলে হলুদ রঙ করে সীতাভোগের

মত ভেজে রসে ডুবিয়ে তার সঙ্গে ছানার ছোট্ট বড়া ভাজা মিশিয়ে ও ২/৪ খানা তেজপাতা লবঙ্গ দিলেই ছানার পোলাও হয়ে যাবে।

মালপোয়া গুড়পিঠেরই উন্নত সংস্করণ। ময়দার সঙ্গে ঘন দুধ মিশিয়ে ফেটিয়ে শিরনির মত করে গোলাকার চেটালো কড়াই-এ ঘি গরম করে এক হাতা করে গোলা নিয়ে ঘিয়ে ভেজে রসে ডোবাতে হয়। গোলার সঙ্গে কালো জিরে গোলমরিচ মিশিয়ে দিলে স্বাদও ভাল হয়।

নারিকেলেরও নানা রকম মিষ্টান্ন হয়; তবে বড় বড় দোকানে নারকেলের মিষ্টি ব্রাত্য। কাজেকর্মে উৎসবে পূজাপার্বণে গৃহস্থ বাড়ীতে নারিকেল গুড় দিয়ে নাড়ু, নারকেল কোরার সঙ্গে চিনি মিশিয়ে ভাল করে মেখে শিলে বেটে কড়াই-এ পাক করলে রস কড়া হয়। পাক করার সঙ্গে ছোট এলাচ দানা কর্পূর সামান্য দিলে ভাল স্বাদ হয় আর মাখাবার সময় কিছু ক্ষীর মিশিয়ে দিলে অভিজাত মিষ্টিকেও হার মানাবে।

মাঝে মাঝে বড় দোকানে ছানার ডিমসন্দেশ তৈরী হতে দেখা যায়। এর পাক কাঁচাগোল্লার মত তবে পাক নামিয়ে সন্দেশের যে লেচি হবে তাকে মোলায়েম করে বেটে তার ভিতর ছানার সঙ্গে জাফরান মিশিয়ে তার পুর দিয়ে ডিমের কুসুম করা হয়। আর ডিমের আকারে-পাকানো হয়। তবে এখন আর জাফরান থাকে না। মিহিদানার রঙ দিয়েই কুসুম করা হয়। তাতে সাহিত্যিক বিজন ভট্টাচার্যের কথায়। "রসায়নের জিত হয়েছে কিন্তু হার হয়েছে রসের, হার হয়েছে রসনার।"

ছানা চিনি দিয়ে সন্দেশের সুলভ সংস্করণ হয় মন্ডা। দেবভোগ্য সন্দেশ। তবে প্রচলিত অর্থে নয়—আক্ষরিক অর্থে। দেবতার নৈবেদ্যে দেওয়া হয়। কিন্তু দেবতার নৈবেদ্যে যে মন্ডা দেওয়া হয় তাতে চিনির আধিক্যের জন্য ঘটিং-এর মত শক্ত হয়। দ্বিজ রামমোহন তাঁর রামায়ণে সীতার বিবাহের খাদ্যতালিকাতে যে "মোটা মোটা মন্ডা"-র কথা লিখেছেন সে মণ্ডা ৫০/৬০ বছর আগে আউসগ্রাম থানার বেলাড়িতে পাওয়া যেত। এখন বিশেষ বরাত দিলে ছানার পরিমাণ বেশী দিয়ে কোন কোন সাধারণ দোকানে খাসমন্ডা তৈরী করে দেয়।

"দেবভোগ্য" অন্যান্য মিষ্টির মধ্যে বাতাসা ও কদমার নাম করতে হয়। বাতাসা ও কদমাতে ছানার কোন সম্বন্ধ নাই। শুধু চিনির পাক তবে পাকের প্রক্রিয়ার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। বাতাসা তৈরী করতে চিনির পাক কিছুটা তরল রাখা হয়। লেইটা খুব ভাল করে নাড়তে হয় যাতে বাতাসার ভেতরটা ফাঁপা হয়। চিনির তরল পাক একটা ছিদ্র যুক্ত হাঁড়িতে নিয়ে কাঠের পাটার ওপর বড়ির মত

করে ফেলা হয়। শুকিয়ে গেলেই তুলে নেওয়া হয়। আবার কচুরির আকারের বড় বড় বাতাসাও হয়। দুবরাজপুরের বাতাসার নাম আছে। কদমা তৈরী করতে চিনির পাক এমন ভাবে নামাতে হবে যাতে সেই 'লেই'কে ঠেসে ঠেসে লুচি তৈরীর লেচির মত লম্বা করে ছোট ছোট নাড়ুর আকারে কেটে নেওয়া হয়। দুর্গাপূজার অষ্টমীর মহা নৈবেদ্যতে বিরাট আকারের কদমা দেওয়ার প্রচলন আছে কোন কোন বনেদী পূজা বাড়ীতে। কদমার ভেতর হয় ফোঁপরা। মানকরের কদমা বিখ্যাত।

বড় বড় দোকানে জলযোগের উপযুক্ত ঘিয়ে ভাজা কচুরী সিঙ্গাড়া তৈরী হয়। এর সঙ্গে ছোলার ডাল বা একটা তরকারীও ফাউ হিসেবে পাওয়া যায়। কচুরিতে ছোলার ডাল ভিজিয়ে তুলে নিয়ে মশলা দিয়ে ভেজে নরম থাকতে নামিয়ে শিলে বেটে কচুরির পুর করা হয়। তবে এখন অনেকে এত ঝামেলা না করে ছোলার ছাতু দিয়েই পুর করে। শীতকালে মটর শুঁটি ছাড়িয়ে বেটে মশলা দিয়ে ভেজে পুর করা হয়। সিঙ্গাড়ার মধ্যে আলু কপির ২/৪ টি কিশমিশ, নারিকেল কুচি এই সব দিয়ে পুর ভরে ত্রিভুজাকৃতি করে মুড়ে ঘিয়ে ভাজা হয়। ভেজিটেবল চপও তৈরী হয় আলুর পুর দিয়ে। তবে আলু, বীট, গাজর সিদ্ব করে ঠেসে তাতে নুন, মশলা, বাদাম, কিশমিশ, নারিকেল কুচোর পুর তৈরী করে গোল করে পাকিয়ে হাতের তেলোয় চেপ্টে বেসমে ডুবিয়ে ঘি বা তেলে ছাঁকতে হয়। সাধারণ দোকানে এখন তেলেভাজারও চল হয়েছে। ফুলুরি, আলুর চপ, বেগুনি গরীবের খাবার, মুড়ির সঙ্গে জমে ভালো।

এ জেলায় এই সব মিষ্টান্ন দীর্ঘদিন ধরে দেখে আসছি। তবে এখন তো বিশ্বায়নের যুগ। এসব এখন সব জেলাতেই পাওয়া যাচ্ছে। রসগোল্লা তো এখন সাগর পাড়ি দিচ্ছে। বর্ধমানের সীতাভোগ মিহিদানা বা শক্তিগড়ের ল্যাংচাকেও এয়ার টাইট কৌটায় পুরে সাগরপারে পাঠালে তো কিছু বিদেশী মুদ্রায় সাশ্রয় হয়। সুধীজন ভেবে দেখতে পারেন।

তৃতীয় পর্ব

গ্রাম পরিক্রমা

পর্যটকের লীলাক্ষেত্র বর্ধমান

মনীষী চরিতাবলী ও কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব

চৌদ্দ অধ্যায়

গ্রামপরিক্রমা

শ্রীচৈতন্যের পাদপূত

শ্রীপাট অম্বিকা কালনা।

নায়েব পাইক গীত গায় শুনিতে কৌতুক
ডাহিনে রহিল পুরী অম্বুয়া মুলুক।

(মুকুন্দরাম)

বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার প্রধান কার্যালয় ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত কালনা—প্রাচীনকালের আম্বোয়া বা আঁবুয়া বর্তমানের অম্বিকা কালনা। কুব্জিকাতন্ত্র মতে ৪২টি পীঠস্থানের অন্যতম পীঠ 'অম্বিকা'; বদরী চ মহাপীঠ অম্বিকা বর্ধমানকম্। কিন্তু 'বর্ধমানকম্' বলতে কোন স্থানকে বোঝায়? ড. দীনেশচন্দ্র সরকার তাঁর Sakta Pithas গ্রন্থে বলেছেন অম্বিকা নামক সিদ্ধপীঠের অর্ধস্থান অম্বিকা কালনা। কিন্তু তন্ত্রচূড়ামণি ও বামতোষণ বিদ্যালঙ্কার রচিত প্রাণতোষিণী তন্ত্রে যে ৫১ পীঠের উল্লেখ আছে তাতে কিন্তু অম্বিকার উল্লেখ নাই। অবশ্য ড. দীনেশচন্দ্র সরকার 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার ১৩৫৩ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার একটি প্রবন্ধে বলেছেন দেবী ভাগবতে পীঠের সংখ্যা ১০৮। কাজেই 'অম্বিকা' এই ১০৮ পীঠের অন্যতম পীঠ হতে পারে। কুব্জিকাতন্ত্র ও ড. দীনেশ সরকারের Sakta Pithasএর বক্তব্য অনুসারে অম্বিকা দেবী দুর্গারই প্রকারভেদ। অম্বিকা, এর আভিধানিক অর্থ মাতা। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে চণ্ডীকে অম্বিকা বা মাতৃদেবী বলা হয়েছে—"শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী"। ড. পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর পূজা পার্বণের উৎসকথা গ্রন্থে বলেছেন চণ্ডিকা প্রধানত প্রাক্ আর্যভাষী দ্রাবিড় অথবা অস্ট্রিক জাতিগোষ্ঠীর উপসিত এক প্রধান মাতৃকাদেবী। বামন জয়াদিত্যকৃত পাণিনি বৃত্তিগ্রন্থ কাশিকায় 'মাতা' অর্থে অম্বিকার উল্লেখ আছে—তৈত্তিরীয় আরণ্যকে রুদ্রপ্রণাম মন্ত্রে 'অম্বিকাপতয়ে'এর উল্লেখ পাই।

ড. বিনয় ঘোষের (পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি) মতে 'আসলে অম্বিকা হলেন জৈনদের বিখ্যাত উপাস্যদেবী, পরে বাংলার পলিমাটিতে দুর্গায় পরিণত হয়েছেন। ...দেবী অম্বিকার উপাসনা শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একাদশ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বিশেষ প্রচলিত ছিল মনে হয়। অম্বিকা উপাসনার উত্তরাধিকার নিয়ে কালনা হয়েছে অম্বিকা কালনা।'

বর্ধমান গেজেট ১৯৯৪-তে বলা হয়েছে—The Presiding deity of the town is the Goddess Ambica who is said to be a Jain deity of the past merging into the concept of Sakti of the Hindus. The position of the presiding deity is now assumed by Siddheswari represented by an icon of Kali with four hands. সিদ্ধেশ্বরী নিমকাঠের তৈরী এক দুর্লভ একক ভৈরবী চতুর্ভুজা কালীমূর্তি ড. পঞ্চানন মণ্ডলের মতে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মহাবীর রাঢ়দেশে এসে বজ্রভূমি ও সূক্ষ্মভূমিতে বহু বৎসর যাপন করেছিলেন। তাছাড়া এখানে ১২ বছর অজ্ঞাতবাস করেন। বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—বর্ধমান নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্বমঙ্গলা—ইনি স্বস্তিকামূর্তি। এই স্বস্তিকা মঙ্গলাদেবী মূলত জৈন দেবী। বর্ধমানে জৈন রাজবংশ এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

দীপক দাস তাঁর "কালনার ইতিবৃত্ত" গ্রন্থে কালনার ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন—অজীবিক সম্প্রদায়ের বণিকরা গুপ্তযুগে বাণিজ্যের তরী নিয়ে বিভিন্ন গ্রামের উৎপাদিত দ্রব্য পৌঁছে দিতো বিশ্বের দরবারে। এই সমস্ত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী ড. বিনয় ঘোষের মতের বিরোধিতা করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে জৈন দেবী অম্বিকার নামানুসারে অম্বিকা স্থান নামটি গ্রহণ করা হয় নাই—এই মত গ্রহণযোগ্য নয়।

১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের ভন ডেন ব্রুকের মানচিত্রে Ambooa নাম পাওয়া যায়। রেনেলের মানচিত্রে ভাগীরথীর পূর্ব পাড়ে Santipur ও পশ্চিমপাড়ে Culna ও এর দক্ষিণে Ambooa দুটি নাম পাওয়া যায়। এই কালনা নাম অন্যত্রও আছে যেমন জামালপুর থানার শুঁড়ে কালনা—সে কারণে কালনার অবস্থান সম্বন্ধে বিভ্রান্তি দূর করার জন্য Ambooa ও Culnaকে অম্বিকা-কালনা করা হয়েছে। তাই বোধহয় প্রথমে কালনা স্টেশনের নাম কালনা কোর্ট করা হলেও পরে অম্বিকা কালনাই বহাল করা হয়েছে।

কালনা অতি প্রাচীন শহর। কালনা সম্বন্ধে খানসাহেব মৌলবী ওয়ালির ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন-জুলাই সংখ্যার Bengal Past and Present

Antiquities of Kalna প্রবন্ধের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। Kalna in the district of Burdwan is situated on the Ganges or Bhagirathi. It appears that it was a celebrated place during the Mahomedan rule and earlier during the Hindu period. Being situated on the river, it was no doubt considered to be a healthy place for strategical purposes. Nothing of the period of the Hindus can now be traced except that the Mahommedans built the mosques out of the materials of Hindus ruins. The inscriptions noticed here show that Kalna was the seat of military governors, who were generally not invariably of the Afgan or Turkoman race. The ruins of a large fort constructed to command the river are still visible.'

The new popular Encyclopedea 1902-এ Culna or Kalna-এর বিবরণে দেখা যায়—Culna or Kalna a town of Hidusthan in Burdwan district of the province of Bengal on the right bank of the Hooghly, 48 miles, n.n.w. of Calcutta. It has a Maharaja's palace, some handsome temples and two fine mosques of considerable antiquity. Here is also a flourishing school and mission station in connection with the united free church of Scotland. It is one of the principal ports on the Hooghly for the Burdwan Dist. and carries on a thriving trade pop (1891) 9680.

কাজেই যদিও এখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শন এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই তবুও এই শহরের প্রাচীনত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

কালনা গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে অবস্থিত হলেও ভাগীরথী, খড়ি, বাঁকা, জলঙ্গী, বল্লুকা প্রভৃতি নদী মহকুমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় জলবায়ু চরমভাবাপন্ন হতে পারে নাই। এখানকার গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৫° সেন্টিগ্রেড ও সর্বনিম্ন ১১° সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১২২১ mm.

বর্তমানে এখানকার প্রধান নদী ভাগীরথী। কিন্তু অতীতে দামোদর নদী কাটোয়া ও কালনা মহকুমা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কালনার কাছে হুগলীতে মিলিত হতো। ভন ডেন ব্রুকের ম্যাপে দেখা যায় দামোদরের একটি ধারা কালনার কাছে ভাগীরথীতে মিশেছে। এর দক্ষিণে পড়েছে জলঙ্গী। Rev. Long-এর বিবরণে দেখা যায় The river (Damodor) formerly flowed behind Kalna

where old Kalna now is. It passed by Pyagachi, the remains of deep and large Jhills are still to be met with there.

P. K. Roy তাঁর Agricultural Economy of Bengal গ্রন্থেও এর উল্লেখ করেছেন—

But before her (Damodor) joining Hoogly near Kalna, she is known to have had flowed almost a direct west to east course and discharged her water to the Hooghly at a point in the vicinity of Katwa...

কাজেই অতীতে দামোদর এবং তার শাখা ও উপনদী বাঁকা, খড়ি, বল্লুকা এবং ভাগীরথী কালনার নৌবাণিজ্যের দ্বারা ও বর্তমানে এই সমস্ত নদী ও উপনদীর বিধৌত পাললিক ভূমিতে কৃষি উৎপাদনের দ্বারা কালনার অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে আসছে।

অতীতে দামোদর ভাগীরথীর মিলিত স্রোতধারা হুগলীতে মিলিত হওয়ার ফলে কালনা বর্ধমান জেলার একটি বন্দরে পরিণত হয়। Long সাহেবের বিবরণে এর উল্লেখ আছে।

Kalna is noted for its great trade being the port of the Burdwan district, the bazar has 1000 shops, the houses are chiefly of bricks. Great quantities of rice brought from merchants of Rangpur, Dewanganj, Juffiganj, are being stored up; grain, silk and cotton also from a large staple. Kalna must have been a great importance in musalman times; as the remains of a large place of fort are still to be seen near mission house. The village of Ambika is situated near it, Katwa is said to have 60,000 inhabitants the chief part of that came from different parts of the country to carry on trade here. (Cal. Review, Dec. 1846)

লঙের বিবরণে জানা যায় কালনার জাপটে ভুরোচিনি, কাঁসারী পাড়ায় কাঁসার বাসন, হাঁসপুকুরে তুলোট কাগজ উৎপন্ন হতো। পুরাতন হাটে ছিল নীলকুঠি। কালনার তাঁতিরা গরদ, তসর, মটকা ও সুতীর কাপড় তৈরী করতো।

এখানকার চাউল পটিতে নানা জাতের ধান-চাউল কেনাবেচা হতো। তখন তো আর এখনকার মত রত্না, ভাযামানিক. ১০১০, ১০২০, মিনিকিট, স্বর্ণ, খেজুরছড়ি. এসব ধান-চাল ছিল না। তখন সরু নাকড়া, ডহর নাকড়া, ঝিঙ্গেশাল, হাতিশাল, কনকচূড় কার্তিকশাল, কুসুমশালি, বালাম, শীতেশাল, গোপাল,

সোনাখড়কি, হাতিপাঁজর, লাউশালি, বাসমতী প্রভৃতি হাজার রকমের ধান-চাল আমদানি-রপ্তানি হতো। ডালহরা মহলে ভাঙা হতো বুট, বিরি বা মাষকলাই, অড়হর, মটর-মসুর, কলাই, সর্ষে পার্টিতে তিল, সরষে ভাঙা হতো, ভেটেরা মহলে পাথরের বাসন, সোনাপটিতে সোনারূপোর গয়না, কেনাবেচা হতো। চকবাজারে সুতী, গরদ কাপড়, নিভৃতি বাজারে খড়, পাট, কাগজ এসবের পাইকারী-খুচরা ব্যবসার রমারমা ছিল। ১৪৪০ সাল থেকে মোটামুটিভাবে মুসলমান শাসন আরম্ভ হয়। মুসলমান শাসনের সময়েও কালনায় ব্যবসা-বাণিজ্যের রমরমা বেড়ে যায়। তার আগে হিন্দু যুগে কালনা সমৃদ্ধিশালী শহর ছিল। ওয়ালি সাহেবের বিবরণে তার পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলমান যুগ ও কোম্পানীর আমল পর্যন্ত নদীপথেই ব্যবসা-বাণিজ্য, যাতাযাত চলতো।

তারপর ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হলে ১৯০৫ সালে A Boileor-এর তত্ত্বাবধানে হাওড়া-ব্যান্ডেল-বারহারোয়া রেলপথের লাইন পাতার কাজ শুরু হয়—চলে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। Peterson-এর গেজেটেও এর উল্লেখ আছে। ১৯১১ সালে পরীক্ষামূলকভাবে গাড়ী চালানর কাজ শুরু হয় কিন্তু গুপ্তিপাড়ার কাছে লাইন বসে যায়। শেষ পর্যন্ত ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল কাটোয়া পর্যন্ত ট্রেন চলাচল শুরু হয়। ১৯৯৬ সালে বৈদ্যুতিক ট্রেন চালু হয়েছে। ভাগীরথীরও গতি পরিবর্তনের ফলে নদীপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ হয়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারা বদলেছে। আর সেই সঙ্গে বদলেছে কালনার ইতিহাসের গতি।

কালনায় ইসলামীয় স্থাপত্যের নানা নিদর্শন ও নিদর্শনের কঙ্কাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। পঞ্চদশ শতকে এখানে এসেছিলেন বদর সাহেব ও মজলিস সাহেব নামে দুই ভাই ইসলামের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে। তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে 'মজলিস সাহেব কি দীঘি' নামে এক বিরাট দীঘি খনন করা হয় কালনা শহর থেকে মাইল দেড়েক পূর্বে—শাসপুরে। তার তীরে পীর সাহেব ও মজলিস সাহেবের সমাধি, আস্তানা, মসজিদ-নির্মাণ করা হয়। এই আস্তানার হিন্দু-মুসলমান সব সম্প্রদায়ের কাছে পীরস্থান নামেই পরিচিত। এখানে হিন্দু-মুসলমান সকলেই সিন্নি দেয়—মানত করে। পয়লা মাঘ প্রতি বৎসর মেলা বসে। জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে ড. বিনয় ঘোষ উল্লেখ করেছেন—পূর্বে নাকি মেলার সময় মজলিস দীঘি থেকে একটি সোনালি মসজিদ ও চৌকি ভেসে আসতো।

মুসলমান আমলে কালনায় তৈরী হয় ৫টি মসজিদ। সবচেয়ে প্রাচীন মসজিদ নির্মিত হয় সৈফুদ্দিন ফিরোজ শাহের (১৪৮৭–৯০ খ্রীঃ) আমলে। কিন্তু এর

কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। জাদুঘরে রক্ষিত একটি শিলালিপি থেকে এর অস্তিত্বের কথা জানা যায়। দ্বিতীয় মসজিদ নির্মিত হয় দ্বিতীয় নাসিরুদ্দিন মাহ্‌মুদ শাহের আমলে—৮৯৫ হিজরী অব্দে নির্মাণ করেন দৌলত খান। হোসেন শাহী বংশের রাজত্বকালে ফিরোজ শাহের আমলে দশ গম্বুজ ও মিনার সমন্বিত মসজিদ নির্মিত হয় শাসপুরে। খানদানি মুসলমান, আয়মাদারগণ পালকিতে চড়ে এখানে ঈদের নমাজ করতে আসতেন। পালকির বেহারার সংখ্যা ও পালকির সাজসজ্জা নির্ভর করতো মালিকের মর্যাদার ওপর। এই মসজিদের গম্বুজ মিনার সব ভেঙে পড়েছে। তবে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। এরই অনতিদূরে মজলিস দীঘির পাড়ে আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট মসজিদ নির্মিত হয়। এটি নির্মিত হয় হিজরা ৮৬৭ তে (১৫৫৯ খ্রীঃ); নির্মাণ করান সরওয়ার খান। এটিও ধ্বংসপ্রাপ্ত। আর একটি নির্মিত হয়েছিল, জেলে পাড়ায়, নির্মাণ করান সেখ খয়ের উল্লাহ ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে।

হোসেন শাহের আমলেই (১৪৯৩-১৫০০) বৈষ্ণব-ধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হয়। তাঁর হরিনাম সংকীর্তনের জোয়ারের ফলে যখন ভাগীরথীর বাম তীরে 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়' তখন ভাগীরথীর দক্ষিণতীরে কালনাও কি সেই জোয়ারে না ভেসে থাকতে পারে? বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারে বের হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অম্বুয়ায় এসে বিশ্রাম নিয়েছিলেন শহরের দক্ষিণে একটি তেঁতুলগাছের তলে। সেখানকার একটি শিলালিপিতে এর বিবরণ লেখা আছে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিশ্রামস্থান আমলিতল। শ্রীগৌর ও গৌরী দাসের সম্মিলনস্থল। নিত্যানন্দ প্রভু অম্বিকা কালনাকে হরিনাম সংকীর্তনে মাতিয়ে দিয়েছিলেন।

এই মতে সপ্তগ্রামে আম্বুয়া মুলুকে।
বিহারেন নিত্যানন্দ স্বরূপ কৌতুকে॥
তবে কথো দিনে আইলেন শান্তিপুরে।
আচার্য্য গোসাঞি প্রিয় বিগ্রহের ঘরে।

[চৈতন্য ভাগবত (অন্ত)-৫ম বৃন্দবন দাস]

বিখ্যাত কালীসাধক ও শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতা কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের (১৭৭২-১৮২১) এই অম্বিকা কালনাতেই আবির্ভাব হয়। তারপর তিনি মাতুলালয় চান্নায় এসে বিশালাক্ষি মন্দিরে সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেন। কালনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সিদ্ধেশ্বরী দেবী—জোড়াবাংলা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত

নিমকাঠের এই বিরল চতুর্ভুজ কালীমূর্তি পূর্বে একক মূর্তি ছিল। পরে এর সঙ্গে শিবের মূর্তি সংযোজিত হয়েছে। এই রকম নিমকাঠের কালীমূর্তি আছে বর্ধমানে প্রতিষ্ঠিত ভৈরবেশ্বরী কালীমূর্তি—সম্পূর্ণভাবে একটি নিমের গুঁড়ি থেকে তৈরী। চৈতন্যোত্তর যুগে এরূপ কাঠের অনেক মূর্তি আছে যেমন বোড়র বলরাম মূর্তি, কাটোয়ার গৌরনিতাই, কৈয়রের মদনগোপাল, বিজয়গোপালের মূর্তি, গোপাল-দাসপুরের রাখালরাজের মূর্তি কিন্তু নিমকাঠের তৈরী কালীমূর্তির দুর্লভ দৃষ্টান্ত কালনার সিদ্ধেশ্বরী ভৈরবী মূর্তি ও বর্ধমানের ভৈরবেশ্বরী কালীমূর্তি। সিদ্ধেশ্বরী মূর্তি ছাড়া কালনায় রয়েছে অম্বিকা মহিষমর্দিনী। প্রতি বৎসর আশ্বিনে শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় মহিষমর্দিনী দশভুজার মহাসমারোহে পূজা হয়। এই ভাবে শাক্ত, বৈষ্ণব ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান হয়ে ওঠে অম্বিকা কালনা।

হোসেন শাহের সময়েই বর্ধমানে মোগল সম্রাটদের ও বর্ধমান রাজবংশের প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে এবং ব্রিটিশ যুগের সূচনা থেকেই রাজবংশের প্রতিপত্তি চরমে ওঠে। কালনাতেও রাজবংশের অনেক দায়-দাক্ষিণ্য ও বদান্যতার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। এই সব নিদর্শন এখানকার বাজপ্রাসাদ, সমাজবাড়ী ও মন্দির স্থাপত্যের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। বর্গী হাঙ্গামার আগে পর্যন্ত দাঁইহাট ছিল রাজবংশের গঙ্গাবাসের স্থান। দাঁইহাটের রাজপ্রাসাদের মধ্যে সমাজবাড়ীতে মহারাজ কীর্তিচাঁদের আগে পর্যন্ত সমস্ত মহারাজ ও মহারানীর অস্থি ও স্মৃতিমন্দির ছিল। কিন্তু বর্গী হাঙ্গামায় এখানকার প্রাসাদ ও সমাজবাড়ী গঙ্গার ঘাট বিধ্বস্ত ও অধিকৃত হওয়ায় কালনায় রাজপ্রাসাদ সমাজবাড়ী ও গঙ্গাবাসের প্রাসাদ নির্মিত হয়। পৃথক পৃথক কক্ষে রক্ষিত আছে কীর্তিচাঁদের পরবর্তী সমস্ত মহারাজা ও মহারানীর অস্থি ও চিতাভস্ম এবং এর ওপর স্মৃতিমন্দির নির্মিত হয়েছে। পিটারসনের গেজেটের বিবরণে জানা যায় এখানে মহতাবচাঁদ মহারাজের মন্দিরে তাঁর দৈনন্দিন ব্যবহৃত সমস্ত জিনিস রাখা থাকতো। এছাড়া থাকতো রুপোর—রেকাব, পানীয় জলের বড় বড় পাত্র, হুকা, আতর দান, তাঁর ব্যবহৃত বেড়াবার ছড়ি, তৈজসপত্র ও দৈনন্দিন ব্যবহারের অন্যান্য জিনিসপত্র। পাশের কক্ষে সাজানো হতো তাঁর অফিস-চেম্বার যেখানে তাঁর ব্যবহৃত টেবিল, দোয়াত, কলমদান, কলম এমন কি ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট পর্যন্ত সাজিয়ে দেওয়া হতো। তৃতীয় কক্ষে সাজানো থাকতো খাটপালঙ্ক। এছাড়া তিনি প্রতিদিন যে আহার্য গ্রহণ করতেন সেইসব আহার্য সামগ্রী তৈরী করে এখানে প্রতিষ্ঠিত তাঁর মূর্তিকে নিবেদন করা হতো ও নিবেদিত ভোজ্যদ্রব্য দরিদ্র নারায়ণের মধ্যে বিতরণ করা হতো। আজ রাজাও নাই—রাজবাড়ীর সে জৌলুসও নাই। অবহেলিত সমাধি-

মন্দির ও সমাজবাড়ীর চলছে এখন কোনমতে অস্তিত্ব বজায় রাখার লড়াই। প্রাসাদের মধ্যে আছে কীর্তিচাঁদ-জননী—ব্রজকিশোরীর প্রতিষ্ঠিত পঁচিশ চূড়ার লালজী মন্দির (১৬৬১ শকাব্দ), ত্রিলোকচন্দ্রজননী লক্ষ্মীকুমারী প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির (১৬৭৩ সাল)। এছাড়া কালনায় আছে রাজবংশের অনুগ্রহপুষ্ট কৃষ্ণচন্দ্র বর্মন প্রতিষ্ঠিত গোপালজীর মন্দির, ১৬৬৩ শকাব্দে মহারাজ চিত্রাসেন নির্মিত সিদ্ধেশ্বরী দেবীর জোড়াবাংলো মন্দির। রাজবাড়ীর পশ্চিমে শিবক্ষেত্রে বৃত্তাকারে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে শ্বেতপ্রস্তর ও কৃষ্ণপ্রস্তরের ১০৯ শিবলিঙ্গ; এই ১০৯ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা সম্পর্কে পিটারসন লিখেছেন—The fifty letters counted from the beginning to end and the other way give us the figure 100. To this is added 8 as representing the group (a, Ka, cha, ta, tha, Pa, ya, ca) into which the letters are arranged. There is one more terminal bead called the meru or pole.

মহিষমর্দিনীর মন্দির, রাজবাড়ীর দোলমঞ্চ, শিলাময়ী জয়চণ্ডীর মন্দির কালনার অন্যতম দর্শনীয় বস্তু। সংস্কৃতচর্চায় কালনার স্থান জেলার শীর্ষে। জেলার ১৯০টি সংস্কৃত টোলের মধ্যে কালনাতেই ছিল ৩৭টি। কালনার বিখ্যাত পণ্ডিতদের মধ্যে তারানাথ তর্কবাচস্পতি, দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন ও অযোধ্যারাম বিদ্যাবাগীশের নাম অগ্রগণ্য। কালিদাস সার্বভৌমের পুত্র তারাদাস তর্কবাচস্পতি (১৮০৬–২০.৩.১৮৯৫) ছিলেন সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করে তিনি তর্কবাচস্পতি উপাধি পান। সংস্কৃত কলেজে তিনি ব্যাকরণের অধ্যাপক ও পরে সহকারী সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেছিলেন। তাঁর কাপড়ের ব্যবসাও ছিল। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে ছয় খণ্ডে রচিত বাচস্পত্য অভিধান, শব্দস্তোম মহানিধি, শব্দার্থরত্ন, বহুবিবাহবাদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন জীবন্ত সংস্কৃত বিশ্বকোষ। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম সহায়ক ছিলেন কিন্তু বহুবিবাহ বিরোধ আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন।

কালনাতে সংস্কৃত টোল ছাড়া পার্সিয়ান স্কুল, আরবী মক্তবও গড়ে উঠেছিল। মিশনারীদের দ্বারা প্রথম বালিকা বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে মিশনারীরা চার্চ মিশনারী সোসাইটি স্থাপন করে। কালনায় প্রকাশিত হয়—বাংলা দৈনিক ১টি, বাংলা পাক্ষিক ৬, বাংলা মাসিক সাহিত্যপত্র ২, ত্রৈমাসিক ৩, ও ষাণ্মাসিক বাংলা ২, মোট ১৪টি পত্রিকা। কালনার 'পল্লীবাসী' পত্রিকা ১৯৯৬ সাল শতবর্ষ পূর্ণ হওয়ার গৌবব অর্জন করেছে।

কালনা মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ১লা এপ্রিল। সে সময় পৌর এলাকার লোকসংখ্যা ছিল ৮৬০৩ জন। ১৯৯১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী কালনা মিউলিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড সংখ্যা ১৪। মিউনিসিপ্যালিটি বহির্ভূত ধাত্রীগ্রামও কালনা শহর এলাকার মধ্যে পড়ে। কালনা মিউনিসিপ্যালিটির আয়তন ৬.৪৭ বর্গ কিমি, লোকসংখ্যা ৪৭১২৯, তপসিলী ১২৭০৬ ও উপজাতি ৪৮৮, ধাত্রীগ্রামের লোকসংখ্যা ৭৪৭৩, তপসিলী ১০৩৩ ও উপজাতি ৪০৯। জনসংখ্যার ঘনত্ব বর্গকিমিতে ৭৩০০।

এখানে আছে একটি ১৩৫ বেডের হাসপাতাল, ডিসপেনসারী—৪, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র—১, টি.বি. ক্লিনিক—১, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কেন্দ্র—২, আর্টস, সায়েন্স, কর্মাস ও বি.এড কলেজ—১, মেডিক্যাল কলেজ ৭০ কিমি দূরে বর্ধমানে আর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ—৯৫ কিমি দূরে কলকাতায়। শর্ট হ্যান্ড টাইপ রাইটিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে ৪টি, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়—৪, মাধ্যমিক—৪, জুনিয়ার হাই স্কুল ৩, প্রাথমিক ৩২ ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ১৫০। স্টেডিয়াম আছে—১, সিনেমা হাউস—২, কমিউনিটি হল—২ ও রিডিং রুমসহ পাবলিক লাইব্রেরী ৩। পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা আছে।

কালনায় ধান, চাল, পাট, আলুর বাজার জমজমাট। ইট, কাঠের শিল্পসামগ্রী, তাঁতবস্ত্রও তৈরী হয়। আর একটা ব্যবসা কিছু দিন হলো জোর কদমে চলছে। শংকর মিত্র মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত কারখানায় কালনার 'রাখী' এখন উত্তর ভারতের বাজারে ঢালাও বিক্রি হচ্ছে।

প্রাচীন নগর দাঁইহাট :

কাটোয়া থানার প্রাচীন নগর দাঁইহাট। কাটোয়া থেকে বাসে বা ব্যাণ্ডেল কাটোয়া লাইনে কাটোয়ার ঠিক আগের স্টেশন দাঁইহাট। মোগল যুগ থেকে নবাবী আমল পর্যন্ত সুলেমাবাদের অন্তর্গত ইন্দ্রাণী পরগনার উল্লেখ পাওয়া যায়। কাটোয়া থেকে ভাগীরথীর প্রবাহপথ ধরে ভাউসিংহ মৌজা পর্যন্ত বিরাট অঞ্চল এই পরগনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। দাঁইহাট এই ইন্দ্রাণী পরগনার অন্তর্ভুক্ত।

বারো ঘাট, তের হাট তিন চণ্ডী তিন ঈশ্বর
ইহাই যে বলিতে পারে তার ইন্দ্রাণীতে ঘর।

(কাশীরাম দাসের জীবনী : সুবোধচন্দ্র মজুমদার)

বারো ঘাটের মধ্যে অন্যতম দেওয়ান ঘাট আবার তের হাটের মধ্যে ছিল দণ্ডীহাট বা দাঁইহাট। দণ্ডীহাট সম্পর্কে প্রচলিত প্রবাদ—ইন্দ্রাণীর কোন এক রাজা

ইন্দ্রাণী নগরীর এক স্থানে যজ্ঞ করে কোন এক ব্রাহ্মণকে দণ্ডপ্রমাণ তিন ফেরতা গ্রন্থিযুক্ত যজ্ঞসূত্র বা দণ্ডীদান করেন। সেই দান দেওয়ার স্থানটিকে দণ্ডী বলা হতো। এই দণ্ডীহাট পরবর্তী কালে উচ্চারণ ভেদে দণ্ডহাট > দাঁইহাট-এ রূপান্তরিত হয়েছে। (তথ্যসূত্র দাঁইহাট পৌরসভা ১২৫ বৎসর পূর্তি উৎসব ১৯৯৪ স্মারকগ্রন্থ)।

আবার অনেকের মতে বর্ধমান-রাজ কীর্তিচাঁদ ও চিত্রসেনের দেওয়ান ছিলেন মানিকচাঁদ। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩৩৮ থেকে জানা যায়, এই মানিক-চাঁদের বাড়ী ছিল গুপ্তিপাড়ায়। মহারাজ মানিকচাঁদ দেওয়ানের নামে ভাগীরথীর তীরে ইন্দ্রাণী পরগনার ভাগীরথী তীরে দেওয়ান ঘাট নির্মাণ করিয়ে দেন—এই দেওয়ান ঘাটই পরে উচ্চারণ ভেদে দাঁইহাটে পরিণত হয়। দেওয়ান ঘাট থেকেই দাঁইহাট হওয়াটাই স্বাভাবিক মনে হয়।

দাঁইহাটের মিউনিসিপ্যালিটি অতিপ্রাচীন। ১৮৬৯ সালের ১লা এপ্রিল স্থাপিত হয়। ১৯৯৪ সালের সেন্সাস রিপোর্ট মতে দাঁইহাট মিউনিসিপ্যাল এলাকার আয়তন ১০.৩৬ বর্গ কিমি, লোকসংখ্যা ২০৩৪৯, পুরুষ ৬১৭৭, স্ত্রী ৪৫৪৪।

এই মিউনিসিপ্যালিটি ১৩০ বছরের প্রাচীন হতে পারে—কিন্তু জনপদটির প্রাচীনত্ব আরও গভীরে। এখানকার বিভিন্ন স্থানে খননকার্যের ফলে অশোক-স্তম্ভের সিংহের মত সিংহমূর্তি পাওয়া গেছে—যে-গুলিকে মৌর্য যুগের বলে অনুমান করা হয়। ১৮৯৫ সালে বেড়াগ্রামে পিতলের জৈনমূর্তি পাওয়া গেছে। যেটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে প্রতাপসিংহের পুত্র ভৃগুভাউসিংহ ১৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ইন্দ্রাণী পরগনা সম্পর্কে কাশীরাম দাসের জীবনীতে যে বারো ঘাটের উল্লেখ আছে, তার মধ্যে ভাউসিংহের ঘাট অন্যতম।

পুরসভার ১২৫ তম বর্ষপূর্তি স্মারকগ্রন্থে আয়ুব হোসেন সাহেবের বিবরণে মহারাষ্ট্রপুরাণ রচয়িতা গঙ্গারাম দত্তকে দাঁইহাট অঞ্চলের লোক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সাহিত্যাচার্য সুকুমার সেন গঙ্গারামের মহারাষ্ট্রপুরাণ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। 'ব্যোমকেশ মুস্তাফী যিনি গঙ্গারামের মারাঠা পুরাণ প্রকাশ করেছিলেন, তিনিই নাম দিয়েছিলেন মহারাষ্ট্রপুরাণ।' ভারতবর্ষ পত্রিকার ১৩৩৬ শ্রাবণ সংখ্যায় রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্ধৃতি দিয়ে ডা. সেন বলেছেন গঙ্গারামের পুরোনাম গঙ্গারাম দত্ত। গঙ্গারাম দত্তের নিবাস নড়াইল (যশোর জিলায়)। সেনের মতে পুরাণের ভাষার কোন কোন তদ্ভব শব্দ অপশ্চিমবঙ্গদেশীয় যেমন "সুইনা" > শুনে, "সোনার বাইন্যা" > সোনার বেনে, "জাউল্যা-মাউছা" = জেলে মেছো।

তবে অনেক শব্দ পশ্চিমবঙ্গীয় তদ্ভব বা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের সর্ববঙ্গীয়। সুতরাং ভাষার বিচারে গঙ্গারামকে অপশ্চিমবঙ্গীয় সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নয়। তবে পুঁথির লিপিকার অপশ্চিমবঙ্গীয় হতে পারেন, যদি অবশ্য পুঁথিটি গঙ্গারামের স্বহস্তলিখিত না হয়। কাজেই গঙ্গারামকে দাঁইহাট অঞ্চলের লোক বলে সিদ্ধান্ত করা বোধ হয় সমীচীন নয়। তাছাড়া হোসেন সাহেব কৃষ্ণবিলাস রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণ দাস, মহাভারতের কয়েক পর্বের রচয়িতা কাশীরাম ও জগন্নাথমঙ্গল রচয়িতা গদাধরকে দাঁইহাটের সিদ্ধিগ্রামের তিন ভাই বলে বর্ণনা করেছেন। যদিও "ভাগীরথী তীরে বটে ইন্দ্রয়ানী গ্রাম / তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিদ্ধিগ্রাম"। তবুও সিদ্ধি বা সিঙ্গি গ্রাম দাঁইহাটের দক্ষিণপ্রান্ত থেকে বেশ কয়েক মাইল পাখী-ওড়া দূরত্বে অবস্থিত। সিদ্ধি বা সিঙ্গি দাঁইহাটে নয়। হোসেন সাহেব লিখেছেন মারাঠা নেতা ভাস্কর পণ্ডিত দাঁইহাটে দুর্গাপূজা করেছিলেন। সাহিত্যাচার্য সুকুমার সেনও বলেছেন মীর হাবিব ভাস্করের কাটোয়া শিবিরের উপর গোলাবর্ষণ করায় ভাস্কর দাঁইহাটের দিকে সরে যান ও নিশ্চিন্তে দশেরা (দুর্গাপূজা) করেন। কিন্তু ইতিহাস অন্য কথা বলে। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার লিখেছেন : "Bhaskar was celebrating the Durga Puja at Katwa in the most lavish style with forced contributions from the Zamindars."

বর্ধমান গেজেট ১৯১০-এ Peterson লিখেছেন "In the next year (1742) Alibardi Khan defeated Bhaskar, the Maratha General at Katwa..." Burdwan Gazetteer 1994 তে দেখা যায়। In 1742 while Bhaskar Pandit was celebrating the Durgapuja at Katoya Nawab Alivardi Khan fell upon him suddenly after crossing the Ganga at Uddharanpur and the Ajoy, a mile north of Katoya and put him to flight.

যাই হোক, ইতিহাসের কচকচি বাদ দিয়ে দাঁইহাটের সংস্কৃতি নিয়ে কিছু আলোচনা প্রাসঙ্গিক হবে। দাঁইহাটেও সিদ্ধেশ্বরী মন্দির আছে। এই মন্দিরের উত্তর ভাগে শাক্ত সাধক রামানন্দ সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেন। দেওয়ানঘাটে ইন্দ্রেশ্বর শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে মুসলমান আমলে বদর সাহেবের মাজার নির্মাণকালে এই মন্দিরের উপাদান ব্যবহার করে মাজার নির্মিত হয়। মাজারের সামনের দেওয়ালে প্রস্তর খণ্ডে ক্ষোদিত দেবদেবীর মূর্তির চিহ্ন দেখা যায়। বুড়ো রানীর ঘাটে বর্ধমান রাজবংশের সমাজবাড়ী আছে। দাঁইহাটেও রাস উৎসব হয়। নবদ্বীপ শান্তিপুরের মত থাকাতে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি সাজিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করা হয়।

ড. বিনয় ঘোষ লিখেছেন—"পাতুন ও দাঁইহাটে পাথর, কাঠ, অষ্টধাতু প্রভৃতি মূর্তি নির্মাণশিল্পী যথেষ্ট সংখ্যক ছিল। পাতুন দাঁইহাট থেকে পাখীওড়া মাইল বারো দক্ষিণে অবস্থিত।" দাঁইহাটের এই প্রস্তরশিল্প কতদিনের সে তথ্য অজ্ঞাত। আয়ুব হোসেন সাহেব লিখেছেন : বর্ধমানের মহারাজার সঙ্গে দাঁইহাটের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ...এই রাজারা লাহোর হতে নবীন ভাস্করদের পূর্বপুরুষদের এখানে এনেছিলেন পাথরের মূর্তি গড়ার জন্য। এই বংশের আদিপুরুষ সঙ্গম রায়। সম্রাট আকবরের সময় ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনার্থে বের হয়ে সরিফাবাদে আসেন ও বৈকুণ্ঠপুরে বসতি করেন। সে সময় এঁদেরই বাসস্থানের ঠিকানা ছিল না কাজেই সে সময় লাহোর থেকে শিল্পী নিয়ে আসার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবে যদি পরবর্তীকালে কোন সময়ে আনান সেকথা আলাদা। তাছাড়া এই শিল্পীদের বংশতালিকা যতদূর পাওয়া গেছে সেই তালিকার নামের মধ্যে পাঞ্জাবী গন্ধ এতটুকুও পাওয়া যায় না। জানি না আয়ুব সাহেব এই তথ্য কোথায় পেলেন। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দাঁইহাট পর্যটনে গিয়ে তাঁর 'দেখা হয় নাই' প্রবন্ধে লিখেছেন—কাঁসারীপাড়ায় এখন দুজন মাত্র শিল্পী অবশিষ্ট আছেন। তাঁরা পিতাপুত্র। পিতার নাম বিশ্বনাথ ভাস্কর, লক্ষ্যণীয় পুত্রের নাম শৈলেন্দ্র কুমার! (দেশ-২৯/১/৭২)।

"...এ পরিবারের বংশগত উপাধি ভাস্কর কিন্তু তারা জাতিতে সূত্রধর। কত পুরুষ ধরে তারা এ পদবী ব্যবহার করছেন বা দাঁইহাটে তাদের বসতি সে বিষয়ে সঠিক তথ্য কিছু জানা যায় না। ভাস্কর উপাধিধারী ছ'টি পরিবার এখন এ-শহরে বাস করেন। কিন্তু বাকি পাঁচটি পরিবারের উপার্জনক্ষম পুরুষেরা পৈতৃক পেশা ত্যাগ করে বিভিন্ন শিক্ষিত জীবিকায় প্রবাসী।"

আমিও বছর দুই আগে দাঁইহাটের গোঁফখালি মহল্লার এক পরিচিতের বাড়ী গিয়েছিলাম। সেখানে কাঁসারীপাড়ায় খোঁজ করে এদের পূর্বপুরুষ নবীন ভাস্কর তাঁর দুইপুত্র আনন্দগোপাল ও যোগেন্দ্র ভাস্কর, যোগেন্দ্রের পুত্র বিশ্বনাথ ও বিশ্বনাথের পুত্র শৈলেন্দ্র-এর নাম সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। শৈলেন্দ্রের ছেলের খোঁজ করেছিলাম পাই নাই। নবীন ভাস্কর যোগাদ্যার নতুন মূর্তি ও দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর মূর্তি নির্মাণ করেন। দক্ষিনেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৫৫ সালের ৩১শে মে। তা যদি হয়, তাহলে সেই সময় নবীন ভাস্কর প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেছেন। কাজেই ঊনবিংশ শতকে প্রথম থেকেই দাঁইহাটে ভাস্করদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল ধরা যেতে পারে। অবশ্য এখন এই দুর্লভ শিল্প অবলুপ্তির পথে।

ড. বিনয় ঘোষও মন্তব্য করেছেন—কমবেশী একশ বছর আগে (১৮৫০-এর দশকে) দাঁইহাটের নবীন ভাস্কর দূর বিস্তৃত খ্যাতিব অধিকারী হয়েছিলেন। দাঁইহাটের প্রস্তরশিল্প অবলুপ্তির পথে যাক আর নাই যাক, দাঁইহাটের প্রস্তরশিল্প ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চির ভাস্বর থাকবে।

কাটোয়া-পরিক্রমা

"ইন্দ্রাণী নিকটে কাটোঙা নামে গ্রাম"।

(চৈতন্যভাগবত)

মধ্যযুগের ইন্দ্রাণী পরগনার প্রাচীন শহর কাটোয়া। কাটোয়া নামের উৎপত্তি সম্পর্কে সঠিক তথ্য বিশেষ পাওয়া যায় না। ভাগীরথীর প্রবাহ পথে দ্বীপ অন্ত একাধিক জনপদের নাম পাওয়া যায়। যেমন—নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ। সেইরূপ প্রাগৈতিহাসিক যুগে কণ্টকময় দ্বীপ বা কণ্টক দ্বীপের উদ্ভব হওয়া বিচিত্র নয়। সেরূপ ক্ষেত্রে কণ্টক দ্বীপ বা কাঁটাদ্বীপ থেকে কাটোয়া নামের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নয়। গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিস-এর বিবরণের উদ্ধৃতিসহ এরিয়নের বিবরণে Amystis এবং কাটাদুপাকে যথাক্রমে অজয় ও কাটোয়া বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে লক্ষ্যণীয় এরিয়নের বিবরণে ভাগীরথীর কোন উল্লেখ নাই যদিও ভাগীরথী ও অজয়ের সঙ্গমস্থলে কাটোয়ার অবস্থিতি প্রাচীন যুগ থেকেই স্বীকৃত। তবে কি ধরে নিতে হবে এরিয়নের সময় ভাগীরথীর প্রবাহপথ কাটাদুপা বা কাটোয়া থেকে কিছু দূরে ছিল? সেটা হওয়াও বিচিত্র নয়। যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গ-অভিধানে' কাটোয়ার প্রাচীন নাম কাঞ্চননগর বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কাঞ্চননগরের সমর্থনে কোন সঠিক তথ্য পাই নাই। ড. সুকুমার সেনের মতে কাটোয়ার উৎপত্তি কর্ত + বয়ন্ থেকে অর্থাৎ সুতাকাটা ও বস্ত্র বয়নের শহর কাটোয়া। আমার মনে হয় কণ্টক দ্বীপ > কাঁটাদ্বীপ > (এরিয়নের) কাটাদুপা থেকে কাটোয়া নাম এসেছে। সে যাই হোক, ২৩.৩৭" অক্ষাংশ এবং ৮৮.৭" দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত ভাগীরথী ও অজয়ের সঙ্গম স্থানে কাটোয়ার অবস্থান। মোট আয়তন ৮.৫৩ বর্গ কিমি। কাটোয়া মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে, অবশ্য কাটোয়া মহকুমারূপে ঘোষিত হয় ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৯১ সালে জনগণনা রিপোর্ট অনুসারে কাটোয়া পৌরসভার ওয়ার্ড ১৩টি কাটোয়া শহরের লোকসংখ্যা ৫৫৫৪১, তপসিলী জাতি ৮২৪৯, উপজাতি ৬৯, পাকা রাস্তা ১৩.৪০ কিমি, কাঁচা রাস্তা ৪৩ কিমি। বৈষ্ণবতীর্থ কাটোয়া—

শ্রীচৈতন্য কাটোয়াতেই মস্তকমুণ্ডন করে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাই তো শচীমাতার নিকট কাটোয়া কণ্টক নগর। ভাগীরথী ও অজয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত হওয়ায় মুর্শিদাবাদের নবাব ও পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দৃষ্টি বিশেষভাবে কাটোয়ার ওপর পড়ে। মুর্শিদকুলি খাঁ এখানে থানা ও দুর্গ নির্মাণ করেন। কাটোয়া হয় মুর্শিদাবাদের দ্বার। দিল্লীর সম্রাট ফারুকশিয়ারের সময় সৈয়দ শাহ্ আলম এখানে একটি প্রস্তরময় তোরণ ও ৪টি মিনার সহ ছয় গম্বুজের মসজিদ নির্মাণ করেন। মুর্শিদকুলি খাঁও এখানে মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদগুলি এখনও মুসলিম স্থাপত্যের নিদর্শন স্বরূপ কাটোয়ার অন্যতম দর্শনীয় বস্তু। তবে আলম খাঁর তোরণটি নীচুপটিতে বালির মধ্যে কিছুটা প্রোথিত হয়ে এখনও টিকে আছে।

১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে মারাঠা বর্গীরা বর্ধমান ও বীরভূমের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে লুটপাট চালিয়ে সমস্ত অঞ্চলকে প্রায় শ্মশানে পরিণত করে কাটোয়ায় দুর্গ দখল করে ও এখানেই ঘাঁটি গাড়ে। কাটোয়াতেই ভাস্কর পণ্ডিত জয়ের উল্লাসে মহা সমারোহে বর্ষা শেষে আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার আয়োজন করেন। অবশেষে নবাব আলিবর্দী খাঁ নবমীর দিন প্রাতঃকালে অজয়ের উত্তরপাড়ে শাঁখাই-এর দুর্গ থেকে মারাঠাদের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে মারাঠাদের দিকে বিতাড়িত করেন। পলাশীর যুদ্ধের প্রহসনের প্রথম অঙ্ক কাটোয়াতেই অভিনীত হয়। আচার্য যদুনাথ সরকার এর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন—On the 17th June 1757 the army (of Clive) reached Patuli. On the 19th a detachment sent by him under Major Eyre Coote took Katwa fort, which the enemy deserted at his approach. This place commanded the high road to Murshidabad and it also contained a very large quantity of grain. The rest of the English army arrived at Katwa late that night and halted for two days. ...On the 22nd the English army set out from Katwa, crossed in Ganges and after a long toilsome march in rain and heat reached Plassy about midnight.... বাংলার রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সাক্ষী হয়ে রইলো কাটোয়া।

নবাবী আমল শেষ হলো। শুরু হলো ইংরেজ আধিপত্যের সূচনা। শাঁকাই এলাকায় এডিস সাহেবের নীলকুঠি স্থাপিত হলো। সাহেব বাগানে কেরী দ্যা জুনিয়র ও আরও অনেক সাহেবকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। ১৯৩৭ সালের বন্যায় প্রায় সব ধুয়েমুছে যায়।

মোগল যুগে ও পরে বর্ধমানরাজের সময় যখন গোপভূমে সদ্‌গোপ রাজবংশের রমরমা ছিল তখন গোপভূমের সদ্‌গোপদের আধিপত্য শেরগড় থেকে কাটোয়ার দক্ষিণ অঞ্চল দিয়ে ভাগীরথীর পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রবাদ—আউসগ্রাম থানার অমরারগড়ের মাহিন্দি রাজা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কাটোয়াব নিকটবর্তী খাজুরডিহি গ্রামের উগ্রক্ষত্রিয় জমিদার জগৎ সিংহের গৃহ থেকে জোর পূর্বক দশভুজা সিংহবাহিনী শিবাখ্যা মূর্তি নিয়ে গিয়ে অমরার গড়ে প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিহাসের অঙ্গন থেকে সংস্কৃতির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলে দেখা যায় কাটোয়া ও শহরের চতুঃপার্শ্বস্থ অঞ্চলে অজস্র দর্শনীয় বস্তু ছড়িয়ে আছে।

প্রথমেই নাম করতে হয় শ্রীচৈতন্যের স্মৃতি বিজড়িত গৌরাঙ্গবাড়ী; এখানে আছে শ্রীনরহরি ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও জগন্নাথ দেবের দারুমূর্তি। গৌরাঙ্গবাড়ীর প্রবেশ তোরণটি ১৩১৬ সালে নির্মিত হয়েছে। এছাড়া ভোগমন্দিরও পরবর্তীকালে নির্মিত। এই গৌরাঙ্গবাড়ীর মধ্যেই আছে মহাপ্রভুর মস্তক মুণ্ডনের স্থান, কেশ-সমাধি, শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগুরু কেশব ভারতীর সিদ্ধিস্থান, মহাপ্রভুর মস্তকমুণ্ডনকারী নাপিত বিষ্ণুদাসের (মতান্তরে মধু) সমাধি, কেশব ভারতী ও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতীক পদচিহ্ন। বছর কুড়ি হলো গৌরাঙ্গবাড়ীতে জনসাধারণের অর্থে গগনচুম্বী দেউল মন্দির নির্মিত হয়েছে।

গৌরাঙ্গবাড়ীর পাশেই রয়েছে ষড়ভুজ গৌরাঙ্গবাড়ী, এখানে প্রতিষ্ঠিত আছে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গের একীভূত প্রতিচ্ছবি ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ; এর বামে রাধাগোবিন্দ ও ডাইনে নিত্যানন্দের দারুমূর্তি। প্রকাশ : গৌরাঙ্গের ষড়ভুজ মূর্তি পণ্ডিত সার্বভৌম কর্তৃক স্বপ্নে দৃষ্ট হয়েছিল। ষড়ভুজের ওপরের দুটি হাত শ্রীরামের দ্যোতক নবদূর্বাদলশ্যাম বর্ণের, হাতে আছে ধনুর্বাণ। মধ্যে দুটি বাহু নীলকান্তমণির বর্ণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতিচ্ছবি ও হাতে ধৃত মুরলী, নীচের দুটি হাত স্বর্ণবর্ণের—শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতীক, হাতে ধৃত কমণ্ডলু ও দণ্ড। ষড়ভুজ গৌরাঙ্গের মূর্তি নবদ্বীপেও দেখেছি। ষড়ভুজ গৌরাঙ্গের মধ্যে ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির যুগাবতারের ভাবনা বিধৃত।

ষড়ভুজ গৌরাঙ্গবাড়ীর ডান দিকে আছে তমালবাড়ী রাধামাধবের মূর্তি,—রাধামাধব ভ্রাম্যমান বিগ্রহ, তমালবাড়ীতে এঁর অধিষ্ঠান ৭ই আষাঢ় থেকে আশ্বিন পর্যন্ত। তারপর নিত্যানন্দ বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের বাড়ীতে বাড়ীতে বিভিন্ন সময়ে অধিষ্ঠান করে রাজকীয় ভোগ আস্বাদন করে বেড়ান।

এছাড়া আছে ব্রজকিশোর মন্দির, বলরাম, নিতাই ও রাধাভবন, রাধাকান্ত দেব, রাধামাধব দেবের মন্দির। ব্রজকিশোরের মূর্তি কষ্টিপাথরের প্রায় আড়াই

ফুট উচ্চ নয়নাভিরাম মূর্তি। কাটোয়া থেকে মাইলখানেক দূরে মাধাইতলা—এক বৈষ্ণবাশ্রম। শ্রীচৈতন্যের খোঁজে এসে জগাই-মাধাই খ্যাত মাধাই এখানে মাধ্বীবৃক্ষতলে সাধন-ভজনে রত হন ও এখানেই দেহরক্ষা করেন। এইখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। বৃন্দাবন থেকে অভয়চরণ দাস বাবাজী গৌরনিতাই বিগ্রহসহ ১০৮ শালগ্রাম শিলা এখানে প্রতিষ্ঠা করেন। দাঁইহাটের পথে পড়ে আকাইহাট। 'বারঘাট, তেরহাট তিন চণ্ডী তিনেশ্বর'—এই তের হাটের অন্যতম আকাইহাট; এখানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিন চণ্ডীর এক চণ্ডী—একাইচণ্ডী আর আছে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম কালাকৃষ্ণ দাসের পাট—এখানেই তাঁর সমাধি। কাটোয়ায় অন্যতম দর্শনীয় "তিনেশ্বরের"—এক ঈশ্বর নাম ঘোষেশ্বর ও সন্নিকটে ঘোষেশ্বরের ভৈরবী ঘোষেশ্বরী। ঘোষেশ্বর অতি প্রাচীন দেবতা—নাম দেখে মনে হয় গোপভূমের কোন রাজা কর্তৃক এই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মন্দিরের টেরাকোটা অলঙ্করণ দর্শনীয়। তিনেশ্বরের অপর ঈশ্বর ইন্দ্রেশ্বর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ যত্রতত্র ছড়ানো। ঘোষেশ্বরীর মূর্তি মূর্তিশিল্পের এক অপরূপ নিদর্শন। মহাদেবের ওপর আরূঢ় অষ্টধাতুর ৫ ফুট উচ্চ কালীমূর্তি। শহরের মধ্যে আছে প্রায় ৪০০ বছরের বেশী প্রাচীন বিশু ডাকাতের প্রতিষ্ঠিত শিলাময়ী গৌরীবর্ণা ভয়ংকরী চতুর্ভুজা কালীমূর্তি সিদ্ধেশ্বরী—দাঁইহাটের কাঁসারীপাড়ার ভাস্করের শিল্পকৃতি।

শহরের বারোয়ারীতলার সন্নিকটে কাশীগঞ্জ পাড়ায় প্রতিষ্ঠিত সখীর আখড়া—বৈষ্ণবাশ্রম। এখানে রাধাগোবিন্দ, রাধাশ্যাম, গৌরনিতাই-এর মূর্তি ছাড়াও শ্বেতপ্রস্তরের ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বুদ্ধমূর্তি —মূর্তিটি প্রায় একহাত উচ্চ, মূর্তির পাদপ্রান্তে দেবনাগরী অক্ষবে ক্ষোদিত বিষ্ণুদাস নাম লেখা—এই বিষ্ণুদাসকে কেউ কেউ মহাপ্রভুর মস্তকমুণ্ডনকারী ক্ষৌরকার বলে চিহ্নিত করেন। কারণ সখীর আখড়াকে অনেকে ক্ষৌরকারের ভিটেও বলে। আমর ধারণা বিষ্ণুদাস বুদ্ধমূর্তির ভাস্কর। তবে এটা আমার অনুমান মাত্র। আর আছে কৃষ্ণপ্রস্তরে ক্ষোদিত—চৈতন্যদেবের প্রতীক পদচিহ্ন—এরই বিপরীত দিকে বীণাবাদিনী সরস্বতী মূর্তি অনেকে এটিকে ইন্দ্রেশ্বর মন্দিরের ইন্দ্রাণী মূর্তি বলে সনাক্ত করেন। কাটোয়ার লৌকিক উৎসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্তিকপূজা, ঘোষেশ্বরের গাজন ও রাধাকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা।

চৈত্র মাসে ঘোষেশ্বরের গাজনের অঙ্গ হিসাবে অনুষ্ঠিত হয় বাণ-ফোঁড়া, আগুনের উপর বিচরণ ও ঘোষেশ্বরকে নিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে শহর পরিক্রমণ; সন্নিকটে পানুহাটের চড়কতলায় এর পবিসমাপ্তি। এই গাজনের

অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো কুড়মনের গাজনের মত বোলানগান—কুড়মনের মত নরমুণ্ড সংগ্রহ করে ভক্ত্যাদের শ্মশান বোলান বা পোড়ো বোলানগানসহ শহর পরিক্রমণ।

কাটোয়ার কার্তিকপূজা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। ভাগীরথী তীরবর্তী কাটোয়া ও চুঁচুড়ার গণিকাপল্লীতে একসময় কার্তিকপূজা ও কার্তিকের লড়াই এক আলাদা মাত্রা লাভ করেছিল। এখনও কার্তিকপূজা হয় ও সে কার্তিক নানারূপে নানা সাজে পূজা পান, যেমন ধেড়ে কার্তিক, নেংটা কার্তিক, লড়াইয়ে কার্তিক, থাকা কার্তিক। চার/পাঁচ ফুট চওড়া সিঁড়ির মত থাক সাজিয়ে আট/দশ ফুট উঁচু থাকা—নানা পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি গড়ে থাকে থাকে সাজিয়ে রাখা হয়—সর্বোচ্চ থাকে কার্তিক কোলে জগদ্ধাত্রী। লোকবিশ্বাস—কার্তিকপূজা করলে বন্ধ্যা বা মরুঞ্চে নারীর সম্বৎসরের মধ্যে কার্তিকের মত পুত্রলাভ হয়। তারই প্রতীক শিশু-কার্তিক কোলে জগদম্বার মূর্তি। বিসর্জনে পাড়ায় পাড়ায় কার্তিক ও থাকা নিয়ে এসে কার্তিকের লড়াই-এর মহড়া ও গঙ্গার উপর নৌকায় থাকা সাজিয়ে বিসর্জন। লৌকিক দেবীর মধ্যে শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা ও ঝাঁপান উল্লেখযোগ্য। সর্বোপরি কাটোয়ার খ্যাতি শ্রীচৈতন্যের স্মৃতিবিজড়িত বৈষ্ণবতীর্থ কণ্টকনগর রূপে।

শ্রীপাট দেনুড়

মন্তেশ্বর থানার ৬৬নং মৌজা দেনুড়। প্রাচীন পুঁথিপত্রে এর নাম পাওয়া যায় দেন্দুর। বর্ধমান বা কাটোয়া থেকে বাসে মন্তেশ্বর বাসস্টপে নেমে ৬।৭ কিমি কাঁচারাস্তা ধরে দেনুড় যেতে হয়। আয়তন ৫৩৭.২০ হেক্টর, লোকসংখ্যা ২৫১৪, এর মধ্যে তপসিলী ১৩১১, সাঁওতাল উপজাতি ৩৪, সাক্ষরের সংখ্যা পুরুষ ৭৪৫, স্ত্রী ৪৯০। গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ডাকঘর আছে। হাটবাজার পাঁচ কিমি. দূরে মন্তেশ্বরে, রাস্তা কাঁচা, নিকটবর্তী শহর কাটোয়া—২৮ কিমি। আধুনিকতার বিচারে গ্রামটি খুবই অনুন্নত। তবে গ্রামের খ্যাতি অন্য কারণে। বৈষ্ণবদের পরম তীর্থস্থান, শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচয়িতা বৈষ্ণবকবি বৃন্দাবন দাসের শ্রীপাট দেনুড়। বৃন্দাবন দাসের ব্যক্তি পরিচয় সম্পর্কে বিশেষ জানা যায় না। দেনুড় গ্রামে কবি বসবাস করতেন। মাতা ছিলেন শ্রীনিবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী বালবিধবা নারায়ণী। প্রবাদ—বৃন্দাবন দাসের জন্মকে সামাজিক করবার জন্য চৈতন্যদেব তাঁর চর্বিত তাম্বুল প্রসাদরূপে নারায়ণীকে দান করেন। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতের প্রথমে নাম ছিল

চৈতন্যমঙ্গল। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা পরে এই গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করে চৈতন্যভাগবত রাখেন।

মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥

(কৃষ্ণদাস কবিরাজ)

শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগুরু কেশব ভারতীর ভজনস্থান এই শ্রীপাট দেনুড়। বর্ধমান সম্মিলনী হীরকজয়ন্তী স্মরণিকা ১৯৭৪এর কমলেন্দু দীক্ষিতের 'শ্রীপাট দেনুড়' প্রবন্ধে কেশব ভারতীর জন্মস্থান দেনুড় ও তাঁর সন্ন্যাসপূর্ব নাম রায়ভদ্র ব্রহ্মচারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী মহাশয়ও কেশব ভারতীর জন্মস্থান দেনুড় বলেছেন। আমি শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কারের জীবনীকোষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত ভারতকোষ, সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, বঙ্গ-অভিধান, সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান পর্যালোচনা করে দেখেছি—কেশব ভারতীর জন্মস্থান মন্তেশ্বর থানার কুলিয়া গ্রাম ও পূর্বনাম কালীনাথ আচার্য। তিনি মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ছিলেন। দেনুড় ছিল তাঁর ভজনস্থান—বর্ধমান গেজেট ১৯৯৪-তেও দেনুড়কে 'Seat of Keshab Bharati' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রামে আছে প্রাচীন গ্রাম্যদেবতা দেন্দুরেশ্বর বা দীনেশ্বর শিব, দেন্দুরেশ্বর শিব মন্দিরের মধ্যে 'বিক্রম চণ্ডী' নামে চণ্ডীর শিলামূর্তি আছে। আবার বৃন্দাবন দাসের মন্দিরে আছে মহিষমর্দিনীর শিলামূর্তি ও গৌরনিতাইয়ের মূর্তি। এই গৌর-নিতাইয়ের শিষ্য রামহরি দাস নিতাই-গৌরের সেবা প্রতিষ্ঠা করেন।

মনে হয় বৈষ্ণব ভাবধারা প্রবর্তনের পূর্বে দেনুড় ছিল শাক্তধর্মের পীঠস্থান। কিন্তু বৃন্দাবন দাসের মন্দিরে মহিষমর্দিনী মূর্তির সঙ্গে গৌর-নিতাইয়ের মূর্তির অবস্থান শাক্ত ও বৈষ্ণব ভাবধারার সমন্বয় ও স্বীকরণের ইঙ্গিতবাহী।

দেনুড়েশ্বরের টেরাকোটা অলংকৃত শিবমন্দির পুরাকীর্তির নিদর্শন। দেনুড় গ্রামে কবিয়াল বেণীমাধব দীক্ষিত ও অভিনেতা অক্ষয়কালী কোঙারের বাসস্থান। গদাধর পণ্ডিতের স্বহস্ত-লিখিত ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্বহস্ত-লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত পুঁথি পাটবাড়ীতে রক্ষিত আছে বলে প্রবাদ। বৈষ্ণবধর্মের পীঠস্থান শাক্ত ও বৈষ্ণবদের সহাবস্থানের এক উজ্জ্বল নিদর্শন দেনুড়—একবিংশ শতাব্দীর সূচনাতে আজও অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে।

বড় কাশিয়াড়া

কাশিয়াড়া : বর্ধমান থানার ৫নং মৌজা কাশিয়াড়া। বর্ধমান থানার রায়পুরের পাশে এক কাশিয়াড়া গ্রাম আছে আবার মঙ্গলকোট থানার ৩৩নং গ্রাম

কাশিয়াড়া। কাজেই তিন কাশিয়াড়া থেকে পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য বর্ধমান থানার ৫নং কাশিয়াড়ার পূর্বে 'বড়' অভিধা যোগ হয়েছে—সরকারী নথিপত্রে কাশিয়াড়া নাম বহাল থাকলেও ডাকঘর 'বড়কাশিয়াড়া', সাধারণ্যে পরিচিত নাম হলদি-কাশিয়াড়া। গ্রামটি ছোট্ট, আয়তন ২৯২.৭৮ হেক্টর, লোকসংখ্যা ১৫৩১, তপসিলী ৭৭৪, সাঁওতাল উপজাতি ২২৭, সাক্ষরের সংখ্যা—পুরুষ ৩৪২, স্ত্রী ২২০। গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় একটি, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ২টি ও ডাকঘর আছে। নিকটবর্তী শহর—বর্ধমান, ১৮ কিমি। বর্ধমান থেকে গুসকরা বাসে হলদিতে নেমে ২ কিমি মত পূর্বদিকে হাঁটা পথ। গ্রামের রাস্তা কাঁচা তবে বিদ্যুৎ গেছে। গ্রামের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্‌গোপ, বাগ্‌দি, ডোম, সাঁওতালের বাস—তবে কায়স্থদের প্রাধান্যই বেশী। গ্রামস্থ দেবদেবীর মধ্যে শুভিখ্যে, ধর্মরাজ, মনসাই প্রধান—তবে গ্রামের শুভিখ্যে মাতার পূজা, দুর্গাপূজা ও ধর্মরাজের ভাঁড়াল বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। গ্রামের মহাবীর চাটুজ্যের বাড়ীতে আছেন শুভিখ্যে দেবী—শিলাময়ী দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি। উচ্চতা এক ফুটের মত। নিত্যপূজা ও শীতল হয়—শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় মহাসমারোহে দুর্গার ধ্যানেই পূজা হয় অষ্টমী ও নবমীতে পাঁঠাবলিও হয়। শারদীয়া পূজার সময় ড. বিধান রায়েরও পূর্বেকার প্রখ্যাত এল.এম.এস. চিকিৎসক ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে ও কায়স্থ পাড়ায় ডাক্তার হেমচন্দ্র ঘোষ ও ডাক্তার বটু ঘোষ এবং অন্যান্য ঘোষ পরিবারের পটে আঁকা দুর্গাপূজা হয়, অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায় গয়রহা এই পূজা এনেছিলেন—৪।৫ ফুট কাঠের চালিতে পরিবার সমন্বিতা মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গামূর্তি এঁকে পূজা হতো—আঁকতেন বর্ধমানের প্রখ্যাত শিল্পী হরিহর দে'র পিতা—তিনি তাঁর স্বগ্রাম চান্না থেকে নিয়মিত এসে অঙ্কনকার্য সম্পন্ন করে যেতেন। অপূর্ব সে মূর্তি আমিও ২।১ বৎসর দেখেছি। বর্তমানে পূজাটি বন্ধ হয়ে গেছে। কায়স্থদের দেবীর মূর্তি আঁকেন পারহাটের পটুয়া মিস্ত্রী। চালি শোলার সাজে সাজান হয়। মুখুজ্যে বাড়ীর পূজায় বলিদান হতো না কুলদেবতা রঘুনাথের জন্য। তবে কায়স্থদের পূজায় যথারীতি বলিদানের ব্যবস্থা আছে। কায়স্থদের পূজার অন্যতম বৈশিষ্ট্য যৌথভোজন। পূজার কয়দিন কায়স্থদের যে পাঁচ-ছয় ঘর শরিক আছেন সকলে আত্মীয়-কুটুম্বসহ যৌথ ভোজনের ব্যবস্থা করেন। পূজার কয়দিন সকলেই যেন একান্নবর্তী পরিবারের শরিক।

বড় সুন্দর ব্যবস্থা—শুভ উৎসবের প্রাণ বুঝি পাঁচজনের এই মিলনযজ্ঞ। পাঁচজনের সঙ্গে এই আনন্দের শরিক হওয়া—"এই কল্যাণী ইচ্ছাই উৎসবের

প্রাণ।" গ্রামে শুভিখ্যে দেবীর জন্যই নাকি দুর্গার মৃন্ময়ীমূর্তি পূজার রেওয়াজ নেই। লক্ষ্মীপূজা ও সরস্বতীপূজাতেও শোলার মূর্তি গড়ে পূজা হয়। ডোম পাড়ায় আছে—ধর্মরাজ ও পাশেই মনসা উভয়েই শিলামূর্তি। ডোমেদের দেবতা এই ধর্মপূজার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'শিব ভাঁড়াল'—যিনি ভক্ত্যা হবেন তিনি শারদীয় অষ্টমী থেকে উপবাসী থেকে ভাঁড়াল জাগিয়ে রাখবেন ও নবমীর দিন দুপুরে মূল ভক্ত্যা মাথায় ভাঁড়াল চাপিয়ে উদ্দাম নৃত্যসহকারে গ্রাম প্রদক্ষিণ করবেন—আশ্চর্য্যের কথা ভাঁড়াল উথলাবে না বা ভাঁড়ালের কলসী মস্তকচ্যুত হবে না। ভক্ত্যার ভরও হয়। গ্রামের আপামর সাধারণ ধর্মরাজের পূজা দেন। আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজায় ধর্মরাজের গাজন ও এই ভাঁড়ালনাচ জেলার লোকসংস্কৃতির এক বিরল দৃষ্টান্ত।

মহাবীরের স্মৃতি-বিজড়িত জৌগ্রাম

জামালপুর থানার ১১৪নং মৌজা জৌগ্রাম—আয়তন ৮৮৯.০১ হেক্টর, লোকসংখ্যা ৮১৬১, এদের মধ্যে তপসিলী ৩৫৩৮ ও উপজাতি সাঁওতাল ১৫৪১। অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষিত (literate) এর সংখ্যা ৩৫৬৬। বর্ধমান-হাওড়া কর্ডলাইনে হাওড়া থেকে ৬৫ কিমি ও বর্ধমান থেকে ৩০ কিমি দূরে এই স্টেশন—গ্রাম কাছেই। ড. পঞ্চানন মণ্ডলের মতে গ্রামটি অতি প্রাচীন—মহাবীরের পাদপূত আচারঙ্গ সূত্রে উল্লিখিত জম্ভিয় বা জম্ভভীয় গ্রামই বর্তমানের জৌগ্রাম। এই গ্রামের ঋজুপালিকা নদীর তীরে মহাবীর আর্হৎ বা কেবল দর্শন লাভ করেছিলেন। "চারিকার ত্রয়োদশ বৎসরে চম্পাই নগরী থেকে শ্রমন্ ভগবান্ মহাবীর গমন করিলেন জৃম্ভিক বা জৃভক অর্থাৎ জম্ভিয়া বা জউভয় গ্রামে।" খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতকে রচিত ভদ্রবাহুর কল্পসূত্রে মহাবীরজীবনী বর্ণনায় জম্ভীয়গ্রাম, অস্থিক গ্রাম, পাণিত ভূমির উল্লেখ আছে। ড. মণ্ডল জৃভক গ্রামের অর্থাৎ বর্তমানের জৌগ্রামের এক মাইল দক্ষিণে বর্তমানে আস্থাই গ্রামের অবস্থানের কথা বলেছেন।

এই ঋজুপালিকা নদী নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। কেউ বলেছেন এটি বর্তমানে কংস বা জলকুলা নদী। কারও মতে এই নদী বিহারের কিউল নদী। ড. মণ্ডল বলেছেন দামোদরের প্রাচীন প্রবাহপথ হিরণ্যগ্রাম থেকে এই উজুবালিয়া নদী নির্গত। আবার এই ড. মণ্ডলই অন্য একটি প্রবন্ধে (শ্রী বর্ধমানে অষ্টোত্তর শত শিব মন্দিরের প্রেক্ষাপটে) বলেছেন—উজুবালিয়া নদী হলো একালের বল্লুকা, চম্পা নদী অথবা কংস বা জলকুলা নদী—একদা এ নদীটি ছিল অজয় নদের শাখা। এই নদীর তীরে যক্ষ মন্দির বৈর্য্যাবত চৈত্য হচ্ছে সাতগেছে বড়োয়াঁ

গ্রামের মধ্যে বর্তমান ধর্ম মন্দিরের পুরাতন স্তূপাবলী। তাছাড়া এই জৃম্ভিক গ্রামের অবস্থান নিয়ে পণ্ডিতগণ একমত নন। জগদীশ জৈনের মতে জৃম্ভিক আধুনিক পাবার নিকট অবস্থিত। অবশ্য পাবায় যে মহাবীর মহাপ্রয়াণ লাভ করেছিলেন সে বিষয়ে অধিকাংশ পণ্ডিতই প্রায় একমত। আবার কারও মতে জৃম্ভিকের অবস্থান বিহারের পরেশনাথ পাহাড়ের নিকট। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন জৃম্ভিক প্রাচ্যের কোন এক অখ্যাত গ্রাম। কাজেই আচারঙ্গ সূত্রের জৃম্ভিকই যে জৌগ্রাম সেটা সঠিক ভাবে প্রমাণিত হয় না। অবশ্য জৌগ্রামের খ্যাতি জলেশ্বরনাথ ও নেংটা গোঁসাইয়ের জন্য। প্রবাদ—বহুদিন আগে—(কারও কারও মতে ২০০ বছর, কেউ বা বলেন ৫০০ বছর।) জলেশ্বর নাথের মূল মন্দিরের পিছনে যে একটি অর্ধপ্রোথিত মন্দির আছে, তার মেঝেতে পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে সাধনা করে নেংটা গোঁসাই সিদ্ধ হন। সে যাই হোক—নেংটা বললেই দিগম্বর জৈন মহাবীরের ছবি ফুটে ওঠে—জানি না গোস্বামী প্রভু জৈন-ভাবিত ছিলেন কিনা। তাছাড়া জলেশ্বরনাথের 'নাথ' এই অন্তপদটি পার্শ্বনাথের 'নাথ' সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক সূচিত করে। ধর্মমঙ্গলের অনেক পুঁথিতে মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িকা প্রভৃতি নাথগুরুর উল্লেখ পাওয়া যায়। পণ্ডিতপ্রবর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে গোরক্ষনাথ তাঁর গুরুকে যে ৩১টি প্রশ্ন করেছিলেন, যেমন "অজপা কাহারে বলে জপে কোন জন"—এইরূপ কিছু প্রশ্নের উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন—"নাথ ধর্মে যে বৌদ্ধধর্মের অনেক ছায়াপাত হইয়াছিল তাহা এই সকল গাথায় স্পষ্টই পরিদৃষ্ট হয়।"

ড. পঞ্চানন মণ্ডলও তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন—প্রবাদ বহুকাল পূর্বে এখানে বিজন বন ছিল আর ছিল মহাশ্মশান। বনে ছিল বর্তমান জলেশ্বরনাথের লিঙ্গ-মূর্তি ভূপ্রোথিত। কামধেনু নিয়মিত এসে দুধ ঢালত শিবের মাথায়। ঋক্ষ বা লিচ্ছবি গোত্রীয় গোপকুলের দেব প্রতিষ্ঠার এ হলো একটি সাধারণ সূত্র। স্থানীয় লোকদের ধারণা এখানে কংস বা বালিয়া নদীর তীরে 'বৌদ্ধ' মঠ ছিল।

এই সমস্ত তথ্য থেকে মহাবীর যে এখানে কংস নদীর তীরে আর্হৎ লাভ করেছিলেন সে সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, তবে জৌগ্রাম যে সুপ্রাচীনকালে জৈন ও বৌদ্ধপন্থী ছিল সেটা প্রমাণিত হয়।

জৌগ্রামের ১ মাইল দক্ষিণে রেললাইনের অপর পারে প্রাচীন অস্থিক গ্রাম যার বর্তমান নাম আস্থাই (Astai—J. L. 106) অবস্থিত। প্রাচীন যৌধেয় বা শবরদের মৃতদেহ কবর দেবার প্রথা থেকে অস্থিস্তূপ সৃষ্টির ফলে 'অস্থিক' গ্রামনাম কিন্তু খাদ্য সংগ্রাহকদের অস্থায়ী বাসস্থান হিসেবে নাম আস্থাই, সেটা

তথ্য প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। প্রাগৈতিহাসিক যুগে শবর, ডোম, বাগ্‌দি প্রভৃতি অস্ট্রিক জাতিগোষ্ঠী তো জেলার একরূপ সবস্থানেই অস্থায়ীভাবে বাস করেছিলেন। কিন্তু আর কোন স্থানের নাম আস্থাই পাই নাই। অবশ্য ড. মণ্ডল উল্লেখ করেছেন—"বর্ধমানে হাড়ের স্তূপের উপর যক্ষ মন্দির তৈরী করা হয়েছিল। যক্ষের নাম ছিল শূলপাণি, আর বর্ধমানের নাম হয়েছিল অস্থিক গ্রাম"। কিন্তু এ তথ্যেরও কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই নাই।

যাই হোক, জৌগ্রাম একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম;—গ্রামে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিষ্ঠিত একটি উচ্চ বিদ্যালয়, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিশুকল্যাণ কেন্দ্র, মাতৃসদন, রেজিস্টার্ড ডাক্তার সবই আছে, অর্থাৎ এককথায় গ্রামের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-পরিষেবা ভালই। গ্রামে শুক্রবার ও সোমবার সপ্তাহে দু-দিন হাট বসে।

গ্রামে গ্রাম্যদেবতা জলেশ্বরনাথ, গ্রামদেবী শুভচণ্ডী, রক্ষাকালী, মুক্তকেশীতলায় পঞ্চমুণ্ডী আসনের ওপর মৃন্ময়ী মুক্তকেশী কালিকা ও গ্রামের মধ্যে ১৪।১৫টি টেরাকোটা অলঙ্করণযুক্ত শিবমন্দিরে শিবপূজার ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া বসু পরিবারে রাধাকৃষ্ণ মন্দির, দক্ষিণপাড়ায় রঘুনাথ মন্দির, চাষাপাড়ায় বদর সাহেবের মাজার, জেলেপাড়ায় মসজিদ, গ্রামে হিন্দু-মুসলিম সহাবস্থানের সাক্ষ্যবহন করছে। শুভচণ্ডী ও রক্ষাকালীর পূজা বৈশাখ মাসের শনি বা মঙ্গলবার হয়।

এই গ্রামের ঠিক পূর্ব পাশে শ্রীচৈতন্যের পাদপূত কুলীনগ্রাম, কিছু দূরে আছে সাতদেউলিয়ায় জৈনমন্দির। বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব সর্বধর্মের কেন্দ্রীভূত গ্রাম—জৌগ্রাম।

বনপাশ কামারপাড়া

শারদীয় বর্ধমান ১৩৮৪ পত্রিকায় প্রকাশিত—বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "বুদ্ধেশ্বর শিব ও সুয়াতা এলাকা" প্রবন্ধে দেখা যায় "সেকালের পার্থালিস গ্রাম বর্তমান পার-তালিত খড়ি নদীর উত্তরপূর্ব কোণে বনপাশ গ্রাম অবস্থিত। গ্রামটি যে খুবই সুপ্রাচীন সে সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ।" এতথ্য ঐতিহাসিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। হলে অবশ্য আমারও গর্বের কারণ হতো, কারণ বনপাশ আমার জন্মভূমি। কিন্তু The Classical Accounts of India গ্রন্থে এল্ডার প্লিনির বিবরণে পাওয়া যায়—The royal city of the Calingac is called Parthalis. ... There is a very large island in the

Ganges which is inhabited by a single tribe called Modogalingac".

হায় কোথায় Royal city of calingac আর কোথায় আমার ভাতার থানার অখ্যাত গ্রাম বনপাশ! সে যাই হোক বর্তমানে...

ভাতার থানার এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম বনপাশ কামারপাড়া (মৌজা বনপাশ জে. এল. ২১)। কিন্তু আজ বনপাশ কামারপাড়া বলতে কেবলমাত্র বনপাশ মৌজাই বোঝায় না—বনপাশ কামারপাড়া বলতে এখন দক্ষিণে হরিবাটী (জে. এল. ২২) পূর্বে মৌজা চাঁদাই (জে.এল. ২৩)ও এর অন্তর্ভুক্ত। সব মিলিয়ে আয়তন ১১৫৪.৫৪ হেক্টর, লোকসংখ্যা ৭৭১৩। এদের মধ্যে তপসিলী ২৩০৮ ও উপজাতি ১০০২, বর্তমানে সাক্ষরের সংখ্যা—পুরুষ ২২৪৪, স্ত্রী ১৬৩৫। এখন গ্রামে ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র, সাব পোস্ট-অফিস, দৈনিক বাজার, বিদ্যুৎ সরবরাহ, টেলিফোন এমন কি প্রধান সড়কে স্থানে স্থানে ট্যাপ ওয়াটারও আছে। আঠারপাড়া কেন বিশপাড়ার গ্রাম—বনপাশ কামারপাড়া। কিন্তু ৬০।৭০ বছর আগেও গ্রাম ছিল সর্ববিষয়ে অনুন্নত—গ্রামের সব রাস্তাই ছিল কাঁচা—বর্ষায় প্রায় অপার। নিকটবর্তী শহর গুসকরা সড়ক পথে যেতে হলে কামারপাড়া-বনপাশ ফিডার রোডে ৩ মাইল গিয়ে বড়াগ্রামের চৌমাথা থেকে উত্তরে সিউড়ি রোড দিয়ে মাইল ৯/১০ কাঁচারাস্তায় হাঁটাপথ কিংবা গরুর গাড়ী ছিল ভরসা। আর সিউড়ি রোড দিয়ে দক্ষিণে ১৮ মাইল হাঁটাপথ কিংবা গো-গাড়ী করে যেতে হতো বর্ধমান। লুপ লাইনে রেলপথ স্থাপিত হয় ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে স্টেশন বনপাশ—মূলগ্রাম থেকে ৫ মাইল হাঁটা পথ, অপার্যমানে গো-গাড়ী, রাস্তা কাঁচা, বর্ষায় প্রায় অপার। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে আদমসুমারীতে দেখা যায়—সাহেবগঞ্জ থানা (বর্তমানে ভাতার) বর্ধমান মহকুমার অন্তর্ভুক্ত ছিল আর আউসগ্রাম থানা যার মধ্যে বনপাশ স্টেশন পড়ে সেটি বুদ্‌বুদ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে এক থানায় স্টেশন ও অন্য থানায় একই নামে গ্রাম হওয়ার কারণ কি? বর্তমানে যেখানে বনপাশ স্টেশনের অবস্থান তার নাম হওয়া উচিত ছিল বেলাড়ি বা বিল্বগ্রাম। আমি এ-বিষয়ে গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদের কাছ থেকে যে তথ্য শুনেছি ও বিভিন্ন রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে যে তথ্য সংগ্রহ করেছি তার থেকে ধারণা হয়েছে যে বনপাশ স্টেশন ও বনপাশ গ্রামের মধ্যবর্তী অঞ্চলের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য গ্রাম ছিল না—বেশীর ভাগ অংশই জঙ্গলে পূর্ণ ছিল, বনপাশ নামের মধ্যে এর সমর্থন মেলে। যে সময় রেলপথ স্থাপিত হয় তখন

কামারপাড়া অঞ্চল লৌহশিল্পে খুবই উন্নত ছিল। মনে হয় এখানকার দক্ষ শিল্পীর দক্ষতা লাইন পাতার কাজে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। তাছাড়া খানা থেকে বোলপুর পর্যন্ত লাইনকে সংক্ষিপ্ত ও সরলতর করবার জন্য বর্তমান বেলাড়ি গ্রামের পশ্চিম দিয়ে লাইন পাতার প্রয়োজন হয়েছিল। এতবড় গ্রামের মধ্যে ছিল মাত্র দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, অথচ পার্শ্ববর্তী গ্রাম মোহনপুরে ছিল একটি মধ্য ইংরাজী (Middle English upto Class VI) বিদ্যালয়।

১২০০ ঘর লোকের মধ্যে একজন মাত্র গ্র্যাজুয়েট ছিল। পানীয় জলের ভরসা ছিল পুষ্করিণী—দুটি মাত্র জেলা বোর্ডের ইন্দারা ছিল। একটি হরিবাটীতে আর একটি মিস্ত্রীপাড়ায়—তাও প্রায় সময়ে অকেজো থাকতো। বিদ্যুৎ, পাকা রাস্তা, বাসসার্ভিস ছিল তখন স্বপ্ন। তবে গ্রাম ছিল শিল্পীর গ্রাম। আগেই উল্লেখ করেছি পূর্বে গ্রাম ছিল লৌহশিল্পে উন্নত। এ-সম্পর্কে গ্রামের মধ্যে একটি প্রচলিত কাহিনী আছে। সময়টা ছিল নবাবী আমল। একজন কর্মকার ইস্পাতের এমন এক লম্বা তরবারি তৈরি করেন যে সেটিকে ভাঁজ করে মুষ্টির মধ্যে ধরার মত এক খাপে রাখা যায়। তিনি সেটিকে নিয়ে নবাবকে উপহার দিতে যান। বহু কষ্টে নবাবের দরবারে উপস্থিত হলে নবাব তাচ্ছিল্য ভরে তাঁর উপহার প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি তখন মনের দুঃখে দরবার থেকে বেরিয়ে এসে পথের ধারে এক বিরাট ঝাউগাছের গোড়া এক কোপে কেটে দিয়ে সেই তরবারিকে খাপের মধ্যে পুরে নিকটস্থ এক কূপের মধ্যে ফেলে দেন। কিছুদিন পরে নবাব নগর পর্যটনে বের হয়ে পথিপার্শ্বস্থ শুকিয়ে যাওয়া ঝাউবৃক্ষ দেখে সেটির হঠাৎ শুকিয়ে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করেন। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে জানতে পারেন এক কর্মকার তরবারির এক কোপে ঝাউগাছের গোড়া দ্বিখণ্ডিত করে তরবারি কুয়ার মধ্যে ফেলে দিয়ে চলে গেছে। তার কথাব সত্যতা প্রমাণ করার জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ লোক লাগিয়ে কুয়া থেকে তরবারি তুলিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন তাতে সামান্যতম মরিচাও পড়ে নাই। তৎক্ষণাৎ সেই কর্মকারের তল্লাশে চারদিকে লোক পাঠালেন ও তাঁকে এনে তাঁর কাছ থেকে সমস্ত বিবরণ শুনে তাঁকে পুরস্কৃত করলেন। ঘোড়ায় চড়ে তিনি যে পরিমাণ জমি পরিক্রমণ করতে পারবেন—সেই মত জমি তাঁর ইচ্ছামত স্থানে তিনি নিতে পারবেন। কর্মকার এক দৌড়ে ১৪৮৪ বিঘা জমি ঘুরেছিলেন—সেই অনুসারে তিনি চাঁদাই মৌজার (J. L. 23) ১৪৮৪ বিঘার জমির আয়মাদার নিযুক্ত হন। হয়ত এই কাহিনীর মধ্যে কিছুটা অতিরঞ্জন আছে—কাহিনীর মধ্যে কিছুটা কিংবদন্তীও প্রচ্ছন্ন থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু ইতিহাস রচনায় কিংবদন্তীরও মূল্য বিধৃত থাকে। এ-সম্পর্কে ঐতিহাসিক

হীরেন্দ্রনাথ দত্তের উক্তি উল্লেখযোগ্য "অনেকে বলেন আমি কিংবদন্তীকে ইতিহাসের মর্যাদা দিচ্ছি। লোকে যাকে বলে কিংবদন্তী আমি তাকে বলি লোকমত। লোকমতের মধ্যে ইতিহাসের উপকরণ যথেষ্ট পরিমাণে লুক্কায়িত থাকে। তাকে অগ্রাহ্য করলে চলে না।" (সাপ্তাহিক দেশ ৬.১.১৯৭৩) আমিও ছোটবেলায় দেখেছি মিস্ত্রীপাড়ার ননী মিস্ত্রীকে বলিদানের পাঁঠা কাটার 'বগি' তৈরী করতে, গাদা বন্দুক নির্মাণ ও মেরামত করতে। গ্রামে নাকি ছোটখাটো কামানও তৈরী হতো।

গ্রামের মধ্যে অধিকাংশ বাড়ী ছিল মাটির, সাধারণ মধ্যবিত্তদের বাড়ীর ছাদ ছিল করগেটের। সেজন্য গ্রামে প্রবাদ প্রচলিত ছিল "জল পড়লে ঢাকের সাড়া/ তবে জানবে কামারপাড়া।" অবশ্য কামারপাড়ার জমিদার বংশ রায়েদের ও হরিবাটীর যদু মুখুজ্যেদের বাড়ী ছিল পাকা দ্বিতল। রায়েদের 'ঘোলা' পুষ্করিণীর লাগাও বাগানবাড়ীও ছিল একতলা দালান। আরও ২।৪টি পুরানো পাকা বাড়ীর চিহ্ন বর্তমান। তবে গ্রামের বেশীর ভাগ বাড়ী মাটির খড়ের ছাউনি—কোন কোন বাড়ীর চালের কাঠামো, খুঁটি, সর্দল কাঠের নানা অলঙ্করণ যুক্ত; চালের ছাউনিও গ্রামীণ লোকশিল্পের অপরূপ নিদর্শন। গ্রামের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না—তবে সম্প্রতি হরিবাটী পল্লীর কায়স্থপাড়ায় প্রয়াত পূর্ণচন্দ্র মজুমদার, ভুজঙ্গভূষণ মজুমদারদের কুলদেবতা রাধাবল্লভের বর্তমান মাটির মন্দিরের ঠিক পশ্চিমাংশে হঠাৎ খননকার্যের ফলে ১৪ ইঞ্চি লম্বা—৮ ইঞ্চি চওড়া বেলেপাথরের নৃত্যরতা নারীমূর্তি বেরিয়ে পড়ে। সেই মূর্তির সঙ্গে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় প্রসাধনরত গোটা চার নারীমূর্তি তাছাড়া একই চালিতে আছে ক্ষোদাই করা হাঁস, ঘোড়া ও ফুল। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কিউরেটর সংবাদ পেয়ে এখানে সামান্য খনন করতেই দুটি প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা পান—একটিকে রামসীতার মূর্তি ও অন্যটিকে রামতরণ বলে চিহ্নিত করেন। এই নারীমূর্তি ও রামতঙ্কা—পালযুগের বলেই আমার অনুমান হয়। তবে এই ঢিবির ব্যাপক খননকার্য চালালে হয়তো অনেক প্রাচীন প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে। আমার বাবার কাছে শুনেছিলাম যেখানে মার্বেল পাথরের নারীমূর্তি পাওয়া গেছে—সেখানেই কায়স্থদের রাধাবল্লভের অলঙ্করণযুক্ত প্রাচীন মন্দির ছিল। ৬।৭।২০০০ তারিখে আজকাল পত্রিকাতেও এ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া সরানধারে চক্রবর্তীপাড়ার বুড়োশিবের প্রাচীন মন্দিরের স্থাপত্যরীতি দেখলে এটিকে পঞ্চদশ/ষোড়শ শতকের মন্দির বলে অনুমিত হয়। মিস্ত্রীপাড়ার দেউলেশ্বরের আটকোণা শিবমিন্দরের সামনে যে প্লেট লাগানো আছে তাতে দেখা যায় মন্দিরটি

নির্মিত হয়েছিল ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে। হরিবাটীর চাটুজ্যে পরিবারের বকুলতলার একত্রিত তিনটি ব্যানার্জী পরিবারের একটি ও কৈবর্তপাড়ার 'যণ্ড মিস্ত্রীপুকুর' পাড়ের একটি শিখর দেউল শিবমন্দির ঊনবিংশ শতকের প্রথম দশকের তৈরী বলেই মনে হয়। চতুর্ভুজতলায় চতুর্ভুজ সিংহবাহিনী দেবীর জোড়াবাংলা মন্দির কাঞ্চননগর ও কালনার সিদ্ধেশ্বরীর জোড়াবাংলার মন্দিরে মত ষোড়শ শতকের তৈরী বলেই ধারণা। এই সমস্ত নিদর্শন থেকে মনে হয় গ্রামের শিল্প-সংস্কৃতির ধারা পঞ্চদশ/ষোড়শ শতাব্দী থেকে উন্নত পর্যায়ে উন্নীত হয়।

পূর্বে গ্রামে পিতল কাঁসার বাসন তৈরী হতো. ৫০।৬০ বছর পূর্বে গ্রামের সাহাপাড়ায় পিতল-কাঁসার বাসন তৈরীর কারখানা দেখেছি। Petersonএর Gazetteer-এ এর উল্লেখ আছে। A Village in the head quarters subdivision with a population according to census of 1901 of 1425 persons. The village is noted for its manufacture of brass and bell metal ware and gives its name to a railway station on the loop line of the East Indian Railway, though situated at some distance from the line. Petersonএর বিবরণের মধ্যে বনপাশ গ্রাম থেকে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত বনপাশ স্টেশনের অবস্থিতির পক্ষে আমি যে যুক্তি দেখিয়েছি তার সমর্থন মেলে।

গ্রামে প্রয়াত তিনকড়ি রায়, দেবু রায়দের বাড়ীতে রথের মেলায় যে পঞ্চরত্ন ৬।৭ ফুট উঁচু পিতলের রথ বের করা হয় সেটি গ্রামের কারিগরদেরই তৈরী। যদিও বনকাটির রথের মত এতে কারুকার্য নাই তবু এই রথের চূড়ার অলঙ্করণে শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্যের দক্ষতা সত্যই প্রশংসনীয়। পরবর্তীকালে গ্রামের স্বর্ণশিল্পীরা পিতলের নাকছাবি, মাকড়ি, নথ, গলার চেন, হাতেব চুড়ি, বালা তৈরী করে সোনার জল ধরিয়ে গিল্টি করে জেলার বাইরে এমনকি বর্তমান বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার মেলায় বিক্রি করতে যেতেন। যোগনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গ অভিধানে' বনপাশের বিবরণে লিখেছেন—বর্ধমান জেলার ভাতার থানার একটি গ্রাম যাত্রাদলের পোশাক তৈরীর জন্য বিখ্যাত। নবাবদের জরোয়া পোশাক এই গ্রামের কারিগররা তৈরী করতেন বলে দাবী করা হয়। বছর পঞ্চাশ আগে বাজারের দোকানে প্রয়াত গোপাল দাসকে প্রায় সারা বছর ধরে যাত্রাদলের পোশাক তৈরী করতে দেখেছি। এছাড়া গোপালবাবুর আর একটা বিষয়ে দক্ষতা ছিল—কাঁচের ওপর পৌরাণিক নানা দেবদেবীর ছবি এঁকে ও মহাজন বাক্য লিখে বিক্রি করতেন। ছবি ও লেখার শিল্পরীতি ছিল অপূর্ব। আজও অনেক ঘরে

এইসব ছবি অবিকৃত অবস্থায় দেখা যায়। বর্তমানে কামারপাড়ার স্বর্ণশিল্পের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এখানকার শিল্পীদের নানা মণিমাণিক্য খচিত সোনার জড়োয়া অলঙ্কারের খ্যাতি সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত। কেবলমাত্র এ-জেলায় নয় জেলার বাইরে এমন কি ভারতের কোথাও কোথাও এমন শহর খুব কমই আছে যেখানে কামারপাড়ার স্বর্ণশিল্পীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে নেই।

ভারতবর্ষ পত্রিকার ১৩৪৯ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "চণ্ডীদাসের নবাবিষ্কৃত পুঁথি" শীর্ষক একটি দীর্ঘপ্রবন্ধ বনপাশ কামারপাড়া সম্পর্কে সুধীজনের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। এই পুঁথি সম্পর্কে ড. বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—এই পুঁথিটি চণ্ডীদাস সমস্যা আলোচনার পক্ষে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু কর্তৃক সম্পাদিত দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। পুঁথিটির আবিষ্কার সম্পর্কে ড. বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"ইহা বর্ধমান জেলার বনপাশ গ্রামের শ্রীযুক্ত ত্রিভঙ্গ রায় মহাশয়ের গৃহে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার পরিবারেও ইহা বহুকাল হইতে পূজা পাইয়া আসিতেছে।"

স্বর্ণশিল্প ছাড়াও গ্রামের দক্ষিণ ভাগে হরিবাটী গ্রামের সূত্রধরদের মধ্যে মন্দির অলঙ্করণের ছাঁচে টেরাকোটার অলঙ্করণের নানা পৌরাণিক কাহিনীর মূর্তি তৈরীর দক্ষতা ছিল। আমার বাবার কাছে শুনেছি মিস্ত্রীপাড়ার দেউলেশ্বর শিবের আটকোণা শিবমন্দিরের টেরাকোটা অলঙ্করণেব মূর্তি হরিবাটীর দ্বিজপদ সূত্রধরের পিতামহ তৈরী করেছিলেন। সূত্রধরগণ আগে কাঠের পুতুল, মাটির পুতুল তৈরী করে রথ ঝাঁপানের মেলায় বিক্রি করতো। এখন এসব বন্ধ হয়ে গেছে প্লাস্টিকের পুতুলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কাঠের পুতুল, মাটির পুতুলের খরচ পোষায় না। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্য গ্রামের ত্রিভঙ্গ রায় পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে ছবি আঁকায় পারদর্শী ছিলেন। কানপুরের কমলামন্দিরের অভ্যন্তরে দেওয়ালে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক ছবি ত্রিভঙ্গবাবুরই আঁকা। তাছাড়া তিনি মাটির প্রতিমা নির্মাণ করতেন, প্রস্তরশিল্পের তিনি ছিলেন দক্ষ ভাস্কর। কয়রাপুরের জলতলবাসিনী দেবীর প্রস্তরমূর্তি চুরি যাওয়ায় ত্রিভঙ্গবাবুই কষ্টিপাথরে দেবীর দশভুজা দুর্গামূর্তি নির্মাণ করেদেন।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বনপাশ শিক্ষানিকেতন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা গ্রামবাসীদের নিকট এক ঐতিহাসিক ঘটনা। যদিও ঐ বৎসর ২রা জানুয়ারী বিদ্যালয়ের উদ্বোধন হয় কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে দলিল সম্পাদিত হয় ১৯৩৭

সালের ৩রা মার্চ। দলিল সম্পাদন করেন ৺কার্তিকচন্দ্র দাসের পক্ষে কিঙ্করচন্দ্র দাস ও হরেরাম দাস, সাং-বনপাশ, দলিল সম্পাদিত হয় বনপাশ শিক্ষানিকেতন ম্যানেজিং কমিটির পক্ষে সেক্রেটারী জগত্তারণ দাস। পিতা ৺লক্ষ্মীনারায়ণ দাস সাং-বনপাশ-এর নামে। দলিল রেজেস্ট্রি হয় ভাতার সাবরেজেস্ট্রি অফিসে—দলিল নং ২০৪, ভলিউম 5, ৺কার্তিকচন্দ্র দাসের উইল মোতাবেক ধান্দলসা মৌজার ১৫০৬ দাগের ৩ একরের মধ্যে ২ একর ২০শতক ও ১৪৩৮ দাগের ২.২০ একর জমির উল্লেখ ছিল। বিদ্যালয় গৃহের মাটির দেওয়াল ভিতরে খড়িটে করা বাইরের দেওয়ালে আলকাতরা দেওয়া, মেঝে সিমেন্টে বাঁধানো, উপরে করগেটের ছাউনি—মোট দশখানি ঘর পশ্চিম দুয়ারি তিনটি, উত্তর দুয়ারি ৪টি ও দক্ষিণ দুয়ারি ৩টি। প্রথম প্রধান শিক্ষক এলেন অভয় চট্টোপাধ্যায়। বছর দুই বেশ চললো—তারপরেই স্কুলের ওপর পড়লো শনির দৃষ্টি। দু'বছর না যেতেই রাজনীতির আবর্তে পড়ে অভয়বাবু বিদায় নেন—এরপর এক বছর দু'বছর অন্তরই প্রধান শিক্ষকের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। কেউ আর আত্মসম্মান বজায় রেখে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে পারেন না। এরপর ১৯৪৫ সালে অনুমোদনহীন এক কন্দকাটা স্কুলের দায়িত্ব অর্পিত হয় এই প্রতিবেদকের ওপর; স্কুলে চারটি শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা ৫৭, শিক্ষক ৩/৪। ১৯৪৬ সালের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের সময় সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একেবারে ৬ বছরের অনুমোদন আনা হলো—গ্রামের কিছু বদান্য ব্যক্তির অর্থানুকূল্যে নতুন বিল্ডিং-এর পত্তন হলো। কিন্তু গ্রামের রাজনীতির আবর্তে পড়ে এই প্রতিবেদককেও স্কুল ছাড়তে হলো।

এখন তো স্কুল নিজের শক্তিতেই গড়গড় করে চলছে, উচ্চতর মাধ্যমিক হয়েছে—গ্রামে এক উন্নতমানের পাঠাগার হয়েছে। পাকা রাস্তা, ঘরের দুয়ারে বাস (Bus), ইলেকট্রিক, টেলিফোন পাড়ায় পাড়ায়, জনগণের ব্যবহার্য রাস্তার ধারে হাইড্রেন্ট ওয়াটার, ডিপ টিউবওয়েল। তবু একটা জিনিসের অভাব আছে—বালিকা বিদ্যালয়ের আশু প্রয়োজন।

গ্রামে প্রায় ৩০।৩২টি শিবমন্দির—বেশীর ভাগই শিখর দেউল, একটি টেরাকোটা অলংকৃত হরিবাটী ও জয়রামপুরে প্রতি বৎসর বৈশাখে সংক্রান্তিতে গ্রামদেবী রক্ষাকালীপূজা ও উৎসব হয়; জ্যৈষ্ঠ মাসে রায়বাড়ীর রক্ষাকালী বেদীতে ফলহারিণী কালিকাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গ্রামে এখনও ১৬/১৭ টি দুর্গাপূজা হয়, কালীপূজায় হাড়িপাড়ায় ১০ হাত উঁচু কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কার্তিকপূজা, তিনকড়ি রায়েদের বাড়ীতে জগদ্ধাত্রীপূজা প্রয়াত হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের

প্রতিষ্ঠিত হরিবাটীতে অগ্রহায়ণ মাসে অন্নপূর্ণাপূজা এখনও আড়ম্বরের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

দুর্গাপূজার সময় মোড়লপাড়ায় অষ্টধাতুর সিংহবাহিনী চতুর্ভুজা দুর্গাপূজায় বহুলোকের সমাগম হয়। মোড়লপাড়ার শ্মশানে আছে সতীর মন্দির—এ সতীর মন্দির কিন্তু সতীদাহের স্মৃতিবাহী নয়—মণ্ডলপাড়ার স্বামী-স্ত্রীর একত্র মৃত্যুকে স্মরণীয় করে রাখার মন্দির। পূর্বে গাজুনে পশুপতি দাসের বাড়ীতে ভাদ্রমাসে ধর্মরাজের গাজন হতো—এই গাজনের বৈশিষ্ট্য ছিল শিবভক্ত্যার ভাঁড়ালনাচ ও শূয়োর বলিদান। বর্তমানে গাজনটি বন্ধ হয়ে গেছে। শ্রাবণ মাসে চক্রবর্তী পাড়ায় মনসাপূজা উপলক্ষে তিনদিন ধরে ঝাঁপান ও সাপুড়েদের সাপ খেলানো উপলক্ষে গ্রামে বহুলোকের সমাগম হয়। পূর্বে চাঁদাই গ্রামে পঞ্চাননতলায় ফাল্গুন মাসে পঞ্চাননের পূজা উপলক্ষে বিরাট মেলা—যাত্রা, থিয়েটার, কীর্তন, পুতুলনাচ. পৌরাণিক কাহিনীর দেবদেবীর মূর্তি তৈরী করে প্রদর্শনী ছিল মেলার অন্যতম আকর্ষণ। এ-মেলাও বর্তমানে বন্ধ। এছাড়াও গ্রামে দিদি-ঠাকরুন, বসন্ত চণ্ডী, পঞ্চানন প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর পূজার ব্যবস্থা আছে। অতীতের অখ্যাত গ্রামের খোলস ছেড়ে বনপাশ কামারপাড়া এখন শিল্পসংস্কৃতির পীঠস্থান।

বনের ধারে বনকাটি

১৯৫৬ সালের অজয়ের বিধ্বংসী বন্যায় পাণ্ডুক, পুবার, দীননাথপুর, রামনগর, খটনগর ভেসে যায়—বহুলোক গৃহহীন হয়, বহু গরু-বাছুর ভেসে যায়—ঠিক পূজার আগের এই বন্যায় বহুলোক সর্বস্বান্ত হয়। সে-সময় সেটেলমেন্ট বিভাগের সরকারী কর্মী হিসেবে এই অঞ্চলে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যের দায়িত্ব নিয়ে পূজার মধ্যেই আমাকে রামনগর যেতে হয়। মাসাবধিকাল এ-অঞ্চলে থাকার সময় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট এক ডাক্তারবাবুর (নামটি ভুলে গেছি) কাছে রামনগরের সন্নিকটবর্তী পশ্চিমদিকে বনকাটি গ্রামের কথা শুনি। প্রেসিডেন্টবাবু ওখানকার অপূর্ব পিতলের রথ দেখে আসতে বলেন। সেই অনুসারে ওখানে আমার আর্দালি গঙ্গাপ্রসাদকে নিয়ে রওনা হই। পানাগড় থেকে ১১ মাইল। বাস স্টপেজের পশ্চিমদিকে মাইল তিনেক গেলেই বনকাটি গ্রাম। বনকাটি ছোট্ট গ্রাম। আয়তন মাত্র ১৪৮.৫২ হেক্টর, লোকসংখ্যা ৯৪৫; এর মধ্যে ৪৪৩ জনই তপসিলী, সাঁওতাল অবশ্য নামমাত্র ৬ জন। বর্তমানে গ্রামে একটি মাত্র প্রাথমিক স্কুল, হেল্‌থ সেন্টার, ৫ মাইল দূরে ডাকঘর একটা স্থাপিত হয়েছে—নিকটবর্তী শহর কাঁকসা ১৮ মাইল। বনকাটিতে আছে ২টি শিবমন্দির—১১৫৫ সালে নির্মিত গোপেশ্বর

শিবমন্দির আর ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত পঞ্চরত্ন শিবমন্দির। কিন্তু বনকাটির আকর্ষণ এর পিতলের রথের জন্য।

তারাপদ সাঁতরা মহাশয় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় পিতলের রথের তালিকা প্রকাশ করেছেন, তাতে বর্ধমান জেলায় এরূপ চারটি পিতলের রথের উল্লেখ করেছেন। (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩৭৭)। বনকাটির রথ অবশ্যই তার মধ্যে একটি।

বনকাটির রথ তৈরী হয়েছিল ১২৪১-৪২ বঙ্গাব্দে (১৮৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দ)। স্থানীয় কাঁসারীরাই এই রথের কারিগর—লোহার ফ্রেমের ওপরে পিতলের পাত বসিয়ে পঞ্চরত্ন মন্দিরের আদলে তৈরী। তপ্ত পিতলের পিণ্ডকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পাতলা চাদরে পরিণত করে চাদরের গায়ে ছেনি দিয়ে রেখাচিত্র ক্ষোদাই করে ও পিতলের পাতকে ছাঁচে ফেলে উল্টো পিঠে হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে উঁচু (ফেটিব) তৈরী করে নক্‌শা কাটা হয়। রথের গায়ে পৌরাণিক কাহিনী, সমাজচিত্র, শিকারের চিত্র—এইসব নক্‌শা কাটা। উচ্চতা ১৫ ফুট প্রস্থ ৬ ফুট, ৫ ইঞ্চি (দোতলার উচ্চতা ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি)। রথের গায়ে ক্ষোদিত দেখা যায় রথ প্রস্তুতের সন তারিখ। "সন ১২৪১ সাল তাং ২ মাঘ, য়ারম্ভ সন ১২৪২ সন ১৫ আষাঢ় তোয়র"। লেখার বানান দৃষ্টে বোঝা যায় শিল্পীর বিদ্যার দৌড় বেশী নয়—হয়ত প্রাথমিক কিন্তু শিল্পীর শিল্পকৃতির বিস্ময়ের উদ্রেক করে, তাছাড়া মাত্র সাড়ে পাঁচ মাসে এরূপ শিল্পকর্মের সৃষ্টি শিল্পীর দক্ষতার পরিচায়ক। এরকম পিতলের রথ দেখেছি ভাতার থানার বনপাশ কামারপাড়ায় ৺তিনকড়ি রায়ের বাড়ীতে, বর্ধমানে সর্বমঙ্গলা মন্দিরে ও রাধানগরের দে-বাড়ীর রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে।

আর একটি পিতলের রথ আছে সিয়ারসোলের রাজবাড়ীতে—জগন্নাথদেবের রথ, বাবু গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত। প্রথমে ছিল কাঠের রথ পরে ঐবংশেরই জিয়নলাল মালিয়া পিতলের রথ তৈরী করান। তৈরী করে কলকাতার মিস্ত্রী প্রসাদচন্দ্র দাস, বঙ্গাব্দ ১৩৩৩ সালে। এরকম পিতলের রথ আরও অনেক স্থানে থাকতে পারে বলেই আমার ধারণা। বর্ধমানের মহন্তর অঞ্চলেও এরকম রথ ছিল।

(তথ্যসূত্র : ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৭৭
দেখা হয় নাই—অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

কালো হীরের শহর রানীগঞ্জ

আসানসোল মহকুমার মধ্যযুগের শেরগড় পরগনার অন্তর্ভুক্ত রানীগঞ্জ থানার অন্তর্গত ২৪ নং শিল্পনগরী রানীগঞ্জ। ২৩.৩৬ উঃ অক্ষাংশ ও ৮৭.৬ পূর্ব

দ্রাঘিমাংশের মধ্যে দামোদরের উত্তর তীরে অবস্থিত কয়লাখনি অঞ্চলের মধ্যমণি রানীগঞ্জ। রানীগঞ্জ নামের মধ্যে প্রাচীনত্বের আভাস পাওয়া যায় না। কারণ রানী শব্দ যদিও রাজ্ঞী > রন্নী থেকে তদ্ভব নিষ্পন্ন করে জাত; 'গঞ্জ' শব্দ ফারসী গনজ থেকে আগত। আর ফারসী ভাষার প্রচলন মোগল আমল থেকে শুরু হলেও এর ব্যাপক প্রচলন নবাবী আমলের (১৭০৭–১৭৬৫) আগে হয় নাই। কাজেই 'রানীগঞ্জ' নাম ২০০/২৫০ বছরের আগের হতে পারে না। অন্য ক্ষেত্রেও দেখা গেছে 'গঞ্জ'-অন্ত গ্রাম ভাতার থানার সাহেবগঞ্জ সম্ভবত বীরভূমের চীপ সাহেবের নাম থেকে এসেছে। কারণ চীপ সাহেবের এখানে নীলকুঠি ও বাণিজ্যকেন্দ্র থেকে সাহেবের বাণিজ্যকেন্দ্র বা গঞ্জ-এর সরলীকৃত রূপ দাঁড়িয়েছে 'সাহেবগঞ্জ'। সেইরূপ 'রানী'র নামাঙ্কিত বাণিজ্যকেন্দ্র বা গঞ্জ থেকে রানীগঞ্জ নামের উৎপত্তি হয়েছে। Journal of the Asiatic Society of Bengal 1842-এ প্রকাশিত The coal field of Damuda প্রবন্ধে Mr. J. Hamfray রানীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লাশিল্পের সম্ভাবনা বিষয়ে বিশদ আলোচনা প্রসঙ্গে এর নামকরণ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। The name is derived from the proprietary rights of the collieries having been vested in the late Rani of Burdwan. কিন্তু বর্ধমান রাজবংশের ইনি কোন রানী যাঁর এখানকার কয়লাখনি অঞ্চলের মালিকানা স্বত্ব ছিল? বর্ধমান রাজবংশের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় কোম্পানীর কলকাতা কাউন্সিল ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী তৎকালীন দুর্নীতিগ্রস্ত দেওয়ান ব্রজকিশোর রায়কে বরখাস্ত করে মহারানী বিষ্ণুকুমারীর হস্তে জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। আবার ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের নথিপত্র ঘেঁটে জানা যায় জেলার তৎকালীন কালেক্টর সামুয়েল ডেভিসের সুপারিশ ক্রমে বর্ধমান রাজ এস্টেট পরিচালনার ভার মহারানী বিষ্ণুকুমারীর হস্তে অর্পণ করা হয় (Bengal Historical Record)।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের যন্ত্রকুশলী মিঃ জোনস কলকাতায় আসেন। তখন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এই জোনস্‌কে রানীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লা অনুসন্ধানের দায়িত্ব অর্পণ করেন। জোনস এই অঞ্চল ভালভাবে সমীক্ষা করে এখানে ইংলন্ডের সমমানের কয়লাপ্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে মহারানী বিষ্ণুকুমারীর কাছ থেকে ৯৯ বিঘা জমি লিজ নিয়ে কয়লা উৎখননের কাজে ব্রতী হন। ফলে অচিরাৎ রানীগঞ্জ বাণিজ্যকেন্দ্র বা 'গঞ্জ' হিসেবে গড়ে ওঠে ও মহারানীর বিষ্ণুকুমারীর নাম অনুসারে নাম হয় রানীগঞ্জ।

সিপাহী বিদ্রোহের আগে পর্যন্ত এ অঞ্চল ছিল ঝোপ-জঙ্গলে পূর্ণ। বাঘ-ভাল্লুকের ভয়ে কোন শ্রমিক রাত্রে কাজ করা তো দূরের কথা বস্তি থেকে বের হতেও পারতো না। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মধ্যে একমাত্র খারশুলি ও কুমারবাজার গ্রামে সামান্য কিছু বসতি ছিল। খারশুলিতে ঘর আষ্টেক গোয়ালা ও মুসলমান এবং কুমারবাজার বা কুমার রামচন্দ্রপুরে কয়েক ঘর চাষীর বস্তি ছিল।

ফরাসী পর্যটক জ্যাকমঁ কলকাতা থেকে গো-গাড়ীতে বর্ধমান, হলদি, দিগনগর, সুয়াতা দিয়ে মঙ্গলপুর ও সেখান থেকে কুমারবাজারে পৌঁছান ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরের ১১/১২ তারিখে। তিনি বর্ধমানে কোন উল্লেখযোগ্য পাকা বাড়ী বা মন্দির দেখেন নাই, বেশীর ভাগই কুঁড়ে ঘর দেখেছিলেন। কিন্তু বর্ধমানের রাজবংশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জ্যাকমঁ-এর তথ্য মেনে নেওয়া যায় না। 'জ্যাকমঁ কুমারবাজারেও যেনতেন প্রকারে তৈরী কুটির দেখলেন। সেখান থেকে বের হয়ে দূর থেকে ধোঁয়া দেখেই বুঝলেন কোথায় রানীগঞ্জ। রানীগঞ্জে জ্যাকমঁ ঘোড়া থেকে নামলেন কয়লাখনির ইউরোপীয় কর্মচারীর বাংলোর দরজায়। কয়লাখনির মালিক মিঃ আলেকজান্ডার...এখানকার কর্তার নাম বার্টন...জ্যাকমঁ-র আসার দু'দিন আগে ন'জন ইউরোপীয়র একটি দল এসেছিল বাঁকুড়া থেকে। তাঁরা এসেছিলেন শিকার করতে, সঙ্গে এনেছিলেন আঠারোটা হাতী। রানীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চল দামোদরের বাঁ পাড়ে, বর্ধমান থেকে পঁয়ষট্রি মাইল দূরে সাতদিনের রাস্তায়। (জ্যাকমঁর দিনপঞ্জির বঙ্গানুবাদ অবন্তী সান্যাল)

জ্যাকমঁ-র বিবরণ থেকে বোঝা যায় ১৮২৯ সালে সেই সময় Messers Alexander & co. নামে এক Agency House ছিল Mr. Jones-এর ঋণের টাকা সুদসহ শোধ করে খনি খননেব দায়িত্ব পেয়েছেন ও কয়লা উৎপাদন শুরু করেছেন। তবে জ্যাকমঁ ছিলেন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ও ভূতত্ত্ববিদ, তাঁর দৃষ্টি ছিল নদ-নদী মাটি জল বালি গাছ গাছালির দিকে; জনপদ ও মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিত্র তাঁর দিনপঞ্জী থেকে আশা করাই বৃথা। তবুও তাঁর দিনলিপিতে তাঁর যাত্রাপথ ও তাঁর দেখা স্থান সম্পর্কে যে running commentary পাওয়া যায়, তার ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়।

একটা বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক। জেলার পশ্চিমাংশে কয়লার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন Mr. Suetonius Grant Heatly—১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি পরে ছোটনাগপুর ও পালামৌ-এর কালেক্টর Mr John Summer-এর সঙ্গে একযোগে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর কাছ থেকে পাঞ্চেত ও

বীরভূমের কয়লা খনি অঞ্চলে খননকার্যের লাইসেন্স লাভ করেন ও এই অঞ্চলে ছটি খনিতে কাজ আরম্ভ করেন। এই ছটি খনি ছিল আইতুরিয়া, চিনাকুরি, দামুলিয়া ও বাকি তিনটি আরও পশ্চিমে বরাকরের কাছে। এর মধ্যে একমাত্র দামুলিয়া বর্তমান রানীগঞ্জ থানায় পড়ে। কিন্তু ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এই অঞ্চলে কয়লা অনুসন্ধানের কাজ শুরু হলেও ১৮১৫–১৬-এর আগে রানীগঞ্জে এই প্রচেষ্টার সাথর্ক রূপায়ণ হয় নাই। রানীগঞ্জে কয়লা উৎখননের বিলম্বের কারণ অনুসন্ধান করে জানা যায় সে সময় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চাষের জমি থেকে কর আদায়ের দিকেই বেশী নজর ছিল। কয়লার ব্যবহারও সে সময় ছিল সীমিত। যেটুকু প্রয়োজন হতো তার কিছুটা কাঠকয়লা দিয়ে আর বাকিটা ইংলণ্ড থেকে আমদানী করে পুষিয়ে নেওয়া হতো। আর এর জন্যে ইংলণ্ডের কয়লাখনির মালিকরা এদেশে কয়লা উৎখননের ব্যাপারে বাধাদানের চেষ্টা করতো। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন ঘটে ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের উত্থান ও ইংলন্ডের বিরুদ্ধে মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা জারী করার পর থেকে। সেই সময় থেকেই ভারতে কয়লা উৎখননের প্রচেষ্টা শুরু হয়ে যায়। এই প্রচেষ্টা শুরু করেন Mr. Jones কিন্তু জোন্স-এর ব্যবসায়িক বুদ্ধি না থাকায় তিনি কয়লা উত্তোলন আরম্ভ ক'রেও লোকসান খেতে থাকেন। সরকারের কাছ থেকে শতকরা ছয় টাকা হার সুদে অগ্রিম নেওয়া ৪০,০০০ টাকা শোধ করতে পারেন না। তখন এগিয়ে আসেন মেসার্স আলেকজান্ডার এন্ড কোম্পানী নামে এজেন্সি হাউস। আলেকজান্ডার জোন্সের ৪০,০০০ টাকার ঋণ সুদসহ শোধ করে দিয়ে কয়লা উত্তোলনের স্বত্ব স্বামিত্ব কিনে নেন ও কয়লা উত্তোলনের কাজ আরম্ভ করে দেন। প্রতি বছরে প্রায় ৭০,০০০ টাকা করে লাভ করতে থাকেন। এখন থেকে রানীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লাশিল্পের রমরমা বেড়ে যায়।

Carr & Tagore Co. Gailmore Homfray Co., Bengal coal co. বাবু গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিত (সিয়ারসোলের জমিদার) প্রভৃতি বহু কোম্পানী এখানে এসে কাজ শুরু করে দেয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে বাবু গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিতের উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪.৩ লক্ষ টন। বেঙ্গল কোল কোম্পানীর পরেই গোবিন্দপ্রসাদের স্থান।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে হাওড়া থেকে রানীগঞ্জ পর্যন্ত প্রথম রেল লাইন স্থাপিত হয়। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রানীগঞ্জ ছিল আসানসোল মহকুমার সদর কার্যালয়। আসানসোলের উত্থানের আগে পর্যন্ত মহকুমা ফৌজদারী আদালত, থানা ডাকঘর, পুলিশ হাজত সব ছিল বর্তমান রানীগঞ্জ থেকে ২ মাইল

দূরে মঙ্গলপুরে। আর মুন্সেফী আদালত ছিল ৮ মাইল দূরে উখড়ায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য উখড়া তখন ছিল বীরভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত; আর রাজস্ব শাসন ও ফৌজদারী শাসন পরিচালিত হতো মানভূম থেকে। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মহকুমার সদর কার্যালয় মঙ্গলপুর থেকে আসানসোলে উঠে যায়। তা সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে রানীগঞ্জের উত্থান ও উন্নতি অব্যাহত থাকে। এ সম্পর্কে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে মার্চ ১২৬১ বঙ্গাব্দ ৯ই চৈত্র তারিখের সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত সংবাদ উল্লেখযোগ্য।

"সম্প্রতি রানীগঞ্জের কয়লাখনি পর্যন্ত রেইলরোড প্রস্তুত হইয়া বাষ্পীয় রথের গমনাগমন হওয়াতে পূর্বাপেক্ষা ঐ স্থানের অধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে এবং ক্রমে আরও হইবে। মঙ্গলপুরের পক্ষে আর বড় মঙ্গল থামিবে না, তথাকার মঙ্গল এখানে আসিবে। রানীগঞ্জ পূর্বে নামে রানীগঞ্জ ছিল এখন কার্যে রানীগঞ্জ হইবেক, যেহেতু বাণিজ্য ও রাজকীয় উভয় বিষয়েই সুশোভিত হইবেক।' কয়েকদিন হইল মঙ্গলপুরের থানা ও ডাকঘর এখানে উঠিয়া আসিয়াছে। এমত জনরব যে অবিলম্বে এই স্থানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের মহকুমা স্থাপিত হইবেক। ১৮৫৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী রানীগঞ্জের নবনির্মিত স্টেশনে প্রথম 'রাষ্ট্রীয় রথে'র আগমন ঘটে। ঐ দিন স্টেশনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অনেক সাহেবসুবা ও দেশীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটে। সে-সময় রানীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লার বাজার ছিল সীমাবদ্ধ কারণ পরিবহনের সমস্যা। প্রথমে Alexander & Co. দামোদর নদী দিয়ে কলকাতায় কয়লা পরিবহনের জন্য ৩০০ থেকে ৪০০ নৌকা ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু কেবলমাত্র বর্ষায় দামোদর ছিল নাব্য। কোম্পানীগুলি এজন্য দামোদরের বন্যার জন্য দিন গুনতেন। রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কয়লা পরিবহনের সুরাহা হয়ে গেল। জেলার পশ্চিমাঞ্চলে শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠার পথিকৃৎ হলো রানীগঞ্জ।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে বল্লভপুরে কাগজের কল স্থাপিত হলো। ধীরে ধীরে ইটভাটা, চুন, সিমেন্ট, পটারী টালি কারখানা গড়ে উঠলো। রানীগঞ্জের টালি ও তাপসহনক্ষম ইটের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে—আজও এই খ্যাতি অম্লান। এছাড়া তেলকল, রাসায়নিক ও বহু ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা স্থাপিত হয়। ১৯০৯ সালের রিপোর্টে দেখা যায় পেপার মিলে ১১০০ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছিল ও ৫৩৯৪ টন কাগজ উৎপাদিত হয়। এরপর কাগজের প্রয়োজনীয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাগজশিল্পেরও দিন দিন উন্নতি ঘটতে থাকে। ইংরেজ কোম্পানী পরিচালনায় উৎপাদন বাড়তে থাকে। আবার সাহেব কোম্পানী শ্রমিক মজুরদের

শোষণ করে লাভের টাকায় স্ফীতকায় হতে থাকে। শেষে ১৯৩৮ সালের শ্রমিক ধর্মঘট ও শ্রমিক নেতা সুকুমার ব্যানার্জীর বুকের ওপর দিয়ে ব্রাউন সাহেবের নির্দেশে লরী চালিয়ে সুকুমার ব্যানার্জীকে হত্যার পর থেকে কাগজকলে শনির দৃষ্টি পড়ে। বারবার মালিকানা বদল হতে থাকে। শ্রমিক ধর্মঘটও অব্যাহত যাকে শেষে কারখানা বন্ধও হয়ে যায়। বর্তমানে কারখানা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোনমতে চলছে।

Wesleyan Methodist Mission এখানে একটি কুষ্ঠাশ্রম, অনাথ আশ্রম ও বিদ্যালয় স্থাপন করে। উনবিংশ শতকের প্রথমে একটি গীর্জা নির্মিত হয়। বর্তমানে স্টেশনের সন্নিকটে গীর্জাপাড়া লেন এই গীর্জার সাক্ষ্য বহন করছে। এখানেও দুটো তেলকল স্থাপিত হয়েছিল।

১৯৯১ সালের জনগণনা রিপোর্ট-এ দেখা রানীগঞ্জ শহর এলাকা (urban arca) গড়ে উঠেছে ১৪টি মৌজা নিয়ে; যেমন—জেমারি (জে. এল. ৮) (এখানে বর্তমানে জে. কে. নগর টাউনশিপ স্থাপিত হয়েছে); রতিবাতি (২) তাপুলি (৩) চেলাদ (৫) এগড়া (১৩) নিমচা (১৬) সিয়ারসোল (১৭) আমকুলা (১৪) মুরগাথাউল (১৫) রঘুনাথচক (২৬) বল্লভপুর (২৭) রানীগঞ্জ (২৪) কুমার বাজার (২৮)। এ ছাড়া এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন গজিয়ে ওঠা সাহেবগঞ্জ (২৫)। বর্তমানে সাহেবগঞ্জ বাদ দিয়ে রানীগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির আয়তন ৬.৪৫ বর্গ কিলোমিটার, লোকসংখ্যা ৬১৯৯৭—এদের মধ্যে তপসিলী ১০৩৪১, উপজাতি ২৪২। রানীগঞ্জে আছে ১৫৯ শয্যাবিশিষ্ট ২টি হসপিটাল, একটি টি. বি. ক্লিনিক, একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র; মেডিক্যাল কলেজ ৮৬ কিমি দূরে বর্ধমানে. ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ২৩ কিমি দূরে দুর্গাপুরে। একটি ডিগ্রী কলেজ, ২টি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩টি মাধ্যমিক, ৩০টি প্রাথমিক ও ২টি সাধারণ পাঠাগার আছে। শহরে সিনেমা হল ২টি। মূলত শিল্পকেন্দ্র ও ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবেই রানীগঞ্জের রমরমা।

রানীগঞ্জ শহর এলাকার অন্তর্ভুক্ত (Urban Agglomeration) রানীগঞ্জের ২ কিমি উত্তরেই সিয়ারসোল। রানীগঞ্জ রেল স্টেশন থেকে পাকারাস্তা ধরে রানীগঞ্জের পথেই রিক্সা করে, বাসে বা হেঁটেও যাওয়া যায়। সিয়ারসোলের খ্যাতি কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিতের এখানে আগমনের পর থেকে। ইনিই সিয়ারসোল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ফরাসী পর্যটক জ্যাকমঁ-এর দিনলিপিতে গোবিন্দপ্রসাদের প্রসঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আলেকজান্ডার এ্যান্ড কোম্পানী মিঃ জোনসের কাছ থেকে এখানকার খনি অঞ্চলের স্বত্বস্বামীত্ব

ক্রয় করে কয়লা উত্তোলন শুরু করলে ১৮২৯ সালে গোবিন্দপ্রসাদ আলেকজান্ডারের অফিসে সামান্য কেরানীর চাকরী নিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। এঁর সম্বন্ধে জ্যাকমঁ লিখেছেন—এই তরুণ কাশ্মীরী ব্রাহ্মণটি 'অসাধারণ ভদ্র, নম্র ও বিনয়ী। সে চমৎকার ইংরাজী বলতে ও লিখতে পারে এবং বড় কর্তার (মিঃ আলেকজান্ডার) চেয়ে হাজার গুণে শ্রেষ্ঠ। তবু বড় কর্তার ঘরে তাকে বাইরে জুতো খুলে রেখে আসতে হয়। তার সঙ্গে ধর্ম নিয়ে জ্যাকমঁ-র অনেক কথা হয়েছিল। ছোটবেলায় পিতৃবিয়োগ হলে সে খুবই দুরবস্থায় পড়েছিল, তখন সাহায্য পেয়েছিল রামমোহন রায়ের। তাঁর ইস্কুলে সে পড়াশুনা করেছিল। জ্যাকমঁর বিশ্বাস সে দরিদ্র বলেই রামমোহন তাকে সাহায্য করেছিলেন, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়, রামমোহনের প্রতি গোবিন্দপ্রসাদের অশেষ শ্রদ্ধা। তার বিশ্বাস তিনি ইউনিটেরিয়ান হলেও খ্রীষ্টান নন... পাদরি কেরির ইস্কুলেও সে কিছুদিন পড়েছিল শ্রীরামপুরে।... এরপর কয়লাখনির মালিকানা কিনে ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা গোবিন্দপ্রসাদ প্রভূত ধনের অধিকারী হন ও একের পর এক জমিদারী ক্রয় করেন। রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধাবশত যদিও তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরক্ত হন কিন্তু তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন নাই। কারণ তিনি জমিদারবাটিতে দামোদর জিউ-এর মন্দির স্থাপন করেন এবং কয়েকটি শিবমন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জগন্নাথদেবের রথযাত্রাও শুরু করেন। প্রথমে কাঠের রথ ছিল পরে এই বংশের জিয়নলাল মালিয়া পিতলের রথ নির্মাণ করান। রথের নির্মাতা প্রসাদচন্দ্র দাস, কলিকাতা বঙ্গাব্দ ১৩৩৩। গ্রামে একাধিক দুর্গাপূজা হয়, চাটুজ্যে বাড়ীর চাটুজ্যে বুড়ি, হাজরাবাড়ীর হাজরাবুড়ি প্রভৃতি। সাঁকো গ্রামে এরকম 'বুড়ি' শব্দযুক্ত কালীমূর্তি আছে; যেমন কালীবুড়ি চণ্ডী। এছাড়া গ্রামে বিশ্বকর্মা, দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, রক্ষাকালী প্রভৃতি দেবদেবীও সাড়ম্বরে পূজিতা হন। গ্রামে ৫০টি বেডযুক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত উচ্চবিদ্যালয়, একটি জুনিয়র হাইস্কুল ও ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে সিরারসোল উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন ও ঐ বৎসরই ঐ স্কুল ত্যাগ করে মাথরুন হাইস্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। তখন মাথরুন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। পুনরায় ১৯১৫ সালে সিয়ারসোল রাজস্কুলের অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন ও এখানে মোহমেডান বোর্ডিং-এ থাকতেন। এখানেই সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজীর বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। সিয়ারসোল স্কুলে প্রি-টেস্ট দিয়ে কাজী সাহেব ৪৯নং বাঙালী পল্টনে যোগ দেন। সিয়ারসোল রাজস্কুলের শিক্ষক বিপ্লবী যুগান্তর দলের

নিবারণচন্দ্র ঘটকের কাছেই কবি বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হন। পণ্ডিত গোবিন্দপ্রসাদ, নিবারণ ঘটক, কাজী নজরুল আজ নাই—কিন্তু তাঁদের স্মৃতিধন্য সিয়ারসোল রাজস্কুল আজও প্রাচীনত্বের ঐতিহ্য নিয়ে স্বমহিমায় বর্তমান। আর কালো হীরের শহর রানীগঞ্জ, কুলটি, বার্নপুর, দুর্গাপুর, আসানসোল শিল্পাঞ্চলের অগ্রদূত হয়েও আজ মাফিয়া চক্রের চক্রান্তে ধুঁকছে।

ভারতের রূঢ়—দুর্গাপুর

জার্মানীর ভারীশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্পের কেন্দ্রভূমি রূঢ় (Ruhr) আর ভারতের ভারী, মাঝারী, ক্ষুদ্র—নানা শিল্পসমৃদ্ধ দুর্গাপুর ভারতের রূঢ়। ইষ্টার্ন রেলওয়ের হাওড়া-আসানসোল-ঝাঁঝা লাইনে হাওড়া থেকে ১৭১ কিমি, বর্ধমান থেকে ৬৫ কিমি, আর আসানসোল থেকে ৪৩ কিমি দূরে অবস্থিত দুর্গাপুর স্টেশন। মানব দেহের শিরা উপশিরার মতো এখান থেকে বাসরুট বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর, পুরুলিয়া, শিলিগুড়ি. সিউড়ি, বর্ধমান চারদিকে বিস্তৃত। ২০ কিমি দূরে কালো হীরের পীঠস্থান রানীগঞ্জ, ৭০ কিমি দূরে চিত্তরঞ্জনের ইঞ্জিন কারখানা, মাইথন ও পাঞ্চেত ৬০ কিমি, ৭০ কিমি দূরে অজয়ের ওপারে বোলপুর শান্তিনিকেতন, ২৭ কিমি দূরে বাঁকুড়া আর ৬২ কিমি দূবে শিল্প-সংস্কৃতির পীঠস্থান প্রাচীন মল্লভূমির রাজধানী বিষ্ণুপুর। আর এরই মধ্যে ইস্পাতনগরী ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের স্বপ্নপুরী দুর্গাপুর। দুর্গাপুর আজ আর বছর যাটের আগেকার শাল পিয়াশালের ঘন অরণ্যে ঢাকা গোপীনাথপুর মৌজার ছোট্ট গ্রামটি নাই। দুর্গাপুর এখন বিশাল Notified Area, ৪০টি মৌজার সুপরিকল্পিত সুসংবদ্ধ নগর সংগঠন ইস্পাত নগরী, যার মধ্যে ৪০টি মৌজা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। "মালিকা পরিলে গলে, প্রতি ফুলে কে-বা মনে রাখে।" এর আয়তন আজ ১৫৪.২০ বর্গ কিমি, লোকসংখ্যা ৪২৫৮৩৬, তপসিলী জাতি ৫৩৮১4, উপজাতি ১১০৮৮, অথচ ১৯৬১ আয়তনের মধ্যে পাকা রাস্তাই ৪৪২.4 কিমি।

১৯৮১ সালে দুর্গাপুর নোটিফায়েড এলাকার মধ্যে ৩টি থানার সৃষ্টি হয়। দুর্গাপুর, কোক ওভেন ও নিউ টাউনশিপ। এর মধ্যে দুর্গাপুরে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ২৭টি মৌজা। পারুলিয়া (জে.এল. ৪৪), চক গোপালপুর (৪৫), শোভাপুর (৪৬) , কমলপুর (৪৭), গোপালমাঠ (৫৪), কারুরিয়া (৫৬), বিজুপোড়া (৫৭), আমরাইল (৫৮), কারসর (৫৯), চাকাগড় (৬০), মোহনপুর (৬১), জগরবাঁধ (৬২), সাব্‌জারা (৬৩), ওয়ারিয়া (৬৪), মেজডিহি (৬৫), দন্ডবাগ (৬৬), বেনাচিতি (৬৮), ভিড়িঙ্গি (৬৮), পুনাবাদ (৬৯), ধুলাড়া (৭০), খাটপুকুর (৫৯)।

কোক ওভেন থানা গ্রাস করেছে ৭টি মৌজা—গোপীনাথপুর (৮৫), রাধামাধবপুর (৮৭), অঙ্গদপুর (৮৯), রতুনা (৯০), বীরভানুপুর (৯১), নডিহা (৯২), নারায়ণপুর (৯৩)। আর নিউ টাউনশিপের মধ্যে আছে ৬টি মৌজা—পারদাই (৭৬), চকভাবনী (৭৭), গোয়ালারা (৭৮), ফুলিহরি (৮২), মামরা (৮৬), হরিবাজার (৮১)।

দুর্গাপুর নোটিফায়েড এরিয়ায় অন্তর্ভুক্ত ৪০টি মৌজার মধ্যে কিন্তু দুর্গাপুর নাই। এ যেন শিং নাই তবু নাম তার সিংহ। এ বিষয়ে স্থানীয় লোকমুখে ও বিভিন্ন তথ্য যোগাড় করে যেটুকু জেনেছি, তার ঐতিহাসিক ভিত্তি অপেক্ষা কিংবদন্তী বা লোকমতের গুরুত্বই বেশী। ঐতিহাসিক হীরেন্দ্রনাথ দত্তের কথায় "লোকমতের মধ্যে ইতিহাসের উপকবণ যথেষ্ট পরিমাণে লুক্কায়িত থাকে। তাকে অগ্রাহ্য করলে চলে না।" দুর্গাপুর হচ্ছে গোপীনাথপুর মৌজার (জে. এল. ৮৫) একটা ছোট্ট গ্রাম। প্রবাদ ২০০/২৫০ বছর আগে বাঁকুড়া জনপদের (বাঁকুড়া জেলার সৃষ্টি হয়েছে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে) বেলিয়াতোড়ের কাছে জগন্নাথপুর থেকে গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায় সপরিবারে বর্তমান দুর্গাপুর অঞ্চলে চলে আসেন ও নডিহার কাছে বসতি স্থাপন করেন। গোপীনাথ ক্রমে ক্রমে বিরাট জমিদারীর মালিক হন ও বিত্তশালী জমিদার নিজের নামকে চিরস্মরণীয় করবার জন্য মহলের নাম দেন গোপীনাথপুর আর তাঁর তনয় দুর্গাদাসের নামানুসারে এই মৌজারই ছোট্ট একটি গ্রামের নামকরণ করেন দুর্গাপুর। (তথ্যসূত্র : সাপ্তাহিক দেশ ৯/১/৬৫) গোপীনাথ কি তখন জানতেন যে তাঁর নিজের নামের মৌজা দুর্গাপুর নোটিফায়েড এরিয়ার মধ্যে তলিয়ে যাবে। আর দুর্গাদাসের দুর্গাপুরের খ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে?

গোপীনাথপুর মৌজার ছোট্ট গ্রাম দুর্গাপুরের নাম ৬০/৭০ বছর আগেও বিশেষ কেউ জানতো না। অজয় থেকে দামোদর পর্যন্ত এই ১৮ মাইল পরিমিত ভূখণ্ড ছিল শাল পিয়াশালের সমুদ্র। ছোটনাগপুর প্লেটোর সূচনা এখান থেকেই—কাঁকর পাথর মিশেল শক্ত জমি, মাঝে মাঝে ছোট বড় সাইজের টিলা, ঢেউখেলানো রাস্তা, উঁচু-নীচু খোয়াই প্রান্তর, শিরিষ আকশিয়া সেগুনের সারি—এই ছিল বর্তমানের দুর্গাপুরের আদিম চেহারা। বাঁকুড়া থেকে দুর্গাপুরের এই অংশ হয়ে বীরভূমের অজয় তীরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত লাল ল্যাটেরাইট মাটি—বাঘ, ভাল্লুক, হায়না নেকড়ে হাতির বুনো শূয়োর, কালোমুখো বানর, বনমুরগী ময়ূবেব অবাধ বিচরণ ভূমি—ঠাঙ্গাড়ে ডাকাতের ভয়ে দিনের বেলায় রাস্তা দিয়ে একাকী কেউ যেতে হলে প্রাণ হাতে করে যেত। এখানেই ছিল মোষখাপুরীর জঙ্গল—

দিনের বেলায় পথ দিয়ে যেতে গা ছমছম করতো—মোষখাপুরী নাম থেকেই বোঝা যায় বাঘের আক্রমণ থেকে বন্য মহিষও পরিত্রাণ পেত না। এই জঙ্গলেরও ইতিহাস আছে। ইতিহাস না বলে কিংবদন্তী বা লোকমত বলাই যুক্তিযুক্ত। সে কাহিনীর সত্যাসত্য, বাস্তবতা অবাস্তবতা কেউ বিচার করে না। ৬০।৭০ বছর আগেও রিক্সাওয়ালার মুখে মুখে শোনা যেত সে কাহিনী।

এই জঙ্গলেই ছিল নাকি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণীর গড় আর ভবানী পাঠকের মন্দির। অবশ্য জঙ্গলের মধ্যে ৫০/৬০ বছর আগেও দেখা যেত বিরাট এক স্তূপ—স্তূপটি আসলে একটি সু-উচ্চ পাথর মিশানো টিলা। এই স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে সমগ্র দুর্গাপুর অঞ্চল দৃষ্টিগোচর হতো। প্রবাদ—এই স্তূপের ওপর দাঁড়িয়েই দেবীরানী শত্রুপক্ষের গতিবিধি লক্ষ্য করতেন। স্তূপের তলায় ছিল এক বিরাট সুড়ঙ্গ। আর সুড়ঙ্গের মধ্যে এক গুপ্ত কক্ষ। সুড়ঙ্গ গেছে একেবারে দামোদর পর্যন্ত। কলকাতায় জেনারেল পোষ্ট অফিসের নীচে কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেই জিপিও থেকে গঙ্গা পর্যন্ত একটা সুড়ঙ্গ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানেই নাকি পুরনো ফোর্ট উইলিয়াম ছিল। আর শত্রুর আক্রমণকালে এই সুড়ঙ্গ দিয়ে নেমে গিয়ে গঙ্গা দিয়ে সৈন্যরা বিপদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করত। দুর্গাপুরেও স্তূপের নীচে সুড়ঙ্গ এই রকম রঙ্গলালদের আত্মরক্ষার পথ ছিল। দুর্গাপুরের স্তূপের নীচে গুপ্ত কক্ষ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে প্রফুল্লর প্রতি মুমূর্ষু বৈষ্ণবের উক্তি—"একটা সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইবে—বরাবর সিঁড়ি আছে। সেই সিঁড়ি দিয়া নামিবে ভয় নাই—আলো লইয়া যাইবে। নীচে মাটির ভিতর এমনি একটা ঘর দেখিবে। সে ঘরের বায়ুকোণে খুঁজিও টাকা পাইবে।" কিন্তু দুর্গাপুরের স্তূপের নীচে সুড়ঙ্গের মধ্যে সিঁড়ি বা ঘর ছিল কিনা জানার কোন উপায় নাই, কারণ কর্তৃপক্ষ সুড়ঙ্গের মুখ স্থায়ীভাবে গেঁথে দিয়েছেন। তবে ৫০।৬০ বছর আগেও স্থানীয় রিক্সাওয়ালার মুখেও শোনা যেত—"ভবানী ঠাকুরের মস্ত উঁচু রহস্যময় সেই ভিটার কথা—যেখানে অল্প কিছুদিন আগেও ঢুকলে আর বেরুনো যেত না। ঢোকার রাস্তা সরকার এখন গেঁথে বন্ধ করে দিয়েছে।" এখন দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে দুর্গাপুরের জঙ্গলের কিছুমাত্র প্রাসঙ্গিকতা আছে কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী ও ইন্দিরা উপন্যাসের পটভূমি ও বীজ হিসেবে লেখকের জেলার পূর্বাংশে দামোদর পাড়ের উচালন, গড় মান্দারণকে গ্রহণ করার কিছুটা প্রাসঙ্গিকতা থাকা সম্ভব—কারণ লেখকের খুল্লপিতামহ গড় মান্দারণ অঞ্চল দিয়ে বিষ্ণুপুর যেতেন। তিনি সে পথে কিংবদন্তী শুনেছিলেন—

পৌত্রদেরও তিনি এই গল্প শোনাতেন—তাতেই বঙ্কিমের ঔৎসুক্যের সঞ্চার। বীজ এইটুকু।" (বঙ্কিম রচনা সংগ্রহের ভূমিকা—পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি) কিন্তু জেলার পশ্চিমাংশে দুর্গাপুরের জঙ্গলকে পটভূমি করার কোন সূত্র পাওয়া যায় না।

"দেবী চৌধুরাণী-র বিজ্ঞাপনে জানানো হয়—এ গ্রন্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, তবে একটু ঐতিহাসিক মূল্য আছে। 'স্ট্যাটিসটিক্যাল একাউন্টে' রঙ্গপুর জেলার বৃত্তান্তে তা পাওয়া যাবে। গ্রন্থের সঙ্গে তার সম্বন্ধ অল্প। দেবী চৌধুরাণী, ভবানী পাঠক, গুডল্যাণ্ড সাহেব, লেফ্‌টেন্যান্ট রেনাল এই নামগুলি ঐতিহাসিক।" (তদেব)

তবে কি লেখক দুর্গাপুরের জঙ্গলের ডাকাতদের অত্যাচারের ঘটনা তথ্যনির্ভর করার জন্য বরেন্দ্রের দেবী সিং-এর অত্যাচার, রঙ্গপুরের জঙ্গলের ডাকাতদের অত্যাচার হিসেবে বর্ণনা করেছেন? উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না—তবে এই অনুমান খুবই কষ্টকল্পিত।

এ স্তূপ ও সুড়ঙ্গ ছাড়া জঙ্গলের গভীরে ছিল এক প্রায়-বুজে যাওয়া বিরাট জলাশয়—লোকের কথায় এর নাম রানীদীঘি। তাছাড়া কেন্দুলি যাবার পথে দূরের জঙ্গলে পড়ে ভবানী পাঠকের মন্দির—যেখানে লোকে কালীপুজোর রাত্রে তোপের আওয়াজ শুনতো বলে প্রবাদ। যাক সে কথা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গভীর জঙ্গলে পড়েছিল সৈনিকের ছাউনি; পানাগড়ে তৈরী হয়েছিল এয়ার বেস—তখন দুর্গাপুর স্টেশন ছিল এক অখ্যাত ফ্ল্যাগ স্টেশন। এর উত্তরে আর একটি সাবস্টেশন ছিল——ওয়ারিয়া। এখানেও পড়েছিল পল্টনের ছাউনি—তাই নাম হয় ওয়ারিয়া—warriorএর ভগ্নাংশ। আগেকার লেভেল ক্রশিং আর ওভার ব্রিজের মাঝামাঝি জায়গায় যেখানে বাঁকুড়া-বর্ধমান-বীরভূমের বাস দাঁড়াতো, সেখানে ছিল এক প্রাচীন কারখানার ভগ্নাবশেষ। চারিদিকে ইটের গাঁথুনি, মাঝখানে মনুমেন্টের মত চিমনি—চতুষ্কোণ ইট দিয়ে গাঁথা। ১৯০৫ সালে নির্মিত এখানে একসময় গড়ে উঠেছিল বার্ণ এণ্ড কোম্পানীর টালি ও ফায়ার ব্রিক্সের কারখানা। বার্ণ কোম্পানীর দূরদৃষ্টি ছিল। বুঝেছিল ভবিষ্যতে এখানেই গড়ে উঠবে শিল্পনগরী ভারতের রূঢ় আর তার জন্য প্রয়োজন হবেই ব্রিক্সের। ডি.ভি.সি.-র পরিকল্পনা তৈরী হয়েছিল প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে কিন্তু ব্যারেজ তৈরী শেষ হলো ১৯৫৫ সালের ৯ আগস্ট। ২২৭১ ফুট দীর্ঘ ব্যারেজ—অনেক মৌজা তলিয়ে গেল এর তলে। এছাড়া ১৫৫০ মাইল দীর্ঘ ক্যানেল কাটতে বহু জমি গেল। কিন্তু উপকারও কম হয় নাই এই দেড় হাজার মাইল দীর্ঘ

ক্যানেল বর্ষায় বিশাল জলরাশি বুকে নিয়ে ঘুরেছে বৃহত্তর অঞ্চল, রসসিক্ত, শস্যশ্যামলা করেছে তৃষ্ণার্ত ঊষর জমিকে। ১৯৫৫ সালে ব্যারেজের উদ্বোধন করলেন তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ইস্কন ও ভারত সরকারের যৌথ উদ্যোগে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা (Durgapur Steel Factory) গড়ে উঠলো—যার উদ্বোধন করলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, ১৯৬৩ সালের ১৬ই নভেম্বর। এখন যে শিল্পনগরীতে উপযুক্ত কর্মসংস্কৃতি (Work culture)এর অভাবে একের পর এক কারখানা বসে আছে—হাজার হাজার কর্মী নতুন করে বেকার হচ্ছে বা উপযুক্ত অবসরের বয়স হওয়ার আগেই অবসর নিতে বাধ্য হচ্ছে—সেখানে সেই সময় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য বিশেষভাবে স্মরণ করা যেতে পারে—"আমরা কুঁড়ে লোক চাই না। আমরা ঢিলে মেজাজের লোক চাই না, যারা সবসময় চাকরির নিয়মকানুন, বদলি ইত্যাদি সম্বন্ধে অভিযোগ করে। চাকরির নিয়মাবলী, বেতন, পদমর্যাদা এসব দরকারী হতে পারে। কিন্তু আমি চাই কাজ, আরও কাজ, আরও বেশী কাজ। আমি কর্ম-সম্পাদন চাই। আমি চাই সেইসব মানুষ যারা ধর্মযোদ্ধার মত কাজ করে। আমি তোমাদের বড় বড় কাজ করতে দেখতে চাই। আমি তোমাদের ভারত নির্মাণ করতে দেখতে চাই। এই বিশাল দেশকে গড়ে তোলার চাইতে বড়ো অন্য কিছু কি তোমরা কল্পনা করতে পারো? এই মনোভাব নিয়ে তোমাদের কাজে নামতে হবে। আর যারা দুর্বল মন্দগতি ও অলস অন্ধকূপে পড়ে থাক, তাদের জন্য কোন মমতার প্রয়োজন নেই।" নেহরুজি বেঁচে থাকলে দেখতেন—কাজের যুগ শেষ হয়েছে অন্তত আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে, এখন 'আসি যাই মাস পোয়ালে মাইনে পাই'-এর যুগ। এখন মুখ্যমন্ত্রীকেও বলতে হয়—'কাজ করতে বলবো কাকে—চেয়ারকে?' আর তাই বোধহয় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের স্বপ্নের শিল্পনগরী আজ ধুঁকছে—অবশ্য অন্য কারণও আছে—সে আলোচনা যথাস্থানে করা যাবে।

ইস্পাত কারখানা গড়ে ওঠার পর থেকে একে একে গড়ে উঠলো কারখানার পর কারখানা, নানা টাইপের কোয়ার্টার, অফিস, ইনস্টিটিউশান, বিল্ডিং, থারমাল পাওয়ার স্টেশন, কোকওভেন। ব্লাস্ট ফার্নেসের তলায় তলিয়ে গেল মেজেডি, সুজারা গ্রাম আর ধানজমি, তালদীঘি। যে বীরভানুপুর—সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম মানবগোষ্ঠীর বিচরণ ক্ষেত্র ছিল, যেখানে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় প্রত্ন বিভাগের অধীক্ষক শ্রীলালের নেতৃত্বে উৎখনন চালিয়ে খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০ বছরের ক্ষুদ্রাশ্মীয় সংস্কৃতির অনেক নিদর্শন—যেমন অর্ধচন্দ্রাকৃতি

আয়ুধ, বোরার (Borers), বুরিণ, স্ক্র্যাপার, ফলক আবিষ্কৃত হয়ে জেলার প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার যুগের ইতিহাসের একটা দিকের আবরণ উন্মোচিত করেছে, সেই বীরভানুপুরের অনেকটা অংশই ব্যারেজের তলায় তলিয়ে গেছে। পাশাপাশি স্থাপিত হলো দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের অন্তর্গত ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। জাপান ও কানাডার আর্থিক সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হলো অ্যালয় স্টিল প্রজেক্ট, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে দুর্গাপুর প্রজেক্টস্ লিমিটেড, দুর্গাপুর কেমিক্যাল লিঃ, কোল মিলিং মেসিনারী প্ল্যান্ট। গড়ে উঠলো বয়লার, কয়লাখনির ও সিমেন্ট তৈরীর যন্ত্রপাতি তৈরীর ইঙ্গ-ভারতীয় উদ্যোগে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান এ.সি.সি., ভাইকার্স ব্যাবকক, ফিলিপস্ কার্বন, সানকী হুইলস্, এশিয়াটিক অক্সিজেন লিমিটেড, শিল্প গবেষণার প্রতিষ্ঠান সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কারিগরী উচ্চশিক্ষা প্রসারের জন্য রিজিওনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং সেন্টার, বিজ্ঞানকলা শিক্ষাকেন্দ্র, দুর্গাপুর সরকারী কলেজ, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান শ্রমিক মঙ্গল কেন্দ্র, ইস্পাত নগরীর হাসপাতাল, আমোদপ্রমোদ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কেন্দ্র, টুরিস্ট লজ, আর্ট গ্যালারী, মিউজিয়াম। পরে পশ্চাতে গড়ে উঠেছে ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন, সিমেন্ট কারখানা, গ্যাস প্ল্যান্ট আরও কমপক্ষে ১৮৩টি সহায়ক ক্ষুদ্রশিল্পের কারখানা। দুর্গাপুরে পাকা রাস্তা আছে ৪৪২.৪ কিমি আর এই রাস্তা হয়েছে মূলত যানবাহনের স্বার্থে, কিন্তু বাসিন্দাদের স্বার্থও উপেক্ষিত হয় নাই। রাস্তার পাশে করা হয়েছে প্রশস্ত ড্রেন, রাস্তার ধারে গড়ে উঠেছে কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, শাল, সেগুন, মেহগিনি নিয়ে সবুজের সমারোহ। জনসমাগম, যান-চলাচল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পথ দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বেড়ে যাচ্ছে। একথা চিন্তা করে রাস্তার দুপাশে পেভমেন্ট করে দিলে ভালো হতো।

দুর্গাপুরে নগরায়ণের ফলে এখানকার আদি বাসিন্দারা সব উৎখাত হয়েছে। অবশ্য ক্ষতিপূরণ পেয়েছে সবাই, বাসস্থানের জন্য অন্যত্র বাস্তুজমিও পেয়েছে, কারখানায় চাকরীও পেয়েছে কিছু লোক। কিন্তু পুনর্বাসনের সার্থক রূপায়ণ হয়েছে কিনা সে-প্রশ্ন থেকেই যায়। বাস্তুহারারা বাস্তুজমি পেয়েছে কিন্তু যে চাষের জমি হারালো সেটা কি পূরণ হয়েছে? চাষের বা কৃষি শ্রমিকের কাজে অনেক পরিবারের বিশেষত নিম্নশ্রেণীর পরিবারের বাড়ীর প্রায় সবাই নিযুক্ত থাকতো তারা কি সবাই কারখানায় কাজ পেল? অবশ্য একথাও ঠিক সমস্ত গৃহহারা মানুষের সমানভাবে সুষ্ঠু পুনর্বাসন সম্ভব নয়। উন্নয়নের জন্যে প্রকৃতিতে হস্তক্ষেপ করা যেমন অনিবার্য, আর তার ফলে কিছু মানুষের ক্ষতি বা অসুবিধাও

তেমনি অনিবার্য। তা না মানলে কোন উন্নয়নই সম্ভব নয়। সে যাই হোক এই যে গ্রামের পর গ্রাম ব্যারেজ, ক্যানেল ও শিল্পনগরী গ্রাস করল তার ফলে গৃহহারা মানুষের জীবনের ধারাটাই বদলে গেল—অর্থনৈতিক ও সামাজিক উভয় দিক থেকেই। নগরায়ণের পূর্বে যারা সবসময় লাঙল, জাল, কোদাল, কুড়ুল সম্বল করে কটিবাস পরে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতো, যাদেরকে বন আর বন্যা নিয়ে ঘর করতে হয়েছে, হিংস্র জন্তু ও দস্যু ঠ্যাঙাড়েদের আতঙ্কে প্রাণ হাতে করে দিনগত পাপক্ষয় করতে হয়েছে আজকে তারা প্যান্ট-শার্ট পরে বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলের টিপছাপ দিয়ে হপ্তা এনে হাড়িয়া খেয়ে বস্তি-জীবনযাপন করছে। অবশ্য মধ্যবিত্ত সমাজের সামান্য শিক্ষিত মানুষ অফিসে কেরানীর বা কারখানার টেকনিসিয়ানের কাজ পেয়ে কোয়ার্টারে বাস করছে তারা আর পাঁচজন সহকর্মীর সঙ্গে মিশে নিজেদের জীবনকে উন্নত করেছে। শিল্পনগরীতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের এমন কি বিদেশের বহুলোক চাকরী করতে এসেছে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে। কোয়ার্টারে জীবনযাপন করে গ্রামীণ সংকীর্ণতা, কুসংস্কার, জাতিভেদ প্রথা ঝেড়ে ফেলে এক composite cultureএর সামিল হয়েছে। নগরায়ণের ফলে অরণ্যবেষ্টিত জনবিরল অনগ্রসর অনুন্নত গ্রামীণ নিস্তরঙ্গ জীবনে এসেছে কর্মচাঞ্চল্যের জোয়ার, নিজেদের পারিবারিক জীবনের সার্বিক উন্নয়নের পথ পেয়েছে। বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, বিভিন্ন জাতির মানুষ নিয়ে দুর্গাপুর শিল্পনগরী এক অখণ্ড ভারতের বলিষ্ঠ রূপ ধারণ করেছে। দুর্গাপুর Notified Areaএর চারিপাশের গ্রামের মানুষের জীবনেও পরিবর্তন এসেছে।

প্রগতিশীল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে চাকরীসূত্রে যারা এখানে কোয়ার্টারের বাসিন্দা—তাদের আর্থিক অবস্থাও মোটামুটি স্বচ্ছল—একটা নির্দিষ্ট মাস-মাহিনা নিয়ে মোটামুটি স্বচ্ছল জীবনযাপন করে। ফলে এখানে ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বেশী। এখানে বাজারে বিক্রয় করলে ভালো দামও পাওয়া যায়। ফলে এখানের চাহিদা মেটাতে পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা অধিক উৎপাদনে উৎসাহী হয়েছে। শাকসব্জী, তরিতরকারী, ডিম, দুধ, ঘি, মাছের উৎপাদন বেড়েছে। এই সব জিনিস শিল্প-নগরীতে বিক্রি করে নিজেদের আয় বাড়িয়েছে। পূর্ণতর কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে। শিল্পনগরীর পাশের গ্রামের লোকেদের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে। এর অর্থনৈতিক তাৎপর্য অপরিসীম। গ্রামবাসীদের বর্ধিত আয় কৃষি উৎপাদনে বিনিয়োগ করার ফলে কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লবের সূচনা হয়েছে। আর একটা সামাজিক পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। যারা শিল্পনগরীতে কারখানায় চাকরীর সুযোগ পেয়ে কোয়ার্টারে বাস করছে তাদের একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন

ধরছে। এটা আর রোধ করা যাবে না। তবে এর ফলে গ্রামের সুপ্রাচীন অদৃষ্ট নির্ভরতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে ও বিজ্ঞান-নির্ভরতা, যুক্তি-নির্ভরতা বাড়তে থাকে। একটা সার্বিক উন্নয়নের পথ খুলে যায়।

আজ প্রায় ৪০ বছরে শিল্পনগরীর পরিকল্পনার পূর্ণ রূপায়ণ আশা করা গিয়েছিল—আশা করা গিয়েছিল এই ৪০ বছরে ভারতের রূঢ় সার্থকনামা হবে। কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে—পণ্ডিত নেহরু যে কর্মসংস্কৃতির প্রেরণা যুগিয়েছিলেন সে সংস্কৃতির শতকরা ২৫ ভাগও বজায় নাই, মাফিয়া চক্র ছেয়ে ফেলেছে, রক্ষীদের চোখের সামনে লরি লরি মাল পাচার হচ্ছে, সুপার কম্পিউটারের যুগে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি দ্বারা যেখানে জাপান, জার্মানি, আমেরিকা উৎপাদন খরচ হ্রাস করে অপেক্ষাকৃত অল্প দরে উৎকৃষ্ট মাল রপ্তানী করছে সেখানে দুর্গাপুর তার মান্ধাতা আমলের প্রযুক্তি ও কারিগরী জ্ঞান দিয়ে যে মাল তৈরী করছে তা বিদেশের মালের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারছে না। ফলে প্রায় প্রত্যেকটি কারখানায় দিন দিন লোকসানের বহর বেড়ে যাচ্ছে—ফলে অধিকাংশ কারখানাই ধুঁকছে—কিছু কিছু বন্ধও হয়ে যাচ্ছে। আরও একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। বড় ব্যারেজ নদীর স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ করে, বিকৃত করে নদীর রোষ জাগ্রত করে। ফলে তার কুফল দেখা দেয়। দামোদরের এই দুর্গাপুর ব্যারেজের ক্ষেত্রে এই কুফল দেখা যাচ্ছে। রুদ্ধ নদীর পাড় ভাঙছে, বুকে পলি জমছে—ব্যারেজের জলধারণ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে, ফলে ব্যারেজকে রক্ষা করার জন্য বর্ষায় লক্ষাধিক কিউসেক জল ছাড়তে হচ্ছে, তার ফল হচ্ছে বন্যা—এ-ও এক মনুষ্যসৃষ্ট বন্যা তবে অন্য অর্থে। কাজেই দুর্গাপুরের শিল্পকে বাঁচাতে, নদীর বুকে পলি তোলা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার সময় এসেছে। দুর্গাপুরকে নিয়ে জেলাবাসীর অনেক আশা অনেক আকাঙ্ক্ষা—দুর্গাপুরের শিল্প কাঠামো ভেঙে পড়লে জেলার অর্থনীতির ওপর চরম আঘাত পড়বে। আশা করি, কর্তৃপক্ষ সময় থাকতে দুর্গাপুরের পুনরুজ্জীবনের জন্য নতুন চিন্তা-ভাবনা করবেন।

দুর্গাপুরের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন নিয়ে ইতিমধ্যেই কতকগুলি নতুন প্রকল্প ঘোষিত হয়েছে। যেমন—ভারীশিল্পের দিকে লক্ষ্য রেখে কমলপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, সাবসিডিয়ারী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার জন্য ১৫০ একর অতিরিক্ত জমি বরাদ্দ, সিটি সেন্টারে স্টেডিয়াম, ডিয়ার পার্ক, লেক, টয়ট্রেন, অডিটোরিয়াম কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য নতুন উন্নয়ন প্রকল্প, আর একটি ডিগ্রি কলেজ প্রতিষ্ঠা। দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ১৪ এম.জি.ডি জল শোধনাগার প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য এক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। সিটি সেন্টারে গৃহনির্মাণ প্রকল্পের জন্য ১৩১ একর

জমি বরাদ্দ হয়েছে, বিধাননগরের উন্নয়নের জন্য ৬০ একর জমি বরাদ্দ হয়েছে। এছাড়া ট্রাক টারমিনার্স ও অডিটোরিয়াম নির্মাণের কথাও চিন্তা করা হচ্ছে। এই সব নতুন প্রকল্পের যদি সার্থক রূপায়ণ হয় তাহলে দুর্গাপুরের চেহারাটাই পাল্টিয়ে যাবে। তবে আমার মনে হয় নতুন প্রকল্পে হাত দেওয়ার আগে পুরাতনগুলির পুনরুজ্জীবনের দিকে নজর দিলে ভালো হতো।

দুর্গাপুর শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠার পর থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধারও অনেক উন্নতি হয়েছে। যেমন—ডিসপেনসারি আছে ২১টি, ১১৯ বেডযুক্ত হাসপাতাল ৭টি, কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শিক্ষার কলেজ ২টি, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ২টি, পলিটেকনিক ১টি, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯টি, মাধ্যমিক ১৩টি, জুনিয়ার হাইস্কুল ৫টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ১১৯, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ৬, ১০০ আসন বিশিষ্ট মহিলা হোস্টেল ১, স্টেডিয়াম ২, সিনেমা হল ৬টি, অতিরিক্ত নাট্যমঞ্চ ও কমিউনিটি হল ৮, পাবলিক লাইব্রেরি ১। ১৯৬৫ সালে যেখানে এখান থেকে একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হতো আজ সেখানে ২৩টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে হিন্দী সাপ্তাহিক ২টি, দৈনিক ১টি, ইংরাজী সাপ্তাহিক ১, সাঁওতালি ত্রৈমাসিক ১, বাংলা দৈনিক ১, সাপ্তাহিক ৬, পাক্ষিক ৫, মাসিক ১, ত্রৈমাসিক ৩, ষাণ্মাসিক ২। এখানে আছে সেই ২০০/২৫০ বছর আগেকার গোপীনাথ চাটুজ্যের প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দির ও ১৭১৫ শকাব্দে প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির।

সবই হয়েছে আরও হবে। তবুও রাজীব সান্যালের কথায় বলি—"যে পরিণতজনেরা এখানে এসেছেন তাঁরা সবাই কুশলী শিল্পশিক্ষায় নিষ্ণাত। এখানকার হাওয়ায় ও আলোয় সেই শিল্পসমুখ যন্ত্রেরই দাবী। সেই শিল্প যার মধ্যে আধুনিক পৃথিবীর সর্বসাধ্যসার শিক্ষার আসন পেতেছে। এই শহরের ধূলিকণা জুড়েও সেই শিক্ষারই আসন। কিন্তু আংশিকতার ও অপূর্ণতার অপরাধের আয়োজনও পাশে পাশেই, সার্বভৌম স্বাক্ষর অন্দরে অন্দরে। সেই কারণে যন্ত্রবিদের শয়নকক্ষে রবীন্দ্র রচনাবলী, শিল্পপল্লীর নাগালের মধ্যে রবীন্দ্র পাঠাগার।" এরপরেও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে দুর্গাপুরের কত উন্নয়ন হয়েছে। কিন্তু শিল্পসমুখ যন্ত্রের দাবি-ই মার খাচ্ছে—এই "অপূর্ণতার অপরাধের' প্রায়শ্চিত্ত করা আগে দরকার।" (সাপ্তাহিক দেশ, ৯/১/১৯৬৫)

শিল্পনগরী আসানসোল

আসানসোল মহকুমার প্রধান কার্যালয় আসানসোল শহর। ২৩.৪১ অক্ষাংশ ও ৮৬.৫৯ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত এই শহরের পৌর এলাকার আয়তন

২৫.০২ বর্গ কিমি। কিন্তু ১৮৯৭ সালে যখন এখানে মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয় তখন আয়তন ছিল মাত্র ৩.৭৩ বর্গ মাইল বা ৯.৭০ বর্গ কিমি আর লোকসংখ্যা ছিল ১১০০০। আর আজ ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুসারে এর লোকসংখ্যা ৭,৬৩,৯৩৯ অর্থাৎ ১০০ বছরে আয়তন বেড়েছে ১৫.৩২ বর্গ কিমি অর্থাৎ শতকরা ১৫৮, কিন্তু লোকসংখ্যা বেড়েছে ৭৫২৯৩৯ অর্থাৎ ৬৯.৫ গুণ। প্রতি ১০ বছরে জনবৃদ্ধির হারের তুলনামূলক বিচার করে দেখা যায় প্রতি ১০ বছরে জনসংখ্যাব গড় বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় শতকরা ২.৫, বর্তমানে জনসংখ্যার ঘনত্ব—৩৪৩০ ও জেলার জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৮৬১। আসানসোল শহর ও চারপাশে ভারী শিল্পের প্রতিষ্ঠান, আসানসোলে রেলওয়ের বিভাগীয় অফিস ও অন্যান্য সমস্ত বিভাগীয় অফিস গড়ে ওঠার ফলেই শহরে এই জন-বিস্ফোরণ।

আসানসোলের ভূপ্রকৃতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আদিতে এই অঞ্চল ছিল Promontory from central India censisting of rocky and rolling country, shut on the West, north and south by hills. মধ্য ভারতের শিলাময় উচ্চভূমি পূর্বে ক্রমশ ঢালু হয়ে জেলার পশ্চিমে এই অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। সে কারণে জেলার অন্য অঞ্চলের চেয়ে গ্রীষ্মে উষ্ণতা ও শীতে শৈত্য বেশী অনুভূত হয়। গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রী সেলসিয়াস আর শীতকালে সর্বনিম্ন ৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণও অপেক্ষাকৃত কম ১০৪১.১৪ মি.মি.। আবহাওয়া কিছুটা চরমভাবাপন্ন অর্থাৎ গ্রীষ্মে গরম বেশী শীতে শীত বেশী। প্রাচীনকালে এই অঞ্চল ছিল আসান, শাল, পিয়াশাল, সেগুন বৃক্ষের জঙ্গল। এই অঞ্চলে ছিল মূলত বাগ্‌দী, বাউড়ি, মালোদের বাস। যদিও এরা নিজেদের হিন্দু বলেই পরিচয় দিত কিন্তু আর্যবংশোদ্ভূত হিন্দুরা এদেরকে চোয়াড় আখ্যা দিত। জৈন আচারঙ্গসূত্র গ্রন্থে উল্লেখ আছে। —"মহাবীর (খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক) যখন পথহীন লাঢ় (রাঢ়দেশ) যজ্‌জভূমি ও সুব্‌ভভূমি (মোটামুটি দক্ষিণবঙ্গ) প্রচারোদ্দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিলেন তখন এই সব দেশের অধিবাসী তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। কতকগুলি কুকুরও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে কামড়াইতে আরম্ভ করে. কিন্তু কেহই এই কুকুরগুলিকে তাড়াইয়া দিতে অগ্রসর হয় নাই। বরং জৈন ভিক্ষুককে আঘাত করিতে আরম্ভ করে ও ছু ছু (খুক্‌থু) বলিয়া চিৎকার করিয়া তাঁহাকে কামড়াইবার জন্য কুকুরগুলিকে লেলাইয়া দেয়। (বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব—ড. নীহাররঞ্জন রায়)। ড. পঞ্চানন মণ্ডল বলেছেন—শ্রমণ ভগবান মহাবীর

তাঁর আর্হৎ দীক্ষা লাভের পূর্বে বারো বছরের কিছু বেশী সময় রাঢ় দেশে বিচরণ করেছিলেন ছদ্মনামে। কেবল দর্শন লাভের পরে প্রভু মহাবীর প্রথম তাঁর চৌমাসা পালনের পূর্বে অবস্থান করেছিলেন মোরাক সন্নিবেশ নামক একটি স্থানে। ড. মণ্ডলের মতে এই মোরাক সন্নিবেশ জৌগ্রামের নিকট দামোদরের পুরাতন কানসোনা বা কর্ণসুবর্ণ উপত্যকায় অবস্থিত ছিল। পক্ষান্তরে মুর্শিদাবাদের জেলায় মোর উপত্যকায় মোরদাবাদ সন্নিবেশ অনুমান করা যেতে পারে। এখানকার প্রাচীনতর বাসিন্দা অস্ট্রিক, কোল, ভীল। পরে এদের সরিয়ে 'কোম' ও বোড়ো গোষ্ঠীর জনসন্নিবেশ ঘটে।

এই দুই তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে 'আসানসোল শহরের ইতিকথা' প্রবন্ধে ড. সুশীল ভট্টাচার্যের 'স্বয়ং মহাবীর জৈন পায়ে হেঁটে জামুরিয়ার পথ ধরে দোমাহানীর চটিতে এসে কয়েকদিন বিশ্রাম করে কালিয়াজোড় বর্তমান নাম যাব কেলেজোড়ার পাশে এক গ্রামে এক সপ্তাহ বিশ্রাম নিয়েছিলেন ও অবহেলিত মানুষকে তাঁর অমৃতবাণী শুনিয়ে বিশ্রাম নিয়েছিলেন ও মানুষ ধন্য ধন্য করেছিলেন তাঁকে।" —এই বক্তব্য মেনে নেওয়া যায় না।

আসানসোল নামের উৎস হিসেবে বলা যায় প্রাচীন কালে এই অঞ্চল আসানগাছের জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর 'আরণ্যক' উপন্যাসে বিহারে মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেষ্টে এই রকম আসানগাছের উল্লেখ করেছেন। বঙ্গীয় শব্দকোষে 'সোল' বা 'শোল' শব্দের অর্থ সোলমাছ দেখা যায় আর সংসদ বাংলা অভিধানে 'সোল' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত উৎস সলিল অর্থাৎ জল। সেই অর্থে 'আসানসোল' কথার অর্থ দাঁড়ায় জলাভূমি বা নিম্নভূমি বেষ্টিত আসান বৃক্ষের জঙ্গল। কিন্তু ড. ভট্টাচার্য শোল অর্থে উর্বর জমি কোথা পেলেন জানি না।

সে যাই হোক, আসানসোল ও রানীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চল মধ্যযুগে শেরগড় পরগনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। (Shergarh—A large pargana in the Asansol subdivision which is practically counterminors with the Raniganj coal field—Peterson)। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান-রাজ চিত্রসেন এই পরগনা অধিকার করেন। শেরগড় পরগনার রাজধানী ছিল ডিহি শেরগড়—এখানে দামোদর তীরে একটি মাটির দুর্গ ছিল। এই দুর্গ তৈরী করেন পাঞ্চেতের রাজপুত বংশ। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ-এ শেরগড় কোম্পানীর অধিকারে আসে। ওয়ারেন হেস্টিংস এই শেরগড়ের পশ্চিমাংশ (আসানসোল অঞ্চল) কোম্পানীর অধিকার ভুক্ত করে ভারত ত্যাগ করার আগে তাঁর বিশ্বস্ত কান্তবাবুকে দিয়ে যান। (বর্ধমান

গেজেট—পিটারসন ১৯১০ Reprint 1997 Page 269 FN) ১৮৪৯ খ্রীঃ কলকাতা থেকে রানীগঞ্জ পর্যন্ত ১২০ মাইল রেললাইন মঞ্জুর হয় ও ১৮৫৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী রানীগঞ্জ পর্যন্ত ও রেল স্টেশনের উদ্বোধন হয়। ১৮৫৮ সালে হাওড়া থেকে ১৪১ মাইল রেলপথ বিস্তৃত হয় ও রানীগঞ্জ কয়লাখনি এলাকার মধ্যস্থলে বেঙ্গল নাগপুর ও ইষ্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের জংশন স্টেশন আসানসোলে প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে এখানে নানা শিল্পকারখানা সম্প্রসারিত হতে থাকে। এখানকার Locomotive shop ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ৯ জন কমিশনার নিয়ে প্রথম মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রানীগঞ্জ ছিল মহকুমা শহর। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ-এ মহকুমার অফিস আসানসোলে স্থানান্তরিত হয়। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড শহরের মাঝ বরাবর প্রসারিত। মহকুমা শহর গড়ে ওঠার পর একে একে সরকারী অফিস, কোর্ট কাছারি এখানে উঠে এলো। জি. টি. রোডের দক্ষিণে স্থাপিত হলো মহকুমা অফিস; দেওয়ানি আদালত প্রতিষ্ঠিত হলো শহরের ২ মাইল পশ্চিমে। ১৯০১ সালে ছোটনাগপুর মাউন্টেড রাইফেলস্-এর 'বি' ট্রুপের হেড কোয়ার্টার আসানসোলে তৈরী হয়।

১৮১৮ সালের পর থেকে এখানে ক্রীশ্চান মিশনারীদের কার্যকলাপ শুরু হয়ে যায়। রোমান ক্যাথলিক মিশনের চার্চ, কনভেন্ট ও স্কুল গড়ে ওঠে। মেথোডিস্ট এপিসকোপাল মিশন এখানে স্থাপন করে কুষ্ঠাশ্রম, অনাথ আশ্রম ও বালিকা বিদ্যালয়। আসাম চা-বাগানের জন্য জেলার বাইরে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কুলী সংগ্রহ করে এনে আসানসোলে জড় করা হতো। সে কারণে এখানে এমিগ্রেশন ডিপো গড়ে ওঠে। এটাই ছিল কুলীদের হল্টিং স্টেশন। এখান থাকে কুলীদের আসামে পাঠানো হতো।

১৯৬৫ সালের হিসেবে দেখা যায় আসালসোল মহকুমায় ২১২ টি কলিয়ারীর মধ্যে আসানসোল অঞ্চলেই ছিল ১২টি। এই ১২টি খনি থেকে ১০৪৪০০০ মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলিত হয়েছিল। ৯৪০০ জন শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছিল। ৩৫০টি বেডযুক্ত সেন্ট্রাল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হলো। আসালসোল থেকে ৭ মাইল দূরে স্থাপিত হয়েছে চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন কারখানা ও হিন্দুস্তান কেবলস্ লিমিটেড। আসানসোলের কাছেই কন্যাপুরে যুক্তরাজ্য (UK) ও পশ্চিম জার্মানীর সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে সেন ব্যালে কোম্পানীর বাইসাইকেল তৈরীর কারখানা। রানীগঞ্জ ও আসানসোলের মধ্যস্থলে জে. কে. নগরে স্থাপিত হয়েছে এ্যালুমিনিয়াম কারখানা। বর্তমানে আসানসোল

মিউনিসিপ্যালিটি গড়ে উঠেছে ১৫টি মৌজা নিয়ে। তবে বেশীর মৌজার অংশ মিউনিসিপ্যাল এলাকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই মৌজাগুলিকে নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটিকে ৩০টি Ward-এ ভাগ করা হয়েছে। মৌজাগুলি হলো— (১) গণরুই (J.L. 12 Part) (২) গোপালপুর (১8p) (৩) নডিহা (১৬P) (৪) পলাশডিহা (১৭p) (৫) গোবিন্দপুর (১৮p) (৬) আসানসোল (২০P) (৬) শীতলা (২১ P) (৭) দক্ষিণধাদকা (২৭ whole) (৮) নরসমুদা (৯P) (৯) গোপালপুর (১0p) (১০) কুমারপুর (১৯ p) (১১) কালিপাহাড়ি (৩৬ p) (১২) মহীশীলা (৩৭p) (১৯) সান্তা (২০ p) (১৪) নরসিংহ বাঁদ (২১P) (১৫) ইসমাইল (২২p) [বন্ধনীর মধ্যে জে. এল. নং এবং Part (P) বা whole লেখা আছে] মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার মোট জনসংখ্যা ২৬২১৮৮, তপসিলী জাতি ও উপজাতির সংখ্যা ২৩৯০৫। পাকারাস্তা ২৯০ কিমি, কাঁচা ১২০ কিমি। মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে আছে ৫৮০ বেড সমন্বিত ৩টি হাসপাতাল, ৪টি ডিসপেনসারী, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ৩, এখানে সীট সংখ্যা ১০, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র-১, টি. বি., ক্লিনিক-৮৬ বেড সমন্বিত ৩; অন্যান্য ২, বেড আছে ১৯৪, এছাড়া কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগের কলেজ ২, কলা ও বিজ্ঞানসহ কলেজ ১, পলিটেকনিক ২, শর্টহ্যান্ডটাইপ-এর প্রতিষ্ঠান ২, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৬, মাধ্যমিক ৩৪, জুনিয়র হাই প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮৮, মহিলা হোস্টেল ৩৬টি আসন বিশিষ্ট ১টি; স্টেডিয়াম, সিনেমা হল ৫, কমিউনিটি হল ১, পাবলিক লাইব্রেরী ৯। আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ADDA) আসানসোল শিল্পনগরীর উন্নয়নের জন্য কতকগুলি প্রকল্প ঘোষণা করেছেন। যেমন (১) কন্যাপুর শিল্পাঞ্চল। এখানে মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য ৩০টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিটকে জমি বরাদ্দ করা হয়েছে, তাছাড়া প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্যও জমি রাখা হয়েছে। (২) কল্যাণপুর স্যাটেলাইট টাউনশিপের প্রকল্প (KSTP)-এর জন্য ইতিমধ্যে ৬০ একর জমির উন্নয়ন ঘটান হয়েছে। বাসগৃহের জন্য বরাদ্দও সম্পূর্ণ হয়েছে। (৩) নিউ আসানসোল টাউনশিপ প্রজেক্টের স্যাটেলাইট টাউনশিপের জন্য কন্যাপুরে ১০০ একর জমি, ওয়েষ্ট বেঙ্গল হাউসিং বোর্ড-এর কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে ও মাস্টার প্ল্যানও তৈরী হয়ে গেছে। এগুলি ছাড়াও স্টেডিয়ামের উন্নয়ন, বাস টারমিনাস তৈরী করারও পরিকল্পনা আছে। একটা বিষয় লক্ষ্যণীয়। বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া মহকুমা অঞ্চলে প্রাচীন দেবদেবীর মন্দির, মসজিদ, মাজার-এর যেমন ছড়াছড়ি দুর্গাপুর ও আসানসোল মহকুমার

শিল্পাঞ্চলে কিন্তু প্রাচীন মন্দির মসজিদের রমরমা নাই। প্রাচীন মন্দির-সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া যায় কুলটি বরাকর নোটিফায়েড এরিয়ার মধ্যে, বরাকর ও বরাকর থেকে ৮ কিমি দূরে হালদা পাহাড়ের ওপর কল্যাণেশ্বরীতে। দুর্গাপুরে তো আছে গোপীনাথ চাটুজ্যে প্রতিষ্ঠিত কালিকাদেবীর মন্দির আর একটি শিবমন্দির। রানীগঞ্জে আছে সত্যনারায়ণ মন্দির ও মহাবীর রামসীতার মন্দির, তাও মন্দিরগুলি প্রাচীন নয়। আর আসানসোলে আছে মিউনিসিপ্যাল এলাকার বাইরে ঊষাগ্রামের কাছে পল্লী সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থানে নুনিয়া নদীর ধারে কাঙাল চক্রবর্তীর স্বপ্নেদেখা ঘাঘরা চণ্ডী, যার বিস্তৃত বিবরণ 'লৌকিক দেবদেবী' অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। আর আছে হটন রোডে ১৩১৮ সালে রাখাল চক্রবর্তীর প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণা কালিকা মন্দির। আগুরিপাড়ায় নাটমন্দির সহ নীলকণ্ঠেশ্বর শিবমন্দির আর নমোপাড়ার কাছে শ্মশানে ছিন্নমস্তার মন্দির—এটিও বেশী দিনের নয়, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। ছিন্নমস্তার বাৎসরিক পূজা হয় মাঘী পূর্ণিমার। আর ছড়িয়েছিটিয়ে আছে দামোদরজিউ, সত্যনারায়ণ মন্দির, হরিবোল মন্দির, গৌরাঙ্গ মন্দির।

এই যে শিল্পাঞ্চলে কোন প্রাচীন মন্দির মসজিদের অপ্রতুলতা দেখা যায় তার কারণ আমার মনে হয়, এ অঞ্চল ছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ঘন জঙ্গলে পূর্ণ, আদিম মানবগোষ্ঠীর বিচরণ ভূমি, বীরভানুপুরে যার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এ অঞ্চল বাগ্‌দী, বাউড়ী, মাল ও চোয়াড়ের বিচরণ ভূমি হয়ে ওঠে। শেরগড় পরগনা আফগান সম্রাট শেরশাহের স্মৃতি বহন করছে বলেই ঐতিহাসিকদের ধারণা। জামুরিয়া থানার চুরুলিয়ার প্রাচীন অধিবাসী ছিলেন মুসলমান আয়মাদার। এখানে দুটি দুর্গ ছিল—একটি পাথরের আর একটি মাটির; পাথরের-টি পঞ্চকোট রাজ নরোত্তমের নামাঙ্কিত। আয়মাদারদের অনেকে এই পাথরের দুর্গে বা দুর্গের পাথব দিয়ে ঘর তৈরী ঘরে বাস করতেন। দুর্গের পাথর দিয়ে মসজিদও নির্মাণ করেছিলেন। অন্য দুর্গটি মাটির; আজ আর এ সবের কোন চিহ্ন নাই।

বরাকর থেকে মাইল পাঁচেক দূরে হালদা পাহাড়ে প্রায় ৫০০/৬০০ বছর আগে পঞ্চকোট-রাজ কল্যাণেশ্বরী মন্দির নির্মাণ করেন। প্রবাদ এই পঞ্চকোট-রাজ সেনপাহাড়ীর গোপভূমরাজ লাউসেনের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। বরাকরেও পাঁচটি প্রাচীন শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এদের মধ্যে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত; একটির মধ্যে রাজা হরিশ্চন্দ্রের নাম ক্ষোদিত; এই মন্দির দুটির

স্থাপত্যশৈলীতে জৈন প্রভাব বর্তমান। হরিশ্চন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে আছে তিনটি লিঙ্গ ও পাদদেশে গণেশমূর্তি। অন্যটিতে আছে চারটি লিঙ্গ ও অর্ঘ্যস্বরূপ শায়িত মৎস্যমূর্তি। একটি মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী বেগুনাকৃতি। সেকারণে স্থানীয় লোকের কাছে বেগুনিয়া মন্দির নামে খ্যাত। এই হরিশচন্দ্র রাজা কোন শতাব্দীর সেটা জানা যায় না। তবে কল্যাণেশ্বরী মন্দির, চুরুলিয়ার নরোত্তম দুর্গ থেকে অনুমান হয় ইনিও পঞ্চকোট-রাজবংশোদ্ভূত। কারও কারও মতে তিনি সেনপাহাড়ীর গোপভূমের কোন রাজা হতে পারেন।

সে যাই হোক এ সমস্ত আলোচনা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে এ অঞ্চলে প্রথমে আয়মাদারদের আধিপত্য গড়ে ওঠে এবং পরে পঞ্চকোটরাজ ও গোপভূমের গোপরাজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এঁদের কাছ থেকে বর্ধমানরাজ চিত্রসেন এ অঞ্চল দখল করেন। তারপর রানীগঞ্জে কয়লাখনি আবিষ্কারের পর থেকে এ অঞ্চলে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও মিশনারীদের অনুপ্রবেশ ঘটে। সে কারণে এখানে বরাকর কল্যাণেশ্বরী ছাড়া কোন প্রাচীন মন্দির বা মসজিদ গড়ে ওঠে নাই। রানীগঞ্জ-আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলে একদিকে শিল্প সমুহ যন্ত্রের দাবী ও অন্য দিকে মিশনারীদের কার্যকলাপ এই উভয়ের প্রভাবে ইউরোপীয় বস্তুতান্ত্রিকতার অনুপ্রবেশ ঘটতে বাধ্য। আর সেই বস্তুতান্ত্রিকতার জোয়ারে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা পিছু হটছে ও এই অঞ্চলেরই পল্লীসংস্কৃতির মধ্যে আশ্রয় নিচ্ছে। প্রকৃত শিল্পাঞ্চলে ধর্মসম্বন্ধে একটা tepid enthusiasm জাগ্রত হচ্ছে। তবে এ কথা ঠিক শিল্পের দাবী মেটাতে গিয়ে সংস্কৃতির দাবী উপেক্ষিত হয় নাই। তাই কলকারখানা গড়ে ওঠার পাশে সমস্ত শিল্পনগরীতে গড়ে উঠেছে সংস্কৃতি মঞ্চ, Auditorium, community hall, stadium, indoor game-এর ব্যবস্থা। আসানসোল থেকেই প্রকাশিত হচ্ছে ২টি দৈনিকপত্র (বাংলা), ৭টি বাংলা সাপ্তাহিক, ১টি হিন্দি সাপ্তাহিক, ৪টি পাক্ষিক বাংলা, একটি মাসিক বাংলা, ২টি ত্রৈমাসিক বাংলা ও একটি ষাণ্মাসিক বাংলা।

আসানসোল শিল্পাঞ্চলে গড়ে উঠেছে প্রায় তেরটি নাট্যসংস্থা এদের মধ্যে আসানসোলে আছে 'সতীর্থ', বলাকা, রূপকার, হরিপুর খাসকেন্দায় নক্ষত্র, চিত্তরঞ্জনে—নাট্যরূপা, অযান্ত্রিক, পরবাস, বার্নপুরে 'দিশারী', অগ্নিবীণা সাংস্কৃতিক চক্র, কুলটিতে আছে মিতালী গোষ্ঠী, রানীগঞ্জ সিয়ারসোলে 'কিশলয় নাট্যগোষ্ঠী', জামুরিয়ায় 'চেনামুখ'।

আধুনিক যুগের দাবী মেনে শিল্পাঞ্চলে এই ভাবে নতুন যুগের অভ্যুদয়। পরিবর্তন এসেছে অর্থনীতি, সমাজ সংস্কৃতি ও ধর্মের অঙ্গনে। এ পরিবর্তন অনিবার্য আর এর জন্যে আক্ষেপ করাও বৃথা। তবে একথা ঠিক যতই বস্তুতন্ত্রবাদের অনুপ্রবেশ ঘটুক—এদেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতাকে গ্রাস করতে পারবে না। একটা সমন্বয় ও স্বীকরণ অনিবার্য, সেদিন বেশী দূরে নয়।

দেবদেবীর পীঠস্থান বর্ধমান। মুসলমানদের জন্য আছে পীরবাহারাম সক্কা, খক্কর সাহেবের মাজার, জেলার যত্রতত্র মসজিদ পীরস্থান। কত কবি কত সাহিত্যিক তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁদের মঙ্গলকাব্যে, কত বৈষ্ণব কবি তাঁদের চরিত কাব্যে—

হেথা কাশীরাম অমৃত সমান প্রচারিল মহাভারতমন্ত্র
বাঙ্গালী জাতির একাধারে বেদ-সংহিতা-স্মৃতিপুরাণতন্ত্র।

তাই বর্ধমান জানায় আহ্বান—

এসো সুধীগণ, মানস-মোহন, এসো বাংলার পুণ্যক্ষেত্রে,
চাহ ভারতী মিলন-ভবনে প্রেম ছলছল উজ্জ্বল নেত্রে।

শহর বর্ধমান :

শহর বর্ধমান ২৩.০৪ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে ৩৫টি পৌর ওয়ার্ডে ছড়িয়ে আছে। শহরেই রয়েছে কত দেবস্থান, কত পীরস্থান গীর্জা ও গুরুদ্বার। সমস্ত স্থানের পরিচয় দেওয়া এই ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি স্থান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি। এত বড় এলাকা একদিনে পর্যটনও সম্ভব নয়। পায়ে হেঁটে তো নয়ই, রিক্সা, অটো রিক্সা, ট্যাক্সিতেও নয়।

মনে হয় পর্যটকের পক্ষে নিজ পছন্দমত যানবাহনের সঙ্গে ঘন্টা হিসেবে চুক্তি করে পর্যটনই যুক্তিযুক্ত।

দেবী সর্বমঙ্গলা :

"রাঢ় মধ্যে পুণ্যনাম হল বর্ধমান
সর্বমঙ্গলাকে নিয়ে যার যশোগান।"

কিংবা রূপরামের কথায় :

বর্ধমানে বন্দো দেবী সর্বমঙ্গলা
অধিষ্ঠান হল দেবী ঠিক দুপুরবেলা।

সর্বমঙ্গলা প্রাচীন শাক্তদেবী। অসুরনাশিনী দেবী শক্তিরই অন্যরূপ। দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, অভয়দায়িনী অভয়া, মঙ্গলকারিণী সর্বমঙ্গলা।

বড় বাজার, ভাতছালা ও তৈলমারুই-এর সংযোগস্থলে সর্বমঙ্গলা পাড়ায় বাঁকা নদীর উত্তরে সুপ্রাচীন বৃহৎ নাটমন্দির সমন্বিত টেরাকোটা দুর্গাপ্যানেল খচিত নবরত্ন মন্দিরাভ্যন্তরে রৌপ্যমণ্ডিত সিংহাসনে সিংহবাহিনী অষ্টাদশভুজা ১১ ইঞ্চি x ৮ ইঞ্চি কষ্টিপাথরে খোদিত মহিষাসুরমর্দিনী দেবী সর্বমঙ্গলা। মূর্তির

গঠনশৈলী পালযুগের বলেই অনুমান হয়। দেবীর আদি ইতিহাস রহস্যাবৃত। প্রবাদ, বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন সতীর নাভিমূল পড়েছিল বর্তমান মন্দির-স্থানে। কিন্তু প্রবাদ প্রবাদই; এর নেই কোন শাস্ত্রীয় সমর্থন নাই। যদিও পুরোহিতগণ দর্শনাকাঙ্ক্ষীদের কিছু দক্ষিণার বিনিময়ে দেখায় দেবীর আদিমূর্তি রূপে কথিত বর্তুলাকার স্ফটিকমূর্তি।

কিংবদন্তী—বাহির সর্বমঙ্গলাপাড়ায় চুনুরীপুকুরে গুগলি ধরার সময় দেবীর বর্তমান মূর্তি ও বর্তুলাকার স্ফটিকমূর্তি চুনুরী (জাতিতে বাগ্‌দী)-দের হাতে উঠে আসে। বর্তুলাকার মূর্তি দেখে খুব সম্ভব ধর্মরাজরূপে বাগ্‌দীদের দ্বারাই পূজিতা হতে থাকেন। পরে মহারাজ কীর্তিচাঁদ (১৭০২–১৭৪০) সংবাদ পেয়ে স্বয়ং তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন ও প্রথমে কাঞ্চনগরের জোড়বাংলা মন্দিরে ও পরে বর্তমান মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম কোণে বিল্ববৃক্ষতলে অস্থায়ী মন্দিরে স্থাপন করেন। পরে মিত্রেশ্বর, রামেশ্বর ও বাণেশ্বর শিবমন্দিরের পূর্ব প্রান্তে বিরাট নাটমন্দির ও নবরত্নমন্দির নির্মাণ করে সেখানেই স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিদিন দেবীকে প্রাতে সরবৎ নিবেদনের পর হয় দেবীর মঙ্গলারতি। পূর্বাহ্ণে ষোড়শোপচারে পূজা, মধ্যাহ্নে পঞ্চব্যঞ্জনসহ আতপান্নের ভোগ, সন্ধ্যায় শীতল ও সন্ধ্যারতির পর শয়ন। আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার সময় ও চৈত্র মাসে বাসন্তী পূজায় ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত দেবীর মহাপূজা ও বলিদান। আশ্বিনে দুর্গাষ্টমীতে সন্ধিপূজার সময় অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে বলিদানের সময় কামান দেগে প্রচারিত হতো সন্ধিক্ষণ। সম্প্রতি বছর তিন আগে ১৯৯৭ সালে কামানদাগার সময় কামানে বিস্ফোরণ হয়ে কামান ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় এই প্রথা নিষিদ্ধ হয়েছে। মহানবমীতে হয় মহিষ বলিদান।

সে যাই হোক, বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা প্রকৃত অর্থেই বর্ধমানেশ্বরী। কখনও পূজিতা হন শ্বেতাননা নীলভুজা সুশ্বেত স্তনযুগলা মহিষাসুরমর্দিনী ধ্যানে, আবার কখনও পূজিতা হন আদিত্যমণ্ডল-নীলা কোটি-সূর্য সমপ্রভা ধ্যানে। সর্বদেবদেবীর তিনি একীভূতারূপ। নতুন খাতা মহরৎ থেকে শুরু করে ষষ্ঠীপূজা, মাকালপূজা, রাধাষ্টমী, নবান্ন যে কোন পূজাতেই মায়ের কাছে পূজা দিলেই ভক্তের মনস্তুষ্টি হয়। মায়ের ভোগেই হয় নবজাতকের অন্নপ্রাশন, দ্বিজাতিরা মায়ের কাছে যজ্ঞোপবীত ধারণ করে সাবিত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হন। প্রেমিক-প্রেমিকা মা-কে সাক্ষী রেখে মালা বদল করে নবজীবন শুরু করে, এমন কি নতুন গাড়ী কিনে মায়ের কাছে পূজা দিলেই গাড়ী চালাবার ফাইন্যাল লাইসেন্স মিলবে বলেই ভক্তের বিশ্বাস। সর্ববাঞ্ছাদায়িনী শুভদা বরদা দেবী জাতিধর্মনির্বিশেষে সবার মা সর্বমঙ্গলা।

দেবী মন্দিরের বাইরে উত্তর দিকে মহতাব চাঁদের কন্যা ধনদেয়ী দেবী (স্বামী গোপীনাথ মেহেরা) প্রতিষ্ঠিত ধনেশ্বরী দেবী ও ধনেশ্বর শিব। মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৯৬ শক ২রা আষাঢ়। সপ্তমী থেকে লক্ষ্মীপূজা পর্যন্ত নবরাত্র উপলক্ষে দেবীর বিশেষ পূজা হয়।

দেবী ভৈরবেশ্বরী : সর্বমঙ্গলা মন্দিরের ঠিক পশ্চিমে মিদ্যাপুকুরের উত্তর পাড়ে একটা গলির মধ্যে এক ভগ্নজীর্ণ মন্দিরে ভৈরবেশ্বরী কালীমন্দির। এখানে প্রতিষ্ঠিত আছেন সম্পূর্ণ নিমকাঠের প্রায় চার ফুট উঁচু দক্ষিণা কালীমূর্তি—মূর্তিটির মুণ্ডমালা ও পদতলে শবরূপে শায়িত মহাদেব সমস্তই এই নিমকাঠের তৈরী। মূর্তিটির বর্তমান সেবাইত প্রায় অন্ধ উমাকান্ত ভট্টাচার্যের কথায় প্রায় ৩০০ বছর আগে মূর্তিটি বর্ধমান রাজবংশের জনৈক নিঃসন্তান ভৈরবনাথ কাপুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এরূপ দুর্লভ মূর্তি অনুরূপ নিমকাঠের কালিকামূর্তি আছে কালনায় সিদ্ধেশ্বরী কালিকামূর্তি। চৈতন্যোত্তর যুগে নিমকাঠের রাখালরাজের মূর্তি, কাটোয়ার গৌর-নিতাই মূর্তি, কৈয়রের বেদগর্ভ সেবিত লক্ষ্মীজনার্দন, মদনগোপাল ও বিজয়গোপাল-এর মূর্তি ও বোড়র বলরামের দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হলেও নিমকাঠের কালিকামূর্তি এই ভৈরবেশ্বরী ও সিদ্ধেশ্বরী মূর্তি ছাড়া শক্তিদেবীর অন্য কোন দারুমূর্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। দারুশিল্পের এই দুর্লভ নিদর্শন। আজ প্রচারের অভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালেই রয়ে গেল।

দেবী কঙ্কালেশ্বরী : কাঞ্চননগরের এক প্রান্তে জোড়বাংলা পদ্ধতিতে টেরাকোটা অলংকরণে গঠিত দেবী কঙ্কালেশ্বরীর মন্দির এর প্রাচীনত্বের পরিচায়ক। এই নবরত্নমন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা দেবীর মূর্তি স্থাপত্য শিল্পের বিরলতম নিদর্শন। ৬ ফুট উচ্চ—অষ্টভুজা কঙ্কালরূপিণী কঙ্কালেশ্বরী চামুণ্ডা মূর্তি। মূর্তিটি নাকি সুদীর্ঘকাল ধরে দামোদরের বালির গর্ভে নিমজ্জিতা ছিল। সামনের দিকটা মাটিতে পুঁতে থাকায় স্থানীয় ধোপারা এটিকে সাধারণ পাথর ভেবে কাপড় কাচার পাটা রূপে ব্যবহার করতো। ১৩২৩ সালে সর্বপ্রথম এক রাজ কর্মচারীর দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। তিনি এটিকে উদ্ধার করে স্থানীয় রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে নিয়ে যান। পরে স্বামী কমলানন্দ পরিব্রাজক মূর্তিটিকে রাধাকৃষ্ণের মূর্তির পাশে প্রতিষ্ঠা করেন। মূর্তিটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিকষ কালো পাথরের। মূর্তির মধ্যে মানবদেহের কঙ্কাল, শিরা, উপশিরা, ধমনী সমস্ত ক্ষোদিত। মূর্তিটির মস্তকভাগের উপরে ক্ষোদিত একটি হস্তী ও পদতলে শায়িত দেবাদিদেব কালভৈরব। নৃমুণ্ডমালিনী এই ভয়ঙ্করী মূর্তির যিনি ভাস্কর, শারীরবিজ্ঞানে (Anatomy) তাঁর ব্যুৎপত্তি

অনস্বীকার্য। মন্দির-সংলগ্ন বিল্বকুঞ্জে তন্ত্রসাধনার জন্য পঞ্চমুণ্ডীর আসন। বহু তান্ত্রিক সাধক সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য এই পঞ্চমুণ্ডীর আসনে সাধনা করেন। পাবলিসিটি ও ঢাক পিটানোর দৌলতে কাশীর অন্নপূর্ণা, মহীশূরের চামুণ্ডা বা জম্মুর বিষ্ণুদেবীকে দর্শনের জন্য পুণ্যার্থীদের মাইলব্যাপী লাইন পড়ে, আর প্রাচীন স্থাপত্যের বিরল নিদর্শন শিরা-উপশিরা-ধমনী সমন্বিতা নৃমুণ্ডমালিনী ভয়ঙ্করী চামুণ্ডা কঙ্কালেশ্বরী প্রচারের অভাবে কাঞ্চননগরের এক প্রান্তে আত্মগোপন করে আছেন।

অন্যান্য শক্তিদেবী : কাঞ্চননগর থেকে সামান্য একটু এগিয়ে গেলেই বাম দিকে লাকুড়ডি পল্লীতে শ্মশানে অধিষ্ঠিতা আছেন শিলাময়ী দুর্লভা কালী, অনেকে এটিকে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের কালী বলে মনে করেন। এছাড়া তেজগঞ্জের দক্ষিণ অংশে একটি দালানমন্দিরে অধিষ্ঠিত আছেন মহারাজ তেজচন্দ্র প্রতিষ্ঠিতা শিলাময়ী কালীমূর্তি, নিকটেই নাটমন্দিরসহ চারচালা মন্দিরে একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর অধিষ্ঠিত আছেন বৃষবাহনসহ ক্ষোদিত কালভৈরব মূর্তি।

বোরহাটে আছে সাধক কমলাকান্ত প্রতিষ্ঠিত কমলাকান্তের কালীমূর্তি। বীরহাটায় আছে ডাকাতে কালী বলে খ্যাত ১০/১২ ফুট উঁচু বিরাট মৃণ্ময়ী কালীমূর্তি।

রাজপ্রাসাদের কাছারী বাড়ীর কাছে লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ-এর মন্দিরের চত্বরে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে রক্ষিত আছে রাজপরিবারের কুলদেবী শিলাময়ী চণ্ডিকামূর্তি।

মিঠাপুকুরে মহারাজ মহতাবচাঁদের দ্বিতীয় মহিষীর নারায়ণী শক্তি বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিতা আছে সোনার কালীমূর্তি। নিকটেই দুটি পাশাপাশি মন্দিরে আছে অষ্টধাতুর দশমহাবিদ্যার অন্যতমা ভুবনেশ্বরী কালিকামূর্তি ও পাশে পঞ্চমুণ্ডীর আসন আর আছে মহাদেবের মূর্তি। ৪নং ইছলাবাদে পুলিশ লাইনের কাছে দ্বিভুজা দিগম্বরী ছিন্নমস্তার মূর্তি খয়েরী শ্বেতপাথরের মন্দিরে (১৪০৩ সাল) প্রতিষ্ঠিতা।

বর্ধমানেশ্বর : আলমগঞ্জের ভিখারী বাগানে ১৩৭০ সালের ২৫ শে শ্রাবণ একটি ঢিবি খননের সময় আবিষ্কৃত হয় একটি বিরাট শিবলিঙ্গ ও একটি বিষ্ণুমূর্তি। এর কয়েক বৎসর পরে বাঁকা নদী সংস্কারের সময় নির্মল ঝিলের কাছে আবিষ্কৃত হয়েছে এক টন ওজনের কালো পাথরের বিরাট ষাঁড়ের মূর্তি। পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি উচ্চ সাড়ে আট ফুট ব্যাসবিশিষ্ট ও ১৮ ফুট গৌরীপট্ট সমন্বিত এই বিরাটকায় বৃদ্ধ শিবই বর্ধমানেশ্বর। অনেকের মতে এই শিবলিঙ্গ ছিল মনসামঙ্গল খ্যাত চাঁদ সদাগরের প্রতিষ্ঠিত শিব।

পীরবাহারাম ও শের আফগানের সমাধি : ময়ূরমহলের দক্ষিণে পীর-বাহারামে বীরশ্রেষ্ঠ আফগান সুলতান শের আফগান প্রিয়তমা পত্নী মেহেরুন্নিসাকে নিয়ে বাস করতেন। মুঘল শাহজাদা সেলিম দিল্লিতে মেহেরুন্নিসাকে দেখে তাঁর প্রতি প্রণয়াসক্ত হন। কিন্তু সম্রাট আকবর তাঁদের স্বীকৃতি না দিয়ে মেহেরুন্নিসার সঙ্গে বাংলার সুবাদার শের আফগানের বিবাহের ব্যবস্থা করেন। আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর সম্রাট হয়েই মেহেরুন্নিসাকে লাভ করার জন্য তাঁর সম্পর্কিত ভ্রাতা কুতুবুদ্দিনকে বর্ধমান পাঠান শের আফগানকে বন্দী করে আনবার জন্য। ফলে ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ কুতুবুদ্দিন ও শের আফগানের যে যুদ্ধ হয় তাতে উভয়েই প্রাণ হারান। পীরবাহারাম চত্বরে উভয়কেই পাশাপাশি সমাধিস্থ করা হয়।

এই সমাধির অদূরেই রয়েছে পীরবাহারাম সক্কার সমাধি। এই বাহারাম সক্কা ছিলেন পারস্যের তাব্রিজ শহরের মানুষ। বায়াত বংশোদ্ভূত, এর পূর্ব নাম ছিল শাহওয়াদি বায়াত। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মক্কার তীর্থপথে ভিস্তি কাঁধে তীর্থযাত্রীদের জলদান করতেন বলে তিনি সক্কা নামে পরিচিত হন। ভারতে এসে তিনি আগ্রায় দীর্ঘ দিন অবস্থান করতেন, তিনি ছিলেন আকবরের গুরুস্থানীয়। এই ধর্মপ্রাণ মুসলমান সিংহল যাবার পথে বর্ধমানে আসেন ও পুরাতন চকে যোগী জয়পালের আস্তানায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর সাহচর্যে যোগী জয়পালও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন ও দীন মহম্মদ নামে পরিচিত হন। বাহারাম শহরে অবস্থানের তৃতীয় দিবসে বাহরাম ইহলোক ত্যাগ করেন। শের আফগানের সমাধির অদূরেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। সম্রাট আকবরের নির্দেশে তাঁর সমাধির ওপর তাঁর স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়। প্রতি বৎসর চান্দ্রমাসে ২২ হতে ২৪ রজব হজরত পীরবাহারাম সক্কার উরস মোবারক উৎসব পালিত হয়। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। যোগী জয়পালের সমাধি বাহারামের সমাধির একশ মিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে।

কালো মসজিদ : পুরাতন চক এলাকায় পায়রাখানা রোডের দক্ষিণ পার্শ্বে কালো মসজিদ। মসজিদের রঙ কালচে হওয়ায় নাম হয়েছে কালো মসজিদ। মসজিদের ক্ষোদিত লিপি থেকে জানা যায় সম্রাট শেরশাহের আমলে এই মন্দির নির্মিত হয়।

রাজবাড়ীর পিছনে খক্কর সাহেবের মাজারের বিপরীতে ঔরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম-উশ-শানের রাজত্বকালে নির্মিত তিন গম্বুজবিশিষ্ট জুম্মা মসজিদ এক ঐতিহাসিক নিদর্শন।

খক্কর সাহেবের মাজার : পীরবাহারাম সক্কারও পূর্বে কাবুল থেকে বর্ধমানে আসেন খক্কর সাহেব, এতদঞ্চলে ইসলামের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে। তাঁর দেহত্যাগের পর তাঁর মৃতদেহ কবরস্থ করা হয় বর্তমান মহতাব মঞ্জিলের যে স্থানে মোগলদের দুর্গ ছিল তারই পাশে। পরে যখন মহতাব মঞ্জিল নির্মিত হয় তখন খক্কর সাহেবের সমাধিক্ষেত্র প্রাচীর বেষ্টিত করে রাখা হয়। বর্ধমান রাজবংশের প্রথম পুরুষ আবু রায় থেকে শেষ মহারাজ উদয়চাঁদ মহতাব পর্যন্ত সকলেই কোন শুভ কাজ আরম্ভ করার পূর্বে খক্কর সাহেবের মাজারে এসে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। একটি সরু সুড়ঙ্গ দিয়ে খক্কর সাহেবের মাজারে উপস্থিত হতে পারা যায়। প্রতি বৎসর ১৭ই ফাল্গুন খক্কর সাহেবের উরস উৎসব পালিত হয়। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই খক্কর সাহেবের মাজারে সিরনি নিবেদন করেন।

খাজা আনোয়ার বেড়ের নবাব বাড়ী : মহারাজ কৃষ্ণরাম রায় শোভা সিংহেব সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হলে বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন শাহজাদা আজিম-উশ-শান। এই সময় রহিম খানের নেতৃত্বে বিদ্রোহী দল বর্ধমানের উপকণ্ঠে হাজির হন। শাহজাদা রহিম খানের সঙ্গে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করার প্রস্তাব দেন। রহিম শাহজাদার প্রস্তাবে রাজী হয়ে প্রস্তাব করেন শাহজাদার উজির তাঁর শিবিরে এসে যদি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন, তাহলে তিনি সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করবেন। শাহজাদার উজির খাজা আনোয়ার রহিম খানের দুরভিসন্ধি অনুমান করতে না পেরে অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে রহিম খানের শিবিরের দ্বারে উপস্থিত হন। কিন্তু আনোয়ার শিবিরে উপস্থিত হলে তাঁকে অভ্যর্থনা না করায় সেখান থেকে তিনি রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু হঠাৎ রহিম খান সসৈন্যে তাঁর পশ্চাদ্ধারন করেন। প্রাসাদের নিকট রহিমের সৈন্য কর্তৃক আনোয়ার পরিবেষ্টিত হন। ফলে যুদ্ধে আনোয়ার শহীদের মৃত্যুবরণ করেন।

সম্রাট ফারুক শিয়ারের নির্দেশে ১৩১৫ হিজরী পোদ্দারহাট মৌজায় (বর্তমান খাজা আনোয়ার বেড় অঞ্চল) তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। ১০ বিঘা জমির উপর চতুর্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত পুষ্করিণী, হাওয়ামহল ও ইমামবাড়ী সমন্বিত ৫০ ফুট উচ্চ স্মৃতিস্তম্ভসহ খাজা আনোয়ার, আবুল কাশেম ও সার্বরি হোসেনসহ তাঁদের সঙ্গীদের সমাধি নির্মাণ করা হয়। সমাধিক্ষেত্রটি মোগল স্থাপত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। প্রতি বৎসর ১লা মাঘ এখানে মেলা বসে ও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু পুণ্যার্থীর সমাগম হয়।

নবাববাড়ী ও সমাধি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয় খাজা আনোয়ারের কন্যা ও তাঁর বংশধরদের ওপর। প্রবেশপথে নবাববাড়ীতে বাস করতেন কন্যার

বংশধরেরা। বর্তমানে এই বংশের বংশধর অশীতিপর বৃদ্ধ সৈয়দ মহম্মদ হোসেন ও তাঁর পুত্রেরা বাস করছেন। নবাববাড়ীর সামনে আছে একটি দীঘি। দীঘির মধ্যে হাওয়ামহল—দীঘির পশ্চিম পাড় থেকে সেতু দ্বারা এই হাওয়ামহল যুক্ত। হাওয়ামহলের চারদিকে খোলা ছোট্ট কুঠুরীতে নবাববাড়ীর সৌখিন মানুষেরা জ্যোৎস্না-রাত্রে জলসা বসাতেন,—সকাল সন্ধ্যায় বেগমরা হাওয়া খেতে আসতেন। দীঘির পশ্চিমে তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ। মসজিদের দক্ষিণে ছিল বেগমমহল—বর্তমানে তার কোন চিহ্ন নাই। দীঘির পূর্ব প্রান্তে ছিল ইমামবাড়ী—সেটির নিদর্শনও অবলুপ্ত। দীঘির দক্ষিণে ৫০ ফুট উচ্চ স্মৃতিস্তম্ভ-বিশিষ্ট খাজা আনোয়ারের সমাধি। এর ঠিক পূর্বে আবুল কাশেম ও পশ্চিমে সার্বার হোসেনের সমাধি। এঁরা আনোয়ারের সহযোগী ছিলেন ও তাঁর সঙ্গেই যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করেন। পাশের কক্ষে ও সমাধি-ভবনের বাইরের চত্বরে আরও অনেক সমাধি আছে। আনোয়ারের সমাধির ঠিক মাথার ওপরে ছাদে ছিল তিনটি বাতি। বাতি তিনটির মূল্যবান কাচের বাল্‌বের ভিতর ছিল ফসফরাস জাতীয় কিছু পদার্থ—যার ফলে রাত্রে বাতি তিনটি জ্যোতি দান করে সমাধিকক্ষকে আলোকিত করতো। কিন্তু বর্তমান বংশধর সৈয়দ মহম্মদ হোসেনের কাছে জানা গেল, গত মহাযুদ্ধের সময় ২টি বাতি নষ্ট হয় ও ২০০০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে প্রবল বৃষ্টির সময় সমাধি-ভবনে বজ্রপাত হওয়ায় তৃতীয় বাতিটিও ভেঙে পড়ে। ভেঙে পড়ার পর ফসফরাস জাতীয় সাদা গুঁড়োর মত কিছু দ্রব্য ছড়িয়ে পড়ে। আগে যখন গাইড ছিল সে পর্যটকদের কাছে এই বাতিকে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর ডিম বলে প্রচার করতো—আরও প্রচার করতো যে এই 'ডিম' যেদিন ভেঙে পড়বে সেদিন দেশ ধ্বংস হবে। "ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর ডিম" (বাতি) ভেঙে পড়েছে কিন্তু দেশ ধ্বংস হয় নাই। গাইড অবশ্য এখন নাই। এখনও অনেক পর্যটক আসেন। ১লা মাঘ প্রতি বৎসর পূর্বাহ্ণে সমাধির নিকট হাজার হাজার মহিলা মনোগত বাসনা চরিতার্থের প্রার্থনা জানিয়ে সিন্নি নিবেদন করেন ও নিবেদিত সিন্নি নিকটস্থ দামোদরে ভাসিয়ে দেন। বিকালের দিকে হাজার হাজার পুরুষ পর্যটক আসেন।

নবাববাড়ী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মূল তায়দাদে ৭টি মৌজার মালিকানা স্বত্ব দেওয়া ছিল—এর থেকে রাজস্ব পাওনা ছিল তিনশত একুশ টাকা পাঁচ আনা চার পাই। বর্তমান বংশধর সৈয়দ হোসেন সাহেবের কথায় ১৯৭২ সন পর্যন্ত তাঁরা সরকার থেকে নবাব বাড়ীর জমিদারী অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ পেতেন। কিন্তু বর্তমান সরকার সমস্ত বন্ধ করে দিয়েছে। তায়দাদে ভুক্ত মৌজাগুলি হলো পোদ্দারহাট (খাজা আনোয়ার বেড়), ইদিলপুর ব্যাচারহাট, সৈয়দপুর, মির্জাপুর,

রায়না ও ধরমপলাশন। এছাড়া যে সমস্ত খাস জমি নবাববাড়ীর দখলে ছিল সেগুলিও সরকার জমি অধিকার আইনের ৬ ধারা মতে অধিগ্রহণ করেছেন। অথচ সৈয়দ সাহেবের কথায় তায়দাদের শর্ত মত এই জমি অধিগৃহীত হতে পারে না। এই অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে সৈয়দ সাহেব মহামান্য উচ্চ আদালতে মামলা করেছিলেন, ডিক্রিও পেয়েছেন কিন্তু অধিকার পান নাই।

তবে খাজা আনোয়ার বেড়ের নবাববাড়ী এখন বর্ধমান রেল স্টেশনের দেওয়ালে প্রচারচিত্রে ও কিছু পুস্তকের ছবিতে নিজের অস্তিত্ব প্রচার করছে। প্রকৃত প্রস্তাবে নবাববাড়ীর বর্তমানে যা অবস্থা তাতে একে নবাব বাড়ী না বলে ভিখিরি বাড়ী বলাই সঙ্গত। নবাব বাড়ীর নবাবদের মহল অর্ধভগ্ন—নীচের তলায় নিরাশ্রয় ভিখারীদের আস্তানা। বেগমমহল ও ইমামবাড়া নিশ্চিহ্ন। হাওয়া-মহলের দীঘি শালুকফুলের পাতায় ঢাকা, বাগানবাড়ী আগাছা জঙ্গলে পরিপূর্ণ। সমাধিভবনের ৫০ ফুট উচ্চ স্মৃতিস্তম্ভেরও ভগ্নদশা। সমাধি-ভবনের সামনে বিঘে দুই জায়গায় চাষ দিয়ে সরষে বোনার ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। 'ভিটেয় সর্ষে বোনার' একটা প্রবাদ গ্রামে-গঞ্জে প্রচলিত আছে। নবাববাড়ীতেও সর্ষে বোনার সূচনা বোধহয় এই সর্ষেক্ষেত। বর্ধমানের এক অপূর্ব ঐতিহাসিক নিদর্শন আজ ধ্বংসের সম্মুখীন। অথচ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্তব্য ঐতিহাসিক সৌধ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করা। এখনও নবাব বাড়ীর যেটুকু বজায় আছে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ যদি তার আমূল সংস্কার করেন ও সরকার এই ঐতিহাসিক সৌধের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তা হলে শহর তথা জেলার এক গুরুত্বপূর্ণ মোগল স্থাপত্যের ঐতিহাসিক নিদর্শন রক্ষা পাবে।

বর্ধমান রাজবাড়ী : পূর্বে মোগলদের যেখানে দুর্গ ছিল সেখানে মহারাজ-মহতাবচাঁদের আমলে বর্তমান রাজপ্রাসাদ নির্মিত হয়। কিঞ্চিদধিক দুশো বছরের প্রাচীন এই সুরম্য প্রাসাদ ব্রিটিশ স্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত। নির্মাণ করেন কলকাতার বার্ণ কোম্পানী। বিশাল প্রাসাদ জুড়ে বিভিন্ন মহল ছিল। বর্তমান কাপুড়েচকের দিকে প্রাসাদের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে বিজয়চাঁদের পিতা মহতাব-চাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র বনবিহারী কাপুরের শ্বেত প্রস্তরের আবক্ষ মূর্তি। এর পরেই প্রাসাদের প্রবেশদ্বার। প্রবেশদ্বারের মুখে ছিল নহবৎখানা আর জমিদারী সেরেস্তার বিভিন্ন দপ্তর। সকাল সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্নে নহবৎখানা থেকে প্রচারিত নহবতের মধুর তান শহরবাসীকে মুগ্ধ করতো। এই কাছারী বাড়ীর মাথায় চার-মুখবিশিষ্ট বিশাল ঘড়ি। এই ঘড়ির ঘন্টাধ্বনি ছিল শহরবাসীর সময়ের নিয়ামক। আজ এই ঘড়ি স্তব্ধ। বর্তমানে এই কাছারী বাড়ীতে রয়েছে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব বিভাগের বিভিন্ন

দপ্তর। মূল প্রাসাদের মধ্যে ছিল বলরুম, আর্ট গ্যালারী ও অন্দরমহল। প্রাসাদের দক্ষিণে প্রাচীরবেষ্টিত খক্কর সাহেবের মাজার। রাজপ্রাসাদের হলে দুর্লভ সব তৈলচিত্র। রাজবাড়ীর পূর্বে রানীমহল। এটি এখন মহিলা মহাবিদ্যালয়। রাজবাড়ীর প্রাসাদে প্রবেশদ্বারের পথে তোরণের শীর্ষে ও প্রাসাদের অন্যত্র রাজবাড়ীর প্রতীক স্মারকচিহ্ন—দুপাশে উল্লম্ফনরত দুই বলশালী অশ্বের মাঝখানে ঢালসহ উন্মুক্ত দুই তরবারী, তারই নীচে ল্যাটিন ভাষায় ক্ষোদিত রাজ্যশাসনেব মূলমন্ত্র—Descredito Justinian Colito যার অর্থ "সুপ্রশংসিত সুবিবেচক সুপ্রজাপালক।" প্রাসাদের পশ্চিমদিকের মাথায় প্রস্তরনির্মিত উড্ডীয়মান ঈগল পাখীর মূর্তি।

রাজপ্রাসাদের অঙ্গ হিসেবে রয়েছে বাবুরবাগে রমনার বাগান ও গোলাপবাগ। রাজপ্রাসাদে এখন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার, রেজিস্ট্রার ও কনট্রোলারের দপ্তর।

গোলাপবাগ ও ডিয়ার পার্ক : ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর সংবাদ ভাস্কর পত্রিকায় অঘোরনাথ ভট্টাচার্যের প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে রমনা-বাগান সম্বন্ধে জানা যায়।

"কৃষ্ণসায়রের উত্তর-পশ্চিম ভাগে দেলকোষা নামক অতি রমণীয় এক উপবন আছে, তাহাতে প্রবিষ্ট হইলে লোকের আর সুরপুর গমনের বাসনা হয় না।" গোলাপবাগ সম্বন্ধে ভট্টাচার্য লিখেছেন। "এই বিহার-কানন নানা দেশীয় অগণ্য কুসুম তরু এবং নানা প্রকার ফলবৃক্ষে আকীর্ণ—কোকিল, কপোত, শুক, সারস, খঞ্জন, ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, সোয়াল প্রভৃতি জলচর এবং স্থলচর নানা জাতীয় বিহঙ্গগণ নিয়ত বিহার করিতেছে।"

গোলাপবাগ উদ্যানটি যার পরিকল্পনায় নির্মিত হয় তার নাম রামদাস। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের একটি স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় রাজা রামমোহনের মানিকতলার গৃহের বাগানটি এই রামদাসের পরিকল্পনায় নির্মিত হয়। রামমোহনের মৃত্যুর পর (১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) বর্ধমানের মহারাজা মহতাবচাঁদ রামদাসকে প্রধান মালী (Head gardener) নিযুক্ত করেন। রামদাসের তত্ত্বাবধানেই গোলাপবাগ উদ্যান নির্মিত হয় (বেহার টাইমস্, ১১ই অক্টোবর ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ)। এই গোলাপবাগেই আগে দারুল বাহার নামে সুরম্য প্রাসাদ পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। নানা জাতির গাছগাছড়া ছাড়া এখানে ছিল নানা জাতির পশুর চিড়িয়াখানা। একটি দ্বীপাকৃতি মঞ্চের চারিদিকে ছিল নৌকাবিহারের জন্য বিরাট নহর ও মধ্যে হাওয়ামহল।

বর্তমানে এখানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গবেষণার বিভাগ স্থাপিত হয়েছে।

রমনার বাগানের মধ্যে আছে বিজয়ানন্দ বিহার। মহতাবচাঁদ একসময় ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বর্ধমানে আমন্ত্রণ জানান। বর্ধমান থেকে ৯ অগ্রহায়ণ ১৭৭৭ শকাব্দ (১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) তারিখে একটি পত্রে পরম সুহৃদ রাজনারায়ণ বসুকে দেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা লিখেছেন— "বর্দ্ধমানাধিপতির জন্মোৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রণ পত্র প্রাপ্ত হইয়া ৫ই অগ্রহায়ণ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি।" আর লিখেছেন—"জন্মোৎসবের দিবস এখানে ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছিল।" সেই রাত্রে জন্মোৎসবের ভোজসভায় রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ও নিমন্ত্রিত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন "খ্রীষ্টান কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রাত্রির সভাতে আসিয়া টেবিলে আহারে বসিয়া গেলেন এবং মদ্যপান করিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন। স্বয়ং ধর্মযাজক হইয়া যে প্রকার মদোন্মত্ত স্বরে আলাপ আরম্ভ করিলেন তাহাতে সকলেই ত্যক্ত হইয়া উঠিল।"

এরপর মহর্ষি মধ্যে মধ্যে বর্ধমানে এসে রমনার বাগানে উপাসনা করতেন। ১৩২২ সালে এই আশ্রমটিকে মহারাজ বিজয়চাঁদ নূতন রূপদান করেন।

বর্তমানে রমনার বাগান সরকারী ডিয়ার পার্ক। স্বর্ণমৃগ, কৃষ্ণসার, চিতলদের নিয়ে গড়ে উঠেছে মৃগদাব উদ্যান। এই বাগানের এক অংশে ৫ বিঘা জমির উপর গড়ে উঠেছে মেঘনাদ সাহা বিজ্ঞান কেন্দ্র ও মিউজিয়াম—১৯৯৪ সালে ৯ই জানুয়ারী এর উদ্বোধন হয়।

মেঘনাদ সাহা তারামণ্ডল : গোলাপবাগের অদূরে অত্যাধুনিক এই তারামণ্ডলের উদ্বোধন হয় ১৯৯৪ সালে, ৯ই জানুয়ারী। এই তারামণ্ডলে মূল যন্ত্র জি. এস. "ইনস্ট্রুমেন্ট সিস্টেমটি"টি জাপান সরকার সাংস্কৃতিক অনুদান হিসেবে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেছে। এখানকার আসন সংখ্যা ৯০। এখানে প্রদর্শিত হয় মানুষ ও মহাবিশ্ব, ডাইনোসরের পৃথিবী, আকাশে ভেসে থাকার চিত্র, কী ভাবে দিন রাত্রি হয়, শীত গ্রীষ্ম হয় এ সবের প্রত্যক্ষ চিত্র।

কিছু দিন আগে মেঘনাদ সাহা প্ল্যানেটোরিয়ামে অদ্ভুত প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রদর্শনীর নামও অভিনব। অন্য জগতের সন্ধানে—In search of other worlds। পুরা কাহিনীকে ছাড়িয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বর্ণবহুল উপস্থাপনায় মানুষের মহাকাশে ওড়ার বাসনা, মহাকাশ পরিক্রমার ইতিবৃত্ত উন্মোচিত করা হয় এই প্রদর্শনীতে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চীনাদের উদ্ভাবিত রকেট বিজ্ঞানের মধ্যে যে মহাকাশযানের অংকুর নিহিত ছিল সেখান থেকে পাশ্চাত্যের অগ্রণী বিজ্ঞানী

কন্‌স্ট্যানটিন্ এডুয়ার্ডোভিচ্ সিওলনিকভ্স্কি, রবার্ট গডাড্ হাচিংস-এর মহাকাশ পরিভ্রমণ প্রভৃতি সহ রকেট বিজ্ঞান এ পর্যন্ত মানব-জাতির জন্য যা কিছু করেছে সমস্তই নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রদর্শনীতে তুলে ধরা হয়। এই প্রদর্শনী থেকে দর্শকদের একটা ধারণা হবে যে সেদিন আর দূরে নাই যেদিন আমাদের উত্তর পুরুষেরা অন্তর্নক্ষত্র মহাকাশের যাত্রীরূপে অজানা ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমার অধিকারী হবে। এখানে প্রতিদিন ৮টি-শো এর ব্যবস্থা আছে। প্রবেশমূল্য মাথাপিছু দশ টাকা ধার্য হয়েছে। সোমবার প্রদর্শনী বন্ধ থাকে।

কৃষ্ণসায়র পরিবেশকানন (Eco Park) : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, জেলা পরিষদ ও বর্ধমান পৌরসভার যৌথ উদ্যোগে গড়ে উঠেছে কৃষ্ণসায়র ইকো পার্ক। কৃষ্ণসায়রের ৩৩ একর জলাশয় জুড়ে, নৌকাবিহারের ব্যবস্থা আছে। সায়রের পাড়ে আগে যেখানে ছিল সারি সারি কামান আজ সেখানে ফায়ার বল, রঙ্গনা, গোলাপ, মর্নিং গ্লোরি, অ্যাঞ্জেলা প্রভৃতি দেশী-বিদেশী ফুলের সমারোহ। আর আছে সর্পোদ্যান। এখানে দেখা যাবে কেউটে, গোখরো, শাঁখামুটি, ময়াল, অজগর, শঙ্খচূড় প্রভৃতি নানা জাতির সাপ।

গুরুদ্বার : তিনকোনিয়া বাসস্ট্যাণ্ডের উত্তরে জি.টি রোডের ওপর চল্লিশের দশকে জনৈক সিভিল সার্জেন শিখ সম্প্রদায়ের জন্য বর্তমান গুরুদ্বারটি নির্মাণ করেন।

কিন্তু এর বহু পূর্বে সর্বমঙ্গলা মন্দিরের দক্ষিণে প্রথম শিখগুরু নানকের ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানে আগমন উপলক্ষে বাঁকার তীরে গড়গড়ার ঘাটে এক গুরুদ্বার নির্মিত হয়েছিল। তার নিদর্শন এখনও এখানে আছে, প্রতি বৎসর রাসপূর্ণিমার দিন ধর্মপ্রাণ শিখ সম্প্রদায় গুরু নানকের চিত্রসহ শোভাযাত্রা সহকারে জি. টি. রোডের ধারের গুরুদ্বার থেকে এখানে আসেন ও গুরুদ্বারে শ্রদ্ধা নিবেদন করে যান।

বিজয়তোরণ : ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদের আমন্ত্রণে মহারাজার অতিথি হয়ে বর্ধমানে আসেন। তাঁর আগমন উপলক্ষে এই বিজয়তোরণ 'শহরের দ্বার' হিসেবে নির্মিত হয়। প্রথমে এর নাম ছিল 'স্টার অব্ ইণ্ডিয়া', পরে এর নাম হয় কার্জন গেট। ইউরোপীয় স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন এই প্রবেশদ্বার। ইউরোপীয় শিল্পীরীতিতে গঠিত গেটের শীর্ষে তিনটি নারীমূর্তির গঠনশৈলী অপূর্ব। গেটের শীর্ষে নির্মিত নারী দণ্ডায়মানা। দু-পাশে দুই নারী বিপরীত মুখে মাথানত করে

উপবিষ্টা দুজনার দুহাতে তরবারি, নৌকা ও ফসলগুচ্ছ। তোরণের গায়ে নক্ষত্রখচিত একুশটি বৃত্ত। 'পশ্চিম দিকে উপরের স্তম্ভে নক্ষত্রখচিত দুটি বড় বৃত্ত—দুই বৃত্তের মধ্যে লেখা 'HEAVEN'S LIGHT OUR GUIDE', দু পাশের করিডরের মাথায় আছে দুটি সিংহের মূর্তি। বর্তমানে এর নাম হয়েছে 'বিজয়-তোরণ'। কিন্তু কার্জন গেট নামটি এতই চালু হয়েছে যে একে হঠানো মুস্কিল।

নবাবহাট (১০৮ শিবমন্দির) : বর্ধমান শহর থেকে পাঁচ কিমি পশ্চিমে নবাব-হাট একটি ছোট গ্রাম—আয়তন ৬৮.৫৬ হেক্টর ১০৩ ঘর লোকের বাস, লোকসংখ্যা মাত্র ৬০৮, অধিকাংশই মুসলমান। নবাবী আমলে হয়ত কোন কালে এখানে হাট বসতো কিনা সে তথ্য পাওয়া যায় না, তবে বর্তমানে হাট-বাজারের কোন হদিশ নাই। জি. টি. রোডের ধারে ২/১ টা দোকান গড়ে উঠছে। বাজার বলতে যা বোঝায় সেটার জন্য গ্রামবাসীদের বর্ধমান শহরই ভরসা। তবে এখানকার গুরুত্ব অন্যত্র। এখানে রয়েছে মহারানী বিষ্ণুকুমারী প্রতিষ্ঠিত ১০৮ শিবমন্দির। ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত List of Ancient Manuments of Bengal (P.W.D Govt. of Bengal)-এ মুদ্রিত নবাবহাট শিবমন্দিরের শিলালিপির যে অনুলিপি আছে তাতে দেখা যায়।

শাকে শূন্য শশাঙ্ক শৈল কুমিতে
নির্ম্মায় রাধা হরি প্রীত্যৈ।
পুণ্যবতী নবাধিকশতং,
শ্রীমন্দিরাণি স্বয়ম্।
ধীর শ্রীযুক্ত তেজচন্দ্র ধরণী
ধৌরেয় চূড়া মনে—
মাতা তৎসবিধে বিধায়
সুসবস্তীরে সমস্থাপয়তু।

অঙ্কস্য বামাগতি নীতি অনুসারে ১৭১০ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তেজচন্দ্রের জননী মহারানী বিষ্ণুকুমারী সুবৃহৎ পুষ্করিণী তীরে ১০৯টি মন্দির নির্মাণ করেন। কথিত আছে বিষ্ণুকুমারী নাবালক পুত্র মহারাজ তেজচন্দ্রের অভিভাবিকা হিসেবে জমিদারী পরিচালনা বিষয়ে নানা বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হন। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে ও স্বীয় বুদ্ধি বলে বিদেশীদের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে পুত্রকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন। এই ঘটনা ঈশ্বরের পরম করুণা ছাড়া কোন মতেই সম্ভব হতো না এই ধারণা তাঁর বদ্ধমূল হয়। তাই বর্ধমানের সন্নিকটস্থ নবাবহাটে বর্তমান বর্ধমান-সিউড়ি রোডের ধারে এক পুষ্করিণী তীরে ১০৯টি

শিবমন্দির নির্মাণ করে ১০৯টি শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। এই মন্দির প্রতিষ্ঠাকালে লক্ষ ব্রাহ্মণের সমাগম হয়েছিল। এই ব্রাহ্মণদের পদধুলি রাজবাড়ীতে দীর্ঘদিন রক্ষিত হয়েছিল।

শোনা যায় উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কিছু লিঙ্গ চুরি হয় ও লিঙ্গ প্রতিষ্ঠাকালে এর তলদেশে মোহর স্বর্ণমুদ্রা লুক্কায়িত আছে মনে করে অনেক লিঙ্গকে স্থানচ্যুত করে।

জমিদারী উচ্ছেদের পর মন্দিরগুলির অবস্থা জীর্ণ হয়ে পড়ে; মন্দিরের মধ্যে অনেক বটগাছ, অশ্বত্থ গাছ জন্মে মন্দিরকে ফাটিয়ে দেয়। তখন জেলাশাসক কে. পি. এ. মেনন, নারায়ণ চৌধুরী, কলকাতার ব্যারিষ্টার শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরদাস ঘটক, তারাপদ পাল প্রমুখ উদ্যোগী হয়ে মন্দির সংস্কারের পরিকল্পনা করেন। তদানীন্তন মন্ত্রী শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি ও জেলাশাসককে কার্যকরী সভাপতি এবং নরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শিবদাস ঘটককে যুগ্ম-সম্পাদক করে একটি মন্দির সংস্কার কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি বিড়লা জনকল্যাণ ট্রাস্ট-এর কাছে ১০৯ শিবমন্দির সংস্কারের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানালে বিড়লা জনকল্যাণ ট্রাস্ট মন্দিরের আমূল সংস্কার করে দেয়। বর্তমানে মন্দির উন্নয়ন কমিটির সম্পাদক শ্রীবিজয় মল্লিক মহাশয় মন্দিরের উন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন; মন্দিরের সংলগ্ন গেষ্ট হাউস, স্থায়ী পুরোহিত নিয়োগ, নিত্যপূজার ব্যবস্থা, পুকুর সংস্কার প্রভৃতি বহু কাজ সম্পন্ন হয়েছে। শিবরাত্রির সময় এখানে সপ্তাহব্যাপী মেলা ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়।

কুড়মুনের ঈশানেশ্বর : বর্ধমান শহর থেকে মাইল ১০/১২ উত্তর-পূর্বে কুড়মুন ও পার্শ্ববর্তী পলাশী গ্রাম, জে.এল. নম্বর ১০৬। কুড়মুন গ্রামের আয়তন ১২৮৫.২৩ হেক্টর, লোকসংখ্যা ৭১৯৪, গ্রামটি বেশ বড়; ১৩৩৬ ঘর লোকের বাস; বিভিন্ন পাড়ায় বিভক্ত।

কুড়মুনের গ্রাম্যদেবতা ঈশানেশ্বর, ত্রিশূলাকৃতি শিবলিঙ্গ অতি প্রাচীন দেবতা। গ্রামের মণ্ডল উপাধিধারী উগ্রক্ষত্রিয় বংশ দেবতার সেবাইত ও ঘোষাল উপাধিধারী ব্রাহ্মণরা পুরোহিত।

গ্রামের দুলে পাড়ায় এক ধর্মরাজ আছেন, নাম কালাচাঁদ। ঈশানেশ্বরের গাজন হয় চৈত্র মাসে আর কালাচাঁদের গাজন হতো বুদ্ধ পূর্ণিমায়। পরে ঈশানেশ্বর ও কালাচাঁদের গাজন যাতে একই সময়ে করা যায়, সে নিয়ে গ্রামের

উচ্চবর্ণের ও নিম্নবর্ণের মধ্যে একটা আপস হয়; ঠিক হয় ১৩ই চৈত্র থেকে উৎসবান্ত পর্যন্ত মণ্ডলদের তত্ত্বাবধানে শিব গাজনতলায় মন্দিরে থাকবেন আর বাকী সময় থাকবেন ব্রাহ্মণপাড়ার মন্দিরে। ফলে বিনয় ঘোষের কথায় "ঈশানেশ্বর শিব জন্ম দিলেন এক পুত্রের—নাম গাজনেশ্বর। এই গাজনেশ্বরই জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের দ্বারা পূজিত হন। ২৫শে চৈত্র থেকে ২৮শে চৈত্র পর্যন্ত চার দিন শিব গ্রামের বিভিন্ন পাড়া প্রদক্ষিণ করেন। এই গাজনে সন্ন্যাসীরা নানা রঙে মুখ চিত্রিত করে বা মুখোশ পরে গাজনতলায় আসে। চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন শ্মশান-সন্ন্যাসীরা আগে থাকতে কবর থেকে নরমুণ্ড সংগ্রহ করে তেল সিঁদুর মাখিয়ে এক হাতে নরমুণ্ড ও অন্য হাতে তলোয়ার নিয়ে এক পৈশাচিক নৃত্যে মাতেন। বর্তমানে এই পৈশাচিক নৃত্য বন্ধ হয়ে গেছে।

ঈশানেশ্বর শিবমন্দিরে আছে পাথরের এক অতি প্রাচীন দেবীমূর্তি। এই মূর্তিটি ইন্দ্রাণীর। ইন্দ্রাণী সপ্তমাতৃকার এক মাতৃকা। এ মূর্তি বাংলাদেশে খুব বেশী নাই। যা আছে দস্তুরা চণ্ডিকা মূর্তি।

মুকুন্দরাম ইন্দ্রাণীর দেবতা ইন্দ্রেশ্বরের উল্লেখ করেছেন। এই জনপদও এখন লুপ্ত। এই ইন্দ্রাণী জনপদ-এর সঙ্গে ইন্দ্রাণী মূর্তির কোন সম্পর্ক আছে কিনা সেটা ঐতিহাসিকদের গবেষণার বিষয়। সে যাই হোক, ঈশানেশ্বর মন্দিরে শিব ও শক্তির এই অপূর্ব সমন্বয় বিস্ময়ের উদ্রেক করে। পাশ্ববর্তী পলাশী গ্রামে ১৭৮২ সালে নির্মিত বুড়োশিবের টেরাকোটা মন্দিরের সম্মুখভাগের অলঙ্করণ দর্শনীয়। এই গ্রামই "Govinda Samanta" ও 'Folk Tales of Bengal' এর রচয়িতা কথা-সাহিত্যিক রেভারেন্ড লালবিহারী দে-র জন্মস্থান; লালবিহারী স্মৃতিস্তম্ভও স্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া কৌতুকাভিনেতা নবদ্বীপ হালদারের জন্মস্থান পলাশী গ্রাম।

আউসগ্রাম থানা :

পাণ্ডুক (জে.এল ৫২) : সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনে ভেদিয়া স্টেশনে নেমে ৬ কিমি বাসে পাণ্ডুক গ্রামে যাওয়া যায়। বর্ধমান থেকে সরাসরি বর্ধমান-রামনগর বাসেও পাণ্ডুক যাওয়া যায়। গ্রামের আয়তন ৪৮২.১০ হেক্টর, লোকসংখ্যা— ৪৬০ ঘরে বাস ২২৩৫ জনের। সে দিক দিয়ে বিচার করলে এক অখ্যাত গ্রাম পাণ্ডুক। কিন্তু ষাটের দশকে এখানকার পাণ্ডুদাস রাজার গড়বাড়ী রাজপোতা-ডাঙার খনন-কার্যের ফলে পাওয়া গেছে, সিন্ধুসভ্যতার সমসাময়িক এক তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার বহু নিদর্শন, যার আবিষ্কারের ফলে বর্ধমান জেলার ইতিহাসের এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন হয়।

এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে পোড়ামাটির ভগ্ন মাতৃকা মূর্তি, লাল কালো রঙের মৃৎভাণ্ড, সককুদ বৃষের প্রতিকৃতি দীর্ঘকণ্ঠী পক্ষীর প্রতিকৃতি মানুষের মস্তকসহ মুখমণ্ডলের কঙ্কাল, পোড়া কয়লার মত চাল। এই সব আবিষ্কারের ফলে জেলার প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক লুপ্ত ইতিহাসের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এ সম্পর্কে বর্ধমান গেজেটিয়ার ১৯৯৪-তে মন্তব্য করা হয়েছে—Pandu Rajar dhibi represents the ruins of a trading township.... The excavations at Pandu Rajar Dhibi show that they had most infinite trade relations with crete and other countries of the Mediterranean world.

প্রাচীন ইতিহাসের গবেষক, শিক্ষাবিদ ও পর্যটকদের নিকট পাণ্ডুক গ্রামের গুরুত্ব অপরিসীম।

ভাতার থানার বড়বেলুনের কাছে বাণেশ্বরডাঙায় ও আমারুণ-এর সন্নিকটে আড়াগ্রামের পাশেই খড়ি নদীর তীরে সাঁওতালডাঙা উৎখননের দ্বারা এই রূপ বহু প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

অমরার গড় (জে.এল ৮৮) : মানকর রেলস্টেশন থেকে গুসকরার দিকে ৩ কিমি এগিয়ে গেলেই অমরার গড়। গুসকরা বুদবুদ বাসেও যাওয়া যায়। গ্রামটি বেশ বড়, আয়তন ১১৬৯.৬৬ হেক্টর, লোকসংখ্যা ৪১৩৭। গোপভূমের রাজা মহেন্দ্রের (মাহেন্দী রাজা) মহিষী অমরাবতীর নাম অনুসারেই গ্রামের নাম অমরার গড়। গোপভূমের গোপদের রাজত্বকালে রাজধানী ছিল অমরার গড়; রাজধানীকে সুরক্ষিত করার জন্যই এই গড়ের নির্মাণ বলেই প্রবাদ। এখানকার গড়ের ধ্বংসাবশেষ ও রাজা মাহেন্দীর প্রতিষ্ঠিত দশভুজা সিংহবাহিনী শিবাক্ষ্যাদেবী ও টেরাকোটা অলঙ্করণে সজ্জিত মন্দির ও নারায়ণশিলার পঞ্চরত্নমন্দির পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

কথিত আছে, রাজা মহেন্দ্র স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কাটোয়ার সন্নিকটস্থ খাজুরডিহি গ্রামের জমিদার জগৎ সিংহের গৃহ থেকে এই মূর্তি জোরপূর্বক নিয়ে এসে নিজ রাজধানীতে প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্বে এখানে দুর্গাষ্টমীর সময় বলিদানের ক্ষণ জানাবার জন্য বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দিরের মত তোপ দাগা হতো। বর্ধমানে সর্বমঙ্গলার মন্দিরে কামান বিস্ফোরণের পর এখানেও তোপ দাগা বন্ধ হয়ে গেছে।

সুয়াতা ভালকী (জে.এল. ৯০) : গুসকরা-মানকর বাসে ভালকী স্টপেজে নেমে সুয়াতা যাওয়া যায়। ২ কিমি-এর মত হাঁটতে হবে। সুয়াতা-ভালকী ছিল গোপভূমের গোপরাজাদের অন্যতম কার্যালয়। প্রবাদ : সদ্‌গোপরাজা ভল্লুপাদের নামানুসারে ভালকীর নাম। ভালকীর পার্শ্ববর্তী গ্রাম সুয়াতা। এই গ্রামের সঙ্গে

বহমান নামক ধর্মপ্রাণ মুসলমানের নাম জড়িত। শিবাক্ষ্যা মন্দিরে নরবলি বন্ধ করার জন্য গোপরাজ ভল্লুপাদের সঙ্গে যুদ্ধে বহমান শহীদ হন। গ্রামে বহমান সাহেবের একটি মাজার আছে। স্থানীয় জনগণের কাছে বহমান জাগ্রত পীর। মাজারের ভিতর আলাউদ্দিন হোসেন শাহের নামাঙ্কিত তোগড়া অক্ষরে লিখিত তিনটি প্রতিষ্ঠালিপি ঐতিহাসিকদের গবেষণার বস্তু।

কসবা-চম্পাই নগরী (জে.এল. ২০) : বুদবুদ থানার একটি ছোট গ্রাম কসবা, আয়তন ৩৪৯.৭৮ হেক্টর, লোকসংখ্যা ১৮১২। বর্ধমান আসানসোল বাসে বুদবুদ চটিতে নেমে দক্ষিণে দামোদর তীরে এই গ্রাম। এই কসবার কাছেই চম্পকনগরী—যাকে ঘিরে মনসামঙ্গলের চাঁদসদাগর বেহুলার কাহিনী গড়ে উঠেছে। এই কাহিনীকে উপজীব্য করেই মনসামঙ্গল কাব্য রচিত। গ্রামের মধ্যে ২টি উচ্চ ঢিবি আছে। একটি বেহুলার বাসরঘর আর একটি সাঁওতালি পাহাড় বলে লোকমুখে প্রচারিত। প্রবাদ : এখানে ২টি বৃহৎ শিবলিঙ্গ আছে। এই বৃহৎ শিবলিঙ্গই নাকি চাঁদের প্রতিষ্ঠিত। তবে চম্পাইনগর ও সাঁওতালী পর্বতের এখানে অবস্থান বিতর্কমূলক। আমার মনে হয় এই টিবির খননকার্য চালালে এখানে কিছু পুরাতত্ত্বের নিদর্শন মিলতে পারে।

ভরতপুর (জে.এল. ২০) : বুদবুদ থানার পানাগড় রেলস্টেশন থেকে ৪ কিমি দক্ষিণে ভরতপুর এক অতি প্রাচীন গ্রাম; আয়তন ৫৮০.৭২ হেক্টর, লোকসংখ্যা ৩৪৮৬, Peterson-এর বর্ধমান গেজেটিয়ার ১৯১০-এ ভরতপুর সম্বন্ধে আছে—Its (Sadgop kingdom, Gopebhum) south-western extremity now Pargana Selimpur was apparently held by two Sadgop Kinglings—Probably merely cadets of the house of Gopebhum—one stationed at Bharatpur on the Domodar and the other at Kankeswar or Kanksa. পর্যটকদের কাছে ভরতপুরের আকর্ষণ এর নবাবিষ্কৃত ভরতপুরের বৌদ্ধস্তুপ যাকে ভরতপুরের তুলাক্ষেত্র বলে বা ধর্মপালদেবের ধর্মরাজিক স্তুপ বলেই অনুমান করা হয়।

এখানে Archaeological survey of India (Eastern Circle, Cal)-এর সহযোগিতায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গোপভূম পরগনায় তিন হেক্টর পরিমিত স্থানের খননকার্য চালান হয়। এখানকার খননকার্যের ফলে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বজ্রাসনে উপবিষ্ট ১১টি বুদ্ধমূর্তি এবং তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। সর্বনিম্ন স্তরের নিদর্শনাবলী ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের বলে C-14

পরীক্ষায় জানা গেছে। এখানকার আবিষ্কার সম্বন্ধে বর্ধমান গেজিটিয়ার ১৯৯৪-তে মন্তব্য করা হয়েছে। The style of construction as well as the antiquities indicates that the stupa complex of the Bharatpur was built in the 7-9th cent by the Budhist Community, and this style of stupa is so far the first of its kind in West Bengal.

The other materials found at Bharatpur indicate the presence of a neolithic-chalcolithic habitation at the bottom succeeded by an early iron age culture after which, it seems the site remained deserted till the time of the construction of the stupa. প্রাচীন ইতিহাসের ছাত্র, গবেষক ও শিক্ষাবিদ্দের পর্যটনের উপযুক্ত ক্ষেত্র এই ভরতপুর।

ভাতার থানা :

আমারুন : বর্ধমান শহর থেকে বাসে বা বি. কে. রেলওয়ের ট্রেনে চড়ে আমারুন যাওয়া যায়। আয়তন ৬৫৩.৯৭ হেক্টর, লোকসংখ্যা ২৩১৯। আমারুনে আছে ক্ষেপাকালীর অধিষ্ঠান। অনেক বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি এখানকার ক্ষেপাকালীর বালা পরে সুস্থ হয় বলে বিশ্বাস। এহ বাহ্য; আমারুনের খ্যাতি অন্যত্র। আমারুনের কাছে আড়া গ্রাম, আড়া গ্রামের কাছে খড়োশ্বরী নদীর ধারে সাঁওতালডাঙায় খননকার্যের ফলে প্রত্নক্ষেত্রে তাম্রাশ্মীয় যুগের বহু নিদর্শন, ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধ, পোড়ামাটির দ্রব্য, তাম্রখণ্ড, কৃষ্ণলোহিত বর্ণের ভগ্ন কলস ও বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

বড়বেলুন (বানেশ্বর ডাঙ্গা, জে.এল. ৯৩) : বর্ধমান হতে সরাসরি বাসে যাওয়া যায়। বড়বেলুন এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম; এর আয়তন ১৭৭৭.০০ হেক্টর, লোকসংখ্যা ৯২২০, গ্রামে টেলিফোন অফিস, দৈনিক বাজার, উচ্চ বিদ্যালয় সবই আছে। এখানকার প্রধান উৎসব ২০/২১ ফুট উচ্চ বিরাট কালীর পূজা। কার্তিক মাসের অমাবস্যায় এই বিরাট মৃণ্ময়ী কালীর পূজাকে উপলক্ষ করে গোটা গ্রাম উৎসবে মেতে ওঠে। সম্প্রতি গ্রামের সংলগ্ন খড়ি নদীর ধারে বাণেশ্বরডাঙায় খননকার্যের ফলে তাম্রাশ্মীয় যুগের বহু প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন যেমন লৌহনির্মিত তরবারির ভগ্নাংশ, সস্তম্ভ থালির অংশ, সুডৌল কলস, কোশীপত্র, লৌহপিণ্ড, তাম্রাশ্মীয় যুগের মৃৎপাত্র ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সমস্ত আবিষ্কার থেকে অনুমিত হয় অজয় নদীর তীরে পাণ্ডুরাজার ঢিবির মত

খড়োশ্বরী নদীতীরে খ্রীষ্টপূর্ব ১৩০০/১৪০০ অব্দের তাম্রাশ্মীয় যুগের এক প্রাচীন সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল।

ভাতার থানার ৩৫নং দেবপুর গ্রামেও দেবাদিত্যের প্রাসাদ বলে কথিত এক ডাঙা ও প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আছে। এখানেও উৎখনন চালালে হয়ত এই রকম কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যাবে।

নিকটবর্তী এরুয়ার গ্রামে (৩৮নং) আছে সন্ন্যাসী গোঁসাই প্রতিষ্ঠিত জোড়া কালীমূর্তি। সন্ন্যাসী গোঁসাই-এর তিরোধান উপলক্ষে শ্রাবণ মাসের অমাবস্যা তিথিতে গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী জোড়া কালীমূর্তির পূজা, বলিদান ও মেলা হয়। এছাড়া আছে মহারুদ্রদেবের পঞ্চরত্ন শিবমন্দির, ষষ্ঠীগড়ের পারে তাজিয়ার কারুকার্য খচিত প্রাচীন শিবমন্দির। এছাড়া আরও আছে ৭০টি মন্দির।

বনপাশ কামারপাড়া (জে.এল. নং ২১) : এখানে আছে অপূর্ব টেরাকোটা অলংকরণ শোভিত আটকোণা শিবমন্দির ও প্রাচীন বুড়োশিবের মন্দির এবং গ্রামের দক্ষিণাংশে মণ্ডল পাড়ায় সিংহবাহিনীর মূর্তি। দুর্গাপূজার সময় এই সিংহবাহিনীর মহাসমারোহে পূজা ও বলিদান হয়।

ওড়গ্রাম (জে.এল. নং ১১) : বিরাট গ্রাম, আয়তন ২৯৩৮.৭৬ হেক্টর, কিন্তু আয়তনের অনুপাতে লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম ১১৭৫, এর কারণ ওড়গ্রামের অধিকাংশ অঞ্চলই ডাঙা। আর ডাঙা নিয়েই ওড়গ্রামের গুরুত্ব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এখানে মিলিটারী ক্যাম্প হয়েছিল।

বর্ধমান-গুসকরা (ভায়া সিউড়ি রোডে) বাস লাইনের ধারে ওড়গ্রামের হাটতলা পার হলেই ওড়গ্রামের ডাঙা। আগে ঠ্যাঙ্গাড়েদের উপদ্রব ছিল। সাধক কমলাকান্ত চান্না আসবার পথে এখানে একবার ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন। এখনও ডাকাতের উৎপাত বেড়েছে বই কমে নাই। যাই হোক, এখানে সরকারে ন্যস্ত ডাঙ্গায়—বনবিভাগের আছে শাল, সেগুন, শিশু, ইউক্যালিপটাস-এর বীথি। মধ্যে লেকের আকারে পুকুর আর পাশেই আছে বন দপ্তরেরই বাংলো, বনভোজনের জন্য মনোরম স্থান। তবে বন দপ্তর থেকে অনুমতি নিয়ে এখানে বনভোজনে যেতে হয়।

জামালপুর থানা :

জাড়গ্রাম (জে.এল ৬১) : বর্ধমান-তারকেশ্বর বাসে যাওয়া যায়। জামালপুর থানার দক্ষিণ প্রান্তে হুগলীর কাছাকাছি তারকেশ্বর থেকে ১৫ কিমি দূরে এই ছোট

গ্রাম। আয়তন ২৪৫.৭৮ হেক্টর, লোকসংখ্যা ১৯৯১। তবে জাড়গ্রামের খ্যাতি কালু রায়ের জন্য।

জাড়গ্রামের কালু রায় দেখীড়তে বাড়ী
জামা জোড়া খাসা ঘোড়া উত্তম পাগড়ী।

জাড়গ্রামের গ্রামদেবতা ধর্মঠাকুর কালুরায়। ইষ্টক নির্মিত মন্দিরে জোড়া ঘোড়ার উপর স্থাপিত সিংহাসনে চতুষ্কোণ শিলামূর্তিটি ধর্মশিলা (বিশদ বিবরণের জন্য লৌকিক দেবদেবী অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। প্রবাদ : কালুরায় পূর্বে হুগলী জেলার দেখীড় গ্রামে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেজন্য চৈত্র মাসে গাজনের সময় একদিনের জন্য দেখীড় গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। চৈত্র মাসে গাজন উৎসবে গোটা গ্রাম উৎসব-মুখর হয়। ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা তিথিতে মনসার গাজন উৎসবও এখানে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়।

পাল্লারোড : বর্ধমান-হাওড়া কর্ডলাইনে পাল্লা স্টেশনে নামতে হয়। অদূরেই দামোদর নদী। দামোদর এখানে বাঁক নেওয়ায় দক্ষিণতীরে বিরাট বালুর চড়া। অপর তীরে আম কাঁঠালের বন। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে এখানকার সেচবিভাগের ডাকবাংলো বনভোজনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। সেচবিভাগের নিকট আবেদন করে আগে থেকে বাংলো বুকিং করে পিকনিকে যেতে হয়। এখানকার দামোদর তীরে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য বাংলা চলচ্চিত্রের ২/১টি শুটিংও হয়েছে।

সাতদেউলিয়া-আঝাপুর : জামালপুর থানার এক প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রাম আঝাপুর। মেমারী-জামালপুর বাসে যাওয়া যায়। মেমারী থেকে ৫ কিমি ও বর্ধমান হাওড়া কর্ডলাইনের মশাগ্রাম থেকে আঝাপুর ৩ কিমি। মশাগ্রাম থেকে বাসেও যাওয়া যায় আবার রিক্সাও পাওয়া যায়। আয়তন ৬৫০.৭৭ হেক্টর, লোকসংখ্যা ৬৩৯৯। সদ্‌গোপ রাজ শালিবাহনের রাজধানী ছিল বলে প্রবাদ। তাই রাজাপুর থেকে অপভ্রংশে দাঁড়িয়েছে আঝাপুর। আঝাপুরের কাছেই সাতদেউলিয়া, আঝাপুর থেকে দেড় বা দুই কিমি উত্তর-পূর্বে সাতদেউলিয়া। সাতদেউলিয়ার শিখর-দেউল মন্দির প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। রথাকৃতি এই মন্দিরের প্রবেশপথে খিলান ও বহির্গাত্রে চৈত্য ও গম্বুজের সমন্বয় এই মন্দিরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। নবম শতকে নির্মিত এই মন্দিরটি ৮০ ফুট উচ্চ, দেওয়াল ৯ ফুট চওড়া, দেউলের উপরিভাগে ১৪১টি তীর্থঙ্করের মূর্তি ক্ষোদিত আছে। শীর্ষে উপবিষ্ট বৃষবাহনসহ ঋষভনাথ। সাতদেউলিয়া নাম থেকে

মনে হয় এখানে এককালে সাতটি দেউল ছিল। দেউলে তীর্থঙ্করের মূর্তির সমাবেশ দেখে অনুমান হয় এ অঞ্চলে মহাবীর তীর্থঙ্কর পর্যটন করেছিলেন।

কুলীনগ্রাম (জে.এল ১১৮) :

কুলীন গ্রামের কথা কহনে না যায়
শূকর চরায় ডোম কৃষ্ণনাম গায়।

বর্ধমান-হাওড়া কর্ড লাইনে জৌগ্রামে নেমে ৫ কিমি দূরে কুলীনগ্রাম এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বৈষ্ণবদের তীর্থস্থান। গ্রামের আয়তন ৮০২.৯৪ হেক্টর, লোকসংখ্যা ৬৪৪৩। শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্ষদ রামানন্দ বসুর শ্রীপাট কুলীনগ্রাম। গৌড়েশ্বর হোসেন বরকর শাহের সভাসদ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর রচয়িতা মালাধর বসুর জন্মস্থান কুলীনগ্রাম। বসু পরিবারের আমন্ত্রণে শ্রীচৈতন্য এখানে এসেছিলেন। কুলীনগ্রামের গোপেশ্বর শিবের আটচালা শিবমন্দিরের বহির্ভাগে আড়াই ফুট দীর্ঘ ও দেড় ফুট উচ্চ কষ্টিপাথরে নির্মিত বৃষমূর্তির গলদেশে উৎকীর্ণ আছে ১৪২০ শকে (১৪৯৮ খ্রীঃ) এই মূর্তি সত্যরাজ খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

জগমোহন ও নাটমন্দিরসহ এক বৃহৎ মন্দিরে মদনগোপাল, শ্রীরাধিকা ও ললিতা দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। গ্রামে রাম-সীতা ও দশভুজা ভুবনেশ্বরীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। গোপেশ্বর মন্দিরের অদূরে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক হরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থান বৈষ্ণবদের তীর্থভূমি। একটি বিরাট বটবৃক্ষের নীচে হরিদাস কৃষ্ণনাম কীর্তন করতেন। এখানে একটি মন্দির স্থাপিত হয়েছে।

মেমারী থানা

মণ্ডলগ্রাম : মেমারী থানার ৭নং মণ্ডলগ্রাম এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম। মেমারী থেকে ২০ কিমি উত্তরে বাসরুটের ধারে এই গ্রাম। গ্রামের আয়তন ১৩২৪.১২ হেক্টর, লোকসংখ্যা ৮৪৮২। নিকটবর্তী রেলস্টেশন মেমারী। মণ্ডলগ্রামের খ্যাতি জগৎগৌরীর জন্য। কথিত আছে, এতদঞ্চলের সামন্তরাজ নরপালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন জগৎগৌরী। প্রকাশ : বর্গী হাঙ্গামার সময় নরপাল মূর্তিটিকে স্থানীয় বিশে পুকুরে ডুবিয়ে রাখেন। তারপর জেলেদের জালে এই মূর্তি পাওয়া যায়। প্রথমে দেবী এক বৃক্ষতলে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। পরে মন্দির নির্মাণ করে সেখানেই দেবীকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। শিরে সপ্তসর্পশোভিত চতুর্ভুজ পাষাণ মূর্তি দেবী জগৎগৌরী প্রকৃতপক্ষে মনসামূর্তি। আষাঢ়ের প্রথম পঞ্চমীতে দেবীর মহাপূজা, বলিদান ও মেলা হয়। কালনা থানার নারিকেলডাঙাতেও জগৎগৌরীদেবী

অধিষ্ঠিতা আছেন এবং তাঁর মহাপূজা ও মেলা আষাঢ় মাসের প্রথম পঞ্চমীতেই অনুষ্ঠিত হয়। এর বিবরণ লৌকিক দেবদেবী অধ্যায়ে দেওয়া আছে।

কালনা মহকুমা : মন্তেশ্বর থানা

মন্তেশ্বর (জে.এল. ৪১) : মন্তেশ্বর থানার মন্তেশ্বর একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। আয়তন ৭৯১.৪৯ হেক্টর, লোকসংখ্যা ৭১২২। বর্ধমান, মেমারী, কালনা ও কাটোয়া থেকে সরাসরি বাসে যাওয়া যায়। কাটোয়া থেকে দূরত্ব ২৮ কিমি। দেবদেবীর মধ্যে মন্তেশ্বর শিব, চামুণ্ডা, সিদ্ধেশ্বরী ও ধর্মরাজ প্রধান—চামুণ্ডাই গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। চামুণ্ডাদেবীর সাধারণ রূপের যে বর্ণনা আছে, সেই আদি ও অকৃত্রিমরূপে দেবী এখানে প্রকট হয়েছেন। শীলাময়ীদেবী মহামেঘ শ্যামবর্ণা, ত্রিনয়না, নগ্নকেশী, মুণ্ডমালাশোভিতা, নতকুচা, পদতলে শব ও মহাকাল। বৈশাখী শুক্লাষ্টমীতে চামুণ্ডাদেবীর মহাপূজা, শত শত বলিদান ও উৎসব হয়।

বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মের গাজন ও উৎসব—যার অন্যতম প্রধান অঙ্গ বাণফোঁড়া, কাঁটাঝাঁপ, বলিদান ও মদের হাঁড়ি নিয়ে সন্ন্যাসীদের ভাঁড়াল নৃত্য।

কালনা : কালনা থানার কালনাই প্রধান ও প্রাচীন শহর। শহরের এলাকা ৪.৪৭ বর্গ কিমি. লোকসংখ্যা ৪৭২২৯। মধ্যযুগ থেকে বাণিজ্যিক গুরুত্বের জন্য কালনার খ্যাতি। The Antiquities of Kalna, Bengal Past and Present—Vol. 14, Jan-June 1917তে কালনা সম্পর্কে লিখিত আছে—It appears that it was a celebrated place during the Mahommedan rule and earlier during the Hindu Period.

Nothing of the period of the Hindus can now be traced except that some of the late archaeological remains reveal the fact that the Mahommedans built out of the materials of older Hindu ruins.

এখানে মোগল যুগের একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া বর্ধমান মহারাজাদের প্রতিষ্ঠিত বহু মন্দির ও দেবদেবী আছে। যেমন :

১০৮ শিবমন্দির : বর্ধমানের নবাবহাটের মত ১০৮ শিবমন্দির আছে। মহারাজ তেজচন্দ্র কর্তৃক ১৮০৯ সালে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত। কালনা রাজবাড়ীর কাছাকাছি মন্দিরগুলি বৃত্তাকারে প্রতিষ্ঠিত। প্রথম বৃত্তের মধ্যে আছে ৬৬টি মন্দির। এই মন্দিরের মধ্যে একটি মন্দিরে কৃষ্ণ প্রস্তরের লিঙ্গ, পরের মন্দিরে শ্বেত প্রস্তরের লিঙ্গ। এই ভাবেই লিঙ্গগুলি প্রতিষ্ঠিত। ভিতরের বৃত্তে আছে

৪২টি। মন্দিরের ভিতরের সব মন্দিরেই লিঙ্গগুলি শ্বেত প্রস্তরের—শ্বেতশুভ্র বর্ণের।

সিদ্ধেশ্বরী : কালনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী অম্বিকা—ঐতিহাসিক বিনয় ঘোষের মতে অম্বিকা হলেন জৈন ধর্মীদের বিখ্যাত উপাস্য দেবী; পরে বাংলার মাটিতে দুর্গায় পরিণত হয়েছেন। কিন্তু ষোড়শ শতকের শেষের দিকে ধর্মমঙ্গলের কবি রূপরাম লিখেছেন!

তোমার মহিমা মাতা কি বলিতে পারি
অম্বুয়া ঘাটে বন্দো কালিকা ঈশ্বরী।

বর্ধমান গেজিটিয়ার ১৯৯৪ তে অম্বুয়া সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

The Presiding deity of the town is the Goddess Ambika, who is said to be a Jain duty of the past merging into the concept of Sakti of the Hindus. The position of the Presiding deity is now assumed by Siddheswari, represented by an icon of Kali with four hands.

সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরটি জোড়বাংলা পদ্ধতিতে নির্মিত। নির্মিত হয় ১৬৬৩ শকাব্দে (১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দ) মহারাজ চিত্রসেনের আমলে। নির্মাণ করে সোনামুখীর রামচন্দ্র মিস্ত্রী। সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরচত্বরে মহারাজ ত্রিলোকচাঁদের মাতা কর্তৃক ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দ-এ একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ধমান রাজপ্রাসাদের মধ্যে শিবমন্দির ও শ্রীকৃষ্ণমন্দির অবস্থিত।

শ্রীকৃষ্ণমন্দির : শ্রীকৃষ্ণমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয় ১১৫৯ বঙ্গাব্দে। ২৫ চূড়াবিশিষ্ট এ মন্দিরের টেরাকোটার কাজ দর্শকদের আজও মুগ্ধ করে। এই রকম পঁচিশরত্ন মন্দির জেলায় খুবই বিরল। এ মন্দিরের অলংকরণ লালজী মন্দির অপেক্ষা উন্নত মানের। এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন মহারাজা ত্রিলোকচাঁদ।

লালজি মন্দির : টেরাকোটা অলংকরণ শোভিত প্রাচীন স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন—লালজি মন্দিরে রাধাকৃষ্ণবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। লালজি মন্দিরও পঁচিশরত্ন-বিশিষ্ট। প্রবাদ : লালজি ছিলেন এক সাধক ফকিরের শিষ্য—তাঁর ভোগ হতো পোড়া রুটি দিয়ে। সে প্রথা আজও চালু আছে।

এছাড়া আছে মহারাজ ত্রিলোকচাঁদের অনুগত কৃষ্ণচন্দ্র বর্মণ স্থাপিত পঁচিশ চূড়ার গোপালজীর মন্দির—মহিষমর্দিনীমাতার মন্দির, রামসীতার মন্দির, সিদ্ধান্তকালীর মন্দির, শ্মশানকালী মন্দির, দোলমঞ্চ প্রভৃতি।

ফিরোজ শাহের মসজিদ : কালনার মসজিদ সম্পর্কে বর্ধমান গেজেটিয়ারে (১৯৯৪) ৩টি ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদের উল্লেখ আছে। There are three ruined mosques of Turko-Afgan Period, situated at Saspur 2 Kms from the main Town (Kalna). Many of these Structures were made of materials gathered from older Hindu temples. ...Incidentally Majlis Shahib and Bader Shahib were two brothers who came to spread the creed of Islam. They have become pirs and their tombs or dargas are considered sacred. Of the three mosques at Kalna one is said to have been built during the reign (AD 1490–91) of Naziruddin Mahmud Shah II, one during the reign of Alauddin Abul Muzaffar Firoz Shah II, son of Nasrat shah and grand son of Hussain Shah in 1533, another in 1560 during the reign of Abul Muzaffar Bahadur Shah. The big-size mosque of 1533 is called Masjid-i-Jamia and was actually built by Ulug Masjad Khan Malik, the minister and commander-in-chief of Mazaffar Firoz Shah.

এই মসজিদগুলির অবস্থান কালনার দাঁতনকাঠিতলায়। মজলিশ সাহেবের মসজিদের খিলান ও সূক্ষ্ম স্থাপত্যশৈলী পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মজলিশ সাহেবের দীঘির পাড়ে ১লা মাঘ উত্তরায়ণে বার্ষিক মেলায় হিন্দু-মুসলমান সকলেই অংশগ্রহণ করে।

বাঘনাপাড়া (মৌজা-রাধানগর জে.এল. ৭৮) : কালনার বাঘনাপাড়া যেতে হলে ব্যান্ডেল-কাটোয়া লাইনে বাঘনাপাড়া স্টেশনে নেমে সড়কপথে কিছু এগিয়ে যেতে হবে। গোপেশ্বর শিবলিঙ্গের রুদ্রভাগে বদ্ধপদ্মাসন ভঙ্গীতে উপবিষ্ট দশপ্রহরণ-ধারিণী দশভুজা মূর্তি ও ৩ ফুট x ১ ফুট কীর্তিমুখসহ রত্নমাল-ক্ষোদিত শিলাফলক ও ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত কৃষ্ণবলরাম-বিগ্রহ ও মন্দির, মুখলিঙ্গ সদাশিব-বিগ্রহ দর্শনীয়। জেলার নিম্নলিখিত স্থানগুলিও পর্যটকদের আকর্ষণ করে। এগুলির সম্বন্ধে পূর্বে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে বলে এখানে মাত্র সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

ক্ষীরগ্রাম,—মঙ্গলকোট থানার ১২৮ নং ক্ষীরগ্রামে বর্ধমান থেকে সরাসরি বাসে কিংবা বি. কে. লাইনে কৈচরে নেমে বাসে বা রিক্সায় যাওয়া যায়। স্থানটি শক্তিপীঠ। কথিত আছে সতীর দক্ষিণ চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পতিত হয়েছিল। দেবী জলতলবাসিনী যোগাদ্যা ও ভৈরব ক্ষীরখণ্ডক। বৈশাখ সংক্রান্তিতে মহাপূজা, উৎসব ও মেলা হয়।

বাবলাডিহি-শঙ্করপুর : মঙ্গলকোট থানার ৬৮নং মৌজা-আয়তন ৫৭.৫৩ হেক্টর, লোকসংখ্যা ৭১৮। বর্ধমান-কাটোয়া বাস লাইনে বলগনা থেকে মাইল খানেক পশ্চিমে হাঁটাপথে যেতে হয়। বাবলাডিহির খ্যাতি ন্যাংটেশ্বর শিব বিগ্রহের জন্য। কৃষ্ণপ্রস্তরে ক্ষোদিত ৩ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট ও পদতলে মৃগলাঞ্ছনযুক্ত তীর্থঙ্কর মহাবীর বাবলাডিহিতে শিবে রূপায়িত হয়েছেন। শিবরাত্রি উপলক্ষে বিরাট মেলা বসে ও বহুযাত্রীর সমাগম হয়।

মঙ্গলকোট (জে.এল ৬৪) : আয়তন ১৮৭৫.৫০ হেক্টর, লোকসংখ্যা ৯৬৪৭। অতি প্রাচীন গ্রাম। নিকটবর্তী নতুনহাট গ্রামে হোসেন শাহ (১৪৩৯–১৫১৯) আমলের একটি মসজিদে খোদিত লিপিতে চন্দ্রসেনের নাম পাওয়া যায়। ডাঃ অশ্বিনী চৌধুরীর মতে বেসান্তর জাতকে উল্লিখিত শিবি রাজ্যের রাজধানী ছিল জেতুত্তর নগর, মঙ্গলকোটই এই নগর। গুপ্তযুগ থেকে সেনবংশের রাজত্ব পর্যন্ত মঙ্গলকোট খুব সমৃদ্ধশালী জনপদ ছিল। তবে মুসলিম আমলে এর শ্রীবৃদ্ধি চরমে ওঠে। ১৮ জন আউলিয়া এস্থানে এসেছিলেন বলে জনশ্রুতি। গোলাম পাঞ্জাতন পীরসহ পাঁচজন পীরের সমাধি আছে। সম্রাট শাহজাহানের গুরু দানেশ মন্দ কর্তৃক ১০৬৫ হিজরা অব্দে মসজিদ নির্মিত হয়। হোসেন শাহেরও মসজিদ আছে। মধ্যযুগে মঙ্গলকোট মুসলিম সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল।

কেতুগ্রাম : কেতুগ্রাম থানা ৮৫নং গ্রাম। কাটোয়া থেকে বাসে যাওয়া যায় (১৭ কিমি)। আয়তন ৮৪৯.৫২ হেক্টর, লোকসংখ্যা ৬৭৪০।

কেতুগ্রাম শক্তিপীঠরূপে খ্যাত। প্রবাদ : এখানে সতীর বামবাহু পতিত হয়েছিল। কষ্টিপাথরে নির্মিত কার্তিক ও গণেশের মূর্তি-সহ দেবী বেহুলার মূর্তি রাজা চন্দ্রকেতু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

কোগ্রাম-উজানি : মঙ্গলকোট থানার ৫৮নং অতি প্রাচীন জনপদ, আয়তন ৫৭.৪৩ হেক্টর, লোকসংখ্যা ২৯০। গ্রামটি অজয় ও কুনুর নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। বর্ধমান-নতুন হাট বাসে যাওয়া যায়। চৈতন্যমঙ্গল চরিতকাব্য রচয়িতা বৈষ্ণব কবি লোচনদাসের জন্মস্থান। এটিও একটি শাক্তপীঠ বলে কথিত আছে। প্রবাদ : এখানে সতীর দক্ষিণ কনুই পতিত হয়েছিল। দেবী সর্বমঙ্গলা (পিতলের মূর্তি) ও ভৈরব কপিলাম্বর। পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের জন্মভিটা সাহিত্যিকদের তীর্থস্থান।

কল্যাণেশ্বরী (মৌজা দেবীপুর কুলটি থানা) : বরাকর হতে ৮ কিমি দূরে হালদা পাহাড়ে এক গুহামন্দিরে দেবী অবস্থিত। শিখরভূমির রাজা কল্যাণ সিং

এই পাহাড় ও চালনাদহকে ঘিরে কল্যাণপুর পত্তন করেছিলেন বলে দেবীর নাম কল্যাণেশ্বরী। কোন বিগ্রহ নাই। গর্ভমন্দিরে দেবী বিমুখ হয়ে বিরাজিতা। কল্যাণেশ্বরীদেবীর পূজার স্থানটি মাইথন অর্থাৎ মায়ের স্থান নামে খ্যাত। এখানে মাইথন ব্যারেজেও হাইড্রো ইলেকট্রিক প্ল্যান্ট আছে।

বরাকর : আসানসোল মহকুমার কুলটি থানার ৩০ নং বরাকর একটি শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র। বরাকর নদীর তীরে অবস্থিত। শহর এলাকা কুলটি বরাকর নোটিফায়েড এলাকার আয়তন ৩২.৫৭ বর্গ কিমি, লোকসংখ্যা ৮৬,৮৩২। এখানে স্থাপত্য সৌন্দর্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ অনেক মন্দির আছে। ৬ষ্ঠ–৭ম শতকের একটি মন্দির ধ্বংসস্তূপে পরিণত। অন্য দুটি মন্দির পুরুলিয়ার তেলকুপি মন্দিরের ন্যায় জৈন প্রভাবে প্রভাবান্বিত। একটি মন্দিরের লিপি থেকে জানা যায় মন্দিরটি গোপভূমের হরিশ্চন্দ্র কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। একটি মন্দিরে আছে মৎস্যমূর্তি সমন্বিত শিবলিঙ্গ আর অন্যটিতে গণেশ ও অন্যান্য দেবদেবীর সহিত শিবলিঙ্গ। বেগুনাকৃতি এই মন্দির বেগুনিয়া-মন্দির নামে খ্যাত। মন্দিরটি রেখদেউল রীতিতে গঠিত। একটি মন্দিরের লিপি বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপির অক্ষরের অনুরূপ, অন্যটি রঘুনন্দনের ধর্মপূজাবিধি লিপির অক্ষরের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত।

বেগুনের আকৃতিবিশিষ্ট বলে বেগুনিয়া মন্দিরের নামকরণ হয়েছে বলে Peterson-এর এই ব্যাখ্যা ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের মতে ঠিক নয়, তাঁর মতে বেগুনিয়া গ্রামে অবস্থিত বলে নাম হয়েছে বেগুনিয়া মন্দির। ৩নং মন্দিরে লিঙ্গের সহিত সংশ্লিষ্ট অর্ঘ্যরূপে শায়িত মৎস্যমূর্তির অবস্থান রহস্যাবৃত। এ সম্বন্ধে Peterson বলেছেন the fish is essentially a representration of the female powers of nature কিন্তু মহাভারত, ভাগবত ও লিঙ্গপুরাণ পর্যালোচনা করে আমর ধারণা হয়েছে লিঙ্গ ও যোনিসম্মিলিত প্রতীক শিবলিঙ্গ— উর্বরতা কালটের প্রতীক। লিঙ্গপুরাণে আছে কামার্ত শিব বসুন্ধরাকে বিদীর্ণ করার প্রাক্কালে বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা শিবের শিশ্ন খণ্ডিত করলে গৌরী কর্তৃক লিঙ্গ যথাস্থানে সন্নিদ্ধ হয়। গৌরী পট্টাকৃতি মৎস্য প্রজননের প্রতীক অবতারতত্ত্বের প্রথম সৃষ্টি এই মৎস্য—ডারউনের বির্বতনবাদের (Theory of Evolution) প্রথম সৃষ্টি জেলিফিস। মহাভারতে আছে বৈবর্ত মনু প্রজা সৃষ্টির মানসে কঠোর তপস্যা করে সমস্ত প্রাণীজগৎ সৃষ্টি করলেন। এর জন্যই ভগবান বিষ্ণু মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাই আমার মতে ডারউইনের বিবর্তনবাদ আবিষ্কারের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে হিন্দুশাস্ত্রের অবতারতত্ত্বে ডারউনের বিবর্তনবাদের nuclears নিহিত।

দুর্গাপুর : শিল্পনগরী—পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত গোটা অঞ্চল শাল-সেগুনের বনাঞ্চল ছিল। ষাটের দশকে এখানে বিশাল শিল্পনগরী গড়ে উঠেছে। নোটিফায়েড এলাকার আয়তন ১৫৪.২০ বর্গ কিমি, লোকসংখ্যা ৪২৫৮৩৬। ২২৭১ ফুট দীর্ঘ দুর্গাপুর ব্যারেজ পর্যটকদের আকর্ষণ করে। এখানকার প্রধান প্রধান শিল্পের মধ্যে দুর্গাপুর কোক ওভেন, স্টীল প্ল্যান্ট, কোল মাইনিং মেসিনারী প্ল্যান্ট, দুর্গাপুর কেমিক্যালস্ লিঃ, এ্যালয় স্টীল প্ল্যান্ট, মাইনিং এণ্ড এ্যালায়েড মেসিনারী ইন্ডাস্ট্রি, ফারটিলাইজার করপোরেশন, দুর্গাপুর থারমাল পাওয়ার স্টেশন, এসিসি ভিকার্স—ব্যাব্কক্ লিঃ, ডি.পি.এল. উল্লেখযোগ্য। এখানে একটি টুরিষ্ট লজ আছে।

চুরুলিয়া : জামুরিয়া থানার ৬নং গ্রাম। আয়তন ১০৪২.০৭ হেক্টর, লোকসংখ্যা ৬০৫২। আসানসোল বা বরাবনি থেকে বাসে যাওয়া যায়। এখানে রাজা নরোত্তমের গড় নামে একটি গড়ের ধ্বংসাবশেষ আছে। নরোত্তম মনে হয় গোপভূমের কোন সামন্তরাজ ছিলেন। ওল্‌ডহামের মতে দুর্গটি পঞ্চকোট রাজের দ্বারা নির্মিত। বিদ্রোহী কবি নজরুলের জন্মস্থান।

এছাড়া আছে আসানসোলের কাছে চিত্তরঞ্জন শহর—আয়তন ১৯.৬৫ বর্গ কিমি, লোকসংখ্যা ৪৭১৮৬। এখানে রেলইঞ্জিন তৈরীর কারখানা আছে। এখানে পরিদর্শনের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাগে। হিন্দুস্তান কেবল্‌সে—বৈদ্যুতিক তার তৈরীর কারখানা।

জেলার অর্থনৈতিক চিত্র অধ্যায়ে শিল্প পর্যায়ে শিল্পাঞ্চলের বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে।

আরও কিছু গ্রাম সমীক্ষার সারণী সংশ্লিষ্ট হলো।

মৌজা জে.এল.নং	যাতায়াত-এর ব্যবস্থা	নিকটবর্তী শহর (দূরত্ব)	আয়তন (হেক্টর)	লোকসংখ্যা মোট	পুরুষ	স্ত্রী
বর্ধমান সদর থানা		বর্ধমান ব্লক	৩৮৩.৮৬ বর্গ কিমি	২৪০০৮৭	১২৪১৯৯	১১৫৯৬৮
কলিগ্রাম (১০৩)	বর্ধমান থেকে বাস	,,	৬৯৭.৫৯ হেক্টর	২৫১৫	১২৯৭	১২১৮
কামারকিতা (১১৮)	,,	,,	২০০.১০	১১৯২	৬২৫	৫৬৭
জরুর (১৫১)	শক্তিগড় থেকে বাস	শক্তিগড় (৫ কি.মি.)	৪৫ ৫৬	৪৭৪	২৫৪	২২০
পুতুণ্ডা (১৫৪)	,,	শক্তিগড় (২ কি.মি.)	৪৩৬.৭৫	৩৪৬৭	১৭৯৪	১৬৭৩
বণ্ডুল (১১৩)	বর্ধমান থেকে বাস	বর্ধমান (৩০ কি.মি.)	১৬৯.৩৭	১৪২৮	৭৪২	৬৮৬
বড়শূল (১৬৩)	,,	শক্তিগড় (৩ কি.মি.)	৩২২.৯১	৪২৯৪	২২৫৬	২০৩৮
বৈকুণ্ঠপুর (৯১)	বর্ধমান-কালনা বাস	বর্ধমান (১৩ কি.মি.)	২৯১.২৮	২১৪০	১১০৫	১০৩৫
ভিটা (৬৩)	বর্ধমান-কুসুমগ্রাম বাস সার্ভিস	বর্ধমান (৮ কি.মি.)	২৯৯.৩৩	১৫৫৪	৮০৪	৭৫০
রায়ান (৬৮)	বর্ধমান থেকে বাস	বর্ধমান (২ কি.মি.)	১০৮৬.৩৬	১২৪১২	৬৪৬৫	৫৯৪৭
শক্তিগড় (১৫৫)	বর্ধমান থেকে বাস মেন ও কর্ড লাইনের স্টেশন	বর্ধমান ১০ কি.মি.	২৩৮.১৬	৬৮৪৯	৩৬০৩	৩২৪৬

তপসিলী	উপজাতি	শিক্ষিত		দেবদেবী, উৎসব ও অন্যান্য
		পুরুষ	স্ত্রী	
৮১৩৫৯	১৯৯০১	৭১২২৯	৪৬৩৪৮	
১১৮০	৩৫	৮৭৪	৬৩৪	প্রস্তর নির্মিত অষ্টভুজা জয়দুর্গা, যোগাদ্যা, মনসা, সূর্য ও বিষ্ণুমূর্তি, জয়দুর্গা পূজা হয় আষাঢ়ে কৃষ্ণাদ্বিতীয়ায়।
৫২৩	২৭	৩৪২	২৫৫	পরিখা বেষ্টিত গড়বাড়ি।
				রাধাগোবিন্দজীর মন্দির, রঘুনাথ মন্দির।
২৬৮	২৬	১৭৬	১২০	যোগাদ্যা, রক্ষাকালী ও রঘুনাথ জিউ।
১৩৩৬	১২৪	১৯৫৪	১২৫৪	আটচালা মন্দিরে দামোদর শিলা, রাধাকৃষ্ণ, শিবলিঙ্গ রক্ষাকালী (লালঘোড়া) দিদিঠাকরুন (সাদা ঘোড়া)
৭৩৬	৪২	৩৯৮	২৫২	সাধকপ্রবর বিশুদ্ধানন্দ স্বামী (গন্ধবাবা) পূর্বনাম ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ রায়, দ্বিজপদ রায়, দেবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান।
১৪১৪	২১৬	১৫৭৭	১১১৪	ধর্মশিলা—জ্যৈষ্ঠ মাসে অরণ্যষষ্ঠী থেকে ৪ দিন গাজন হয়। শ্মশানকালী—চৈত্র মাসে দ্বিতীয় শনিবার। রাজরাজেশ্বরের বিগ্রহ
৬৪৪	৩৫৮	৫১২	৩২৮	রাজবংশের আদিপুরুষ সঙ্গম রায় এখানে প্রথম বাস করেন। পীড়াদেউল মন্দিরে গোপেশ্বর শিব, রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ, রক্ষাকালী, মনসা।
৪৭৯	১৩১	৫৪০	৩৫৫	আগে নাম ছিল বাসুদেবপুর, রাজার খাস তালুক হিসেবে ভিটা (Homestead) নাম হয়। যোগাদ্যা, মনসা, শিব, পঞ্চানন প্রভৃতি দেবদেবী আছে।
৩৩১৮	৫২৪	৩৫৫৬	২১৮২	টেরাকোটা অলঙ্করণে সজ্জিত মন্দিরে দক্ষিণেশ্বর শিব; বসন্তচণ্ডীর শিলামূর্তির আষাঢ়ের নবমীতে পূজা হয়। যাত্রাপালা-কার ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী এই গ্রামের সন্তান। চৈত্র মাসে গাজন হয়।
১৩৩৬	১২৪	১৯৫৪	১২৫৪	একবাংলা মন্দিরে বর্ধমানরাজের প্রতিষ্ঠিত শিলাময়ী কালিকা; বিপরীতে রাধাবল্লভের পঞ্চরত্নমন্দির। এখানকার ল্যাংচা বিখ্যাত।

মৌজা জে.এল.নং	যাতায়াত-এর ব্যবস্থা	নিকটবর্তী শহর (দূরত্ব)	আয়তন (হেক্টর)	লোকসংখ্যা মোট	পুরুষ	স্ত্রী
হাট-গোবিন্দপুর (১৩৬)	বর্ধমান থেকে বাসে (১০ কিমি)	বর্ধমান	৬৭২.৪০	৪৬৫৮	২৩৯৩	২২৬৫
আউসগ্রাম ব্লক ১ }		২৩০.৫৬	৯৩৯০২	৪৮১১২	৪৫৭৯০	৩১৬৬৬
থানা ব্লক-২		২৫৪.৪৯	৯৩১১৫	৪৭৭২৫	৪৫৩৯০	৩৭০৫১
এড়াল (৯৩)	গুসকরা-মানকর বাস	মানকর গুসকরা	৮১৩.৮৫ বর্গ কিমি	৩৮৪৯	১৯১৬	১৯৩৩
গুসকবা (১৫৮)	সাহেবগঞ্জ লুপ বর্ধমান থেকে	গুসকরা	২১.১৫ বর্গ কিমি	২৬৯৯৫		
খটনগর (৪৪)	বর্ধমান-রামনগর বাস	বোলপুর ও গুসকরা (২০ কিমি)	১৪৯.০৩	১২৭৭	৬৫৯	৬১৮
তকিপুর (১৭১)	বর্ধমান-ভোঁতা বাস	গুসকরা (২০ কিমি)	৪২৪.০৪	২১৯৫	১১৪৬	১০৪৯
দরিয়াপুর (১৬২)	গুসকরা-মানকর বাসে	গুসকরা (৫ কিমি)	৫০৭.৮৭	২৬৮৩	১৩৯২	১২৯১
বননবগ্রাম (৪০)	গুসকরা-আউসগ্রাম বাস	গুসকরা (১৭ কিমি)	৯৪৭.৫৭	৩৯৯১	১৫৭৯	১৫১২
মৌখিরা (১)	পানাগড়-ইলামবাজার বাস	গুসকরা (২২ কিমি)	৬০২.৮৩	২০৮৭	১০৯৪	৯৯৩
সর (৯৫)	গলসী থেকে ৩ কিমি উত্তরে, কাঁচারাস্তা	গুসকরা (১৭ কিমি)	৫৩৯.৭৪	৩৪৭৮	১৮১১	১৬৬৭
ভাতার থানা	ভাতার ব্লক		৪১৪.৪০ বর্গ কিমি	২১০৪৫৭	১০৮০৯০	১০২৩৬৭
এরুয়ার (৯৮)	গুসকরা-বলগোনা বাস	গুসকরা (১২ কিমি)	২০৬৩.৪৫	৮০০৭	৪০৬৫	৩৯৪২

তপসিলী	উপজাতি	শিক্ষিত		দেবদেবী, উৎসব ও অন্যান্য
		পুরুষ	স্ত্রী	
১৮৯২	৫৭০	১৪৭৯	৯৯১	মনসা, শ্রীধর ও অষ্টনায়িকা দুর্গার আটচালা মন্দির আছে। এখানে একটি কলেজ আছে।
১২০২৫	২৬৩১৮	১৭৩৫৬		
১৩৬৬৩	২৩৯০২	১৪৮৭৭		
১৫৫৪	৫২৭	১১৮৫	৮০০	বুদ্ধ প্রভাবান্বিত বুদ্ধেশ্বর শিব, ১৫ ফুট উচ্চ কালীমূর্তি; যাত্রা সিদ্ধি বাঁকুড়া রায় ও সদাশিব নামধারী ধর্মঠাকুর।
৯০৮৯	—	২১৯২	১২২৩	ইস্ট ইন্ডিয়া কোং-এর আমলে কুনুর নদীর ধারে একটা নীলকুঠি ছিল। দেবী রমনা— দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ও মন্দির। ধান চালের বড় কেন্দ্র, এখানেও একটি কলেজ আছে।
৫৬৯	১৮৫	৩৪২	২৩৪	টেরাকোটা অলংকরণে সজ্জিত ৫০ ফুট উচ্চ লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির। ৪০ ফুট উচ্চ শিবমন্দির।
১২২০	১৫৩	৪৯৬	৩৪৮	কালীপূজার সময় ১৫ ফুট উচ্চ কালী। কালীপূজা, বিরাট উৎসব।
১১৩১	৩০৩	৬৮৫	৪২৯	ডোকরা শিল্পীদের বাস।
১০৩৭	৬২৮	৭৩৭	৪২০	পার্শ্ববর্তী গ্রাম ওয়ারিশপুরে বৃহৎ মসজিদ ও ইমামবাড়া। জেলার একমাত্র ইমামবাড়া। আদিরায় ধর্মঠাকুর, প্রস্তর নির্মিত কালিকামূর্তি।
১৪১৬	৬৭	৫২৪	৩১১	মন্দিরময় গ্রাম; ২০টি মন্দিরের ১২টিতে বিগ্রহ আছে, অধিকাংশ মন্দির টেরাকোটা অলংকৃত, প্রাসাদতুল্য দুর্গামণ্ডপ।
১৫০৬	৫৬১	৬৪০	৩৫৬	সারঙ্গ মুরারি প্রভুর শ্রীপাট। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভ মূর্তি শিখরদেউল ও আটচালা মন্দিরে শিবলিঙ্গ। গ্রামদেবতা সরেশ্বর শিব।
৬৫৪০২	১৮১৯৯	৫৮৭০৭	৩৯৫৩৩	
২৫৮৮	৩২৬	১৭৯৮	১২৭০	মহারুদ্রদেবের পঞ্চরত্ন মন্দির, ষষ্ঠীগড়ের পাড়ে প্রাচীন শিবমন্দির, এ মন্দিরের সম্মুখ-ভাগে তাজিয়ার কারুকার্য, সন্ন্যাসী গোঁসাই প্রতিষ্ঠিত জোড়া কালীমূর্তি। শ্রাবণী অমাবস্যায় কালীপূজা হয় ও মেলা বসে।

মৌজা জে.এল.নং	যাতায়াত-এর ব্যবস্থা	নিকটবর্তী শহর (দূরত্ব)	আয়তন (হেক্টর)	লোকসংখ্যা মোট	পুরুষ	
কামারপাড়া (মৌজা- বনপাশ ২১)	বর্ধমান- গুসকরা বাস	বর্ধমান (১৮ কিমি)	৭০১.৭৪	৬৪৭১	৩২৮৪	৩১৮৭
কালাচাঁদতলা (বেলগ্রাম কাঁচগড়িয়া ৯৭)	ভাতার থেকে ৩ কিমি	বর্ধমান ২১ কিমি	৪৭.২১	৮৩২	৪১৩	৪১৯
কালিপাহাড়ী (৭৪)	বলগনা থেকে ৩ কিমি হাঁটাপথ	বর্ধমান (৩০ কিমি)	৪২৩.৪৮	২৫৩২	১২৮২	১২৫০
নাসিগ্রাম (৮৯)	বর্ধমান থেকে বাস সার্ভিস	বর্ধমান (৩০ কিমি)	২২৮১.৫২	৭৬০৮	৩৮৯৩	৩৭১৫
মহাতা (৩৩)	গুসকরা- বলগনা বাস	গুসকরা (১৫ কিমি)	৯১১.৮৭	৪৩৩২	২২৫১	২০৮১
রায় রামচন্দ্রপুর (মৌজা- পূর্ব রামচন্দ্রপুর ৮০)	ঐ	গুসকরা (১২ কিমি)	৬৫.৮৯	৫৬৬	২৮৯	২৭৭
মেমারী থানা	গ্রাম		১৮৯.৬১	১৭৪৯০৩	৮৯৭৪৪	৮৫১৫৯
	শহর	মেমারী- ব্লক ১	৬.০৬	২০৬৯০	১০৯৭৫	৯৭১৫
		মেমারী- ব্লক ২	২৩১.৪৩	১৪২৩৭২	৭৩০৬৬	৬৯৩০৬
আমোদপুর (১২৮)	মেমারী স্টেশন থেকে ২ কিমি উত্তরে (বাস সার্ভিস)	মেমারী (২ কিমি)	৪৬৪.৭৭ বর্গ কিমি	৪৩২২	২২১৩	২১০৯
কানপুর (১২০)	মেমারী থেকে বাস	মেমারী (৮ কিমি)	১২৫.৮৩	৫৭৮	৩১৬	২৬২

তপসিলী	উপজাতি	শিক্ষিত		দেবদেবী, উৎসব ও অন্যান্য
		পুরুষ	স্ত্রী	
২০৫৮	৩৩০	২০৪৯	১৫৬৫	পূর্বে স্টীলের তরবারি ও বন্দুক তৈরি হতো। পিতল কাঁসার বাসন তৈরি হতো। এখন সব স্বর্ণশিল্পী, টেরাকোটা অলংকৃত আটকোণা শিবমন্দির, বুড়োশিবের মন্দির, মনসা, দিদি ঠাকরুন, চর্তুভুজা দুর্গা আছে।
২৮৭	—	২৫৬	১৭৩	কূর্মমূর্তিতে ধর্মরাজ—বৈশাখী পূর্ণিমায় বিশেষ উৎসব ও মহাপূজা, বলিদান হয়।
৮৯৭	—	৯৬৯	৭১৪	১ ফুট উঁচু প্রস্তর-নির্মিত হংসারূঢ়া ব্রাহ্মণী (মনসা) আষাঢ়-এর কৃষ্ণানবমীতে মহাপূজা ও বলিদান। পূর্বস্থলী থানার ব্রাহ্মণী-তলাতেও ব্রাহ্মণী দেবীর পূজা হয়।
২৪৪৮	৩২	২৫০০	২০০৪	গোপীনাথ, রাধামাধব, বুড়োশিব, ন্যাড়া মা, রক্ষাকালী, বৃদ্ধরাল (ধর্মঠাকুর) প্রভৃতি দেবদেবী আছে। বুড়োশিব গ্রামদেবতা। সত্যনারায়ণ পাঁচালী রচয়িতা কাশীনাথ সার্বভৌমের জন্মস্থান (১৭৪০ সাল)।
১২৪১	৮০৯	১১০৪	৬৪৪	গোস্বামীদের গৃহে গোবিন্দদেব বিগ্রহ, পঞ্চানন্দ মনসা, ভদ্রকালী ও মাঘমাসে গোবিন্দদেবের বিশেষ পূজা ও মেলা হয়।
—	—	১৬০	৯৫	কটা রায়, ময়না রায়, মেঘ রায় ও পোড়া রায় —কূর্মাকৃতি ধর্মশিলা আছে। বৈশাখী পূর্ণিমায় গাজন হয়, পূজায় ৯টি ছাগ একসঙ্গে বলিদান করা হয়।
৬১৩২১	২৬২১৯	৪৯৯১৬	৩৩০৮০	
৪২৬০	৭১১	৭৪৩৫	৫২০৬	
৩৭১৯৮	২৫৬৮৬	৪০৪৯৪	২৬৩৮৯	
৮৩৬	১১২৩	১২০৪	৮৯৫	২০টি টেরাকোটা মন্দির আছে। খাঁ পুকুরের পাড়ে ৩০ ফুট উচ্চশিখর দেউল মন্দির ত্রিরথাকৃতি (১৫৭২ খৃঃ) আনন্দময়ীর মন্দির, গোপাল জিউ-এর মন্দির উল্লেখযোগ্য।
৩৬৮	১১০	৩৮৪	২৫৫	প্রস্তরনির্মিত মহিষমর্দিনী সর্বমঙ্গলা রূপে পূজিতা। মহাপূজা জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে। বুদ্ধ-পূর্ণিমায় ধর্মরাজের গাজন।

মৌজা জে.এল.নং	যাতায়াত-এর ব্যবস্থা	নিকটবর্তী শহর (দূরত্ব)	আয়তন (হেক্টর)	লোকসংখ্যা মোট	পুরুষ	স্ত্রী
দেবীপুর (১৯৩)	হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনে	মেমারী (১৩ কিমি)	৩৩৩.৬০	২২৯২	১১৮৭	১১০৫
বোহার (৯৩)	মেমারী থেকে বাস	মেমারী (১৯ কিমি)	৮৯৬.৬৮	৭৬৯০	৩৮৬৭	৩৮২৩
মেমারী (১৫২)	মেন লাইনের স্টেশন	মেমারি	শহর এলাকা ৬.০৬ বর্গ কিমি	২০৬৯০	—	—
জামালপুর থানা ও ব্লক			২৬২.৯০ ব.কিমি	২১১৯৫৭	১০৮৪৩৫	১০৩৫২২
ইলসরা (১১৬)	কর্ড লাইনে জৌগ্রাম স্টেশন থেকে ৩ কিমি পূর্বে রিক্সায়	মেমারী ৯ কিমি	২২৭.৮৬	১১৮২	৬০৯	৫৭৩
গোপীকান্ত-পুর (৫৬)	মশাগ্রাম থেকে বাসে চকদীঘি ও পরে পূর্বে ৩ কিমি হাঁটা পথ	মেমারী ২৫ কিমি	৩২২.০১	২০২৬	১০৫১	৯৭৫
চকদীঘি (৫৯)	বর্ধমান-তারকেশ্বর বাস	তারকেশ্বর ১৮ কিমি	৭৮.৫১	১৩১৩	৬৮৩	৬৩০
জৌগ্রাম (১১৪)	বর্ধমান-হাওড়া কর্ড লাইনের স্টেশন	মেমারী (১২ কিমি)	৮৮৯.০১	৮১৬১	৪২০৬	৩৯৫৫
পর্বতপুর (২৬)	জৌগ্রাম স্টেশন থেকে ৪ কিমি পশ্চিমে	মেমারী ১৩ কিমি	৩৩৫.৫৬	১৯০৯	১০০১	৯০৮

তপসিলী	উপজাতি	শিক্ষিত পুরুষ	শিক্ষিত স্ত্রী	দেবদেবী, উৎসব ও অন্যান্য
৫৩৩	৬৬৭	৫২৮	৩২৬	সিংহ পরিবারের স্থাপিত ৬০ ফুট উচ্চ টেরাকোটা অলংকৃত লক্ষ্মী-জনার্দনের মন্দির (১২৪৭ সাল) শিব, কালিকা, বুড়ো শিব প্রভৃতির পূজা হয়।
১১১৪	১৬৩৫	২১৯৫	১৪৬২	মুসলমান রাজত্বকালে বিখ্যাত ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল। আরবী ও পার্শী শিক্ষার আবাসিক প্রতিষ্ঠান ছিল। এখানকার লাইব্রেরীর পুস্তকগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে। মাদ্রাসার কাছে একটি তিন গম্বুজওয়ালা মসজিদ ছিল।
৪২৬০	—	৯২৭	৫৩০	বাণিজ্য কেন্দ্র—পূর্বে এখানে সূতি ও রেশমী বস্ত্র উৎপাদিত হতো। সোমেশ্বর শিবমন্দির, সিংহবাহিনী, সর্পছত্রশোভিত শিলাময়ী মনসা পূজা হয়।
৭২২৩৭	৩২৮৯০	৫৮০৩৭	৩৮২২৭	
৪১০	২৯৭	২১৬	১৫১	বাবুসাহেব, পীর সাহেব, বদর সাহেব ও বড় পীর সাহেবের আস্তানা। কৃষ্ণ রায়ের দোল উৎসব। ড. শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের জন্মস্থান।
৪৯৮	৮৬০	৫৪৪	৩০৩	১/২ কিমি দক্ষিণে দামোদর নদীর হানার ধারে বনের মধ্যে রঙ্কিনী দেবীর মন্দির, ১লা বৈশাখ দেবীর চড়ক উৎসব হয়।
৪০০	১২৩	৪৯১	৩৬৮	সিংহরায় পরিবারের জমিদারী। সারদাপ্রসাদ সিংহরায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নির্দেশে ১৮৫৭ খ্রীঃ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ৮টি শিবমন্দির ও ১৬ স্তম্ভের উপর নির্মিত দুর্গামণ্ডপ স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন। টেরাকোটা অলংকৃত জোড়াশিবমন্দির ও পীরস্থান আছে।
৩৫৩৮	১৫৪১	২২০০	১৩৬৬	১৪/১৫টি শিবমন্দির, জোড়াশিবমন্দির, রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ, জলেশ্বর শিব, নাপিতে কালী মনসা, বদর সাহেবের সমাধি আছে।
৩১১	৯৭৪	৪৯৯	২৭৫	১৬ই ফাল্গুন শ্মশানকালীর পূজা, শ্যামসুন্দর, মনসা-ধর্মরাজ কালাচাঁদ, সিদ্ধেশ্বরী কালী প্রভৃতি দেবদেবী আছে।

মৌজা জে.এল.নং	যাতায়াত-এর ব্যবস্থা	নিকটবর্তী শহর (দূরত্ব)	আয়তন (হেক্টর)	লোকসংখ্যা মোট	পুরুষ	স্ত্রী
পাঁচড়া (মৌজা-রূপপুর ১৫)	মশাগ্রাম-চকদীঘি বাস	মেমারী (১২ কিমি)	৭৯৭.০১	৫৬২২	২৮৪৪	২৭৭৮
মশাগ্রাম (১৩)	বর্ধমান-তারকেশ্বর বাস লাইনে, কর্ড লাইনে মসাগ্রাম স্টেশনে নেমে রিক্সায় ১ মাইল	মেমারী (১০ কিমি)	৩৮২.০৯	৩৬৮৪	১৯০০	১৭৮৪
সাদিপুর (৭)	মসাগ্রাম-জামালপুর বাসে বটতলায় নেমে দামোদর বাঁধ ধরে মাইলখানেক গিয়ে দামোদর পার হতে হয়।	মেমারী (১৫ কিমি)	২৩৯.৩৮	২০৪৫	১০৪২	১০০৩
(শুঁড়ে) কালনা (৪৩)	বর্ধমান-তারকেশ্বর বাস	মেমারী (২০ কিমি)	২১৯.৬৮	২৬৬১	১৩৬১	১৩০০

রায়না থানা :

মৌজা জে.এল.নং	যাতায়াত-এর ব্যবস্থা	নিকটবর্তী শহর (দূরত্ব)	আয়তন (হেক্টর)	লোকসংখ্যা মোট	পুরুষ	স্ত্রী
কাইতি (১৬৪)	বর্ধমান থেকে বাস	বর্ধমান (২৮ কিমি)	২০৭.৩১	২১৮৪	১১১৫	১০৬৯

তপসিলী	উপজাতি	শিক্ষিত		দেবদেবী, উৎসব ও অন্যান্য
		পুরুষ	স্ত্রী	
১৬৬৩	১১৩৪	১৪২২	৯২৮	কূর্মরূপী ধর্মরাজ—বৈশাখে গাজন ও মেলা। বিশালক্ষী দেবী, কষ্টিপাথরের কৃষ্ণ ও অষ্টধাতুর রাধিকা, কাঠের বলরাম ও রেবতী, সিদ্ধেশ্বরী কালী প্রভৃতি দেবদেবী আছে।
১২৫১	৪৬০	৯৪৩	৬৬৮	বনরায়—ধর্মরাজের গাজন; জ্যৈষ্ঠ মাসে গাজনে সঙ বের হয়। বৈশাখের শেষ মঙ্গলবারে সদ্যমূর্তি তৈরি করে রক্ষাকালী পূজা, চারচালা, আটচালা, আটকোণা প্রভৃতি রীতিতে নির্মিত ৯ টি শিবমন্দির আছে।
১২৫৯	--	৪৫৬	৩০০	প্রাচীন নাম অনন্তবাটি। ৪০ বিঘা জমির ওপর মদনমোহন মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ। মন্দিরের আয়তন ছিল ৩৫ ফুট x ৩০ ফুট। মন্দির সংলগ্ন ৫০ ফুট x ৩০ ফুট x ১৫ ফুট নাটমন্দির (১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দ) মধ্যে মোহন দীঘি নামক পুষ্করিণী, কষ্টিপাথরের রাধাবল্লভ মূর্তি। রাধামোহন, পঞ্চানন, শীতলা, রক্ষাকালী। শিবের গাজন উৎসব, সবই প্রাচীন মিত্র বংশীয়দের কীর্তি।
৫৩৫	১৬৩	৮৯০	৬৫৪	মদনগোপাল জিউ, — ভাদ্রমাসে নৌকাবিলাস উৎসব, মন্দিরে মদনগোপাল, রাধিকা ও ললিতার দারুমূর্তি। রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ ও শিবমন্দির আছে।
৮৫	৭	৩১১	২২৩	'কাইতি চাপিয়া বন্দ বানরাজার পাট উষাবালি পোতাবন্দ শ্বেতগঙ্গার ঘাট।" শ্বেতগঙ্গা নামে একটি পুষ্করিণীর অস্তিত্ব ছিল, বানরাজার একটি ডাঙা ছিল বলে কথিত আছে। এই ডাঙা খনন করলে কিছু পুরাকীর্তি হয়ত মিলতে পারে। গ্রাম্যদেবী সিদ্ধেশ্বরী কালী, চৈত্রমাসে বারুণীর সময় শ্বেতগঙ্গার পাড়ে মেলা বসে।

মৌজা জে.এল.নং	যাতায়াত-এর ব্যবস্থা	নিকটবর্তী শহর (দুরত্ব)	আয়তন (হেক্টর)	লোকসংখ্যা মোট	পুরুষ	স্ত্রী
কোটশিমুল (২০৮)	রায়না থানার শেষ প্রান্তে। রায়না পর্যন্ত বাস তারপর ৫ মাইল হাঁটতে হবে।	বর্ধমান (৪৭ কিমি)	৩০৫.৮৩	১৫৮৯	৭৯৩	৭৯৬
ছোট বৈনান (১৬৭)	বর্ধমান থেকে আরামবাগ বাসে	বর্ধমান (৫০ কিমি)	৬০৮.৭৮	৫০৬৯	২৬৩০	২৪৩৯
দামুন্যা (২০০)	বর্ধমান দামুন্যা বাস	আরামবাগ (৫০ কিমি)	৪১৯.৪৬	২৬৩৬	১৩৬৯	১২৬৭
নাড়ুগ্রাম (১৪)	বর্ধমান থেকে বাস	বর্ধমান (১২ কিমি)	৯২১.৮৯	২৬২৫	১৩৫৮	১২৬৭
বলাগড় (৮৪)	বর্ধমান থেকে বড়শূল বাস ও শম্ভুপুর। ঘাটে দামোদর পার হয়ে ৬ কিমি হাঁটাপথ	বর্ধমান (২২ কিমি)	২২৯.২৮	১৭১৫	৮৮৫	৮৩০

তপসিলী	উপজাতি	শিক্ষিত		দেবদেবী, উৎসব ও অন্যান্য
		পুরুষ	স্ত্রী	
৪৯৫	২৯	৪৫৮	২৭৮	কোটশিমুল নাম থেকে বোঝা যায় এখানে প্রাচীনকালে একটি কোট বা দুর্গ ছিল। শাহজাহানের আমলে বঙ্গবরা খাঁ নামে এক উজির প্রাসাদ ও দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। গড়ের আয়তন ১০৬০ ফুট x ৮৯০ ফুট। চারদিকে ৭০ ফুট চওড়া ও ৩০ ফুট গভীর পরিখা ছিল।
১৯৫৩	১২৩	১৮৯৬	১৩৫৯	প্রবাদ : বাদশাহী সড়কের ধারে যদু বা জালালুদ্দিনের সময় এক মাইল অন্তর মসজিদ নির্মাণ করা হয়। পরে ছত্রধর সিংহ নামে এক জমিদার মসজিদ ধ্বংস করে কালী মন্দির নির্মাণ করেন। দক্ষিণেশ্বর শিব ও শাড়ী পরিহিত প্রস্তর নির্মিত বিষ্ণুমূর্তি আছে।
৭৯৪	—	৯৭৮	৭০৬	গ্রামে খড়ের চালের মাটির ঘরে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের বংশের প্রতিষ্ঠিত সিংহবাহিনী চণ্ডীমূর্তি, ধাতু নির্মিত চতুর্ভুজা। উপরের দু-হাতে পদ্ম ও চক্র, নীচের দু-হাতে ত্রিশূল, পদতলে সিংহ ও মহিষাসুর। প্রাচীন মূর্তি অবশ্য চুরি যায়। নতুন মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। রত্না নদীর তীরে শিবলিঙ্গ। রত্না নদীর জাহাজপোতা উৎখননের ফলে কাঠের পাটাতন পাথরের বাজু আবিষ্কৃত হয়েছে। পিতলের রুদ্রদেব ও চণ্ডী; শীতলা প্রভৃতি দেবদেবী আছেন।
১১৫৭	২১৪	৮৫৫	৫৫৫	নাড়েশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত। লিঙ্গটি মাটিচাপা অবস্থায় ছিল। মাটি খোঁড়ার সময় জনৈক গোপ আবিষ্কার করে। চৈত্র মাসে নাড়েশ্বরের গাজনে আগুন খেলা, ময়ূরপঙ্খী গান খুবই উপভোগ্য। তবে আজকাল জৌলুস কমে গেছে।
৯৬৮	—	৪৮৪	৩০৫	দামোদরের দেবখালের তীরে গ্রাম। গ্রামে ১০ ফুট x ১০ ফুট x ১৫ ফুট (উঃ) পাতলা ইটের তৈরি শিবমন্দির, ১৮ ফুট x ২০ ফুট x ৫০ ফুট শিবমন্দির পীড়া দেউল রীতিতে নির্মিত। মন্দিরগুলি খুবই প্রাচীন।

মৌজা জে.এল.নং	যাতায়াত-র এর ব্যবস্থা	নিকটবর্তী শহর (দূরত্ব)	আয়তন (হেক্টর)	লোকসংখ্যা মোট	পুরুষ	স্ত্রী
বোড় বলরাম (৮৩)	ঐ	ঐ	২৮৬.৭০	২২১৮	১১৪০	১০৭৮
শাকনাড়া (১১৭) বর্তমানে মাধবডিহি থানা	রায়না ৪ কিমি দক্ষিণে	বর্ধমান	০.৭৭	৫৩৫	২৬৩	২৭২
শ্যামসুন্দর (৭২)	বর্ধমান	বর্ধমান ১৮ কিমি	৭৫৭.৩০	৩৩৮৬	১৭৬১	১৬২৫

খণ্ডঘোষ থানা :

মৌজা জে.এল.নং	যাতায়াত-র এর ব্যবস্থা	নিকটবর্তী শহর (দূরত্ব)	আয়তন (হেক্টর)	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
কুমীরকোলা (৯)	বর্ধমান থেকে বাস	বর্ধমান (২৭ কিমি)	৩১৩.২৩	১২৮৯	৬৫৯	৬৩০
কৈয়র (৯৬)	বর্ধমান থেকে বাস	বর্ধমান (২১ কিমি)	৩৩২.৭৮	২২২৭	১১২১	১১০৬
খণ্ডঘোষ (১৮)	বর্ধমান থেকে বাস	বর্ধমান (২৪ কিমি)	১০৫১.৮৩	৫৬৮৮	২৮৬৪	২৮২৪

তপসিলী	উপজাতি	শিক্ষিত পুরুষ	শিক্ষিত স্ত্রী	দেবদেবী, উৎসব ও অন্যান্য
১৩০৯	—	৫৪৭	৩৭৮	বড়োর সবচেয়ে আকর্ষণ চতুর্দশ বাহু বিশিষ্ট বলরামের দারুমূর্তি। বৈশাখে অক্ষয় তৃতীয়ায় স্নান, চতুর্দশীতে চক্ষুদান ও গাজন। পৌষ মাসে সংক্রান্তিতে মহাভোগ ও মাকরী সপ্তমীতে মেলা। বিশদ বিবরণ দেবদেবী অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
১০৩	৮৯	১৮৮	১৪৮	সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জন্মস্থান। তাঁর মা কুড়ুনীদেবীও সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন ও তাঁর নিজের টোল ছিল।
১৩৪৫	১৭৪	১২৬৮	৮৮১	এ গ্রামের পূর্বনাম 'আহার বেলমা'; এখানকার বিশালাক্ষ বসুর প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দরের নামানুসারে এই নাম। অতীতের বাদশাহী সড়কের ধারে অবস্থিত একটি পুরাতন রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ ও ২০০ বিঘা আয়তনের দীঘি আছে। শ্যামসুন্দর, জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার মূর্তি, প্রস্তরনির্মিত দুর্গামূর্তি আছে। শ্যামসুন্দর কলেজ বিশালাক্ষ বসু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।
১১৮১	১৭	৩৯৩	২১৯	দরপত্তনীদার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের প্রতিষ্ঠিত রেবতী, বলরাম, শিব, রাধাগোবিন্দ মন্দির। এখানকার দুর্গাপূজার বিশেষ বৈচিত্র্য আছে। পৌষ মাসে রাধাগোবিন্দ পূজায় মেলা হয়।
১০৯০	৮৫	৭১৬	৫৩২	অভিরাম গোস্বামীর শিষ্য বেদগর্ভের শ্রীপাট। বেদগর্ভের প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মী-জনার্দন, মদনগোপাল, বিজয়গোপাল ও রাইরানী মূর্তি আছে। সম্প্রতি এখানে রামকৃষ্ণ আশ্রমের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
৩০২৫	৭০	১৪৫৩	৯২৩	বৈশাখী পূর্ণিমায় বুড়োশিবের গাজন, পৌষ মাসের অমাবস্যায় রক্ষাকালী পূজা, মাঘমাসে চতুর্দশীতে রটন্তী কালীপূজা, কমললোচন ধর্মঠাকুরের নবমদোল, রাধাবল্লভের পঞ্চম দোল—নানা উৎসব হয়। প্রখ্যাত আইনজ্ঞ রাসবিহারী ঘোষের জন্মস্থান।

মৌজা জে.এল.নং	যাতায়াত-এর ব্যবস্থা	নিকটবর্তী শহর (দূরত্ব)	আয়তন (হেক্টর)	লোকসংখ্যা মোট	পুরুষ	স্ত্রী
বোঁয়াই (৩৫)	বর্ধমান থেকে বাস	বর্ধমান ২৭	৫৫৫.১৪	৩২৫২	১৭২২	১৫৩০
শাঁকারী (৭০)	ঐ	বর্ধমান (১৮ কিমি)	১০৮১.৬৭	৩৮২১	১৯১৫	১৯০৬
গলসী থানা :						
আদরা ৭৮	বর্ধমান থেকে বাস	বর্ধমান (৩৩ কিমি)	৬৬১.২৭	৩১৫০	১৬০৮	১৫৪২
উড়ো (১৩৭)	ঐ	বর্ধমান ১৫ কিমি	৪৬৫.৪৬	৩০৪৫	১৫৬১	১৪৮৪
কৈতারা (৭৪)	গোহগ্রাম থেকে বাস	বর্ধমান ৩৩ কিমি	৩৮১.৯৪	২৮২১	১৪৩২	১৩৮৯
গলসী	বর্ধমান	বর্ধমান ২২ কিমি	৮৭৮.০৮	৮৫৬০	৪৪৯৪	৪০৬৬
মল্লসারুল (৭৬)	গলসী থেকে ২০ কিমি দক্ষিণপশ্চিমে রিক্সা	বর্ধমান ৩৬ কিমি	৮৩৪.৪৯	৩৬৮২	১৯১০	১৭৭২

তপসিলী	উপজাতি	শিক্ষিত		দেবদেবী. উৎসব ও অন্যান্য
		পুরুষ	স্ত্রী	
১৩৩৬	২২	১০৫২	৬৮০	গ্রাম্যদেবী বোঁয়াই চণ্ডী; বুদ্ধিমন্ত খাঁ-এর দ্বারা দেবী প্রতিষ্ঠিত; অম্বুবাচীর সময় ও মহানবমীতে মহাপূজা ও বলিদান এবং মেলা। মহাপূজার সময় রুধির ভৈরব রক্তস্রোতে স্নাত হয়। নূতন মন্দিরের নির্মাণ কার্য চলছে জনগণের অর্থানুকূল্যে।
১৬৯৬	৩৫৩	১০৯২	৭৩৪	ধর্মমঙ্গলের কবি নরসিংহ বসুর বাসস্থান। মজুমদার পরিবারের পঞ্চরত্ন মন্দির (১৬৭৩ খ্রী) সিংহবাহিনী মন্দির (১৭৬২), টেরাকোটা শিবমন্দির (১৭৬১), বাসুদেব বিগ্রহ। বাসুদেব বিগ্রহের মূর্তির ভাস্কর্য অপূর্ব।
১৬০৩	২৫২	৬৭৩	৪২৯	মল্লসারুল তাম্রশাসনে উল্লিখিত অধরক জনপদই বর্তমান আদরাহাটি—রুদ্রভাগে দেবমূর্তি ক্ষোদিত আদারেশ্বর শিব, পাশে প্রস্তর নির্মিত জয়দুর্গা, রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ প্রভৃতি দেবস্থান আছে।
১৪১৭	২৫৮	৮৩৯	৬০৮	বাঘ রায়ের বাড়ীতে অষ্টভূজা সিংহবাহিনী মহিষমর্দিনী, কালাচাঁদ, ধর্মবিগ্রহ, শিব, শিলাময়ী মনসামূর্তি গ্রামে অধিষ্ঠিতা।
৭৬৪	২০	৮৩৩	৫৪২	মল্লসারুল তাম্রশাসনের কপিত্থ বাটকই বর্তমানের কৈতারা। এখানকার কর্মকারদের তৈরী পিতলের বাসনপত্র বিশেষ করে তেলের ঘটি বিখ্যাত। রাধাকৃষ্ণ, শ্রীধর, মনসা বুড়োরায়, ধর্মশিলা ও শিলাময়ী বিশালাক্ষীর পূজা হয়। ১৭৪৮ সালে নির্মিত শিবমন্দির।
৩১৩৫	৫৮	২৬৫১	১৫০০	গ্রামদেবতা গর্গেশ্বর শিব ও ধর্মরাজের শিলামূর্তি, অষ্টভুজা, দুর্গামূর্তি। শ্রাবণ মাসে ধর্মরাজের গাজন হয়। গাঙ্গুলী পরিবারের ১৭৭৬ শকাব্দের শিখর দেউল মন্দির উল্লেখযোগ্য।
১৩৮৮	—	৯৮৯	৬০৯	মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের অধীনস্থ সামন্ত-রাজা বিজয় সেনের ঐতিহাসিক তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে—এই তাম্রশাসনে বর্ধমান-ভুক্তির বহু গ্রামের উল্লেখ আছে। গ্রামদেবতা মল্লেশ্বর শিব।

মৌজা জে.এল.নং	যাতায়াত-এর ব্যবস্থা	নিকটবর্তী শহর (দূরত্ব)	আয়তন (হেক্টর)	লোকসংখ্যা মোট	পুরুষ	স্ত্রী
সারুল (১৩৬)	গলসী থেকে ৩ কিমি পূর্বে	বর্ধমান ২৭ কিমি	৩৩০.৫৩	১৭৫২	৯২৮	৮২৪
সাঁকো (১৫৪)	বর্ধমান থেকে কুলগড়িয়া বাস ও পশ্চিমে ২ মাইল রিক্সা	বর্ধমান ১৫ কিমি	১০৮৪.২৭	৭৩২০	৩৭৭৪	৩৫৪৬
পূর্বস্থলী থানা :						
চুপী ৭৯	পূর্বস্থলী স্টেশনের উত্তরে অবস্থিত	নবদ্বীপ ১৩ কিমি	২০৮.২৩	৫২১৯	২৭১১	২৫০৮
জামালপুর ৪৬	পাটুলী থেকে বাসে	কাটোয়া (২৬ কিমি)	৯৮.৪১	১০৮৭	৫৬৩	৫২৪
পাটুলী ১৭	নবদ্বীপ-কাটোয়া রেললাইন -এর স্টেশন; কাটোয়া থেকে বাসেও যাওয়া যায়।	দাঁইহাট (১৪ কিমি)	৩৪৮.০৯	৪৩৫০	২১৭৫	২১৭৫

তপসিলী	উপজাতি	শিক্ষিত		দেবদেবী, উৎসব ও অন্যান্য
		পুরুষ	স্ত্রী	
১১৭২	৩২	৫১২	২৮৬	বিশালাক্ষীর মন্দির আছে। একটি শিলাখণ্ডের উপর দেবীর চোখ আঁকা আছে। বৈশাখী পূর্ণিমায় দেবীর মহাপূজা। টেরাকোটা অলঙ্করণ শোভিত শিখর দেউল মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। চান্নার বিশালাক্ষীর সঙ্গে এখনকার বিশালাক্ষীর পার্থক্য চান্নার মূর্তি বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবীর অনুরূপ ও আষাঢ়ে নবমীতে মহাপূজা।
৩২৭১	৩৮৮	২৩০৮	১৫০২	মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে সাঁকোর শঙ্খ দত্ত গন্ধবণিকের উল্লেখ আছে। শঙ্খেশ্বরী মনসা, হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত সূর্য-মূর্তি—উষাদিত্য, মাকরী সপ্তমীতে বিশেষ পূজা ও উৎসব; মৃত্তিকা খনন করে বিষ্ণু বাসুদেবের অপূর্ব কারুকার্য সমন্বিত মূর্তি পাওয়া গেছে। বর্তমানে কালী-বুড়ি-চণ্ডী দেবীর কাছে সর্বরোগ নিরাময়ের ওষুধ পাওয়া যায় বলে অনেকের বিশ্বাস।
১১৯২	৫	১৪৬৯	৮৭৯	অক্ষয়কুমার দত্তের বাসস্থান। কবি সত্যেন্দ্র-নাথ দত্তেরও বাসস্থান। বর্ধমান রাজের দেও-য়ান ব্রজকিশোর রায় ও দেওয়ান পরিবাবের প্রতিষ্ঠিত মন্দির আজ ধ্বংসের পথে।
৭৫০	১০	৩৫৮	২৪১	জামালপুরের খ্যাতি বুড়োরাজের জন্য। বুড়ো শিবের 'বুড়ো' আর ধর্মরাজের 'রাজ' মিলে বুড়োরাজ, সেকারণ একটি নৈবেদ্যের মাঝে দাগ দিয়ে ২ ভাগ করে এক ভাগ শিব ও ১ ভাগ ধর্মরাজকে নিবেদন করা হয়। বৈশাখী পূর্ণিমায় মেলা ও মহাপূজা, অংসখ্য বলিদান হয়। কোনটিই দেবতাকে উৎসর্গ করা হয় না। মুসলমানও পূজা ও বলি দেয়। লৌকিক দেবদেবী অধ্যায়ে বিশদ্ বিবরণ দ্রষ্টব্য।
৮৫৭	—	১৪০৫	৯৯১	ভাগীরথী এখানে উত্তরবাহিনী—পৌষ সংক্রান্তি ও উত্তরায়ণে উত্তরবাহিনীর পূজা; লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির; পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির ছিল। নীলকুঠি ও রাজপ্রাসাদ ধ্বংসের পথে। গঙ্গার ধারে আগে নীলচাষ হতো।

মৌজা জে.এল.নং	যাতায়াত-এর ব্যবস্থা	নিকটবর্তী শহর (দূরত্ব)	আয়তন (হেক্টর)	লোকসংখ্যা মোট	পুরুষ	স্ত্রী
পূর্বস্থলী	কাটোয়া-নবদ্বীপ বাস	নবদ্বীপ	৩৭৯.০৯	৩২৮৩	১৬৯২	১৫৯[illegible]
সমুদ্রগড় (১৮[illegible])	কাটোয়া-নবদ্বীপ লাইনের স্টেশন	নবদ্বীপ ১২ কিমি	৪২১.৭৪	৭৮৮৭	৪০৫২	৩৮৩[illegible]
কালনা থানা :						
ধাত্রীগ্রাম ৮৭	নবদ্বীপ-ব্যাণ্ডেল রেল লাইনের স্টেশন	ধাত্রীগ্রাম শহর	টাউন এলাকা ২৬৪.০	৭৪৭৩	—	—
বৈদ্যপুর ১২৮	হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনে বৈঁচি স্টেশনে নেমে বাসে	কালনা ১৬ কিমি	২৩৪.৩৪ হেক্টর	৩৮০৯	১৯৯৫	১৮৯৪
মন্তেশ্বর থানা :						
করন্দা ১০৩	মেমারী হতে মন্তেশ্বর বাস	মেমারী ৩৩ কিমি	৬২৪.৭৭	১৯৪৮	১০০৬	৯৪২
জামনা	মেমারী পুটশুড়ি বাসে ভাকরা স্টপেজে নেমে এক মাইল হাঁটাপথ	মেমারী (৪২ কিমি)	১১২.৫১	৯১৯	৪৮৫	৪৩৪

তপসিলী	উপজাতি	শিক্ষিত		দেবদেবী, উৎসব ও অন্যান্য
		পুরুষ	স্ত্রী	
৩৯৫	০৬	১০২৪	৭৪৫	বড়মার মন্দির—বড়মার মূর্তি নাই—কালীর ধ্যানেই পূজা হয়। শীতলা পূজা ও মেলা, সতীমার মূর্তি—কার্তিক সংক্রান্তিতে কার্তিক পূজা ও পূর্ণিমায় রাস উৎসব হয়।
৩৩৭৭	২৪৩	২১৯৮	১৩৪০	বুনো রামনাথের বাসস্থান ও চতুষ্পাঠীর জন্য খ্যাতি। শ্রীচৈতন্য বিগ্রহ ও লছমন জিউর পূজা। বিবির হাটে ইছামৎ খাঁর জননী কর্তৃক নির্মিত তিন গম্বুজওয়ালা মসজিদ। এখানেও নীলচাষ হতো। নীল কুঠির চিহ্ন বর্তমান।
১৫৬২	—	২৬৫	১০৩	বল্লালসেনের তাম্রশাসনে উল্লিখিত ধার্যগ্রাম থেকে সম্ভবত ধাত্রীগ্রাম নাম। নিকটবর্তী ভবানীপুরে মহারাজ তেজচন্দ্রের গুরুবাড়ী ছিল। জঙ্গলের মধ্যে ৩টি টেরাকোটা মন্দির আছে। রামসুন্দর তর্কচূড়ামণির জন্মস্থান ও সাহিত্যিক প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের মাতুলালয় ও জন্মভূমি। তাঁতশিল্পের জন্য খ্যাতি আছে।
১০৭৫	৩৭০	১৩৫১	১০০৬	*প্রবাদ* : সেন বংশোদ্ভূত ব্রহ্মক্ষত্রিয় বৈদ্য কিঙ্করমাধব সেন ছিলেন জমিদার (ত্রয়োদশ শতক) এখানে বৃন্দাবন চন্দ্রের নবরত্ন মন্দির —নন্দী পরিবারের শিবমন্দির, রাজ-রাজেশ্বর শালগ্রাম শিলা পূজিত হয়। ১২০৪ সালে একজোড়া তেরো চূড়ো রথ আগে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো।
৬৪৭	২২	৬৩২	৪২০	গ্রাম্যদেবী মহিষমর্দ্দিনী, শ্রাবণ মাসে শুক্লা চতুর্দশীতে বার্ষিক পূজা—প্রথম পূজা হাড়িদের। তারপর অন্যান্যদের। চৈত্রে বুড়োরাজের গাজন। মাঘী পূর্ণিমা ও বৈশাখী পূর্ণিমায় মহাপূজা।
৫১২	—	৩৩২	২৩৩	পিতলের জয়দুর্গার নিত্যপূজা ও গুরু পূর্ণিমায় বাৎসরিক পূজা; জয়কালী, রঘুনাথ শিব, কেঁড়ে মাতা, চণ্ডী, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি দেবদেবী আছে। সুবোধ মল্লিক প্রতিষ্ঠিত ১৮৫০ সালের একটি উচ্চ বিদ্যালয় আছে।

মৌজা জে.এল.নং	যাতায়াত-এর ব্যবস্থা	নিকটবর্তী শহর (দূরত্ব)	আয়তন (হেক্টর)	লোকসংখ্যা মোট	পুরুষ	স্ত্রী
দেনুড় (৬৬)	কাটোয়া-মন্তেশ্বর বাস	কাটোয়া ৩২ কিমি	৫৩২.২০	২৫১৪	১৩০৬	১২০৮
পুটশুড়ি (৬৪)	মন্তেশ্বর-পুটশুড়ি বাস	নবদ্বীপ ৪৯ কিমি	৮৪৬.৫৫	৪৯২১	২৪৯৯	২৪২২
পাতুন (৪৬)	কাটোয়া-মন্তেশ্বর বাস	কাটোয়া ৩২ কিমি	২৬৮.৬৪	১৩১৮	৬৮৩	৬৩৫
শুশুনা (২৪)	মেমারী-মন্তেশ্বর বাসে মালডাঙ্গায় নেমে ২ কিমি দক্ষিণে	বর্ধমান ৩৯	২৬০.১৭	১৪৮৯	৭৫৪	৭৩৫

মঙ্গলকোট থানা :

মৌজা জে.এল.নং	যাতায়াত-এর ব্যবস্থা	নিকটবর্তী শহর (দূরত্ব)	আয়তন (হেক্টর)	লোকসংখ্যা মোট	পুরুষ	স্ত্রী
ইটা (১৩০)	কৈচর থেকে বাসে ইটা স্টপেজে নামতে হয়	কাটোয়া ৮ কিমি	২৬০.৬০	১৮৪৩	৯৪০	৯০৩

তপসিলী	উপজাতি	শিক্ষিত পুরুষ	শিক্ষিত স্ত্রী	দেবদেবী, উৎসব ও অন্যান্য
১৩১১	৩৪	৭৪৫	৪৯০	শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগুরু কেশব ভারতীর জন্মস্থান শ্রীপাট দেনুড়। এই গ্রামে বৃন্দাবন দাস তাঁর চৈতন্যভাগবত (১৫৪২-১৫৭৬ খ্রীঃ) রচনা করেন। দেনুড়েশ্বর বা দীনেশ্বর শিব, বিক্রমচণ্ডীর মূর্তি, বৃন্দাবন দাসের মন্দিরে মহিষমর্দিনী মূর্তিসহ গৌর নিতাই-এর মূর্তি আছে। মনে হয় বৈষ্ণব সংস্কৃতির পূর্বে দেনুড় শাক্ত সংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল।
১৪৪৮	—	১২২৪	৭৯১	গুঁই পরিবারের শিলাময়ী গজ কালিকা মূর্তির নিত্যপূজা ও শ্রাবণ মাসে বাৎসরিক পূজা ও মেলা। গোপীনাথ ও রাধারাণী, বাবাঠাকুর আছে। আষাঢ়ে নবমীতে বাবা ঠাকুরের বাৎসরিক পূজা হয়। ৩১ শে বৈশাখ যোগাদ্যা দেবীর বাৎসরিক পূজা হয়।
৪৩৯	—	৪৭০	৩২৯	পাত্রেশ্বর শিবের জন্যই পাতুন নাম। দাঁই-হাটের মত ভাস্করদের গ্রাম ছিল পাতুন। বিনয় ঘোষের মতে রাঢ়ে ভাস্করদের লুপ্তকীর্তির নিদর্শন এখানে মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে। তারা, চামুণ্ডা, মহিষমর্দিনী, লোকেশ্বর বিষ্ণু (?) মূর্তিও পাওয়া গেছে। গোপীনাথ জিউর সেবা হয় প্রতিদিন ও কার্তিক মাসে মহোৎসব হয়; বাগ্‌দীদের গ্রামদেবতা ধর্মরাজ।
১০৬৮	১৫	৫৭৪	৪০৪	শুশুনির খ্যাতি তারাক্ষ্যা মায়ের জন্য। চক্ষু-রোগ নিরাময়ে—দেবীর স্নানজল চক্ষুতে প্রয়োগ করলে সর্বপ্রকার চক্ষুরোগ নিরাময় হয় বলে বিশ্বাস। কষ্টিপাথরে ক্ষোদিত চতুর্ভুজা দেবী মহাপদ্মের উপর সমাসীনা মহাদেবকে স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করে স্তন পানরতা অপূর্ব ৭ ফুট উঁচু মূর্তি। জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লা চতুর্দশীতে মহাপূজা ও বলিদান।
৯০৫	০১	৫৮৮	৩৮৫	গ্রামের দক্ষিণে ৯ই উচ্চ গরুড় মূর্তি—গ্রামে ১২টি টেরাকোটা অলংকৃত শিবমন্দির ছিল। এর মধ্যে ৫টি বর্তমান ছিল। রায়চৌধুরী পরিবারের ১০ইঃ উঁচু শিলাময়ী এলাই চণ্ডীর নিত্যপূজা হয়। এছাড়া আছে শ্যাম রায়। মহিষমর্দিনী, তারা, সিংহবাহিনী প্রভৃতি দেবদেবী।

মৌজা জে.এল.নং	যাতায়াত-এর ব্যবস্থা	নিকটবর্তী শহর (দূরত্ব)	আয়তন (হেক্টর)	লোকসংখ্যা মোট	পুরুষ	স্ত্রী
পালিগ্রাম (২১)	গুসকরা হতে সরাসরি বাস	গুসকরা ৯ কিমি	৮৩০.০১	৩১১২	১৬৬০	১৪৫২
বাবলাডিহি	বলগনা শঙ্করপুর থেকে পশ্চিমে ২ কিমি হাঁটাপথ	কাটোয়া ২০ কিমি	৫৭.৫৩	৭১৮	৩৬৪	৩৫৪
মাজিগ্রাম (৯১)	কাটোয়া বা বর্ধমান থেকে বাসে	কাটোয়া ২০ কিমি	১২৭৬.০৭	৩৭২৩	১৮৬১	১৮৬২

বুদবুদ থানা :

মৌজা জে.এল.নং	যাতায়াত-এর ব্যবস্থা	নিকটবর্তী শহর (দূরত্ব)	আয়তন (হেক্টর)	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
মানকর (৩৭)	বর্ধমান হতে বাস বা রেলপথে মানকর স্টেশন	বর্ধমান ৩০ কিমি	৭৩৭.৬৭	৭৬৫৩	৩৯৬৪	৩৬৮৯

তপসিলী	উপজাতি	শিক্ষিত		দেবদেবী, উৎসব ও অন্যান্য
		পুরুষ	স্ত্রী	
১৩২৭	২৭৪	১০৬৫	৬৮৭	গ্রামের মধ্যস্থলে ৬টি ধর্মশিলা পূজিত হয়। বুদ্ধ পূর্ণিমায় গাজন হয়, গাজনে সন্ন্যাসীদের জিভ-বাণ ফোঁড়া, হেঁটমুণ্ড আগুন ঝুলের প্রথা আছে। এছাড়া আশ্বিন মাসে কিরীটেশ্বরী ও ভাদ্র মাসে খাঁদা কালীর পূজা হয়।
৩০৮	—	২৪৭	১৮৮	বাবলাডিহির খ্যাতি ন্যাংটেশ্বর শিবের জন্য। ৩ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট পদতলে মৃগ-লাঞ্ছন কষ্ঠিপাথরে মূর্তিটি আসলে জৈন মহাবীরের। শিবরাত্রিতে মেলা হয়।
৩৫০	—	৩৬১	২১৪	মাজিগ্রামের খ্যাতি শাকম্ভরী দেবীর জন্য; আষাঢ়ে নবমীতে বিশেষ পূজা, মদন চতুর্দশীতে শাকম্ভরী ও দেউলেশ্বর শিবের বিবাহ। কালো কনে ও বুড়োবরের বিবাহ শেষ পর্যন্ত পণ্ড হয়। দেবদেবী মন্দিরে ফেরে। (বিশদ বিবরণ লৌকিক দেবদেবী অধ্যায়ে) মাজিগ্রাম চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ গণপতি পাঁজা ও ধনপতি পাঁজার জন্মস্থান।
২৯২১	৩১৪	২৩০৮	১৫৯৬	সাংস্কৃতিক ও বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে মানকরের খ্যাতি সুপ্রাচীন। হিতলাল মিশ্রর বাড়ীতে অসংখ্য সংস্কৃত পুঁথি ছিল। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক রঘুনাথ শিরোমণি এই গ্রামেই জন্মেছিলেন। মধ্যযুগে চেলি ও তসর বস্ত্রের জন্য মানকরের খ্যাতি ছিল। মানকরের মাছধরা মুগা সুতো, বঁড়শি বিখ্যাত। মানকরেশ্বর শিব এখনকার শৈবতন্ত্রের পরিচায়ক। আবার বৈদ্যকবিরাজদের গৃহদেবী আনন্দময়ী শক্তিতন্ত্রের পরিচয় দান করে। পঞ্চকালীর মূর্তি আছে। ভক্তলাল গোস্বামী কীর্তিচাঁদ ও চিত্রসেনের গুরু ছিলেন। মদনমোহন সিদ্ধান্ত, গদাধর শিরোমণি, নারায়ণ চূড়ামণি যাদবেন্দ্র সার্বভৌম প্রমুখ পণ্ডিতগণের পীঠস্থান। মানকরের বিরাট কদমার খ্যাতি আজও অম্লান।

মৌজা জে.এল.নং	যাতায়াত-এর ব্যবস্থা	নিকটবর্তী শহর (দূরত্ব)	আয়তন (হেক্টর)	লোকসংখ্যা মোট	পুরুষ	স্ত্রী
কাঁকসা থানা :						
বনকাটি (৩৩)	পানাগড়-ইলামবাজার বাসে ১১ মাইল, স্টপেজে নেমে পশ্চিমে হাঁটাপথ	কাঁকসা (১৮ কিমি)	১৪৮.৫২	৯৪৫	৪৭৮	৪৬৭
রানীগঞ্জ (২৪)	বর্ধমান-আসানসোল মেন লাইনের স্টেশন; বাসেও যাওয়া যায়।	রানীগঞ্জ শহর	টাউন এলাকা ৬.৪৫ বর্গ কিমি	৬৫৫১৭	—	—

আসানসোল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের বিবরণের জন্য জেলার অর্থনৈতিক চিত্র—শিল্প অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

তপসিলী	উপজাতি	শিক্ষিত পুরুষ	শিক্ষিত স্ত্রী	দেবদেবী, উৎসব ও অন্যান্য
৪৪৩	৬	২৩২	১৬২	ষাটের দশকে পাণ্ডুরাজার ঢিবি উৎখননের সময় এখানেও খননকার্য চালিয়ে বহু প্রস্তর আয়ুধ ও ফসিল কাঠ পাওয়া গেছে। গোপেশ্বর শিব ও পঞ্চরত্ন শিব ও পিতলের পঞ্চরত্নাকৃতি সুদৃশ্য রথ দর্শনীয়।
৪০৪৮৭	—	৯৭৫৬	৩৬৬২	কয়লাখনি আবিষ্কারের পর শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠে। মাটির বাসনপত্র, টালির কারখানা, তেলকল, নিকটে বল্লভপুরে কাগজকল ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের কারখানা আছে। জেলার পশ্চিমাঞ্চলের সদর মহকুমার কার্যালয় ছিল। মঙ্গলপুরে ফৌজদারী আদালত ও উখড়ায় মুন্সেফী আদালতে ছিল। মেথডিস্ট মিশনের বিদ্যালয় ছিল। গীর্জা স্থাপিত হয়েছিল; গীর্জাপাড়া লেন তার স্মৃতি বহন করছে। সত্যনারায়ণ, রামসীতা, মহাবীর বিগ্রহ আছে।

ষোলো অধ্যায়

মনীষী চরিতাবলী ও কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব

(প্রধানত সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান বঙ্গ অভিধান, বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে সংকলিত)

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৫.৭.১৮২০—১৮.৫.১৮৮৬) : চুপীতে জন্ম। পিতা—পীতাম্বর। ১৪ বছর বয়সে 'অনঙ্গমোহন কাব্যগ্রন্থ' রচনা করেন। ১৮.৮.১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এতে পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা, এবং স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ও হিন্দু বিধবাদের সমর্থনে, বাল্যবিবাহ ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি নির্ভীকভাবে লেখনী চালনা করেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর পৌত্র। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়", "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার", "প্রাচীন হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার", "চারুপাঠ ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ" উল্লেখযোগ্য।

অজয় ঘোষ (২০.২.১৯০৯—১৩.১.১৯৬২) : জেলার মিহিজামে জন্ম। পিতা—শচীন্দ্রমোহন (চিকিৎসক)। পিতার কর্মস্থল কানপুরে থাকতেন। কেমিষ্ট্রিতে অনার্সসহ বি.এসসি। বিপ্লবী ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্তের সংস্পর্শে আসেন ও লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী হন কিন্তু প্রমাণাভাবে মুক্তি পান! কিছুকাল মানবেন্দ্র রায়ের সহকর্মী ছিলেন। পুনায় গ্রেপ্তার হন ও দেউলি জেলে প্রেরিত হন। এখানে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হলে নেহরু প্রমুখের হস্তক্ষেপে মুক্তি পান। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য রাঁচী আসেন। আদিবাসীদের সমস্যা সম্পর্কিত Notes on Chhotonagpur and its people তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। আজীবন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন ও দীর্ঘদিন পার্টির সম্পাদক ছিলেন। তাঁর গ্রন্থ Bhagat Sing and his comrades, some features of Indian situation.

অনুপচন্দ্র দত্ত : শ্রীখণ্ড বর্ধমান। পিতা—মৃত্যুঞ্জয় দত্ত। বর্ধমানের জালরাজা বলে কথিত প্রতাপচাঁদ যখন শেষ জীবনে সন্ন্যাস অবলম্বন করে কলিকাতা শ্রীরামপুর অঞ্চলে বাস করছিলেন, তখন অনুপচন্দ্র তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। প্রতাপচাঁদ ধর্মপ্রবর্তক হয়ে শ্রীখণ্ডে যাতায়াত করতেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে গুরুর জীবদ্দশায় অনুপচন্দ্র 'প্রতাপচন্দ্র লীলা প্রসঙ্গ সঙ্গীত' নামে এক অতি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন।

অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৬—১৯৪৩) : এ জেলার চাকটা গ্রামে জন্ম। প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া। বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত গ্রন্থের শ্লোক সহযোগে নিজস্ব সুর ও তালে গানের এক অনন্য শৈলীর তিনি স্রষ্টা। নন্দকিশোর দাস ও পঞ্চানন দাস তাঁর প্রধান শিষ্য।

অশ্বিনী রায় (৩০.১১.১৯০৫-১৭.০৩.১৯৮৯) : খণ্ডঘোষ থানার রূপসা গ্রামে জন্ম। স্থানীয় বিদ্যালয় ও বর্ধমান রাজ কলেজে শিক্ষা শেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের রেলকর্মী হিসেবে যোগ দেন। সাথে সাথে রেলওয়ে শ্রমিক সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। ফলে রেলের চাকুরী থেকে বরখাস্ত হন। এরপর শ্রীরায় অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে সাড়া দিয়ে নিজের জেলায় ফিরে আসেন ও কৃষক সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। ক্যানেলকর আন্দোলনের সময় শ্রীরায় সক্রিয় ভূমিকা নেন। শ্রীরায় কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী ছিলেন। তিনি ছিলেন আজীবন অকৃতদার। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে ভাতার ও গলসী থেকে তিনবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হলে শ্রীরায় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য থেকে যান ও জেলার পার্টির আজীবন সম্পাদক ছিলেন। পার্টির সাংগঠনিক কাজে অংশ নিয়ে বর্ধমানে ফেরার সময় ট্রেনেই হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন ও স্টেশনের রেলকর্মীদের চেষ্টায় বর্ধমান হাসপাতালে ভর্তি হন কিন্তু চিকিৎসকদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও হাসপাতালেই শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি পার্টির সদস্য হিসেবে অবিভক্ত সোভিয়েত রাশিয়া পরিভ্রমণ করেন।

অহিভূষণ ভট্টাচার্য : কোকসিমলা—বর্ধমান। প্রসিদ্ধ যাত্রা-পালাকার ও পালা-রচয়িতা। প্রথম দিকে কলকাতার হরীতকী বাগানে তাঁর নিজের দল ছিল। তাঁর প্রথম পালা 'তুলসীলীলা' (১৮৯৪), অন্যান্য নাটক—উত্তরা পরিণয়, দণ্ডীপর্ব, সুরথ উদ্ধার রাই উন্মাদিনী, রামাশ্বমেধ, ধর্মলীলা প্রভৃতি।

আবদুস সাত্তার (১৯১১—'৬৫) : কালনার টোলা গ্রামে জন্ম। দেশকর্মী ও সাংবাদিক, ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে ও '৪২-এর ভারত ছাড়ো

আন্দোলনে যোগ দিয়ে দীর্ঘকাল কারাদন্ড ভোগ করেন। বিভিন্ন সময়ে 'বর্ধমান কথা' ও 'বর্ধমানবাণী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৪.৫.১৮৪৯–২৩.৩.১৯১১) : আদি নিবাস বর্ধমান জেলার গঙ্গাটিকুরী গ্রামে, উকিল হিসাবে কর্মজীবনের সূচনা। বর্ধমান শ্যামবাজারে দীর্ঘদিন ছিলেন। পঞ্চানন্দ ছদ্মনামে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখতেন। কল্পতরু (উপন্যাস), ভারত-উদ্ধার (খণ্ডকাব্য), হাতে হাতে ফল (প্রহসন), ক্ষুদিরাম (গল্প সংকলন) প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। পাঁচু ঠাকুর ছদ্মনামেও তিনি লিখতেন এবং ব্যঙ্গচিত্র আঁকতেন। সংস্কৃতভিত্তিক সাধুবাংলার বদলে সহজ সাবলীল সরল ভাষায় লেখার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ তাঁর মৃত্যু হয়।

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী (৭.৬.১৮৭৫–৬.২.১৯৪৬) : জন্ম বর্ধমান জেলার জামালপুর গ্রামে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এম.বি. পাশ করেন মেডিসিন ও ফার্মাসিতে প্রথম হন। তারপর এম.ডি. ও শারীরতত্ত্বে পিএইচ.ডি. করেন। কালাজ্বরের ঔষধ বিখ্যাত ইউরিয়া স্টিবামাইন আবিষ্কার করেন। তাঁর গ্রন্থের মধ্যে Treatise on Kala-Azar, Kala-Azar and its consequent chemotherapy of Quinine compounds উল্লেখযোগ্য।

কবিচন্দ্র (১৬শ শতাব্দী) : দামুন্যা গ্রামে জন্ম। পিতা—হৃদয় মিশ্র। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের অগ্রজ। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'কলঙ্কভঞ্জন', 'দাতাকর্ণ, উল্লেখযোগ্য।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য : (আনু ১৭৭২–১৮২১) : মাতুলালয় চান্নায় জন্ম। পৈতৃকভূমি অম্বিকাকালনা। চান্নার বিশালাক্ষী মন্দিরে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর কালী সাধনায় আকৃষ্ট হয়ে বর্ধমান মহারাজ তেজচন্দ্র বর্ধমান শহরের কোটালহাটে তাঁর বাসগৃহ নির্মাণ করে দেন। তেজচন্দ্র ও পুত্র প্রতাপচাঁদ তাঁকে গুরু বলে মেনে নেন। তিনি বহু শ্যামাসঙ্গীত ও আগমনীগানের রচয়িতা। টপ্পার আঙ্গিকে গীত ও তাঁর শ্যামাসঙ্গীত এক সময়ে বহুল প্রচলিত ছিল।

কালিদাস রায় (কবিশেখর) (৯.৭.১৮৮৯–২৫.১০.১৯৭৫) : কড়ুই-এ জন্ম। শীর্ষস্থানীয় কবি, বিশিষ্ট নিবন্ধকার ও আদর্শ শিক্ষাবিদ্। পিতা—যোগেন্দ্র নারায়ণ। বহরমপুর কলেজ থেকে সম্মানের সঙ্গে বি.এ. পাশ করে স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শনে এম.এ. পড়েন। কর্মজীবনের শুরু রংপুর জেলার উলিপুর মহারানী স্বর্ণময়ী স্কুলের প্রধান শিক্ষক রূপে। এরপর ভবানীপুর মিত্র ইন্সটিটিউশনের সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পূর্ব

পর্যন্ত ঐ পদেই ছিলেন (১৯৫২)। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কুন্দ' ১৮ বছর বয়সের রচনা। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ—পর্ণপুট, খুদকুঁড়া, লাজাঞ্জলি, হৈমন্তী, বৈকালী, ব্রজরেণু, সন্ধ্যামণি, ঋতুমঙ্গল, চিত্তচিতা, রসকদম্ব ইত্যাদি। কালিদাস ছিলেন চৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা লোচনদাসের বংশধর। তাঁর কাব্যে সহজ, সরল ও আন্তরিকতার সুর পাওয়া যায়। তাঁর রচিত প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য-পরিচয়, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, পদাবলী সাহিত্য, শরৎ সাহিত্য, সাহিত্য প্রসঙ্গ প্রভৃতি। সাহিত্যকৃতির জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার, জগত্তারিণী-স্বর্ণপদক ও সরোজিনী স্বর্ণপদক লাভ করেন। বিশ্বভারতী তাঁকে দেশিকোত্তম এবং রবীন্দ্র ভারতী 'ডি.লিট' উপাধিতে ভূষিত করেন।

কালিকাপ্রসাদ দত্তরায় : রায় বাহাদুর, সি.আই.ই. (১৮৪১–১৯১৫)। মেড়াল গ্রামে জন্ম। পিতা-গোলকনাথ; প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেন। আইন পাশ করে মুন্সেফ ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। দীর্ঘকাল কোচবিহারের রাজা নাবালক নৃপেন্দ্রনারায়ণের দেওয়ান ছিলেন। তিনি কৃষকদের সর্বপ্রকার অত্যাচার থেকে মুক্ত করে তাঁদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন ও নানা স্থানে ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মেড়ালে স্ত্রীর স্মৃতিরক্ষায় বিদ্যামন্দির স্থাপন করেন।

কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন : মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন ১২৪০ বঙ্গাব্দে (১৭৫৫ শকাব্দে) বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কেশবচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং মাতার নাম কমলাসুন্দরীদেবী। ১৩১৩ বঙ্গাব্দের (১৮২৮ শকাব্দে) পৌষমাসে শ্রীভারত ধর্মমহামণ্ডলের সভাপতি ছিলেন। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা কলকাতার বিরাট অধিবেশনে কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়কে 'পণ্ডিতকুল চক্রবর্তী' উপাধি প্রদান করেন।

কোন এক সময় অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিবার জন্য কৃষ্ণনাথকে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত দিবার প্রলোভন দেখান হলেও তিনি উহা ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ভারত গভর্নমেন্ট তাঁহাকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রদান করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে "কর্পূরাদি স্তোত্রের টীকা" 'বাতদূত' প্রভৃতি ১৪টি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। ১৩১৮ বঙ্গাব্দে (১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে) ২৬শে অগ্রহায়ণ পূর্বস্থলীতেই পরলোক গমন করেন।

কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, মহামহোপাধ্যায় : কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত ধাত্রী গ্রামের মুখোপাধ্যায় বংশে ১৭৫২ শকাব্দের (১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ) ৫ই মাঘ

কৈলাসচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ঘনশ্যাম সার্বভৌম ও মাতার নাম আদরময়ী। দেবীপুরের হরচন্দ্র ন্যায়বাগীশের কাছে সমগ্র মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এরপর নিজগৃহে চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি কিছুদিন কাশী সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি ছিলেন অন্যতম ধুরন্ধর নৈয়ায়িক। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মহামহোপাধ্যায় উপাধি পান। ইনি 'ন্যায়সূত্রের ভাষ্যচ্ছায়া' নামে এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা রচনা করেন। ১৮৩০ শকাব্দে (১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ) ৩রা চৈত্র কাশীধামে পরলোক গমন করেন।

কাশীনাথ তর্কালঙ্কার (?—১৮৫৭) : উপলতি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্মার্ত মহামহোপাধ্যায় কাশীনাথ কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। হাতিবাগানে তাঁর চতুষ্পাঠী ছিল। তাঁর রচিতগ্রন্থ "প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা সংগ্রহ।"

কাশীরাম দাস : বাংলায় মহাভারতের অনুবাদক কাশীরাম দাসের জন্ম ১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কাটোয়া মহকুমার সিঙ্গি গ্রামে। তিনি একা সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ করেন নাই। কাশীরাম আদি, সভা, বনসমগ্র ও বিরাট পর্বের কিছু অংশের অনুবাদ করেন। বাকি অংশ অনুবাদ করেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের সম্পাদনায় যে "কাশীদাসী মহাভারত" প্রকাশিত হয় তার ভাষা উনিশ শতকের বাংলার মতো। অগ্রজ 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' রচনা করেন। 'ভারত পাঁচালী' কাব্যের কবি হিসেবেও তিনি খ্যাত ছিলেন। কাশীরাম দাসের নামে রচিত 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী' 'স্বপ্নপর্ব', 'জলপর্ব, ও 'নলোপাখ্যান'ও পাওয়া যায়।

কাজী নজরুল ইসলাম (২৫.৫.১৮৯৮—২৯.৮.১৯৭৬) : আসানসোল মহকুমায় চুরুলিয়া গ্রামে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৫মে জন্মগ্রহণ করেন (১৩০৬ সাল ১১ জ্যৈষ্ঠ)। বালক বয়সে তিনি দুখু মিঞা নামে পরিচিত ছিলেন। ১৯ বছর বয়সে সৈনিক হিসাবে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। এগার বছর বয়সে 'লেটো' যাত্রার গান রচনা করেন। ১৯১৯ সালে তাঁর প্রথম কবিতা 'মুক্তি'। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে 'নবযুগ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'ধূমকেতু' পত্রিকায় সম্পাদকীয় লেখার ফলে রাজরোষে পত্রিকা বন্ধ হয় ও নজরুল বন্দী হন। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'অগ্নিবীণা', 'দোলনচাঁপা', 'সঞ্চিতা', 'ছায়ানট', 'ভাঙার গান', 'বিষের বাঁশী', 'প্রলয় শিখা'; গল্পগ্রন্থ—'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন'; উপন্যাস—'বাঁধনহারা', 'মৃত্যুক্ষুধা'; নাটক—'আলেয়া', 'ছিনিমিনি' উল্লেখযোগ্য।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক (৩.৩.১৮৮২–১৪.১২.১৯৭০) : কোগ্রামে জন্ম। অজয় ও কুনুর নদীর সঙ্গমস্থলে 'চৈতন্যমঙ্গল' প্রণেতা লোচনদাসেরও জন্ম, তাঁর সমাধিও আছে এই গ্রামে। কুমুদরঞ্জন ছিলেন মাথরুন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাঁর অধিকাংশ কাব্যই কোগ্রামে রচিত হয়। তাই তাঁর কাব্যে মেলে পল্লীর প্রশান্তি ও প্রসন্নতা। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে আছে—উজানী, শতদল, বনতুলসী, একতারা, বীথি, বীণা, বনমল্লিকা, রজনীগন্ধা, নূপুর, অজয় প্রভৃতি।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ (আনু : ১৫৩০–১৬১০ খ্রীঃ) : জন্ম কাটোয়া মহকুমার ঝামটপুর গ্রামে। স্বপ্নে নিত্যানন্দের আদেশ পেয়ে গৃহত্যাগ করে বৃন্দাবনবাসী হন। বৃন্দাবনে গভীর অধ্যয়ন ও রচনায় সারাজীবন অতিবাহিত হয়। শ্রীচৈতন্যের অনুলিখিত কৃষ্ণকর্ণামৃত অবলম্বনে তিনি সটীক 'সারঙ্গরঙ্গনা' রচনা করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা—"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"। এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য অসীম।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ (১৭শ শতাব্দী) : বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামে জন্ম। ক্ষেমানন্দ চৈতন্য-প্রভাবিত কবি। ক্ষেমানন্দ নাম—কেতকাদাস উপাধি। কেতকাদাসের কাব্যের পদলালিত্য ও ভাবমাধুর্য বৈষ্ণবপ্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে পারেনি। এই ভক্তি-প্রাধান্যের ফলে তাঁর চাঁদসদাগর পৌরুষহীন, দৃঢ়তাহীন ও খর্বকায়। ক্ষেমানন্দের কাব্যের আরেক বৈশিষ্ট্য—ভৌগোলিক তথ্যের অনুসরণ। চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যপথ বর্ণনায় বা বেহুলার যাত্রাপথের বর্ণনায় কবি ভৌগোলিক সংস্থান-সমূহের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন।

কেঃ মল্লিক (১২.২.১২৯৫–১৩৬৬ বঙ্গাব্দ) : জন্মস্থান কুসুমগ্রাম—বর্ধমান। পিতা–মুনশী মহম্মদ ইসমাইল। প্রকৃত নাম মুনশী মহম্মদ কাশেম। তাঁর গান রেকর্ড করার জন্য কলকাতার জার্মান রেকর্ড কোম্পানী 'বেকা'-র প্রতিনিধি দেখা করতে এসে মোট বারখানা গান রেকর্ড করে। গান রেকর্ডে বিভিন্ন নাম ব্যবহার করতেন। বাংলা গানে তিনি কেঃ মল্লিক, হিন্দী গানে পণ্ডিত শঙ্কর মিশ্র ও ইসলামী গানে মুন্শী মহম্মদ কাশেম। নজরুল, আঙ্গুরবালা তাঁর সমসাময়িক। তাঁর উৎসাহে কমলা (ঝরিয়া) কলকাতায় গান শিখতে আসেন ও বিখ্যাত হন।

ক্ষুদিরাম বসু (৩১.১.১২৬০–১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) : জন্মস্থান–সাদিপুর, বর্ধমান। পিতা–গোরাচাঁদ। কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে পড়াশুনা করে বি.এ. পাশ করেন। রেভঃ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহলাভ করেন। পরে বিদ্যাসাগরের সাহচর্য লাভ করে, মেট্রোপলিটান কলেজে তর্কশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। প্রথমে খ্রীষ্টধর্ম ও পরে কেশবচন্দ্রের অনুরাগী হন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার সেন্ট্রাল

ইনস্‌টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেন। রাখী বন্ধনের দিন (১৯০৬) সভা নিষিদ্ধ হলে তিনি ইনস্‌টিটিউট্ প্রাঙ্গণে সভা করে স্বদেশ প্রেমের পরিচয় দেন।

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য (?–১৮৩১) : পূর্বস্থলী থানার বহড়া (জে.এল.- ১) গ্রামে জন্ম। প্রথম বাঙালী সাংবাদিক। প্রথম জীবনে শ্রীরামপুর মিশনারী প্রেসে কম্পোজিটারের কাজ করতেন। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সম্পাদিত 'সচিত্র অন্নদামঙ্গল' প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকেই প্রথম ব্লক ব্যবহার করা হয়। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে 'বাঙ্গালা গেজেট প্রেস' নামে একটি মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন ও হরচন্দ্র রায়ের সহযোগিতায় 'বাঙ্গালা গেজেট' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাঙ্গালা গেজেটকে প্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্র বলা হয়। কারও কারও মতে খ্রীষ্টান মিশনারীদের 'সমাচার দর্পণ' ১৫/১৬ দিন আগে প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত সংকলিত গ্রন্থ "A Grammar in English and Bengali" (১৮১৬), দায়ভাগ (১৮১৬-১৭), দ্রব্যগুণ (১৮২৪), চিকিৎসার্ণব (১৮২০?) উল্লেখযোগ্য।

কেশব ভারতী : কুলিয়া গ্রামে জন্ম। পূর্ব নাম কালীনাথ আচার্য। তিনি ছিলেন মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। চৈতন্যদেব তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন (২৬.১.১৫১০)।

স্বামী কেশবানন্দ মহাভারতী (১২০৩–১২২২ বঙ্গাব্দে) : বাঘাসনে জন্ম। পূর্বনাম রাধিকাপ্রসাদ রায়চৌধুরী। রামগোপাল ব্রহ্মচারীর কাছে হটযোগ শিখে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা নেন ও 'কেশবানন্দ' নাম নেন। নিজ গ্রামে বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, কৃষি-উদ্যান ও গোচারণ ক্ষেত্র স্থাপন করেন। অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 'আনন্দগীতা' গ্রন্থের রচয়িতা।

গণপতি পাঁজা (১৩০০–২১.৫.১৩৬৬ বঙ্গাব্দ) : মাজিগ্রামে জন্ম। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রখ্যাত চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ। অত্যন্ত দারিদ্র্য অবস্থা থেকে উন্নতি লাভ করেন। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর অর্থানুকূল্যে এম.বি. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তিনি চর্মরোগ গবেষণাগার স্থাপন করেন।

গিরিশচন্দ্র বসু (২৯.১০.১৮৫৩–১.১.১৯৩৯) : জামালপুর থানার বেড়ুগ্রামে জন্ম। হুগলী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে কটক র‍্যাভেনশ কলেজে উদ্ভিদবিদ্যা অধ্যাপনা কালে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এম.এ. পাশ করেন ও সরকারী বৃত্তি লাভ করে বিলাত যান। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গবাসী স্কুল ও ১৮৮৭ সালে বঙ্গবাসী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরাজী ও বাংলায় 'কৃষি গেজেট' সাপ্তাহিক পত্রিকা

প্রকাশ করেন। রচিত গ্রন্থ—ম্যানুয়েল অব্ বটানী, কৃষি সোপান, কৃষি পরিচয় ও বাংলা ভাষায় ভূবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ 'ভূতত্ত্ব' ইত্যাদি।

গুণরাজ খাঁ (১৬শ শতাব্দী) : জন্মস্থান কুলীনগ্রাম। পিতা ভগীরথ। গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের মন্ত্রী এবং রাজসভায় রূপ ও সনাতনের নিয়োগকারী। ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ভাগবতের প্রথম ও একাদশ স্কন্দের অনুবাদ করেন। প্রকৃত নাম মালাধর বসু। গৌড়েশ্বর গুণরাজ খাঁ উপাধি দেন। তাঁর অনুবাদ গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। অন্যান্য গ্রন্থ—শ্রীধর্ম ইতিহাস, লক্ষ্মীচরিত্র, যোগসার।

ঘনরাম চক্রবর্তী (১৬৬৯—) : কৃষ্ণপুরে জন্ম। পিতা গৌরীকান্ত। ছাত্রাবস্থায় কবিতা রচনার জন্য তাঁর গুরু তাঁকে কবিরত্ন উপাধি দেন। বর্ধমানরাজ কীর্তিচাঁদ তাঁকে রাজসভাকবি পদে নিযুক্ত করেন। তাঁর আদেশে তিনি সুবৃহৎ 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থ শেষ হয়। বর্ধমানে থাকার সময় কবি ফারসী ভাষাও শিক্ষা করেন। এই সুগায়ক পাঁচালীকারের অন্য গ্রন্থ 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'।

জগদানন্দ : কাটোয়ার প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা। বাল্যকালেই বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। বাংলায় যাত্রার প্রচলক চন্দ্রশেখর দাসের শিষ্য ছিলেন। তাঁর রচিত যাত্রার সঙ্গীতসমূহ পদবিন্যাসে এবং ভাব ও সৌন্দর্য বিন্যাসে অতুলনীয়। তাঁর রচিত বহু সঙ্গীত শিশিরকুমার ঘোষ সম্পাদিত 'পদকল্পতরু'তে প্রকাশিত হয়েছে।

জয়ানন্দ (১৫১২/১৩—?) : জেলার আমাইপুরায় জন্ম। পিতা সুবুদ্ধি মিশ্র। শৈশবে নাম ছিল গুঁইঞা। চৈতন্যদেব নীলাচল থেকে নদীয়া ফেরার পথে সুবুদ্ধি মিশ্রের গৃহে বাসকালে বালকের নাম দেন জয়ানন্দ। তিনি অভিরাম গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'চৈতন্যমঙ্গল' ঐতিহাসিক তথ্যে সমৃদ্ধ।

জ্যোতিষ ঘোষ (১১.১২.১৮৮৩–১৩.৩.১৯৭১) : বর্ধমানের দত্তপাড়ায় জন্ম। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম.এ. পাশ করে প্রথমে বাঁকিপুর কলেজে, পরে হুগলী মহসীন কলেজে ও বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজে অধ্যাপনা করেন। এবং ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের অধিকার অর্জনের জন্য সচেষ্ট হন। শ্রীঅরবিন্দের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। ১৯০৫ থেকে রাজনৈতিক জীবন শুরু। বিভিন্ন দফায় ২০ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯২৪ সালে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মান্দালয় জেলে বন্দী ছিলেন। অত্যাচারের ফলে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি প্রাদেশিক ফরওয়ার্ড ব্লকের সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৬ ও ১৯৫২

সালে দুবার বিধানসভার সদস্য হয়েছিলেন। তিনি মাষ্টারমশাই নামে পরিচিত ছিলেন। (শারদীয়া আ: বা: প ১৩৯৩, পৃ. ৮০)

জীবনানন্দ বিদ্যাসাগর (ভট্টাচার্য) : জন্ম—অম্বিকা কালনায়। পিতা তারানাথ তর্কবাচস্পতি। সংস্কৃত কলেজে পিতার নিকট ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলংকার, বেদান্ত, মীমাংসা, জ্যোতিষ ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।" তিনি কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে বিদ্যাসাগর উপাধি পান।

নিজস্বকৃত টীকাসহ ১০৭টি ও বিনা টীকায় সম্পাদন করে ১০৮টি গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে—বেতাল পঞ্চবিংশতি, কাদম্বরী, কথাসার, সংক্ষিপ্ত হর্ষচরিত, শব্দরূপাদর্শ, তর্কসংগ্রহ (ইংরাজী অনুবাদ) সংক্ষিপ্ত দশকুমারচরিত প্রভৃতি।

জ্ঞানদাস : জন্ম—কাঁদড়ায়, জন্মকাল আনুমানিক ১৫২০ থেকে ১৫৩৫এর মধ্যে। মঙ্গল-ব্রাহ্মণ বংশীয় ছিলেন বলে মঙ্গলঠাকুর, শ্রীমঙ্গল, মদনমঙ্গল প্রভৃতি নামেও অভিহিত হতেন। নিত্যানন্দের ভক্ত ছিলেন। ব্রজবুলিতে অনেক পদ রচনা করেন। 'ষোড়শ গোপালের' রূপবর্ণনা করে প্রথম উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেন। রাধাকৃষ্ণ প্রণয়লীলার বিভিন্ন পর্যায়ের পদ রচনা করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর জন্মস্থানে একটি বড় মঠে প্রতি বছর পৌষ পূর্ণিমায় তাঁর স্মরণে মেলা হয়। কীর্তনের নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি (১৮০৬—২০.৬.১৮৮৫) : কালনায় জন্ম। পিতা কালিদাস সার্বভৌম। ১৮৩০—৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করে তর্কবাচস্পতি উপাধি পান। পরে কাশীতে বেদান্ত ও পাণিনি অধ্যয়ন করেন। সেখান থেকে ফিরে এসে স্বগ্রামে টোল খোলেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বাল্যবিবাহের বিরোধী, স্ত্রী-শিক্ষার উৎসাহী ও হিন্দুমেলার উদ্যোগী সংগঠক ছিলেন। ব্যাকরণ, বেদ, ন্যায়, উপনিষদ, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। সিদ্ধান্ত কৌমুদীর উপর 'সরলা' নাম্নী টীকা, বাচস্পত্য (অভিধান), শব্দস্তোম, মহানিধি (অভিধান), বহুবিবাহবাদ, বিধবা বিবাহ খণ্ডন প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৫?—১৯০৭) : কাটোয়ায় জন্ম। বিখ্যাত ফৌজদারী উকিল। সাক্ষ্য বিষয়ে মুসলমান আইনগ্রন্থ প্রণেতা। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের পর জাতীয় ভাণ্ডার স্থাপন করেন। কৃষ্ণনগরের স্বদেশী আন্দোলনের জন্মদাতা। সামাজিক ব্যাপারে প্রগতিশীল ও স্ত্রীশিক্ষার উদ্যোগী।

কৃষ্ণনগরে মৃণালিনী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন ও আমৃত্যু এর ব্যয়ভার বহন করেন। সাধারণী পত্রিকার সম্পাদক ও ভারতসভার সহ-সম্পাদক ছিলেন।

ত্রিভঙ্গ রায় (১৯০৬–৯.৬.১৯৭৯) : ভাতার থানার বনপাশ কামারপাড়ায় জন্ম। শিল্পী ও সাহিত্যিক। তুলির টানে পৌরাণিক ঘটনাবলী অঙ্কনে নৈপুণ্য ছিল। বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজী ও গণিতে লেটারসহ বোলপুর শিক্ষানিকেতন থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। অবনীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে তাঁর শিল্পজীবন দ্রুত এগিয়ে যায়। তিনি চান্নার নিরালম্ব স্বামীর (যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) কাছে সোহং মন্ত্রে দীক্ষিত হন।

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েন্টাল আর্টস-এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম কানপুরের জে. কে. অরগানাইজেশনের 'কমলা টেম্পল'-এর অভ্যন্তর দেওয়ালে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ঘটনাবলীর চিত্ররূপ। চার বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই কার্য সমাধা করেন। ১৯৩২ সালে দিল্লীর প্রদর্শনীতে তাঁর সিল্কের উপর হোলিবিষয়ক চিত্রটি স্বর্ণপদক লাভ করে। মাটির প্রতিমা নির্মাণেও তাঁর খ্যাতি ছিল। ১৯৩৭ সালে বনপাশ শিক্ষানিকেতনে সরস্বতীর যে মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন তা সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিল। প্রস্তরমূর্তি নির্মাণেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আউসগ্রাম থানার কয়রাপুরে কষ্টিপাথরের 'দেবীমূর্তি' চুরি হয়ে গেলে ত্রিভঙ্গবাবু অবিকল সেইরূপ নতুন শিলাময়ী মূর্তি নির্মাণ করেছেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা একাডেমী অব্ ফাইন আর্টস থেকে স্বর্ণপদক পান। সাহিত্যিক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর রচিত গ্রন্থ—গৌতমবুদ্ধ, মানিক অঙ্গুরী, ছুটির চিঠি, রাঙাদির রূপকথা ইত্যাদি। ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে বীরভূমের রাতমাগ্রাম নিবাসী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ত্রিভঙ্গবাবুর বনপাশের বাড়ী থেকে চণ্ডীদাসের একটি পুঁথি আবিষ্কার করেন। পুঁথিটি ত্রিভঙ্গবাবুর পরিবারে নিত্যপূজা পাচ্ছিল। এই নব আবিষ্কৃত পুঁথি সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৪৯ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'ভারতবর্ষে' বিশদ আলোচনা করেছেন।

ত্রিলোচন দাস (১৫২৭–১৫৮৯) : কোগ্রাম বর্ধমান। পিতা কমলঠাকুর। পদকর্তা হিসাবে লোচনদাস নামে পরিচিত। চরিতামৃত ও ভক্তিরত্নাকরাদি গ্রন্থে সুলোচন নামে পরিচিত। অপর গ্রন্থ দুর্লভসার ও রাগলহরী।

দশরথি রায় বা দাশু রায় (১৮০৯–১৮৫৭) : বাঁধমুড়ায় ব্রাহ্মণকুলে জন্ম। পিতা দেবীপ্রসাদ। পীলাগ্রামে মাতুলালয়ে ইংরাজী ও বাংলা শিখে প্রথমে শাকাই

গ্রামে নীলকুঠিতে কেরাণীর কাজে নিযুক্ত হন। পদ্য রচনায় স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল। প্রথমে আকাবাই (অক্ষয় কাটানী)-এর কবির দলে যোগ দেন। পরে প্রতিপক্ষ রামপ্রসাদ স্বর্ণকার কর্তৃক তিরস্কৃত হলে দলত্যাগ করে নিজে পাঁচালীর আখড়া স্থাপন করেন। কবিগানের ঝাঁঝালো ছড়া ও চাপান-উতোর ভঙ্গীতে তিনি পাঁচালীর নববিন্যাস করেন। তাঁর পাঁচালী সাধারণের মধ্যে লোকশিক্ষা, সাহিত্যবোধ, ধর্মবোধ ও সমাজচেতনা জাগাতে সমর্থ হয়েছিল।

দাশরথি তা (২৩শে কার্তিক ১৩১৮—১৪ই বৈশাখ ১৩৮৭) : জন্ম—ধামাস গ্রামে। প্রথমে বড়ো বলরাম এম.ই. স্কুল, পরে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল ও পরে টাউন স্কুলে পড়াশোনা করেন। পাঠ্যাবস্থাতেই স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। আন্দোলনের কেন্দ্র হিসাবে দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলকেই বেছে নেন ১৯৪২ সালে তিনি দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে সত্যাগ্রহ, অসহযোগ ও বন্যা প্রতিকারের দাবীতে অবিরত সংগ্রাম করেন। স্বল্পকালীন কৃষিমন্ত্রী ছিলেন ও গ্রামে গ্রামে ধর্মগোলা স্থাপন করেন। ১৯৭৭ সালে জনতা পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৮০ সাল থেকে রাজনীতি থেকে অবসর নেন। আজীবন বিপ্লবী ছিলেন। দামোদর, বর্ধমান বার্তা, পল্লীকথা প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদন করেন। ১৯৪৭ সালে থেকে আমৃত্যু সাপ্তাহিক দামোদরের সম্পাদনা করেছিলেন।

দুর্গাদাস লাহিড়ী (১৮৫৮?—১৯৩২) : জন্ম—চক ব্রাহ্মণগড়িয়া, নদীয়া। কর্মস্থল বর্ধমান জেলার কাটোয়া। ১৮৮৭ সালে 'অনুসন্ধান' পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি মাসিক, পাক্ষিক, দৈনিক ও পরে ইংরেজী আকারে প্রকাশিত হয়। তাঁর সর্বপ্রধান কীর্তি 'পৃথিবীর ইতিহাস' রচনার প্রয়াস। মূল, ব্যাখ্যা ও অনুবাদসহ মূল চতুর্বেদ বাংলা অক্ষরে প্রকাশ তাঁর অক্ষয়কীর্তি, তাঁর রচিত ও সম্পাদিত অন্যান্য গ্রন্থ—দ্বাদশ নারী, নির্বাণ জীবন, ভারতে দুর্গোৎসব, চুরি-জুয়াচুরি, বাঙালীর গান, বৈষ্ণব পদলহরী, রামায়ণ, মহাভারত, "স্বাধীনতার ইতিহাস, শিখ যুদ্ধের ইতিহাস ইত্যাদি।

দেবকীকুমার বসু (২৫.১১.১৮৯৮—১৭.১১.১৯৭১) : অকালপৌষ গ্রামে জন্ম। পিতা—মধুসূদন। ছাত্রাবস্থায় নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের সাহচর্যে আসেন। অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে কলেজ ত্যাগ করে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন। 'শক্তিনাথ' নামে দেশাত্মবোধক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ডি. জি. বা ধীরেন গাঙ্গুলীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে চিত্রজগতে প্রবেশ করেন। ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন কোম্পানীর Flame and Flash ছবিতে গল্পকার ও চিত্রনাট্যকার রূপে আবির্ভূত

হন। পরবর্তী—পঞ্চশর, অপরাধী ছবিরও চিত্রনাট্যকার ছিলেন। নিউ থিয়েটার্স-এর 'চণ্ডীদাস' (১৯৩২)-এর চিত্রনাট্যকার ও পরিচালকরূপে ভারতখ্যাত হন। বিদ্যাপতি, সাপুড়ে, নর্তকী, আপনা ঘর (হিন্দী), মেঘদূত, কৃষ্ণলীলা, রত্নদীপ, চন্দ্রশেখর, চিরকুমার সভা প্রভৃতি প্রায় উনচল্লিশটি ছবির পরিচালনা করেছেন। শেষ ছবি পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রযোজিত 'অর্ঘ্য'। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্য আকাদেমী কর্তৃক সম্মানিত ও ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত হন।

নগেন্দ্রনাথ সেন (?—আশ্বিন ১৩২৬ বঙ্গাব্দ) : কালনায় জন্ম। কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাশ করেও কবিরাজী শুরু করেন। 'কেশরঞ্জন' তেলের আবিষ্কর্তা। তাঁর রচিত ও সংকলিত গ্রন্থ 'রোগীচর্চা', 'পাঁচন ও মুষ্টিযোগ', 'সচিত্র ডাক্তারি শিক্ষা', 'সচিত্র সুশ্রুত সংহিতা' ইত্যাদি। 'জবাকুসুম' তেলের আবিষ্কর্তা চন্দ্রকিশোর সেন তাঁর নিকট আত্মীয়।

নটবর ঘোষ : বর্ধমানে জন্ম। পিতা–অক্ষয়কুমার। জাতিতে গোপ। বিখ্যাত কবিয়াল ও কবিগান-রচয়িতা। তাঁর পিতাও ব্যঙ্গকবিতা রচনায় দক্ষ ছিলেন।

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (৪.৭.১৮৫৩–১৯২২) : বুড়ার গ্রামে জন্ম। পিতা ঠাকুরদাস। 'শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী' ছদ্মনামে তাঁর রচিত কবিতা সারা বাঙলায় চাঞ্চল্য এনেছিল। পেশায় ডাক্তার। 'লৌহসার' নামক ম্যালেরিয়া নাশক পেটেন্ট ঔষধ তৈরী করে সুনাম ও অর্থ লাভ করেন। তাঁর রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ—ভুবনমোহিনী প্রতিভা (২ খণ্ড), দ্রৌপদীনিগ্রহ, আর্যসঙ্গীত (২ খণ্ড), সিন্ধুদূত, জাতীয় নিগ্রহ প্রভৃতি।

নরহরি দেব : পাঞ্জাবের খাড়া অঞ্চল থেকে এসে তিনি বর্ধমান রাজগঞ্জ অঞ্চলে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আখড়া স্থাপন করেন। তিনি নিম্বার্ক থেকে অধস্তন উনচত্বারিংশ শিষ্য। তিনি সিদ্ধ পুরুষ নামে খ্যাত ছিলেন ও শোনা যায় নানা অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর অন্যতম শিষ্য দয়ারাম গোস্বামী ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জন করে উখড়ায় আখড়া স্থাপন করেন ও সেই আখড়ায় গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

নরহরি দাস, সরকার ঠাকুর (১৪৭৮–১৫৪০) : শ্রীখণ্ড। পিতা–নারায়ণ। জাতিতে বৈদ্য। শ্রীচৈতন্যদেবের মন্ত্রশিষ্য ও সহচর ছিলেন। তিনি সখীভাবে চৈতন্যের ধ্যান করতেন। বৈষ্ণব সমাজে তিনি রাধার সহচরী মধুমতী বলে পরিচিত। তিনি ছিলেন বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারার প্রবর্তক। গৌরলীলাত্মক কবিতা তিনিই প্রথম রচনা করেন। শ্রীখণ্ডে নিজ ভবনে তিনিই প্রথম গৌরনিতাই মূর্তি

স্থাপন করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'ভক্তিচন্দ্রিকা পটোল', 'শ্রীকৃষ্ণ ভজনামৃত', 'ভক্তামৃতাষ্টক', 'নামামৃত সমুদ্র', 'গীতচন্দ্রোদয়' উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থের মধ্যে তিনি কোথাও নরহরি দাস, কোথাও নরহরি সরকার বা সরকার ঠাকুর নাম ব্যবহার করেছেন। লোচনদাস তাঁর শিষ্য ছিলেন।

নিত্যানন্দ দাস (১৫৩৭—?) : জন্ম—শ্রীখণ্ডে। তাঁর প্রকৃত নাম বলরাম দাস; পিতার নাম আত্মারাম। নিত্যানন্দ বলরামের গুরুপ্রদত্ত নাম। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'প্রেমবিলাস' 'গৌরাঙ্গাষ্টক' 'বীরচন্দ্র চরিত', 'রসকলাসার', 'কৃষ্ণলীলামৃত' 'হাটবন্দনা', 'কুঞ্জভঙ্গের একুশ পদ' উল্লেখযোগ্য। 'প্রেমবিলাস'ই সমধিক প্রসিদ্ধ।

নিধিরাম সাহা : জামড়া বর্ধমান। কবিসঙ্গীত রচয়িতা নিধিরাম একসময় কবিয়াল দাশরথি রায়ের প্রতিযোগী গায়ক ছিলেন।

নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর : রানীগঞ্জের জমিদার পরিবারে জন্ম। বিশিষ্ট লেখক। 'পূর্ণিমা' (১৩৩৩ বঙ্গাব্দ) পত্রিকার সম্পাদক। লাভপুরে নাট্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'নবাবী আমল', 'বীররাজা', 'ভুলের খেলা', 'রূপকুমারী' (গীতিনাট্য), 'প্রভাতস্বপ্ন', 'অন্তরায়' (উপন্যাস) প্রভৃতি।

নীরোদমোহিনীদেবী (২৪.২.১৮৬৪–২.১১.১৯৫৪) : বর্ধমানে জন্ম। পিতা প্যারীচাঁদ মিত্র। স্বামী বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা গিরীশচন্দ্র বসু। তিনি ইংরাজী শিখে দেশ-বিদেশী কাব্য-সাহিত্যাদি অধ্যয়ন ও চর্চা করেন। তাঁর রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রবাহ'। এই কাব্যে সে যুগে নীরোদমোহিনীদেবী নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে নারীমুক্তি, দেশের স্বাধীনতা ও প্রকৃতিকে তাঁর কাব্যের উপজীব্য করেন। অন্যান্য কাব্য—পারিজাত, ছায়া প্রভৃতি। তিনি টেনিশনের অনেক আখ্যায়িকা কাব্যও বাংলা পদ্যে অনুবাদ করেন।

নবীনচন্দ্র ভাস্কর : মধ্যযুগের দাঁইহাটের প্রখ্যাত ভাস্কর। রাঢ় অঞ্চলে তাঁর নির্মিত বহু পাথরের দেবমূর্তি পাওয়া গেছে। বর্ধমান জেলার ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যা দেবীর মূর্তি, দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীমূর্তি তাঁর শিল্পকৃতির পরিচায়ক।

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (কণ্ঠমশাই) (১৮৪১—১৯১২) : ধবনী গ্রামে জন্ম। গ্রামের পাঠশালায় কিছুদিন অধ্যয়নের পর অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রীতির জন্য গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রা দলে যোগ দেন। পরে গোবিন্দ অধিকারীর মৃত্যু (১২৭২ বঙ্গাব্দ) হলে নিজেই দলের অধিকারী হন ও দল পরিচালনা করেন। বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর 'কৃষ্ণযাত্রা'র বিশেষ খ্যাতি ছিল।

তাঁর কবিত্ব-শক্তি ও পাঁচালীগানের জন্য নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজ তাঁকে 'গীতরত্ন' উপাধি দেন।

নৃসিংহরাম মুখোপাধ্যায় (৮.৭.১২৮৮–২৭.৭.১৩৫০ বঙ্গাব্দ) : এ জেলার গঙ্গাপুরে তাঁর মাতুলালয়ে জন্ম। 'ধর্মপ্রচারক' পত্রিকার সম্পাদক ও 'বসুমতী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে সাহিত্য-প্রসূন, সাহিত্য-দর্পণ, আশুতোষ সরল ব্যাকরণ, সাহিত্য রত্নাকর, সংস্কৃত ব্যাকরণসার সোপান, A garland of Poems, Boys' First Word Book, Readings in English literature, Hints on the study on Sanskrit, প্রভৃতি ছাত্রদের উপযোগী পুস্তক ও আইনসংক্রান্ত পুস্তক The Code of civil Procedure (1882–1889) উল্লেখযোগ্য।

প্রতাপচন্দ্র রায়, সি.আই.ই (১৫.৩.১৮৪১–১৩.১.১৮৯৫) : গলসী থানার সাঁকো গ্রামে জন্ম। পিতার নাম রামজয়। সংসারে অভাব অনটনের জন্য এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে তাঁকে রাখালি করতে হয়। ব্রাহ্মণ তাঁর শিক্ষায় আগ্রহ দেখে তাঁকে লেখাপড়া শেখান। ১৬ বছর বয়সে কলিকাতায় এসে কালীপ্রসন্ন সিংহের কাছে চাকরী নেন ও পরে একটি বই-এর দোকান করেন। ৭ বছর পরিশ্রম করে তিনি মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেন। অনূদিত গ্রন্থের ২০০০ কপি বিক্রিত হবার পর বাকি ১০০০ কপি বিনামূল্যে বিতরণ করেন। 'রামায়ণ', 'শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা'রও বঙ্গানুবাদ করেন। তাঁর প্রধান কীর্তি মহাভারতের মূলানুযায়ী ইংরাজী অনুবাদ। এর জন্য ভারত সরকার তাঁকে সি.আই.ই উপাধি দান করে সম্মানিত করেন।

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৩–২২.৪.১৯৭৬) : চুরপুনিতে জন্ম। পিতা ক্ষেত্রনাথ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে অনার্স ও এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হন। আইন পরীক্ষাতেও প্রথম স্থান অধিকার করেন। দেশ বিভাগের আগে ফজলুল হক মন্ত্রীসভায় রাজস্ব, খাদ্য ও বিচার বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। আইন কলেজের অধ্যক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদও অলংকৃত করেন। বেইরুটে ইউনেস্কো ডেলিগেশনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। টোকিওতে আন্তর্জাতিক আইনবিদ সম্মেলনেও যোগ দেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে ইংরাজীতে 'প্রাচীন ভারতের আইন' গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। তিনি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জামাতা ছিলেন।

প্রমথনাথ মিত্র (১২৫৬-২৫.৮.১৩২৩ বঙ্গাব্দ) : জন্মস্থান কৃষ্ণপুর, বর্ধমান। বাল্যে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় চন্দননগরে মাতুলালয়ে মানুষ হন। নিজের

চেষ্টায় বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, ফারসী ও ইংরেজী ভালই শিখেছিলেন। বঙ্গবাসী, হিতবাদী, প্রভাতী ও ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় লিখতেন। হুগলী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা হাজি মহম্মদ মহসীনের জীবনী তিনিই প্রথম লেখেন। বিশ্বকোষ প্রণয়নে প্রমথনাথ নগেন্দ্রনাথ বসুকে সাহায্য করেছিলেন। শোভাবাজার বেনাভোলেন্ট সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ঐতিহাসিক শাখার বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন।

প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী, স্বামী (২৭.৮.১৮৮০–২২.১০.১৯৭৩) : কাটোয়া থানার চান্দুলী গ্রামে জন্ম। আশ্রম-পূর্ব নাম প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়। দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. পাশ করেও পদার্থবিদ্যা নিয়ে অধ্যয়ন করেন। বিপ্লবী অরবিন্দের ন্যাশনাল কাউন্সিল অব্ এডুকেশনেও শিক্ষকতা করেন। পরে রিপন কলেজে দর্শন, পদার্থ-বিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। 'সারভেন্ট' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ Approaches to truthএ তিনি অঙ্কের ধারণা নিয়ে দর্শনকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পান। তন্ত্র সাধনায় স্যার উডরকের সহকর্মী। তাঁর রচিত গ্রন্থ Metaphysics of physics, Science and Sadhana (6 vols), বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান, বেদ ও বিজ্ঞান প্রভৃতি।

প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ (১৮০৬–২৫.৪.১৮৬৭) : রায়না থানার শাকনাড়া গ্রামে জন্ম। পিতা–রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করে 'তর্কবাগীশ' উপাধি পান। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ছোটবেলায় তাঁর কবির দলে গান করার অভ্যাস ছিল। সেই সূত্রে ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় ও সংবাদ প্রভাকর ও সংবাদ ভাস্কর পত্রিকার সংস্কৃত শিরোলেখ রচনা করে দেন। তিনি সুবিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ জেমস প্রিন্সেপকে ক্ষোদিত তাম্রশাসন ও প্রস্তর ফলকের পাঠোদ্ধারে সাহায্য করেন। তিনি ১১টি সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা রচনা করেন।

বটকৃষ্ণ ঘোষ (১৯০৫–১৯৫০) : জন্ম–অকালপৌষ গ্রামে। পিতা–অরবিন্দপ্রকাশ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর শারীরিক কারণে পড়াশুনা বন্ধ করতে বাধ্য হন। পরে চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত ও নিজের চেষ্টায় জার্মান ও ফরাসী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। তারপর হিতৈষীদের সহযোগিতায় জার্মানী ও ফ্রান্সে যান এবং গবেষণা করে উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও আধুনিক ভাষা বিভাগে এবং উভয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। পরে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও

আধুনিক ভাষা বিভাগের লেকচারার হন। বিদ্যাসাগর কলেজে জার্মান ও ফরাসী ভাষার লেকচারার ও যাদবপুরের জাতীয় শিক্ষা পরিষদের হেমচন্দ্র বসু লেকচারার, এশিয়াটিক সোসাইটির রিসার্চ ফেলো প্রভৃতি পদ অলংকৃত করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ—Linguistic Introduction to Sanskrit, Collection of Fragments of Lost Brahmanas, Pali Literature and Language, Hindu Law and Customs, Hindu Ideal of Life 1947 উল্লেখযোগ্য।

বটুকেশ্বর দত্ত (১৯০৮—১৯.৭.১৯৬৫) : পৈতৃক নিবাস ওয়াড়ি। পিতা গোষ্ঠবিহারী। ১৯২৫ সালে কানপুর থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে কলকাতায় দরজির কাজ শেখেন। এই সময়েই ভগৎ সিং ও চন্দ্রশেখর আজাদের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে বিপ্লবী দলে যোগ দেন। বিভিন্ন প্রদেশে বিপ্লবীদল সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। এই দলের নাম ছিল হিন্দুস্তান রিপাবলিকান সোসিয়ালিষ্ট আর্মি। দলের প্রথম কাজ হলো ভগৎ সিং কর্তৃক প্রকাশ্য দিবালোকে সন্ডার্স নিধন (১৭.১২.২৮)। বটুকেশ্বর ও ভগৎ সিং রাজ্যশাসন ব্যবস্থার প্রতিবাদ জানাবার জন্য পার্লামেন্ট গ্যালারী থেকে দুটি বোমা ছোড়েন ও প্রচারপত্র ছড়িয়ে দেন (৮.৪.১৯২৪) এবং ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' ও 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক' ধ্বনি তুলে শান্তভাবে আত্মসমর্পণ করেন। পাঞ্জাবে তাঁদের বিস্ফোরক আইন ভঙ্গ ও হত্যার চেষ্টার অভিযোগে বিচারের এক প্রহসন চলে এবং বিচারে ভগৎ সিং-এর ফাঁসি ও বটুকেশ্বরের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বটুকেশ্বর মুক্তি পান কিন্তু বাংলা, পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে আবার গ্রেপ্তার হন ও ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দাদার গৃহে অন্তরীণ থাকেন। স্বাধীনতা লাভের পর পাটনায় বসবাস করেন ও ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে বিবাহ করে সংসারী হন। জীবিকার জন্য শেষ জীবনে ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায় নামেন। ১৯.৭.৬৫ তারিখে দিল্লীতে তাঁর দেহান্ত ঘটে। জীবিত অবস্থায় তাঁর ব্যক্ত ইচ্ছানুসারে তাঁর মরদেহ হোসেনওয়ালাতে ভগৎ সিং-এর সমাধিক্ষেত্রে আনীত হয় ও সেইখানেই শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

বলাইচন্দ্র সেন (১৩০০—১৩৫১ বঙ্গাব্দ) : জন্ম—কালনায়, পিতা—কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ। মূলত ব্যবসায়ী; কলকাতায় ওরিয়েন্টাল মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ নামে হারিকেনের কারখানা, ড্রাগ এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস নামে ওষুধের কারখানা গড়ে শিল্পোন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য করেন। কালনার অম্বিকা হাইস্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং হাসপাতাল নির্মাণে কয়েক লক্ষ টাকা দান করেন।

বিজয় কুমার ভট্টাচার্য (১৮৯৫–১৯৯১) : ১৮৯৫ সালে বর্ধমান জেলার ওয়াড়ি গ্রামে জন্ম। কলেজে পড়াকালীন বিবেকানন্দের চিন্তাভাবনা ও বাণীর দ্বারা প্রভাবিত হন। এই সময় থেকেই আদর্শবাদী বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় স্বাধীনতা আন্দোলনে হাতেখড়ি। প্রথম জীবনে হুগলী জেলায় ভাণ্ডারবাটী হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন।

১৯২১ সালে গান্ধীজির ডাকে সাড়া দিয়ে শিক্ষকতার চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং বর্ধমানে যাদবেন্দ্র পাঁজা ও বিনয় চৌধুরীদের সঙ্গে এক যোগে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, বন্যাত্রাণ, প্রেস চালান যেখানেই কর্মীর অভাব হয়েছে সেখানেই বিজয়বাবু এগিয়ে গিয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যোগ দিয়ে দীর্ঘ কারাবাস করেন। যুদ্ধশেষে ছাড়া পেয়ে কলানব গ্রামে গিয়ে গ্রামের গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সেখানে বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন, টেকনিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা, আঞ্চলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করে গ্রামটিকে আদর্শ গ্রামরূপে গড়ে তোলার কাজে সারাজীবন কাটিয়ে দেন।

সাধনা দেবী তাঁর কর্মসঙ্গিনী। বিজয়বাবু সারাজীবন নিরক্ষরকে শিক্ষাদান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান, পীড়িতের চিকিৎসা ও নানা গঠনমূলক কাজকেই ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে ছিলেন। ১৯৮৪ সালে একবার সরকারের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। তিনি আমৃত্যু অনশন করার সংকল্প জানিয়ে সরকারকে চরম পত্র দেন। শেষে তাঁর স্নেহভাজন মন্ত্রী বিনয় চৌধুরীর হস্তক্ষেপে মিটমাট হয়। মৃত্যুর আগেও ৯৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত অসুস্থ শরীরে তাঁর অদম্য কর্মোৎসাহ কিছুমাত্র কমে নাই।

বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব : বর্ধমান জেলার বণ্ডুলে জন্ম। পূর্বাশ্রমের নাম ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়। ছাত্র হিসাবে খুব মেধাবী ছিলেন। ১২ বছর বয়সের সময় তাঁর জীবনে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। তাঁকে কুকুরে কামড়ালে ক্ষতের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে চুঁচুড়ায় আত্মীয়ের বাড়ী যান। সেখানে একদিন গঙ্গায় আত্মহত্যা করতে যান। হঠাৎ দেখেন এক সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী তাঁকে নিরস্ত করে ক্ষত স্থানে হাত বুলিয়ে দিতেই ক্ষত নিরাময় হয়। এই সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে এসে বিন্ধ্যপর্বতের গোপন গুহায় সাধন-ভজন করেন। শ্রীভৃগুরাম পরমহংসদেব তাঁকে যোগতন্ত্র প্রক্রিয়াতে ধর্মসাধনায় দীক্ষা দেন। দীক্ষান্তে স্বগৃহে ফিরে আসেন। গোপীনাথ কবিরাজ তাঁর অন্যতম শিষ্য। পল ব্রন্টন ও গোপীনাথ কবিরাজের লেখা কয়েকখণ্ড গ্রন্থে এই মহাপুরুষের জীবন ও সাধনার পরিচয় আছে। বর্ধমানে রোজভিলায় বিশুদ্ধাশ্রমে

তিনি দীর্ঘদিন ছিলেন। শিষ্যদের ফরমাস মত তিনি অলৌকিক শক্তিবলে হাতে যে কোন গন্ধ উৎপন্ন করতে পারতেন। এজন্য তিনি 'গন্ধবাবা' নামে পরিচিত ছিলেন। ১৩৪৪ সালের আষাঢ় মাসে তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে।

বীরেশ্বর তর্কতীর্থ মহামহোপাধ্যায় (১২৭৯—১৩৬১ বঙ্গাব্দ) : জন্ম— কালনা থানার বৈদ্যপুরে। পিতা সারদাচরণ ভট্টাচার্য। ১২ বছর বয়সে তিনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের আদ্য, মধ্য পরীক্ষার পাঠ শেষ করেন। ১৭ বছর বয়সে পাঁচঘড়া নিবাসী মথুরানাথ কাব্যস্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের কাছে কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বীরেশ্বর অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তিনি একবার যাহা পড়তেন চিরদিনের জন্য কণ্ঠস্থ করে রাখতেন। এরপর বাগবাজার নিবাসী পার্বতীচরণ তর্কতীর্থ, পটলডাঙ্গা নিবাসী জীবনানন্দ বিদ্যাসাগর প্রমুখ পণ্ডিতদের নিকট কাব্য অধ্যয়ন করেন। কাব্য অধ্যয়ন শেষে মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্বভৌমের কাছে নব্য ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ও উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে পুরস্কার ও স্বর্ণকেয়ুর উপহার পান। ভারত ধর্ম মহামণ্ডলের পক্ষে মিথিলারাজ কামাখ্যা সিংহের কাছ থেকে 'তর্কনিধি' উপাধি লাভ করেন। ১৩১০ সালে 'বৈদ্যপুর জ্ঞানতরঙ্গিণী' নামে চতুষ্পাঠী খোলেন। ১৩২১ সালে বর্ধমান বিজয় চতুষ্পাঠীতে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়ে আমৃত্যু অধ্যাপনার কাছে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'লকারার্থ নির্ণয়' পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়েছে।

বলাইচন্দ্র দত্ত (১৯২৩—) : জন্ম— রায়না থানার ৮০নং মেড়াল গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত গ্রামীণ জমিদার পরিবারে। এন্ট্রান্স পাশ করে গ্রামে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় চাকুরীর সন্ধানে পাটনায় এক আত্মীয়ের কাছে যান। সেখানে বীমার দালালি করতে গিয়ে এক অবসরপ্রাপ্ত বাঙালী অফিসারের দারোয়ানের গলাধাক্কা খান। পরে নরেন্দ্র সিংহ নামে এক সহৃদয় বাঙালীর আশ্রয়ে থেকে Type Writing & Lino Telegraphy শেখেন। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। দানাপুর ক্যান্টনমেন্টে সৈন্যদলে যোগ দিতে গিয়ে ব্যর্থ হন ও পরে সুলেমান সাহেব নামে এক Chief Petty Officer-এর সাহায্যে Royal Indian Navyতে যোগ দেন। সেখানে ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে ব্রিটিশ সৈন্যদের খাদ্য, পোশাক, কর্মপদ্ধতিতে বিরাট বৈষম্য বলাইবাবুসহ ভারতীয় সৈন্যদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। শেষে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয়ে বলাইবাবুসহ কয়েকজন ভারতীয় নৌ সৈন্যের নেতৃত্বে ভারতীয় নৌ সৈন্যরা

'তলোয়ার' জাহাজে ১৯৪৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে অনশন শুরু করেন। শুরু হয় নৌবিদ্রোহ। ২২ বছর বয়সী বলাইবাবু ছিলেন এই বিদ্রোহের অন্যতম নেতা। বিদ্রোহীরা জাহাজ থেকে ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে কংগ্রেসী, মুসলীম লীগ ও কমিউনিস্ট পতাকা উত্তোলন করেন। ব্রিটিশ সৈন্যগণ নির্বিচারে বিদ্রোহীদের উপর গুলি চালালে ও আকাশ থেকে বোমা ফেলার হুমকি দিলে, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের পরামর্শে বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করেন। যদিও নেতারা আশ্বাস দিয়েছিলেন কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না; কিন্তু নেতৃস্থানীয়রা শাস্তি থেকে রেহাই পান নাই। অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে বলাইবাবুও বরখাস্ত হন এবং নৌবাহিনীতে তাঁর যে পাওনাগণ্ডা ছিল সমস্ত থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হয়। বলাইবাবুদের এই বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশ সরকারের ধারণা হয় সৈন্যবাহিনী যখন ক্ষেপেছে তখন এদেশ তাদের ছাড়তেই হবে। ফলে স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হয়। দেশের জন্য বলাইবাবুদের আত্মত্যাগ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

বিনয় চৌধুরী : (জন্ম—১৯১১, মৃত্যু—মে '২০০০) : জন্ম মাঝেরগাঁয়ে। প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা ও রাজ্যের প্রাক্তন ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রী। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে পড়াশোনা। শেষে শ্রীরামপুর কলেজে পড়ার সময়েই তিনি ও সরোজ মুখার্জী যুগান্তর বিপ্লবী দলে যোগ দেন। বর্ধমানে ফকিরচন্দ্র রায় মহাশয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছাত্র ও যুব সম্মেলনের মাধ্যমে ছাত্র ও যুবদের সংগঠন শুরু করেন। লবণ সত্যাগ্রহের সময় তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে চিঠি দিয়ে বর্ধমানের কর্জন গেটে বে-আইনীভাবে তৈরী লবণ বিক্রি করার সময় গ্রেপ্তার হন। ১৯৩২ সালে জেল থেকে বেরিয়ে বেগুট কেসে আবার গ্রেপ্তাব হন। বিচারে হরেকৃষ্ণ কোঙারের ৬ বছর সাজা হয়। প্রমাণাভাবে বিনয়কৃষ্ণকে ডেটিনিউ করে প্রথমে বর্ধমান ও পরে বগুড়া জেলে ইনটার্ন করে রাখা হয়। পরে সেখান থেকে সিউড়ীতে স্থানান্তরিত হন। পরে তাঁকে বীরভূম ষড়যন্ত্র কেসে আসামী করা হয়। ৮ মাস বিচারের প্রহসন চলার পর বিনয়বাবুর সাড়ে পাঁচ বছর জেল হয়। ১৯৩৮ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। সেই থেকে তিনি পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী। ১৯৫২ সালে বর্ধমানের মহারাজ বিজয়চাঁদ মহতাবকে হারিয়ে সংসদীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ১৯৭৭ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত প্রতিটি নির্বাচনেই বর্ধমান কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেন। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে তিনি আর দাঁড়াননি। ১৯৯৮ সালে পলিটব্যুরোর সদস্যপদও ছেড়ে দেন। এরপরেই রাজনীতি থেকে অবসর নেন। ১৯৯৮ সালে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই তাঁর

শরীর ভেঙে পড়ে। বিনয়বাবুর শ্রেষ্ঠ কীর্তি রাজ্যে অপারেশন বর্গার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ বর্গাদারকে নথিভুক্ত করে তাদের উচ্ছেদ বন্ধ করা। ২০০০ সালের মে মাসে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁর দেহ নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজে গবেষণার জন্য দান করা হয়।

বৈকুণ্ঠনাথ সেন, রায়বাহাদুর (১৪.৬.১৮৪৩—এপ্রিল ১৯২১) : কাটোয়ার নিকট আলমপুরে জন্ম। পিতা হরিমোহন সেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. ও বি.এল. পাশ করে প্রথমে হাইকোর্টে ও পরে বহরমপুর কোর্টে ওকালতি করেন। কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক, কংগ্রেসের এডুকেশন সেলের সদস্য ছিলেন। ১৯১৭ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সদস্য ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি ছিলেন। কাশিমবাজারের মহারাজা ও বৈকুণ্ঠনাথের অর্থেই বেঙ্গল পটারী ওয়ার্কস্ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভূষণ দাস (আনু ১৯১৬) : কালনা মহকুমার আনুখালে জন্ম। সুকণ্ঠগায়ক; তিনি যাত্রার দলে অভিনয় ও জুড়ির ভূমিকা উভয় ক্ষেত্রেই অংশ নিতেন। তাঁর 'অভিমন্যু বধ' পালা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। তাঁর 'মাতৃপূজা' নাটক স্বদেশ প্রেমের কারণে সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়।

ভোলানাথ রায় কাব্যশাস্ত্রী (১২৯৮—২৩.১২.১৩৩৯ বঙ্গাব্দ) : বর্ধমানের নিকট রায়ান গ্রামে জন্ম। খ্যাতনামা যাত্রানাট্যকার। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে, পড়া ছেড়ে দেন ও যাত্রার পালা রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর প্রথম নাটক কুবলাশ্ব। গণেশ অপেরাতেই তাঁর অধিকাংশ নাটক অভিনীত হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁকে 'কাব্যশাস্ত্রী' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর রচিত নাটক—কালচক্র, জগদ্ধাত্রী, ধনুর্যজ্ঞ দাক্ষিণাত্য, বজ্রদৃষ্টি, অজাতশত্রু, বাসুকী প্রভৃতি।

মতিলাল রায় (১৮৪২—১৯০৮) : পূর্বস্থলী থানার ভাতশালা গ্রামে জন্ম; পিতা—মনোহর রায়। যাত্রার প্রখ্যাত পালাকার ও অভিনেতা। ধর্মীয় কাহিনী ছাড়াও রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করে যাত্রার বহু নাটক লিখেছেন। শিক্ষাশেষে কিছুদিন কেরাণী ও শিক্ষকতার কাজ করেন। ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকরের নিয়মিত লেখক ছিলেন। নবদ্বীপে যাত্রার দল গঠন করেন ও গীতাভিনয়, যাত্রাপালা রচনা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর রচনায় পাঁচালী ও কথকতার মিশ্রণ ছিল। তাঁর গদ্যরচনা কৃত্রিম। উল্লেখযোগ্য পালা

সীতাহরণ, ভরতাগমন, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, নিমাইসন্ন্যাস, কর্ণবধ, ভীষ্মের শরশয্যা প্রভৃতি। কাশীতে মৃত্যু হয়।

মুকুন্দ দত্ত (১০/১৬ শতাব্দী) : শ্রীখণ্ড, বর্ধমান। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুরক্ত ছিলেন। নবাব হুসেন শাহের রাজচিকিৎসক নিযুক্ত হন।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবিকঙ্কণ (আনুমানিক ১৫৪৭—?) : দামুন্যায় জন্ম, পিতা হৃদয় মিশ্র। মিশ্র নবাবদত্ত উপাধি। মুসলমান ডিহিদার মামুদ সরিপের অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে দামুন্যা ত্যাগ করে মেদিনীপুরে আরড়া গ্রামের বাঁকুড়া রায়ের কাছে গেলে তিনি তাঁকে নিজ পুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। এখানেই বিদ্যালোচনায় মনোনিবেশ করে কিছুদিন পর 'চণ্ডীমঙ্গলকাব্য' রচনা করে কবিকঙ্কণ উপাধি পান। কাব্যের রচনাকাল সম্ভবত ১৫৯৪—১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল-এ ইতিহাস বড় জীবন্ত; বাঙ্ময়। বহিঃশক্তির আবির্ভাবে সমাজের সর্বস্তরে যে অনিশ্চয়তা নেমে এসেছিল মুকুন্দরামের কাব্যে তার প্রতিফলন ঘটেছে। দরিদ্রের দুঃখ বেদনাদীর্ণ জীবনযাপন থেকে সমৃদ্ধ নগরস্থাপন, পশুপক্ষী শিকার, ছাগল চরানো থেকে সমুদ্রযাত্রা—সপত্নী কলহ, গ্রাম্য দলাদলি, ব্যাধের সরল জীবনযাত্রা—জনজীবনের বিচিত্র চিত্রে সমৃদ্ধ কবিকঙ্কণের কাব্য। মুকুন্দরাম কেবল চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেরই শ্রেষ্ঠ কবি নন, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের সার্থকতম শিল্পী তিনি।

যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭–১৯৩০) : স্বাধীনতা সংগ্রামী, পরবর্তীকালে নিরালম্ব স্বামী নামে সর্বাধিক পরিচিত। জন্ম গলসী থানার চান্নাগ্রামে। কলেজে পড়ার সময় যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হওয়াব আগ্রহে তিনি গৃহত্যাগ করেন। এলাহাবাদে 'প্রবাসী'র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁর 'কায়স্থ পাঠশালায়' হিন্দী শেখেন। সামরিক বিদ্যা শেখার জন্য রামানন্দবাবুর পরামর্শে বরোদায় যান। এখানে অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে পরিচিত হন ও তাঁর সুপারিশে বরোদা-রাজের দেহরক্ষী নিযুক্ত হন। তখন নাম নেন যতীন্দ্র উপাধ্যায়। ১৯০২ সালে কলকাতায় অনুশীলন সমিতি নামে বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ভারতী পত্রিকায় ইতালীর বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে লিখতে শুরু করেন। পরে পাঞ্জাবে যান ও এখানেই সোহম্‌স্বামী তিব্বতী বাবার সংস্পর্শে আসেন ও সোহম্ মন্ত্রে দীক্ষিত হন; নাম হয় নিরালম্ব স্বামী। কিছুকাল 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। তাঁর মাধ্যমেই বরোদায় অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের যোগাযোগ হয়।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (৩০.১২.১৮৫৪–১৮.৮.১৯০৫) : জন্ম ইলসরা গ্রামে (জামালপুর থানা)। পিতা মাধবচন্দ্র, পৈতৃক নিবাস জামালপুর থানার বেড়ুগ্রাম। এম.এ. পাশ করার পর, ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত হয়ে এলাহাবাদ যান। সেখানে আইন পরীক্ষায় পাশ করেন। পরে চুঁচড়ায় 'সাধারণী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক হন ও ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহে সম্মতি দান বিলের প্রতিবাদে আন্দোলনে নামেন। তিনি কংগ্রেসের ভিক্ষা চাওয়ার নীতির বিরোধী ছিলেন। রক্ষণশীল হিন্দু। তিনি হিন্দী 'বঙ্গবাসী' ও ইংরেজী 'টেলিগ্রাফ' পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন। বাংলার প্রাচীন সাহিত্য, বঙ্গানুবাদসহ বহু শাস্ত্রগ্রন্থ ও কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য ইংরেজীগ্রন্থের সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কালাচাঁদ, নেড়া হরিদাস, কৌতুককথা, চিনিবাসচরিত, বাঙালীচরিত (৩ ভাগ), মডেল ভগিনী (৪ ভাগ), শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী।

যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা (১৮৮৫–১৯৬১) : সাটিনন্দী গ্রামে জন্ম। ওকালতি করতেন। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দীর্ঘকাল কারাবরণ করেন। ২০ বৎসর কাল তিনি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। অবিভক্ত বাংলার আইন পরিষদেরও তিনি সভাপতি ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর রাজ্যমন্ত্রীসভায় যোগ দেন। কংগ্রেসে যোগদানের পর থেকেই তিনি জুতা ত্যাগ করেন। অত্যন্ত সৎ ও নিষ্ঠাবান গান্ধীপন্থী কংগ্রেসকর্মী ছিলেন।

রঘুনন্দন দাসগোস্বামী (১৭৮৬–?) : মানকরের কাছে মাড়ো গ্রামে জন্ম। পিতা কিশোরীমোহন। রঘুনন্দন ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর বংশধর। সংস্কৃত ব্যাকরণ, শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন শেষ করে ১৮ বছর বয়সেই কবিতা রচনা শুরু করেন। তিনি বহুপদ রচনা করে, গীতমালায় সন্নিবদ্ধ করেন। তাঁর রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ 'গৌরাঙ্গচম্পূ'তে চৈতন্যদেবের নবদ্বীপলীলা মাত্র বর্ণিত আছে। তিনি ৪৫ বছর বয়সে নিজ বংশবৃত্তান্ত রামরসায়ন কাব্য লেখেন। তাঁর রচিত অপর গ্রন্থ 'রাধামাধবোদয়', 'দেশিক নির্ণয়' 'বৈষ্ণবব্রত নির্ণয়' প্রভৃতি।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭–১৩.৫.১৮৮৭) : জন্ম—জেলার বাকুলিয়া গ্রামে। গ্রামস্থ পাঠশালা ও মিশনারী স্কুলের পাঠ শেষ করে হুগলী মহসীন কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য কলেজ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ইংরাজী, সংস্কৃত ও প্রাচীন ওড়িয়া কাব্যসাহিত্যে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল।

ঈশ্বর গুপ্তের সাহচর্যে তিনি 'সংবাদ প্রভাকরে' সাহিত্য জীবন শুরু করেন। ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকার সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে কিছুদিনের জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা, আয়কর বিভাগে চাকুরী ও শেষে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে দীর্ঘদিন চাকরী করে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে অবসর নেন। স্বদেশপ্রেমিক কবি হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'পদ্মিনীউপাখ্যান', খুবই বিখ্যাত। এই কাব্যের অংশ—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়?"

সে সময় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মূলমন্ত্র ছিল।

তিনি কুমারসম্ভবের পদ্যানুবাদ করেন। তাঁর অপর পুস্তক 'নীতিকুসুমাঞ্জলি' 'উৎকল দর্পণ' ইত্যাদি।

রায়বাহাদুর রসময় মিত্র : (১৮৫৯—১০.৪.১৯৩১) : গুসকরার সন্নিকট গুসকরা-কাশেমনগর রাস্তার মধ্যস্থলে চানক গ্রামে জন্ম। পিতা—নবদ্বীপচন্দ্র। খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্। অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থা থেকে তিনি নিজেকে গড়ে তোলেন। সিউড়ি সরকারী বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে ১৫ টাকা বৃত্তি পান। মহসীন কলেজ থেকে ২০ টাকা বৃত্তি নিয়ে এফ.এ. পাশ করেন। ইংরাজীতে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মেদিনীপুরের এক স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। পরে হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়ে আসেন। ৫ বছরে হেয়ার স্কুলের প্রভূত উন্নতি করেন। এরপর সরকার তাঁকে হিন্দু স্কুলের দায়িত্ব দেন। তাঁর কর্মনিষ্ঠায় হিন্দু স্কুলের যেন নূতন জাগরণ ঘটে। এই কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ সরকার তাঁকে রায়বাহাদুর উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী রসময়বাবুর কীর্তনগানে লোকে মুগ্ধ হয়ে যেত। 'কৃপাদৃষ্টি,' 'রাস-রস-কণিকা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

রাজকৃষ্ণ রায় (২১.১০.১৮৪৯—১৯.৩.১৮৯৪) : রামচন্দ্রপুরে জন্ম। বিশিষ্ট নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। আট বছর বয়সে পিতৃহীন হন। প্রথমে নিউ বেঙ্গল প্রেসে যোগ দিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। পরে এ্যালবার্ট প্রেসের ম্যানেজার হন ও এখান থেকেই 'বীণা' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় তাঁর নাটক, কবিতা প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রেসে লোকসান হতে থাকায় তিনি প্রেস বিক্রয় করে দেন ও 'বীণা রঙ্গভূমি' প্রতিষ্ঠা করেন (১২৯৪ বঙ্গাব্দ)। সেখানে

স্বরচিত 'চন্দ্রহাস' নাটক ও অন্যান্য নাটক অভিনীত হতে থাকে। কিন্তু এখানেও ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ায় 'রঙ্গভূমি' বিক্রয় করে স্টার থিয়েটারে বেতনভুক নাট্যকার নিযুক্ত হন। তিনি অক্লান্ত লেখক ছিলেন। ভাবত-গান-কবিতামালায় তাঁর দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'পতিব্রতা', 'নাট্যসম্ভব', 'তরণীসেন বধ', 'লায়লা মজনু', 'দ্বাদশ গোপাল' এবং রামায়ণ-মহাভারতের বঙ্গানুবাদ উল্লেখযোগ্য। তিনি হরধনুভঙ্গ (১৮৮১) নাটকে সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন। তাঁর 'বর্ষার মেঘ' কবিতা ও 'রাজা বিক্রমাদিত্য' নাটকে গদ্যকবিতা রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

রামক্ষয় চট্টোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর (১৮২৯—১৯১৪) : জন্ম দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের শাকনাড়া গ্রামে। ১৪ বছর বয়সে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ও ইংরাজী শিক্ষা করেন। ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির জন্য বৃত্তিলাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে সেই বছরই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর দেড় বছর প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অধীনে ডেপুটি ইন্সপেক্টর পদে যোগ দেন। ১৮৬৬ সালে ওড়িশায় ও ১৮৭৪ সালে বিহারে দুর্ভিক্ষ হলে রামক্ষয় ত্রাণকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। নিজ গ্রামেও অনেক জনহিতকর কার্য করেন। তাঁর রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ "আত্মচিন্তন" ও "আচারচিন্তন"। বাংলা গ্রন্থ "পুলিশ ও লোকরক্ষা।"

রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত (১৮শ শতাব্দী) : পিতা—অভয়রাম তর্কভূষণ। ধাত্রীগ্রামের গুরু ভট্টাচার্য বংশীয় ছিলেন। তিনি 'বুনো রামনাথ' নামে অধিক পরিচিত। নবদ্বীপে অধ্যাপনা করেন। অগাধ পাণ্ডিত্য ও আর্থিক অনটন সত্ত্বেও অধ্যাপনার প্রতি নিষ্ঠার জন্য তাঁর খ্যাতি ছিল। আর্থিক দুরবস্থা সত্ত্বেও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বৃত্তি প্রত্যাখ্যান করেছেন। ছাত্রদের ভিক্ষালব্ধ অন্ন ও তিন্তিড়ি (তেঁতুল) পত্রের ঝোলেই তিনি পরিতুষ্ট ছিলেন। তাই আজও 'বুনো রামনাথ'কে শিক্ষকের আদর্শ বলা হয়।

রাসবিহারী ঘোষ, স্যার (২৩.১২.১৮৪৫—২৮.২.১৯২১) : তোরকণায় জন্ম। পিতা জগবন্ধু। বাঁকুড়া হাইস্কুল থেকে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে এন্ট্রান্স, প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বি.এ. এবং ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ভারতীয় হিসাবে ইংরাজীতে অনার্সসহ এম.এ. এবং ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্ণপদক সহ আইন পাশ করে বহরমপুর কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। তারপর হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন ও অল্পদিনের মধ্যে আইনজীবী হিসাবে খ্যাতির শীর্ষে ওঠেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে Honours in Law পাশ করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠাকুর আইন অধ্যাপক রূপে Law of Mortgage in India শীর্ষক যে বক্তৃতা দেন, তাই একত্রিত করে Mortgage আইন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ডি.এল., সি.আই.ই., সি.এস.আই ও নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও দেশসেবার কাজে বহু লক্ষ টাকা দান করেছেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি সভাপতি হন। তিনি বঙ্গভঙ্গের বিরোধী ছিলেন।

রাসবিহারী বসু (২৫.৫.১৮৮৫–জানুয়ারী ১৯৪৫) : রায়না থানার সুবলদহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা–বিনোদবিহারী। চন্দননগরে মর্টন স্কুলে ও ডুপ্লে কলেজে পড়ার সময়েই অধ্যাপক চারু রায়ের প্রভাবে কানাই দত্ত, মতি রায় প্রমুখ যে বিশিষ্ট দল গড়ে তোলেন তার সঙ্গে এবং মুরারিপুকুর বাগানে বারীন ঘোষের নেতৃত্বে গড়ে তোলা সংগঠিত গুপ্তদলের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে আলিপুর বোমার মামলায় তল্লাসী চালাবার সময় তাঁর লেখা দুটি চিঠি পুলিশের হস্তগত হওয়ায় গ্রেপ্তার হন ও পরে মুক্তি পান। পুলিশের নজর এড়াতে দেরাদুনে যান ও সেখানে ফরেস্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউটে হেড ক্লার্ক রূপে কাজে যোগ দেন। তিনি দেশ-বিদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গোপনে যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে বিপ্লবীদল গড়ে তোলেন। ১৯১৫ সালে মহাযুদ্ধের সময় গোপনে তাঁর সঙ্গীরা সৈন্যদের মধ্যে বিপ্লব প্রচার করতে থাকেন। এরপর নানা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে পুলিশ চারদিকে তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য অনুসন্ধান করেন ও তাঁর মাথার জন্য বহু টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর নাম থাকায় রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় পরিচয়ে পি. আর. ঠাকুর ছদ্মনামে জাপানে পালিয়ে যান ও সেখানে টোকিও ইণ্ডিয়ান লীগ প্রতিষ্ঠা করেন ও জাপান থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যান। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান মিত্র পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে তিনি মালয়-ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশের ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ গঠন করেন। পরে সুভাষচন্দ্র জাপানে গেলে তিনি সুভাষচন্দ্রের হাতে আজাদ হিন্দের সব দায়িত্ব তুলে দেন। জাপানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

রূপমঞ্জরী (১৭৭৫ ?–১৮৭৫) : আউসগ্রাম থানার কলাইঝুটিতে জন্ম। পিতা–নারায়ণ দাস। ব্যাকরণ, সাহিত্য ও চিকিৎসা শাস্ত্রে পণ্ডিত রূপমঞ্জরীর প্রথম শিক্ষাগুরু তাঁর বৈষ্ণব পিতা। পরে নিকটবর্তী এক বৈয়াকরণের গৃহে তিনি মেয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। পিতার ব্যাকরণ পাঠ শেষ করে সরগ্রাম নিবাসী গোকুলানন্দ তর্কালঙ্কারের কাছে সাহিত্য, চরক সুশ্রুত ইত্যাদি জটিল

চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁর কাছে ব্যাকরণ, সাহিত্য ও চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য বহু ছাত্রের সমাবেশ হতো। তিনি পুরুষের মত মস্তকমুণ্ডন, শিখা ধারণ ও উত্তরীয় পরিধান করতেন। আজীবন কুমারী অবস্থায় তিনি চিকিৎসা ও জ্ঞানের সাধনা করে গেছেন। তিনি হটু বিদ্যালঙ্কার নামে সুপরিচিত ছিলেন।

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে (১৮.১২.১৮২৪–২৮.১০.১৮৯৪) : বর্ধমান থানার সোনাপলাশী গ্রামে জন্ম। পিতা ছিলেন গোঁড়া বৈষ্ণব। তবু ছেলেকে শিক্ষার জন্য কলকাতায় পাঠান। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল এসেম্বলী ইনস্‌টিটিউশনে ভর্তি হন। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রেভঃ ডাফ কর্তৃক খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। এরপর ধর্মীয় প্রচারক ও ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রেভারেন্ড হন। ১৮৭৭–'৮৯ পর্যন্ত হুগলী কলেজের ইংরেজী অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। এখান থেকেই 'বেঙ্গলী ম্যাগাজিন' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইংরাজী সাহিত্যচর্চার জন্য ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ফেলো নির্বাচিত হন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে সুরাটের পার্সী খ্রীষ্টান হরমদজি পেস্টনজীর কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি বেথুন সোসাইটির সদস্য-রূপে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন—যেমন Primary Education of Bengal, English Education in Bengal, Teaching of English literature in Colleges. তিনি বিশ্বাস করতেন প্রতিটি মানুষের শিক্ষার অধিকার আছে ও শিক্ষাদান সরকারের কর্তব্য। তিনি হিন্দুজাতিভেদ প্রথার, ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে বৈষম্যের ও জমিদারদের রায়ত শোষণের তীব্র সমালোচক ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Govinda Samanta বা The History of a Bengal Rayat ও Folk Tales of Bengal, Recollections of Alexander Duff.

শিবদাস সেন : একজন আয়ুর্বেদবিদ্ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। পঞ্চকোট বা শিখরভূমের রাজসভাসদ সাঙ্গ সেনের প্রপৌত্র অনন্ত সেনের পুত্র। তিনি চক্রপাণি দত্ত রচিত 'চিকিৎসা সংগ্রহ' ও 'দ্রব্যগুণ সংগ্রহে'র এক উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করেন।

শৈলবালা ঘোষজায়া (১৮৯৩ ?–১৯৭৩) : প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক। বর্ধমানে জন্ম। কুমারী অবস্থায় উপাধি নন্দী। মেমারীর নরেন্দ্রমোহন ঘোষের সঙ্গে বিবাহ হয়। নায়ক মুসলমান ও নায়িকা হিন্দুকে নিয়ে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সেখ আন্দু' প্রকাশিত হলে আন্দোলনের ঝড় ওঠে। মহিলা লেখকদের মধ্যে তিনি বিশেষ

খ্যাতি অর্জন করেন। প্রায় ৫২ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—সেখ আন্দু, নমিতা, জন্ম-অপরাধী, ইমানদার ইত্যাদি।

শ্যামাদাস বাচস্পতি (১৮৬৪–৩.৭. ১৯৩৪) : জন্ম চুপী গ্রামে, পিতা–অন্নদাপ্রসাদ। ২৮ বছর বয়সে টোলে পড়া শুরু করেন। তখন থেকে সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্তা ও বক্তৃতা দিতে চেষ্টা করেন। নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র ও কাশীতে আয়ুর্বেদশাস্ত্র পাঠ শেষ করে কলকাতায় ফিরে কবিরাজি শুরু করেন। বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্রদের নিয়ে টোল খোলেন। দেশবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে টোল তুলে দিয়ে 'বিদ্যাশাস্ত্রপীঠ' প্রতিষ্ঠা করে দু'লক্ষ টাকা দান করেন। রচিত গ্রন্থ 'চা পানের দোষ', 'ব্রহ্মার কথা', 'শিবের কথা', 'ইন্দ্রের কথা' প্রভৃতি।

শশিভূষণ অধিকারী : কালনা। যাত্রা-পালাকার। বেহালা বাজনায় তাঁর দক্ষতা ছিল। তিনি জুড়িগানের সঙ্গে বিবেকের গানের প্রচলন করে যাত্রাপালায় কিছু নতুনত্ব আনেন।

শশী হাজরা (?–২৪.১২.১৩৩৭ বঙ্গাব্দ) : সন্তোষপুর—বর্ধমান। আনুমানিক ১৯০৮–১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে শান্তি সম্প্রদায় অপেরা নামে যাত্রার দল করেন। এই দলেই সর্বপ্রথম স্বনামখ্যাত যাত্রাভিনেতা ফণিভূষণ মতিলাল (ছোট ফণী : ১৯০৪–৭২) সর্বপ্রথম সখীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। 'মান্ধাতা' পালার অভিনয়ে এই দল বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। অন্যান্য পালা হলো—শ্রীদুর্গা, দ্রোণসংহার, মা, জয়দ্রথ বধ। এই দলে জুড়িগান ও বিবেকের গান দুই-ই প্রচলিত ছিল। শশী হাজরা আততায়ীর হাতে নিহত হন।

শ্রীশচন্দ্র ঘোষ (১৮৮৭–২.৫.১৯৪১) : রায়না থানার সুবলদহ-এ জন্ম। চন্দননগরে পিতৃব্য গৃহে প্রতিপালিত হন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ও পরে বৈপ্লবিক আন্দোলনে বিশেষ অংশগ্রহণ করেন। ১৯০৫ সালে এন্ট্রান্স পাশ করে 'হিতবাদী' পত্রিকায় সাময়িক ভাবে কাজ নেন। সেখানে গণেশ দেউস্করের সান্নিধ্যে আসেন। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু তাঁর নিকট আত্মীয় ও অভিন্নহৃদয় বন্ধু। অগ্নিযুগে তিনি বহু দুঃসাহসিক কাজে নিযুক্ত ছিলেন। যেমন, আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে নরেন গোঁসাইকে হত্যার জন্য কানাইলাল দত্তকে রিভলভার পৌঁছে দেওয়া, রডেনহাম হত্যার প্রচেষ্টা, রডা কোম্পানীর লুণ্ঠিত পিস্তল বিপ্লবকেন্দ্রে ছড়িয়ে দেওয়া, চন্দননগরে অরবিন্দ প্রমুখ বহিরাগত বিপ্লবীদের আত্মগোপনের ব্যবস্থা করা, হার্ডিঞ্জ হত্যা ও সিপাহীর মধ্যে বিপ্লবের বাণী প্রচার করা ইত্যাদি। ১৯১৫ সালে পারিবারিক কাজে চন্দননগরের বাইরে যাবার সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়েন

ও 'ইনগ্রেস টু ইন্ডিয়া' এ্যাক্ট-এ পুলিশের হাতে বন্দী হয়ে ৫ বছর আটক থাকেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রয়্যাল 'ক্লিমেন্সি' ঘোষিত হলে তিনি মুক্তি পান। নানা মানসিক আঘাতে ও অর্থাভাবে শেষ পর্যন্ত হতাশাগ্রস্ত হয়ে আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করেন। রচিত পুস্তিকা 'শিক্ষাগুরু প্রসঙ্গে'।

শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী (১৮৫০–১৯৩১) : আমাদপুর। ইংরাজীতে এম.এ. পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেন ও আইন পাশ করে হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। ১৯০৫ সালে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে যোগ দেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য পদে ব্রতী হন।

সত্যকিঙ্কর গোস্বামী (১৮৯১–১৯.২.১৯৬০) : জন্ম কোন্দা গোবিন্দপুর। পিতার নাম দোলগোবিন্দ। সন্ন্যাস জীবনেব নাম স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী। তাঁর উর্ধতন দশম পুরুষ ঘনশ্যাম গোস্বামী—বৈষ্ণব ও শাক্ত সাধনার সমন্বয় সাধন করেন। তাই প্রবাদ প্রচলিত ছিল—"নাড়াও নারে, পাঁঠাও কাটে। দেখে এলাম কোন্দার পাটে।" উখড়ায় সংস্কৃত শিক্ষা নেন। ব্যাকরণ ও কাব্যতীর্থ উপাধি পান। স্বাধীনতা সংগ্রামে বিলাস দ্রব্য ও মাদক দ্রব্য বর্জনের এবং চরকাকাটা ও জাতীয় শিক্ষা প্রচারে উৎসাহী ছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের সংস্কৃতানুবাদ ও 'তরণী বিদায়' নামক সংস্কৃত গীতিকাব্য। 'ভাস্করানন্দ সরস্বতীর জীবনী' নামে বাংলা ভাষায় জ্ঞানগর্ভ পুস্তক রচনা করেন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১১.২.১৮৮২–২৫.৬.১৯২২) : পৈতৃক নিবাস চুপী। পিতা রজনীনাথ। জন্ম মাতুলালয়ে চব্বিশ পরগনার নিমতায়। সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র। বি.এ. পর্যন্ত পড়াশুনা করে কিছুদিন ব্যবসায়ও করেছিলেন। তারপর সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হন। নানাবিধ ছন্দ রচনায় ও ছন্দ উদ্ভাবনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। বাংলাদেশের নিজস্ব বাগধারা ও ধ্বনি নিয়ে ছন্দবিজ্ঞান সৃষ্টি করে তিনি মৌলিক কবিপ্রতিভার পরিচয় দেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ—সবিতা, বেণু ও বীণা, তীর্থরেণু, কুহু ও কেকা। উপন্যাস–জন্মদুঃখী, বারোয়ারী! নাট্যসংগ্রহ–রঙ্গমল্লী। অনুবাদ নিবন্ধ–চীনের ধূপ।

সর্বানন্দ ন্যায়বাগীশ (১১৭৬–১২৮২ বঙ্গাব্দ) : বিদ্যাপতিপুর—বর্ধমান। পিতা ধর্মদাস বিদ্যানিধি। শিক্ষা পিতার কাছে, নবদ্বীপে, মিথিলায় ও কাশীতে। মিথিলার পণ্ডিত-সমাজ তাঁকে 'ন্যায়বাগীশ' উপাধি দেন। কলকাতা শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্তদেবের সভাপণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। রাধাকান্তদেবের অর্থানুকূল্যে 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধান সংকলন করে প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগরের 'বিধবা বিবাহ' আন্দোলনে তিনি 'বিধবা বিবাহ প্রতিবাদ' পুস্তিকা প্রকাশ করেন।

সাতকড়ি মালাকার : আউসগ্রাম থানার ভেদিয়ায় জন্ম। সঙ্গীতজ্ঞ সাতকড়ির জন্ম দরিদ্র পরিবারে। শৈশবেই পিতৃবিয়োগ হওয়ায় লেখাপড়ার তেমন সুযোগ হয় নাই। শৈশব থেকেই কাকার সঙ্গে পারিবারিক পেশা সোলার কাজ করতেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে সঙ্গীত প্রতিভা প্রকাশ পায়। বেহালাবাদক ও গায়ক তুলসী চট্টোপাধ্যায় তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে যান ও তাঁর সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা গানে গুণী গোপাল চক্রবর্তীর কাছে সাতকড়ির সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। পরে সুপ্রসিদ্ধ গায়িকা যাদুমণির কাছেও সঙ্গীত শিক্ষা করেন। ছোটবেলায় বসন্তরোগে তিনি অন্ধ হয়ে যান। কিন্তু ১৫/১৬ বছরের সাধনায় সঙ্গীত পারদর্শী হয়ে উঠলেও তিনি উপযুক্ত মূল্য ও প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারেন নাই। নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনে তিনি গাইবার সুযোগ পেয়েছিলেন। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর শেষ জীবন কাটে।

সুকুমার সেন (১৯০০–১৯৯২) : আদি নিবাস বর্ধমানের গোতান গ্রাম। পিতা হরেন্দ্রনাথ সেন। বর্ধমানে ওকালতি করতেন। মায়ের নাম নবনলিনী সেন। প্রখ্যাত আইনজীবী রাসবিহারী ঘোষের ভাইঝি সুশীলা সেন স্ত্রী। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে এবং রাজ কলেজে পড়াশুনা করেছেন। ১৯২১ সালে সংস্কৃতে অনার্সসহ প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় ও ১৯২৩ সালে এম.এ. পরীক্ষায় তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। পরের বছর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ১৯৩৭ সালে পি.এইচ-ডি.। দীর্ঘ ২৮ বৎসর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন। ভারতবিদ্যায় অসামান্য অবদানের জন্য তাঁর আন্তজার্তিক খ্যাতি সমগ্র বঙ্গসমাজের গৌরব। কেবল ভাষা বিজ্ঞানই নয়, সাহিত্য-ইতিহাস-প্রত্নতত্ত্ব-সমাজ-সংস্কৃতি ও শিক্ষাব্যবস্থার সর্বত্রই তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত মনন, চিন্তন, সংকলন শিক্ষাবিদ্‌দের বিস্ময় উদ্রেক করে। বাংলা-সাহিত্যে গোয়েন্দা কাহিনীর পটবদল ঘটেছে তাঁর কলমে। সুকুমার সেনের স্বরচিত, সম্পাদিত ও অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক।

তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ৪ খণ্ড, সেক শুভদয়া, হিস্ট্রি অব্ ব্রজবুলি লিটারেচার, ওল্ড পার্সিয়ান ইন্সক্রিপশনস অব্ দি আখামেনিয়ান এমপারারস, কমপ্যারাটিভ গ্রামার অব্ মিডল্ ইনডো-এরিয়ান, চর্যাগীতি পদাবলী, চৈতন্যচরিতামৃত, এটিমলজিক্যাল ডিকশনারী অব্ বেঙ্গলী, রামকথার ইতিহাস, চৈতন্যাবদান, লোকসাহিত্য; দিনের পর দিন যে গেল (২য় খণ্ড) বিশেষ

উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রয়াণে এক কৃতি ছাত্রের উক্তি—"বাঙালীর শেষ ধ্রুবতারাটি অস্তমিত হল।" এই শূন্যতার ব্যথা বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি কোনদিন ভুলবে না।

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ (জন্ম–২৪শে মার্চ ১৯১৩, মৃত্যু–জানুয়ারী ১৯৯১) : জন্ম–মণ্ডল গ্রামের নিকট গয়েশপুর অঞ্চলে। তিনি ছিলেন সি.পি.আই. (এম)-এর রাজ্য কমিটির সদস্য ও 'নন্দন' সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক। বিধানসভা ও সংসদের সদস্য হিসাবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। 'লেলিন বাদীর চোখে গান্ধীবাদ', 'শিক্ষা ও শ্রেণী সম্পর্ক', 'মাতৃভাষা ও সাহিত্য', 'বিবিধ প্রসঙ্গ' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা। সৈয়দ শাহেদুল্লাহ সাহেবের সবচেয়ে উল্লেখ্য গ্রন্থ— "বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ।" বর্ধমান জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশের সঠিক ধারণা তৈরীতে শাহেদুল্লাহ্ সাহেবের বইটি খুবই গুরত্বপূর্ণ। শুধু তাই নয়, শাহেদুল্লাহ সাহেবের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে অন্বিত করে তাঁর বিশ্লেষণ-সমৃদ্ধ এই গ্রন্থ একটি ঐতিহাসিক দলিল।

সীতারাম ন্যায়াচার্য, শিরোমণি, মহামহোপাধ্যায় (১৮৬৪–৫.৬.১৯২৮) : বঙ্গাব্দের ১২৭০ ফাল্গুন কাইগ্রামে জন্ম। পিতা–নবীনচন্দ্র তর্কালঙ্কার। নবদ্বীপের ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ও 'তর্করত্ন' উপাধি লাভ করেন। এর আগে তর্কতীর্থ উপাধি লাভ করেছিলেন। এরপর 'বঙ্গ-বিবুধ-জননী-সভা' হতে সীতারাম ন্যায়াচার্য শিরোমণি উপাধি পান। ইনি মুর্শিদাবাদে 'মুশির্দাবাদ মঠ' ও নবদ্বীপে 'আরণ্য চতুষ্পাঠী' স্থাপন করে ছাত্রদের অধ্যাপনা করতেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানরাজ কর্তৃক 'বিদ্বৎশোভিনী' সভার সভ্য মনোনীত হন। তিনি বঙ্গীয় বেদসভার সভাপতি ও সংস্কৃত শিক্ষা বিভাগের কার্যনির্বাহক সভার সদস্য মনোনীত হন। বাংলা ভাষায় তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'হরিবাসর সঙ্গীত'। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি পান।

সোমেশ্বর প্রসাদ চৌধুরী (১৮৯৬–২৩.১১.৪৯) : পৈতৃক নিবাস মণ্ডলগ্রাম। পিতা–ডাঃ রাধাগোবিন্দ। পিতার স্থায়ী বাসস্থান মেমারীতে জন্ম। হাওড়া বেলিলিয়াস স্কুলের ছাত্র। ১৯২১ সালে কারমাইকেল কলেজ থেকে ফার্স্ট এম.বি. পাশ করে দেশবন্ধুর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। রাজশাহী, নদীয়া, পাবনা ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে নীলকর এলাকায় কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনা করেন। এই আন্দোলনে সাফল্যলাভ করলেও দীর্ঘদিন কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। গান্ধীর খদ্দর প্রচার অভিযানে যোগ দিয়ে অর্থ

সংগ্রহের জন্য নিজের সম্পত্তি পর্যন্ত বন্ধক রাখেন। ১৯৪২ সালের আন্দোলনেও যোগ দিয়ে তিনি দীর্ঘদিন কারাদণ্ড ভোগ করেন। পরবর্তীকালে ডাক্তারী পাশ করে দুঃস্থদের চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করেন। অসহায় ছাত্রকল্যাণ প্রতিষ্ঠান, মৎস্যজীবী সঙ্ঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন।

হটী বিদ্যালঙ্কার (আঃ ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দ) : সোঞাই-এ জন্ম। পিতার কাছে ব্যাকরণাদি শেখেন। বিধবা হওয়ার পর কাশী গিয়ে স্মৃতি ব্যাকরণ ও নব্য ন্যায় অধ্যয়ন করে অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করেন। সেখানেই চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যাপনা করতে থাকেন। পাণ্ডিত্যের জন্য বিদ্যালঙ্কার উপাধি পান। প্রকাশ্য পণ্ডিত-সভায় তিনি তর্কাদিতে যোগ দিতেন।

হরেকৃষ্ণ কোঙার (১৯১৫–২৩.৭.১৯৭৪) : মেমারী (বর্ধমান)। জন্ম–রায়না থানার কামারগড় গ্রামের এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে। ভারতের মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ও কিষাণ সভার বিশিষ্ট নেতা। অসহযোগ আন্দোলনের সময় মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ও ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আমৃত্যু নিখিল ভারত কিষাণ সভার সদস্য ছিলেন। স্বাধীনতার পূর্বেও পুলিশের নজর এড়ানোর জন্যে ৪ বার আত্মগোপন করে বেড়ান। ১৯৩২ সালে রাজনৈতিক ডাকাতির মামলায় গ্রেপ্তার হন ও আন্দামানে নির্বাসিত হন। ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত বর্ধমান কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সংগঠিত দুই যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলেই তিনি ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। এই বিষয়ে তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা ইংরাজীতে ও বাংলায় বক্তৃতা দিতে পারতেন।

নিরুপম সেন (৮.১০.৪৬–) : জন্ম বর্ধমান শহরের জেলখানা রোডের এক প্রাচীন বনেদী বৈদ্য পরিবারে ১৯৪৬ সালের ৮ই অক্টোবর। পিতা ভুজঙ্গভূষণ সেন। বংশগত বৃত্তি কবিরাজী। ভুজঙ্গবাবুও প্রথমে কবিরাজী আরম্ভ করেন—সরকারি চাকরির সুযোগ পেয়েও যোগ দেননি। পরে কমরেড শাহেদুল্ল্যাহ সাহেব, বিনয় চৌধুরী ও হরেকৃষ্ণ কোঙারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রথমে স্বাধীনতা আন্দোলনে ও পরে কৃষক আন্দোলনে সামিল হন। ১৯৪৩ সালে যখন সমস্ত ভোগ্যপণ্যের মূল্য আকাশচুম্বী, শহরে গ্রামে গঞ্জে চলছে দুর্ভিক্ষের

অবস্থা তখন বামপন্থী আন্দোলনের ফলে রেশনিং ব্যবস্থা চালু হয়। শহরে ও অঞ্চলে ফুড কমিটি গঠিত হয়। ভুজঙ্গবাবু হন টাউন ফুড কমিটির সেক্রেটারী। এরপর তিনি স্কুল সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন ও বর্ধমান থেকে ৬ মাইল উত্তরে রাইপুর কাশিয়াড়ার একটি হাইস্কুল গড়ে তোলেন। তিনিই হন প্রধান শিক্ষক। নিরুপম সেন পিতার বিদ্যালয় থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। এরপর তিনি রাজকলেজে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেন ও বিএসসি পাশ করেন। এখানে তিনি বামপন্থী ছাত্রসংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শহরের কয়েকজন কমিউনিস্ট নেতার সঙ্গে একটি ফৌজদারী মামলায় জড়িয়ে পড়ে অন্তরীণ হন। এই অন্তরীণ অবস্থায় লুকিয়ে কলকাতা গিয়ে মেদিনীপুরের এক অধ্যাপিকার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু ২ দিন পরেই পার্টির নির্দেশে তাঁর রাজনৈতিক গুরু কমরেড বিনয় চৌধুরীর সঙ্গে আসানসোল শিল্পাঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন ও বামফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হওয়ার পরেও তিনি আন্দোলন চালিয়ে যান। কলেজজীবনে বামপন্থী ছাত্রসংগঠন (এস.এফ.আই), পরে শ্রমিক সংগঠন ও এর পরে কৃষক আন্দোলনে বিনয়বাবুর সঙ্গে কাজ করেন। নিরুপমবাবু পার্টির একনিষ্ঠ সৈনিক—পার্টির নির্দেশে যখন যে কাজের ভার পড়েছে—একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সুসম্পন্ন করেছেন। নিরুপমবাবুর পার্টির প্রতি নিষ্ঠা ও কর্তব্য পরায়নতা পুরস্কারস্বরূপ। আজ তিনি মন্ত্রীপরিষদের পর্যায়ক্রমের দ্বিতীয় মন্ত্রী—শিল্প ও রুগ্ন শিল্পের পুনরুজ্জীবন, নতুন নতুন শিল্প গড়ে তোলার গুরুদায়িত্ব তাঁর ওপর। তাঁর ওপর জেলাবাসীর অনেক আশা—নিরুপম সেন বর্ধমানের গৌরব।

□

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১ : এক নজরে বর্ধমান

পরিশিষ্ট ২ : গ্রন্থপঞ্জী

পরিশিষ্ট ৩ : নির্ঘণ্ট

পরিশিষ্ট–১

এক নজরে বর্ধমান

অবস্থান : ২২°.৫৬′ থেকে ২৫°.৫৫′ উঃ অক্ষাংশ ও ৮৬°.৪৮′ থেকে ৮৮°.২৫′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ

চতুঃসীমা : উত্তরে সাঁওতাল পরগণা জেলা, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলা; পূর্বে নদীয়া জেলা, দক্ষিণে হুগলী ও পুরুলিয়া জেলা, পশ্চিমে বিহারের ধানবাদ জেলা।

আয়তন : ৭০৩৪ বর্গ কিলোমিটার

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য :

১) পশ্চিমে পার্বত্যময় অঞ্চল। এই অঞ্চলেই ৫০০ ফুট উচ্চ হালদা পাহাড় অবস্থিত

২) মধ্যভাগে ল্যাটেরাইট গঠিত সমভূমি

৩) পূর্বে দামোদর অজয়-ভাগীরথী বিধৌত পাললিক সমভূমি।

জলবায়ু :

ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত। মোটামুটি ভাবে ক্রান্তীয় নাতিশীতোষ্ণ আর্দ্র, শীতকালে শুষ্ক ও মৃদুশীত আর সব ঋতুতেই ক্রান্তীয় সাভানা টাইপের উষ্ণ জলবায়ু। তাপমাত্রা গড় ২৫-৩৫ ডিগ্রি সে.। পশ্চিমাঞ্চল কিছুটা চরমভাবাপন্ন। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত : বৎসরে গড়ে ৭৭.৬ দিন। পরিমাণ ১৫২৮.৬ মিমি

নদনদী : দামোদর, ভাগীরথী, অজয়, খড়োশ্বরী (খড়ি), বক্কেশ্বরী (বাঁকা), মুণ্ডেশ্বরী, দ্বারকেশ্বর, বরাকর, নুনিয়া, সিঙ্গরণ, তমলা, কুকুরা, কুনুর, তুমনী, ব্রহ্মাণী, বেহুলা, গৌড়, গাঙ্গুর, ঘিয়া, কাকি প্রভৃতি।

বনাঞ্চল : ২৪৩ বর্গ একর।

প্রধান প্রধান শস্য : ধান, পাট, আলু, গম, যব, ইক্ষু, মসুর, মাষ কলাই, ছোলা, সরিষা, তিল, কচু, বেগুন, কুমড়া, মূলা, কপি (ফুলকপি, বাঁধাকপি), লাউ, পিঁয়াজ প্রভৃতি নানা প্রকার শাকসব্জী। তবে প্রধান শস্য ধান ও আলু।

সেচব্যবস্থা : দামোদর ক্যানেল, ইডেন ক্যানেল, ময়ূরাক্ষী ক্যানেল, গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ (স্যালো), নদী থেকে পাম্পের সাহায্যে জলোত্তোলন, জলাশয় থেকে দুনির সাহায্যে সেচ, কূপ।

খনিজ : কয়লা, লৌহপিণ্ড, ম্যাঙ্গানীজ, বক্সাইট, কাওলিন, কাচ তৈরীর বালি।

(১৯৯১ এর আদমসুমারী অনুসারে)

জেলার মোট আয়তন : ৭০২৪ বর্গ কিমি.

ক) চাষের উপযুক্ত জমি —৪৬৯২.০০ বর্গ কিমি

খ) শিল্পাঞ্চল—৫৪৫ বর্গ কিমি

গ) কয়লাখনি অঞ্চল—১১২ বর্গ কিমি
ঘ) বর্তমানে পতিত জমি : ১৬৬ বর্গ কিমি
ঙ) অন্যান্য চাষের অযোগ্য জমি : ১৫০৯ বর্গ কিমি

মোট লোকসংখ্যা : ৬০,৫০,৬০৫
ক) পুরুষ—৩১,৮৬,৮৩৩
খ) মহিলা—২৮,৬৩,৭৭২
গ) গ্রামাঞ্চল এর জনসংখ্যা : ১) পুরুষ—২০,৩১,৮৪২
২) মহিলা—১৮,৯৫,৭৭১
খ) শহরাঞ্চল— (১) পুরুষ—১১,৫৪,৯৯১
(২) মহিলা—৯,৬৮,০০১
(ঙ) প্রতি দশকে জন্মহার বৃদ্ধি : (১৯৮১-৯১) শতকরা ২৫.১৫
(চ) প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব : ৮৬১
(ছ) পুরুষ ও নারীর অনুপাত : প্রতি হাজার পুরুষে ৮৯৯ নারী।
(জ) তপসিলী জাতির সংখ্যা—১৬৬০৪৯৩
(১) পুরুষ : ৮,৬১,৮৮৭
(২) মহিলা : ৭,৯৮,৬০৬
(ঝ) তপসিলী উপজাতি—মোট ৩,৭৬,০৩৩
(১) পুরুষ—১,৯০,৯৬৯
(২) মহিলা—১,৮৫,০৬৪

সাক্ষরের সংখ্যা : ৩১,৩৬,৭৬১ (৫১.৮৪%)
(১) পুরুষ—১৯,১০,২৭২ (৬০.৮৯%)
(২) মহিলা—১২,২৬,৪৮৯ (৩৯.১১%)
(ক) গ্রামাঞ্চলে সাক্ষরের সংখ্যা— (১) পুরুষ—১১,২৭,০৪৫ (৫৫.৪৬%)
(২) স্ত্রী—৭,১৭,৩৭২ (৩৭.৮৪%)
(৩) মোট—১৮,৪৪,৪১৭ (৪৬.৯৪%)
(খ) শহরাঞ্চল : (১) পুরুষ—৭,৮৩,২২৭ (৬৭.৮১%)
(২) স্ত্রী—৫,০৯,১১৭ (৫২.৫৯%)
(৩) মোট : ১২,৯২,৩৪৪ (৬০.৮৭%)

(ক) **কৃষিজীবীর সংখ্যা**—৩,৯২,১২৩
(খ) **কৃষি-শ্রমিক**—৫,৫১,৯৩৭
(গ) **প্রধান প্রধান শিল্পে নিযুক্ত শ্রমজীবীর সংখ্যা** :
(১) পশুচারণ, মৎস্যচাষ, বনসৃজনে নিযুক্ত—১৬,২৭১
(২) খনি ও পাথর খাদে নিযুক্ত—১,২৯,৫৫৪
(৩) কল-কারখানায় নিযুক্ত—২,৫৪.০৮২

(৪) গৃহনির্মাণ—২৫,৮৬২
(৫) ব্যবসা-বাণিজ্য—১,৬৯,৯৮৮
(৬) যানবাহন—৭০,৯৩২
(৭) অন্যান্য বৃত্তিতে—১,৮৭,৩৮১
(৮) প্রান্তিক শ্রমিক—৬৫,১৭৬
(৯) বেকার—৪১,৯৫,৭৫৯

মহকুমা : বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া, দুর্গাপুর, আসানসোল

মিউনিসিপ্যালিটি ৯ : বর্ধমান, আসানসোল, দুর্গাপুর, দাঁইহাট, গুসকরা, কাটোয়া, কালনা, মেমারী, রাণীগঞ্জ

থানা (ফাঁড়ি সহ) ৪২ : বর্ধমান, আউসগ্রাম, বুদ্‌বুদ, ভাতার, মেমারী, জামালপুর, মাধবডিহি, খণ্ডঘোষ, গলসী, পূর্বস্থলী, কালনা, রায়না, মন্তেশ্বর, মঙ্গলকোট, কেতুগ্রাম, কাটোয়া, ফরিদপুর, দুর্গাপুর, নিউ টাউন, কাঁকসা, পাণ্ডবেশ্বর, চিত্তরঞ্জন. সালানপুর, আসানসোল উত্তর, আসানসোল দক্ষিণ, বরাবনি, রানীগঞ্জ, জামুরিয়া, অণ্ডাল, কোক ওভেন, হীরাপুর, রূপনারায়ণপুর, ঝিগ্‌রীমহল্ল্যা, কেন্দা, কুলটি, লাউডহা, সীতাপুর জি.এইচ., ওয়ারিয়া।

ফাঁড়ি : গুসকরা, কেশবগঞ্জ, মুরাদপুর, নতুনগঞ্জ

সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক : ৩১

মৌজার সংখ্যা : ২৫৮৮
(ক) অধ্যুষিত—২৪৮৮
(খ) অনধ্যুষিত—১০০

পঞ্চায়েত সমিতি : ৩১

গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা : ২৭৮

বিদ্যুৎ সরবরাহ আছে এমন গ্রামের সংখ্যা : ১২২০

চিকিৎসার সুবিধাযুক্ত গ্রাম : ৯১৬
(১) লোকসভার আসন সংখ্যা—৪
(২) বিধানসভার আসন সংখ্যা—২৬

যানবাহন : (ক) রেলপথ—(১) ব্রড গেজ—২৪০ কিমি.
(২) কয়লাখনি অঞ্চলে রেলপথ—৫৭.৪৩ কিমি.
(৩) ছোট লাইন—৯১.৭৭ কিমি (এর মধ্যে বি.ডি.আর এর ১৮.১৭ কিমি. বন্ধ আছে)

রাস্তা : (১) এক্সপ্রেস হাইওয়ে—১৯ কিমি (চালু)
(২) জি.টি. রোড—১২১ কিমি
(৩) জাতীয় সড়ক—১৫৮ কিমি
(৪) প.ব. সরকারের অধীনে—১৮৯ কিমি

(৫) ব্ল্যাক টপ্ রাস্তা—১৩৬২ কিমি
(৬) মিউনিসিপ্যাল শহরে— (ক) পাকা রাস্তা—৯২০.৭৫ কিমি
(খ) মোরাম ও কাঁচা রাস্তা—৪৮৬.১২ কিমি
(৭) গ্রামের রাস্তা —৮১০.১২ কিমি
(৮) গ্রামে পি.ডব্লিউ.ডি-এর রাস্তা—৪৯৮.৩৮ কিমি
(৯) জিলা পরিষদের রাস্তা—
(i) স্টেজ এ— ৪৩২ কিমি
(ii) স্টেজ বি—১০৩৬ কিমি
(iii) স্টেজ সি—৩৩৭ কিমি
(iv) ডাকবাংলো—২০
(v) পরিদর্শন বাংলো ও বিশ্রামাগার—২৭
(vi) ফেরী ঘাট—২১

১৯৯৬-এর প্রাপ্ত সংখ্যা অনুসারে :

১(ক) জাতীয় ব্যাঙ্ক ও শাখাসমূহ—৩৬৬
(খ) সমবায় ব্যাঙ্ক—৩০
২(ক) চাউল কল—২৯০ (চালু)
(খ) তুঁষের তেলকল—৫
(গ) কোল্ড স্টোরেজ—৬৯

জমিদারী অধিগ্রহণ ও ভূমি সংস্কার আইন (সংশোধিত) অনুসারে অধিগৃহীত জমির পরিমাণ— (১৯৯৬ সালের পরিসংখ্যান)

(ক) কৃষিজমি—৮৮৭৩৫.৯৪ একর
(খ) অকৃষি (জঙ্গলসহ)—৬৫৩৮৪.৫১ একর
(গ) নথিভুক্ত বর্গাদারের সংখ্যা—১,২৫,৯৫৮
(ঘ) নথিভুক্ত বর্গাদার সমন্বিত জমির পরিমাণ—১১০৭০৩.৫১ একর

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : (১৯৯৮-এ প্রাপ্ত সংখ্যা)

	প্রাথমিক	বয়স্ক শিক্ষা	জুনিয়র হাই (১৩টি মাদ্রাসা সহ)	মাধ্যমিক হাই (১৩টি মাদ্রাসা সহ)	উচ্চ মাধ্যমিক (দ্বাদশ শ্রেণী, ৩টি উচ্চ মাদ্রাসা সহ)	কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়
গ্রাম	৩৪৬২	৩৫০	২২৪	৩৫৩	৫৯	—
শহর	২৭৯	৩৫০	৪৫	৮৯	৬১	৭
মোট	৩৭৪১	৭০০	২৬৯	৪৪২	১২০	৭

(খ) উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :

বিশ্ববিদ্যালয়	ডিগ্রি কলেজ	মেডিকেল কলেজ	আইন কলেজ	সরকারী কলেজ	ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ
১	২৫	১	১	১	২

এম.ই./এম.টেক কলেজ	বি.এড. কলেজ	বুনিয়াদী শিক্ষণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	টেকনিক্যাল স্কুল/কলেজ (পলিটেকনিক)
১	৩	৪	৫

পাঠাগার		জেলা-পাঠাগার	বিজ্ঞান ভবন	প্ল্যানেটোরিয়াম
গ্রামীণ	শহরে			
২৩৪	৯	২	১	১

স্বাস্থ্য পরিষেবা (১৯৯১ সুমারী অনুযায়ী)

হসপিটাল	মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র	মাতৃসদন	শিশুমঙ্গল কেন্দ্র	স্বাস্থ্যকেন্দ্র
৩৫	৩০	৮	৬৬	১৪৭

প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র	প্রাথমিক স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র	ডিসপেনসারী	পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র
১৪	২৪৪	১৪৫	১২

টি বি. ক্লিনিক	কমিউনিটি হেলথ্ ওয়ার্কার	হোমিও কেন্দ্র
৮	৫৫৯	৭

মেলার সংখ্যা — ৪৭৮

(ক) বৈশাখ থেকে আষাঢ়ে চাষের পূর্বে অনুষ্ঠেয় মেলা : ১১৫

(খ) শ্রাবণ থেকে অগ্রহায়ণ (কৃষিপর্বে) : ৮৮

(গ) পৌষ থেকে চৈত্র (ধান ওঠার পর) : ২৭৫

(ঘ) **উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মেলা** :

(১) দধিয়া বৈরাগ্যতলা (মাঘ)

(২) ক্ষীর গ্রামের যোগাদ্যা মেলা—বৈশাখী সংক্রান্তি

(৩) জামালপুরে বুড়োরাজের মেলা—বৈশাখী পূর্ণিমা

(৪) নবাবহাটের শিবরাত্রি মেলা—ফাল্গুন (শিব চতুর্দশী)

(৫) বোরবলরামে বলরামের চক্ষুদান উৎসবে মেলা—বৈশাখী পূর্ণিমা

(৬) কয়রাপুরে দেবীপূজা—চৈত্র (রামনবমী)

(৭) কুড়মুন ঈশানেশ্বরের গাজন মেলা : চৈত্র
(৮) কড়ুই এর বুড়োশিবের মেলা—চৈত্র সংক্রান্তি
(৯) বোঁয়াই-এ বোঁয়াইচণ্ডী মেলা—আষাঢ় (অম্বুবাচি)
(১০) নারিকেলডাঙ্গা জগৎগৌরীর মেলা—আষাঢ় (প্রথম পঞ্চমী)
(১১) বাবলাডিহি শঙ্করপুর—নেংটাশ্বরের শিবরাত্রির মেলা—ফাল্গুন
(১২) আসানসোল (ঊষাগ্রাম) এ ঘাঘর চণ্ডীর মেলা—পৌষ
(১৩) মাহিনগরের খড়ির মেলা—পৌষ সংক্রান্তি

ভারী শিল্প কারখানা :

(ক) দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্ট
(খ) দুর্গাপুর প্রজেক্টস্ লিঃ
(গ) এ.সি.সি ভিকার্স ব্যাবকক্ (এ.ভি.বি)
(ঘ) এ্যালয় স্টীল প্ল্যান্ট (৪ সেল-এর একটি ইউনিট)
(ঙ) দুর্গাপুর কেমিক্যালস্ লিঃ
(চ) দুর্গাপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র
(ছ) মাইনিং ও এ্যালায়েড মেশিনারী কর্পোরেশন
(জ) দুর্গাপুর ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট
(ঝ) ইন্ডিয়ান আয়রন ও স্টীল কোং লিঃ (ইস্কো)
(ঞ) দুর্গাপুর কোল মাইনিং মেশিনারী প্ল্যান্ট
(ট) বেঙ্গল আয়রন ওয়ার্কস্, কুলটি
(ঠ) ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন লিঃ, আসানসোল
(ড) চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ্ ওয়ার্কস্
(ঢ) হিন্দুস্তান কেবলস্
(ণ) সেন র‍্যালে লিঃ
(ত) এ্যালুমিনিয়ম ইনডাস্ট্রি
(থ) বেঙ্গল পেপার মিল বল্লভপুর, রাণীগঞ্জ

সহায়ক ও ক্ষুদ্র শিল্প :

(ক) ইঞ্জিনিয়ারিং—দুর্গাপুর, কাঁকসা, বর্ধমান
(খ) বিটুমেন, আলকাতরা—দুর্গাপুর
(গ) তাঁত শিল্প—কাটোয়া, মেমারী, জামালপুর, কালনা
(ঘ) ইলেকট্রনিক্স—বর্ধমান. আসানসোল, দুর্গাপুর
(ঙ) প্ল্যাস্টিক—দুর্গাপুর, আসানসোল
(চ) কাঠ খোদাই শিল্প—বর্ধমান, নতুন গ্রাম, দাঁইহাট
(ছ) পাথর খোদাই শিল্প—বর্ধমান, পাতুন, নতুন গ্রাম, কাটোয়া, দাঁইহাট
(জ) কার্পাস বয়ন শিল্প—বড়শূল, বর্ধমান।

(ঝ) লোকশিল্প

(১) শোলা শিল্প—বনকাপাশি, বর্ধমান, মোহনপুর (ভাতার)
(২) ডোকরা শিল্প—দরিয়াপুর—(আউসগ্রাম ব্লক)
(৩) খড় শিল্প—বর্ধমান
(৪) মৃৎশিল্প—বর্ধমান, হরিবাটী, কাটোয়া, নতুন গ্রাম
(৫) কাঁথা শিল্প—শ্রীকৃষ্ণপুর (আউশগ্রাম ব্লক), মুরাতিপুর, হরিপুর, মঙ্গলকোট, কাটোয়া।
(৬) বয়ন শিল্প—সমুদ্রগড়, ধাত্রীগ্রাম
(৭) রাখী শিল্প—কালনা
(৮) পটশিল্প ও চিত্রশিল্প—বর্ধমান রাইপুর—কাশিয়াড়া, কৈচর, নিগন, মশাগ্রাম, মালডাঙ্গা, দুর্গাগ্রাম

লৌকিক দেবদেবী :

ধর্মরাজ, কালু রায়, ওলাইচণ্ডী, ঘাঘরচণ্ডী, পঞ্চানন্দ, ভাদু, ক্ষেত্রপাল, ইন্দ্র (ভাঁজো), ঘেঁটু, সত্যপীর, সত্যনারায়ণ, রঙ্কিণী, শীতলা, বোঁয়াই চণ্ডী, দিদি ঠাকরুন, ঝাঁকলাই মনসা, কুলচণ্ডী, তারিক্ষ্যে, ষষ্ঠী, ব্রহ্মানী।

মন্দির :

সর্বমঙ্গলা মন্দির—বর্ধমান
১০৮ শিবমন্দির—নবাবহাট, কালনা,
সিদ্ধেশ্বরী মন্দির—কালনা, কাটোয়া,
গোপালজী মন্দির—কাটোয়া,
কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির—কালনা
সাত দেউলিযার শিখর দেউলমন্দির (৯ম শতাব্দী)—সাত দেউলিয়া (আঝাপুর)
যোগাদ্যামন্দির—ক্ষীরগ্রাম,
শিখরদেউল প্রস্তরমন্দির—বরাকর,
বেগুনিয়া মন্দির—বরাকর,
শিখরদেউল শিবমন্দির—মৌখিরা
আটচালা মন্দির—আমাদপুর
শিবমন্দির—বৈদ্যপুর
প্রতাপেশ্বর শিব মন্দির—কালনা, বর্ধমান
আটকোণা টেরাকোটা শিবমন্দির—কামার পাড়া (বনপাশ)
কঙ্কালেশ্বরী জোড়াবাংলা মন্দির—কাঞ্চননগর
শিবাক্ষ্যা মন্দির—অমরার গড় (আউসগ্রাম, ব্লক-২)

মসজিদ ও স্মৃতিস্তম্ভ :

১ খাজা আনোয়ার বেড়, নবাব বাড়ী—খাজা আনোয়ার বেড়।

২. কালো মসজিদ (শেরশাহ)—পুরাতনচক, বর্ধমান
৩. পীরবাহারাম সক্কা—পায়রাখানা—বর্ধমান
৪. খোক্কর সাহেবের আস্তানা—পায়রাখানা লেন, রাজবাড়ী—বর্ধমান
৫. জামা মসজিদ্ (আজিম-উশ্‌শান)—পুরাতন চক, বর্ধমান
৬. মজলিস সাহেব মসজিদ—কালনা
৭. দানেশমন্দ মসজিদ—মঙ্গলকোট
৮. গদাই ফকিরের আস্তানা ও মসজিদ- –বোহার
৯. বহমন পীর-এর মাজার ও মসজিদ—সুয়াতা

ব্রত-পার্বণ (শাস্ত্রীয় ব্রত) : অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় সিঁদুর, অন্নদান-জলদান, অম্বুবাচী, বিপত্তারিণী, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, বীরাষ্টমী, শিবরাত্রি

লৌকিক ব্রত : পুণ্যি পুকুর, দশ পুত্তুল, হরির চরণ, অরণ্যষষ্ঠী, মনসাব্রত, লোটন ষষ্ঠী, ভাদু, ইতু, পৌষ সংক্রান্তি, শীতলাষষ্ঠী, সত্যনারায়ণ, নীলষষ্ঠী

পত্র পত্রিকা : বর্ধমান থেকে প্রথম প্রকাশিত সাপ্তাহিক
সংবাদ বর্ধমান (১৮৪৯), জ্ঞান প্রদায়িনী, বর্ধমান চন্দ্রোদয়
প্রথম সংবাদিক ও সম্পাদক—গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। বহড়া, জে.এল. ১—থানা পূর্বস্থলী—বাঙ্গাল গেজেটি—১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ ১৫ই মে, শুক্রবার প্রথম প্রকাশিত
(Ref. Long's Descriptive Catalogue of Bengali works 1855)

বর্ধমান জেলা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সংখ্যা

ভাষা	দৈনিক	সাপ্তাহিক	পাক্ষিক	মাসিক	ত্রৈমাসিক	ষান্মাষিক
১. বাংলা	৫	৩৮	৪৯	৬	১৪	৫
২. হিন্দী	১	৩	-	-	-	-
৩. ইংরাজী	-	১	-	-	-	-
৪. সাঁওতালি	-	-	-	-	১	-

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা

দৈনিক : দৈনিক মুক্ত বাংলা : বর্ধমান
দৈনিক স্বীকৃতি : বর্ধমান
আসানসোল পরিক্রমা : আসানসোল
দৈনিক মহাজাতি : হিন্দি
জাতীয় পত্রিকা : আসানসোল

সাপ্তাহিক : সাপ্তাহিক মুক্ত বাংলা
সাপ্তাহিক স্বীকৃতি

কাটোয়া হিতৈষী—কাটোয়া
পল্লীবাসী—কালনা
কাটোয়ার কলম—কাটোয়া
সাপ্তাহিক ধ্বনি

পাক্ষিক :
কুলটিবার্তা—আসানসোল

দুর্গাপুর জনজীবন
বর্ধমান সমাচার
সাপ্তাহিক বর্ধমান
বিজয়তোরণ
সাপ্তাহিক প্রফুল্ল
রানীগঞ্জ দর্পণ
কাটোয়া দর্পণ
ইস্পাত বলয়—দুর্গাপুর
ক্রীড়াক্ষেত্র—বর্ধমান
মেমারী সংবাদ—বর্ধমান
চাষ আবাদ—বর্ধমান
পরিবহন সমাচার—বর্ধমান
সাম্প্রতিক—কালনা
অম্বিকা সমাচার—কালনা

দ্রষ্টব্য স্থান :

বর্ধমান : বিজয়তোরণ, সর্বমঙ্গলা মন্দির, বর্ধমানেশ্বর-শিবমন্দির, সোনার কালীবাড়ী, লক্ষ্মীনারায়ণজী মন্দির, সাধক কমলাকান্তের কালীবাড়ী, দুর্লভা কালীবাড়ী, ভৈরবেশ্বরী কালীমন্দির (মূর্তি নিমকাঠের তৈরী), কঙ্কালেশ্বরী কালী মন্দির (কাঞ্চননগর), বর্ধমান রাজবাড়ী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়—গোলাপবাগ, ডিয়ার পার্ক, রমনার বাগান, মেঘনাদ সাহা তারামণ্ডল, পরিবেশ উদ্যান-কৃষ্ণসায়র, বর্ধমান রাজ-উপাসনামন্দির (রমনা-বাগান), পীরবাহারাম, শের আফগানের সমাধি, খক্কর সাহেবের আস্তানা (পায়রাখানা), জামা মসজিদ, কালো মসজিদ, খাজা আনোয়ার (বেড় নবাববাড়ী), সংস্কৃতি হল, বারোদুয়ারী গেট (কাঞ্চননগর)

নবাবহাট : ১০৮ শিব মন্দির

কুড়মুন : ঈশানেশ্বরের ত্রিশূলাকৃতি শিব, ইন্দ্রানী দেবী।

কালনা : সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, ১০৮ শিব মন্দির, লালজী মন্দির, শ্রীকৃষ্ণ মন্দির, তুর্কী-আফগান আমলের মসজিদ

মন্তেশ্বর : মুক্তেশ্বর শিব, চামুণ্ডা সিদ্ধেশ্বরী মন্দির

কাটোয়া : গৌরাঙ্গবাড়ী, সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, মুর্শিদকুলী খাঁর মসজিদ

কেতুগ্রাম : শক্তিপীঠ—সতীর বাম বাহু পতিত হয় বলে কথিত। দেবী বেহুলা।

ক্ষীরগ্রাম : শক্তিপীঠ—সতীর দক্ষিণ চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পতিত হয় বলে কথিত, দেবী যোগাদ্যা, ভৈরব—ক্ষীরকণ্টক ভৈরব।

বাবলা ডিহি : ন্যাংটেশ্বর শিব (জৈন মূর্তি)

মঙ্গলকোট : দানেশমন্দ ফকিরের স্মৃতিস্তম্ভ, হোসেন শাহের মসজিদ, নানা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন।

কোগ্রাম : বৈষ্ণব কবি লোচনদাস স্মৃতিমন্দির, শক্তিপীঠ (দেবীর দক্ষিণ কনুই পতিত হয় বলে কথিত) দেবী সর্বমঙ্গলা ও ভৈরব কপিলেশ্বর, কুমুদরঞ্জন মল্লিকের জন্মস্থান।

অমরারগড় : গোপভূম খ্যাত শিবাক্ষ্যামন্দির।

কল্যাণেশ্বরী : হালদা পাহাড়ে পীড়াদেউল মন্দিরে দেবী কল্যাণেশ্বরীর গুহামন্দির।

বরাকর : ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীর শিবের প্রস্তর নির্মিত শিখর দেউল মন্দির, বেগুনিয়া

শিবমন্দির।
দুর্গাপুর-আসানসোল-চিত্তরঞ্জন-কুলটি শিল্পাঞ্চল।

চুরুলিয়া : পঞ্চকোট রাজ নরোত্তমের গড়, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মস্থান।

কুলীন গ্রাম : মালাধর বসুর জন্মস্থান, মদনগোপাল, ললিতা, রাধার মন্দির, গোপেশ্বর শিবমন্দির

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন : আউসগ্রাম থানার পাণ্ডুক গ্রামের রাজপোতা ডাঙ্গা।
ভাতার থানার বড় বেলুনের সাঁওতাল ডাঙ্গা ও আড়াগ্রামের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন।
পানাগড়ের নিকট ভরতপুরের বৌদ্ধস্তূপ।

বনভোজনের স্থান :
পানাগড়ের নিকট রন্ডিয়ার ডাকবাংলো, ওরগ্রাম-এর ডাকবাংলো ও পাল্লা রোডের দামোদর তীরে ডাক বাংলো।

জেলার কতিপয় প্রখ্যাত সাহিত্যিক, কবি, নাট্যকার, ঐতিহাসিক ও মনীষী (প্রাচীন-নবীন)

চণ্ডীদাস	কেতুগ্রাম	পদাবলী
মালাধর বসু	কুলীন গ্রাম	শ্রীচৈতন্যভাগবত
বৃন্দাবন দাস	দেনুড়	শ্রীচৈতন্যভাগবত
লোচনদাস	কোগ্রাম	চৈতন্যমঙ্গল
জয়ানন্দ	আমাইপুরা	চৈতন্যমঙ্গল
কৃষ্ণদাস কবিরাজ	ঝামটপুর	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
জ্ঞানদাস	কেন্দরা	পদাবলী
গোবিন্দদাস কর্মকার	কাঞ্চননগর	শ্রীচৈতন্যচর্চা
রামগোপাল দাস	শ্রীখণ্ড	রসকল্পাবলী
কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	দামিন্যা (রায়না থানা)	অভয়ামঙ্গল
ঘনরাম চক্রবর্তী	কুকুরা, কৃষ্ণপুর	ধর্মমঙ্গল
নরসিংহ বসু	বাসুদাগ্রাম	ধর্মমঙ্গল
হৃদয়রাম সাউ	খুরুল (ভাতাড় থানা)	ধর্মমঙ্গল
রঘুনাথ রায়	কাষ্ঠশালী	শাক্ত পদাবলী
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	চান্না/কোটালহাট বর্ধমান	(শাক্ত পদাবলী) শ্যামাসঙ্গীত
দাশরথি রায়	বাঁধমুরা, কাটোয়া	পাঁচালী
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	বকুলিয়া, কালনা	স্বদেশপ্রেম-মূলক কাব্য
কুমুদরঞ্জন মল্লিক	কোগ্রাম	পল্লীকবি

ভোলানাথ মহন্ত	বর্ধমান (মিঠাপুকুর)	পল্লীকবি
ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	বড়বেলুন	অমিত্রাক্ষর ছন্দে রামায়ণ অনুবাদক (দন্তালিকা)
রাজকৃষ্ণ রায়	রায় রামচন্দ্রপুর	নাট্যকার ও কবি
ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী	রায়ান (বর্ধমান)	যাত্রার পালাকার
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পঞ্চানন বা পাঁচু ঠাকুর)	গঙ্গাটিকুরী	ব্যঙ্গাত্মক ও হাস্যরসাত্মক সাহিত্য রচয়িতা, কার্টুনিস্ট
অক্ষয়কুমার দত্ত	চুপী	প্রবন্ধকার
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	চুপী	ছন্দের যাদুকর কবি
কালিদাস রায় (কবিশেখর)	কড়ুই	পল্লীকবি
নজরুল ইসলাম	চুরুলিয়া	বিদ্রোহী কবি
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	অন্ডাল	ঔপন্যাসিক
রমাপদ চৌধুরী	পলসনা (কাটোয়া)	ঔপন্যাসিক
রেভঃ লালবিহারী দে	সোনা পলাশী	ঔপন্যাসিক, গোবিন্দ সামন্ত ও ফোক টেলস্ অব্ বেঙ্গল 'রচয়িতা'।
কাশীরাম দাস	সিঙ্গী	মহাভারতের অনুবাদক
সুকুমার সেন	গোতান	ভাষাচার্য, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক
সৈয়দ শাহেদুল্লাহ		প্রবন্ধকার ও ঐতিহাসিক
কালীপদ সিংহ	পার্কস রোড বর্ধমান	সাহিত্যিক
ড. রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়	সাহিত্যিক
নীলা কর	বি.সি. রোড, বর্ধমান	কবি
ডঃ বারিদবরণ ঘোষ	রোজভিলা বর্ধমান	প্রবন্ধকার ও গবেষক
চিত্ত ভট্টাচার্য	পিলখানা লেন	কবি ও ঔপন্যাসিক
দেবেশ ঠাকুর	চাঁদমারী বাইলেন	প্রবন্ধকার
সমীরণ চৌধুরী	চৌধুরী লেন, জি.টি. রোড	প্রবন্ধকার
ড. গোপীকান্ত কোঙার	নতুন পল্লী, বর্ধমান	প্রবন্ধকার
সুধীরচন্দ্র দাঁ	১ পাকমারা লেন, বর্ধমান	ঐতিহাসিক
যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী	ক্ষীরগ্রাম	ঐতিহাসিক
সুধীর অধিকারী	কালিবাজার, বর্ধমান	সাংবাদিক ও সাহিত্যিক
ডঃ আদিত্য মজুমদার	২নং ইছলাবাদ	শিক্ষাবিদ ও প্রবন্ধকার
ডঃ সুমিতা চক্রবর্তী	বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়	গবেষক
ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা	ঐ	ঐ
রফিকুল ইসলাম	বাবুর বাগ, বর্ধমান	কথা সাহিত্যিক

কামাখ্যা মুখোপাধ্যায়	কালিবাজার, বর্ধমান	কবি
মানবেন্দ্র পাল	কালনা	কথা সাহিত্যিক
জগদীশ রায়	কালনা	কবি
দীপককুমার দাস	কালনা	ঐতিহাসিক
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	কালনা	গল্প-উপন্যাস
সৌরিন ঘটক	কাটোয়া	উপন্যাস
কালিপদ ঘটক	আসানসোল	
মতি মুখোপাধ্যায়	কুলটি	কবি
মানব চক্রবর্তী	চিত্তরঞ্জন	সাহিত্যিক
অনিল সেনগুপ্ত	কাটোয়া	
অগ্নি মিত্র		নাট্যকার
অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	রোপা, আসানসোল	অভিনেতা
শম্ভু বাগ	বর্ধমান	নাট্যকার
দেবকীকুমার বসু	ওয়াড়ি (বর্ধমান)	অভিনেতা ও পরিচালক
কমল মজুমদার	বর্ধমান	সিনেমা অভিনেতা
নবদ্বীপ হালদার	সোনা পলাশী	কৌতুক অভিনেতা
জয়া মিত্র	আসানসোল	সাহিত্যিক.
জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য	২নং ইছলাবাদ	প্রবন্ধকার
অজিত হালদার	২নং ইছলাবাদ	ঐ
রতন দত্ত	৩নং ইছলাবাদ	কবি ও সাহিত্যিক
নারায়ণ চৌধুরী	কালীবাজার	ঐতিহাসিক
সুবোধ মুখোপাধ্যায়	বর্ধমান	প্রবন্ধকার
ড. আবদুস সামাদ	রানীগঞ্জ	গবেষক
বলাই দেবশর্মা	শাঁখারীপুকুর	সাংবাদিক, প্রবন্ধকার
কল্যাণ ভট্টাচার্য	২নং ইছলাবাদ	প্রবন্ধকার
ভব রায়		সাহিত্যিক
কালিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	দুর্গা গ্রাম	বাংলাদেশের ইতিহাস রচয়িতা
মহামহোপাধ্যায় বীরেশ্বর তর্কতীর্থ	বৈদ্যপুর	সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত
নবাব খান বাহাদুর আবদুল জব্বার		পাহাড়হাটি
উপেন্দ্র ব্রহ্মচারী	জামালপুর	কালাজ্বরের ঔষধ আবিষ্কারক
কবিরঞ্জন	শ্রীখণ্ড	
মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি	ধাত্রীগ্রাম	

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য	বহড়া, পূর্বস্থলী	প্রথম সাংবাদিক
গণপতি পাঁজা	মাজিগ্রাম	চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ
গিরীশচন্দ্র বসু	বেরুগ্রাম, জামালপুর	সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ
জীবনানন্দ বিদ্যাসাগর (ভট্টাচার্য্য)	অম্বিকা কালনা	সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত
তারকনাথ তর্কবাচস্পতি	ঐ	
নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	বুড়ার গ্রাম	কবি ও ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক লৌহসার আবিষ্কর্তা
নবীন ভাস্কর	দাঁইহাট	প্রস্তর শিল্পী
নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়	ধবনী গ্রাম	যাত্রাদলের অধিকারী
প্রতাপচন্দ্র রায়	সাঁকো	মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদক
প্রভাত মুখোপাধ্যায়	ধাত্রীগ্রাম	কথা-সাহিত্যিক
প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ	শাকনাড়া	সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত
বটুকেশ্বর দত্ত	ওয়াড়ী	বিপ্লবী
বলাই দত্ত	মেড়াল	নৌবিদ্রোহের বিপ্লবী
বিনয় চৌধুরী	মাঝের গাঁ	বিপ্লবী, অপারেশন বর্গা
দাশরথি তা	ধামাস	বিপ্লবী, সাংবাদিক

পরিশিষ্ট-২
গ্রন্থপঞ্জী

প্রথমে পরিকল্পনা ছিল ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা একটি খণ্ডেই বিধৃত হবে। কিন্তু প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠার পুস্তকের অখণ্ড সংস্করণ প্রকাশিত হলে সেটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পাঠকের অসুবিধা হতে পারে। সেই বিবেচনায় ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতির জন্য দুটি পৃথক খণ্ডে বইটি প্রকাশ করতে হলো। একখণ্ডে প্রকাশ করার পরিকল্পনার ফলে ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত যে সমস্ত গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য নিতে হয়েছে, তাদের প্রায় পূর্ণ তালিকাই প্রথম খণ্ডেই সংযোজিত হয়েছে। কাজেই দ্বিতীয় খণ্ডে সে সমস্ত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তবু লোকসংস্কৃতির আলোচনার জন্য যে সমস্ত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার সহায়তা বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়েছে কেবলমাত্র সেগুলিই দ্বিতীয় খণ্ডে সংযোজিত হলো।

ইংরাজী :

1. Folk Tales of Bengal Rev. —Lal Behari Dey.
2. Rituals and Festivals of India. —Bapat Tara.
3. Major Hindu Festivals—Subhash Anand.
4. Encyclopeadia of Religion and Ethics. (1959), Ed. J. Hastings.
5. The Golden Bough, (1964–20) (1–12) J.G. Frazer
6. Hindu Mythology (1887)—Wilkins
7. A study of Religion. —J. Martinue.
8. Folk Arts and crafts of Bengal—Gurusaday Datta. (Selected Papers)
9. Folklore of Bengal—Sankar Sengupta.
10. Man in India, Oct–Dec 1952
11. Worship of Nature—J. Gonda.
12. Burdwan Gazetteer—Peterson
13. Bardhaman Gazetteer—1994.
14. Epigraphica Indica, Vol.1
15. Bengal Temples—Bimal Kr. Dutta 1975
16. Travel of a Hindoo (Vol. I+II)—Bholanath Chander 1968
17. List of Ancient Monuments in Bengal, 1896, Govt. of Bengal.
18. Dist census Hand Book Bardwan 1981, Govt. of W.B.
19. Dist. Census Hand Book 1953—Dr. A. Mitra
20. Hist. of Bengal Vol II, J. N. Sarkar.
21. Temples and Legends of Bengal. —P. C Roy Chowdhury.
22. Sakta Pithas 1973—D. C. Sarkar.

23. The Annals of Rural Bengal—W. W. Hanter.
24. Dist Census Hand Book 1991—Bardhaman XIIA, Series 26.
25. Dist Census Hand Book—XIIB
বাংলা :
১. রাগ ও মেলডি—সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. খেয়ালের জন্ম—প্রমথ চৌধুরী
৩. সহজিয়া—দ্বিজেন্দ্র বাগচি
৪. যৌথ পরিবার—পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
৫. বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসব-১৪০৭—অন্বেষণ, বর্ধমান
৬. প্রগতির পথে—স্মারক সংখ্যা—কালনা (১৯৭৩)
৭. বর্ধমান জেলার লোকসংস্কৃতির প্রকৃতি ও গতি—রফিকুল ইসলাম (পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা—বর্ধমান জেলা সংখ্যা, ১৪০৩)
৮. বর্ধমানের লোকসংস্কৃতি—শৈলেন্দ্র সামন্ত (পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ৬৮ তম সম্মেলন ১৯৯৪)
৯. বর্ধমান সম্মিলনী সুবর্ণজয়ন্তী স্মরণিকা-১৩৬৪
১০. শারদীয় বর্ধমান-১৩৯১
১১ রানীগঞ্জের সংস্কৃতি অন্দোলন—উদয় দাস
১২. কাটোয়া মহকুমা প্রদর্শনী স্মারকগ্রন্থ ১৯৮১
১৩. সারা ভারতের সাংবাদিক তীর্থ বর্ধমানের বহড়া—দাশরথি তা—দৈনিক দামোদর শারদ সংখ্যা ১৩৮১
১৪. শারদীয় মুক্ত বাংলা—১৪০৫
১৫. নতুন চিঠি—শারদ সংখ্যা ১৯৮৫
১৬. শিক্ষানিকেতন পত্রিকা ১৯৭৩
১৭. নতুন চিঠি—শারদ সংখ্যা ১৯৮৪
১৮. শারদীয় বিজয়তোরণ—১৪০৬
১৯. শারদীয় বর্ধমান ১৩৯৪
২০. আজকের যোধন, জুলাই-আগস্ট ২০০০
২১. শারদীয় বর্ধমান ১৩৮৪
২২. দৈনিক স্বীকৃতি, উৎসব সংখ্যা—১৪০৫
২৩. মেয়েদের ব্রতকথা—অন্নপূর্ণা দেবী
২৪. বাংলার ব্রত—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৫. বাংলার ব্রতপার্বণ—ডঃ শীলা বসাক
২৬. পশ্চিমবাংলার পূজাপার্বণ—ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত
২৭. শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ

২৮. চণ্ডীমঙ্গল—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, সম্পাদনা : সুকুমার সেন
২৯. ব্রতকথা—কিরণবালা দাসী
৩০. গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা—১৪০৩
৩১. মনসামঙ্গল—কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
৩২. পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ
৩৩. বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব—বিনয় ঘোষ
৩৪. পশ্চিমবঙ্গের মেলা : সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা—ডঃ গোপীকান্ত কোঙার
৩৫. শ্রী ধর্মমঙ্গল—ঘনরাম চক্রবর্তী, সম্পাদনা : পীযূষ মহাপাত্র
৩৬. মেয়েলি ব্রত—অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদনা : শ্রীলেখা চট্টোপাধ্যায়
৩৭. বাংলার লোকসংস্কৃতি—মিহির চৌধুরী কমিল্যা
৩৮. আঞ্চলিক দেবতা লোকসংস্কৃতি—মিহির চৌধুরী কামিল্যা
৩৯. ভারতবর্ষ—অগ্রহায়ণ ১৩৫৩
৪০. শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন—নরেন্দ্রনাথ বসু, ফাল্গুন ১৩৫৯
৪১. ভারতবর্ষ—কার্তিক ১৩৫৫
৪২. ভারতবর্ষ—আশ্বিন ১৩৬৬
৪৩. ভারতবর্ষ—অগ্রহায়ণ-মাঘ—১৩৫৯
৪৪. ভারতবর্ষ—বৈশাখ ১৩৩৫
৪৫. ভারতবর্ষ—১৩৪৬ মাঘ
৪৬. ভারতবর্ষ—চৈত্র ১৩২২
৪৭. রূপকথার রূপ—হৃষীকেশ ভট্টাচার্য
৪৮. আলপনা ও পিঁড়িচিত্র—জিতেন্দ্র নাগ।
৪৯. দ্বিজমাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত—সুধীভূষণ ভট্টাচার্য
৫০. বাইশ কবির মনসামঙ্গল—আশুতোষ ভট্টাচার্য
৫১. বাংলার লোকসাহিত্য-১ম, আশুতোষ ভট্টাচার্য
৫২. পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা (৫ম খণ্ড)—ড: অশোক মিত্র
৫৩. বাংলার লৌকিক দেবতা—গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
৫৪. ব্রত ছড়া আলপনা—বেলা দে
৫৫. বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৩য় খণ্ড)—যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী
৫৬. বাংলার লোকসাহিত্য : আশুতোষ ভট্টাচার্য
৫৭. মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—আশুতোষ ভট্টাচার্য
৫৮. বঙ্গীয় মহামহোপাধ্যায় জীবনী—হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য
৫৯ প্রতাপচন্দ্র লীলারস প্রসঙ্গ সঙ্গীত—শ্রী অনুপচন্দ্র দত্ত
৬০. সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র—সংবাদ প্রভাকর; বিনয় ঘোষ
৬১. পৌরাণিক অভিধান—সুধীরচন্দ্র সরকার

৬২. বঙ্গীয় শব্দকোষ—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৩. সংসদ বাংলা অভিধান—জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ
৬৪. সংবাদপত্রে সেকালের কথা-১ম ও ২য়—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম পূর্বার্ধ-অপরার্ধ, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড—সুকুমার সেন
৬৬. সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান—সাহিত্য সংসদ, সম্পাদক সুবোধ সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু
৬৭. বাংলা ছোট গল্প (১৮৭৩-১৯২৩)—শিশির দাস
৬৮. পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি—পশ্চিমবঙ্গ সরকার, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, ১৬/১২/৭০
৬৯. শারদ দামোদর—১৩৭০
৭০. পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা—কাজী নজরুল ইসলাম স্মরণ সংখ্যা, ১৪০৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
৭১. পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি-৩৯ তম রাজ্য সম্মেলন স্মরণিকা-১৯৯৮
৭২. শ্রীশ্রী বসন্ত চণ্ডী মাতার আবির্ভাব ও ইতিবৃত্ত—বলরাম মাঝি
৭৩. ভারতের সাধক ১-৬ষ্ঠ খণ্ড—শঙ্করলাল রায়
৭৪. বর্ধমান রাজসভাশ্রিত বাংলা সাহিত্য—ডঃ আবদুস সামাদ
৭৫. আনন্দবাজার পত্রিকা—৪/১/২০০০
৭৬. আনন্দবাজার পত্রিকা (জেলা পরিক্রমা) ৬/২/২০০০
৭৭. লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার—ডঃ বরুণ চক্রবর্তী
৭৮. বাংলার লোকশিল্প–১ম + ২য়—সুধীর চক্রবর্তী
৭৯. পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও মহোৎসব—সুধীর চক্রবর্তী
৮০. কালনার ইতিবৃত্ত—দীপককুমার দাস
৮১. বিজয়তোরণ, শারদীয়, —১৩৮৩
৮২. নতুন চিঠি, শারদ সংখ্যা —১৯৯৮
৮৩. অজয় পত্রিকা–১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৮৮
৮৪. দাঁইহাট পৌরসভা, ১২৫ বর্ষ পূর্তি উৎসব, ১৯৯৪, স্মারকগ্রন্থ
৮৫. শারদীয় বিজয়তোরণ, ১৩৯৩
৮৬. শারদীয় দামোদর, ১৩৮০
৮৭. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি, ৫৯ তম বার্ষিক সম্মেলন স্মারকগ্রন্থ ১৯৮৫
৮৮. বিশ্বভারতী পত্রিকা—শ্রাবণ-আশ্বিন ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দ

সাপ্তাহিক দেশ :

তারিখ	পৃষ্ঠা নং	তারিখ	পৃষ্ঠা ন
৯/১/৬৫	৯১৭	১১.১১.৭৮	৫১
৩১/৭/৬৫	১৩৪৮	২ অগ্রহায়ণ ১৩৮৫	৪৯
৮ই মাঘ ১৩৭২	১১৯৫	২৩শে অঘ্রান, ১৩৮৫	৫৭
১৯ শে পৌষ ১৩৭৬	১০০৫	১৭.২.৭৯	৪৫
১০/১/৭০	১১০৯	১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬	৪১
১১.৭.৭০	১২০৯	৯.৬.৭৯	৫৭
৭.৬.৬৯	১০০৭	১৫ই ভাদ্র, ১৩৮৬	৪৫
১৬ই শ্রাবণ, ১৩৭৭	৪৭	১৭.১২.৮০	৪১
২৪.৭.৭২	১০০১	২১.১১.৮১	৫৩
৯.৯.৭২	৫৪৭	১৫.৫.৮২	৯
১১ ১১.৭২	১৮৯	১০.৭.৮২	৫
৩.১১.৭৩	৬৩	৭.৮.৮২	৬
অমৃত পত্রিকা :		২৮.৮.৮২	৩
১.২.৭৪	১৯	৭.৮.৮২	৫৩
সাপ্তাহিক দেশ :		২৫.১১.৮২	৬
১৯.৬.৭৬	৫৫২	২১.৮.৮২	১৩
২২.১.৭৭	৯১৮	ঐ	৩১
৩১শে বৈশাখ, ১৩৮৪	৪৫	১৩/২/৮২	৯
২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪	১৭	২৬/৩/৮৩	৯
৩১শে আষাঢ়, ১৩৮৪	২৯	২৭/৩/৮২	৯
২৮শে জ্যৈষ্ঠ	১৭	১/১০/৮৩	৫১
৩১ শে আষাঢ়, ১৩৮৪	২৯		
৭ শ্রাবণ, ১৩৮৪	৫৩	২৯/১০/৮৩	৩৭
১৮ ভাদ্র, ১৩৮৪	১১	১২/৩/৮৩	৩৯
১লা আশ্বিন, ১৩৮৪	১১	১৯/৩/৮৩	২৫
১৪.১৭৮	৬১	২/৪/৮৩	৪৯
৬.২.৭৮	৫	৩০/৪/৮৩	৩১
২৫ শে চৈত্র, ১৩৮৪	৩	২৫/৬/৮৩ }	৪৩
৬.২.৭৮	৬১	২১/৩/৭৬ }	
৬ই ফাল্গুন ১৩৮৪	৪১	২২/৬/৮৫	২৩
৪ঠা চৈত্র ১৩৮৪	৩৭	২৩/১১/৮৩	৭
১লা জুলাই, ১৯৭৮	১৭	৭/৯/৮৫	৮

তারিখ	পৃষ্ঠা নং
৯/১১/৮৫	১৩
এই প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকা ২৬/১/৯৯ দ্রষ্টব্য।	
২৬/১১/৮৫	১০০
২৮/১২/৮৫	৭
৩০.১১.৮৫	৩৬
৭.১২.৮৫	৩৭
৮.২.৮৬	৩৭
২৯.৩.৮৬	৩৫
১২.৪.৮৬	৫৫, ৬৬
২৬.৪.৮৬	১৯
২১.৬.৮৬	১৯
১১.৭.৮৭	৭৭
১১.৭.৮৭	৪৭
১.৮.৮৭	৯৫
৮.৮.৮৭	৭
৫.৯.৮৭	৩৯
২৬.৯.৮৭	৩৭
৯.৪.৮৮	৫৮
২১.৫.৮৮	৬৩
১৬.৮.৮৮	৮৭

তারিখ	পৃষ্ঠা নং
১৬.৮.৮৮	৩৯
৬.৮.৮৮	১৯-৫১
১০.৯.৮৮	৫৭
১০.৯.৮৮	৯৬
৩.৯.৮৮	৪৩
১০.৯.৮৮	
২৪.৯.৮৮	
২৯.৯.৮৮	
	ধারাবাহিক
১৯.১১.৮৮	
১৪.১.৮৯	
২৪.৯.৮৮	১৯
৩.১২.৮৮	৭৭
১১.২.৮৯	৭৭
২৯.৪.৮৯	১৯
২৭.৫.৮৯	৩৭
২৪.৬.৮৯	৪৯
২৮.১০.৮৯	১৯
২৮.১০.৮৯	৩৯
৪.১১.৮৯	৫৭

সাপ্তাহিক/পাক্ষিক দেশ	পৃষ্ঠা
১২.৭.৯১	১৯
৬.৪.৯১	২১
২০.৪.৯১	৬৭
২২.৬.৯১	২১
২০.৭.৯১	২১
১৮.১.৯২	২১
,,	৪২
১৪.৯.৯১	৯৮

	পৃষ্ঠা
২১.৩.৯২	১৮
১৩.৬.৯২	২১
২২.৫.৯৩	৩২
১৭.৭.৯৩	৫৩
৯.১০.৯৩	৭–১২
২৯.৭.৯৫	৭৭
৮.৮.৯৮	৪৩
১৭.৪.৯৯	১৯
২৪.৭.৯৯	২৭

সাপ্তাহিক পশ্চিমবঙ্গ :

(২৭.২.৮৭) প্রবন্ধ : বাংলা রূপকথার নিজস্বতা—রীতা ঘোষ
ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও পঞ্চায়েতরাজ—গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী

সাপ্তাহিক পশ্চিমবঙ্গ :

(১৭.৭.৮৭) প্রবন্ধ : বাংলা সাহিত্যে লৌকিক মন্ত্রের ব্যবহার—সুভাষ মিস্ত্রী।

পুরোহিত দর্পণ—সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা—১৪০২
Encyclopedia Britanica —9th Edn. 1890
শারদীয় বিজয়তোরণ—১৯৮৩
শারদীয় নতুন চিঠি—১৯৯৮
বর্ধমান সম্মিলনী—১৯৭৪ (হীরকজয়ন্তী স্মরণিকা)
শারদীয়া মুক্তি চাই—১৩৮৪
বর্ধমান জেলা কংগ্রেস কালনা স্মারকগ্রন্থ—১৯৭৩
নতুন চিঠি, শারদ সংখ্যা —১৯৮৫
লোকসংস্কৃতি গবেষণা—সম্পাদনা সনৎ মিত্র, ত্রৈমাসিক পত্রিকা

(ক) বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৯৯
(খ) শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০১
(গ) কার্তিক-পৌষ ১৪০১
(ঘ) কার্তিক-পৌষ ১৪০২
(ঙ) মাঘ-চৈত্র ১৪০২
(চ) বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৩
(ছ) শ্রাবণ-আশ্বিন- ১৪০৩
(জ) কার্তিক-পৌষ ১৪০৩
(ঝ) মাঘ-চৈত্র ১৪০৩
(ঞ) বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৪
(ট) কার্তিক-পৌষ ১৪০৪
(ঠ) শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৫
(ড) কার্তিক-পৌষ ১৪০৫
(ঢ) বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৬
(ণ) শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৬

পরিশিষ্ট-৩

নির্ঘন্ট

ব্যক্তিনাম

স্থাননাম